এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, সর্ব অর্থেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইতিহাসপুরুষ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান অপরিমিত। তাঁর সমগ্র জীবন কল্পিত উপন্যাসের চেয়েও কৌতূহলোদ্দীপক। বাল্যকাল থেকে অন্তর্ধান পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের জীবনে যা কিছু ঘটেছে, তার মধ্যে জীবনভাবনার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলো নিহিত ছিল। অপার বিস্ময় যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্বে। 'মহানায়ক' উপন্যাস সেই মহাজীবনের কাহিনি। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, অনুসন্ধিৎসু গবেষণার সনিষ্ঠ প্রয়োগে মূল মরাঠি ভাষায় লেখা এই জীবনোপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছেন মহানায়ক নেতাজি।

.....

ISBN 81-7756-651-2

SHOUT
SHARE
IT

28

মহানায়ক

বিশ্বাস পাটিল

অনুবাদ দীপেন চক্রবর্তী

আনন্দ

১৯৯৮ সালে রাজহংস প্রকাশন কর্তৃক মরাঠি ভাষায় প্রকাশিত
বিশ্বাস পাটিল লিখিত মহানায়ক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

সম্পাদনা সহায়তা: শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৭

© বিশ্বাস পাটিল

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-651-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

৩৫০.০০

মহানায়ক

১
লালকেল্লার আহ্বান

দিল্লি: নভেম্বর, ১৯৪৫।

লালকেল্লা! দিল্লির অনন্য বৈভব। প্রায় এক শতাব্দী ধরে গুমরে গুমরে কাঁদছিল সে। অষ্টআশি বছর আগের কথা। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ তখন স্তিমিত। কেল্লা ব্রিটিশ সেনার দখলে। তখন থেকে কেল্লা হল বিদেশিদের অস্ত্রের ভাঁড়ার। এক শতাব্দীর যাত্রা শেষে আজ কিন্তু লালকেল্লার ভূমিকা ইতিহাস-পুরুষের। সারা হিন্দুস্থান অনুরণিত তার আহ্বানে।

সাড়ে তিনশো বছরে অনেক দেখেছে লালকেল্লা। হীরামুক্তামাণিক্যের ইন্দ্রধনুচ্ছটায় উদ্ভাসিত রাজ্যাভিষেক, অপরূপা মোহিনী রমণীকুল, সোনার ঘণ্টা গলায় হস্তীবাহিনীর গজেন্দ্র গমন, চুনি পান্নার উপঢৌকন হাতে মাথা নিচু করে দাঁড়ানো বিদেশি রাজদূতের দল— আরও কত কী! দেখেছে ছুরি-ছোরার রক্তারক্তি। দেখেছে ঋণজর্জর বাদশাহকে, দেখেছে খিদের জ্বালায় শাহজাদাদের কাঁদতে। সাক্ষী থেকেছে কত হারজিত, কত মান-অপমানের। হিন্দুস্থানের হৃৎপিণ্ড দিল্লি আর দিল্লির হৃৎস্পন্দন লালকেল্লা। কখনও সোনার পাখার হাওয়া দিয়ে সে উসকে দিয়েছে কারও উচ্চাভিলাষ কখনও বা দুর্ভাগ্যের ক্ষততে রক্তাক্ত করেছে কারও জীবন।

সময় কারোর জন্য বসে থাকে না। গ্রীষ্ম বর্ষার অনুবর্তনে অবিরাম তার রথ চলে এগিয়ে। কখনও সে রথের সামনে থাকে কোনও অসামান্য পুরুষের বিজয় কেতন। সে কেতনের উত্তুঙ্গ মহিমায়, কালের রথও বোধহয় টলমলিয়ে ওঠে, হয়তো বা ঝুঁকে পড়ে সেলাম জানায় তাকে।

লালকেল্লার সঙ্গে আত্মীয়তা নেই কারও। তবু আজ লালকেল্লা হতবাক। তার সময়ের ছোপ ধরা রক্তিম বহিরঙ্গের ভেতরে আজ কীসের যেন আলোড়ন। অষ্টআশি বছর পর আজ আবার তার হৃৎস্পন্দন যেন দ্রুত হয়ে ওঠে।

১৮৫৭! জাতপাত-ভাষা-সংস্কৃতির গণ্ডি চুরমার করে বিদ্রোহের প্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সারা দেশকে। কখনও সূর্য অস্ত না-যাওয়ার গর্বে গর্বিত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই প্রথম বিদ্রোহ। এই কেল্লা থেকেই ঘোষিত হয়েছিল, সেই বিদ্রোহ, রাজছত্র নিয়ে আর পিঠে শিশুপুত্রকে বেঁধে ঝাঁসির প্রান্তরে ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন রানি লক্ষ্মীবাই, শিবপুরীর ফাঁসির মঞ্চ লাল হয়েছিল বীর তাঁতিয়া টোপির রক্তে। অসংখ্য মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল বিদ্রোহের যে নিশান, ভাল করে ওড়ার আগেই বেইমানের ছুরি ফালাফালা করে দিল তাঁকে। লালকেল্লার যে জায়গা থেকে জারি হত বাদশাহি হুকুমনামা, সেখানে তৈরি হল কয়েদখানা। ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের চোখের সামনে গুলি করে মারা হল তাঁর আদরের পুত্রদের। শাহজাদাদের কবরে মাটি দেওয়ার পর তাঁর কাঁপা কাঁপা হাতে পরানো হল লৌহ শৃঙ্খল। এসব দেখেছে লালকেল্লা— হয়তো বা ভেতরে ভেতরে গুমরে উঠেছে কান্না।

তারপর শুরু হল বিচারের নামে এক প্রহসন। মাতৃভূমির জন্য লড়াই করার 'অপরাধে' ফৌজি আদালতে বিচার শুরু হল তাঁর। রাজদ্রোহের অভিযোগ স্বয়ং বাদশারই বিরুদ্ধে।

সাজানো সাক্ষীদের জবানবন্দি, জাল দলিলের কারসাজিতে হিন্দুস্থানের বাদশাকে যেতে হল নির্বাসনে। কবরের জন্য মাত্র কয়েক মুঠো দেশের মাটিও জুটল না তাঁর ভাগ্যে।

লালকেল্লা কি ভুলতে পারে সেই সন্ধ্যা? রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত বাদশা শেষবারের মতো বেরিয়ে যাচ্ছেন লাহোরি দরওয়াজা দিয়ে। ক্ষীণদৃষ্টি; চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। সেই চোখ তুলেই তাকালেন দরওয়াজার সামনে জড়ো হওয়া, তখনও পর্যন্ত বেঁচে থাকা আত্মীয়-বান্ধবদের দিকে। চোখে তাদেরও জল! হাত মুঠো করা কিন্তু সে মুঠোতে অস্ত্র নেই। বাদশার ফৌজ ছত্রভঙ্গ, পালিয়েছে নানান দিকে। সিক্কাতে নেই বাদশাহি মোহর। রাজ্যপাট বিদেশির হাতে। হয়তো বা অশ্রুভারাক্রান্ত বাদশাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই হঠাৎই এল এক ঝলক দমকা হাওয়া। সোজা হল তাঁর ঝুঁকে পড়া মাথা, চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বেরোল। দু'চোখ ভরে একবার তাকালেন লালকেল্লার দিকে। হাত উঠল পতাকা দণ্ডের মতো। ভেতরের সমস্ত আবেগ ভাষা পেল বিদ্রোহী কবিমনের তরঙ্গিত আলোড়নে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বাদশাহ বললেন,

গাজীও মে তু রহেগী জবতক ইমান কী
তখ্‌ৎ লন্দন তক চলেগী তেগ হিন্দুস্থান কী।

২

অষ্টআশি বছর পর; সেই একই মঞ্চে, একই রকমের আর এক বিচারের প্রহসন। একই নাট্যবিষয়— রাজদ্রোহ।

এ-নাটকে বৈচিত্র্য অবশ্য আরও বেশি। আসামি একজন নয়— তিনজন।

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর তিনজন পদস্থ অফিসার। তাঁরা আবার এক ধর্মেরও নন। সুকৌশলে বেছে নেওয়া হয়েছে ভারতের তিন প্রধান ধর্মের এক এক করে তিনজনকে। শাহনওয়াজ খান— মুসলমান, গুরুবক্স সিং ধিল্লোঁ— শিখ, প্রেম সেহগল— হিন্দু। তাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ— ইংলন্ডেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আর ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে বেইমানি। ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী এই অপরাধের শাস্তি ফাঁসি। তবু যদি কোনও কারণে আসামিরা আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়— তাই তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে খুনোখুনি আর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ।

ছায়া নামে যমুনার জলে। কেল্লা থমথমে। কেল্লার ভেতরের অগুনতি ব্যারাক আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি সৈন্যতে গাদাগাদি। জায়গা হচ্ছে না অনেকেরই। তাদের পাঠানো হল পাশের সেলিমগড়ে আর কাবুল লাইনে। রাজধানী দিল্লিতে শীত পড়তে শুরু করেছে। প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি মোড়ে কড়া পাহারা। সেপাইদের টহল। অন্যদিকে প্রতিটি দরজার পেছনে বস্তিতে বস্তিতে, পাড়ায়-মহল্লায় ফিসফিস করে চলে মামলার আলোচনা। এলাকায় সেপাইদের বুটের খটখট, ধাবমান গাড়িতে ওয়ারলেসের কর্কশ আওয়াজ, সব মিলে রাত্রির আতঙ্ককে আরও যেন বাড়িয়ে তোলে। গোটা শহরটাই যেন এক বিশাল পুলিশ ছাউনি। লালকেল্লার বিশাল উঁচু পাঁচিল অন্ধকারে ভয়াল দেখায়। কোনও অশরীরী শয়তান যেন দখল নিয়েছে কেল্লার। সাপের মতো আঁকাবাঁকা পাঁচিলের ওপরে ছায়ামূর্তির মতো সৈন্যদের টহল, কেমন যেন ভৌতিক মনে হয়।

দু'বছর ধরেই লালকেল্লার কাছে পৌঁছচ্ছিল নানান ধরনের খবর। প্রথম যখন গোলাবারুদ বোঝাই লরিগুলো বেরোতে শুরু করল লালকেল্লার সিংহদরজা দিয়ে, রওনা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনের দিকে, তখন থেকেই লালকেল্লায় শিরশিরে আতঙ্ক। খবরগুলো কখনও আনে খুশির ছোঁয়া, কখনও থমকে দিতে চায় বুকের স্পন্দন। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো খবর দেয়, ভারত আক্রমণ করেছে জাপান। যদি তারা জেতে দেশের ওপর ঘনিয়ে আসবে স্বৈরতন্ত্রী শাসনের ভীষণ অন্ধকার। তারপর একদিন শোনা গেল আজাদ হিন্দ বেতার। শোনা গেল নেতাজির দৃপ্ত কণ্ঠ, 'চল দিল্লি—'। সে কণ্ঠে প্রত্যয়ের শঙ্খধ্বনি। লালকেল্লায় শিহরন। দুশো বছরের পরাধীনতার ইতিহাসে আনে ঢেউ। ব্রিটিশ সিংহকে এভাবে কেউ চ্যালেঞ্জ জানায়নি। নেতাজির কথা তো নয়, যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়া আগুনের ফুলকি। 'স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের জন্য অধীর, হে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরের দল, চল দিল্লি, দিল্লি চল। ছিঁড়ে দাও আটত্রিশ কোটি মানুষের গলার শ্বাসরুদ্ধ করে তোলা পরাধীনতার ফাঁস। বড়লাট প্রাসাদের ওপর থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে যতদিন না আমাদের তেরঙা ঝান্ডা সেখানে উড়ছে, যতদিন না তোমাদের দৃপ্ত কুচকাওয়াজ লালকেল্লার প্রাঙ্গণে বিজয়-উৎসবকে উত্তাল না করে তুলছে ততদিন আমাদের শান্তি নেই, নেই শান্ত গৃহকোণের নিশ্চিন্ত আরাম।'

আজাদ হিন্দ ফৌজ পৌঁছল ভারতের পূর্বদ্বারে। ব্রিটিশ ঘাঁটির পতন ঘটল ইম্ফলে, কোহিমায়— উন্মুক্ত হল ডিমাপুর সড়ক। পতন হল বিশানপুরের। কেউ বা বলল, গুজরাত, বোম্বাই আর মাদ্রাজ উপকূলে ডুবোজাহাজ থেকে নেমে এসেছে নেতাজির কমান্ডো দল। কেউ বলল, ব্রিটিশের আত্মসমর্পণের খসড়া টাইপ করা পর্যন্ত হয়ে গেছে। নেতাজি তাঁর চল্লিশ হাজার বীরদের সঙ্গে লালকেল্লায় পৌঁছলেন বলে— বড়জোর আর এক সপ্তাহ। আজাদ হিন্দ ফৌজের জয়ধ্বনিতে সারা আকাশ ভরে যাবে। লালকেল্লা অধীর— নেতাজি বন্দনার জন্য। লালকেল্লার সিংহদ্বারে ফৌজি পোশাকে নেতাজি— সে দৃশ্য দেখবার জন্য যেন সারা আকাশ অপেক্ষা করে আছে।

কিন্তু ভাগ্য আর দুর্ভাগ্য একসঙ্গে মিলে উলটে দিল সবকিছু। ইম্ফল আর কোহিমায় ফৌজের অগ্রগতি রুখে দিল বর্ষা। মস্কোর পথে নেপোলিয়নের জয়রথ যেভাবে একদিন আটকে গিয়েছিল, রাশিয়ার কর্দমাক্ত প্রান্তরে, ঠিক সেইভাবে। তারপর হিরোসিমা আর নাগাসাকির ওপর নেমে এল পারমাণবিক বোমা। দিল্লিতেও বর্ষা। পূর্বপ্রান্ত থেকে আসছে না কোনও খবর। তারপর একদিন বর্ষা শেষ— শেষ সবকিছুর। যে লালকেল্লায় বীর সৈন্যদের বিজয়-উৎসব করার কথা, সেখানে ঠিকই এসে পৌঁছল তারা হাজারে হাজারে— তবে বন্দি হয়ে। এই হাজার হাজার বেইমানকে নিয়ে হিমশিম ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। রাজা গোপালাচারীর মতো কংগ্রেসিদের খোলা পরামর্শ, 'এইসব গুন্ডাদের সিধে ফাঁসি দাও।' ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যদের বিশ্বস্ততায় চিড় খাওয়াতে পারেনি কেউ কখনও। নেতাজি দেখিয়ে দিলেন, সেই বিশ্বাসের স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে কীরকম ফাঁপা ভিতের ওপর। তাঁর ডাকে পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ব্রিটিশের মোকাবিলায়। চার্চিল থেকে বড়লাট ওয়াভেল পর্যন্ত কর্তাব্যক্তিরা সবাই আতঙ্কিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রেখেছে ব্রিটিশ ভারতীয় ফৌজের বজ্রকঠিন নিষ্ঠা। পৃথিবীর আর কোথাও এদের মতো বিশ্বস্ত ভৃত্য পাওয়া যায় না। শুধু ভারতে নয়, ব্রিটিশ এদের কাজে লাগিয়েছে আফ্রিকাতে, ইউরোপে— সর্বত্র। প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক রণাঙ্গন সিক্ত হয়েছে তাঁদের রক্তে। এই নিরাপদ বারুদের ভাণ্ডারে আগুন লাগাল কিনা কে এক নেতাজি বোস?

কেল্লায় তখন একটা থমথমে ভাব। শীত আর সৈন্যদের কড়া নৈশ পাহারা। যমুনার দিক থেকে আসা শিরশিরে হাওয়া যেন কেল্লার দেওয়ালগুলো পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। কর্কশ আওয়াজ তুলে ভেতরে এল এক পুলিশ ভ্যান। স্যালুট আর বুটের আওয়াজ। কোনও তদন্তের কাজে কেউ এল বোধহয়। নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, তাই কেউ তেমন নজর করল না। বুটের আওয়াজ চলল সেই দিকে, যেদিকে সবচেয়ে বিপজ্জনক তিন বন্দি রয়েছে। এবার কিন্তু সজাগ হল অনেকেই। লোক দেখানো বিচারটুকুও না করেই কি ফাঁসি দেওয়া হবে এই তিনজনকে? হাজার কয়েদির মিলিত কণ্ঠে মন্দ্রিত হল,

আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ
প্যারে নেতাজি জিন্দাবাদ!
সবসে উঁচা হায় দুনিয়ামে ঝান্ডা হামারা,
নেতাজি জিন্দাবাদ!

অন্ধকার চিরে উড়ে গেল কয়েকটা বাদুড়। কয়েদখানার দরজা খুলল। আলো পড়ল ভেতরে। সামনে রোখা ভঙ্গিতে টুলের ওপর বসা একত্রিশ বছর বয়সি ওই বিপজ্জনক কয়েদিদের একজন। তারের জালের ছায়া পড়েছে মুখের ওপর। আগন্তুক অফিসার সামনে এসে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। সঙ্গী অফিসারটি তাঁর কানে কানে বললেন, 'এই হচ্ছে শাহনওয়াজ খান।' শাহনওয়াজের ভাবে ভঙ্গিতে আমির-ওমরাহের খানদানি আদত। চোখা নাক, নাকের নীচে আঙুল প্রমাণ মোটা, নিখুঁত ফৌজি কায়দায় ছাঁটা গোঁফ, একটা লম্বাটে মুখ। যুদ্ধের টানাপোড়েন কিছু আঁকিবুকি কেটেছে সুন্দর মুখশ্রীর ওপর। আগন্তুক অফিসারের চোখে পড়ে, যে বাহুতে একদিন শোভা পেয়েছিল দেরাদুন মিলিটারি আকাদেমির শ্রেষ্ঠ ক্যাডেটের তকমা, সেখানে আজ I.N.A. এই কালো অক্ষরগুলো সাঁটা রয়েছে। পরনে অত্যাচারী জাপানের ভাঁড়ার থেকে পাওয়া বিদেশি ইউনিফর্ম। আগন্তুক অফিসারের গলার কাছটা কেমন দলা পাকিয়ে উঠল আবেগে। শাহনওয়াজের কাঁধে আস্তে হাত রেখে মৃদু হাসলেন তিনি। বললেন, 'তোমাকে এই বেশে মানায় না শানো। তোমারই বংশের ষাট-সত্তরজন যে আজও ব্রিটিশ বাহিনীতে চাকরি করে।' চমকে উঠলেন শাহ্ নওয়াজ। এই চেনা চেনা গলা কার? বিস্মৃতির কোণে লুকিয়ে থাকা, একদিন নয়, দিনের পর দিন শোনা কার এই কণ্ঠস্বর। একদৃষ্টে অফিসারের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন, 'স্যার! কলিন্স স্যার।' হাত এগিয়ে দেন তিনি। কলিন্স জড়িয়ে ধরেন তাঁকে। দুজনেরই চোখে জল। ব্রিগেডিয়ার কলিন্সের গলায় আবেগ ঝরে পড়ে, 'একদিন তুমি ইন্ডিয়ান আর্মির কম্যান্ডার ইন-চিফ হতে পারতে।' শাহনওয়াজও উদ্গত অশ্রু সামলাতে পারছিলেন না। দেরাদুন আকাদেমিতে কলিন্সের মতো শিক্ষক আর একজনও ছিলেন না।

হঠাৎ রাগ হল কলিন্সের। তাঁর ভেতরকার অফিসারটি বোধহয় জেগে উঠল। দূরে সরিয়ে দিলেন শাহনওয়াজকে।

'আই হেট ইউ, শানো, আই হেট ইউ।'

'স্যার।'

'ঠিক করতে পারছি না। প্রিয় ছাত্র হিসাবে জড়িয়ে ধরব না লাথি মারব বেইমান বলে।'

'স্যার, আমার অপরাধ?'

'অপরাধ তোমার নয় আমার। ফোর্টিন্থ পঞ্জাব রেজিমেন্ট— আমার স্বপ্ন নিয়ে গড়ে তোলা।

গুরুবক্স ধিল্লোঁ, হবিবুর রহমান, স্ট্রেসি— বাছা বাছা ক্যাডেট সবাই। সবাই, তোমরা সবাই বেইমান হয়ে গেলে?'

কলিন্সের রাগের পারদ চড়ে যায়। লাল হয়ে যাওয়া নাকের ডগা আর চোখের জল রুমালে মুছে নিয়ে বলেন, 'শানো— তুমি নিমকের ইমান-ইজ্জত রাখলে না?'

শান্তকণ্ঠে শাহনওয়াজ জিজ্ঞেস করেন, 'কার নিমক স্যার?'

'আর্মির নিমক, কিং এম্পারারের নিমক।'

'মাফ করবেন স্যার। ইংল্যান্ডের নিমক, সম্রাটের নিমক আমি খাইনি। খেয়েছি আমার দেশের মাটির নিমক।'

'টোটাল মিসগাইডেড বাই দ্য এনিমি।' উদ্গার করেন কলিন্স।

'স্যার! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পাশবিক শাসনব্যবস্থায় কম্যান্ডার হওয়ার চেয়ে, নেতাজির দরজায় আরদালি হতে পারাটা আমার কাছে আল্লাহতাল্লার মেহেরবানি।'

'স্টপ ইট বাস্টার্ড', হুংকার দিয়ে ওঠেন কলিন্স। 'নেতাজি মানে দ্যাট বোস। নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য, জাপানিদের হাতের পুতুল বনে যাওয়া সেই বেইমান বাঙালি।'

'কলিন্স স্যার মুখ সামলে। আপনার জায়গায় আর কেউ হলে আমি তার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম।'

'বোস মাস্ট বি এ ম্যাজিশিয়ান।'

'লাখ কথার এক কথা বলেছেন স্যার। সত্যিই তিনি জাদুকর।' বলতে বলতে গলা ধরে আসে শাহনওয়াজের। 'স্যার! কী ছিলাম আমরা? পেটের তাগিদে মিথ্যে ইমানের বাজারে বিক্রি হতে আসা সেপাই। কেরিয়ার, প্রমোশন, পে, অ্যাডিশনাল পে, বউ, গোলগাল বাচ্চা, ক্লাব আর প্রাণহীন পার্টি— এই ছিল আমাদের স্বপ্ন। বুকে মেডেল ঝোলাতে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছিলাম, নিজেদের মগজ। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশের স্থান কোথায় ছিল? নেতাজিকে দেখলাম, দেখতে পেলাম সত্যিকারের ভারতকে। চোখের সামনে থেকে যেন একটা পরদা সরে গেল— পরিচয় হল দেশের সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে, দেশের হাওয়ার সঙ্গে।'

কলিন্সের অনুকম্পা হল শাহনওয়াজের ওপর। মনে মনে ভাবেন, এই অবোধ জানে না কোর্ট মার্শাল কী বস্তু। প্রাণটা যাবে এই অল্প বয়সে। হাত রাখেন তিনি শাহনওয়াজের পিঠে। 'একবার ভেবে দেখ। মাত্র তো একত্রিশ বছর বয়স তোমার শানো।'

'কেন স্যার, এ বয়সে ফাঁসি দেওয়ার তো কোনও বাধা নেই।'

'আহাম্মকের মতো কথা বোলো না। আর্মি কম্যান্ডারকে সব বলেই এসেছি এখানে। তুমি আবার আগের পদ ফিরে পাবে, প্রতিষ্ঠা পাবে। তারপর একদিন নিজের যোগ্যতায় ধাপে ধাপে যাবে কম্যান্ডার-ইন-চিফের আসনে। রাস্তা এখনও খোলা রয়েছে।'

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একদৃষ্টে কলিন্সকে দেখতে থাকেন শাহনওয়াজ। কলিন্সের ব্যবহারের পেছন থেকে কী এক রহস্য যেন উঁকি দিচ্ছে। শাহনওয়াজ এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ওপর এই দাক্ষিণ্যের প্রতিদানে আমাকে কী করতে হবে?'

'তুমি রাজসাক্ষী হয়ে যাও শানো। জাপান আর বোসের ভাড়াটে সৈন্যদের আসল রূপটা খুলে দাও জগতের সামনে।'

'রাজসাক্ষী'— কথাটা বিষাক্ত তিরের মতো শাহনওয়াজের বুকে গিয়ে বিঁধল। মনের মধ্যে ঝড় উঠল। চোখ থেকে টপটপ করে ঝরে পড়ল অশ্রুবিন্দু।

'চুপ করুন, স্যার। জীবনে কদাচিৎ এমন মানুষের সংস্পর্শে আসা যায়, যাদের ছায়া শরীরে

পড়লেও সারাটা জীবন সোনার মতো ঝলমল করে ওঠে। কম্যান্ডার হয়তো হব। তারপর? একদিন তো কবরে যাব। সারা জীবন "জি হুজুর" করে পাওয়া মেডেলগুলো মুচকি হাসবে আমার মরা শরীরটার দিকে তাকিয়ে। অন্য দিকে নেতাজির সিপাহি— সম্মানের কী বিরাট শিরোপা! সে ইজ্জতের সামনে আপনাদের দেড় পয়সার পদের পরোয়া কে করে স্যার?'

কলিন্স নীরব। Stupid. কিছুক্ষণ পরে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে তিনি বলেন, 'হয় তোমাকে শেখাতে পারিনি, কিংবা তোমাকে ভুল বুঝেছি।' বিদায় নেওয়ার সময়ে কলিন্স আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। আদরের শানোর কপালে চুম্বন করলেন তিনি। তারপর বললেন, 'মাই সন, গড ব্লেস ইউ।' তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে, বেরিয়ে গেলেন তিনি।

৩

কলিন্সের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। কয়েদখানার এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন শাহনওয়াজ। মনটা ছটফট করে শাহনওয়াজের। এর চেয়ে যদি যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যু হত ভাল হত। হতাশ গলায় ডুকের ওঠে, 'এই গুরুবক্স, এই বক্সি তুই একটা গাধা। কেন ঠেকালি আমাকে? শহিদ হয়ে আল্লার কাছে চলে যেতাম।'

'শানো; একটু ভেবে কথা বল। ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে মরে গেলে নেতাজির কথা কে পৌঁছত দুনিয়ার কাছে? ওদের দুশমন আজাদ হিন্দ ফৌজকে ওরা বেইমান ভাড়াটে সৈন্যের দল বলে প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাই খাড়া করেছে এই আদালতের প্রহসন। এই মঞ্চ থেকেই আমাদের শোনাতে হবে আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরবগাথা। তারপর ভবিষ্যৎই বিচার করবে, কে ভাড়াটে আর কে-ই বা বিপ্লবী।'

গুরুবক্স শাহনওয়াজেরই বয়সি। শিখ জওয়ান। সুঠাম শরীর রাজপুত বীরদের মতো। একটু চাপা ধরনের মুখ, সামান্য ঢোকা গাল। চোখের দৃষ্টি যেন ভেতর পর্যন্ত দেখে নিতে চায়। বিশাল ছাতি, ইদানীং আরও যেন ফুলে উঠেছে গর্বে। পরনে চিট ময়লা, আজাদ হিন্দ ফৌজের ইউনিফর্ম। পোশাকে রক্তের দাগ। ইউনিফর্মটা আজ জীর্ণ, কিন্তু একদিন এই ইউনিফর্মের ওপরে নেতাজি নিজের হাতে মেডেল ঝুলিয়েই দিয়েছিলেন।

চেখের সামনে ভেসে উঠছে ঘটনাগুলো। ব্রহ্মদেশের ভেতরে চলছে লড়াই। আজাদ হিন্দ ফৌজের নিবু নিবু প্রদীপের শিখাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন নেতাজি। লড়াইয়ের ময়দানে পাখির মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন শাহনওয়াজ, গুরুবক্স, প্রেম সেহগল। গুরুবক্সের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ব্রহ্মদেশের জঙ্গল, পেগু নদীর দুই পাড় ভেসে যাচ্ছে দুরন্ত বর্ষায়। চারিদিকে উজাড় হয়ে যাওয়া গ্রামগুলো নিষ্প্রদীপ। খেতে না-পাওয়া পলাতক, নদীর বুকে ভেসে যাচ্ছে বেওয়ারিশ মাঝিবিহীন নৌকোগুলো।

মৃত্যুর বেড়াজালের ফাঁক দিয়ে গলে গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনজন। মাথার ওপর মৌমাছির ঝাঁকের মতো ব্রিটিশ আর আমেরিকান বিমানবাহিনী আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে আজাদি সেনাদের। রেঙ্গুন দখল করে নেতাজিকে জীবন্ত ধরার জন্য মরিয়া মাউন্টব্যাটেন। তার গতি পদে পদে রুখছিলেন, বেঁচে থাকা কয়েকজন মুষ্টিমেয় সৈন্য, কানায় কানায় ভরা ইরাবতী, পোপা পাহাড় আর মৌলমিনের জঙ্গল। প্রায় পাঁচশো মাইল জুড়ে চলছে একদলের ধাওয়া করা আর

একদলের এড়িয়ে পালানোর এই লুকোচুরি খেলা। মৌলমিনের পথেই একদিন খবর পাওয়া গেল নেতাজি পৌঁছে গেছেন থাইল্যান্ডে।

তারপর একদিন ব্রিটিশরা এসে পৌঁছল পাঁচশো গজের মধ্যে। মাথার ওপরে বজ্রবিদ্যুতের ঝলকানি আর তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, নীচে মেশিনগানের অগ্নিবর্ষণ। পেগুনদীর ধারে এক নির্জন ঝুপড়িতে জমা হলেন তিনজন। আশপাশ দিয়ে গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে গুলিগুলো অতঃকিম্? মৃত্যু বরণ করা?

গুরুবক্স বোঝাতে থাকেন সাথিদের। আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধবন্দি হতে হবে। 'তুই একটা ডরপোক', চেঁচিয়ে ওঠেন শানো।

'না শানো! ডরপোক আমি নই। ফৌজি বিচারে ফাঁসি আমাদের হবেই। কিন্তু তার আগে দুনিয়ার কাছে নেতাজির কথা তো শুনিয়ে যেতে পারব।' জ্বলজ্বল করে ওঠে বক্সির চোখ।

ব্রিটিশ সৈন্য ঘিরে ধরেছে চারিদিক থেকে। পিস্তল থেকে গুলি বার করে এক এক করে সেগুলো জলে ছুড়ে ফেলে শাহনওয়াজ। আত্মসমর্পণের সময় ব্রিটিশ কম্যান্ডার অবাক চোখে দেখছিলেন আজাদি সেনাদের। পায়ে ছেঁড়া বুট, জরাজীর্ণ ইউনিফর্ম, খাওয়া জোটেনি ক'দিন কে জানে— তবু সংকল্পের দৃঢ়তা ফুটে বেরোচ্ছে ভঙ্গির ঋজুতায়। বুকের ওপরকার মেডেলগুলো বৃষ্টিতে, ঘামে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পোশাকের ওপরেও জ্বলজ্বল করছে। 'ফৌজ ডায়নে সিধাই লেঙ্গে, ডায়নে সিধাই লো', শাহনওয়াজ কম্যান্ড দেন। আওয়াজে দৃপ্ত প্রত্যয়। ব্রিটিশ কম্যান্ডার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকেন, এসব তো ভাড়াটে, দালাল বাহিনীর লক্ষণ নয়। দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত অবস্থাতেও নিজেদের সত্তা সচেতন, বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর সংকল্পদৃঢ়তা! জাপানের তাঁবেদার দালাল বাহিনী নয়, নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন চোখে নিয়ে, নেতাজির মতো নেতার জন্য গর্বিত এই ফৌজ।

সেদিন বক্সির সিদ্ধান্ত মনোমতো হয়নি শাহনওয়াজের। তাই আজ রাগে ফুঁসছেন তিনি। সরকারপক্ষের নানা শয়তানি চালের ফন্দিফিকির, রাত্রির জমাট আঁধারকে আরও জমাট করে তোলে। শাহনওয়াজের আপশোস হঠাৎই বেরিয়ে আসে কান্নাভেজা আওয়াজে। 'একবার, শুধু একটিবার যদি দেখতে পেতাম নেতাজি এই লালকেল্লার বুরুজের ওপর দাঁড়িয়ে সেলাম করছেন তেরঙা ঝান্ডাকে, তারপর মরণ এলেও কে পরোয়া করত?'

'ভুলে যা শানো, ভুলে যা। আমাদের স্বপ্ন দেখা বোধহয় ভগবানের সইল না। হয়তো ভগবানও রাজনীতির শিকলে বাঁধা।'

তিন কয়েদির চোখের সামনে ভেসে ওঠে নেতাজির সেই দৃপ্ত মূর্তি। যাঁর জাদুর ছোঁয়া বদলে দিয়েছিল জাপানের মতো রাষ্ট্রেরও ধরনধারণ। ভারতের আজাদির জন্য প্রাণ দিল পঞ্চাশ হাজার জাপানি সেনা। ফুলে ওঠা অসংখ্য লাশ ভেসেছিল ইরাবতী, চিন্দুইন আর সালুয়িন নদীর বুকে। পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ তাদের অলংকার, তাদের যথাসর্বস্ব অর্পণ করেছিল নেতাজির হাতে। তুলে দিয়েছিল তাদের ছেলেদেরই শুধু নয়, মেয়েদেরও। মাত্র বাইশ মাসে নেতাজি যেন ভেলকি দেখালেন।

অনেক দেরিতে একটু বোধহয় চোখ লেগে গিয়েছিল গুরুবক্সের। ব্যারাকের দরজায় এসে দাঁড়াল ব্রিটিশ সেপাই। জানাল কেল্লার বাইরে অপেক্ষা করছেন গুরুবক্সের বাবা আর স্ত্রী। গুরুবক্সের সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁরা।

চোখের সামনে বৃদ্ধ পিতা। তাকিয়ে দেখে বক্সি। বলিরেখার আঁকিবুকি আঁকা মুখে পাতলা হয়ে আসা সাদা দাড়ি, চোখ কোটরে ঢোকা, মাথার পাগড়ি ময়লা। বক্সি এগিয়ে যান। পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরেন বৃদ্ধ। বক্সির চোখেও জল। তার-ই মধ্যে দিয়ে পাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় বসন্ত দাঁড়িয়ে। বসন্ত কাউর। ঝিরঝিরে হাওয়ায় উড়ছে তার চুল আর ওড়না। স্বর্ণচাঁপার মতো, দাঁড়িয়ে আছে— সেই আগেকার মতো। সালোয়ার, কামিজ একইরকম। কুড়ি বছর বয়সটাকে বেঁধে রেখে দিয়েছে সে। চোখও একইরকম দীপ্তিতে ঝকমকে— সে চোখ কথা বলছিল নীরব ভাষায়।

বৃদ্ধ পিতা পাগল ছেলেকে বোঝাতে ব্যস্ত। 'তোর বড় ভাই বিছানায় শুয়ে দিন গুনছে। দিনরাত সেই বিছানার পাশে বসে তোর মা। এদিকে তুইও যদি ফাঁসি যাস তা হলে আমরা বুড়োবুড়ি কাকে নিয়ে থাকব রে?'

গুরুবক্স পঞ্জাবি রেওয়াজ অনুযায়ী বাবাকে ভাইয়াজি বলেন। মুখে তাঁর বিষণ্ণ হাসি। 'ভাইয়াজি। আমাদের হাজার হাজার সাথি জান দিয়েছে লড়াইয়ে। অনেক সময় খাবারটুকুও জোটেনি তাদের। শয়ে শয়ে লাশ ভেসেছে সিতাং নদীর জলে। বিশানপুর দখলের লড়াইয়ে মাটি নিয়েছে আরও কতজন। তাদের কি মা ছিল না, তাদের কি বোন ছিল না?'

বৃদ্ধ চোখ মুছলেন। তাকিয়ে দেখলেন পাহারাদার সিপাইটি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বক্সির কানের কাছে মুখ নিয়ে যান তিনি। 'পরশু রাতে লাহোরের কমিশনারের কাছ থেকে এক অফিসার এসেছিলেন। এখনও অনেক কিছুই হতে পারে।'

'কী হতে পারে?'

'তুই আবার মেজর হতে পারিস।'

'শুধু এই?'

'পঞ্জাবে একটা ছোটখাটো জায়গির দেওয়া হবে তোর পরিবারকে।'

'তার জন্য আমায় কী করতে হবে?' বক্সি জিজ্ঞাসা করেন।

'কংগ্রেসের কাছে সাহায্য নিবি না। সরকারের আশ্রয় নে। শোন বেটা। এই বুড়ো বাপের কথাটা রাখ।' কাঁদতে কাঁদতে ছেলের পায়ের কাছে মাথার পাগড়ি নামিয়ে রাখেন তিনি।

'ভাইয়াজি পাথর থেকে দুধের ঢল নামে না। আমিও ওই পাথরেরই মতোই। তাই তো নেতাজি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন নেহরু রেজিমেন্টের ভার। জায়গিরের কথা বলছ? ওরকম দশটা জায়গির নেতাজির পায়ের ধুলোটুকুরও যোগ্য নয়। নেতাজির সঙ্গে বেইমানি তো নিজের সঙ্গে বেইমানি। তার আগেই যেন মৃত্যু হয় আমার।'

নীরব হলেন বৃদ্ধ। ছেলেকে বোঝানো যাবে না। কথা ঘোরান তিনি। 'ঠিক আছে ব্রিটিশের কথা নাই শুনলি। শিখধর্মের নির্দেশ তো মানবি?'

'এতে ধর্ম আসছে কোথা থেকে?'

'অকাল তখত মদত দেবে তোকে আদালতে। তাদের নির্দেশ তুই যেন কংগ্রেসের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিস।'

'ভাইয়াজি। এরকম নির্দেশ শাহনওয়াজের কাছেও এসেছে। ব্যারিস্টার জিন্না আর মুসলিম লিগ মদত করতে চায় তার।' বলতে বলতে আবেগ উথলে ওঠে তাঁর। 'ভাইয়াজি। শাহনওয়াজ যদি শুধু মুসলিমদের জন্য, আমি যদি শুধু শিখদের জন্য লড়ি তবে নেতাজির জন্য, তাঁর স্বপ্নের অখণ্ড ভারতের জন্য কে লড়বে?'

জবাব দিতে পারেন না বৃদ্ধ। সরে দাঁড়ান তিনি। বক্সি এগোয় বসন্তের দিকে। বক্সির হাতের মধ্যে থরথর করে কাঁপে বসন্তের হাত— মেহেদি রাঙানো উষ্ণ নরম হাত। বক্সি সে হাত তুলে নেয় বুকের কাছে। কথা হয় শুধু চোখে চোখে। হিন্দি আর গুরুমুখি দু' ভাষাতেই অবশ্য দখল আছে বসন্তের। একটু একটু ইংরেজিও জানে। তার শিক্ষা স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যে নয়— জীবনের আঙিনায়। পাঁচ বছর পর এই দেখা। শেষ দেখার সময় বক্সি ছিলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যেতে হল মালয়ে। তার পরের কাহিনি তো এক মহাভারত। কী করে এতটুকু সময়ে বলবেন?

কয়েদির পোশাকে গুরুবক্সের চোখে চোখ রাখেন বসন্ত। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের সময়, আমি মেয়েদের মোর্চা নিয়ে গিয়েছিলাম লাহোরের আনারকলি বাজারে। গ্রেফতার হলাম। 'শ্বশুরমশাই বলেছিলেন সরকারের কাছে ক্ষমা চাইতে।'

'তার পর?' বক্সি রুদ্ধশ্বাস।

'আমি রাজি হইনি। আমার মুখের ওপর বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি।'

'বাবা! কেন? কেন?' তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বক্সির গলায়। 'তোর চাকরিতে যাতে কোনও আঁচ না লাগে তাই আমি বলেছিলাম ওকে ক্ষমা চাইতে। কিন্তু ও তো তোকেও টেক্কা দিল।'

বাবার কথায় উদ্ভাসিত হয় বক্সির মুখ। 'সাবাস বসন্ত।'

তরতর করে কাছে এল ব্রিটিশ মেজর। 'সময় হয়ে গেছে।' বলে আবার একটু পাশে যায় সে।

ভাইয়াজি যাবার জন্য তৈরি হলেন। 'তোর মাকে গিয়ে কী বলব রে?'

'এ জন্মের জন্য ক্ষমা করতে বোলো আমাকে। বোলো এ জন্মে তার সেবায় লাগলাম না। আসছে জন্মে পুষিয়ে দেব সেটা।'

চোখ মুছতে মুছতে বৃদ্ধ দূরে সরে যান। বসন্ত দাঁড়িয়ে। বাদল হাওয়ায় হেলে পড়ো পড়ো লতাটির মতো। আর একবার তার হাত তুলে নেন বক্সি বুকের কাছে। 'বসন্ত। বিচারের প্রহসন শেষের পর ফাঁসি হয়ে যখন গুরুজির কাছে পৌঁছে যাব, কী চাইব তোমার জন্য?'

'কিছুটি চাইতে হবে না আমার জন্য। শুধু এইটুকু দেখ যে তোমার জন্য আমার মাথা যেন নিচু না হয়।'

চমকে ওঠেন বক্সি। মিকটিলার জঙ্গলে নেতাজির সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কথা মনে পড়ে। চারজন অফিসার নেতাজির সঙ্গে, আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে গদ্দারি করে হাত মেলায় দুশমনের সঙ্গে। ভেঙে পড়া নেহরু রেজিমেন্টের ভার তিনি তুলে দিয়েছিলেন গুরুবক্সের হাতে, পরম বিশ্বাসে। নেতাজিকে অভিবাদন করে তিনি বলেছিলেন, 'নেতাজি। গুরুবক্স সিং ধিল্লোঁ এমন কিছু কখনও করবে না যাতে আপনার মাথা নিচু হয়।'

'সে ভরসা আমার আছে।' জবাব দিয়েছিলেন নেতাজি।

হুবহু সেই কথা, সেই ভাবনা। বসন্তের আঁখি পল্লবের নীচে জমে ওঠা অশ্রুবিন্দু আঙুল দিয়ে মুছে দেন বক্সি। ধীরে ধীরে বসন্তের চিবুক ধরে মুখটা তুলে ধরে সে।

'বসন্ত। এই ফৌজির আদালতের কাছে শুধু একটাই আর্জি জানাব আমি। ফাঁসি যাওয়ার আগে আমার শেষ আর্জি।'

'কী সেটা?'

'আমার ফাঁসিটা যেন হয় তোর চোখের সামনে।'

'পরোয়া করি না তার জন্য। যে নিষ্ঠার জন্য, যে প্রিয় নেতার জন্য, তাঁর যে স্বপ্নকে রূপ

দেওয়ার জন্য ফাঁসি যেতে চলেছ তুমি — নিশ্চিন্তে থেকো— তার জন্য একবার কেন, আমার সামনে যদি দশবার তোমাকে ফাঁসি দেয় তবুও এতটুকু টলব না আমি।'

হয়তো চিরকালের জন্যই এই শেষ দেখা। ব্যারাকের ওপর আষাঢ়ের ঘনঘোর বর্ষা নামে। ভোর হয় হয়। বৃদ্ধ আর বসন্ত চলে যান।

ক্যাপ্টেন রাম সিংয়ের গান ভেসে আসে। সোঁ সোঁ করে বইতে থাকা বাতাস যেন তার সঙ্গে বেহালায় সঙ্গত করে।

নেতাজি হামারে...
হসতে হসতে জিনা...

৫

মামলার তৃতীয় আসামি কর্নেল প্রেম সেহগল। ডোন্ট কেয়ার ভাব তার। বয়স আটাশের আশেপাশে। তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স। ফরসা, একটু ফোলা ফোলা মুখ, পুরন্ত ঠোঁট, লম্বাটে মুখ, কুচকুচে কালো চোখজোড়া সদা চঞ্চল। রূপকথার রাজপুত্তুরের মতো চেহারা।

লালকেল্লার বাইরে দ্রুত ঘটছে অনেক ঘটনা। কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন আসন্ন। কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের মধ্যে চলছে টানাপোড়েন। সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর যুদ্ধকালীন কড়াকড়ি একটু ঢিলে। খবরের কাগজের পাতা জুড়ে প্রকাশ পাচ্ছে আজাদ হিন্দ ফৌজের বৃত্তান্ত। ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায় আস্তে আস্তে জানতে পারছে মানুষ। নেতাজি আর তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের গর্বে সারা ভারত উত্তাল। নির্বাচনী প্রচার তার সামনে ফিকে।

প্রেমের হাতে খবরের কাগজ। তাতে রয়েছে বছর তিরিশের এক শ্রীময়ী যুবতীর ছবি। পরনে ফৌজি পোশাক। খোঁপা পেছনে রেখে একটু ত্যারচা করে পরা ফৌজ টুপি মাথায়। বুকে মেডেলগুলো ঝকমক করছে। পোশাক খুঁটিয়ে দেখতে গেলে পুরুষালি। কিন্তু ফরসা রং, দীপ্ত চোখ, তীক্ষ্ণ নাক সব মিলিয়ে যুবতীর মুখে এক অনুপম সৌন্দর্য। মালয় উপদ্বীপের এই শ্রেষ্ঠী সুন্দরী-ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীর কথা বার বার মনে পড়ছে প্রেমের। কোথায় আছে সে? নেতাজি কোথায়? শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল মেমিয়োর ফৌজি হাসপাতালে। সামনে আসন্ন কোর্ট মার্শাল। ফাঁসির দড়ি গলায় পরে পায়ের তলার তক্তাটা যখন সরে যাবে, তার আগে কি দেখতে পাব লক্ষ্মীকে, অন্তত একটিবার?

আজ বোধহয় সাক্ষাৎযোগ ছিল পাঁজিতে। ব্যারাকের বাইরে দুটি গাড়ি এসে দাঁড়াল। প্রথম গাড়িটি থেকে নেমে আসেন আচ্ছারুরাম। পাঁচ বছর পর বাবাকে দেখছে প্রেম। সান্ত্রি সিপাহিরা খটাখট সেলাম করল আচ্ছারুরামকে। দেবেই তো! লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি আচ্ছারুরাম। অনেকের দৃষ্টিই পিতাপুত্রের দিকে। বাবা হাইকোর্টের জজ আর ছেলে রাজদ্রোহী। যে-কোনও দিন ফাঁসি হবে তার। পিতাপুত্র সব ভুলে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন দৃঢ় আলিঙ্গনে। মন উথালপাথাল— চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জল। জজসাহেব পরিচয় করিয়ে দেন একজন মোটাসোটা লোকের সঙ্গে। 'ইনি ব্যারিস্টার ভুলাভাই দেশাই।' প্রেম পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তাঁকে। কত বড় উকিল! তা ছাড়া অনেক বছর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য।

পাশের বড় ব্যারাকে সাস্ত্রিদের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের দপ্তর। প্রেমকে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। প্রেমের মুখের দিকে তাকিয়ে ভুলাভাই বললেন, 'আচ্ছারুরাম, আই অ্যাম প্রাউড অব ইয়োর সান।' 'সো আই অ্যাম' বলেন আচ্ছারুরাম।

ঠিক তখনই দুজন অফিসার এলেন সেখানে। ঘন ঘন হুইসলের আওয়াজ, বুটের আওয়াজ বেড়ে যায়। জানা গেল পণ্ডিত নেহরু আসছেন। প্রেম খুশি। কত দিন বাদে দেখবে সে চাচাজিকে! বাবার আঙুল ধরে লাহোরের কংগ্রেস অধিবেশন দেখতে গিয়েছিল সে। তখন কালো ঘোড়ার ওপর বসা নেহরু সস্নেহে দেখেছিলেন তাকে। অধিবেশনে অনেককিছু দেখেছিল সে-সব স্পষ্ট মনে পড়ে না। কিন্তু সাদা খদ্দরের পোশাক পরা সুভাষচন্দ্রের দৃপ্তমূর্তি মনে এখনও স্পষ্ট। নেহরু আর সুভাষ আলোচনা করছিলেন। তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন কংগ্রেসের তরুণ কর্মকর্তারা।

প্রেমের একগুঁয়ে স্বভাব ভালই জানা বাবার। তাই যা ঘটেছে তা কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল এসব প্রশ্ন করার রাস্তায় গেলেন না তিনি। এই মামলার মুখোমুখি কীভাবে হওয়া যায় তাই আলোচনা করছিলেন ভুলাভাইয়ের সঙ্গে। প্রেম জানতে পারলেন, ভুলাভাইয়ের শরীর তত ভাল নেই। চোখে মুখে অদম্য উৎসাহ, কিন্তু শরীর বইছে না। শারীরিক অসুবিধেও স্পষ্ট। পা-ও ফুলে গেছে।

ভুলাভাই বললেন, 'জজসাহেব। প্রেম যদি ফৌজে না যেত, তো সুভাষের প্রভাব পড়তই না ওর ওপরে।'

'বাবা, নেতাজির আহ্বান এমনই যে মরা মানুষও সাড়া দেবে', প্রেম পাশ থেকে বলেন।

লালকেল্লার ফটক দিয়ে নেহরুর গাড়ি ভেতরে ঢুকল। অবাক চোখে তিনি কেল্লার প্রাচীরের দিকে দেখছিলেন। কেল্লা সেই-ই আছে। শাহজাহানের কুশলী সৃষ্টি, বাহাদুর শাহের অমর গজল যেখানে আজও গুঞ্জন তোলে। কেল্লার চারপাশে জমা হওয়া লোকেরা শ্লোগান দিচ্ছিল, 'চল দিল্লি', 'নেতাজি জিন্দাবাদ'। কিছুদিন ধরেই আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা ঝড়ের মতো কাঁপিয়ে দিচ্ছিল সারা দেশ। ঝড় নয় দাবানলের তুলনাটাই বোধহয় বেশি খাটে। ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পর কোনও বিষয় জনমানসে এভাবে সাড়া তোলেনি, রাস্তায় নামেনি এত লোক।

চার বছর কারাবাসের পর সদ্য বাইরে এসেছেন নেহরু। ব্রিটিশের দোর্দণ্ড শাসন বিয়াল্লিশের আন্দোলনকে দলে পিষে শেষ করে দিয়েছে। কংগ্রেস প্রায় অস্তিত্বহীন। যে কটা কংগ্রেস অফিসে নেহরু গেছেন, দেখেছেন— ধুলোয় ভরা ঘর, উইধরা ছেড়া কাগজপত্র, কালি শুকিয়ে যাওয়া দোয়াত আর কর্মীদের নিস্তেজ মুখ। আইনসভার আসন্ন নির্বাচনের প্রচার শুরু হয়েছে তবে তাতে প্রাণের সাড়া নেই। সুভাষ আর আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম কংগ্রেসিরা বড় একটা নেয় না, যতটা পারে এড়িয়ে চলে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলোর মাধ্যমে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রকৃত কাহিনি প্রকাশিত হচ্ছে মানুষের কাছে। কংগ্রেসের সভাতেও শ্লোগান উঠছিল, 'জয় হিন্দ, চল দিল্লি', আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঘুঁটি করলে ভাল ফল পাওয়া যায় দেখে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগ দুই পক্ষই তার সুযোগ নেওয়া শুরু করল।

নেহরুর পাটনার নির্বাচনী সভা ভালই জমেছিল। রাজেন্দ্রবাবুর স্বাগত ভাষণের পরই সভায় শ্লোগান দেওয়া শুরু হয়ে গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজের দুই প্রাক্তন সৈনিককে মঞ্চে তুলে দিল তারা। 'দারুণ গায় এরা, এদের গাইতে দেওয়া হোক', দাবি উঠল সভার চারদিক থেকে। মাইকের সামনে দাঁড়ানো দুই জওয়ানকে অবাক চোখে দেখছিলেন নেহরু। ইউনিফর্ম ছিঁড়ে

গেছে তাদের, তবু তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, 'জয় হিন্দ' শ্লোগান দেওয়ার সময় আশ্চর্য ঋজুতা। 'সুভাষ', 'আজাদি', 'ওয়তন'— এইসব শব্দগুলো বলার সময় তাঁদের সমস্ত সত্তাই যেন বদলে যাচ্ছিল।

সবকিছু ভুলে গিয়ে গান ধরল তারা,

...হিন্দু হো ইয়া মুসলমাঁ শিখ ইয়া ঈশাই সারে
মাতী কে নয়ন সুখ হ্যয়, মাতা কি হম দুলারে।
...সবসে উঁচা হ্যায় ঝান্ডা হমারা
নেতাজি জিন্দাবাদ, আজাদ করেঙ্গে...

আজাদ হিন্দের গান মনের কোন মর্মস্থল পর্যন্ত যেন নাড়িয়ে দেয়! সমস্ত সভা মন্ত্রমুগ্ধ। নেহরুর মনেও আলোড়ন। কীসের আবেশে বিভোর হয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। হাতে নিলেন ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা, গানের সুরে সুর মেলালেন তিনি, পতাকা দোলাতে লাগলেন গানের তালে তাল মিলিয়ে।

নেহরুর মনে তুফান। ক্ষমতার লোভ, একনায়কত্বের লোভ কী সুভাষের মনে আসা সম্ভব? এঁটো পাতার মতোই আই সি এস পদ ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। এগারো বার জেলে যাওয়া সুভাষ; সেনা-পুলিশের লাঠিবাজিতে কতবার রক্ত ঝরেছে তাঁর। সম্প্রতি প্রকাশিত সুভাষের যুদ্ধকালীন ভাষণ খুঁটিয়ে পড়েছেন নেহরু। 'ব্যক্তির মৃত্যু হয়, অমর হয়ে থাকে ধ্যান-ধারণা। ব্যক্তি মরে রাষ্ট্রকে জাগিয়ে দেয়। আমার মৃত্যু যেন ভারতের মুক্তি নিয়ে আসে।' এই তেজ, এই দীপ্তি, সর্বস্ব উৎসর্গ করে আত্মত্যাগের এই তীব্র ঈপ্সা, একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব যে গাঁটছড়া বেঁধেছে আগুনের শিখার সঙ্গে।

জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকা সুভাষ বন্দনায় চারণের মতো সোচ্চার। একে একে প্রকাশ পাচ্ছে সুভাষের অনুগামীদের বিক্রমগাথা। সঙ্গে সঙ্গে নেহরুর কবিচিত্ত তার মন থেকে রাজনীতিককে সরিয়ে দিচ্ছে একটু একটু করে। ছাইয়ের তলা থেকে আগুনের প্রকাশ। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনে তিনি স্বয়ং প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ঘোষণা করলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসাররা বাহাদুর বীর। তবে প্রস্তাবে 'তাদের পথ ভুল হলেও' শব্দগুলো নথিভুক্ত করতেও ভুল হয়নি তাঁর। মামলার খরচের জন্য কংগ্রেস অর্থ সংগ্রহ শুরু করল সারা দেশে। লখনউতে নেহরু নিজেই নিলাম করলেন নিজের অয়েল পেন্টিং। পাটনার সভায় তাঁর আত্মহারা ভাবের প্রকাশ্য সমালোচনা হল কংগ্রেস কমিটির সভায়।

অভ্যর্থনা কক্ষে নেহরু ঢুকে নমস্কার জানালেন ভুলাভাইকে। আন্তর্জাতিক আইনে ভুলাভাইয়ের অগাধ জ্ঞান, যেমন পৃথিবীর ইতিহাসে নেহরুর। আজাদ হিন্দ মামলায় কার ওপর বেশি দায়িত্ব?

আবেগকম্পিত স্বরে নেহরু বলেন, 'ভুলাভাই আমি নিজে আদালতে দাঁড়াব আজাদ হিন্দের সমর্থনে—ব্যারিস্টারের গাউন পরে।'

'উত্তম কথা। কিন্তু এত দেরিতে সুভাষের সমর্থনে দাঁড়াতে আপনার একটু বাধো বাধো ঠেকবে না?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জওহরের দিকে তাকিয়ে ভুলাভাই বলেন।

'সে কথা অবশ্য সত্যি!' আমতা আমতা করেন নেহরু।

'গাঁধীজি, আমি নিজে আর আপনিও, ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর সুভাষের বিপক্ষে বলার একটি

সুযোগও ছাড়িনি।' ভুলাভাই বলেন। 'আমরা মানি আর নাই মানি পূর্ব এশিয়ায় গিয়ে সুভাষ নক্ষত্রের মতো ভাস্বর হয়ে উঠেছে। সে আজ চিরদিনের মতো ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায় হয়ে গেছে।'

'মানছি সে কথা। নয়তো বিশ বছর পরে ব্যারিস্টারের গাউন পরার ইচ্ছে আসবেই কেন আমার মনে।'

'আমিও একদিন সর্দার পটেলের জন্যে এইভাবেই দাঁড়িয়েছিলাম। জওহর মনে আছে আপনার? ত্রিপুরীর সময়ে আমি ছিলাম গাঁধীজির অন্ধ ভক্ত। বোসেরা দুই ভাই-ই ফ্যাসিস্ট, এ মন্তব্য সেদিন আমিই করেছিলাম। সেই তিক্ততা ভুলে গিয়ে, আমাদের আগের ভূমিকা ত্যাগ করে সুভাষের পক্ষ সমর্থনই আজ এ যুগের দাবি।'

'ঠিক বলেছেন। আমরা না এগিয়ে এলেও একাজ দেশের জনগণ নিজেরাই করবে।' স্বীকার করেন নেহরু।

নেহরুর অনুরোধ রাখলেন জেলার। তিন আসামিকে আনা হল অভ্যর্থনা কক্ষে। ব্যারাকে ব্যারাকে শত শত বন্দি সিপাহির কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'নেতাজি কী জয়, পণ্ডিত নেহরু জিন্দাবাদ, লাল কিল্লে সে আই আওয়াজ, ধিল্লোঁ, সেহগল, শাহনওয়াজ।' এঁরা তিনজনও কপালে ডান হাত তুলে 'জয় হিন্দ' বলে গর্জন করে উঠলেন। সহর্ষে অভিবাদন জানালেন নেহরুকে। ছাই রঙের পশমি ওভারকোট, চুড়িদার-পায়জামা, সাদা টুপি আর পায়ে পাঠানি জুতো। কর্পূর-গৌর রঙে উজ্জ্বল চোখ, খাড়া নাক আর মুখে স্মিত হাসি। নেহরুর কাশ্মীরি চেহারা সবাইকে মুগ্ধ করে। ডান হাতে চিবুকের ভর দিয়ে অনেকক্ষণ বসেছিলেন তিনি। আচ্ছারুরাম আর ভুলাভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে তাঁর। আজাদ হিন্দ ফৌজের এই ত্রিমূর্তির বক্তব্য শুনলেন তিনি। ধীর কিন্তু প্রত্যয়ী স্বরে বললেন, 'দেশের স্বাধীনতার জন্য যাত্রায় আমরা তোমাদের চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে দেব না। কী বলেন ভুলাভাই?'

'ঠিক কথা। তরুণ বন্ধুরা। তোমাদের বাঁচানো আমাদের জাতীয় কর্তব্য।' ভুলাভাই বলেন। 'আমি নিজে, কৈলাশ কাটজু, তেজবাহাদুর সপ্রু আরও অনেকে তোমাদের পেছনে আছি।'

প্রেম অনেকক্ষণ শান্ত ছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ শান্ত হয়ে বসা তাঁর কুষ্ঠিতে লেখেনি। অধীর হয়ে তিনি বলেন, 'মাপ করবেন চাচাজি। আমাদের বাঁচানো যদি কংগ্রেসের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়, খামোখা অস্বস্তিতে পড়বেন না আপনারা।'

'মানে?' নেহরু, দেশাই এমনকী প্রেমের বাবাও সচকিত।

'আপনারা সবাই অহিংসার পূজারি, আর আমরা নেতাজির সৈনিক। আমাদের তলোয়ারে যদি অহিংসার কোনও ক্ষতি হয় তো কাজ কী সমর্থনে? আমাদের যা হবার তাই হবে।'

প্রেমের কথায় একটুক্ষণের জন্যে থমকে গেলেন নেহরু তবে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'আবেগে ভেসে যেয়ো না। আমরা তোমাদের ম্যাকুয়িজ ভাবি।'

এক সুরে বাঁধা নাকি দুটি তার? দুয়েরই একই পরদা, একই ঝংকার! একটুক্ষণের জন্য হকচকিয়ে যান তিনজনেই। এ কার কথা? নেহরুর না নেতাজির? নেতাজির মুখ থেকে বহুবার তাঁরা শুনেছেন ম্যাকুয়িজদের কথা। সর্বস্ব ত্যাগ করে, স্বাধীনতার বেদিতে রক্তের আলপনা এঁকে দেওয়া, ভাস্বর তেজের মূর্তিমন্ত প্রকাশ ম্যাকুয়িজ। প্রেমের রাগ উধাও। যখন দুর্ভাগ্যের ঘন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না, সেইসব মুহূর্তে নেতাজি বিপ্লবের আকাশের উজ্জ্বল সব তারকা—গ্যারিবল্ডি, কাহুর, ম্যাকুয়িজদের কথা বলতেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোচনা শেষ হল। যাবার জন্য উঠলেন নেহরু। আর একবার

তাকালেন তিনজনের দিকে। আবেগের সঙ্গে বললেন, 'ভুলাভাই, সুভাষের প্রতিটি সহযোগীকে রাষ্ট্র নির্মাণের কাজে লাগাতে হবে আমাকে। আগামীকাল স্বাধীনতা যখন আসবে লক্ষ মানুষের ভিড়ে এইসব বীরেরা যেন হারিয়ে না যায়।' নেহরু বেরিয়ে যান। পেছনে তখনও তাঁর আবেগকম্পিত কথাগুলোর রেশ রয়ে গেছে। ভুলাভাই, আচ্ছারুরামের হাতে ভর দিয়ে কোনওমতে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকেও গিয়ে মামলার জন্য তৈরি হতে হবে। বের হবার সময় তিনি বললেন, 'জজসাহেব, ভগবান করুন, জওহরের এই ভাবনা যেন টিকে থাকে।'

'মানে?'

'জওহরের মাথায় কোনও একটা চিন্তা এলেই তাতে একেবারে মগ্ন হয়ে যান।' ভুলাভাই বলতে থাকেন, 'জওহরের এইসব ভাবনা কিন্তু বেশিদিন টেকে না।'

৬

ঘূর্ণিবাত্যার কেন্দ্রবিন্দু লালকেল্লা। ১৯৪৫-এর ৫ নভেম্বর শুরু হল মামলা। সারা দেশের অশান্ত পরিস্থিতি দেখে তিন সপ্তাহের জন্য মামলা স্থগিত রাখা হল। কিন্তু পরিস্থিতি বদলাল না। উলটে আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল আরও তীব্র গতিতে। রোজ হাজার হাজার লোক লালকেল্লার দিকে এগিয়ে যায়। 'লালকেল্লা তোড় দো, দেশ ভক্তোঁকো ছোড় দো... লালকিল্লে সে আই আওয়াজ, ধিল্লোঁ, সেহগল, শাহনওয়াজ।' ধ্বনিতে মুখরিত দিল্লির সমস্ত এলাকা। সমস্ত দেশে একই চিন্তা, কী হবে আজাদ হিন্দের বীরবৃন্দের।

'এইসব জঘন্য অপরাধে অপরাধীদের শাস্তি আমরা দেবই।' বারবার সদর্পে ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার। লোকে তেমন আমল দেয় না। ভারতের বড়লাট ওয়াভেল অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁর প্রাসাদে শুরু হল অফিসারদের জরুরি বৈঠক। ওয়াভেল ডাকেননি কারওকে। কিন্তু রাজধানীকে ঘিরে ধরেছে অশান্তির আগুন। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। আপৎকালীন অবস্থা। এক অফিসার একটি পোস্টার দেখান, 'এক একটি বীরের প্রাণের বদলে কমপক্ষে বিশজন ইংরেজকে বলি দেওয়া হবে।' এই হুমকি কাঁপুনি আনে।

অফিসাররা ওয়াভেলকে জানাতে থাকেন। 'রাস্তায় আমাদের চলা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেভ আই এন এ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে তরুণদের মিছিল পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা বেইমান নয়, দেশপ্রেমিক; লেখা ব্যানার হাতে প্রকাশ্যে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ আগুন এমনভাবে ছড়াবে এ ধারণা আমাদের ছিল না।'

'আমিও জানতাম?' ওয়াভেল সাহেবও কবুল করেন। 'মামলার প্রতিবাদে পঞ্জাবের লোকেরা এবছর দেওয়ালির উৎসবই পালন করেনি। সাধারণ মানুষ যদি এইসব বিশ্বাসঘাতকদের মাথায় তুলে মিছিল করে, আমাদের সাম্রাজ্যের গতি কী হবে?'

অসুস্থ গভর্নর জেনারেলের কথার পর চুপ করে থাকে সবাই। স্টেনোগ্রাফার দ্রুত এসে টেলিগ্রাম হাতে দেয়। ওয়াভেল বিস্ফারিত চোখে দেখতে থাকেন। এই মামলার প্রভাব দেশের বিভিন্ন কোণে কতটা সেটা দেখা ভীষণ জরুরি। আজ মামলার দিন শুধু বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লির মহানগরীগুলো নয়, অসমের লিডো পর্যন্ত সর্বত্র হরতাল পালিত হয়েছে। শ্রমিক, ছাত্র, সরকারি অফিসের কেরানিরা পর্যন্ত কাজ করেনি কেউ। অমৃতসরের গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি সাত হাজার টাকা দিয়েছে মামলার তহবিলে। এ ছাড়া পুনা, কানপুর, মাদ্রাজের

পুরসভাগুলি 'আজাদ হিন্দ বাঁচাও ফান্ড'-এ মুক্তহস্তে দানের জন্য ঘোষণা করেছে। অমরাবতীর টাঙ্গাওয়ালারা কৌটো হাতে ফান্ডের জন্যে টাকা তুলছে। পঞ্জাব যে-কোনও মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে। বিচারাধীন তিন সেনানী এই প্রদেশেরই। তাঁদের রক্ষার জন্যে মুসলিম লিগ, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি সবাই এককাট্টা। রাওয়ালপিন্ডি আর করাচির জেলাশাসকেরা টেলিগ্রামে জানিয়েছেন, ছোট ছোট শহরেও সভাতে উপস্থিত ছিল পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ।

এক অফিসার নিরীহ মুখে প্রশ্ন করেন ওয়াভেলকে, 'ইয়োর এক্সেলেন্সি মিস্টার নেহরুকে আপনি আলোচনায় ডেকেছিলেন শুনেছি। তাতে কি কিছু ফল হল?'

'শুধুই আলোচনা, আর কিছু নয়। উলটে নেহরু ওই বিশ্বাসঘাতকদের বাঁচানোর ফান্ডের জন্যে টাকা তুলছেন। অহিংসামন্ত্র জপ করতে করতে যিনি ওঠাবসা করেন, সেই মহাত্মা গাঁধীও একইরকম। বহুবার তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছি। আমাদের কাছে নাই হল, কম-সে-কম খবরের কাগজে বিবৃতি দিন একটা। তিনিও এ ব্যাপারে মৌন থাকাই শ্রেয় বলে ঠিক করেছেন।'

'স্যার বাংলার অবস্থাও ভাল নয়। একেকবারে দশ-দশ হাজার ছাত্র ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমা হচ্ছে। হিন্দু আর মুসলমান ছাত্ররা একসঙ্গে শ্লোগান দিয়ে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।'

'আমি জানি। অনেক শহরে ব্যারিস্টার জিন্নার চেয়ে সুভাষভক্ত, মুসলমান সংখ্যায় বেশি। কিন্তু এসব অবিলম্বে থামাতে হবে। আমরা আগ্নেয়গিরির শিখরে দাঁড়িয়ে আছি।' ওয়াভেল বলেন।

লালকেল্লার প্রাচীর সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। মামলার কাজ শুরু হয়েছে কেল্লায়। সমুদ্রের জোয়ারের মতো রোজ হাজার হাজার মানুষের জনসমুদ্র উত্তাল। কেল্লার আশেপাশে জমায়েত নিষেধ—তবু মানুষের উৎসাহে ঘাটতি নেই। ব্যারাকগুলো থেকে ভেসে আসে কম্বুনিনাদ, 'লালকিল্লা তোড় দো, দেশভক্তকো ছোড় দো।'

সাম্প্রদায়িকতার দানব আগে থেকেই কাজ শুরু করেছিল। ব্যারিস্টার জিন্না চেষ্টা করছিলেন শাহনওয়াজকে দলে টানতে। আকালি দল গুরুবক্সকে নিজেদের আওতায় নেবার জন্যে অধীর। মামলার রায় শেষ পর্যন্ত কী হবে? ভবিষ্যৎ একেবারেই স্পষ্ট নয় তিন কয়েদির কাছে। অভ্যর্থনা কক্ষে তাঁদের সামনে বসে ভুলাভাই বলছিলেন তাঁদের; 'তরুণ বন্ধুরা। তোমাদের প্রাণ বাঁচবে কী না বাঁচবে সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু যে নেতার জন্য, দেশের যে ইজ্জতের জন্য তোমরা জীবন পণ করে লড়াই করেছ, তাঁর কথা, তোমাদের সংগ্রামের পেছনে যে আদর্শ তাঁর কথা মনে রেখে মৃত্যুর জন্য তৈরি থেকো।'

'জাতপাত, গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে টুকরো টুকরো ভারতের ছবি আমাদের জন্য নয়', বলেন শাহনওয়াজ। 'নেতাজি আমাদের বলেছিলেন, হিন্দুস্থানের কর্তৃত্ব কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের হাতে যাওয়ার চেয়ে বিদেশির অধীনে থাকাই ভাল।'

ভুলাভাই সাগ্রহে দেখছিলেন তিনজনের চোখে নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা! বিগত অনেক দিন পড়াশোনা করতে করতে তাঁর রাত আর দিনের মধ্যে কোনও তফাত ছিল না। দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনি, বিপ্লবী অভ্যুত্থান তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে জমে ওঠা

চিঠিপত্রের রাশি। মামলা শুরু হবার আগেই প্রতিবাদী আইনজীবীর ভাষণের প্রতিটি শব্দ তাঁর জিভের ডগায় আসন পেতেছে। খারাপ শরীর এই উত্তেজনায় আরও খারাপ হয়েছে। আজও তিনি কেল্লায় এসেছেন হুইল চেয়ারে বসে। অ্যাম্বুলেন্স থেকে যখন তাঁকে হুইল চেয়ারে নামানো হচ্ছিল, আশপাশের সবাইয়ের চোখেমুখে তখন উদ্বেগ। মোটাসোটা, বেঁটেখাটো ভুলাভাই কিন্তু শান্ত—যেন ধ্যানস্থ। মাথায় টাক, কানের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে, ফরসা সুন্দর মুখ, ভরাট, আপন করে নেওয়া কণ্ঠস্বর। ভুলাভাই তিনজনকেই দেখছিলেন। বিচারপতি আচ্ছারুরাম তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মোটাসোটা শরীরটা কেঁপে উঠল, চোখ ভরল জলে। কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের জল মুছলেন। বললেন, 'ইউ অল আর ইয়ংগার দ্যান মাই সন।'

মামলার কাজ শুরু হল। আজাদ হিন্দের সমর্থনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে দেশের পনেরোজন স্বনামধন্য আইনের দিকপাল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার পণ্ডিত নেহরু। অনেক বছর আগে ভাঁজ করে তুলে রাখা গাউন আবার তাঁর পরনে। তাঁর এই রূপ দেখে মনে মনে হাসছিলেন রাজাজি আর আচার্য কৃপালনি। বিচারালয়ে হাজির ছিলেন ব্যারিস্টার সপ্রু, কৈলাসনাথ কাটজুর মতো বিখ্যাত আইনজ্ঞরা। ভুলাভাই অবশ্য জানতেন এই লড়াই তাঁর একার। তাই শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই ঐতিহাসিক মামলার বিশাল কাজের পাহাড় তিনি সামলাতে পেরেছিলেন। আদালতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন জাপানি রাজদূত হাচিয়া, মেজর ফুজিয়ারা, তাকাকি প্রভৃতি অনেক জাপানি সাক্ষী। নিখুঁত সুরে তালে 'জনগণমন' 'বন্দেমাতরম্' আর 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' যখন জাপানি ফৌজি অফিসাররা গেয়ে শোনালেন তখন আনন্দে আবেগে চোখে জল এসে গিয়েছিল ভুলাভাই এবং আরও অনেকের। ভুলাভাই বললেন, 'নির্বাহী আইনজীবী হিসেবে এ মামলার দায়িত্ব পাওয়া আমার পক্ষে বিরাট গৌরব। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য পূর্ব এশিয়ায় নেতাজির সেই অসাধারণ নেতৃত্ব দেখার সুযোগ আমি পাইনি।'

প্রতিদিন মামলার শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে চলে। পঞ্জাব আর বাংলার আলোড়ন ব্রিটিশের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। আজাদ হিন্দের তিন সেনানীকে রক্ষার জন্য কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে হল এক বিশাল জনসভা। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্দার পটেল, পণ্ডিতজি আর নেতাজির অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু। কলকাতার ময়দানে ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ মিলিয়ে দু'লক্ষেরও বেশি মানুষ তিনদিন লাগাতার বসে থেকে প্রতিবাদে শামিল হলেন। আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে যায় চারিদিকে। বোম্বাইয়ের মিল মজদুররা 'নেতাজি জিন্দাবাদ' শ্লোগান তুলে রাস্তায় নামল। মাদ্রাজে গুলিতে নিহত হল অনেক মানুষ।

রাজদ্রোহের এই মামলা সীমাবদ্ধ রইল না শুধু ব্রিটিশ সরকারের আর আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে। লালকেল্লা দেখতে পেল এ লড়াই ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের। ব্রিটিশ ভারতীয় ফৌজের অনেক সৈনিক আর অফিসাররা ইউনিফর্ম পরেই উপস্থিত থাকতে লাগলেন কংগ্রেসের সভায়।

দিনে দিনে মামলা জমে ওঠে। মোড়ে মোড়ে পানের দোকানে, হোটেলে সর্বত্র নেতাজির ছবি টাঙানো। শাহনওয়াজ, সেহগল আর ধিল্লোঁর ছবি নিয়ে বেরোয় শোভাযাত্রা। মামলার শুনানি শুনতে সঙ্গীদের সঙ্গে বসন্ত যখন সাইকেলে করে যায়, তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে জনতা। সাইকেলকে এগিয়ে দেয় লালকেল্লার ভেতরে। প্রেমের বউদি কিংবা শাহনওয়াজের ভাই—তিনজনের যে-কোনও আত্মীয়স্বজন এলেই জনতা গর্বিত চোখে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। 'আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরেদের মুক্তি দাও' ধ্বনি তুলে চাঁদনি চক থেকে

ছাত্রদের উপচে-পড়া ভিড় সামলানো গেল না। চলল গুলি। দিল্লির রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল অনেক মানুষ। লালকেল্লার ভেতরে ভুলাভাইয়ের গর্জন—বাইরে গুলিবর্ষণের আওয়াজ। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দিল্লি পুলিশের কর্তারা দৌড়লেন পণ্ডিত নেহরুকে ডেকে আনতে।

আদালতের কাছে সরকারপক্ষের বক্তব্য, আজাদ হিন্দ ফৌজ এক বিশ্বাসঘাতকের দল। সৈনিকেরা ইংলন্ডেশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ ভঙ্গ করেছে, ইজ্জত রাখেনি নিমকের। এরা সাধারণ কয়েদি। এদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন প্রযোজ্যই নয়। সরকার পক্ষের বক্তব্য শুনে তাঁর সেই শারীরিক অবস্থাতেও উঠে দাঁড়ান ভুলাভাই। বিচারকের দিকে আঙুল তুলে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'মি লর্ড। এঁরা আদৌ বিশ্বাসঘাতক নন। আটত্রিশ কোটি মানুষের মুক্তির জন্য ব্যাকুল, স্বাধীনতার সৈনিক। তাঁদের ছিল স্বাধীন সরকার...'

সরকারি উকিল নাওশিখন ইঞ্জিনিয়ার বলে ওঠেন সবিদ্রূপে, 'কেমন সরকার? এক চিলতে জমিও কি ছিল তাদের অধীনে!'

বিদ্রূপ উপেক্ষা করে ভুলাভাই আমন্ত্রণ জানালেন জাপানি রাজদূত হাচিয়াকে। বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে হাচিয়া বললেন, 'মি লর্ড, আজাদ হিন্দ ফৌজকে ডায়েট অর্থাৎ জাপানের পার্লামেন্ট স্বীকৃতি দিয়েছিল। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তুলে দেওয়া হয়েছিল নেতাজির হাতে। এ ছাড়াও ব্রহ্মদেশের জিয়াবাড়ির পঞ্চাশ বর্গমাইল আবাদি এলাকার শাসনও ছিল আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে। এতেই শেষ নয়। জাপানি আর আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করল, তখন অধিকৃত ভূমির সমস্তটাই তুলে দেওয়া হয়েছিল নেতাজির সরকারকে। এ বিষয়ে জাপানি পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী তোজোর স্পষ্ট ঘোষণা ছিল।'

হাচিয়ার সাক্ষ্যের পর ভুলাভাই আদালতকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে জাপান, জার্মানি, ইন্দোচিন এবং ব্রহ্মদেশ সহ পৃথিবীর আটটি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছিল আজাদ হিন্দ সরকারকে। আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের প্রধান দীননাথ এর পর সাক্ষ্য দিলেন। নেতাজির সাহায্যের জন্য পূর্ব এশিয়ার কৃষক, গোয়ালা থেকে ব্যারিস্টাররা পর্যন্ত মিলে কীভাবে ছয়-সাত মাসের মধ্যে বিশ কোটিরও বেশি টাকা তুলে দিয়েছিলেন সে কাহিনি জানালেন তিনি।

প্রতিবাদী উকিলের শেষ বক্তব্য রাখার সময় হল। রণাঙ্গনে মহাযোদ্ধারা যেমন যুদ্ধ শুরুর আগের মুহূর্তটিতে চারিদিকের সৈন্য সমাবেশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তেমনি ভুলাভাইও একবার চারিদিকে দেখে নিলেন। লালকেল্লার প্রতিটি ইট যেন আজ কান পেতে আছে। চেতনা পেয়েছে, প্রেরণা দিচ্ছে। ঝিরঝিরে হাওয়া বয়ে আনছে ব্যর্থ বাহাদুর শাহর দীর্ঘনিশ্বাস। লাহোর থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত শয়ে শয়ে মামলা লড়ে জিতেছেন ব্যারিস্টার ভুলাভাই দেশাই। প্রচুর উপার্জন করেছেন। বক্তৃতায় কাঁপিয়ে দিয়েছেন বিচারাসন। কিন্তু আজকের মুহূর্তটি অনন্য। একদিকে শারীরিক অসুস্থতা, অন্যদিকে ইতিহাস তাঁর জবাবি ভাষণের জন্য উন্মুখ প্রতীক্ষায় অপলকে তাকিয়ে।

ভুলাভাইয়ের হাত মুষ্টিবদ্ধ। ভারাক্রান্ত স্বরে বিচারপতিকে বললেন, 'আমার বক্তব্য পেশ করার আগে আমি মেজর জেনারেল কাটাকুরাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।' উঠে দাঁড়ালেন কাটাকুরা। ভুলাভাই বললেন, 'ইম্ফল অভিযানের প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন আপনি। আমার শুধু একটি প্রশ্ন। আপনারা নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে কী কী সাহায্য দিয়েছিলেন?'

'কী দিইনি?' অর্থ, সমর্থন ছাড়াও পঞ্চাশ হাজার জাপানি সৈনিক জীবন দিয়েছিল ইম্ফল অভিযানে। এসব শুধু তাঁর জন্য।'

'মিস্টার কাটাকুরা, "শুধু তাঁর জন্যে" বাক্যটির অর্থ কি আর একটু স্পষ্ট করে বোঝাবেন?' ভুলাভাই আবার জিজ্ঞেস করেন।

'নেতাজি জাপানে আসার আগেই আমরা ইম্ফল অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু প্রচণ্ড খরচ আর বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সে পরিকল্পনা ত্যাগ করা হল।'

'তা হলে আবার ইম্ফল অভিযানে কেন নামলেন আপনারা?'

'এ প্রশ্নের একটিই জবাব—নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস!' চোখ জলে ভরে ওঠে কাটাকুরার। চোখের জল মুছে তিনি বলেন, 'নেতাজির ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতার জন্য তাঁর আকুতি, কষ্ট সহ্য করার শক্তি সবই ছিল আলাদা। ইম্পিরিয়াল হোটেলে যেদিন তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে বলতে লাগলেন ভারতের স্বাধীনতার কথা, আমরা সবাই সেদিন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল কেউ যেন নিজের দেশের জন্য স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গেও বিবাদে প্রস্তুত।' এই সময় কোর্টে উঠে দাঁড়ালেন মেজর ফুজিয়ারা। আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'নেতাজির ব্যক্তিত্ব-ই তাঁর মহা অস্ত্র ছিল। জাপানের জনসাধারণ হয়তো তোজোকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিত, কিন্তু নেতাজিকে সাহায্য করা থেকে বিরত হত না।'

ফুজিয়ারার কথার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন জাপানের সমস্ত প্রতিনিধি। উপমন্ত্রী সাওদা, ওহটা, হাচিয়া, কাটাকুরা—সবাই। আবেগকম্পিত স্বরে একসঙ্গে তাঁরা বলে উঠলেন, 'মাতৃভূমিকে কী করে ভালবাসতে হয়, সে ভালবাসার জন্য কী করে পাগল হতে হয় তা আমাদের শিখিয়েছেন নেতাজি। এ তাঁর এক অসামান্য দান।'

'নিজের দেশকে ভালবাসা পৃথিবীর কোন সভ্য, সংস্কৃতিবান মানুষের চোখে অপরাধ?' ভুলাভাই বলতে শুরু করেন। 'দেশের জন্য, দেশের মর্যাদার জন্য প্রয়াস জগতের কোনও আদালতে অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। কোনও ফৌজ যখন নিজের দেশের জন্য লড়াই করে, মাতৃভূমির জন্য রক্ত ঝরায় তখন আপনিই সে স্বীকৃতি পায় সংগ্রামী রাষ্ট্রের। জার্মানির কবলে নিজের প্রিয় দেশ যাতে না যায় তার জন্য ফ্রান্সে ম্যাকুয়িজরা যখন বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছিল, কী হয়েছিল তখন? ম্যাকুয়িজদের বিদ্রোহী সংগঠন যখন জীবনপণ করেছিল, তখন ফ্রান্স জার্মানির অধিকারে। এই শাসনের বিরুদ্ধেই ম্যাকুয়িজের বিদ্রোহ। তবে কি একে বেইমানি বলব? বলবই বা কী করে? ইংল্যান্ড আর আমেরিকা নিজেরাই ম্যাকুয়িজদের দেশপ্রেমিক হিসেবে সম্মান দিয়েছে। একদিকে বলা হচ্ছে ম্যাকুয়িজরা দেশপ্রেমিক, অন্যদিকে আটত্রিশ কোটি পরাধীন মানুষের মুক্তির জন্য নেতাজির নেতৃত্বে প্রাণপণ সংগ্রামের শরিক আজাদি সৈনিকদের শাস্তি দেবার জন্য ফাঁসির মঞ্চ সাজানো হচ্ছে—এ কোন ন্যায়বিচার, মি লর্ড?'

শতধার ঝর্ণার মতো কথার স্রোত ভুলাভাইয়ের। তিনি আন্তর্জাতিক আইনের অসংখ্য ধারা সবিস্তারে তুলে ধরেন। তুলে ধরেন সে সম্বন্ধে লরেন্স, ইডেন, পিট, কুবেট, চার্চিল আর ওপেনহেইমের মতো দিকপালদের ব্যাখ্যা। বিচারপতির দিকে আঙুল তুলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'গ্যারিবল্ডি যখন ইতালির সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন, কারা তাঁর "রাষ্ট্র"কে স্বীকৃতি দিয়েছিল? ইংল্যান্ড-আমেরিকা নয় কি? মি লর্ড, যুদ্ধ-ঘোষণা যদি রীতিসম্মত হয় তবে রাজার প্রতি নিষ্ঠা, ইমানদারির কথাই উঠতে পারে না। রাজসত্তাই যখন বেইমান, তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় রাজনিষ্ঠার প্রশ্নই ওঠে না। নিজের দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজভক্তির বন্ধন কেমন করে থাকবে? সিঙ্গাপুরের ফারের পার্কে কর্নেল হান্ট যখন জাপানিদের হাতে

পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্যকে যুদ্ধবন্দি হিসাবে তুলে দিয়েছিলেন তখন তিনি কার পক্ষ থেকে তাদের দিয়েছিলেন? ব্রিটিশ সম্রাটের পক্ষ থেকেই তো? তার মানে সংকটের সময় রাজা তাঁর সৈনিকদের রাজনিষ্ঠার মর্যাদা রাখেননি। গোরু-ছাগলের মতো তুলে দিয়েছিলেন বিদেশিদের হাতে। আজ সেইসব সৈনিকদের কাছ থেকে রাজনিষ্ঠা প্রত্যাশা করা হচ্ছে! চার্চিল আর ইডেন-ও বলেন দেশের জন্য সংগ্রাম সফল বা ব্যর্থ যাই হোক না কেন, যে মুহূর্তে সে সংগ্রাম বাস্তব রূপ নেয়, সেই মুহূর্তে সংগ্রামী সৈন্যদের ওপর স্থানীয় আইনের বন্ধন আর থাকে না। তারা তখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক। মি লর্ড, তাই এই মামলা ন্যায়ের দেবতার প্রতি এক বিরাট ঠাট্টার বিড়ম্বনা!'

চার ঘণ্টা ধরে চলেছিল ভুলাভাইয়ের বক্তৃতা। শেষের দিকে তাঁর জ্বর এসে যায়। গলা ভেঙে যায়। মাঝে মাঝে জল খাচ্ছিলেন, আবার শুরু করছিলেন বলতে। ওকালতি শুরু করার আগে আহমেদাবাদে ইতিহাস পড়াতেন তিনি। সেটা কাজে লাগছিল এখন। আইন আর ইতিহাস যেন হাত মিলিয়ে ইংল্যান্ডের সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করছিল। মাঝে মাঝে পাশে বসা কৈলাসনাথ কাটজু তাঁর হাত হাতে নিয়ে জ্বর পরীক্ষা করছিলেন—দুশ্চিন্তা তাঁর মুখে। ঘড়িতে পাঁচটা। আদালতের সময় শেষ হল। বসে পড়তে পড়তে ভুলাভাই বললেন, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশের কতখানি লোকসান করেছে, সেটা আমিও বুঝি। তবু বলব বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণার চশমা খুলে দেখলেই, এ মামলার অন্তঃসারশূন্যতা আপনাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।'

ভাইসরয় প্রাসাদে শুরু হল জরুরি বৈঠক। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং ফৌজি আধিকারিকরা মামলা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মুহুর্মুহু খতিয়ে দেখছিলেন। 'জরুরি' লেখা খামে টেলিগ্রাম নিয়ে এসে দাঁড়াল এক বার্তাবহ। সীমান্তপ্রদেশের গভর্নর টেলিগ্রামে লিখেছেন, 'প্রত্যেকটি দিন যাচ্ছে আর সীমান্তপ্রদেশের পরিস্থিতি বিস্ফোরক হয়ে উঠছে। দয়া করে কোনও না কোনও ওজর দেখিয়ে এ মামলা অবিলম্বে বন্ধ করুন। নয়তো সীমান্তপ্রদেশ যদি ব্রিটিশের হাতছাড়া হয় তার জন্য আমাকে দায়ী করবেন না।'

আগেই ওয়ারলেস বার্তা এসেছে বোম্বাইয়ের গভর্নর-এর কাছ থেকে। 'বোম্বাই-এর নৌসেনা দলে কখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে তা বলা যায় না। পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ।' কলকাতার রাস্তায় নেমে পড়েছে লক্ষ লক্ষ লোক। পঞ্জাব আগুন হয়ে উঠেছে। মাদ্রাজের গ্রামে গ্রামে আন্দোলনকারীরা আগুন লাগাচ্ছে। শুধু পাগল হতে বাকি লর্ড ওয়াভেলের। ব্রহ্মদেশে ওয়াভেল মার খেয়েছিলেন জাপানিদের হাতে। কম্যান্ডার হিসাবে তাঁর সে অপমান এখনও ভুলতে পারেন না তিনি। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই এই বিচারের প্রহসনের পেছনে তাঁর হাত ছিল সবচেয়ে বেশি। রাগে অন্ধ হয়ে টেবিল চাপড়ে গর্জে ওঠেন তিনি। 'সেই বেইমান সুভাষচন্দ্র বোস আর তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের মুখোশ খুলে দেবার জন্যই আমরা মামলা শুরু করেছিলাম। আজ সেই মামলা আমাদের দিকেই ছোরার মতো ছুটে আসছে। যাকে বেইমান বলে প্রমাণ করতে যাওয়া হল, সেই সুভাষ বোস আজ না থেকেও সবার চোখে মহানায়ক। সিজারের মৃত্যুর পরের দাঙ্গা আর আজকের পরিস্থিতির মধ্যে তফাত কোথায়? লালকেল্লাকে বেছে নেওয়াই একটা বড় ভুল হয়েছে আমাদের। আমরা ভেবেছিলাম, যে লালকেল্লায় ব্রিটিশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে বিজয়-মিছিল করতে চেয়েছিল এই বেইমানেরা, সেখানেই কবর দেব তাদের। হল উলটো, লালকেল্লা সেই সুভাষের শৌর্যের অমর প্রতীক হয়ে উঠল। হু ওয়াজ দ্যাট ব্লাডি ফুল, রাসকেল? হু হ্যাজ চোজেন দিস হন্টেড প্লেস? কে বেছেছিল এই ভূতের বাড়ি?'

গোধূলি ঘনায়। কেল্লায় নামে অন্ধকার। ভুলাভাই গর্বভরে একবার তাকালেন তিনজনের দিকে। ব্যারাকে যাবার সময় হল। সান্ত্রি-সেপাইদের হইচই। এইসময় কৈলাসনাথ কাটজু ভুলাভাইয়ের হাতে তুলে দিলেন একটি আর্জি।

'হোয়াট ইজ দিস কৈলাস?'

'সই করে দিন স্যার। মামলার কাজ চারদিন স্থগিত রাখার দরখাস্ত করব বিচারপতির কাছে।'

'কেন? কীসের জন্য?'

'স্যার আপনার শরীর—'

'কৈলাস। আমার শরীর নিয়ে ভাবছ কেন? নিজের জীবনকে বাজি রেখেও এইসব তরুণ আজাদি সৈনিকদের পক্ষে আদালতে আমাকে বক্তব্য রাখতেই হবে। কৈলাস, কাল বোধহয় শেষ হবে আমার জবাবি ভাষণ। আশেপাশে ভাল করে নজর রেখ। যদি দেখ যমরাজ এসে পড়েছেন, তাঁকে স্পেশাল রিকোয়েস্ট কোরো ভাষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। আমার জবাবি ভাষণ শেষ হওয়ার আগে কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দিয়ো না তাঁকে। ডোন্ট অ্যালাউ হিম ইনসাইড বিফোর কমপ্লিশন অফ মাই ফাইনাল আর্গুমেন্ট।'

২

সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি

১

'বল তো। ভারতের মতো গৌরবশালী দেশ কার দোষে পরাধীন হয়ে গেল?' প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস প্রশ্ন করলেন।

'বাঙালিদের জন্য।' সামনের বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একটি সুন্দরমতো, চশমা পরা, ছিপছিপে কিশোর।

হো হো করে হেসে উঠল বাকি ছেলেরা; তুমুল হইচই। ক্লাস একটু ঠান্ডা হলে কিশোরটি বেণীমাধবকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার আমার উত্তর কি ভুল? পলাশির প্রান্তরে সিরাজদৌল্লা আর তাঁর সৈনিকেরা তো বাঙালিই ছিলেন। ইংরেজের প্রধান ঘাঁটি তো ছিল কলকাতা বন্দর। মাদ্রাজ বা বোম্বাই নয়।'

এর আগের দুটি ক্লাসে কিশোরটি উপস্থিত ছিল না। তাই বোধহয় গুলিয়ে ফেলেছে ভেবে বাকি ছাত্ররা হাসতে লাগল। টেবিলে ছড়ি আছড়ে বেণীমাধব বললেন, 'চুপ কর সবাই। ওর উত্তর একদম ঠিক। তোমরা যদি ইতিহাস ভাল করে পড়, তোমরাও বুঝবে। আমরা বাঙালিরা যদি সময়মতো ইংরেজদের ঠিকমতো বাধা দিতাম তা হলে তারা এমনভাবে আমাদের দেশের বুকে চেপে বসত না।'

বেণীমাধব কিশোরটির কাছে এলেন। চশমা পরা, ছিপছিপে কিশোরটির দিকে সস্নেহে তাকিয়ে রইলেন। তার কাঁধে হাত রেখে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম কী তোমার?'

'সুভাষ।'

'কার ছেলে তুমি?'

'শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বোসের।'

'তার মানে বড় উকিল সাহেবের?'

স্কুল ছুটি হল। গেটে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ি চলতে লাগল। ওড়িয়া বাজারের দিকে। দূর থেকেই সুভাষ দেখতে পেল নিজেদের বড়সড় বাড়িটা। গেটের সামনে আর একটা বগিগাড়ি দাঁড়িয়ে। বাবা তা হলে আজ অন্যদিনের চেয়ে আগেই কোর্ট থেকে ফিরে এসেছেন! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মইয়ে চড়ে মিউনিসিপ্যালিটির লোক রাস্তার আলো জ্বালাচ্ছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত এলাকা। অনেক বাড়ির চালই নারকেল পাতায় ছাওয়া। বাড়িতে তিন তিনটে বগিগাড়ি রাখার মতো অবস্থা একমাত্র উকিলসাহেবেরই।

সুভাষ বাড়ির এক কাজের লোকের কাছ থেকে জানল যে বাবা আজ আর রোজকার মতো ইউনিয়ন ক্লাবে যাননি। কোর্ট থেকে এসে ধুতি-কোট পরে টেনিস স্যু পায়ে দিয়ে মাকে নিয়ে

কবে যে ক্লাবে যাননি বাবা, একথা সুভাষের মনেই পড়ে না! বাকি ভাইরাও চুপচাপ। সুভাষ পায়ে পায়ে ছাদে গেল। দোতলার ছাদ থেকে কটক শহরের অনেকটাই দেখা যায়। বাড়ির পেছনে চাকরদের কোয়ার্টারগুলোও আজ থম মেরে রয়েছে। সারাবাড়ি চুপচাপ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল কিছু একটা হয়েছে।

রাত্রির খাওয়া শেষ হল। বাবার ঘরের পাশেই ছেলেদের ঘর। মায়ের গলার আওয়াজ পেল সুভাষ।

'সরকারি উকিল মানে কি চাট্টিখানি কথা?'

'কিন্তু তাই বলে কি আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে বারবার অপমান সইতে হবে?'

'কিন্তু সরকারি উকিলের কত ক্ষমতা আর দাপট, নীচে কত জুনিয়র উকিল! কমিশনার এমনকী গভর্নরের বাংলোয় পর্যন্ত ওঠাবসা।'

'প্রভা, আমার ঝগড়া আদর্শের জন্য। জজ ভুল করেছেন। সেটা তিনি স্বীকার করছেন না। ব্রিটিশ অফিসাররা সমর্থন করছেন তাকে। দল বেঁধে তারা আমাদের পেছনে লাগছেন। আমাদের একমাত্র দোষ আমরা নেটিভ—পরাধীন—গোলাম!'

'কিন্তু ইস্তফা দেওয়ার পর কী করবে?'

'যেখানে প্রশ্ন আদর্শের, সেখানে পদ আঁকড়ে থাকার কোনও মানে নেই। কাল সকালেই ইস্তফার চিঠি পাঠিয়ে দেব।'

ঘুম আসছিল না কারওরই। ছোটভাই শৈলেশকে নিয়ে মা ছাদে গেলেন। পেছনে পেছনে সুভাষও গেল সেখানে। ছাদময় জ্যোৎস্না ছেয়ে আছে।

'মা।'

'কী রে?'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী বাবা?'

'বাবার সঙ্গে তোমার কবে কীভাবে প্রথম দেখা হয়েছিল মা?'

মা যেন নিজের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। পুরনো স্মৃতি উথাল-পাথাল হয়ে উঠল। হাসিমুখে বলতে থাকেন তিনি।

'কলকাতার মতো বিরাট শহরে অনেক বড়লোকের বাস। তাদের বাড়িগুলো অনেক রাজবাড়িকেও হার মানায়। তার মধ্যেও গঙ্গানারায়ণ দত্তের বাড়ি সবার চোখে পড়ত। সে বাড়ির সিন্দুকে কত হিরে জহরত, বাড়ির সামনে বিরাট বাগান, অগুনতি চাকরবাকর। একদিন কোদালিয়া গ্রামের একটি বেজায় জেদি ছেলে যাচ্ছিল দত্ত বাড়ির সামনে দিয়ে। হঠাৎ দেখতে পেল দত্তদের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা দারুণ সুন্দরী মেয়ে। দেখেই ঢুকে পড়ল সে। ছেলেটি ছিল এক গরিব স্কুলমাস্টার।'

'সেই ছেলেটিই আমার বাবা, না মা?' সুভাষ হেসে জিজ্ঞেস করে।

'শোন তো। গেট পেরিয়ে সে সটান গিয়ে বলল যে গঙ্গানারায়ণের ওই সুন্দরী মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে চায়। কোথায় গ্রামের এক গরিব মাস্টার আর কোথায় গঙ্গানারায়ণ দত্ত। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাওয়া? গঙ্গানারায়ণের অন্য জামাইরা সব জজ ব্যারিস্টার। এই মাস্টারটির চেয়ে গঙ্গানারায়ণের মালিরাও বেশি মাইনে পায়। গঙ্গানারায়ণ রেগে লাল। মাথা গোঁজার জায়গা নেই, আবার রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন! বুকের পাটা দেখ ছোকরার!

'শোনো হে, আগে আমাদের সমান হও, তারপর আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়ো।

'মেয়েটির কিন্তু সব শুনে খুব মন খারাপ। বগিগাড়িতে চড়ে এদিক ওদিক যাওয়ার সময় কোথাও দেখতে পায় না ছেলেটিকে। এইভাবেই কাটে তিন-চার বছর। তারপর একদিন ছেলেটির ঘোড়ার গাড়ি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে দত্তবাড়িতে এসে ঢুকল। ইতিমধ্যে দিনরাত এক করে, প্রাণপাত করে মস্ত উকিল হয়েছে সে। কটকের আদালতে তার খুব নামডাক।'

প্রভাবতী এলেন জানকীনাথের ঘরে। ভরে উঠল সংসার। ছয় মেয়ে, আট ছেলে। জানকীবাবুর ক্রমাগত উন্নতি। নামজাদা উকিল থেকে সরকারি উকিল হলেন। তারপর একে একে কটক টাউন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, বাংলার অ্যাসেমব্লির মেম্বার। জানকীবাবুর বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর অগাধ আস্থা প্রভাবতীর। প্রথমে আপত্তি করলেও সরকারি ওকালতি থেকে তাঁর ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত মন থেকেই মেনে নেন তিনি।

সেই রাত্রিতে সুভাষ মাকে বলে তার প্রিয় শিক্ষক বেণীমাধবের কথা। বেণীমাধবকে ভীষণ ভাল লাগে সুভাষের। শান্ত, ধীরস্বভাব বেণীমাধবকে দেখলেই মনে হয়, তাঁর ভেতরে এক উদ্দীপনা কাজ করে চলেছে। সুভাষের অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করে তাঁকে। বেণীমাধবের অফিসঘরে হাজির হয়ে সুভাষ একদিন জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, গোলাম মানে কী?'

'নিজেদের চিন্তাভাবনা বিসর্জন দিয়ে যারা অত্যাচারীদের দাসত্ব করে তাদের বলে গোলাম।'

'এমন গোলাম আমাদের দেশে কত আছে স্যার?'

'ত্রিশ কোটি', বেণীমাধব উত্তর দেন।

আস্তে আস্তে বেণীমাধবের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। যেন নিজেকেই বলছেন এমনভাবে বলেন, 'সাধে কী স্বামীজি বলেছেন যে আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের একমাত্র ধ্যান, একমাত্র চিন্তা হতে হবে গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়া। স্বাধীনতা না পেলে ভারতের কোনও ভবিষ্যৎই নেই, উন্নতির কোনও সম্ভাবনাই নেই।'

যে স্বামীজির কথা বেণীমাধব এমনভাবে বলছেন তিনি কে? তাঁর মধ্যে কী সেই ক্ষমতা যা বেণীমাধব স্যারকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছে? সুভাষের কিশোর মনে প্রশ্নের ঢেউ। বাবার কথায় সুভাষ একদিন বুঝতে পারে এই স্বামীজির নাম স্বামী বিবেকানন্দ। বেশ কয়েক বছর আগে আমেরিকায় বসেছিল এক আন্তর্জাতিক ধর্মসম্মেলন। স্বামীজি সেই সম্মেলনে হিন্দুধর্মের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেছিলেন দৃপ্তকণ্ঠে।

ওড়িয়া বাজারে থাকত সুভাষের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। পদবি ঘোষ। তার বাড়িতে সুভাষ পেল এক সম্পদভাণ্ডারের সন্ধান— স্বামীজির রচনাবলি।

বিবেকানন্দের লেখা সুস্থির থাকতে দেয় না সুভাষকে। দেওয়ালির চরকিবাজির মতো ক্রমাগত নানা আবর্ত তোলে মনে। বন্ধ হয় বসুবাড়ি থেকে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ঘোড়ার গাড়ির যাতায়াত। বাকি সব ছাত্রদের মতোই সুভাষও স্কুলে হেঁটে যাওয়া আসা শুরু করে। দীন দুর্বলের ওপর তার করুণার শেষ নেই। স্কুলের গেটে প্রতিদিন তাঁর পথ চেয়ে ভিড় করে থাকে অনেক সাধু, বৈরাগী, ফকির, ভিখারি।

'যে পর্যন্ত কোটি কোটি দেশবাসী অজ্ঞান আর ক্ষুধার করালগ্রাসে পড়ে আছে, সে পর্যন্ত আরাম-আয়াসের সমস্ত উপকরণ আমার কাছে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।'

স্বামীজির এই কথাগুলো অস্থির করে তোলে সুভাষকে।

সুভাষের এই পরিবর্তন মায়ের চোখ এড়ায় না। বাড়ির সবাই প্রভাবতীকে ডাকে, 'মা জননী।' এই বিশাল পরিবার তিনিই সামলান। স্বভাবত তীক্ষ্ণধী সুভাষ। সতীশ, শরৎ আর অন্য সব ভাই—এরাও খুবই বুদ্ধিমান। এদের সংস্পর্শে সুভাষের বুদ্ধি আরও শাণিত হয়ে

ওঠে দিনে দিনে। তার ইংরেজি এত ভাল যে মাস্টারমশাইরাও আশ্চর্য হয়ে যান।

একবার সংস্কৃতের পণ্ডিতমশায় বাগচিবাবু বসুবাড়িতে এসে জানকীনাথ আর প্রভাবতীকে বললেন, 'আপনাদের সুভাষকে আমি সংস্কৃতে একশোর মধ্যে খালি একশোই দিয়েছি।'

'খালি মানে?' প্রভাবতী হেসে জিজ্ঞেস করেন।

'আমার ইচ্ছে ছিল একশোর মধ্যে একশো দশ দেওয়ার। কিন্তু সেটা নাকি দেওয়া যায় না। অগত্যা একশোই দিতে হল।'

সুভাষের পড়াশুনোর ব্যাপার বাবা-মাকে চিন্তা করতে হয় না। পরীক্ষার আগে চার রাত জাগলেই তার পড়া হয়ে যেত। তাতেই সমস্ত বিষয়গুলোর গভীরে পৌঁছে যেত সে। সব পরীক্ষাতেই প্রথম স্থানটি তার বাঁধা। কিন্তু নিশ্চয়ই কিছু তার হয়েছে। তার চালচলন পালটে গেছে। বয়সের আন্দাজে বেশি রকম গম্ভীর। স্কুলে যাওয়ার সময় একদিন প্রভাবতী ধরলেন তাকে।

'কী হয়েছে রে? চুপচাপ থাকিস, হাসি-তামাশা নেই, চালচালনে কেমন যেন অবাধ্যতা, বিদ্রোহের ভাব।'

'মা, ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশু যে কেঁদে ওঠে, সেটাও তো তার বিদ্রোহের প্রথম প্রকাশ।' শান্তস্বরে উত্তর দেয় সুভাষ।

'কে বলেছে একথা?'

'স্বামী বিবেকানন্দ।'

'খুব তালেবর হয়ে গেছিস মনে হচ্ছে। এমনভাবে বলছিস যে স্বামীজি রোজ তোর সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন!'

বাবা সরকারি চাকরি ছেড়ে জেদ করে নিজের ওকালতি শুরু করেছেন। তার ওপরে কয়েকদিন আগেই সর্দিগর্মিতে ভুগে উঠেছেন। তাঁর ব্যাপারে মা জননীকে দৃষ্টি রাখতে হয়। সতীশ আর শরৎ কলকাতায় পড়ে। সুনীলও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। এ সবের চিন্তাও রয়েছে। তার মধ্যে সুভাষের এইরকম আনমনা ভাব। তার মনের মধ্যে কী হচ্ছে তার হদিশ পাওয়া ভার। মনে হয় সুভাষ সকলের সঙ্গেই আছে, তবু যেন কারও সঙ্গেই নেই।

জানকীনাথ প্রভাবতীকে বলেন, 'সুভাষকে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় শরতের কাছে পাঠাতে। বাবার চিন্তা যাতে না বাড়ে তার জন্যে কলকাতায় যাবার জন্য তৈরি হয় সুভাষ। মেজদা শরতের সঙ্গে সুভাষের দারুণ মনের মিল।'

কলকাতা ব্রিটিশের রাজধানী। রেস্তরাঁ, ট্রাম সর্বত্রই ব্রিটিশদের দাপট। কলকাতার রাস্তায় অনেক মানুষ মরছে কলেরায়, ইনফ্লুয়েঞ্জা কিংবা স্রেফ খিদের জ্বালায়। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি বেওয়ারিশ লাশগুলো তুলে নিয়ে যায় রাস্তার মরা কুকুরগুলোর মতো। অন্যদিকে তারই মধ্যে চলছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল তৈরির অমিতব্যয়িতা। রাজস্থান থেকে আনা হয়েছে মূল্যবান পাথরের রাশি, এসেছে দেশবিদেশের কারিগরেরা আর তার সঙ্গে অসংখ্য শ্রমিকের দল—যাদের খাওয়া জোটে না ভাল করে। দেখে যেন গা গুলিয়ে ওঠে সুভাষের।

স্বামীজির কথাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবার পর এই প্রথম সুভাষ দেশকে এক নতুন চোখে দেখছে। কী ভীষণ অজ্ঞানতার অন্ধকার! রেলগাড়িতে চড়া মেয়েদের কাছে পাপ। মা প্রভাবতী যখন রেলগাড়িতে যাতায়াত করেন অবাক চোখে মেয়েরা তাঁকে দেখতে থাকে বাইরে থেকে। পুরুষেরা ভুরু কুঁচকোয়, ছি ছি করে। উড়িষ্যা থেকে বাংলা, সর্বত্র আকালের করালগ্রাস স্পষ্ট। অভাবের তাড়নায় চাষের বলদ পর্যন্ত বেচতে বাধ্য হচ্ছে চাষিরা। কত লোক ঘরদোর ছেড়েছুড়ে

গ্রাম ছেড়ে চলে আসছে শহরে খাদ্যের সন্ধানে। আপনমনে সুভাষ বলে, 'এ অন্যায়। এটা কী ধরনের সরকার? কী ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা?'

পথচলতি মানুষগুলো অস্থিসার। তৃতীয় শ্রেণির কামরাগুলো যেন নরককুণ্ড। কীসের জন্য তবে রাজাকে সেলাম জানানো? কেন গাইতে হবে স্কুলে স্কুলে 'গড সেভ দি কিং'? কেন আওড়াতে হবে পঞ্চম জর্জ প্রশস্তি?

কটকে ফিরে আসে সুভাষ। রোজ স্কুল শুরু হবার আগে সব ছেলেদের একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। একজন প্রথমে গায়, তাকে অনুসরণ করে অন্যেরা। সারা বছর ধরে এক একজনের পালা আসে এক একদিন। ব্যায়ামশিক্ষক শ্রীবাস্তব স্যার বুঝতে পারছেন না প্রার্থনা কেন শুরু হচ্ছে না সেদিন।

'আজ কার পালা? প্রার্থনা শুরু হচ্ছে না কেন?'

'সুভাষের পালা স্যার।' একসঙ্গে বলে ওঠে অনেকে।

ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো মারমুখী নজরে শ্রীবাস্তব দেখতে থাকেন সুভাষকে। ওর পালা আজকে অথচ বিলকুল খেয়াল নেই এ ছেলের? 'প্রার্থনা শুরু কর শিগগির', রক্তচক্ষু শ্রীবাস্তব হুঙ্কার দেন।

চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোয় সুভাষের। সটান শ্রীবাস্তবের মুখের ওপর বলে দেয় গাইবে না সে ইংলন্ডেশ্বরের বন্দনা।

'বটে?' সুভাষের হাতের ওপর সপাসপ ছড়ির ঘা পড়তে থাকে। হাত ফুলে ওঠে দাগড়া দাগড়া হয়ে। মার সহ্য করতে করতে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলে ওঠে সে, 'কিছুতেই গাইব না আমি।'

বেত পড়ে অবিশ্রান্ত। 'কেন, কেন গাইবি না তুই?'

'ইংল্যান্ডের রাজা আমাদের কে? তিনি আমাদের ধর্মগুরু না পির পয়গম্বর? না কি বিরাট এক সমাজসেবক? কেন গাইতে হবে তাঁর বন্দনা, কেন করব তাঁর জন্য প্রার্থনা?'

'দেখছি কেমন না গাস তুই! আজ চামড়া ছাড়িয়ে নেব তোর?' অবিশ্রান্ত ছড়ি উঠছে আর পড়ছে। সমস্ত ছেলেরা ভয়ে কাঁপছে। হঠাৎ কানে এল এক লৌহকঠিন আওয়াজ, 'মার থামান আপনি। মারতে মারতে মেরে ফেলবেন না কি? আপনি মানুষ না রাক্ষস?' ছুটতে ছুটতে এলেন বেণীমাধব দাস। এসে হাতে তুলে নেন সুভাষের লাল হয়ে যাওয়া হাত।

মারের তাড়সে রাতে জ্বর আসে সুভাষের। ছাদে জানকীনাথের কাছে বেণীদা বসে।

'কেউ যদি নালিশ করে বসে? একটা স্কুলের ছেলে রাজার বন্দনা গাইতে অস্বীকার করেছে। আইনের চোখে এটা তো রাজদ্রোহ। তাই না?'

বেণীদার প্রশ্নের জবাব ছিল না তাঁর কাছে। চুপ করে তাকিয়ে থাকেন তিনি অন্ধকারের দিকে।

২

'সুভাষের লক্ষণ ভাল ঠেকছে না আমার। ইদানীং সে বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশা করছে।' বাবা বললেন।

'আমি বিশ্বাস করি না এ কথা। এটা অসম্ভব।' জবাব দেন মা।

'আমার কাছে কটক থানার ইন্সপেক্টর এই নালিশ জানিয়ে গেছেন।' বাবার গলা এক পরদা চড়ে।

মা স্তম্ভিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ওঠেন, 'সুভাষ ক্লাসের সেরা ছাত্র। দেখতে ভাল, একরোখা। তাই হিংসে করে কোনও ছেলে বোধহয় ওর ক্ষতি করবার জন্য এই সব রটাচ্ছে।'

বাবা ধমকে ওঠেন, 'ইদানীং ও কী পড়ছে, কী লিখছে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছে তার কোনও খবর নিয়েছ তুমি?'

বাইরে যাচ্ছিল সুভাষ। হাতে একটা খাতা। জানকীবাবু খাতাটা টেনে নেন। ছবির খাতা। সুভাষের আঁকা ছবিগুলো দেখতে দেখতে ভ্রূ কুঞ্চিত হয় তাঁর।

'প্রভা দেখো তোমার গুণধরের কীর্তি।'

'কই দেখি।'

ছবিগুলো দেখতে থাকেন মা।

'এর মধ্যে দোষের কী দেখলে তুমি?'

মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠেন প্রভাবতী।

'কী সুন্দর বাগান এঁকেছে, কী সুন্দর রং করেছে।'

'বাগানে দাঁড়ান ইংরেজগুলোর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ। প্রত্যেকটি ইংরেজকে কী বীভৎসভাবে এঁকেছে সেটা দেখেছ?'

এবার মায়ের নজরেও এল ব্যাপারটা। হেসে জিজ্ঞেস করেন তিনি, 'কী রে? বেঁকা মুখ, লম্বা লম্বা কান! তোর আঁকা সাহেবরা যেন ষাঁড়ের মতো গুঁতোতে আসছে। ভাল করে আঁকিস না কেন?'

সুভাষ জন্মেছে রানি ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তীর বছরে। ব্রিটিশদের কাছে জানকীনাথের যথেষ্ট সম্ভ্রম প্রতিপত্তি ছিল। ইংরেজ সরকার রায়বাহাদুর খেতাবে সম্মানিত করেছিল তাঁকে। কিন্তু ব্রিটিশদের সঙ্গে সুভাষের যেন জন্মান্তরের শত্রুতা। কিছু দিন আগে তরুণ কিশোর ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে ভারতবিদ্বেষী কিংসফোর্ডকে বোমা মারতে গিয়েছিল। কিন্তু ভুল করে অন্য লোককে মেরে ফেলে। বিচারে কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। খবরের কাগজে ক্ষুদিরামের সুন্দর মুখের ছবি দেখে সারাদিন চোখের জল ফেলেছিল সুভাষ। অনেকদিন পর্যন্ত ক্ষুদিরামের ছবি তার টেবিলে যত্ন করে সাঁটা ছিল। ইদানীং অনেক রাত পর্যন্ত কয়েকজন সাহসী, ডানপিটে ছেলেদের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যাচ্ছিল তাকে।

জানকীবাবু এবার জেরা করতে থাকেন।

'এবার যখন কলকাতায় গেলি, কাদের কাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতিস? সুরেশ ব্যানার্জি বলে কোনও ছেলেকে চিনিস তুই?'

'হ্যাঁ চিনি।'

'তার সঙ্গে কোথায় কোথায় যেতিস তুই?'

'আমাদের দেখা হত চৌরঙ্গির ওপরে এক পুরনো ঘুপচি বাড়িতে।'

'কবার গেছিস তার কাছে?'

'তিন-চার বার হবে।'

সুভাষের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলে প্রভাবতীকে বলেন জানকীবাবু।

'এই সুরেশ ব্যানার্জি হচ্ছে কলকাতায় অনুশীলন সমিতির এক মস্ত পান্ডা। পুলিশের খাতায় বেশ ভাল করেই নাম তোলা আছে তার। অনেক কীর্তিই করেছে। ওর সঙ্গে মেলামেশা করার দরকারটা কী সুভাষের? ওর কী এখন, এসব করার সময়?'

'সুভাষ, ঠিক করে বল, এ সব কী ব্যাপার', প্রভাবতীও এবার ধমকে ওঠেন।
'তুমি একটু থামো।' জানকীবাবু থামিয়ে দেন প্রভাবতীকে। আবার জেরা শুরু হয় তাঁর।
'তুই এখানে গিরিশ ব্যানার্জির কাছে যাওয়া আসা করিস?'
'হ্যাঁ, যাই।' শান্তস্বরে জানায় সুভাষ।
'কীসের জন্য?'
'তাঁর কাছে বিবেকানন্দের অনেক বই আছে। পড়তে যাই।'
'এই গিরিশ ব্যানার্জি হচ্ছে কটকে অনুশীলন সমিতির নেতা। পুলিশ ওকে ধরেছিল। ওর সঙ্গে আছে বিধু রায়, শশাঙ্ক মুখার্জি...!'
'আরে! এরা তো অনেকবার আমাদের বাড়িতেও এসেছে!' প্রভাবতী ভয়ে ভয়ে বলেন। 'ওদের কথাবার্তায় তো কখনও মনে হয়নি যে ওরা এসব ব্যাপারে জড়িয়ে আছে।'

পাশের চেয়ারটাতে তিনি ধপ করে বসে পড়েন। তাঁর মনে সাম্প্রতিক অনেক ঘটনা পাক খায়। কলকাতা থেকে কখনও হেমন্ত সরকার, কখনও রমেন্দ্র ঘোষ আর মহাদেব ঘোষ এসে এ বাড়িতে থেকে যায়। তাদের চেহারা কেমন যেন রোখা ধরনের। তাদের চালচলনও বেশ সন্দেহজনক। সারারাত জেগে কী সব সলাপরামর্শ চলে তাদের—বয়স আন্দাজে ছেলেগুলো একটু বেশি পাকা। যত মনে পড়ে ততই চিন্তা বাড়ে তাঁর। 'যা এখন পড়াশোনায় মন দে ত।' জানকীনাথ সুভাষকে ধমকে দেন। অপরাধী অপরাধী মুখ করে সুভাষ চলে যায় সেখান থেকে।

দুপুরে জানকীবাবু কোর্টে গেলেন না। সুভাষের চিন্তায় বেশ অস্থির তিনি।
'বেণীমাধব বদলি হয়ে গেছে।' প্রভাবতীকে বলেন তিনি।
'সেকি? সুভাষকে তবে সামলাবে কে?' মায়ের চিন্তা আরও বাড়ে।

সরকারি উকিলের চাকরিতে ইস্তফা দিলেও ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিরা জানকীবাবুকে এক সংস্কৃতিবান, সমাজসচেতন ব্যক্তি হিসাবেই দেখতেন। তাঁর কটকের বাড়িতে অনেক দুঃস্থ আত্মীয় আর গরিব ছাত্রদের নিত্য আনাগোনা ছিল। তাঁর কাছ থেকে কখনও কোনও সম্ভাবনাময় ছাত্র রিক্তহাতে ফিরে যায়নি। জন্মগ্রাম কোদালিয়াতে মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়—ইত্যাদি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে তিনি দান করেছেন মুক্তহস্তে। সমস্ত কটক বিভাগের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই রায়বাহাদুর খেতাব ব্রিটিশরা এমনি এমনি দেয়নি।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ সস্ত্রীক ভারতসফরে আসছেন। তাঁর সংবর্ধনার জন্য দিল্লিতে বসতে চলেছে এক বিরাট দরবার। কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হবে দিল্লিতে। সেই জন্য পুরনো দিল্লির পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে নতুন দিল্লি, এক সুপরিকল্পিত নতুন শহর। সেখানেই বড়লাটের প্রাসাদে বসবে এই খাস দরবার। সেই দরবারে উপস্থিত থাকার জন্যে জানকীবাবুর কাছেও আমন্ত্রণ এসেছে। এই সম্মানে ওড়িয়া বাজারের বসুবাড়ি আনন্দে ডগোমগো।

প্রভাবতীর ইচ্ছে জানকীনাথের সঙ্গে সুভাষও যাক দিল্লিতে। বেড়ানোও হবে আর সঙ্গে বিবেকানন্দ আর ব্রিটিশ বিরোধিতার ভূতও হয়তো ঘাড় থেকে নামবে। পরামর্শটা ভালই লাগল জানকীনাথের।

১৯১১ সাল, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নতুন দিল্লি বিয়ের কনের মতো সেজেছে। দেশীয় রাজা-নবাবদের হাবভাবে মনে হচ্ছে আশমান থেকে কোনও দেবদূত কিংবা পয়গম্বর মাটিতে নেমে এসেছেন। দিল্লির রাস্তায় মণিমাণিক্যে সাজানো হাতি-ঘোড়ার অপরূপ শোভাযাত্রা। সারা দেশের রাজা-মহারাজা-জমিদারদের ভিড় নতুন দিল্লিতে। এঁদের মধ্যে রেষারেষি চলেছে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখানোর। দরবারে কেউ যদি আভূমি কুর্নিশ করেন তো আর একজন

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। এঁদের ওঠা, বসা, সবকিছু সুভাষের চোখে যাত্রাপালায় অভিনয়ের মতো লাগছিল।

গণ্যমান্যদের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে সম্রাট এগিয়ে আসছিলেন। সুভাষ একদৃষ্টে দেখছে, তার কোঁকড়ানো চুল আর চোমড়ানো গোঁফ। এগিয়ে আসতে আসতে একসময় তিনি জানকীনাথের কাছে এসে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে জানকীনাথের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। পাশে দাঁড়ান সুভাষের ওপর নজর পড়ল পঞ্চম জর্জের। আদর করে তার গালে একটা টোকা মারলেন তিনি। সুভাষ চুপচাপ একভাবে দাঁড়িয়ে। সম্রাট সকৌতুকে তার দিকে তাকিয়ে। পেছন থেকে এক দেশীয় রাজা বলে ওঠেন, 'বেটা, দেখতে ক্যা হো? ও ভগবান হ্যায়, পায়র ছুঁয়ো উনকো।' সুভাষ ঘাড় শক্ত করে একভাবেই দাঁড়িয়ে। না একটা নড়া, না কিছু বলা। অনেকের চোখেই ভয়। পঞ্চম জর্জ কিন্তু যেন কিছুই হয়নি এইরকম ভাব দেখিয়ে এগিয়ে গেলেন।

কলকাতায় হেমন্ত জিজ্ঞেস করল, 'কী রে কেমন দেখলি দিল্লির দরবার?'

'দরবার আবার কী? কতকগুলো জড়ভরতের মেলা।'

বিপ্লবী ছেলেদের সঙ্গে ঘোরাফেরা একটু কমেছে সুভাষের। কিন্তু 'বিবেকানন্দ দর্শন' বন্ধ হয়নি। ছুটি হলেই সুভাষের দলবল কটকের বস্তি ঝুপড়িতে হাজির। 'মায়ের দয়া' আর কলেরা রোগী দেখতে পেলে তাদের ওষুধপথ্যির ব্যবস্থা করা তাদের কাজ। কটকে অনেক গরিব ছাত্রের জন্যে বিনাভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা ছিল। তাদের জন্যে আশপাশ থেকে নিজেদের বাড়ি থেকে চাল সংগ্রহ করে আনত সুভাষরা।

এই সঙ্গে বেড়েছে সুভাষের বইপড়া। তার হাতে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, রামায়ণ, মহাভারত, ম্যাৎসিনির 'মানুষের কর্তব্য', গিবনের 'ডিক্লাইন অ্যান্ড ফলস'—এইসব মোটামোটা বই।

একদিন সন্ধেবেলা জানকীনাথ আর প্রভাবতী সিটি ক্লাবে বসে আছেন। তাঁর পরিচিত এক উকিলবাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খবর শুনেছেন?'

'কী খবর? বিশেষ কিছু ঘটেছে না কি?'

'দিল্লিতে বড়লাটের শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। শোভাযাত্রায় বড়লাটের হাতির ওপর বোমা মারা হয়েছে।'

'সে কী? ভাইসরয় কেমন আছেন?'

'হাতির মাহুত মারা গেছে। বড়লাটের ভাগ্য খুব ভাল। কোনওক্রমে বেঁচে গেছেন তিনি।'

ঘটনাটা ঘটেছে অনেকদূরে দিল্লিতে। কিন্তু জানকীনাথের মন কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল। বাড়ি ফিরলেন তিনি। টেবিলে বসে সুভাষ আর সতীশ। বড়ভাই সতীশ সেদিন দুপুরেই কলকাতা থেকে এসে পৌঁছেছে। দাদাকে দেখে দারুণ খুশি সুভাষ। সুভাষের কথা কানে গেল জানকীবাবুর।

'গতবছর পঞ্চম জর্জের মিছিলে যদি এরকম একটা বোমা পড়ত তা হলে আরও ভাল হত।'

'সুভাষ, আবার তোর মনে এইসব পাক খাচ্ছে?' জানকীনাথ ধমকে ওঠেন। 'ব্রিটিশের ওপর এত আক্রোশ কেন তোর?'

'এটা আক্রোশ নয় বাবা। দুর্ভিক্ষ, মহামারিতে সাধারণ মানুষ পোকামাকড়ের মতো মরছে। আমাদের এই কটক বিভাগেই ত্রিশ হাজার লোক কলেরায় মারা গেছে। আমাদের সম্রাটের উচিত ছিল কোনটা সবচেয়ে বেশি জরুরি সেটা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া। সেটা না করে তিনি যতসব মোসাহেব রাজা মহারাজা নিয়ে দরবার জমালেন।'

র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে জোর জল্পনাকল্পনা—বড়লাটের ওপর বোমাটা কে ছুড়েছিল? একদিন পুলিশ তার সন্ধান পেয়ে গেল। খবরের কাগজটা হাতে করে নাচতে নাচতে বাড়ি এসে মাকে জানাল, 'দেখ মা। বোমা যিনি ছুড়েছিলেন তিনি বাঙালি।'

'কে রে?'

'চন্দননগরের রাসবিহারী বোস।'

মা-ও মনে মনে খুশি। কিন্তু সুভাষকে ধমক দেন তিনি, 'তোর এসবে দরকার কী রে? তুই এখন পড়াশোনা কর।' মা ধমক দিলেও যতক্ষণ না ফটকে বাবার গাড়ি এসে পৌঁছল ততক্ষণ সুভাষের নাচানাচি চলতেই লাগল।

একদিন জানকীনাথ কিছু একটা খুঁজতে সুভাষের ঘরে এসেছিলেন। বইয়ের আলমারিতে কিছু কাগজ দেখে তাঁর মনে একটা খটকা লাগল। কাগজটা খুলে তাঁর মাথা ঘুরে যাওয়ার অবস্থা। কাগজটা একটা পোস্টার। পোস্টারের লেখাগুলো যেন তাঁর দিকে ভয়ংকর চোখে তাকিয়ে আছে।

চাই : হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে দৃপ্ত সৈনিক

বেতন : মৃত্যু

পুরস্কার : শহিদ হওয়ার গর্ব

পেনশন : ভারতের স্বাধীনতা

রণাঙ্গন : হিন্দুস্থান

পোস্টারটা এসেছে আমেরিকা থেকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে সেখানে বিপ্লবীরা গড়ে তুলেছেন গদর পার্টি—পোস্টারটা তাঁদেরই। এইরকম একটা সাংঘাতিক জিনিস তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গেছে! হতচকিত জানকীনাথ সব ঝালটা ঝাড়েন প্রভাবতীর ওপর। 'সুভাষকে সামলাও; নয়তো অনেক দুঃখ আছে কপালে!'

কয়েকদিন পর আর একটা খবরে কটক শহর উথালপাথাল। বিপ্লবী রাসবিহারী নাকি দুদিন কটকে ছিলেন! পুলিশ কমিশনার নাজেহাল। লাটসাহেব থেকে শুরু করে নানা মহলে কৈফিয়ত দাখিল করতে করতে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত। সারা শহরে সব জায়গায় পুলিশের খানাতল্লাশি। গিরিশ ব্যানার্জি আর তার সঙ্গীরা কটক থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

পুলিশের খোঁজখবরে আর একটা চমকে দেওয়া খবর প্রকাশ পেল। রাসবিহারীকে সাহায্য করার জন্য একটা গোপন ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই ফান্ডে কটকের অনেক ব্যবসায়ী আর সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরাও মোটা মোটা টাকা দিয়েছিলেন। গণ্যমান্যদের বাড়িতে পুলিশের আনাগোনা শুরু হয়। কোর্টে বসে এ সব শুনে জানকীনাথের মনে মনে আশঙ্কা হয়। শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ংকর খবরটা পৌঁছল তাঁর কানে। কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটার তাঁর কানে কানে খবরটা দিলেন।

'ব্যাপারটা তেমন কিছু অবশ্য নয়। একজন অভিযুক্ত তার স্বীকারোক্তিতে বলেছে যে সুভাষ নাকি ওই ফান্ডে দুশো টাকা চাঁদা দিয়েছে।'

'এখন কী হবে?' সুভাষের ভবিষ্যৎ ভেবে ঘেমে ওঠেন জানকীনাথ।

'আমরা সবাই আছি তো। কিছু একটা উপায় বের করা যাবে।' পাবলিক প্রসিকিউটার আশ্বস্ত করেন তাঁকে।

দুপুরেই বাড়ি চলে আসেন জানকীনাথ। তাঁর মুখের দিকে তাকান যাচ্ছে না। তাঁকে দেখে প্রভাবতী ভীষণ চিন্তায় পড়েন। সন্ধেবেলা জানকীনাথ সুভাষকে নিয়ে পড়েন। ধমকাধমকিতে সুভাষ স্বীকার করে টাকা দেওয়ার কথা।

'শুধু এই না, আরও কিছু করেছিস?'

'আর কিছু নয়।'

'তোর সঙ্গে রাসবিহারীর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে নাকি?'

'আমার কী আর তেমন ভাগ্য!' কিছু না ভেবেই উত্তর দেয় সুভাষ।

'সুভাষ, বাবা, ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ—জানিস তো এ কথা। বড় হ—নিজের যোগ্যতা প্রমাণ কর— তার পরে যত ইচ্ছে দেশের কাজ করিস।' বাবা ধীরে ধীরে বলেন।

'সুভাষ, মানিক আমার, এমন করিস না বাবা', মা বললেন।

'কত আশা ছিল এই ছেলের ওপর। জানো, পরশু একটা মামলার ব্যাপারে কলকাতার উকিল ভট্চাযমশায় এসেছিলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন যে কলকাতায় ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় নামে তুখোড় একটি ছেলে আছে। হাসতে হাসতে এন্ট্রান্সে ফার্স্ট হবে সে। ওর বাবাও ওর জন্য সবরকম চেষ্টা করছেন। প্রভা জানো এ কথা শুনে আমাদের বার লাইব্রেরির অন্যান্য উকিলরা কী বললেন?'

'কী?'

'আরে মশাই, লিখে রাখুন, এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি পাচ্ছে আমাদের কটকের সুভাষ বোস।' জানকীবাবুর চোখে জল আসে। 'মেরিট লিস্টের কথা ছেড়েই দিলাম। এখন তুই যদি সব বিষয়ে পাশ করে যাস, তাতেই আমি বর্তে যাব।'

সুভাষের মুখ লাল হয়ে ওঠে বাবার কথায়। অপমানিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। ঠিক সেই সময় আসেন কটক থানার থেকে একজন ইন্সপেক্টর। ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে আসছেন তিনি। জানকীবাবুকে ইন্সপেক্টর বলেন, 'ছেলেটি এখনও স্কুলে পড়ছে, তা ছাড়া আপনার ছেলে। তাই আমরা এ নিয়ে আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করছি না। তবে রায়বাহাদুরের ছেলে বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে এ ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে কিন্তু ভীষণ অস্বস্তির।'

৩

এলগিন রোডের বাড়ির বাইরে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। জানকীনাথ আর প্রভাবতী কটকে ফিরে যাচ্ছেন। সুভাষকে রেখে কটকে ফিরে যেতে পা সরে না মায়ের। 'মেজ বউমা, ছেলেটার ওপর নজর রেখ। তোমার ভরসাতেই ওকে রেখে যাচ্ছি। নইলে সুভাষ না থাকলে আমার একটুও ভাল লাগে না।'

'আমি কি বাচ্চা নাকি?' হাসতে হাসতে বলে সুভাষ। 'তোমরা তো আমি পাশ করব কি না সেই ভেবেই অস্থির হচ্ছিলে! দেখলে তো আমি পরীক্ষায় সেকেন্ড হলাম।'

মা বাবা কটকে ফিরে গেলেন। বাড়িতে থাকেন সুভাষের প্রিয় মেজদা শরৎচন্দ্র আর অন্য দুই দাদা, সতীশচন্দ্র আর সুনীল ছাড়াও থাকেন অন্যান্য অনেক আত্মীয়স্বজন। জানকীনাথের অবস্থা এখন তুঙ্গে। কলকাতায় এলগিন রোডে এই তিনতলা বাড়িটা কিনেছেন তিনি। অভিজাত এলাকা। চারপাশ উকিল, ডাক্তার, শিল্পপতি এইসব গণ্যমান্যদের বাস। এখানে বাড়ি থাকা মানে একটা বিরাট ইজ্জতের ব্যাপার।

সুভাষ পড়বে প্রেসিডেন্সি কলেজে। বাংলার তাবড় তাবড় লোকেদের বেশির ভাগ এখানেই পড়াশোনা করে পাশ করে বেরিয়েছেন। কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই সুভাষ বন্ধু হেমন্ত সরকারকে বলে, 'হেমন্ত এবার আমি দেখিয়ে দেব।'

'কী দেখাবি?'

'ফার্স্ট হওয়াটা কয়েকটা নম্বরের জন্য ফসকে গেল এবার। পরের বারে দেখিস তুই।'

'তা অবশ্য ঠিক। তুই যদি গোঁ ধরে গাছ নাড়া দিস তো গাছটাই ধরাশায়ী হবে।' স্থির বিশ্বাস হেমন্তর।

সুভাষের প্রিয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর ছেলে দিলীপকুমার রায় সুভাষের সঙ্গেই পড়ে। অবশ্য সুভাষ আর্টসের ছাত্র, দিলীপকুমার সায়েন্সের। সুভাষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ক্ষিতীশ চ্যাটার্জিও আছে। ক্ষিতীশ এন্ট্রান্সে সুভাষের চেয়ে কয়েকটা নম্বর কম পেয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে এখন দারুণ উজ্জ্বল সব ছেলেদের মেলা। সুভাষ খুশিতে ডগোমগো। তা ছাড়া সুভাষের প্রিয় সুরেশদার গোপন আস্তানা চৌরঙ্গি লেনের একটা বাড়ির ওপরের তলায়। নানান দুষ্প্রাপ্য বই, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আর ষড়যন্ত্রের খবরের ঘাঁটি সেটা। এখান থেকে মনের খোরাক পায় সুভাষ।

মেজদাকে মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হয়। মেজবউদির মুখটা বিষণ্ণ হয়ে যায় তখন। মেজদার কথা তুলে বউদিকে খেপায় সুভাষ। মোটামুটি সমবয়সি দুজন। মেজদার বিয়ের কথা উঠলেই দেওর-বউদি দুজনে হাসি সামলাতে পারে না। মা চাইতেন বউ হবে তাঁর মতো ফরসা। আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখার আগে মেয়েটিকে যাচাই করার জন্য একটা কায়দা করতেন তিনি। মেয়ে দেখার জন্য বিভাবতীদের বাড়িতে যে দিন গিয়েছিলেন তিনি, সেদিন সিল্কের পাঞ্জাবি পরে সুভাষও ছিল তাঁর সঙ্গে। আগে দে বাড়িতে না গিয়ে, মেয়েকে এক প্রতিবেশীদের বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। বেশ ভাল করে পরীক্ষা করলেন মেয়ের ফরসা রং। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখতে গেলেন মেয়েদের বাড়িতে।

কলেজ শুরু হওয়ার আগে থেকেই সুভাষকে ঘিরে একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সেকেন্ড হওয়ায় একটা পরিচিতি তো ছিলই, তা ছাড়াও তার মধ্যে ছিল একটা প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি। সবসময়েই তার আশেপাশে অনেক ছেলে জুটে যায়।

বিবেকানন্দে ডুবে থাকে সুভাষ। বন্ধুদের নিয়ে সে ধ্যান, যোগাভ্যাস, হঠযোগের ওপর যত বই প্রায় শেষ করে ফেলে। সাদা কাপড়ের ওপর কালো বৃত্ত এঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার দিকে তাকিয়ে যোগাভ্যাস করে সে। খুব ভোরে ওঠে খালি পায়ে অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে আসে। কখনও বরফ ঠান্ডা জলে চান, কখনও বা ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে মাইলের পর মাইল হাঁটা। মাছ মাংস ছেড়ে দিল হঠাৎ। দরিদ্র মানুষের মধ্যে সে নারায়ণ দেখে।

কালীঘাটে বিবেকানন্দ সমিতির বৈঠক চলছে। হঠাৎ বলে ওঠে সুভাষ, 'ক্লাসের পড়ায় কিছু হবে না, বন্ধু। সন্ধান পেতে হবে অনন্তের। এর জন্য উপযুক্ত গুরুকে খুঁজে বার করতে হবে। খাঁটি গুরু ছাড়া এই জীবনে সার্থকতা আসবে না।'

'আমিও একমত এ ব্যাপারে।' হেমন্ত সমর্থন করে সুভাষকে।

সেই বৈঠকেই ঠিক হয়ে গেল সব। শিগগিরই বেরোতে হবে গুরুর সন্ধানে। হেমন্ত রাজি হল আগে গিয়ে প্রাথমিক খবরাখবর জোগাড় করার জন্য। দিন পনেরোর মধ্যেই সে খবর পাঠাবে সাংকেতিক ভাষায়। খবর এলেই সবাই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। কাউকে না জানিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়তে হবে।

কোনও রকমে পনেরোটা দিন কাটে। হেমন্তের কাছ থেকে খবর এল, 'শিগগির এস। পথের সন্ধান পেয়েছি।' পাঁচ-ছয়জন বেরিয়ে পড়ার জন্য এক পায়ে খাড়া। কিন্তু যাওয়ার তো একটা খরচ আছে। সেটার ব্যবস্থা কী করে করা যায়? ক্ষিতীশ স্কলারশিপের টাকা পেয়েছে। সকলে

ধরে পড়ল তাকে। পয়সার ব্যবস্থা হল। কলকাতার আরামের খাঁচা ছেড়ে পাখিরা উড়ল আকাশে।

সীমা নেই অসীমের তৃষ্ণার, শেষ নেই পথ চলার। চলা আর চলা। শুরু হল অবিরাম যাত্রা। কখনও লছমনঝোলা, কখনও হরিদ্বার তো কখনও মথুরা-বৃন্দাবন। সমগ্র উত্তর ভারত চষে ফেলল তারা। মন্দির দেখা হল অনেক। দেখা হল অনেক সাধুসন্ন্যাসী, ফকির-গোঁসাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু কোথায় সেই খাঁটি গুরু? আশ্রম, গুরুকুল দেখা হল অনেক। কোথাও কমল সরোবর, কোথাও বাগানে খেলা করে হরিণ, পুচ্ছ নাচায় ময়ূর। কোথাও দেখা পাওয়া গেল কোনও মৌনীবাবার— দশ বছর যিনি কথা বলেননি। কিন্তু পথের শেষ কোথায়? কোথায় সেই কল্পনার পরশমানিক— সেই গুরু, অজ্ঞান-তিমির-বিদারী যাঁর জ্যোতির্ময় প্রকাশ?

একদিন রাতে এক ভাঙামন্দিরে শুয়ে আছে ওরা ছ'জন। প্রচণ্ড ঠান্ডায় শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ গায়ে কতকগুলো শুকনো পাতা ঝরে পড়তে ঘুম ভেঙে যায় সুভাষের। বাতাসে গাছের পাতায় সরসর করে আওয়াজ হচ্ছে। মনে হচ্ছে গাছটা যেন কাঁদছে। মায়ের কথা মনে পড়ে যায় সুভাষের আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ ভরে ওঠে জলে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে সুভাষ।

দু'মাস ধরে চলছে এই পথ চলা। যে স্বপ্ন নিয়ে অসীম সাহসে সুর বেঁধে এরা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, কাচের মতো তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। হরিদ্বারে সবাই গিয়ে সাধুদের সঙ্গে খেতে বসেছে। খিদেটা বাড়তে বাড়তে এখন একটা অসাড় ভাব। অবশ্য দু-এক গ্রাস পেটে পড়লেই আবার চনমন করে খিদেটা। ঠিক সেই সময় লম্বা দাড়িওয়ালা এক সন্ন্যাসী ধমকে উঠল, 'ওঠ তোরা। ওদিকে গিয়ে বোস।'

'কেন?'

'এটা সাধু আর ব্রাহ্মণদের জায়গা।'

'আমাদের মধ্যেও তো ব্রাহ্মণ রয়েছে।'

'কী আমার ব্রাহ্মণ রে—মচ্ছিখোর বাঙালি। ঘেন্না—ঘেন্না।' বাজখাঁই গলা সন্ন্যাসীর। 'কোথায় হরিদ্বারের ব্রাহ্মণ আর কোথায় বাঙালি বামুন! ভাগ, ওঠ এখান থেকে।'

কাশিতেও পণ্ডিতরা কুয়ো থেকে জল নিতে দেয়নি একবার। কোথায় গেল হিন্দুধর্মের সেই উদার মহিমা? কে তুলেছে এই সব বিভেদের দেওয়াল? যে মানবধর্মের সন্ধানে এই ছ'জন বেরিয়ে পড়েছিল তার একটু অস্পষ্ট আভাসও কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দেবতার নামে, ধর্মের নামে শুধু ব্যাবসা চলছে রমরমিয়ে। দেখে দেখে এদের কিশোর মন কুঁকড়ে যায় তীব্র ব্যথায়। অবশেষে রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে দেখা হল স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন সুভাষকে।

'কলকাতা থেকে এসেছ? তুমি সুভাষ, না?'

'আজ্ঞে আমি সুভাষ ঠিকই— কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?'

'আমি কলকাতা থেকেই সম্প্রতি এসেছি।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ সস্নেহে বলতে থাকেন, 'তোমাদের বাড়িতে কী হচ্ছে তার বিন্দুমাত্র আন্দাজ আছে তোমার? বেশ কিছুদিন হল তোমার মা অন্নজল ত্যাগ করেছেন। তোমার আত্মীয়রা বেলুড় থেকে শুরু করে বদ্রীনাথ পর্যন্ত সর্বত্র খুঁজছেন। তোমার মা ঠাকুরের সামনে ধরনা দিয়ে পড়ে আছেন।'

মায়ের কথা মনে পড়ে মন আকুলি-বিকুলি করে সুভাষের। আর মেজবউদির কথা কল্পনা করতেও ভয় পায় সে। সত্যি কথা বলতে গেলে বউদির সঙ্গে সে একরকম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মা কটক যাওয়ার সময় বিভাবতীর ওপরেই তার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন।

গত দু-আড়াই মাসের অবিশ্রান্ত পথচলায় সবার-ই অবস্থা কাহিল। 'যথেষ্ট হয়েছে', একদিন হেমন্ত বলল। 'চল কালই ফিরি'।

'আমি ফিরছি না' সুভাষ বলে। 'আজ পর্যন্ত যা ঘুরেছি তার পাওনা কী? কিছু একটা না পাওয়া পর্যন্ত ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরতে আমি পারব না, হেমন্ত', থেমে থেমে বলে সে।

'তুই একটা পাগল। খুঁজতে আমরা বাকি রেখেছি কিছু? আর কোথায় পাবি তুই সঠিক গুরুর সন্ধান?'

'আজ দুপুরেই খবর পেয়েছি একজনের কাছে। বদ্রীনাথের পেছনে তিনটে পাহাড় পেরোলেই এক জায়গায় এক তপস্বী থাকেন। বিরাট ঋষি তিনি।'

'তিনটে পাহাড় পেরোতে কদিন লাগবে?'

'দিন দুই হাঁটতে হবে।'

'ওরে বাবা। আমাদের দ্বারা হবে না।' সমস্বরে বলে বাকি বন্ধুরা। এই অবস্থায় দুদিন পাহাড়ে চলা শুনেই চোখ কপালে ওঠে তাদের।

শুধু সুভাষ যাবে একজন গাইড সঙ্গে নিয়ে। ভোর ভোর বেরোতে যাচ্ছে। দেখল হেমন্ত তার আগেই তৈরি। এক গাল হেসে হেমন্ত বলে, 'তোকে একলা ছেড়ে দিয়ে থাকি কী করে বল?' বন্ধুত্বের এই নিবিড় ছোঁয়ায় সুভাষের চোখ ঝাপসা।

দু'দিনের পাহাড়ি পথ শেষ হয়। এক পাহাড়ি ঝরনার ধারে সন্ন্যাসীর দেখা মেলে। চেহারা থেকে যেন জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে। হেমন্ত আগেই ক্লান্ত ছিল। ঝরনার ধারে একটা পাথরের ওপর গা এলিয়ে দেয় সে।

সন্ন্যাসী সস্নেহে দেখছিলেন সুভাষকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বুঝে নিলেন যে সুভাষ বিবেকানন্দের রচনাবলি গুলে খেয়েছে। এবার তিনিও মন খুলে কথা বলতে শুরু করলেন, 'এইভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে যাও বাবা।'

'অসম্ভব! আমি এই পাহাড়ে জঙ্গলে সাধনা করার জন্য তৈরি হয়েই এসেছি। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার আগে যদি আমার মৃত্যু হয় তো হোক। যতক্ষণ না জীবনে পরমপ্রাপ্তি ঘটে, আমি বাড়ি ফিরে যাব না।'

'বাবা, ঈশ্বর এই পাহাড়ে জঙ্গলে থাকেন না। তিনি থাকেন সবার সঙ্গে, কাজের মধ্যে।' বলতে বলতে আনমনা হয়ে যান সন্ন্যাসী, আস্তে আস্তে আবৃত্তি করতে থাকেন,

'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ খাটছে বারো মাস।
রৌদ্র-জলে আছেন সবার সাথে, ধুলা তাহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধুলার পরে।'

'গীতাঞ্জলি'র কবিতা— সুভাষের চেনা। তার মনে পড়ে 'কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।'

সন্ন্যাসী বলেন, 'নিজের সিদ্ধির মধ্যে তো সার্থকতা নেই বাবা, আছে স্বার্থপরতা। স্বামীজির কথা মনে কর, পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো—নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। সবচেয়ে বড় পাপ স্বার্থপরতা। এ দেশের ঘুমন্ত মানুষগুলোকে জাগাও, তাদের মধ্যে আলো এনে দাও, শোষণের হাত থেকে তাদের বাঁচাও...।'

সুভাষ বলে ওঠে, 'স্বামীজিকে দেখেছেন আপনি?'

'শুধু দেখেছি?' হেসে ফেলেন সন্ন্যাসী। চোখের তারায় ভেসে বেড়ায় স্মৃতি রোমন্থনে। 'তাঁর সঙ্গেই কেটেছে আমার সমস্ত যুবকবেলা; তাঁর কথা শুনে, তাঁর লেখা পড়ে। কিন্তু তাঁর দেখানো পথে যাওয়ার শক্তি আমার মধ্যে ছিল না। তাই সারা গায়ে ছাই মেখে চোরের মতো এই সুদূর পাহাড়ে পালিয়ে এসেছি।'

সুভাষ স্তম্ভিত। সন্ন্যাসী বলেন, 'এই ভারতভূমিতে কত ঋষি মহাঋষি আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ এই যুগের একমাত্র সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বর্তমান জগতে ভারতের স্থানটা কোথায়। ঢাকায় তাঁর একটা সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই সভায় দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, সবার আগে চাই দেশের স্বাধীনতা।'

সুভাষ বলে ওঠে, 'এ কথা তো কংগ্রেসও বলে।'

'না বাবা। কংগ্রেসের মতবাদের থেকে স্বামীজির কথা অনেক বেশি শক্তিমন্ত। তাই তো স্বামীজির আশেপাশে পুলিশের গুপ্তচররা সব সময় ঘুরঘুর করত।'

'ওরা তবে স্বামীজিকে আটক করেনি কেন?'

'সাহস হয়নি। আমেরিকায় ধর্মসংসদের পর স্বামীজির জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। ব্রিটিশ জানত তাঁকে গ্রেফতার করলে, সারা দেশ বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মতো তাদের ওপর আছড়ে পড়বে। তাই বিবেকানন্দের কথাগুলো তেতো বড়ির মতো গিলে ফেলা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না।'

সুভাষ এক মনে শুনতে থাকে সন্ন্যাসীর কথা। তার একাগ্রতা লক্ষ করে সন্ন্যাসী বলেন, 'তোমাদের মতো তরুণদের ওপরই স্বামীজির সবচেয়ে বেশি ভরসা ছিল। ধর্মসম্মেলন থেকে ফিরে এসে কলকাতায় এক সভায় বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, বাঙালির দ্বারাই এ কাজ হবে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'— কলকাতার যুবকরা ওঠো জাগো। মাতৃভূমি তোমাদের কাছ থেকে মহাবলি প্রার্থনা করছে, 'যুবকেরাই পারবে এ কাজ করতে। আমি নিশ্চিত, বাঙালি যুবকদের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াবে শত শত বীর।' আর এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন, 'যেদিন আমাদের যুবকেরা তাদের মধ্যে যে শক্তি আছে সেটা উপলব্ধি করবে সেইদিন এই বিদেশিদের লেবুর মতো চটকে ফেলে দেবে।'

মুগ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীর কথা শুনতে থাকে সুভাষ। সন্ন্যাসীর কথায় বিবেকানন্দের ভাবনার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হয় তার। সোনালি সূর্যের আলোয় মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কুয়াশা মিলিয়ে যেতে থাকে। সন্ন্যাসী বলে চলেন, 'বাবা তোমার মুখে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমার মনের সত্যিকার গতিপ্রকৃতি। তোমার মধ্যে আছে দেশের প্রতি অগাধ ভালবাসা। তাকেই তুমি আরও জাগিয়ে তোল। দেশের কল্যাণই হোক তোমার জপের বীজমন্ত্র। তোমার মধ্যে যে বিরাট শক্তি আছে তাকে কাজে লাগাও। তুমি ঘরে ফিরে যাও, সুভাষ। তোমাকে এই দুর্ভাগা দেশের বড় প্রয়োজন।'

স্তম্ভিত সুভাষ জিজ্ঞেস করে, 'স্বামীজি, আপনার নাম?'

স্মিতহাস্যে জবাব দেন সন্ন্যাসী, 'কী হবে আমার নাম দিয়ে? আমি যা পারিনি, আমার গুরুর যে মন্ত্র আমি কাজে লাগাতে পারিনি, সেই মন্ত্র আমি আজ তোমাকে দিলাম। তুমি পারবে সুভাষ সে মন্ত্রকে কাজে লাগাতে। যাও সুভাষ, সেই মহামন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর।'

কখন রাত কেটে গেছে টের পাওয়া যায়নি। সকালে উঠে সুভাষ দেখে গাছ থেকে ঝরে পড়া ফুলে তার শরীর ঢাকা। হেমন্তকে জাগিয়ে তোলে সে। 'চল, হেমন্ত, যাওয়া যাক।'

'কোথায়?'

'কলকাতায়। আমার সাধনার জায়গা অরণ্য নয়। জীবনের রণাঙ্গন।'

একদিন সকাল সুভাষ এসে পৌঁছল এলগিন রোডের বাড়িতে। তাকে দেখে হইচই বাঁধিয়ে দেন তার সত্যেন মামা। 'সুভাষ' এই কথাটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানার সঙ্গে মিশে যাওয়া প্রভাবতী যেন বিদ্যুতের ঝটকা খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দৌড়ে বাইরে এসে সিঁড়ির ওপরই সুভাষকে বুকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। গায়ে মাথায় হাত বুলোন। তারপর একছুটে ঠাকুরঘরে গিয়ে মা দুর্গার কাছে মাথা ঠেকিয়ে বসে থাকেন।

বাবা নিজের ঘরে বসে। তাঁকে দেখে সুভাষ চমকে ওঠে। মনে হয়, তিনি যেন অনেককাল এইভাবে চেয়ারে বসে আছেন। চোখ দুটো লাল— চোখের নীচে কালি। এমনিতে দৃঢ়মনের মানুষ বাবা। কিন্তু এখন আর সামলাতে পারছেন না নিজেকে। সুভাষকে কাছে ডেকে কেঁদে ফেলেন তিনি। চোখের জল আর থামে না।

'আমাকে ক্ষমা করে দাও বাবা। যা খুশি শাস্তি দাও, কিন্তু এভাবে কেঁদ না,' সুভাষ বলে।

সুভাষ মেজবউদির ঘরে যায়। ছাদের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলছেন বিভাবতী। অবিরল সে অশ্রুধারা। সুভাষ তাঁর হাত দুটো হাতে তুলে নেয়। 'আমাকে ক্ষমা কর বউদি। শুধু শুধু তোমাকে কষ্ট দিলাম।'

'যেতে দাও ঠাকুরপো। তুমি ফিরে এসেছ এতেই আমাদের সব পাওয়া হয়ে গেছে।' সুভাষের আর নিজের চোখ মোছেন বিভাবতী। ঠিক এই সময় ঠাকুরঘর থেকে সেখানে এলেন মা। সুভাষের হাত ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেলেন ঠাকুরঘরে। ঠাকুরের পায়ের ফুল ঠেকান তিনি সুভাষের মাথায়। কান্নাভেজা গলায় বলেন, 'পাখির কাছে তার সব বাচ্চাই সমান। তবু ঠাকুরের সামনে মিথ্যে বলতে নেই। আমার কাছে তুই-ই সবচেয়ে আদরের ধন। আমার প্রাণ যায় যাক, তবু তোকে হারাতে আমি পারব না।'

বাড়ির সবাই ঠাকুরঘরে এসে জড়ো হয়েছে। মা আবার সুভাষের হাত টেনে নিয়ে বলে ওঠেন, 'মা দুর্গার নামে প্রতিজ্ঞা কর, দেবতার নামে শপথ কর...'

সুভাষ আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকায়। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মা আমার কাছে তুমি-ই সত্যিকারের ঠাকুর। তোমার কাছে শপথ, আমার কাছে দেবতার নামে শপথের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি।'

'মিথ্যেবাদী কোথাকার!' দুঃখের মধ্যে হেসে ফেলেন মা। সুভাষের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আপন মনেই বলেন, 'জানি বাবা, তোর মধ্যে আগুন আছে। তাই তো তোর ওপর কোনও ভরসা নেই। একদিন এমন দাগা দিবি যে জন্মভোর চোখের জল আর শুকোবে না।'

মেজদাকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। একসময় মহানন্দার ধারে বসে সতীশ আর শরৎ শেকসপিয়রের নাটক পড়তেন। কাছে বসে শুনত ছোট্ট সুভাষ। কে ভাবতে পেরেছিল বড় হয়ে সে এমন সাংঘাতিক হয়ে উঠবে। আর লড়তে যাচ্ছে কার সঙ্গে? খোদ ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থে ঘা দিলে ফলটা কী হবে? সুভাষ নিজের দলবল নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ধর্মঘট ডেকেছে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ব্রিটিশের গর্ব। বেশির ভাগ অধ্যাপকই ইংরেজ। সরকারের খাস কলেজ।

ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বিভাবতীর ওপর ফেটে পড়েন শরৎ।

'তোমার আশকারাতেই এত বাড় বেড়েছে সুভাষের। জানো, কলেজের এই ধর্মঘট সারা শহরে হইচই ফেলে দিয়েছে। সব জায়গায় শুধু এই আলোচনা। গভর্নরের কাছে অনবরত ফোন যাচ্ছে।'

'বেশ তো! বাড়ি আসুক, তার পরে বেশ করে ধমকে দাও না তুমি।'

'একবার বাড়ি আসুক না। টের পাবে আজকে।' মেজদা একেবারে আগুন। সন্ধে হল। ঘরের পেছনের বাগান অন্ধকার। বাড়িতে ঝড়ের আগেকার স্তব্ধতা। বাড়ির কাজের লোকেরাও সবাই চুপচাপ। নীচে শরৎবাবুর কাছারি ঘরেও ফিসফিস কথাবার্তা।

রাত্রি ন'টা বাজল। সুভাষের সঙ্গীসাথিরা গেট পর্যন্ত সুভাষকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুভাষ বাড়ির অস্বাভাবিক স্তব্ধতা খেয়াল করল। খাওয়ার টেবিলে এসে বসলে বিভাবতী ভাতের থালা এগিয়ে দিলেন সামনে। বিভাবতীর নজর দরজার দিকে। এই বোধহয় শরৎবাবু এসে পড়েন। আসছে, আসছে করে বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর, শোবার ঘরে গেলেন তিনি। শরৎবাবু বইয়ে মুখ গুঁজে বসে রয়েছেন।

'কী? বসে রয়েছ যে? সুভাষকে কী সব মজা টের পাওয়াবে বলছিলে যে?'

'যা কিছু জিজ্ঞেস করার তুমি জিজ্ঞেস কর গিয়ে। ও এখনও ছোটটি আছে না কি?'

'সেকি তখন যে বাড়ি মাথায় তুলছিলে, যা মুখে আসে বলছিলে, সে সব এখন কোথায় গেল?' বিভাবতী বলে ওঠেন। হাসি সামলাতে বিভাবতীর মুখে আঁচল।

শরৎবাবু অপ্রস্তুত। গলাতে কেমন একটা অসহায়তার সুর। 'কী করব বিভা, ও যদি একটু হাসে তা হলেই আমার সব রাগ জল হয়ে যায়। সুভাষের ওপর রাগারাগি করা আমার দ্বারা হয় না। তোমরা এ নিয়ে যত ঠাট্টাই কর, পেরে উঠি না যে।'

'এমন দাদা কখনও দেখিনি! দাদা বটে!' হেসে ওঠেন বিভাবতী।

কিন্তু ব্যাপারটা বেশ চিন্তার। ভালমন্দ যদি কিছু একটা হয়ে যায় মা-বাবার কাছে কী জবাব দেবেন তাঁরা? লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে যে। গত্যন্তর না দেখে বিভাবতী সুভাষের কাছে এসে বসলেন।

'ঠাকুরপো, কলেজে নাকি কী সব হয়েছে?'

'ব্রিটিশগুলোর বদমায়েশি বউদি। আমাদের যেন কোনও আত্মসম্মানই নেই।' সুভাষের গলা বেশ চড়া।

'তো হয়েছেটা কী?'

'জানো বউদি। আমাদের ইতিহাস যিনি পড়ান, সেই ওটেনসাহেব উঠতে বসতে আমাদের, নেতাদের টিটকিরি দিয়ে কথা বলেন। তাঁতিয়া টোপি, রানি লক্ষ্মীবাই সবাই নাকি ভীষণ খারাপ লোক ছিলেন। ভারতীয়রা সব তার কাছে বর্বর, কালা আদমি। এঁরা সব গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, আমাদের উদ্ধার করতে এসেছেন। ওদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সবই মহান! রোজ এসব শুনতে হয়। কাঁহাতক আর চুপ করে শোনা যায় বল?' বলতে বলতে খাওয়া বন্ধ সুভাষের।

বিভাবতী বলেন, 'তা তোমরা প্রিন্সিপালকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বল না।'

'প্রিন্সিপাল জেমস সাহেবও তো ওদেরই একজন। তিনি বলেন, আগে আমাদের ওটেনসাহেবের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'

'তাতে কী হয়েছে? তোমরা ছাত্র, তিনি গুরু।'

'ছাত্র বলে আমরা কী জানোয়ার নাকি? হুঁ! বলে কিনা ক্ষমা চাইতে হবে! বা রে বা!' বলতে বলতে সুভাষের মুখ রাগে লাল।

পরের দিন প্রেসিডেন্সি কলেজে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ক্লাস ঘরগুলো সুনসান। খালি ঘর, শূন্য বারান্দা দেখে প্রিন্সিপাল জেমসের মাথায় আগুন জ্বলে। কলেজের বাইরে ভিড় বেড়েই চলেছে। কলেজের এতদিনের প্রতিষ্ঠা, ইজ্জত সব একেবারে ধুলোয় মিশে গেল!

দুপুরে প্রিন্সিপাল মৌলবিসাহেবকে ডেকে পাঠালেন। 'অন্তত আপনার মুসলিম ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করুন। এই সব বখে যাওয়া হিন্দু ছেলেদের পাল্লায় পড়ে তারা কেন ভবিষ্যৎ খোয়াচ্ছে?'

মৌলবিসাহেবের হাজার চেষ্টাতেও একটিও মুসলমান ছাত্র কলেজের মধ্যে পা রাখল না। সুভাষ আর তার সঙ্গীসাথিরা প্রায়ই মুসলমান এলাকায় যেত। কাবাব, বিরিয়ানি, মোগলাই খানা খাওয়া শুধু নয়, সেখানকার পির-দরবেশদের মাজার-দরগার 'উরস'-এ, মিলাদ শরিফে যোগ দিত। মুসলমান ছেলেদের কাছে সুভাষ তাই খুব প্রিয়।

বাধ্য হয়ে প্রিন্সিপাল একটু নরম হলেন। ছাত্রদের প্রতিনিধি, ওটেনসাহেব আর প্রিন্সিপালের মধ্যে বৈঠক হল। 'যা হয়েছে, হয়েছে, আর নয়—' গোছের একটা বোঝাপড়া হল। ওটেনসাহেব কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্র নন। ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার জন্য প্রতিটি ছাত্রের পাঁচ টাকা জরিমানা ধার্য হল। তখনকার দিনে পাঁচ টাকায় কলকাতা থেকে বোম্বাই রেলগাড়িতে যাওয়া যেত। এক টাকাই ছাত্রদের পক্ষে অনেক। প্রিন্সিপালের কাছে দরবার করেও ফল হল না।

ওটেনসাহেব ক্লাস নিচ্ছেন। ক্লাস ঘরের বাইরে ছাত্রদের আনাগোনা। হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সাহেবের। গটগট করে বাইরে এসে সামনে যাকে পেলেন তার কলার ধরে হুঙ্কার দিলেন, 'ইউ অল ব্লাডি রাস্কেলস!' চোখা চোখা গালাগালির ফোয়ারা ছোটে তার মুখে। প্রিন্সিপালের কাছে আবার নালিশ গেল। ফল পূর্ববৎ। ভারতের সংস্কৃতি, ভারতীয় নেতাদের সম্বন্ধে ওটেনসাহেবের টিটকিরি, ঠাট্টা ক্রমাগত বাড়ে আর সেই সঙ্গে বাড়ে ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন।

'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মানে হচ্ছে কতকগুলো ধর্মের ষাঁড়ের মাতামাতি। এর কোনও ভবিষ্যৎ নেই।' ক্লাসে একদিন বলে বসেন ওটেনসাহেব।

'স্যার, আপনার মন্তব্য প্রত্যাহার করুন।' একটি ছাত্র বলে ওঠে।

'আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে।' অন্য একদল চিৎকার করতে থাকে।

'আমি যা বলেছি সেটা আজকের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে। চুপ করে শোন। হল্লা বন্ধ কর।' ওটেন ধমকে ওঠেন।

'স্যার, আগে আপনি ক্ষমা চান।'

'কীসের জন্যে মাপ চাইতে হবে আমাকে? এমন ছাত্রদের আমার কোনও দরকার নেই।' রাগে গরগর করতে করতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। প্রতিবাদে সারা ক্লাসও বেরিয়ে আসে। ছাত্রদের উত্তেজনা চরমে। ক্ষিতীশ, সুভাষ, হেমন্ত—আরও অনেকে মিলে ঠিক হল ওটেনসাহেবকে এবার উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

একদিন সকালে ওটেন আর একটি ছাত্রের গায়ে হাত তুললেন। সারা কলেজে ছড়িয়ে পড়ল সে খবর। দুপুরে ওটেনসাহেব নীচের বারান্দায় এসে নোটিসবোর্ডে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি সাঁটছিলেন। ঠিক তখনই দশ-বারোজন ছাত্র চড়াও হয় তাঁর ওপর। কেউ পেছন থেকে, কেউ সামনে থেকে ধাক্কা দিতে থাকে তাঁকে। মাটিতে পড়ে যান ওটেন। তাঁর চশমা ভাঙে, পোশাক ছিঁড়ে যায়। দশ-বারো হাত দূরে দাঁড়ানো সুভাষের চোখের সামনেই ঘটে এসব।

ঘটনামাত্র এক-দেড় মিনিটের। ফল হল সুদূরপ্রসারী। ওটেন ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের লোক। তার ওপর নির্ভেজাল ইংরেজ। প্রেসিডেন্সি খাস সরকারি কলেজ। রাইটার্স বিল্ডিং-এর

কর্তাব্যক্তিদের টনক ভালভাবেই নড়ল। প্রেসিডেন্সি কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল।

'ইংরেজ অধ্যাপক ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা নির্মমভাবে প্রহৃত'— স্টেটসম্যানে বিরাট হেডিং পড়ে জানকীনাথ দিশাহারা। প্রভাবতীকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন তিনি। দুজনের কারও চোখে ঘুম নেই। জড়িত ছাত্রদের নামের তালিকায় সবার আগে সুভাষের নাম। কী হবে এবার সুভাষের? ইংরেজ প্রশাসন ঘটনার শিকড় পর্যন্ত উপড়ে না ফেলে থামবে না।

সুভাষের ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, জানকীনাথের কাছে অজানা নয় সেটা। কী করে বোঝাবেন তিনি সুভাষকে? জানকীবাবুর বয়স এখন অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়েছে। উদয়ের পথের যাত্রী সুভাষকে বোঝাবার ভাষা তাঁর কোথায়? কলেজের বংশীধর দারোয়ান বলেছে, ঘটনার জায়গায় সে সুভাষকে দেখেছে। সবাই বিশ্বাস করে, এ ব্যাপারে সুভাষের হাত আছে।

'সত্যি করে বল সুভাষ, তুই ওটেনকে মেরেছিস?'

'না!' জবাব দেয় সুভাষ।

'তা হলে?'

'ঘটনাটা আমার সামনে ঘটেছে, এই মাত্র।' শান্তস্বরে জবাব দেয় সুভাষ।

'সুভাষ তুই একজন ছাত্র। তোর এক শিক্ষকের গায়ে তোর সামনে কেউ যদি হাত দেয় তাকে আটকানো তোর কর্তব্য নয়? ওদের না ঠেকিয়ে অন্যায় করেছিস তুই।'

'মানলাম সে কথা। কিন্তু অন্যের সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে সম্মান দিতে ওটেনসাহেব আদৌ জানেন না।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জানকীবাবু আবার বলেন, 'তুই ঠিক বলছিস? তুই নিজে ওটেনের গায়ে হাত দিসনি?'

'আমি মারলে পেছন থেকে নয়, সামনে থেকে মারতাম।' ফোঁস করে ওঠে সুভাষ।

'সুভাষ, ক্ষমতা আর ন্যায়-অন্যায় বোধ— এ দুটোকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। মুশকিল হচ্ছে যে ক্ষমতার সঙ্গে লড়াই করে বুদ্ধি পেরে ওঠে না।' জানকীবাবু যেন কেমন কেমন গলায় বলেন।

কয়েকদিন পর কলেজ আবার খুলল। সবাই খুশি। কিন্তু প্রথম দিনেই প্রিন্সিপাল সুভাষকে ডেকে পাঠালেন। হাতের চুরুট পাশে রেখে, দাঁত চেপে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তটি শোনালেন— 'সুভাষ, তুমি এই কলেজের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক ছাত্র। তাই তোমাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হল।'

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ওপর ব্রিটিশের রাগ। 'অনুশীলন' আর 'যুগান্তর' সমিতির অনেক বিপ্লবী এখানেই পড়াশোনা করেছেন। সরকারের জানা ছিল সে সব খবর। তা ছাড়া স্টেটসম্যান-এর মতো কাগজগুলো তো আগুনে ঘি ঢালার জন্য মুখিয়েই আছে। ইডেন হিন্দু হোস্টেলে বহুবার হানা দিয়েছে পুলিশ। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনা যেন ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতের লড়াই।

কলেজ থেকে বহিষ্কৃত সুভাষকে এবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তাড়ান হবে কি না, সেটার সিদ্ধান্ত নেবে তদন্ত কমিটি। যে দিন তদন্ত কমিটির বৈঠক বসবে তার আগের দিন রাত্রে বসুবাড়ির কারও চোখে ঘুম নেই। সুভাষের দেশপ্রেম, বুদ্ধির দীপ্তিতে বুক ভরে যায় জানকীনাথের। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ কী?

তদন্ত কমিটির অধ্যক্ষ স্যার আশুতোষ মুখার্জি শরৎচন্দ্রের খুবই পরিচিত। কিন্তু তাই বলে

তাঁকে কিছু বলা শরৎচন্দ্রের নীতিতে বাধে। দুজনেরই পরিচিত অন্য একজন আশুবাবুর কাছে নিজেই গেলেন। 'একটা ছেলেমানুষ ছাত্রের সঙ্গে সরকারের এইভাবে টক্কর দেওয়াটা কী ভাল দেখাচ্ছে? যদি একটা ভুল করেই থাকে তার শাস্তি কী ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে দেওয়া।' আশুতোষ পরামর্শ দেন, 'সুভাষ দুঃখ প্রকাশ করুক। আমার ধারণা তাতেই মিটে যাবে ব্যাপারটা।'

'দুঃখ প্রকাশ' করার ব্যাপারটা সুভাষকে বলে কে? শেষ পর্যন্ত ছোটভাই সন্তোষ বলে ফেলে, 'দাদা দুঃখ-প্রকাশ করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেল।'

'দুঃখ প্রকাশ মানে তো ক্ষমা প্রার্থনা।' সুভাষ খাপ্পা।

মা আর থাকতে পারলেন না। 'বাবা, বুঝছিস না কেন? দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেই যদি এত বড় বিপদটা কেটে যায় তা হলে বলেই দে না বাবা।' বলে ওঠেন তিনি।

'মা ক্ষমা কখন লোকে চায়? যখন সে কোনও অন্যায় করে। কী অন্যায় করেছি আমি? ওটেনকে কী আমি নিজে মেরেছি? ওটা ছিল অন্য ছাত্রদের রাগের একটা বহিঃপ্রকাশ। তা ছাড়া আমারও মনে হয় ঠিকই করেছে তারা। অন্যায় করিনি তবু ক্ষমা চাইতে হবে? তুমিও এই কথা বলছ মা? এটা কী তোমার মনের কথা?' সুভাষ মায়ের হাত দুটো ধরে জিজ্ঞেস করে আকুল হয়ে। মা নীরব।

একসময় রাত পোহাল। সুভাষ তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হল। টেবিলের ওপাশে বসে আছেন তদন্ত কমিটির সদস্যরা। স্যার আশুতোষ ছাড়াও কমিটিতে আছেন শিক্ষা অধিকর্তা হর্নেল সাহেব, বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ন কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড মিচেল, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস সাহেবকেও কমিটির সভ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তদন্ত বয়কট করায় তাঁর জায়গায় এসেছেন অধ্যাপক পিক। এ ছাড়া ছিলেন মিস্টার আর. বি. স্টিলি, আই সি এস। তিনিই কমিটির সেক্রেটারি।

মামলা সহজ নয়। শিক্ষায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ আর বাংলায় ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী মতবাদের পটভূমিকায় সারা দেশ এই তদন্তের ফলাফলের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। শুরুতে স্যার আশুতোষ তাঁর ভূমিকায় সুভাষের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এইবার জিজ্ঞাসাবাদের পালা শুরু হল। হর্নেল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটেনের গায়ে কে হাত তুলেছিল?'

'আমি নই।'

'তো কে সে?'

'তাও আমি বলতে পারি না।'

'বলতে পারবে না, না বলতে চাইছ না?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন হর্নেলের।

সুভাষ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে। ভাবটা, 'আপনাদের যেটা ইচ্ছে বুঝে নিন।' সুভাষের কোনও বৈলক্ষণ্য নেই বরঞ্চ সদস্যেরাই উদ্বিগ্ন। একটা শিক্ষিত, অভিজাত পরিবারের ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে এ চিন্তা তাঁদের মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তাঁরা চান তদন্ত শেষ হলে সুভাষ যেন কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এবার একটি সহজ প্রশ্ন করা হল তাকে।

'দেখ বোস, কারা এই কাজ করেছে না বলতে চাও বোল না। কিন্তু কাজটা যে খারাপ হয়েছে সেটা তো মানো তুমি?'

'একদমই না।'

'সে কী? কাজটা খারাপ হয়নি?'

'ছাত্ররাও মানুষ—গোরু ভেড়া তো নয়। আপনাদের মতো এত বড় বড় মানুষ এই কথাটা কেন বুঝেছেন না?' সুভাষের স্বরে অদ্ভুত এক আকুতি।

তদন্ত কমিটির সদস্যেরা স্তম্ভিত। ক্ষমা প্রার্থনা তো দূরস্থান সামান্য অনুশোচনারও কোনও লক্ষণ নেই। একজন ছাত্র, যত উজ্জ্বলই হোক, যত অভিজাতবংশের ছেলেই হোক— যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে। সুভাষ বাইরে যেতেই বাকি সদস্যরা স্যার আশুতোষের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁর সেই বিখ্যাত গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে স্যার আশুতোষ শুধু বললেন, প্রত্যেক সদস্য যেন তাঁদের বক্তব্য লিখিতভাবে দিয়ে দেন।

ট্রেন ছুটে চলেছে, কটকের দিকে। নীচের বার্থের একটাতে জানকীনাথ অন্যটাতে প্রভাবতী শুয়ে। কালো ধোঁয়া উড়িয়ে হুইসল বাজিয়ে ছুটে চলে ট্রেন। চাকার ঘষটানিতে লাইন থেকে ঝলসাচ্ছে আগুনের ফুলকি।

যা হবার হয়ে গেল। সরকার ইডেন হোস্টেল বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কলেজ থেকে সুভাষকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বহিষ্কৃত ছাত্রকে অন্য কোনও কলেজ নেবে এ সম্ভাবনাও নেই। শহর অশান্ত। তাই বাবা-মা সুভাষকে কটকে নিয়ে যাচ্ছেন।

জানলার ধারে সুভাষ ঠায় বসে। ঘুম আসছে না। এক একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায় আর ঘুমন্ত প্ল্যাটফর্ম জেগে ওঠে। আবার হুইসল। শেকড় ছেঁড়া গাছের মতো অবস্থা সুভাষের। হতাশা নয়, তবে মনের মধ্যে অবিশ্রান্ত পাক খাচ্ছে নানান চিন্তা।

জানকীনাথের অর্থ সাহায্যে অনেক ছাত্রই পড়াশুনো করে। অন্যের ছেলেদের পড়ার ব্যবস্থা করছেন তিনি আর নিজের ছেলেরই পড়া বন্ধ হয়ে গেল। জানকীনাথের বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করে।

অনেকক্ষণ পরে প্রভাবতীর ঘুম ভাঙে। সুভাষকে কাছে টেনে নিয়ে গায়ে হাত বুলোতে থাকেন তিনি। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেন, 'ঘুমোচ্ছিস না যে বাবা। কী ভাবছিস?'

'মা আমার জীবনের গাড়ি এবার কোন স্টেশনে দাঁড়াবে সেটাই ভাবছিলাম।' সুভাষ বলে। 'ইংরেজ জাতটার উপর আমার বিদ্বেষ নেই মা— কাউকে আমি ঘেন্নাও করি না। কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো। একদিন আমার জুতো কোনও না কোনও ইংরেজ পালিশ করবে আর আমি দেখব সেটা।'

'ইংরেজদের ওপর এত আক্রোশ কেন বাবা?'

'মা এই প্রশ্নটা আমাকে জিজ্ঞেস না করে প্রায় দুশো বছরের গোলামির জাঁতাকলে পিষে যেতে থাকা আমার দীনদুখিনী, অভাগী মাতৃভূমিকে জিজ্ঞেস কর—উত্তর পাবে।'

ট্রেনের হুইসল বাজে।

৫

'বি এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড? বাঃ বাঃ? তোমার নামটা কী?' সামনের কাগজটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'বোস?'

'বোস?' হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে ওঠেন স্যার আশুতোষ। চশমার কাচ মুছে ভাল করে তাকিয়ে দেখেন। 'তুমি সুভাষ? জানকী বোসের ছেলে?'

'আজ্ঞে।'

স্যার আশুতোষের বয়স হয়েছে। বাংলার বাঘের সেই বিখ্যাত গোঁফে সাদার ছিটে লেগেছে। সুভাষকে চিনতে পেরে সেই বাঘের চোখ দুটো খুশিতে ঝকঝক। হইচই করে বাড়ির ভেতর থেকে সবাইকে ডাকাডাকি করে বাইরে আনলেন। কী সাংঘাতিক ছেলে দেখ! কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর— দুটো বছর কলেজে পড়েনি—তারপরে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (এখনকার স্কটিশ চার্চ) ভরতি হতে পারল। সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষা দিয়ে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। একটুর জন্য সেকেন্ড। ছেলে বটে একটা। স্যার আশুতোষের হই হই আর হাসিতে বাড়ি ফেটে পড়ে।

খুশিমনে স্যার আশুতোষের বাড়ি থেকে হেমন্ত আর সুভাষ বেরিয়ে আসে। গরম পড়তে শুরু করেছে। শুধু প্রাকৃতিক গরম নয় দেশের রাজনীতিতেও আগুনের হলকা। একটার পর একটা, ঘটনায় কলকাতা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

অগ্নিগর্ভ ১৯১৯। কয়েকদিন আগেই রাউলাট বিল পাশ হয়ে গেছে আইনসভায়। সরকারের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা। যখন তখন যে-কোনও লোককে পাকড়াও করে যতদিন খুশি আটকে রাখা যাবে। এই কালা কানুনের প্রতিবাদে গাঁধীজি ভারতব্যাপী হরতালের ডাক দিয়েছিলেন। অবিরাম কর্মচঞ্চল, মুখর কলকাতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। রাস্তা ফাঁকা। গাড়ি-ঘোড়া চলেনি। বাজার-দোকান, কোর্ট-কাছারি সব বন্ধ। হাওড়া স্টেশন দিনের বেলাতেই সুনসান। গঙ্গার বুকে নৌকা পর্যন্ত চলেনি।

জানকীনাথ কাজের ব্যাপারে কটক থেকে কলকাতা এসেছেন। সুভাষের পরীক্ষার ফলে তিনি খুশি। কিন্তু এরকম রেজাল্টে যতটা আশা করেছিল সুভাষ ততটা উচ্ছ্বসিত নন তিনি। মেজদাও কেমন যেন আনমনা। সুভাষ লক্ষ করেছে রাত বারোটা পর্যন্ত দুজনের মধ্যে কি সব আলাপ-আলোচনা চলে। দুজনেরই মনের ওপর যেন কীসের একটা চাপ রয়েছে। রোজ রাত্রে মাথায় হাত দিয়ে কীসের এত চিন্তা সুভাষ তার হদিশ পায় না। একদিন সুভাষের ফিরতে বেশ দেরি হয়েছে— মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে জানকীবাবু আর শরৎচন্দ্র চাপাস্বরে কী সব আলোচনা করছেন। মধ্যরাতের নিস্তব্ধতায় আস্তে আস্তে বলা কথাও কানে আসে সুভাষের।

'মড়াকে চাপা দিলে কী হবে। গন্ধ তো ছড়াবেই।' মেজদা বলছিলেন।

'খবরের কাগজগুলোকে একেবারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হয়েছে। নয়তো পঞ্জাবের আসল খবর বেরিয়ে পড়ত।' বাবা বললেন।

'কাল দাদা বলছিল পঞ্জাবে মার্শাল ল জারি করা হয়েছে। গাঁধীজিকে আটক করা হয়েছে। কলকাতাতেও ধরপাকড় চলছে।' মেজদা বললেন।

'শরৎ, পঞ্জাবে দামামা বাজলে বাংলায় তার আওয়াজ উঠবেই। আবার বাংলা যেই হাঁক মারবে মহারাষ্ট্রে আগুন জ্বলবে—এটা ধরে নিতে পার। আর এই তিন জায়গায় যদি আগুন জ্বলে, সারা হিন্দুস্থান তা হলে অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠবে। লাল-বাল-পাল, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র আর বাংলার সম্পর্কটা বেশ ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।' বাবার আওয়াজ পাওয়া গেল।

'এই পরিস্থিতিতে সুভাষকে এখানে রাখা মানে, বারুদের স্তূপের পাশে আগুন রেখে দেওয়া।' মেজদার মন্তব্য শোনা গেল।

পরের দিন সন্ধেবেলা মা, বাবা আর মেজদার বৈঠক চলছিল। চৌধুরীবাবু তাকে ডাকতে এলে সুভাষ বেশ হকচকিয়ে গেল। ব্যাপারটা কী? নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। সুভাষ ঘরে ঢুকল। সবাই চুপচাপ। কেউই আর কথাটা পাড়ছেন না। অবশেষে সুভাষই আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে বাবা? আমি কী কিছু ভুল করে ফেলেছি।'

'না বাবা। ভুল তুই করিসনি। বরঞ্চ তোর ক্ষমতা সম্বন্ধে বুঝতে আমরাই ভুল করেছিলাম।' বলতে বলতে চোখে জল আসে জানকীবাবুর। ধুতির খুঁটে চোখ মুছে বলতে থাকেন তিনি, 'এত কাণ্ড হয়ে যাবার পরও গোঁ ধরে যেভাবে তুই রেজাল্ট দেখিয়ে দিলি, তাতে আমাদের বুক দশ হাত হয়ে গেছে।' আর বলতে পারেন না বাবা।

এবার মেজদা শুরু করেন। সুভাষের হাত দুটো ধরে শরৎ বলেন, 'বাবা চান তুই বিলেতে গিয়ে আই সি এস পরীক্ষা দে।'

চমকে ওঠে সুভাষ। আই সি এস— অসম্ভব কঠিন পরীক্ষা। আই সি এস পাশ করার জন্য ভারত কেন ইংল্যান্ডের ছেলেরাও কোমর বেঁধে, আদাজল খেয়ে লেগে যায়। পড়তে পড়তে নাকি হাড় কালি হয়ে যায়। আই সি এস-এর কষ্টিপাথরে নিজেদের যাচাই করার জন্য দিলীপকুমার রায় আর ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ছেলেরা আগেই ইংল্যান্ডে গেছে। সেই আই সি এস? সুভাষের ভাব দেখে মেজদা আদর করে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বলেন, 'একবার ওই তিনটি অক্ষরে ছাপ পড়ুক না তোর পিঠে, ব্যস! তারপরে দেখবি রাতারাতি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ তোর হাতে। এই ছাপটা লেগে গেলে একেবারে হতদরিদ্র বাড়ির ছেলের দরজাতেও রাজা মহারাজা, আমির ওমরাহ সব কনের বাপ একেবারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।' পরিস্থিতিটা একটু হালকা করার জন্য মজা করেন শরৎ।

'সুভাষ, আমাদের বাড়িতে তুই আর শরৎ ছাড়া এটা আর কেউ পারবে না। শরতের তো আর বয়স নেই। বাকি রইলি তুই। এ সম্মান শুধু তুইই নিয়ে আসতে পারিস বাবা।' আস্তে আস্তে বলেন বাবা। 'সময় বেশি নেই হাতে। তুই বিলেত যাবি কি না কালকের মধ্যে ঠিক করে বল।'

মা বললেন, 'সুভাষ আজ পর্যন্ত তোর কাছে কিছু চাইনি বাবা। আজ চাইছি। আমার বড় সাধ, তুই আই সি এস পরীক্ষায় পাশ কর।'

সুভাষের মন অস্থির। আই সি এস-দের সম্মান, ইজ্জত, ক্ষমতার কথা কে না জানে? নিজের দেখা আই সি এস-দের দাপটের নানা ছবি তার চোখে ভাসে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ভেবে চলেছে সুভাষ। মেজদা এলেন ঘরে। এ সুযোগ যাতে সে না ছাড়ে সেটা বোঝাতে থাকেন তিনি। সুভাষের মনে চিন্তা। অন্যান্য ছেলেরা চার-চারটে বছর ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে এ পরীক্ষার জন্য। হাতে রয়েছে মাত্র সাত-আট মাস। এর মধ্যে কী করে তৈরি হবে সে? মেজদাকে বলে সে, 'মেজদা এ বছর স্রেফ ছটা পোস্ট খালি আছে বলে শুনেছি আমি। যতগুলো পোস্ট, শুধু সে কটা ছেলেকেই তো পাশ করানো হয়।'

'ও নিয়ে তুই ভাবিস না। পোস্ট যে কটাই হোক ঠিক পারবি তুই।'

সারারাত আধো ঘুমে কাটে সুভাষের। সকালে উঠে সুভাষ হেমন্তের বাড়িতে যায়। হেমন্তকে বাড়িতে পেল না, দোকানেও নয়। 'বুক ক্লাব' নামে একটা বইয়ের দোকান আছে হেমন্তর। আর কোথায় যেতে পারে? ময়দানের দিকে পা বাড়ায় সুভাষ। হেমন্তের সঙ্গে আলোচনা না করে স্বস্তি পাচ্ছে না সুভাষ। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল একটা ঘোড়ার গাড়ি। 'সুভাষ', হাঁক মেরে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল হেমন্ত। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে বাজারের দিকে যাচ্ছিল হেমন্ত। সুভাষকে দেখে নেমে পড়ল। গাড়ি চলে গেল। সুভাষ আর হেমন্ত ময়দানের দিকে এগোল। সুভাষের উশকোখুশকো চেহারা দেখে হেমন্ত বুঝতে পারে, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। সুভাষ আই সি এস পরীক্ষার ব্যাপারে বাবার আগ্রহ, বাড়িতে আর কী কী কথা হয়েছে সব হেমন্তকে খুলে বলল।

সব শুনে হেমন্ত নিশ্চুপ। তাকে দেখে মনে হয় প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছে সে। সুভাষ চেপে ধরে তাকে, 'কী রে কথা বলছিস না যে? তুই ছাড়া কার সঙ্গে মন খুলে কথা বলব, কার কাছেই বা পরামর্শ চাইব?'

'সুভাষ, আই সি এস মানে হেভেন বর্ন সার্ভিস— স্বর্গলোকের হাতছানি। কিন্তু বন্ধু, ছুরি সোনার হলেও ছুরি-ই। সেটা পেটে চেপে ধরলে পেট ফাঁসবেই।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ে হেমন্ত। 'সুভাষ তুই কি সেই সুভাষ, যে বলত স্বামী বিবেকানন্দ তার গুরু? তুই না বলতিস জীবনের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মুখে তুই লাথি মারতে পারিস। সেই তুই আজ কাঁচুমাচু মুখ করে জিজ্ঞেস করছিস তুই এখন কী করবি? সুভাষ, আমি তোকে উলটে জিজ্ঞেস করছি বল, আমরা এখন কী করব? শ্রীকৃষ্ণ যদি গোকুল ছেড়ে চলে যান, তবে গিরি গোবর্ধন কে ধারণ করবে, ভাই?'

'মা বাবার খুব আগ্রহ। তা ছাড়া আমি গেলেও তফাতটা কী হবে? এরকম চার-ছ মাস পড়ে কেউ আই সি এস পরীক্ষা পাশ করেছে— কখনও শুনেছিস তুই?'

'ওসব তুই আমাকে বলিস না।' হেমন্ত রেগে যায়, 'লেখাপড়ার ব্যাপারে তুই যে কী করতে পারিস সেটা আমরা ভাল করেই জানি। তুই যদি পরীক্ষায় বসিস, তবে পাশও অবশ্যই করবি। চাস তো লিখে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা ধরে নিলাম পাশ করলাম। চাকরি নেব না। ও চাকরিতে লাথি মেরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব।' এবার সুভাষের গলায় দৃঢ়তা।

'সুভাষ এটা কখনও হয় না। ক্ষমতার ফাঁদে মানুষ একবার জড়িয়ে গেলে আর বেরোতে পারে না।'

'আমার বেলায় এটা কখন-ও ঘটবে না।'

বাড়ি ফেরে সুভাষ। মনের মধ্যে টালমাটাল। কী করা উচিত? বাবার ইচ্ছে অনুযায়ী চলা মানে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা। তার সামনে দুটি রাস্তা— সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি রাস্তা। একদিকের পথ ফুল বিছোনো অন্যদিকে কাঁটা। একদিকে ক্ষমতা, আয়েস-আরামের বিপুল সম্ভার, অন্যদিকে ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন। কোন পথে যাবে সে? ক্ষমতা না আত্মত্যাগ? বৈভব না দারিদ্র্য? আরামের সুখশয্যা না কারাগারের কঠিন ভূমিশয্যা?

গাঁধীজিকে কেন গ্রেফতার করা হল? পঞ্জাবের প্রকৃত ঘটনা কী? বিবেকানন্দ সমিতির সভায় সবারই কৌতূহল। কেউ কিছু জানে না। শেষে সুভাষ, ভোলানাথ আর হেমন্ত রওনা হল চৌরঙ্গির সেই রহস্যময় বাড়িটির দিকে। পুরনো তিনতলা বাড়িটার সিঁড়ি জীর্ণ। নীচে কড়া নাড়লে ওপরতলার একটা জানলা খুলে যায়। ভাল করে দেখে নিয়ে তাদের আসতে দেওয়া হয়। তিনজন ওপরে যায়। ঘরে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। সুরেশদা অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। আশেপাশে বসে রয়েছে কয়েকটি ছেলে। তাদের এলোমেলো চুলে কতদিন তেল পড়েনি কে জানে। সবাই গম্ভীর। মাঝখানে বিছোনো একটা ম্যাপ। পঞ্জাব থেকে সদ্য এসে পৌঁছনো দুটি ছেলে পঞ্জাবের খবর দিচ্ছিল। ওরা এসেছে অমৃতসর থেকে।

গাঁধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে সারা ভারতের সঙ্গে অমৃতসরেও সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়েছিল ৬ এপ্রিল। ৯ এপ্রিল বেরিয়েছিল রামনবমীর মিছিল। হিন্দু, মুসলমান, শিখ— সবাই সমানভাবে শামিল হয়েছিল সে মিছিলে। সরকার ভারত-রক্ষা আইনের বলে গ্রেফতার করলেন জনপ্রিয় নেতা ড. কিচলু আর ড. সত্যপালকে। উত্তেজিত জনতা মিছিল করে চলল ডেপুটি কমিশনারের বাড়ির দিকে। রেলওয়ে ক্রসিং-এর কাছে বাধা দিল পুলিশ। উত্তেজনা চরমে।

জনতার মধ্যে থেকে ছোঁড়া ঢিলে কয়েকজন ইংরেজ জখম হল। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সেখানে এলেন জেনারেল ডায়ার। ১১ এপ্রিল অমৃতসরে সমস্ত সভা-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করার আদেশ জারি করা হল। কিন্তু ইচ্ছে করে সে আদেশের যথোপযুক্ত প্রচার করা হল না। সাধারণ লোক জানতেই পারল না।

১৩ এপ্রিল বিকেল সাড়ে চারটের সময় শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে আয়োজন করা হল এক সভার। সভায় হাজির হল হাজার হাজার লোক। তাদের দাবি আটক নেতাদের মুক্তি আর অত্যাচারের অবসান।

সভা সবে শুরু হয়েছে। প্রতিহিংসার আগুনে উন্মত্ত জেনারেল ডায়ার হাজির হলেন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে। সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করতে করতে জেনারেল ডায়ার একবার নজর বুলিয়ে নেন বাগের চারদিকে। চারদিকে দুই মানুষ উঁচু পাঁচিল। ভেতরে ঢোকার জন্য আছে শুধু একটা সরু রাস্তা। পাশাপাশি দু' তিনজন কষ্টে-সৃষ্টে যেতে পারে। আর কোনওখান দিয়ে পিঁপড়ে ঢোকার মতোও জায়গা নেই। হালকা মেশিনগান বসানো হল গেটে। সভায় জমায়েতদের মধ্যে রয়েছে শিশুকোলে মায়েরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর বৃদ্ধেরা। তাদের কোনওরকম সতর্ক বার্তা না দিয়েই গর্জে উঠলেন উন্মত্ত ডায়ার, 'ফায়ার।' শুরু হল গুলিবর্ষণ। ধড়াধ্বড় করে লুটিয়ে পড়ছে শিশু, যুবা, পুরুষ মহিলা। 'বাঁচাও, বাঁচাও' আর্তনাদে আকাশ ফেটে যাচ্ছে, সেদৃশ্য দেখে বোধহয় নরকের যমদূতদেরও করুণা হত, কিন্তু কোনও চিত্তবৈকল্য নেই ডায়ারের। চারদিকে মানুষের অসহায় ছোটাছুটি। বাইরে যাবার একমাত্র রাস্তা বন্ধ। শবের ওপর শব। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কেউ কেউ সেই মৃতদেহের রাশির মধ্যে আড়াল নেবার চেষ্টা করল। ডায়ারের চোখে পড়তেই শুরু হল মৃতদের ওপর ফিরে ফিরে গুলিবর্ষণ। ঝান্ডাগুলো রক্তে ভেজা। দশ মিনিটের মধ্যেই চলেছিল ১৬৫০টি বুলেট। হয়তো থামত না—যদি গুলি ফুরিয়ে না যেত। জালিয়ানওয়ালাবাগে মৃতের স্তূপ, দেখতে থাকে ডায়ার— মুখে তার পৈশাচিক হাসি— হাতে চুরুট।

পঞ্জাব থেকে আসা যুবকেরা বলে চলেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মস্পর্শী করুণ কাহিনি। 'সরকার থেকে বলা হয়েছে মৃত চারশোর কাছাকাছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সংখ্যা দু' হাজার ছাড়িয়ে যাবে।' বলে ওদের একজন।

'এখনও চলেছে অবর্ণনীয় অত্যাচার। চাষের ক্ষেতে বোমা ফেলা হচ্ছে। লোকেদের বাধ্য করা হচ্ছে রাস্তা দিয়ে সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে যেতে। চারদিকে আতংক আর অসহ্য অত্যাচার। এই ইংরেজ আবার গর্ব করে তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতির!'

ধিক্কার দেওয়ার ভাষা খুঁজে পায় না, শ্রোতারা। তাদের সব শিরা উপশিরায় রক্ত ফোটে টগবগ করে। জ্বলন্ত তেলের কুপিটার ওপরে হাত রাখে তাঁরা। গলার স্বর নিচু কিন্তু সমস্ত আবেগ দিয়ে তাঁরা সমস্বরে বলে ওঠে, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

জ্বলতে থাকে হাতের তালু। 'প্রতিশোধ, প্রতিশোধ' শপথ নেয় তাঁরা। হাতের জ্বালার চেয়ে অনেক বেশি জ্বালা তাঁদের মনে। আগুনের শিখার চাইতে অনেক বেশি উত্তাপ প্রতিহিংসার আগুনে। সারা ঘরে পোড়া মাংসের গন্ধ।

জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্ত জল করা কাহিনি শুনে সুভাষ, ভোলানাথ আর হেমন্ত স্তম্ভিত। বিপ্লবীদের শপথ নেবার পদ্ধতি দেখে তাদের সারা শরীরে রোমাঞ্চ। এমন সময় পেছনের ঘর থেকে কারও গোঙানির আওয়াজ কানে আসে তাদের। কান খাড়া করে শোনে তারা সে বুক হিম করে দেওয়া আর্ত গোঙানি। সুরেশদা বলেন, 'ভেতরে ড. ভট্টাচার্য আছেন। উনি আমাদের

বোমা তৈরির ব্যাপারটা দেখাশোনা করেন। দু'দিন আগে গঙ্গার ধারে একটা জায়গায় একটা বোমা পরীক্ষা করার সময় বোমাটা ওর হাতেই ফেটে যায়।'

তিনজনে উঠে ভেতরের অন্ধকার ঘরটাতে যায়। আবছা আলোয় দেখতে পায় এক যুবক পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। তার সেবা করছে একটি তরুণী। তরুণীটিকে বাকি সবাই মায়ী বলে। ড. ভট্টাচার্য গোঙানির মধ্যেই বলছেন 'অঞ্জলি, আমাকে একটু আফিং এনে দাও। আমাকে আরামে মরতে দাও। আর সইতে পারছি না— ওঃ ওঃ।'

'তুমি আবার ভাল হয়ে উঠবে। কেন বুঝছ না, অনুশীলন সমিতির জন্য, আমাদের দেশের জন্য তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে।' তরুণীটি সান্ত্বনা দেয়।

ড. ভট্টাচার্যের সাহস, বুদ্ধি, আত্মত্যাগ মুগ্ধ করেছিল অঞ্জলিকে। বড়লোক বাবার বাড়ি ছেড়ে ড. ভট্টাচার্যের হাত ধরে পথে নেমেছিল সে। দেশের জন্য দুজনের আত্মত্যাগের তুলনা মেলা ভার। সুভাষের মন ভরে যায় শ্রদ্ধায়।

তিনজনে বেরিয়ে যাচ্ছে, সুরেশদা পেছন থেকে ডাকলেন। 'তোমরা এর পরে এখানে আর এস না। এ জায়গাটা আর নিরাপদ নয়। আমরা শিগগিরই চলে যাব এ আস্তানা ছেড়ে।'

তিনজনে চলতে থাকে নির্মীয়মাণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে।

'শুনলি তো সুভাষ। ওই ডায়ারদের মতো জানোয়ারদের দেশে যেতে চলেছিল তুই।'

'ঠিক বলেছিল হেমন্ত। এখন বুঝছি গাঁধী মহারাজ ব্রিটিশ সরকারকে শয়তানের সরকার কেন বলেছেন। স্বামীজির কথাই ঠিক। এই বিদেশিদের লেবুর মতো চটকে ফেলে দিতে হবে।'

সুভাষ জানে কলকাতার পুলিশের খাতায় তার সব কীর্তির কথা ভালভাবেই দাগানো আছে। নিশ্চিন্ত আছে সে। বিদেশ যাওয়ার ছাড়পত্র কিছুতেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু হঠাৎ একরাত্রে শরৎবাবু তাঁকে ডেকে বললেন, 'তোর জন্য একটা খারাপ খবর আছে। তোর পাশপোর্ট পাওয়া গেছে। এখন আর তোর কোনও অজুহাত চলবে না। আই সি এস পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কেমব্রিজের কোনও ডিগ্রির জন্যও তৈরি হতে চেষ্টা করিস!'

সুভাষ নিজেকে সামলে নিল। বলল, 'ঠিক আছে মেজদা। দেখেই আসি এক চিলতে একটা দ্বীপের লোকেরা প্রায় দুশো বছর ধরে কীসের জোরে ভারতের মতো এত বড় একটা নানাজাতের মিলনভূমিকে শাসন করে চলেছে। কী সেই ভেতরের শক্তি। ব্রিটিশ সিংহের গুহায় ঢুকে তার কেশরগুলোয় চিরুনি চালিয়ে দেখিই না একবার।'

যাবার দিন এসে পড়ল। কলকাতার ঘুম ভাঙেনি। সকালে খিদিরপুর ডক থেকে ছাড়বে এস এস ক্যালকাটা। জোরে গাড়ি চলছে। সুভাষের কথায় কালীঘাটে যাওয়া হল। ভিজে কাপড়ে ফুল হাতে পুজো দিতে যাচ্ছে অনেকে। বিভাবতীও পুজোর উপকরণ কিনে পুজো দিতে এলেন। মূর্তির সামনে সুভাষ দাঁড়িয়ে। মনের মধ্যে সতীর দেহত্যাগের কাহিনি ঘুরপাক খায়।

সতীর দেহত্যাগের পর সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে পাগলপারা শিব। তাণ্ডবনাচে টলমল করে উঠেছিল সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। সৃষ্টি বুঝি লয় পায়। শিবের কাঁধে সতীর দেহ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তাণ্ডব থামবে না। সমস্ত বিশ্ব আসন্ন ধ্বংসের প্রতীক্ষায়। উপায়ান্তর না দেখে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রে বাহান্ন টুকরো করেন সতীদেহ। সেই পবিত্র দেহের অংশগুলো পড়ে জায়গায় জায়গায়। তৈরি হয় একান্নটি জ্ঞাত আর একটি অজ্ঞাত পীঠস্থান। কালীঘাটে পড়ে দেবীর দক্ষিণ চরণের চারটি অঙ্গুলি। তাই এই কলিতীর্থ কালীঘাটও পীঠস্থান। অনেকে বলে কালীঘাট থেকেই নাকি কলিকাতা নাম হয়েছে।

মা গো। তোমার আশীর্বাদী নির্মাল্য মাথায় ছুঁইয়ে আমিও শপথ নিলাম মা। তোর সেই

শবের মতোই আজ দেশমাতৃকাও শবস্বরূপা-অজ্ঞানের অন্ধকারে জড়, বিদেশির শোষণে নিঃস্ব, পদানত। শক্তি দাও মা। মাতৃভূমির এই শবদেহ কাঁধে নেবার শক্তি দাও মা। শিবের মতো সারা দুনিয়া টলমলিয়ে দেবার শক্তি দাও মা। অস্ত্র চাই আমার। শত্রুর ভেতরের খবর নেওয়ার জন্যই শত্রুর খাস ডেরাতে চলেছি মা। আশীর্বাদ করো মা যেন সফল হতে পারি।

অপলক সুভাষের ধ্যান ভাঙেন বিভাবতী। মায়ের মূর্তিকে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ে সুভাষ।

জাহাজঘাটে পৌঁছে সুভাষ দেখল হেমন্ত আর বিবেকানন্দ সমিতির আরও দশ-বারোজন ছেলে আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে। আসন্ন বিচ্ছেদের কল্পনায় হেমন্ত বিষণ্ণ। সামনে দাঁড়িয়ে জাহাজ। নাম এস এস ক্যালকাটা।

মা বাবাকে প্রণাম করে সুভাষ। আজকের কাগজে চৌরঙ্গির সেই আস্তানায় পুলিশের খানাতল্লাশির চাঞ্চল্যকর সংবাদ বেরিয়েছে। বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে সেখানে। ড. ভট্টাচার্য আর সেই তরুণী, যাকে সবাই মায়ী বলে ডাকত তাদের কী হয়েছে কে জানে। এই পরিস্থিতিতে সুভাষ যে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে তাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন বাবা। কিন্তু হেমন্তর মুখের দিকে তাকানো যায় না। বিষণ্ণ, বিমর্ষ হেমন্তকে সান্ত্বনা দেয় সুভাষ, 'ভাবিস না। ফিরে তো আসবই আমি। ব্রিটিশ সিংহের দাঁতের জোরটা যাচাই করার জন্য সিংহের গুহায় যাওয়াটা দরকার।'

'সিংহের গুহার ভেতরে যাবার পায়ের ছাপ অনেক রয়েছে, ফিরে আসার কোনও উদাহরণ জানা নেই কারও।' হেমন্ত আস্তে আস্তে বলে।

'এইবার দেখবি।' অন্যদিকে তাকিয়ে বলে সুভাষ।

'কালায় তস্মৈ নমঃ বলে প্রতীক্ষা করে থাকব সেই দিনটার জন্য।' বিষণ্ণ হাসি হেমন্তর মুখে।

জাহাজের ভোঁ বাজে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায় সুভাষ। একসময় জাহাজ ছাড়ে। হেমন্ত অপলকে তাকিয়ে। কালসমুদ্রের অতলে কী আছে কে জানে। কালায় তস্মৈ নমঃ।

৬

সুভাষ, কালকের মর্নিং পোস্টটা দেখিস। এক বন্ধুর টেলিগ্রাম এল রাতে। পরীক্ষা শেষ। ছুটির মেজাজে রাত্রে অনেক দেরিতে শুতে গিয়েছিল সুভাষ। 'সুভাষ, আগুনে পুড়লে সোনার উজ্জ্বলতা আরও বাড়ে বাবা।' পরীক্ষার আগে মা আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে সুভাষ। কিন্তু সময় ছিল বড়ই কম।

ইংল্যান্ডে থাকার সময়টা নানাদিক থেকেই লাভজনক হয়েছে। কলকাতার মতো এখানে ছাত্রদের ওপরে সদাসর্বদা বন্দুকের নল তাক করা নেই। প্রত্যেকটি ছাত্রকে হবু বিপ্লবী বলে পুলিশি সন্দেহে ভুগতে হয় না এখানে। বিসমার্কের আত্মজীবনী, মেটারনিকের স্মৃতিচারণ, কাহ্নুরের পত্রাবলি—এই সব মূল প্রামাণ্য বই পড়বার সুযোগ পেয়েছে সুভাষ। ইউরোপের তরুণমনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছে। মদ আর মদিরাক্ষীরা ঘায়েল করেছে অনেক ভারতীয় ছাত্রকে। তবে সে দিকে সুভাষের কোনও আকর্ষণ ছিল না।

আই সি এস পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়ার সময় অল্প—দেখতে হবে কী করা যায় এরই মধ্যে। পড়াশোনার সময় চিরকালই সুভাষের মধ্যে কী যেন একটা ভর করে। তার পরিশ্রম দেখে স্তম্ভিত ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, সি. সি. দেশাই— এই সব সঙ্গীরা।

পরীক্ষা চলল একমাস ধরে। অন্য ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা আর বিগত সব পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ভাল করে তৈরি করে নেওয়াতেই জোর দিয়েছে সুভাষ।

সংস্কৃতের প্রশ্নপত্র হাতে আসতেই খুশিতে উথলে উঠেছিল সুভাষ। দেড়শো নম্বরের পরীক্ষা। কলেজে সংস্কৃত পরীক্ষাতেই দুর্দান্ত ফল তার। যত বেশি সম্ভব নম্বর পেতে হবে সংস্কৃতে। খাতায় উত্তর লেখার আগে প্রশ্নপত্রের ওপরই খসড়া উত্তর লিখতে থাকে সুভাষ। সাফল্যের প্রতিশ্রুতি সংস্কৃতের প্রশ্নপত্রে। একসময় উত্তরের খাতায় লিখতে থাকে সে। সব উত্তর লেখার আগেই পরীক্ষা শেষের ঘণ্টা বাজে। সুভাষের গা ঘেমে ওঠে। খামোকা উত্তরের খসড়া লেখার সময় নষ্ট করে জেতা বাজি হারল সে। সরাসরি খাতায় লিখলে কে তাকে আটকাতে পারত? নিজের বোকামিতে নিজেরই হাসি পায় তার।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, চারদিকে আলো। তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জল ছিটিয়ে রাস্তায় এসে 'মর্নিং পোস্ট' খুলে দেখে সে। আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নাম বেরিয়েছে। সে শুধু পাশই করেনি, চতুর্থ হয়েছে! নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হয় না তার। এটা কী ভাবে সম্ভব হল? তাড়াতাড়ি সতীশদাদার বাড়ির দিকে পা বাড়ায় সে। সেখানে সে পৌঁছবার আগেই অনেক ফুল পৌঁছেছে সেখানে। সতীশদাদা বিলেতেই থাকেন। তিনি এসেছেন ব্যারিস্টারি পড়তে। তিনি খুশিতে ডগমগ। দিলীপ সুভাষকে দেখেই ব্রাভো বলে জড়িয়ে ধরে সারা ঘরে পাক খায়।

সতীশদাদা আগেই বাবাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষিতীশ, সি. সি. দেশাই, সুখটনকর— সব বন্ধু এসে হাজির হল সেখানে। ইংরেজি রচনায় সুভাষ সবার চেয়ে বেশি পেয়েছে। সংস্কৃতে বোকামির জন্যে তাকে আক্কেলসেলামি দিতে হয়েছে কম নম্বর পেয়ে। কিন্তু ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন আর অন্য বিষয়ে দারুণ ভাল নম্বর পেয়েছে সে। পাঠ্যসূচির বাইরের বই পড়া অসাধারণ কাজে লেগেছে।

'নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস'— সাফল্যের চেয়ে সফলতা আর কিছু নেই। সুভাষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনায় মশগুল বন্ধুরা। শুরুতেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—তারপর কমিশনার— সেক্রেটারি— একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙে ক্রমশ ওপরে চড়া। তারপর একদিন হয়তো কোনও প্রদেশের চিফ সেক্রেটারি। তবে গোরা-কালার তফাত যেন না করে সে। এরপর সাত-আট মাস প্রোবেশনার হয়ে থাকা। তারপর কয়েকটা পরীক্ষা— যার মধ্যে আছে ঘোড়ায় চড়া। এই ঘোড়ায় চড়াতেই অকৃতকার্য হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। ঘোড়া চালানোয় সুভাষের দক্ষতা অবশ্য সংশয়াতীত। নিঃসন্দেহে পয়লা নম্বরেই থাকবে সে। একবার পদগ্রহণের কাগজপত্রে সইসাবুদ মিটলেই শুরু হবে জীবনের পথের জয়যাত্রা। ঘোড়া ছুটবে ধুলো উড়িয়ে। আর পেছন ফিরে তাকানোর কিছু নেই।

টেলিগ্রাম পৌঁছেছে এলগিন রোডের বাড়িতে। সারা বাড়ি আলো ঝলমল। মেজদাদাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য সারা ভবানীপুর ভেঙে পড়েছে সেখানে।

সুভাষ আর দিলীপ সতীশদাদার বাড়িতেই রয়েছে। সারা দিন হইহই করে কেটেছে। সুভাষ শ্রান্ত কিন্তু তৃপ্ত। রাত্রে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় সে। কিন্তু ঘুম আসে না। কে যেন ডাকছে তাকে— কে যেন একদম কাছে থেকে ফিসফিস করে কথা বলছে তার সঙ্গে। কে সে? আধোঘুমে মনে হয় তার অন্তরাত্মাই যেন কথা বলছে তার সঙ্গে। সত্যিই তো। সাফল্য, অভিনন্দন আর ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন তাকে তো তার নিজের কথাই ভুলিয়ে দিয়েছিল। আই সি এস পরীক্ষায় পাশ করে তার কী এমন চতুর্বর্গ লাভ হয়েছে? হেমন্তর বিষণ্ণ মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একদিকে মোটা মাইনে, জীবনের সমস্ত আয়েস-আরাম আর চাকরি

জীবনের শেষে মোটা পেনশন। ব্রিটিশের অধীনে চাকর হতে হবে বটে তবে জীবনের শেষে চিফ সেক্রেটারির পদে হাতছানি। উলটোদিকে অন্তরাত্মা বাধ সাধে— তোমার জীবনে এটাই কি পরমপ্রাপ্তি? তোমার অশান্ত মন শান্তি পাবে এতে? পাগল পথিক, এ কোন পথে পা বাড়াতে চলেছ তুমি?

ঝিমুনি কেটে যায়। সুভাষ ওঠে। পরপর কয়েক গেলাস জল খায় সে। সারা শরীরে ঘাম দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে আলো আঁধারি। নিজের পায়ের দিকে তাকায় সে। একদিন এই পা দুটোই গুরুর খোঁজে চষে বেড়িয়েছে এলাকার পর এলাকা। ঘোরার তাগিদে কলেজের পড়া বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এই পা দুটো তাকে ঘুরিয়ে মেরেছে কটকের বস্তিতে বুভুক্ষু আর কলেরাপীড়িতদের সেবার জন্য। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে, কোন মোড় নেবে তার পা? কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তাকে? দেশমাতৃকার সেই আকুল আহ্বান কি আজও শুনতে পায় সে? নিজের পায়ের বেড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নীরবেই চোখের জল ফেলছেন তিনি। লজ্জায় মাথা তুলতে পারছেন না। না না না— অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ— কোনও কালেই আমার দ্বারা এরকম কিছু ঘটেনি— ঘটতে পারে না। চমকে উঠে বিছানার ওপর ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুভাষ— গলা দিয়ে আচমকাই চিৎকার বেরোয়, 'না— না— না— হবে না— হতে দেব না। সিভিল সার্ভিসের সোনার খাঁচায় আমাকে বন্দি করতে পারবে না। আমার স্বপ্ন, আমার আশা, আমার আকাঙ্ক্ষাকে বলি দিতে পারব না আমি। ও পথ আমার নয়।'

সুভাষের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় দিলীপের। সুভাষের চোখমুখের অবস্থা দেখে ভয় পায় সে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে সুভাষ? তোমার কি কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে?'

'ব্রিটিশের চাকরি করব না আমি।' ঝট করে বলে দেয় সুভাষ।

দিলীপ আরও ঘাবড়াল। সুভাষ কি ঘুমের মধ্যে কথা বলছে? জোরে জোরে ঝাঁকুনি দেয় সুভাষকে। জিজ্ঞেস করে, 'কী বলছ আবোল তাবোল? মাথা খারাপ হল নাকি তোমার? স্বর্গের সিঁড়ি তোমার সামনে। তা ছেড়ে তুমি কি রাস্তায় নামতে চাও?'

'তোমাদের ওই স্বর্গ আমার কাছে নরক।' বলতে বলতে থরথর করে কাঁপে সুভাষের শরীর।

'ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখ। ওই চাকরির মধ্যে দিয়েও তুমি দেশের অনেক মঙ্গল করতে পারবে।'

'একসঙ্গে দুই মালিকের সেবা করা আমার দ্বারা হবে না।'

খবর পেয়ে সতীশদাদা ধড়মড়িয়ে নেমে এলেন। পরনে তার নাইটগাউন। সুভাষচন্দ্রের মনের এরকম পরিবর্তন দেখে তিনি হতভম্ব। সুভাষ দৃঢ়স্বরে তাঁকে জানিয়ে দেয় 'মাতৃভূমির পায়ের শিকল ছিঁড়ে ফেলাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সিভিল সার্ভিসের বেড়ি পায়ে পরতে আমি রাজি নই।' সতীশদাদার মাথা ঘুরছে। দিলীপকে নিয়ে তিনি স্টাডিরুমে গেলেন। চিন্তিতভাবে তিনি বললেন, 'ওর মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছে, একে কী বলা যায়?' দিলীপের প্রতি প্রশ্ন।

'ছাত্রাবস্থায় অমন শপথ তো কত ছেলেই নেয়। তাকেই ধ্রুবসত্য মেনে কেউ চলে নাকি? আই সি এস-এর সোনার থালায় লাথি মেরেছে আজ পর্যন্ত এর একটা উদাহরণ তুমি দেখাতে পারো? কেউ কি এরকম পাগলামি করে?' সতীশদাদা দিশেহারা।

সকাল হল। দিলীপ আবার এল সুভাষের ঘরে। 'সুভাষ, ভাল করে ভাব। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ো না।'

'আই সি এস-এর প্রলোভনে ভোলার মতো দুর্বলতা আমার নেই দিলীপ। আমাকে এ সোনার শেকল পরানোর ক্ষমতা কারও নেই। দিলীপ আমার মনে যে প্রচণ্ড আগুন তা নিববে শুধু চিতার আগুনে, তার আগে নয়। তার আগে আমার সংকল্পেরও পরিবর্তন হবে না।' সুভাষের দৃষ্টি যেন কোন সুদূরে।

কলকাতা থেকে রোজ বন্ধুবান্ধবের চিঠি এসে পৌঁছচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকেই মেয়ের বাবা। অভিনন্দনের রাশি যত বেড়ে চলে, সুভাষের মন তত অস্থির হয়ে ওঠে। বারবার মনের মধ্যে অন্য আর একজন যেন কথা বলছে। সে বলে, নিজের আনন্দের জন্য সিভিল সার্ভিসের মুখে লাথি মারছ ভাল কথা! কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কথা একবারও ভাববে না? সোনার থালা ছুঁড়ে ফেলে, নারকেলের মালা হাতে বেরিয়ে পড়া, সুনিশ্চিত জীবন পায়ে ঠেলে, অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়ে তোমার না হয় তৃপ্তি হল কিন্তু বাবা, মা? তাঁদের মন যে রক্তাক্ত হয়ে উঠবে দুঃসহ যন্ত্রণায়— তার কথা ভাববে না। বাস্তবে এই সব ভাবালুতা মূর্খামি এ ধরনের সিদ্ধান্ত, বিরাট ভুল। এটা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

এই সময়ই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অমৃতসরে ডায়ারের কীর্তি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। পার্লামেন্টের ভেতরে অবশ্য ডায়ারের কঠোর সমালোচনা করা হল। তাকে অপসারিত করা হল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী থেকে। সুভাষের আনন্দ কিন্তু স্থায়ী হল না কয়েকটা দিনও। ডায়ার যেন মহাপুণ্যের কাজ করেছে এইভাবে ব্রিটেনে ডায়ারের জন্যে চাঁদা তোলা শুরু হল। চারশো লোককে হত্যা করে, কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরস্ত্র, অসহায়, চারদিক থেকে বন্দি আবাল-বৃদ্ধ নরনারীর ওপরে ১৬৫০ রাউন্ড গুলি চালিয়ে পৈশাচিক হাসি হেসে ডায়ার সদম্ভে ঘোষণা করেছিল, 'আই হ্যাভ ডান আ জলি গুড থিং।' সেই নরপশুর জন্য দানের পসরা নিয়ে এগিয়ে আসছেন ইংরেজরা। ছাব্বিশ হাজার পাউন্ড সংগৃহীত হয়েছে ডায়ারের লোকসান পূরণের জন্য। সুভাষের মাথায় আগুন জ্বলে।

'সুভাষ ভাল করে ভাব।' ক্ষিতীশ এসে অনুনয় করে।

'ভাববার কী আছে? যে সরকার শয়তানকে সাহায্য করে, শাসনব্যবস্থা স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্রমাগত বিভেদের বীজ বুনে চলেছে, আমাদের সোনার দেশকে লুটেপুটে নিঃস্ব করে দিয়েছে যারা, সেই সরকারের, সেই শাসনব্যবস্থার একজন হওয়া মানে তো একরকম মৃত্যুবরণ।' সুভাষ গর্জন করে ওঠে। 'আমার একমাত্র চিন্তা মা বাবাকে কী করে বোঝাব। আমার মেজদা আমাকে ছেলের মতো ভালবাসেন, আমার মেজবউদির তো আমি দেওর নই যেন পিঠোপিঠি ভাই। এদের সবাইকে আঘাত করতে হবে এটাই শুধু আমাকে অস্থির করে তুলছে। মেজদা-মেজবউদির সম্মতি আমাকে নিতেই হবে। তাঁদের মুখ আমাকে রাখতে হবে। আমাকে বিলেত পাঠানোর জন্য অনেক করেছেন তাঁরা।'

আত্মীয়দের সাহায্যের বিপুল ঋণ মাথায়। রক্তের টান, নাড়ির টান মনকে বিহ্বল করে তোলে। কিন্তু সংকল্প নেওয়া হয়ে গেছে। আর ফেরার রাস্তা নেই। বাবাকে চিঠি লিখতে বসেন সুভাষ। মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিলীপ বলে, 'সুভাষ, কী করে আত্মীয়দের মুখোমুখি হবে তুমি? তোমার আত্মীয়রা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ জজ, কেউ ডাক্তার, কেউ ব্যারিস্টার। তাদের কী বোঝাবে?'

'উপায় নেই দিলীপ। শুধু একটা বিশ্বাস আমার আছে। আমার মেজদা আর মেজবউদি কখনই আমাকে ভুল বুঝবেন না। যাই হোক না, আমি জানি, তাঁদের সমর্থন আমি সর্বদাই পাব।' সুভাষের গলায় স্থির নিশ্চয়তা।

'বিয়ে করবে না তুমি?'

'বিয়ে আমার জন্য নয়। পিছুটান থাকলে দেশসেবা করা যায় না। বিয়ের চেয়ে দেশের স্বাধীনতা অনেক বড় আমার কাছে।'

'কিন্তু তোমাকে চিরকুমার থাকতে দিলে তো?' দিলীপ উঠে টেবিলের ওপর থেকে অভিনন্দনের টেলিগ্রামের তাড়া নিয়ে এল সুভাষের কাছে। পরীক্ষার ফল বেরোবার অনেক আগে থাকতেই আসতে শুরু করেছিল অনেক প্রস্তাব— পাত্রীর ফটোর সঙ্গে। কেউ কেউ কোষ্ঠীও পাঠিয়েছেন। পরীক্ষার ফল বেরোবার পর থেকে টেলিগ্রাম আসার বিরামই নেই। হবে না-ই বা কেন? বাঙালিদের মধ্যে তো নয়ই, ভারতীয়দের মধ্যেও এর আগে এত ভাল রেজাল্ট আই সি এস-এ কেউ করেনি।'

সুভাষ চিঠিটা লিখে শেষ করে খামে ভরলেন। দিলীপ তবুও বলে, 'সুভাষ আর একবারটি ভাব।' মৃদু হেসে সুভাষ বলে, 'এই সামান্য ব্যাপারে যদি অত ভাবতে হয়, তবে দেশের বড় বড় সমস্যার সময় কী করব?'

বাবাকে ছাড়াও সুভাষ আর একটা চিঠি লিখলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে। আই সি এস-এর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তাঁর সহকারী হিসাবে দেশের জন্য কাজ করার বাসনার কথা জানালেন তাঁকে। কিন্তু সেই সঙ্গে কংগ্রেসের নীতিতে অত্যন্ত নরমপন্থার সমালোচনাও করলেন তিনি সেই প্রথম চিঠিতেই। স্পষ্ট জানালেন, এ নীতির কী ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন।

সুভাষের সিদ্ধান্তে ভারতীয় ছাত্রমহল চমকে উঠল। ক্ষিতীশ আর দিলীপের মুখ গম্ভীর। এরা আই সি এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ইংল্যান্ডে আসার আগেই ক্ষিতীশের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে প্রথম ভারতীয় আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনির সঙ্গে। মেয়েটির ইচ্ছেতেই ক্ষিতীশ আই সি এস পরীক্ষা দেবার জন্য ইংল্যান্ডে এসেছে। ভাবী স্ত্রী তাকে নিয়মিত চিঠিতে প্রেরণা যোগায়।

সুভাষচন্দ্রের প্রোবেশন শুরু হয়েছে। খুব শিগগিরই ব্রিটিশ সরকারের একনিষ্ঠ সেবার অধিকারপত্রে সইসাবুদ করতে হবে। তার আগেই তাঁকে এই সোনার শিকল কাটতে হবে। কিন্তু তারও আগে জানকীবাবুর টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল। 'বাড়া ভাতে ছাই দিয়ো না। ইস্তফা দেওয়ার আগে একবার নয়, হাজারবার ভাব।' টেলিগ্রামের পরপরই শরৎবাবুর চিঠি এল। দিলীপের কথাই ঠিক। ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারে বসুপরিবারের কারওরই মত নেই। মেজদা পর্যন্ত ভীষণ চটেছেন। এর পরেই এল বাবার চিঠি। সুভাষের পত্রাঘাতে সারা সংসার বিপর্যস্ত। ছোটবোন সাংঘাতিক অসুস্থ। জীবন মরণ সংশয়। তার মধ্যে সুভাষের এই চিঠির বোমা। সুভাষের চিঠি পেয়ে বাবা প্রচণ্ড মর্মাহত।

দিলীপ মিনতি করে, 'কিছু একটা কর। একটা আপস মীমাংসা...।'

'নো কম্প্রোমাইজ। এইসব আপস একটার পেছনে আর একটা আসতেই থাকবে। একটা অন্তহীন শৃঙ্খল।'

দিলীপ আর একবার মেজদার চিঠিটা খুঁটিয়ে পড়ে। 'ঠিকই বলেছেন উনি। তোমার এই হঠকারিতায় তোমার বাবার আয়ু কমে যাচ্ছে। হবেই তো। অভিষেকের মুহূর্তে রাজবেশের বদলে ছেলেকে যদি বল্কল পরা দেখেন, তো বৃদ্ধ বাবার বুক তো ফাটবেই। তাঁর মনের অবস্থাটা ভাব একবার। আর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তোমার এই বিদ্রোহের জবাবে ভারতের মাটিতে পা ফেলার আগেই গ্রেফতার করা হবে তোমাকে।'

'আমাদের সম্পদের এই যথেচ্ছ লুটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তো করতেই হবে। দেখে নিয়ো, আমার দেখাদেখি আরও অনেকেই সিভিল সার্ভিসের চাকরি ছাড়বে।'

'তুমি পাগল। আমাদের ভারতীয়দের চেনোনি এখনও। আরে আমাদের দেশের প্রত্যেক বাবা মা ভাবেন প্রতিবেশীর ছেলে শিবাজি কিংবা রাণাপ্রতাপ হোক— আমার ছেলেটা যেন সরকারি চাকরি পায়।'

'তাই যদি হয় তবে তো ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে ওই যে অভয়শঙ্খ।' সুভাষ গজরাতে থাকে।

সুভাষ যেন ফাঁদে পড়েছে। বাড়ির সবাই এমনকী মেজদা পর্যন্ত তাঁকে সমর্থন করছেন না। প্রোবেশন এভাবে চালু থাকলে ব্রিটিশ সরকারের অঙ্গীকারপত্রে সই করতেই হবে। চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকেও চিঠির কোনও উত্তর আসেনি। ইস্তফাপত্র দাখিল করলে জরিমানা দিতে হবে। সে টাকা কোথা থেকে পাওয়া যাবে? অবশেষে চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে চিঠি এল। 'তোমার মতো নিঃস্বার্থ ছেলে আজ দেশের বড় প্রয়োজন। এখানে কাজের পাহাড় জমেছে। কিন্তু ঠিকভাবে কাজ করার মতো কোনও সহায় নেই হাতে। তুমি এস সুভাষ, শিগগির এস।' পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে যায় সুভাষের।

সতীশদাদার ওপরেও বাড়ি থেকে প্রচণ্ড চাপ আসছে। 'তুমি ওখানে আছ। কেন বোঝাচ্ছ না সুভাষকে?' সতীশদাদা পাকড়ালেন সুভাষকে। 'বাবার কথামতো কর না কিছুদিন চাকরি। তারপর ভালমন্দ বুঝে ছেড়ে দিস।'

'দাদা, দুদিনেরই হোক আর দু'বছরই হোক গোলামি গোলামিই। স্বামীজি তাই বলতেন, শপথ নাও— আমরা গোলামি করব না। চিত্তরঞ্জন লাখ টাকার ওকালতি ছেড়ে দিলেন রাতারাতি। আমি তো ঝাড়া হাত পা, না কোনও দায়, না কোনও পিছুটান। আমার চিন্তার কী আছে?'

দিলীপ বলেন, 'আত্মীয়রা কেউ কিছু বোঝেন না, এক তুমিই বুঝি খুব বুঝদার? রমেশচন্দ্র দত্তও তো আই সি এস ছিলেন। তিনি তাঁর কাজেকর্মে ব্যতিক্রমী উদাহরণ রেখে যাননি? তিনি তো পরে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টও হয়ে ছিলেন।'

কাল অঙ্গীকারপত্রে সই করার দিন। আজ রাত্রেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কীভাবে কাটবে ভবিষ্যৎ জীবন! সারাজীবন 'জো হুজুর, জি হুজুর' করে, গাড়ি টানা ঘোড়ার মতো অবিশ্রান্ত দৌড়তে হবে। চোখে ঠুলি এঁটে। প্রমোশনের সিঁড়িতে একটু ওপরে বসা মানেই শ্রদ্ধার পাত্র, সিনিয়র। সারা জীবন অন্যের পিকদানি বয়ে বেড়িয়ে উন্নতির সোপানে চড়া এইসব মানুষদের সিনিয়র বলে মেনে চলতে হবে। এইসব মেরুদণ্ডহীন সিনিয়রদের কাছে মূল্য থাকবে না তার নিজের প্রতিভার। তার চাইতে লাথি মারো এই নিরাপদ চাকরিতে। ঝাঁপিয়ে পড়ো অনিশ্চয়তার নিশ্চয়তায়। ইতিহাস হাতছানি দিচ্ছে আর তোমার সমস্ত আবেগ, সমস্ত স্বপ্নকে বন্দি করে রেখে, তারুণ্যের আহ্বানকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশের লোহার খাঁচায় দিন কাটাতে চলেছ তুমি?

ঘুম নেই দু চোখের পাতায়। বারবার মনে হয় মায়ের কথা। হয়তো একদিন বাবা রাজি হবেন এই ইস্তফার ব্যাপারে। কিন্তু হাটখোলার অভিজাত দত্তবাড়ির মেয়ে প্রভাবতী কোনওদিন মেনে নেবেন না এ সিদ্ধান্ত। একের পর এক মেয়ে দেখছেন তিনি। সুভাষের বউ দেখার ভীষণ সাধ তাঁর।

বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে নিদ্রাহারা রাত্রি শেষ হয় একসময়ে। সকালের জলখাবার খাওয়ার সময়ে মায়ের চিঠিটা হাতে পায় সুভাষ। কী আছে সে চিঠিতে সুভাষ সেটা

ভালই আন্দাজ করতে পারে। তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিঠিটা খোলে। চিঠিটাতে চোখ বুলোতেই চমকে ওঠে সে। এ চিঠি কার? সত্যিই কি এটা মা লিখেছেন?

'...তোর যাতে মঙ্গল হয়, সেই চিন্তায় রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছি আমি। আমার সে চিন্তা ছিল একজন সাধারণ মায়ের, আর পাঁচজন মায়ের মতো। আজ তুই যার সেবা করতে চলেছিস সেই মা যে অনেক বড় বাবা। অন্যে কী ভাববে তার কথা, তুই ভাবিস না। গাঁধীজির ধ্যানের জগতে, কর্মের আঙিনায় পা রাখতে চলেছিস তুই এতে আমার দুঃখ নয় রে, গর্ব হচ্ছে। আমার সোনার ছেলের দীপ্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, এই আশীর্বাদ করি।' মায়ের চিঠি বার বার পড়ে সুভাষ। মা, মাগো! মুখে খুশির ঝলক, চোখে জল। মনের মধ্যে সারা রাত্রির ঝড়-বাদল মিলিয়ে গেল কোন দিগন্তে। মায়ের ছোট্ট চিঠিটা মাথায় ঠেকিয়ে চুপ করে বসে থাকে সুভাষ।

ইস্তফা দিল সুভাষ। মুক্ত বিহঙ্গের মতো আকাশে ডানামেলা আনন্দ তার মনে। মুক্তি, মুক্তি। ব্রিটিশের চাকরির লোহার খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। এইবার... চল মুসাফির, মুক্তি চাই দুর্ভাগা দেশের, তার 'অনেক বড়' মায়ের।

জাহাজ এখনও জেটিতে লাগেনি। সামনের দিগন্ত ছোঁয়া জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুভাষের সঙ্গে ক্ষিতীশ আর দিলীপ। ফিরে যাবার টাকাপয়সার ব্যাপার দিলীপ সামলেছে। দিলীপের পিঠে একটা চাপড় মেরে সুভাষ বলে, 'দিলীপ আই সি এস-এ আমি ফোর্থ হয়েছি— তোমাকে কিন্তু ফার্স্ট হতে হবে।'

'পরীক্ষায় বসছে কে?' দিলীপ উত্তর দেয়। 'আমিও শুনতে পেয়েছি আমার অন্তরাত্মার আহ্বান। সংগীতই আমার জীবন। সেই সাধনায়, আমি চললাম জার্মানিতে।' হঠাৎই হেসে ওঠে দিলীপ, 'আরে আমার কথা বাদ দাও। ক্ষিতীশকে জিজ্ঞেস কর না ওর কী হাল?' কৌতুকে ঝিকিয়ে ওঠে দিলীপের চোখদুটো, 'ক্ষিতীশও আর আই সি এস দেবে না।'

'কেন?' সুভাষ হতচকিত।

'ও সোনার খাঁচায় আমিও ঢুকব না। অ্যানথ্রোপলজি নিয়ে পড়ব আমি।' ক্ষিতীশ উত্তর দেয়।

জাহাজে ওঠার সময় হয়ে এল। সুভাষচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে দিলীপ হাসিমুখে বলে, 'সুভাষ তোমার মধ্যে আকর্ষণের জাদুটা একটু কমাও। অনেক সংসার তা হলে নিরাপদ থাকবে।' তিনজনেই হেসে ওঠে হো হো করে।

জাহাজের রেলিং ধরে সুভাষ দাঁড়িয়ে। বন্ধুদের দিকে অপলক দৃষ্টি তার। একসময় চোখের আড়ালে চলে যায় তারা। চারদিকে জল, অশান্ত, তরঙ্গমুখর। তখনও ডেকে দাঁড়িয়ে সেই ছেলেটি, অনিশ্চয়তার সাগর পাড়ি দিতে যাত্রা শুরু তার। আশেপাশে কিছু ব্রিটিশ পুলিশ কটমট করে তার দিকে তাকাচ্ছে। তাদের দিকে নজর পড়ে না তার। পৃথিবীর পাঁচভাগের একভাগ মানুষকে দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আনার স্বপ্ন তার চোখে। কালের সীমা পার হয়ে চলবে এই যাত্রা। 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়'-এর দেখা মিলবে কি? ফেরার রাস্তা বন্ধ। এখন শুধু এগিয়ে চলা। 'বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক' থামবে না যাত্রা। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' দূরে নীল দিগন্তের আহ্বান।

৩
গুরুশিষ্য সংবাদ

১

১৬ জুলাই, ১৯২১। সুভাষের জাহাজ ভিড়ল বোম্বাই বন্দরে। অঝোর বর্ষায় বিপর্যস্ত বোম্বাইয়ের রাস্তাঘাট। গাঁধীজিকে দেখার উদগ্র ইচ্ছে সুভাষের মনে। জাহাজ থেকে নেমেই তাঁর প্রথম কাজ গাঁধীজির দর্শন। ভাগ্যক্রমে গাঁধীজি এখন বোম্বাইয়ে।

মণিভবনের কাছেই একটা স্কুলের দোতলার একটা ঘরে গাঁধীজি রয়েছেন। আশেপাশে অনেক অনুগামীরা সুতো কাটায় ব্যস্ত। সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই মারফৎ খবর পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাঁধীজির ডাক এল। ওপরে যাওয়ার সিঁড়িটা নড়বড়ে। সিঁড়ির রেলিং ধরে সুভাষ উঠতে থাকেন। পায়ের নতুন জুতো পিছলে যাচ্ছে সিঁড়িতে। নীচে থেকে মহাদেবভাই বললেন, 'সাবধানে যেয়ো। সিঁড়িটা পুরনো বটে তবে মজবুত। তবু সাবধানেই যেয়ো।'

ওপরের ঘরে মোটা একটা জাজিম বিছানো। মাঝখানে পা মুড়ে গাঁধীজি বসে। তাঁর দুপাশে জনা পনেরো-কুড়ি অনুগামী। একমনে সুতো কেটে চলেছেন তাঁরা। সুভাষের পরনে সাহেবি পোশাক। তাঁর দিকে নজর পড়তেই গাঁধীজি হাসিমুখে তাঁকে ডাকলেন, 'এস সুভাষ।' জুতোটা বাইরে খুলে সুভাষ ভেতরে এলেন। চারপাশের সবাই দেশি পোশাকে। তাদের মধ্যে একটু বেমানান লাগে নিজেকে।

গাঁধীজিকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন সুভাষ। ছবিতে দেখা গাঁধীজির সঙ্গে বাস্তবের গাঁধীজির অনেক তফাত। চোখ দুটো একটু কটা। বয়স যদিও পঞ্চাশ পেরিয়ে তবু সেই চোখের দীপ্তি কমেনি। চশমার মধ্যে দিয়ে সেই চোখদুটো সকৌতূহলে দেখছে সুভাষকে। একটি বাঙালি ছেলে আই সি এস-এর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশসেবার জন্য বিলেত থেকে ফিরে আসছে এই খবর আগেই পৌঁছেছে তাঁর কানে। কৌতূহলটা তাই বেশিই ছিল।

গাঁধীজির খালি গায়ে পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট। শান্ত, গভীর চোখ। মাথার চুল বিরল হয়ে এসেছে। কান দুটো একটু বড়। চওড়া নাক, একটু বের হয়ে আসা নীচের ঠোঁট, দাঁত দু-একটা পড়ে গেছে, গোঁফটা ঠিকমতো ছাঁটা নেই। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারত— বিগত অনেক বছরের অনেক কষ্ট সহ্য করার সাক্ষ্য তাঁর চেহারায়। গাঁধীজিকে দেখে মনে হয় যেন গ্রামের কোনও কিষান— সরল, সহজ; কবির ভাষায় 'যে আছে মাটির কাছাকাছি।'

বিদেশি পোশাকের জন্য সুভাষের অস্বস্তি। একটু অপ্রস্তুতভাবেই তিনি বললেন, 'আমি ক্ষমা চাইছি। জাহাজ থেকে নেমে সোজা আসছি তাই...' হো হো করে হেসে ওঠেন গাঁধীজি। গাঁধীজির হাসিতে সুভাষের উৎকণ্ঠা একটু কমে। হাওয়ায় একটু শিরশিরে ভাব। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাঁধীজির পরনে শুধু একটা খাটো ধুতি। একজন একটা শাল

এগিয়ে দিলেন। মিষ্টি হেসে গাঁধীজি বললেন, 'আই সি এস-এর মতো শক্ত পরীক্ষায় তোমার সাফল্যের কথা শুনেছি। সাবাস।'

'কিন্তু সে বেড়ি তো কবেই কেটে ফেলে দিয়েছি।' সুভাষ বলেন। গাঁধীজির সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করার ইচ্ছে তাঁর। বাইরে অপেক্ষা করছেন সীমান্ত প্রদেশ থেকে আসা কয়েকজন গণ্যমান্য নেতা।

কস্তুরবা একদৃষ্টে সুভাষের দিকে তাকিয়ে। গাঁধীজি তাঁকে বললেন সুভাষকে শরবত দিতে। শরবত খাওয়ার সময় সুভাষের মুখ দেখে বুঝলেন, সুভাষের ভাল লাগেনি এই অন্যরকম লেবুর শরবত। কস্তুরবার দিকে তাকাতে, তিনি আবার উঠে নীচে গেলেন। উঠে এলেন নোনতা-ঝাল ঘোলের শরবত নিয়ে। চুমুক দিয়ে সুভাষের মনে হল এটাও না আনলেই ভাল হত।

গাঁধীজি বললেন, 'দেখে বুঝতে পারছি অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছ তুমি। আমিও, তুমি কী ভাবছ সেটা একটু বুঝে নিতে চাই। আজই কলকাতায় যাচ্ছ না তো? থাক না দু-একদিন। বেশ সময় নিয়ে কথা বলা যাবে।'

সুভাষকে একটা কামরা দেওয়া হল। সে কামরাও তথৈবচ। গাঁধীজির সঙ্গে দেখা করার এমন তাগিদ যে সুভাষ সকালের খাবারটুকুও খেয়ে বেরোননি। দুপুর পেরিয়ে গেছে। গাঁধীজির মণিভবনে কড়া নিয়মকানুন। ঘড়ি ধরে সকলে মিলে একসঙ্গে খাওয়া। বিড়ি, সিগারেট দূরে থাক, চায়ের পাট নেই। খিদেটা ভালমতোই চাগাড় দিয়েছে। জিনিসপত্র ঘরে রেখে সুভাষ বেরিয়ে এলেন। পাশের গলিতে একটা ইরানি রেস্তরাঁ। সেখানে চুপচাপ চা-বিস্কুট খেয়ে নিলেন।

গাঁধীজির সঙ্গে দেখা করার জন্য মণিভবনে লোকের ঢল। তাদের মধ্যে পার্সি, মুসলমান, মাদ্রাজি, বাঙালি সব আছে— 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান'-এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মাত্র বছর কুড়ি আগে বোম্বাইতে প্র্যাকটিস জমাতে না পেরে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি দিতে হয়েছিল তাঁকে। আজ ভারতের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু তিনি। সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন একজন। মুখে দাড়ি, তীক্ষ্ণ চোখ, খাড়া নাক। তার সঙ্গে জন দশ-বারোর একটা দল। বয়স গাঁধীজিরই মতো। লম্বা দাড়িতে তাঁকে ঋষিমুনির মতো লাগছিল।

কোথায় যেন দেখেছি— ভাবতে ভাবতে সুভাষ চিনলেন তাঁকে। ইনি ব্যারিস্টার বিঠ্ঠলভাই পটেল। গুজরাতের খেড়া জেলার কিষান আন্দোলনের মূল হোতা। সেই সময় গাঁধীজিকে নিয়ে গ্রামগুলো ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি।

বাইরে বাঁধা আট দশটা ছাগল চেঁচাচ্ছে। ছাগলের তাজা দুধ গাঁধীজির খুব প্রিয়। সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই একটা নিজস্ব কায়দায় ছাগলগুলোকে যাচাই করে নেন। বিকাল থেকে মণিভবনে ভিড় বাড়ে। গাঁধীজি থাকা মানেই সান্ধ্য প্রার্থনাসভা হতেই হবে। তাঁর শিষ্যসামন্ত তো বটেই, বাইকুল্লা থেকে ওরলি-দাদার পর্যন্ত অনেক স্ত্রীপুরুষ সাগ্রহে যোগ দিতে আসে প্রার্থনা সভায়।

রাতের খাওয়ার দেরি আছে। এই সময় ইরানি হোটেলটায় একটা চক্কর মেরে আসার জন্য সুভাষ পা বাড়িয়েছেন, পেছন থেকে একজন ডাকল। কস্তুরবা ডেকে পাঠিয়েছেন। কস্তুরবা রান্নাঘরে। সুভাষ গিয়ে প্রণাম করেন তাঁকে। প্রথমেই কস্তুরবা বললেন, 'এর পরে তোমাকে আর ইরানি হোটেলে যেতে হবে না।'

সুভাষচন্দ্র হতচকিত! কস্তুরবা বললেন, 'চা করেছি তোমার জন্য। তোমার পেটে কী হচ্ছে বুঝেছি আমি। কিন্তু কী করি বল। আমাদের এখানে একেবারে ফৌজি কড়াকড়ি।' কস্তুরবার

বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেললেন সুভাষ। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি বলেন, 'ক্ষমা করবেন। গাঁধীজি থেকে শুরু করে সবাই আপনাকে "বা" বলেন। আমি কি আপনাকে "মা" বলতে পারি।'

'স্বচ্ছন্দে। "বা"র চেয়ে তোমার মুখে "মা" শুনতেই ভাল লাগবে আমার। 'এখানে একজনের নিয়মই চলে এখানে। প্রিভি কাউন্সিলের চাইতেও কড়া তাঁর আইন।'

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। গাঁধীজি ডেকে পাঠালে কস্তুরবা তাড়াতাড়ি প্রার্থনাসভায় চললেন। কস্তুরবা পাশে না থাকলে গাঁধীজির চলে না। তেরো বছর বয়সে অশিক্ষিত কস্তুরবার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। তারপর থেকে কস্তুরবা গাঁধীজির জীবনের এক অভিন্ন অংশ।

'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' গাওয়ার পরে আরও দুটো ভজন গাওয়া হল প্রার্থনাসভায়। তারপরে রামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা করে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী দিলেন গাঁধীজি। প্রার্থনাসভা শেষ হলে ব্যারিস্টার বিঠ্ঠলভাইয়ের সঙ্গে সুভাষের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।

রাত্রে নিজের কামরায় শুয়ে শুয়ে সুভাষ গাঁধীজির জীবনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করছিলেন মনে মনে। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে গাঁধীজির আশ্চর্য দৃঢ়তায় ভরা হাসিমুখ। লন্ডনে কেমব্রিজে, হোটেল থেকে শুরু করে গানের আসর পর্যন্ত খাটো ধুতি পরা গাঁধীজির উপস্থিতি নিয়ে অনেক রসিকতা চলে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বলশেভিকদের এজেন্ট মনে করেন।

অসহযোগ আন্দোলন আর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিভূ গাঁধীজির জন্ম গুজরাতের পোরবন্দরে। বাবা করমচাঁদ একসময় পোরবন্দর আর রাজকোটের দেশীয় রাজাদের দেওয়ান ছিলেন। সম্পন্ন বৈশ্য পরিবারের সন্তান গাঁধীজির ওপর মা পুতলিবাইয়ের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও সাগর পাড়ি দেওয়া মানে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ। সে পাপ মাথায় নিয়েও গাঁধীজি ব্যারিস্টার হবার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন। স্যুটবুটধারী মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী ব্যারিস্টার হয়ে ভারতে ফিরলেন ১৮৯১ সালে।

বোম্বাইতে পসার কিন্তু তেমন জমল না। অবশেষে একদিন আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানির চাকরি নিয়ে হাজির হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার নাতাল শহরে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন ভারতীয়দের অভিধা 'কুলি'। গাঁধীজির পরিচয় হল 'কুলিদের ব্যারিস্টার'। একদিন প্রিটোরিয়া থেকে ট্রেনে প্রথম শ্রেণিতে যাচ্ছেন— সঙ্গী এক গোরাপুঙ্গব। সে তাঁর জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলে দিল পিটার মরিৎসবার্গ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। তাঁকে গলাধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিল ট্রেন থেকে। এক নতুন চেতনার উন্মেষ হল গাঁধীজির মধ্যে। শুরু হল বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর অহিংস সংগ্রাম। ভাষা, ধর্মের গণ্ডির বাঁধনে বিভক্ত ভারতীয়দের শামিল করে তুললেন সেই সংগ্রামে। প্রচণ্ড আন্দোলনে প্রত্যাহৃত হল ভারতীয়দের ভোটাধিকার প্রাপ্তির বাধা নিষেধের আইন। শুরু হল এক যুগপুরুষের যাত্রা।

১৯১৫ সালের ৯ জানুয়ারি গাঁধীজি ফিরে এলেন দেশে। কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে আহমেদাবাদে শুরু করলেন সত্যাগ্রহ আশ্রম। অল্পদিন পরেই সবরমতীর অপর পারে প্রতিষ্ঠিত হল স্থায়ী আশ্রম। বিহারের চম্পারন আর গুজরাতের খেড়া জেলার কিষান সত্যাগ্রহের নেতৃত্বের সুবাদে সারা ভারতের নজর কাড়লেন তিনি। আহমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের আন্দোলনে দিলেন সফল নেতৃত্ব।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গাঁধীজির সমস্ত সহানুভূতি ছিল ব্রিটিশেরই ওপর। তারপর একদিন জারি হতে চলল ব্যক্তিস্বাধীনতার কণ্ঠরোধের জন্য 'রাউলাট অ্যাক্ট'-এর কালা কানুন। শুরু হল তাঁর ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম। জালিয়ানওয়ালাবাগে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড তাঁর মনে আগুন

জ্বালিয়ে দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের সহায়তা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দিয়েছিল 'কাইজার-ই হিন্দ' পদক। সে পদক ফেরত দিলেন তিনি ১৯২০ সালের পয়লা আগস্ট।

একই দিন ভোরবেলায় জীবনাবসান ঘটল লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের। টিলকের মরদেহের অন্তিম দর্শনে গাঁধীজি বোম্বাই এলেন। টিলক যুগের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতির আকাশে ভাস্বর হয়ে উঠল নতুন যুগ— গাঁধী যুগ। এবার তিনি বেরোলেন ভারতদর্শনে। বদলে গেল জীবনের গতিপ্রকৃতি, আচার ব্যবহার। সমস্ত দরিদ্র সাধারণ মানুষের প্রতীক হয়ে উঠলেন গাঁধীজি।

সকালে ঘুম ভাঙল সুভাষের। কথা ছিল গাঁধীজির প্রাতঃভ্রমণে সঙ্গী হবেন তিনি। সমুদ্রের তীরে সুপুরি আর নারকেল গাছের সারির পাশ দিয়ে গাঁধীজির হাঁটা তো নয় দৌড়নো। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটার অভ্যেস তাঁর। তাঁর সঙ্গে চলতে গেলে অন্যদের দৌড়তে হয়। তাঁর মতো যুবকেরও গাঁধীজির সঙ্গে পাল্লা দিতে দম বেরিয়ে যায়। মনে মনে প্রশংসা করেন তিনি এই জীবনীশক্তির। বিঠ্ঠলভাইও ছিলেন সঙ্গে। বোম্বাইয়ের কাছেই তাঁর থাকার জায়গা।

সুভাষ গাঁধীজিকে সংগ্রামের ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। গাঁধীজি বললেন, 'সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলাই আমার নীতি। তাই কংগ্রেসের সদস্যচাঁদা ধার্য করা হয়েছে মাত্র চার আনা। কাঠবিড়ালীও সেতুবন্ধনে রামের সহায়তা করেছিল। সাধারণ শ্রমিক, দরিদ্র, অত্যাচারিত দলিত—সবাইকে জড়ো করতে হবে কংগ্রেসের পতাকাতলে।'

'শুধু খাজনা বন্ধ, বয়কট আর অসহযোগে কি ইংরেজ সরকার মাথা নোয়াবে? এতে কি স্বাধীনতা আসবে?' সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন করেন।

সুভাষের প্রশ্নে চকিত হলেন বিঠ্ঠলভাই। সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে হেসে গাঁধীজির দিকে তাকালেন তিনি। গাঁধীজিকেও সুভাষের প্রশ্নে খুশি দেখাল।

'বিদেশি বস্ত্র বর্জন আর স্বদেশি পণ্য ব্যবহারের নীতি আমাদের স্থায়ী নীতি। আমরা যে গঠনমূলক কাজের কর্মসূচি নিয়েছি তাও সফল হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সরকারি আইনের বন্ধন অস্বীকার করে কারাবরণ আমাদের আগামী পদক্ষেপ।'

'বিদেশি বস্ত্র বয়কট আন্দোলনের সাফল্যের ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলোর ক্ষতি হবে এটা ঠিক। কিন্তু তাদের চাপে কি ব্রিটেন ভারতকে স্বাধীনতা দেবে।'

'চাপ? কীসের চাপ? চাপের কথা আসছে কী করে?' গাঁধীজি রীতিমতো বিস্মিত।

'চাপে না পড়লে ব্রিটিশ নত হবে কেন?'

গাঁধীজি অবাক দৃষ্টিতে সুভাষের দিকে তাকান। 'আমার কোনও কর্মসূচিতে চাপসৃষ্টির কোনও কথাই ওঠে না।'

'তা হলে আপনার সেই ঘোষণা, এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতা, তার কী হবে?' সুভাষ প্রশ্ন করেন।

গাঁধীজি আর বিঠ্ঠলভাই দুজনেই জোরে হেসে উঠলেন। কোমরে ঝোলানো ট্যাঁকঘড়ি তুলে ধরে সময় দেখলেন গাঁধীজি। অন্যদিনের চেয়ে আজ একটু বেশি সময় লেগেছে। ফিরে চললেন আস্তানার দিকে। খানিকটা এসে বিঠ্ঠলভাই বিদায় নিলেন। যাওয়ার আগে সুভাষের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে বললেন, 'বাপুজি আপনি যাই বলুন, সুভাষের কথায় আমি বর্তমান তরুণদের মনের ভাবের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি।'

গাঁধীজি যেখানে থাকতেন অথবা তাঁর আশ্রমে গরমজল বর্জনীয় পদার্থ। এদিকে গরমজল ছাড়া সুভাষের স্নান হয় না। রাত্রে লাউকুমড়োর তরকারি ভাল করে হজম হয়নি। এক আশ্রমকর্মীর কাছে গরমজল চাওয়ায় সে সুভাষের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত বা-এর কাছে অভিযোগ পৌঁছল। বা দু'বালতি গরমজল দিলেন সুভাষকে। বাকিরা এই নিয়মভঙ্গকারী তালেবরটির দিকে কটমট করে দেখতে লাগল। ভাল করে স্নান করে গরম চা পেটে পড়তে সুভাষের একটু ঝরঝরে বোধ হল। চা শেষ হতেই কস্তুরবা তাড়াতাড়ি কাপপ্লেট নিয়ে ভেতরে রেখে এলেন।

ঠিক তখনই গাঁধীজি এসে পৌঁছলেন সেখানে। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুভাষকে চা দিয়েছ?'

'অ্যাঁ— হ্যাঁ।'

'আর একবার দাও। বিলিতি অভ্যেস। তা ছাড়া মন্ডা মিঠাই খাওয়া বাঙালির রক্ত—'

কস্তুরবা স্বীকার করলেন, 'এই এখনি চা দিয়েছি আমি।'

'কাল থেকে তোমার মুখে আমি একটা অপরাধী অপরাধী ভাব দেখতে পাচ্ছিলাম। তাতেই আন্দাজ করলাম।' তিনজনেই হেসে উঠলেন।

দুপুরে গাঁধীজি সুতো কাটতে বসলেন। সুভাষ কলকাতায় যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। গাঁধীজির সঙ্গে আলোচনায় তাঁর সমস্ত প্রশ্নের নিরসন হয়নি। গাঁধীজির কর্মসূচি একেবারেই বৈপ্লবিক বলে মনে হয়নি সুভাষের। তাঁর মাথায় ঘুরছে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, কাহুর আর আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবীদের কথা। তাদের তুলনায় গাঁধীজির কর্মসূচি বড় ফিকে, বড় ঠান্ডা রকমের লাগছিল।

'কলকাতায় দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা কর। কলকাতায় এমন একজন বিরাট ব্যক্তিত্ব থাকতে আমার কাছে পথের সন্ধান চাইছ কেন তুমি?' গাঁধীজি বলেন। সুভাষচন্দ্র যাবার জন্য বেরোচ্ছেন। গাঁধীজি নিজে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন। তাঁর সঙ্গে কস্তুরবা। গাঁধীজি স্বয়ং সুভাষকে এগিয়ে দিচ্ছেন দেখে উপস্থিত সবাই হতচকিত। সুভাষ প্রণাম করেন দুজনকে। গাঁধীজির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গাঁধীজি আপনিই এর আগে ব্রিটিশ সরকারকে "শয়তানের সরকার" আখ্যা দিয়েছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক কীর্তির জন্য ব্রিটিশ জনতার ডায়ারকে সংবর্ধনা জানানো কীসের ইঙ্গিত? বড়সড় একটা কড়া রকমের ধাক্কা না দিলে এই গুছিয়ে বসা বুড়ো হাতিটাকে নড়ানো যাবে না।'

উত্তরে গাঁধীজি শুধু একটু হাসলেন।

সুভাষচন্দ্রের মনে খটকা। মহাত্মার সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু মনের সংশয় দূর হল না। গাঁধীজির ব্যক্তিত্ব পর্বতপ্রমাণ। কিন্তু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের কর্মসূচি একেবারেই রেখাপাত করেনি সুভাষের মনে।

টাঙা দূরে চলে গেল। গাঁধীজি পেছন ফিরলেন। সপ্রশংস দৃষ্টিতে কস্তুরবা বললেন, 'ছেলেটার মধ্যে প্রচণ্ড তেজ আছে। একেবারে খাঁটি সোনা। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য এত অধীর কেন?'

২

'মাননীয় বিচারপতি মহোদয়। কালচক্রের অমোঘ আবর্তনে সময় কাটবে, দিন বদলাবে, আজকের মামলার উত্তেজনা সেদিন আর অনুভূত হবে না। আগামী প্রজন্ম সেদিন আজকের আসামিকে স্মরণে রাখবে স্বাধীনতা সংগ্রামের চারণ, জাতীয়তাবাদের হোতা, মানব-আত্মার বাণীমূর্তি রূপে। মাননীয় বিচারপতি মহোদয়! আমি এই আদালতে আজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতে চাই, আজকের আসামি এই আদালতের কাঠগড়ায় নয়, দাঁড়িয়ে আছেন ইতিহাসের দোরগোড়ায়।'

অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ। বাংলার জনসাধারণ রাজদ্রোহের মামলা থেকে নিজেদের প্রিয় নেতাকে মুক্ত করে আনতে চাঁদা তুলেছেন সাধ্যমতো। আসামি পক্ষের কৌঁসুলি একদিন নয়, দু'দিন নয়, দশ মাস দিবারাত্র পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন সমর্থনের দলিল দস্তাবেজ। সংগৃহীত অর্থ শেষ। কিন্তু ব্যারিস্টার সাহেব যেন জীবনের বাজি ধরেছেন এ মামলার ওপরে। বিক্রি করেছেন তাঁর ঘোড়া সমেত ঘোড়ার গাড়ি। নিঃস্ব হয়েছেন সবকিছু দিয়ে। প্রাণপণে লড়ছেন মামলা, জেরা করেছেন দুশো সাক্ষীকে, পেশ করা নথির সংখ্যা পাঁচ হাজার, সওয়ালের সঙ্গে সংযোজনা দুশো। তাঁর অন্তিম সওয়াল আকাশচুম্বী প্রতিভার স্বাক্ষর। পুরো নয়দিন ধরে সেই ভাষণ পড়েছেন তিনি। জুরিরা, এমনকী জজসাহেবও চিন্তিত। ভাষণ দিতে দিতে ব্যারিস্টার সাহেবের ভাল-মন্দ কিছু একটা হয়ে যাবে না তো?

অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। একটিমাত্র মামলা চিত্তরঞ্জন দাশকে সারা ভারতে প্রসিদ্ধি আর খ্যাতির শিখরে তুলে দিল। সেই চিত্তরঞ্জন আজ দেশবন্ধু, জাতীয় চেতনার পুরোহিত, স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী সেনানী। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সুভাষচন্দ্রের মন আকুল আগ্রহে অধীর।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এসে থামল। হাসিমুখে বাইরে এলেন সুভাষ। স্যুট-বুট নয়, সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি তাঁর পরনে। ভাইপো-ভাইঝিরা চিৎকার করে ওঠে 'ওই তো রাঙাকাকা।' শুধু তাঁরা নয় সমস্ত বসুপরিবার স্টেশনে হাজির। বিভাবউদি এগিয়ে এসে মুখে মিষ্টি গুঁজে দিলেন। আত্মীয়, বন্ধু, গুণমুগ্ধরা ফুলের তোড়া আর মালা নিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। একটু দূরে মাকে দেখতে পেলেন সুভাষ। ভিড় সরিয়ে মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকালেন তিনি।

সবার পেছনে পুরনো ছাতাটি হাতে নিয়ে জানকীবাবু দাঁড়িয়ে। অসম্ভব পরিবর্তন তাঁর শরীরে। কোথায় গেল তাঁর সতেজ, সবল শরীর। দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন, অসুখে ভুগে উঠেছেন তিনি। তা সত্ত্বেও মুখে হাসি— যদিও সে হাসিতে একটা বিষণ্ণতার আভাস। 'বাবা', বলে চিৎকার করে ওঠে সুভাষ গিয়ে জড়িয়ে ধরেন বাবাকে। কাঁদবার জায়গা নয় এটা— তবু চোখের জল বাধা মানে না।

ভবানীপুরের দিকে দুটো মোটরগাড়ি চলতে শুরু করে। মা আর বাবার মাঝখানে পেছনের সিটে সুভাষ। মেজদাদা ড্রাইভারের পাশে সামনের সিটে। বাবা শক্ত করে ধরে আছেন সুভাষের হাত। হাওড়া ব্রিজ পেছনে ফেলে গাড়ি চলেছে। সুভাষ মেজদাকে জিজ্ঞেস করল, 'চিত্তরঞ্জন দাশ এখন কী করছেন?'

'কিছুদিন আগে নাগপুর কংগ্রেসে গাঁধীজির উপস্থিতিতে তিনি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিস্টারি ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। ওই সভায় নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান

করেছেন দেশের কাজে। সভার মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করে উঠেছিল, "সাবাস দেশবন্ধু।" সেই থেকে সবাই তাঁকে দেশবন্ধুই বলে।'

সুভাষ ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলেন। রাস্তার ধারে গিয়ে গাড়ি থামায় ড্রাইভার। সুভাষকে নামতে দেখে শরৎচন্দ্র হকচকিয়ে গেলেন। 'কী ব্যাপার? নামছিস যে?'

'আমি দেশবন্ধুর সঙ্গে একটু দেখা করে আসছি।'

'পরে যাস না। এই তো এলি।' মা বলে ওঠেন।

'না মা। যাব আর আসব।'

অন্য গাড়িতে ভাইপো ভাইঝিরা রাঙাকাকার কাণ্ড দেখে অভিমানে ঠোঁট ফোলায়। একটু ইতস্তত করেন সুভাষ। কিন্তু পা যেন তাঁকে টেনে নিয়ে চলে গুরু দর্শনে। দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে সুভাষের অনেকদিন থেকে। দেশবন্ধুর বিশাল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে দেখতে থাকে সুভাষ। বাড়ি তো নয়— প্রাসাদ। বাড়ির মধ্যে কর্মকর্তাদের ভিড়। বহুবিচিত্র সেই ভিড়ের চেহারা। সামনের এক কর্মকর্তাকে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করেন সুভাষ, 'দেশবন্ধু বাড়িতে আছেন?'

'না তো। কলকাতার বাইরে গেছেন।'

অবসন্ন বোধ করে হতাশ সুভাষ। ঠিক তখনই ভেতর থেকে আওয়াজ আসে, 'কে ওখানে? সুভাষ?' আওয়াজটা চেনা চেনা। সঙ্গে সঙ্গেই ওপর থেকে নেমে আসে ছিপছিপে এক যুবক। পরনে খাদির পোশাক।

'কে? হেমন্ত? তুই এখানে?' সুভাষ আত্মহারা।

হেমন্ত সুভাষকে সেখানেই দাঁড়াতে বলে রান্নাঘরের দিকে যায়। একটু পরে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাঝারিগোছের লম্বা এক মহিলাকে নিয়ে ফিরে আসে সে। সুভাষকে নমস্কার করেন মহিলাটি। 'ইনিই শ্রীমতী বাসন্তী দাশ'। হেমন্ত বলার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নুইয়ে প্রণাম করেন সুভাষ। বাসন্তীদেবীর মুখ উদ্ভাসিত। জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন এলেন?'

'আজই। হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা এখানেই আসছি।'

'খুব ভাল চিঠি লেখেন কিন্তু আপনি! উনি তো আপনার চিঠি আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। আপনার কথা বারেবারেই বলেন।' আর কিছু না বলে বাসন্তীদেবী রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন সকালের জলখাবার তৈরি করতে।

'দেখলি সুভাষ। আজ তিন বছর ধরে দেশবন্ধুর মনে শান্তি নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য কংগ্রেস কমিটি তৈরি করেছে। তার জন্য দৌড়ঝাঁপ লেগেই আছে। সব খরচ ওঁর নিজের পকেট থেকে। পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে এই ব্যাপারে। এই যে মাকে দেখলি কত বড় বাড়ির মেয়ে উনি জানিস তুই? এঁর বাবা দেওয়ান বদ্রীনাথ, অভয়পুরী এস্টেটে বিরাট চা বাগানের মালিক। কলকাতাতেও তাঁর বিরাট বাড়ি। স্বামী স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের ব্রত নিয়েছেন। তাঁর যোগ্য সহধর্মিণীও তাই কোমর বেঁধেছেন দারিদ্র্যের সাধনায়। বাড়িতে রান্নার লোক নেই। হাত দুটোতে কত যে ফোস্কা পড়েছে!'

হেমন্ত দেশবন্ধুর বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে। তার ছোট্ট ঘরটিতে বসে সুভাষ দেশবন্ধুর কথা শুনতে থাকে। ঢাকা-বিক্রমপুরের ছোট এক গ্রামে জন্ম চিত্তরঞ্জনের। বাবা ভুবনমোহন কলকাতা হাইকোর্টের যশস্বী অ্যাডভোকেট। ব্রাহ্মসমাজের আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন তিনি। কারও মধ্যেই খারাপ দিকটা নজরে পড়ে না তাঁর। ধার করেও সাহায্য করেন লোককে। একবার একজনের জন্যে ত্রিশ হাজার টাকার জামিন দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে লোকটি ফেরার।

পরোপকারের দণ্ড দিতে হল ভুবনমোহন আর চিত্তরঞ্জনকে। প্র্যাকটিসের গোড়াতেই এই দুর্যোগে পিতার সঙ্গে পুত্রকেও নিজেদের 'দেউলিয়া' বলে ঘোষণা করতে হল। বাবা রিটায়ার করলেন। ট্রামে করে হাইকোর্টে যান চিত্তরঞ্জন, ফেরেন সন্ধ্যার পর ময়দানের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে। ব্যারিস্টারি ছাড়াও ইংরেজি সাহিত্য আর কবিতা লেখা তাঁর নেশা। দিনরাত পরিশ্রম করেন। শ্রীঅরবিন্দের মামলার সময় নিজের সব কিছু দিয়ে মামলা লড়েছেন তিনি। ওই একটি মামলাই তাঁকে যশের শিখরে তুলে দেয়।

রাউলাট অ্যাক্ট পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন। আজ বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বৈঠক, কাল অমৃতসর, পরশু নাগপুর, কখনও ঢাকা। বিরাম নেই ছোটাছুটির। কবিতা লেখার কলম ছেড়ে হাতে নিলেন বিদ্রোহের পতাকা। তারপর নাগপুর কংগ্রেসে গাঁধীজির উপস্থিতিতে সেই অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের ঘোষণা। ওকালতি ছেড়ে দিলেন তিনি। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে কিন্তু বন্ধুত্ব করেন তিরিশের কোঠার যুবকদের সঙ্গে। কাজের লোক বেছে নেওয়ায় তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ নজর। তাঁর ডাকে সর্বস্বপণ করবার জন্য বাংলা আর অসমের অনেক তরুণ তৈরি।

একসময় সন্ধে হয়ে এল। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠল। মোটরের হর্ন শোনা গেল। দেশবন্ধু দরজা পর্যন্ত আসতেই চাঞ্চল্য শুরু হল ঘরে বাইরে। নীচের ঘরে কর্মকর্তারা উঠে দাঁড়ালেন। তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন দেশবন্ধু। সারাদিন ধকল গেছে। সুভাষচন্দ্র অপলকে তাঁর দিকে তাকিয়ে। এত রোগা?

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে এলেন দেশবন্ধু। তাঁর শালটা হাতে নিয়ে বাসন্তী দেবী বললেন, 'ইংল্যান্ড থেকে তোমার শিষ্য এসেছে।' চমকে উঠলেন দেশবন্ধু। পেছন ফিরে নজর পড়ল সুভাষের দিকে। দেশবন্ধুর চোখে হাসির সঙ্গে একটা আশ্চর্য অনুভূতির ছায়া। সুভাষ এগিয়ে এসে প্রণাম করেন তাঁকে। দুহাত ধরে তাঁকে উঠিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। ফরসা রং, চওড়া কপাল, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। মুখে একটু মঙ্গোলিয়ান ধাঁচ। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা কিছু রয়েছে যাকে ঠিক ধরাছোঁয়া যায় না। সুভাষও অপলকে দেখছেন তাঁকে। আস্তে আস্তে বলেন, 'দেশের কাজে নিজেকে লাগাব বলে আপনার কাছে এসেছি আমি।'

সুভাষকে থামিয়ে দিয়ে সকৌতুকে বাসন্তী দেবীর দিকে তাকান চিত্তরঞ্জন। 'দেখছ, ঠিক আমার মতোই সেন্টিমেন্টাল।'

বাসন্তী দেবী খাবার জায়গা করলেন। চিত্তরঞ্জন আর হেমন্তর সঙ্গে সুভাষও খেতে বসলেন। বাইরে কঠোর নেতা চিত্তরঞ্জন খাবার ঘরে অন্য মানুষ। ছেলেমেয়েরা খেতে বসেছে। তাদের সঙ্গে মজা করছেন। নিজের পাত থেকে সন্দেশ তুলে সুভাষের পাতে দিয়ে দিলেন। হঠাৎ সুভাষের দিকে তাকিয়ে রাগরাগ ভঙ্গিতে বললেন, 'কী সুভাষ? আমাদের কংগ্রেস তোমার কাছে মিনমিনে লাগে?'

একটু হকচকিয়ে যান সুভাষ। 'তার মানে?'

'কেন মনে নেই চিঠিতে কী সব লিখেছিলে। বাপরে কী সব ভাষা! কংগ্রেসের বর্তমান কর্মসূচিতে দরিদ্র, গৃহহীনদের জন্য কোনও জায়গা নেই, শ্রমিক আর কারখানা সম্পর্কে আইন তৈরির কথা নেই। প্রচারের জন্যে অবিলম্বে স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করা উচিত। স্বাধীনতা আসবেই ধরে নিয়ে আগামী দিনের জন্য দেশের সংবিধান রচনার কাজে এখন থেকে হাত দিতে হবে... আরও কত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ।'

সুভাষ একটু লজ্জিত হন। চিত্তরঞ্জনের রসিকতা থামে না, 'এখনও কংগ্রেসের চৌকাঠও মাড়াওনি, এর মধ্যেই খুঁত ধরছ? গাছে না উঠতেই এক কাঁদি?'

হঠাৎ গলার স্বর বদলে যায় তাঁর। সামনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ। এই বয়সেই তোমার ভাবনার গভীরতা অবাক করেছে আমাকে। তোমার মতো নতুনদের আজ বড় দরকার। তোমরা এলে তবেই কংগ্রেসে শুদ্ধতা বজায় থাকবে। সামনে যত তালেবর ব্যক্তিই থাকুক না, সত্যি কথা বলতে ভয় পেয়ো না।'

কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন দেশবন্ধু? সুভাষ হতচকিত।

'পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে দেখ সুভাষ। গোড়ায় যাঁরা প্রগতিশীল ছিল একসময় তাঁরাই হয়ে ওঠে চরম প্রতিক্রিয়াশীল।'

'কেন এমন হয়?'

'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হন তাঁরা। সময় এগিয়ে যায় আর তাঁরা পড়ে থাকেন পেছনে।'

বাড়ি ফেরার পথে সুভাষের মন আনন্দে উদ্বেল। এতদিনে প্রকৃত গুরুর দেখা পেয়েছেন তিনি। অশান্ত মন শান্তির সন্ধান পেয়েছে। সেই প্রাপ্তির আবেশ নিয়ে বাড়িতে ঢোকেন তিনি।

রাঙাকাকার অপেক্ষা করে করে শিশু কিশোর দল ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। বাবার চোখে তবু ঘুম নেই। সুভাষ এসে সামনে দাঁড়ালে তাঁর আবেগ উথলে ওঠে। চোখের জল মুছে সুভাষকে কাছে বসিয়ে বলেন, 'শেষ বয়সে অনেকেরই দেশসেবার বাই চাগাড় দেয়। কিন্তু ত্যাগ করার নামে তাঁদের গায়ে জ্বর আসে। নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও, হেলায় তাকে ত্যাগ করে তুই যে কাজ করেছিস, বিশ্বাস কর, তার জন্য গর্ব হচ্ছে আমার। সব বাবারই ছেলের ভবিষ্যতের ভাবনা থাকে বাবা। সেই ভাবনা থেকেই অনেক কিছু বলেছি তোকে। ভুলে যা বাবা সে সব কথা। এখন থেকে যা ভাল বুঝবি তাই করিস তুই। আমার আশীর্বাদ সবসময় থাকবে।'

৩

হাওড়া স্টেশনে তৃতীয় শ্রেণির একটি কামরায় গাঁধীজি দেশবন্ধুকে বলেছিলেন, 'দেশবন্ধু, আন্দোলনের ভার আপনার কাঁধে দিয়ে আমি বাংলা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত।' বাংলার সাধারণ মানুষ গাঁধীজির এ বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিল। তাঁর বিদেশি কাপড় বর্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজরা পার্কে যে পরিমাণ বিদেশি কাপড় জ্বালানো হয়েছিল তার তুলনা গাঁধীজি সারা ভারতে কোথাও পাননি। গাঁধীজির আর কংগ্রেসের সম্মান যাতে একটুও ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্যে দেশবন্ধু চারদিক চষে বেড়িয়েছেন।

দেশবন্ধুর বাড়িতে বাংলার যুবনেতাদের বৈঠক। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ব্যারিস্টার কিরণশঙ্কর রায়, হেমন্তকুমার সরকার, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, পূর্ববাংলার রেলশ্রমিকদের নেতা জে. এম. সেনগুপ্ত। রয়েছেন শ্রীরামপুরের যুবনেতা গোপীনাথ সাহা আর যতীন দাস।

দেশবন্ধু বলছিলেন, 'আমরা গর্ব করে বলি বাংলা আজ যা ভাবছে, সারা ভারত কাল তা ভাববে। এ কথার প্রমাণ দেওয়ার সময় এসেছে আজ।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত যেভাবে ইংল্যান্ডকে সাহায্য করেছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে স্বয়ং প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে এসেছিলেন ১৯২১ সালের ২১ নভেম্বর। তাঁকে স্বাগত জানাতে

বোম্বাইয়ে তৈরি হয়েছিল বিশাল 'গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া'। যুবরাজকে দেশের প্রকৃত মনোভাব জানাবার জন্যে গাঁধীজি ওই দিনই দেশব্যাপী হরতাল পালনের ডাক দিয়েছিলেন। স্বাগত জানাবার সমর্থনে আর বিরোধিতায় দাঙ্গা বেধেছিল বোম্বাইতে। কিন্তু কলকাতায় হরতাল অভূতপূর্বভাবে সফল হয়েছিল। এই সাফল্যের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন সুভাষ আর জে. এম. সেনগুপ্ত। কংগ্রেসের শব্দকোষে একটি নতুন শব্দ যোগ হয়েছে— 'ডিক্টেটর'। বাংলার ডিক্টেটর নির্বাচিত হয়েছেন দেশবন্ধু।

'যুবরাজের ওপর আমাদের কোনও বিদ্বেষ নেই। কিন্তু তাঁর এ সফর সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। তাঁর সফরের মূল লক্ষ্য কংগ্রেসকে হেয় করে অত্যাচারী সরকারের হাত শক্ত করা।' দেশবন্ধু বলেন।

কিরণশঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন, 'এই সময়ে বিলাতি বর্জনের ডাক দেওয়াটা কি গাঁধীজির পক্ষে ঠিক হচ্ছে?'

'অন্য কী করতে পারতেন তিনি? জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তে রাঙানো হাতের সঙ্গে হাত মেলানো মানে তো দেশের আত্মাকে অপমান করা কিরণ।'

অনবরত ঘোরাঘুরি আর প্রাণপাত পরিশ্রমে দেশবন্ধুর শরীর ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু স্থির থাকা তাঁর ধাতে নেই। ২৪ ডিসেম্বর যুবরাজ আসছেন কলকাতায়। তার বিরুদ্ধে উগ্র জন-আন্দোলন গড়ে তুলতে চান তিনি। পাঁচজন পাঁচজন করে স্বেচ্ছাসেবকের দল রাস্তায় রাস্তায় প্রচার আর পিকেটিং করে চলেছে। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তাতে। শেষ পর্যন্ত তিনি সত্যাগ্রহীদের প্রথম দলের নেতা হিসাবে নির্বাচন করলেন পুত্র চিররঞ্জন দাশকে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হল চিররঞ্জনকে। আন্দোলন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে। তার জন্য কোনও একটা অমোঘ উপায় খুঁজছেন দেশবন্ধু। চোখ জ্বলছে তাঁর, বুকের ওপর হাত রেখে তিনি বললেন, 'বন্ধুগণ। এ আন্দোলনে শুধু আমার ছেলেই নয় আমার স্ত্রী বাসন্তী দেবীও অংশগ্রহণ করবেন।'

কিরণশঙ্কর আর সুভাষ হতবাক। আন্দোলনে রাস্তায় নামবে মেয়েরা তার ওপর আবার দেশবন্ধুর পরিবারের মেয়েরা! বাংলার রাস্তায় এ দৃশ্য কখনও দেখেনি কেউ। বৈঠক অশান্ত। যতীন দাস আর গোপীনাথ চিৎকার করে ওঠেন, 'এটা আমরা কিছুতেই হতে দেব না।' সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রিয় নেতার ওপর আগে কখনও এত রেগে যাননি। বাসন্তী দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'আপনার মত কী মা?'

'হয়তো কোনও দিন আমার স্বামীর আদেশ আমি অমান্য করতে পারি। কিন্তু আমার প্রিয় নেতার আদেশ আমার কাছে অলঙ্ঘনীয় সুভাষ।'

বাসন্তী দেবীর উত্তরে সবাই চুপ। ঘর থেকে যার আঙিনা বিদেশ, স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারেও যাঁদের শত বাধা ঠেলতে হয়, ট্রেনে চাপা যাঁদের জন্য পাপ— সেই মেয়েরা প্রকাশ্য রাজপথে আন্দোলনে শামিল হবে? মেয়েরা লতার মতো পুরুষবৃক্ষের আশ্রয়ে, ছেলে কোলে হেঁশেল ঠেলে দিন কাটাবে, এটাই প্রচলিত নীতি। সে নীতির ব্যতিক্রম সাধারণ মানুষ ভাল চোখে দেখবে?

'যে পর্যন্ত এ শহরে একটি পুরুষও জীবিত থাকবে, সে পর্যন্ত আমাদের মা-বোনেরা রাস্তায় দাঁড়াবেন না,' কিরণশঙ্কর বলে উঠলেন।

'আমি সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছি না।' দৃঢ়স্বরে বলেন দেশবন্ধু। মনে হচ্ছে তাঁর মধ্যে কী এক শক্তি ভর করেছে। 'শুধু আমার স্ত্রীই নয় আমি চাই আমার দুই কন্যাও দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ

করুক। বড়টি বর্তমানে বিবাহিতা। তাই তার ওপর আমার অধিকার নেই। কিন্তু আমার ছোট মেয়েটি তো আছে।'

সুভাষ বলে ওঠেন, 'আপনি আবেগে আত্মহারা হচ্ছেন। ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর বদলে জেলে পাঠাতে চাইছেন তাকে?'

দেশবন্ধু বললেন, 'ভুল আমার নয়, তোমাদের। মাকালী-মহাশক্তির আরাধনা এই বাংলায়। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়েও তোমরা উপলব্ধি করছ না যে মেয়েরা শক্তিস্বরূপা। তোমরা ভুলে গেছ ঝাঁসির রানির গৌরবগাথা। আমাদের জাতীয় আন্দোলনে যেদিন মেয়েরাও সমানতালে এগিয়ে আসবে, সেদিনই আসবে আন্দোলনের সুবর্ণক্ষণ।'

'ঠিক আছে। মেয়েরা যদি আন্দোলনে নামে তবে আগে নামবে আমাদের ঘরের মেয়েরা— আপনার পরিবারের মেয়েরা নয়।' বলে ওঠেন একজন। তাঁকে সমর্থন জানান আরও অনেকে।

'পাগল তোমরা।' দেশবন্ধু হেসে ফেললেন। 'প্রথম আত্মোৎসর্গের এই সুযোগ আমি কাউকে দেব না। সকলের আগে যাবে আমার বাড়ির মেয়েরা— অত্যাচারের অগ্নিকুণ্ডে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাবে তারা।'

পরের দিন বাসন্তী দেবী আর দেশবন্ধুর ভগিনী ঊর্মিলাদেবী অংশগ্রহণ করলেন আন্দোলনে। ব্রিটিশ বিরোধী ধ্বনি দিয়ে আইন অমান্য করলেন তাঁরা। কংগ্রেস অফিসে খবর পৌঁছতেই উচ্ছ্বসিত দেশবন্ধু বলে উঠলেন, 'এইবার দেখবে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূলে কী ভাবে ঘা পড়ে।'

বাসন্তী দেবী আর ঊর্মিলা দেবীকে তোলা হয়েছে পুলিশ ভ্যানে। দেশবন্ধুর আত্মীয়দের ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। আগুনের মতো খবর ছড়ায়। রাস্তায় জনতা ক্ষিপ্ত। হাঙ্গামা বেধে যায়। দলে দলে লোক চলল থানার দিকে। থানায় দুজনকে যখন ভ্যান থেকে নামান হচ্ছে, সেপাইরা স্যালুট করল তাঁদের— যেমন স্যালুট করে ওপরওয়ালাদের। সেপাইদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা। 'আমরাও স্বরাজের জন্য লড়ব, কংগ্রেসে যোগ দেব' আওয়াজ উঠল তাদের মধ্যেও। অফিসারদের চক্ষু চড়কগাছ। সন্ধে হয়ে আসছে আর থানার সামনে ভিড় তত বাড়ছে। 'বাসন্তী দেবীকে মুক্তি দাও' গর্জনের কলরোলে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। মুসলমান মহল্লা থেকেও দলে দলে ছুটে আসছে মানুষ। মুসলমানদের মধ্যেও দেশবন্ধুর প্রবল প্রভাব। রাতে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, এই ভয়ে অফিসাররা সন্ত্রস্ত। রাইটার্স বিল্ডিংয়েও আতঙ্ক। কলকাতার অনেক প্রতিষ্ঠিত, গণ্যমান্য ব্যক্তির আজ লাটবাড়িতে ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারবর্গকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সে ডিনার বর্জন করেছেন তাঁরা।

গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা শহর উত্তাল। আন্দোলনে সাধারণ মানুষ যোগ দিচ্ছে দলে দলে। দারুণ খুশি চিত্তরঞ্জন। রাত্রে বাড়িতে কলিং বেলের আওয়াজ। ঘড়িতে রাত আড়াইটে। খুশির মেজাজে এত রাত হয়েছে বুঝতে পারেননি আগে। শিরশিরে ঠান্ডায় চিত্তরঞ্জন নীচে এসে দরজা খুলে দেখেন সামনে বাসন্তী দেবী আর ঊর্মিলা দেবী দাঁড়িয়ে।

'এত রাত্রে? কী করে এলে?'

'ওরা আমাদের ছেড়ে দিল।'

'ছেড়ে দিল বলে এত রাত্রে আসতে হবে।'

'আমরা বলেছিলাম সকালে যাব। কিন্তু থানার অফিসার নিজেই গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। গভর্নর নাকি এরকমই আদেশ দিয়েছেন।'

'কেন এলে? সরকারকে নাকানি চোবানি খাইয়ে ছাড়তাম আমি।' দেশবন্ধু গজরাতে থাকেন।

'বারে— আমরা তবে কোথায় যাব? ওরা জেলে থাকতে দেবে না আর তুমি বাড়িতে আসতে দেবে না? আমরা তবে পথে পথে ঘুরব নাকি?' ছদ্মরাগে বলেন বাসন্তী দেবী। দেশবন্ধুকে সরিয়ে ওপরে উঠে যান তাঁরা।

৪

বাংলার আগুন নেবার কোনও লক্ষণ নেই। দেশবন্ধুকে গ্রেফতার করা হল। তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় জনতা পথ আটকায়। তাদের সরানো যাচ্ছে না। এই কয়দিনে তাঁর শরীরের আরও অবনতি হয়েছে। তবুও সিংহ সিংহই। নিজেই জনতাকে বলেন, 'তোমরা সরো আমাকে এখন স্বরাজ আশ্রমে যেতে দাও।' জেলের দরজা খুলে দেওয়ার সময় সেপাই-হাবিলদারদেরও চোখে জল। দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তা দেখে ডেপুটি পুলিশ কমিশনারও বিস্ময়ে অভিভূত।

যুবরাজের আসার দিন যত এগিয়ে আসছে ততই সক্রিয় হয়ে উঠছে স্বৈরতন্ত্রের নিষ্পেষণ। হেমন্তকুমার, সাবিত্রীপ্রসন্ন, বীরেন্দ্র শাসমল, কিরণশঙ্কর এবং সুভাষচন্দ্রকে একের পর এক কারাবন্দি করা হল যেন দেশবন্ধুর নেতৃত্ববৃক্ষের ডালগুলো একের পর এক ছেঁটে ফেলা হল সুপরিকল্পিতভাবে।

অবশেষে এসে পড়ল ২৪ ডিসেম্বর। যুবরাজের আসার দিন। সমস্ত শহরে হরতাল। কলকাতার রাস্তাগুলো খাঁ খাঁ করছে। পুলিশরাই জেলের মধ্যে হরতালের সাফল্যের কথা পৌঁছে দেয়। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সমস্ত বাংলার মানুষ প্রতিবাদে দৃঢ়। হরতালের সাফল্যে জেলের মধ্যে সারাদিন খুশির হাওয়া। সন্ধেবেলায় জেলার এলেন দেশবন্ধুর কাছে। জরুরি প্রয়োজনের কথা জানিয়ে দেশবন্ধুকে জেলের অফিসে নিয়ে গেলেন তিনি।

সেখানে কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট রয়েছেন। জাঁদরেল গোঁফ, উচ্চতা সাড়ে ছ-ফুট। পোড়খাওয়া ফরসা রং, নীল চোখ। টেগার্টের নাম শুনলেই জাঁহাবাজ অপরাধীদের কালঘাম ছোটে। তাঁর মারের হাত থেকে বাঁচার জন্য না করা অপরাধও স্বীকার করে ফেলে তারা।

টেগার্ট বললেন, 'মিস্টার দাশ। এখুনি আপনাকে আমার সঙ্গে লাটভবনে যেতে হবে।'

'কেন?'

'যুবরাজ এবং ডিকি ম্যাউন্টব্যাটেন আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চান।'

'এখন আর আলোচনা করে কী লাভ?'

'ভেবে দেখুন। এরকম সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না।'

'দেখুন। আমার শরীর ভাল নেই। আমার সহযোগী কেউ যদি যান তা হলে কি চলবে?'

'সম্ভব হলে আপনার সঙ্গেই আলোচনা করতে চান যুবরাজ। শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছেন সেখানে।'

দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র আর কিরণশঙ্করকে ডেকে পাঠালেন। জেলারের অফিসেই তিনজনের আলোচনা শুরু হল। দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইংল্যান্ডে মাউন্টব্যাটেন নামে কারওকে চিনতে তুমি?'

হ্যাঁ, ডিকি মাউন্টব্যাটেন। আমরা যাওয়ার আগে থেকেই সামরিক শিক্ষার জন্য কেমব্রিজে পড়ত সে। যুবরাজের এডিকং হয়ে ভারতে এসেছে। যুবরাজের সম্পর্কিত ভাই। কী হয়েছে তার?'

'এর পরে যাতে গোলমাল আর না হয় তাই কংগ্রেসের সঙ্গে জরুরি আলোচনায় বসতে চান তাঁরা।'

'তাঁরা মানে?'

'স্বয়ং যুবরাজ আর মাউন্টব্যাটেন। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। তোমরা দুজনে গিয়ে শুনে এস ওঁদের প্রস্তাবটা কী।'

টেগার্টের সঙ্গে রওনা হলেন দুজন। দুজনের মধ্যে কেমব্রিজের কথা আলোচনা হতে থাকে। ডিকি নামধারী পুঙ্গবটি রানি ভিক্টোরিয়ার নাতনির ছেলে। সুভাষের থেকে তিন বছরের ছোট। সুভাষ যেবার কেমব্রিজে যান, সেইবারই ডিকি কেমব্রিজের পড়া শেষ করে বেরিয়েছে। ডিকির বাবা ছিলেন ইংল্যান্ডে 'সি লর্ড'— নৌবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সাহস আর উদ্দীপনা ডিকির সহজাত। ডিকির এক পিসি ছিলেন রাশিয়ার জারিনা। রাজবংশের সঙ্গে অনেকদিক দিয়েই সম্পর্ক রয়েছে। নীল রক্তের প্রভাবই হোক আর তারুণ্যের উন্মাদনাতেই হোক কেমব্রিজে ডিকির খ্যাতি ছিল 'প্লে বয়' হিসাবে। একসঙ্গে আধ ডজন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করত এই প্লে বয়টি। শুধু তাই নয় নাবালিকা কিশোরীদের শয্যাসঙ্গিনী করার ব্যাপারেও খ্যাতি ছিল তার।

লাটভবন আলোর মালায় সাজানো। যুবরাজের সম্মানে খানাপিনার বিরাট আয়োজন। ব্রিটিশের ধামাধরা কয়েকজন বিশেষ করে বাছাই করা ব্যবসায়ীকে ভার দেওয়া হয়েছে পার্টির খাবার-দাবার সরবরাহের। বড়লাট রিডিং সাহেবের নিজের জন্য বানানো সেলুনগাড়িটি যুবরাজের ট্রেন যাত্রার জন্য রাখা হয়েছে। সাদার ওপর সোনালি নকশা করা সেলুন গাড়িটি 'রেলপথের স্বর্গ' বললেও চলে। সবরকম সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা আছে সেলুনটিতে। লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, সেলুনটির জন্য একটা হাওয়াই জাহাজের চেয়েও বেশি খরচা করা হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ জেতার পরে ব্রিটেনের মর্যাদা তখন তুঙ্গে। সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি ভারতবর্ষ সফরে এসেছেন যুবরাজ। তাঁর জন্য আয়োজনও তাই বিশাল। পোলো খেলা, বাঘ শিকার, চাঁদনি রাতে হাতির পিঠে চড়ে ভ্রমণ, বিশাল স্বাগত-সমারোহ আর বাদশাহি আমোদপ্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা।

লাটভবনে বিশাল লনে বিরাট জাঁকজমক। সুভাষ আর কিরণশঙ্কর এক পাশে বসে আমোদপ্রমোদের এই বিশাল আয়োজন দেখতে থাকেন। একটু পরেই সেখানে টেগার্টের সঙ্গে এলেন একুশ-বাইশ বছরের এক উচ্ছল যুবক। লম্বায় ছ ফুট, খুবই সুদর্শন। গায়ের রং গাজরের চেয়েও লাল। 'মাননীয় মাউন্টব্যাটেন'— টেগার্ট পরিচয় করিয়ে দেন। ডিকির নীল চোখ আর খাড়া নাক তার ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়।

যুবরাজের কাশি হয়েছে। তাই তিনি লাটভবনের বাইরে আসবেন না। দেশীয় কেষ্টবিষ্টুরা যুবরাজের কাশির সংবাদে যথোচিত উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। যুবরাজের কাশি মানে তো রাষ্ট্রীয় সংকট! চিত্তরঞ্জন দাশ আলোচনার জন্য স্বয়ং আসেননি দেখে মাউন্টব্যাটেন রীতিমতো ক্ষুব্ধ। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আলোচনা করে একটা কিছু ফয়সালা হলে, গাঁধীর ওপরে চাপ সৃষ্টি করা যেত। আপাতত পরিস্থিতি সামাল দিয়ে যুবরাজ এবং তিনি স্বয়ং বাহবা কুড়োবেন, এইরকম আশা করেছিলেন ডিকি। মদিরার পাত্র তুলে নিয়ে ডিকি

বললেন, 'চলুন আনন্দ করা যাক। যুবরাজ অন্দরে থাকলে কী হবে, তার এই প্রজাটি তো হাজির রয়েছে।'

চটজলদি জবাব দিলেন সুভাষ, 'মিস্টার মাউন্টব্যাটেন ভারতে খালি প্রজাই আছে রাজা নেই। এ দেশ অরাজক।'

টেগার্ট অবশ্য আগেই সুভাষের পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যেই নামটা ভুলে গেছেন ডিকি। 'আপনার নামটা যেন কী বলেছিলেন।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'সুভাষচন্দ্র বোস। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একজন শিষ্য।'

টেগার্ট বলে উঠলেন, 'স্যার। ইনি দারুণ গুণী লোক। আই সি এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন আর ইংরেজি রচনায় প্রথম। কিন্তু সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়েছেন।'

'রিজাইনড? ফর হোয়াট?' ডিকি মাউন্টব্যাটেন আশ্চর্য।

'ফর মাই আনফরচুনেট কান্ট্রি— আমার দুর্ভাগা মাতৃভূমির জন্য।'

সামনের প্লেট থেকে একটা মুরগির ঠ্যাং তুলে নিলেন ডিকি সাহেব। 'ব্রিটিশরাজত্ব ভারতের পক্ষে একটা সৌভাগ্য এটা আপনাদের বোঝা উচিত। আমাদের ইংল্যান্ডে সুসভ্য গণতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা এবং বিরোধী পক্ষের সম্মানের কথাই ধরুন না কেন।' মুরগির ঠ্যাং-এ কামড় বসালেন ডিকি।

সুভাষচন্দ্র মুচকি হাসলেন, 'শুধু ব্রিটিশ নাগরিকদেরই জন্য। তাই নয় কি?'

'তার মানে?'

'সুয়েজ খাল পেরিয়ে এলেই ইংল্যান্ডের ন্যায়পরায়ণ মানুষেরা অন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠে। আমাদের জন্য অন্যায়ের শাসন। আদালতে ইংরেজ বিচারক ভারতীয়দের ঘেন্নার চোখে দেখেন। আইন, উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা কিছুই ভারতীয়দের জন্য নেই। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে মুক্ত বাতাবরণের আমরাও প্রশংসা করি। আমরা চাই আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা হোক। আমাদেরও চাই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।'

'এরকম বলার কারণ? ভাইসরয়ের কাউন্সিলে কি ভারতীয়রা নেই?' ডিকি অসহিষ্ণু।

'তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই গুণবান। কিন্তু বেশির ভাগই ভাইসরয়ের পাতের পাশে ঘুরঘুর করা বেড়াল। দেশীয় রাজ্যের রাজা আর নবাবদের এ দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার কী যোগ্যতা আছে?'

সুভাষচন্দ্রের গলায় উষ্মা। মাউন্টব্যাটেনও এবার একটু সতর্ক হলেন। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বললেন, 'এই যে তোমাদের গাঁধীর হরতাল, অনশন, রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ— এ সব তামাশার অর্থ কী? এইভাবে কি স্বরাজ আসবে?'

'কিছুকাল এসব করে দেখা যাক শুভবুদ্ধির উদয় হয় কি না? তারপর দেখা যাবে। জানেন তো লোকের নাক চেপে ধরলে মুখ খুলে যায়।'

'এটা কি ধমক?' মাউন্টব্যাটেনও এবার যুদ্ধং দেহি মেজাজে।

'ধমক নয়। আমাদের মনের ব্যথার প্রকাশ মাত্র।'

'ব্যথাটা কীসের একটু জানতে পারি?'

'অন্যকে জুতোর নীচে যে পিষে মারে সে কি বুঝতে পারে জুতোর নীচে দমবন্ধ হয়ে আসা মানুষটার মনোভাব?'

এবার মাউন্টব্যাটেনের মুখের ভাব বদলায়। 'আমাদের দেশের সমস্ত নেতা, প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে আমিও মনে করি, যতদিন পর্যন্ত সম্ভব ভারতবর্ষে আমাদের রাজত্ব রক্ষার

সবরকম ব্যবস্থাই আমাদের নিতে হবে। তার জন্য বলপ্রয়োগেও আমরা ইতস্তত করব না।'

'মার খাওয়া আমাদেরও অসহ্য হয়ে উঠেছে। সুযোগ পেলেই আমরাও এই অন্যায়ের শাসন সমূলে উচ্ছেদ করব।' এবার সুভাষচন্দ্রেরও গলা চড়ে।

এইবার মাউন্টব্যাটেন সতর্ক হয়ে গেলেন। তাঁর জানা ছিল বিপ্লবীদের গুপ্ত সংগঠন বাংলাতেই সবচেয়ে বেশি। সুভাষচন্দ্রের কথায়ও বিপ্লবী পথের আভাস স্পষ্ট। কঠিন স্বরে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'এইসব তথাকথিত বিপ্লবীরা যে ভাবে জজ বা পুলিশ অফিসারদের খুন করছে সেটা কি আপনার কাছে খুব সভ্য উপায় বলে মনে হচ্ছে?'

'তাতে বেশি কিছু যায় আসে না।'

'তার মানে?'

'এরকম দু-চারটে থাপ্পড় মাঝে মাঝে পড়াটা দরকার। নইলে চোর যে অন্যায়ভাবে অন্যের ঘরে ঢুকেছে সেটা সে বুঝবে কী করে?'

আর আলোচনা চালানো নিষ্ফল। সুতরাং কথাবার্তা এখানেই শেষ হল। সুভাষচন্দ্র আর কিরণশঙ্করকে নিয়ে মোটর চলল প্রেসিডেন্সি জেলের দিকে। মাউন্টব্যাটেন চললেন যুবরাজের শয়নকক্ষের দিকে। সেখানে জানতে পারলেন যুবরাজ নাচঘরে গেছেন। দরবার হলের পাশেই নাচঘর। আলোচনায় যুবরাজের আকর্ষণ নেই। তাই তিনি গেছেন নাচঘরের ফুর্তিতে অংশ নিতে। যুবরাজ এবং ডিকির পছন্দের কথা স্মরণে রেখে আয়োজকরা নানা দিক থেকে অনেক হুরিপরি হাজির করেছেন। সেই সব অপ্সরীরা একেকজন এক এক রকম। কেউ হয়তো এসেছেন অভাবে আবার কেউ স্বভাবে।

নাচঘরের দরজা পর্যন্ত ডিকিকে এগিয়ে দিতে এসেছেন টেগার্ট। ডিকি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিস্টার টেগার্ট। এই বোসের ওপর ভাল করে নজর রাখবেন। বিপ্লবী হবার সমস্ত লক্ষণই আছে বোসের। একটু বেশি মাত্রায়ই আছে।' মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'ওর শরীরে ব্রিটিশ বিদ্বেষ আর বিপ্লবের অগ্নিশিখার আঁচ খুবই স্পষ্ট।'

মুখ টিপে হাসলেন টেগার্ট। 'আই সি এস-এ ইস্তফা দিয়ে যে মুহূর্তে হাওড়া স্টেশনে পা রেখেছে সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের গোয়েন্দারা অষ্টপ্রহর লেগে আছে ছোকরার পেছনে। রোজ কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, সব খবর আছে আমাদের কাছে। ওর সব চিঠির কপি হয়তো ওর নিজের কাছে নেই তবে আমাদের ফাইলে আছে। মানছি অসাধারণ ক্ষমতা আছে ছোকরার, তবে যতই ফড়ফড় করুক পাখিকে খাঁচায় পোরার ব্যবস্থা আমাদের পাকা। ফাঁদ আমাদের সবসময় পাতাই আছে।' টেগার্টের স্বরে আত্মপ্রসাদ শুধু নয় অহমিকাও লুকোনো থাকে না।

'অতটা নিশ্চিন্ত হয়ো না। পাখি একদিন খাঁচা সমেত ফুরুত হয়ে যাবে। টেক কেয়ার।'

'ইয়েস স্যার।'

'মনে রেখ, ব্রিটিশরা জান দেবে তবু ভারতবর্ষকে মুঠো থেকে পিছলে যেতে দেবে না। বোসের ওপর সবসময় নজর রাখবে। সময়ে সময়ে একটু দাবড়ে দেবে। আর সুযোগ পেলে এই পাখিটার ডানা কেটে ফেলবে। হি ইজ এ ডেঞ্জারাস এনিমি অফ দ্য এম্পায়ার।'

৫

বিভা বউদির পাঠানো খাবার নিয়ে গোপীনাথ সাহা জেলখানায় এসেছেন। তাঁর কাছে খবর পাওয়া মাত্র সুভাষের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বিক্ষুব্ধ গোপীনাথ বললেন, 'এটা কী করলেন গাঁধীজি। চলন্ত গাড়িকে থামানোর কী অধিকার আছে তাঁর? আমরা বাংলায় আগুন জ্বালিয়ে দেব।'

'আমি দেশবন্ধুকে গিয়ে বলছি। একটু ধৈর্য ধর।'

'গাঁধীজির নেতৃত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না, এই বিশ্বাসেই আমরা কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। কী পেলাম আমরা? না সুভাষবাবু, আপনাদের বা গাঁধীজির দলে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব না।'

গোপীনাথের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না সুভাষ। তিনি নিজেই এত বিক্ষুব্ধ যে কথা সরে না তাঁর মুখে। প্রচণ্ড রাগ নিয়ে গোপীনাথ চলে গেলেন। কুঠরিতে আসামাত্র তাঁর মুখ দেখে দেশবন্ধু চমকে উঠলেন।

'উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরাতে একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে।' সুভাষ বললেন, 'সেখানে কংগ্রেস আর খিলাফতিরা মিলে একটা মিছিল করেছিল। পুলিশের আচরণ জনতাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা তাড়া করে পুলিশদের। উত্তরে পুলিশ গুলি চালায়। বিক্ষুব্ধ জনতা থানায় আগুন লাগায়। বাইশজন পুলিশ পুড়ে মারা যায়।'

কপালে হাত দেন দেশবন্ধু। 'এটা ভাল হয়নি।'

'আমিও মানছি সেটা। কিন্তু দেশের একটা কোনায় কী হল তার জন্য সমস্ত দেশের আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে?'

'সে কী? উত্তর মেরুর অপরাধে শাস্তি পাবে দক্ষিণ মেরু?' দেশবন্ধু বলে ওঠেন।

'এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে! এই আশ্বাসের কী হবে? গাঁধীজি কিছু বুঝতে চান না। প্রথমে ঢেউ তোলেন, মহাসমারোহে যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু যেই তীরে ভেড়ার সময় আসে, নোঙর ফেলে জাহাজ থামিয়ে দেন।' সুভাষচন্দ্র বলেন।

'এমন কেন করেন তিনি? কী মনে হয় তোমার?'

'আমার ধারণা গাঁধীজির মনের মধ্যে একই সঙ্গে এক মহাত্মা আর এক পলিটিশিয়ান থাকে। তাদের মধ্যে যে বিরোধ তারই বহিঃপ্রকাশ এই ধরনের দুর্বোধ্য আচরণ।'

দেশবন্ধু হাসেন। আস্তে আস্তে শুধু বললেন, 'সুভাষ মহাপুরুষদেরও পা মাটিতেই থাকে। সেটা ভুলে যাওয়ার মতো ভুল তুমি কোরো না।'

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল। গোপীনাথের মতো অনেকেই মনে করে গাঁধীজি তাদের পথে বসিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন। তরুণ ছাত্র আর শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ। গাঁধীজির জনপ্রিয়তায় ভাঁটার টান। সুযোগ বুঝে ব্রিটিশ তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা আনল। ছ-বছরের জেল হল তাঁর।

গাঁধীজি জেলে গেলে কংগ্রেসের দায়িত্ব পড়ল দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহরুর ওপর। ১৯২২-এর ডিসেম্বর মাসে গয়ার কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু। আইনসভায় প্রবেশ করে ব্রিটিশ সরকারকে বাইরে থেকে তো বটেই আইনসভার ভেতর থেকে উদ্ব্যস্ত করে তোলার ইচ্ছে তাঁর। অধিবেশনের শেষ দিনে আইনসভায় প্রবেশের প্রস্তাব স্বয়ং দেশবন্ধু উত্থাপন করলেন। গাঁধীজির অনুগামীদের তীব্র বিরোধিতায় পক্ষে ৮৯০ আর বিপক্ষে

১৯৪৮ ভোটে বাতিল হয়ে গেল প্রস্তাব। কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম স্বয়ং সভাপতির আনা প্রস্তাব বাতিল হল। সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধু সভাপতির পদ থেকে আর মতিলাল নেহরু কংগ্রেস সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। তাঁদের সঙ্গে হাত মেলালেন লালা লাজপত রায়। গড়ে উঠল স্বরাজ্য দল।

দেশবন্ধু আর মতিলাল স্বরাজ্য দলের প্রচারে প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন। গুরুর পাশেই রয়েছেন সুভাষচন্দ্র। একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দলের কার্যালয়ে বসে রয়েছেন তাঁরা। ঘেমে নেয়ে সেখানে হাজির হলেন যতীন দাস।

'সুভাষবাবু, গোপীনাথ এ কাজটা ভাল করেনি।'

'কী হয়েছে?'

'আর্নেস্ট ডে বলে এক সাহেবকে খুন করেছে সে।'

সুভাষের সঙ্গে দেশবন্ধুও বিমূঢ়। কিলবার্ন কোম্পানির এই নিরীহ কর্মচারীটিকে দিনদুপুরে পার্ক স্ট্রিট আর চৌরঙ্গির মোড়ে খুন করে গোপীনাথের কী লাভ হল? গোপীনাথ আর কংগ্রেসের অফিসে আসে না। শোনা যায় বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় যাতায়াত করছে সে। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হল। তার জবানবন্দিতে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে চাঞ্চল্য। টেগার্টের সামনে আনা হল তাকে। চেহারাতে উগ্রতা ফেটে পড়ছে।

পৈশাচিক দৃষ্টিতে তাকে তাকিয়ে দেখেন টেগার্ট। হাতের বেল্ট দিয়ে সপাসপ মারতে মারতে প্রশ্ন করেন টেগার্ট, 'সত্যি করে বল! কাকে খুন করতে চেয়েছিলি?'

'তোকে রে তোকে।' চিৎকার করে ওঠে গোপীনাথ।

'তা হলে ডে সাহেবকে মারলি কেন?'

'ডে সাহেব একটা বুদ্ধু। তোর মতো চেহারা তার। একইরকম দাড়ি রেখেছিল। আমার চোখ আমার সঙ্গে বেইমানি করল। ডে মরল আর তোর ভাগ্য বাঁচিয়ে দিল তোকে।'

হেসে ফেললেন টেগার্ট। তারপরে আগুনদৃষ্টিতে নিজের সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছ, নাক টিপলে দুধ বেরোয় এমন বাচ্চাও টেগার্টকে মারার স্বপ্ন দেখছে। আর তোমরা ক্লাবে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে সারারাত নেচে কাটাচ্ছ। তোমাদের ধিক্কার দেওয়ার ভাষা নেই আমার।'

টেগার্ট রাগে অন্ধ, দিশেহারা। হাতের লিকলিকে বেত নিয়ে গোপীনাথের পিঠে উন্মত্তের মতো চালাতে থাকেন। চারজন সেপাই গোপীনাথকে উপুড় করে ধরে আছে। মারতে মারতে হাত ধরে আসে তার। গোপীনাথের মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে কিন্তু টু শব্দটুকুও বেরোচ্ছে না। তা দেখে টেগার্টের মাথার আগুন আরও জ্বলে ওঠে। অন্য অফিসারদের বলে, 'দেখ দেখ। কী ভাবে তৈরি করা হয়েছে এদের।' একটা বুনোজন্তুর মতো আচরণ টেগার্টের। হাবিলদার-সেপাইরা যে কাজ করতে লজ্জা পাবে এমন সব কাজেও দ্বিধা নেই তার।

'সত্যি করে বল। বোস আর দাশকে চিনিস তুই?'

'ভুল করছ সাহেব। আমাকে মেরে ফেললেও কিছুই বলব না আমি।'

'কেন বলবি না?'

'শয়তানের কাছে ভগবানের নামে চুকলি খাওয়া আমার আসে না।'

'আমাকে মারার ইচ্ছে তোর হল কেন?'

'আমার অনেক বিপ্লবী বন্ধুদের ফাঁসিকাঠে তুলেছ তুমি। তাদের সংসারকে শ্মশান করে দিয়েছ তুমি। তার প্রতিশোধ আমরা নেবই।'

গোপীনাথের রক্তে ভেজা শরীরটা হিঁচড়ে নিয়ে যায় সেপাইরা। অর্ধচেতন অবস্থার মধ্যেও সে বলে, 'এইটুকু বলে যাচ্ছি সাহেব। যে কটা দিন বাঁচবে, সে দিনগুলোকে বোনাস বলে ভেব। আমার বন্ধুরা তোমাকে এমনিতে ছেড়ে দেবে না।'

গোপীনাথের রক্তরাঙা চোখ টেগার্টের মনেও ভয় ধরিয়ে দেয়। আগুনজ্বলা চোখের সামনে একটা বাড়ির ছবি ভেসে ওঠে। এলগিন রোডের ওপর তিনতলা একটা বাড়ি।

প্রেসিডেন্সি জেল বিনিদ্র সেই রাতে। রাত্রি ভোর হলে যার ফাঁসি হবে, চারদিকে সে হইচই ফেলে দিয়েছে। 'পুলিশ কমিশনার টেগার্টকেই গুলি করতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু তার সৌভাগ্য আর আমার দুর্ভাগ্য। দেখার ভুলে গোলমাল হয়ে গেল সবকিছু।' ভিড়ে ঠাসা আদালতে নির্ভীক বিবৃতি দিয়েছিলেন গোপীনাথ সাহা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরাধীনতার পিঞ্জর থেকে মুক্তি পাবে তার প্রাণবিহঙ্গ। কারাগারের দেওয়ালগুলোও বোধহয় নিঃশব্দে কাঁদছে।

ভোরের বাতাস বইতে শুরু করেছে। সুভাষচন্দ্রের গাড়ি এসে দাঁড়াল জেলের বাইরের আবছা অন্ধকারে। গাড়ি থেকে নামলেন সুভাষ, পূর্ণ দাস। তাঁদের পেছনে পনেরো-বিশজন তরুণ। সুভাষের মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। জেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন তিনি। ভাগ্য ভাল। জেলার এলেন অভ্যর্থনা কক্ষে।

'বলুন বোসবাবু।'

'আর্জি আছে আমাদের।'

'কীসের আর্জি।'

'গোপীনাথের মৃতদেহ আমাদের দেওয়া হোক। আমাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী গঙ্গাতীরে শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে চাই আমরা।'

'মাফ করবেন। সে অনুমতি দেওয়া যাবে না। পুলিশ কমিশনার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। মৃতের অন্তিম সংস্কার করতে হবে জেলের চার দেওয়ালেরই মধ্যে।'

ঠিক তখনই বাইরে শোনা গেল সাইরেনের আওয়াজ। জেলার ত্রস্তপায়ে ভিতরে চললেন। সুভাষ কিছু বলার আগে জেলার চেঁচিয়ে বললেন, 'ওই দেখুন কমিশনার মিস্টার টেগার্ট নিজেই এসেছেন। আপনাদের যা বলার ওঁকেই বলুন।' দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে যান জেলার। টেগার্ট গাড়ি থেকে নামতেই সিপাই, সান্ত্রিরা স্যালুট করল তাঁকে। গাড়ি থেকে নামার সময় টেগার্টের নজর পড়ল সুভাষচন্দ্রের ওপর। টেগার্টের মুখের হাসি সুভাষের মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। টেগার্টের সামনে এসে তিনি বললেন, 'মিস্টার টেগার্ট, গোপীনাথের অন্তিম সংস্কারের সময় আমরা উপস্থিত থাকার অনুমতি চাই।'

ক্রূর হাসি হেসে টেগার্ট বললেন, 'আজ পর্যন্ত যত আগুন লাগিয়েছ তোমরা, সেগুলোতে মন ভরেনি, তাই চিতায় আগুন দিতে চাও? আসামির ভাইকে তার অন্তিম সংস্কারের অনুমতি আগেই দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেখানে আর কারও থাকার প্রয়োজন নেই।'

'দেখুন—'

'এভরিথিং ইজ ওভার নাউ। ইউ মে গো।'

'আমরা যাব না। গোপীনাথ আমাদের আত্মজন—আত্মার আত্মীয়।'

টেগার্ট আর কিছু শুনলেন না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সেখান থেকে চলে যান তিনি। কড়কড় আওয়াজে জেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পাহারায় থাকা হাবিলদারটি সুভাষচন্দ্রের জন্য একটি চেয়ার নিয়ে এল। সেটাকে ঠেলে দিয়ে সুভাষ সেখানেই ধুলোর ওপর বসে পড়লেন। তার সঙ্গে বসলেন বাকি সঙ্গীরা। 'এভরিথিং ইজ ওভার নাউ—সব শেষ' টেগার্ট বলে গেছে। সত্যিই কি শেষ না শুরু? সুভাষচন্দ্রের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে একটা বিলাপের মতো, মন্ত্রোচ্চারণের মতো বেরিয়ে এল 'বন্দেমাতরম্।' সবার চোখে জল। 'বন্দেমাতরম্'—যেন এক নতুন মাত্রা পেল, এক আশ্চর্য মহিমায় দীপ্ত হল।

ভেতরে ফাঁসি দেওয়ার আয়োজন চলছে। বাইরে তখন অন্য আবহাওয়া। কাব্যদিগন্তের নতুন চারণ কাজী নজরুল ইসলাম গান গাইছেন একের পর এক।

ফাঁসির সমস্ত আয়োজন শেষ। চার্লস টেগার্টের জীবনে বোধহয় এত আনন্দের দিন আর আসেনি। একটা সতেরো আঠারো বছরের ছোকরা তার মুখের ওপর বলে দিল—যে কটা দিন আর বাঁচবে, মনে কর বোনাস পাচ্ছ! তাই সেই ছোকরা কেমন করে ফাঁসির দড়িতে ঝোলে সেটা দেখার জন্য টেগার্ট উদগ্র বাসনায় অধীর। কোনও পুলিশ কমিশনারের এর আগে কারও ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকার কথা কারও মনে পড়ে না। রাত্রিশেষে গোপীনাথকে স্নান করানো হয়েছে। কপালে চন্দন—সে যেন কোনও মহাযাত্রার তীর্থযাত্রী।

টেগার্টের ওপর নজর পড়লে গোপীনাথ হাসলেন। দুজনের মধ্যে দূরত্ব বেশি নয়। সাহেবকে শুনিয়ে গোপীনাথ বলেন, 'সাহেব তোমার ভাগ্যটা খুব ভাল তাই বেঁচে গেলে।'

'কী রে কুত্তা! তোর জীবনের বোনাস কে দেবে এখন?'

'সাহেব, কোর্টে যা বলেছি আবার বলছি তোমাকে। আমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু থেকে জন্ম নেবে নতুন বিপ্লবীরা। তাদের মধ্যেই আমি বাঁচব।' শান্ত দৃঢ়তা গোপীনাথের গলায়।

আয়োজন সম্পূর্ণ। দ্রুতপায়ে সাব-জেলার এলেন সেখানে। বললেন, 'বাইরে স্বরাজ্য দল আর কর্পোরেশনের অনেক লোক জমা হয়েছে। সুভাষ বোস দাবি করছেন তাদের ভেতরে আসতে দেওয়া হোক।' সুভাষের নাম শুনে গোপীনাথের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দেখে টেগার্টের মাথায় আগুন আরও দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। 'বল, বাংলার বিপ্লবী ষড়যন্ত্রে আর কে কে আছে। নইলে চামড়া খুলে নেব তোর।'

'আমি তো চললাম সাহেব। আমার চামড়া আর খুলবে কী করে? যাবার আগে বলে যাই। যতক্ষণ সুভাষচন্দ্র আছেন তোমরা সামলে চোলো।'

সকালের আলোয় জেলখানার উঁচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে জ্বলন্ত চিতার ধোঁয়া আকাশের দিকে চলেছে। জেলখানার বাইরে তখন চড়া পরদায় বন্দেমাতরম্ অনুরণন তুলছে। সাতটা বাজল। গোপীনাথের ভাই মদনমোহন গোপীনাথের জামাকাপড় হাতে বাইরে এল। সুভাষচন্দ্রকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। তাঁকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে সে। 'দাদা, গঙ্গাটুকুও পেল না ও।' গোপীনাথের জামাকাপড় অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করে মাথায় ঠেকিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠেন সুভাষ। জেলারের কামরায় বসে টেগার্টের চোখে পড়ল সে দৃশ্য। 'দেখতে পাচ্ছ? কলকাতার সমস্ত হিংসাত্মক ঘটনার মূলে আছে এই লোকটি।'

বাইরে এসে গাড়িতে চড়ার আগে টেগার্ট সুভাষকে বললেন, 'তুমি হিংসাচারকে সমর্থন করছ।'

'আমি শুধু এই অপূর্ব আত্মবলির, আত্মোৎসর্গের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।'

'চুপ কর। আমাকে শেষ করার জন্য তুমি নিজে অনেক বিপ্লবীকে উদ্বুদ্ধ করেছ তার প্রমাণ আছে আমার কাছে।' হিসহিসিয়ে বলে ওঠেন টেগার্ট।

'প্রমাণ থাকলে কোর্টে যাও।' সুভাষ উত্তর দেন।

'দেখতেই পাবে কী করি।' দাপটের সঙ্গে বললেও মনের কোণের ভয়কে লুকিয়ে রাখতে পারেন না কমিশনার সাহেব।

৭

'একটা গোলামি ছেড়ে আর এক গোলামির ফাঁস গলায় পরার কোনও ইচ্ছে নেই আমার।' সুভাষ বললেন।

চিত্তরঞ্জন সদনে গম্ভীর পরিবেশ। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। দেশবন্ধু কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র হয়েছেন। সুভাষ এবং শরৎ দুই ভাইও জিতেছেন। কর্পোরেশনের প্রশাসন স্বচ্ছ আর জনকল্যাণমূলক করে তোলার স্বপ্ন দেশবন্ধুর। তাই তিনি সুভাষকে কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার হিসেবে চান। সুভাষ কিন্তু একেবারেই রাজি নন। সে কথা স্পষ্ট বলে দিলেন দেশবন্ধুকে, কোনওরকম গোলামগিরি-ই আমার চাই না।'

'এটা আপসও নয়, গোলামিও নয় সুভাষ। ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখ। আমি একটা বিশেষ দিক থেকে দেখছি সমস্ত ব্যাপারটা।' দেশবন্ধুর আশেপাশে অনেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি। তাঁদের মধ্যে আছেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, ব্যারিস্টার কিরণশঙ্কর রায় এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত সরকার, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় আরও অনেকে। দেশবন্ধু চান সুভাষকে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। বাসন্তী দেবী উদ্বিগ্ন। দেশবন্ধুর গলা বসে গেছে। তিনি বললেন, 'স্বরাজ পাওয়ার জন্য প্রাণপাত করে চলেছ তোমরা। মনে কর আগামী দিনে ব্রিটিশ ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দিল। সেই স্বাধীনতা রক্ষা করবে কী করে? রাজ্যশাসন করার জন্য আমরা কী লন্ডন থেকে লোক নিয়ে আসব? আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে আমরাও প্রশাসন চালাতে পারি।'

দেশবন্ধুর কথা মনে ধরল উপস্থিত সবারই। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে দেশবন্ধু বললেন, 'কর্পোরেশনকে সাধারণ মানুষের জন্য এক সেবা মন্দিরের দৃষ্টান্ত করে তুলতে হবে আমাদের। তাই তোমাকে পাশে পেতে চাই আমি। তুমি পাশে থাকলে সিভিল সার্ভিসের ব্রিটিশ অফিসারদের বাগে রাখতে পারব আমি।' সুভাষ শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। হাসি ফুটল বাসন্তী দেবীর মুখে। দেশবন্ধু আশ্বস্ত। ১৯২৪ সালের ১৪ এপ্রিল। চৌরঙ্গির রাস্তায় দাঁড়িয়ে কর্পোরেশনের লাল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে অনেক স্বপ্ন তাঁর মনে। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে অনেক জোড়া কটা চোখ। সেসব চোখে অসন্তোষের প্রকাশ স্পষ্ট। মাত্র সাতাশ বছরের এক নেটিভ ছোকরা তাদের ওপরওয়ালা হয়ে বসবে? দেশি লোকের অধীনে কাজ করতে হবে তাদের? লাটসাহেবের কাছে দরবার করে এ নিয়োগ মাসখানেক আটকে রাখলেন তারা। পরে অবশ্য আর আটকানো গেল না।

সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করার জন্য কেরানি, ঝাড়ুদার, মজুররা সোৎসাহে হাজির কর্পোরেশনের প্রবেশদ্বারের সামনে। তাদের উদ্দেশ্যে সুভাষ বললেন, 'আমাদের এই পরাধীন দেশে কেউ লর্ড নয়। আপনারা সবাই মিলে এগিয়ে আসুন। সবাই মিলে আমরা এই

কর্পোরেশনকে সমাজসেবার এক পবিত্র মন্দির হিসাবে গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে যাই।'

কাজে নতুন উৎসাহ আসে। বহুদিন ধরে টেবিলে পড়ে থাকা ফাইলের পাহাড় সাফ হয়। শহরের রাস্তাঘাট সম্পর্কে অনেক অভিযোগ রয়েছে। চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের টেবিলে রাখা ঘণ্টা বাজে। পিওন এলে তাকে বললেন, 'চিফ ইঞ্জিনিয়ার কোটস সাহেবকে ডেকে আনো।' কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, 'উনি বললেন, উনি এখন কাজে ব্যস্ত।'

সন্ধেবেলায় আবার খবর পাঠানো হল। কোটস সাহেব তখনও ব্যস্ত। তারপর একসময় খবর না দিয়েই দরজা ঠেলে ভেতরে এলেন কোটস। সুভাষচন্দ্রের সামনের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে সিগারেট টানতে লাগলেন তিনি। ফাইল থেকে মুখ তুলে সুভাষ হেসে বললেন, 'ঊর্ধ্বতন পদাধিকারীর মুখে ধোঁয়া ছাড়াটা বোধহয় আপনার কাছে সভ্যতার পরিচয়। তাই না মিস্টার কোটস!' কোটস ঘাবড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি সিগারেট নিবিয়ে পাশে ফেলে দিলেন। 'একসকিউজ মি স্যার।'

'আপনার চেয়ারে বসার ভঙ্গিটাও কিন্তু ক্লাবে বসে থাকার মতো। অফিসে ঠিক মানায় না। আশা করি বুঝতে পারছেন।'

'আই অ্যাম ভেরি সরি স্যার।' লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে উঠলেন কোটস।

কর্পোরেশনের সি ই ও-র সম্মান বেড়ে চলে। দেশবন্ধুর মাথায় তিন বিরাট দায়িত্ব। আইনসভায় 'স্বরাজ্য খিলাফত' দলের নেতৃত্ব, বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আর কর্পোরেশনের মেয়র। কর্পোরেশনের কাজ যতদূর সম্ভব সুভাষের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত তিনি। একাগ্র নিষ্ঠায় সুভাষও তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন। কর্মচারীদের সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্ট আর দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হঠাৎ কাজের চাপ বাড়লে ফাইল রাত্রে বাড়িতে যায়, সকালে ফিরে আসে উপযুক্ত মন্তব্যসহ সই হয়ে।

কলকাতা কর্পোরেশনে স্বরাজ্য দলের কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। কুটির শিল্পগুলিকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। কর্মীদের পোশাক স্বদেশি খাকি কাপড়ে তৈরি হল। সাহেবদের আবার সেটা দৃষ্টিশূল। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হল। ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় কর্পোরেশনের প্রথম শিক্ষা অধিকর্তা হিসাবে যোগ দিলেন। সুভাষকে অনুসরণ করে তিনিও আই সি এস পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাজের মধ্য দিয়ে পুরনো বন্ধুত্ব দ্বিগুণ হল। শহরে জলসরবরাহের জন্য নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হল। তরুণ বয়সে দেখা স্বপ্ন রূপ পাচ্ছে বাস্তবে। এলগিন রোডের বাড়িতে কখনও আসেন দিলীপকুমার রায়। কখনও বসে কাজী নজরুলের কবিতাপাঠের আসর। বাংলায় তখন সাড়া ফেলেছেন নজরুল।

রাইটার্স বিল্ডিং-এর তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে কর্পোরেশনের লালবাড়িটির ওপর। স্বরাজ্য দলের এই নতুন দুর্গটি দিনে দিনে পোক্ত হয়ে উঠছে। শহরে বড়লাট বা অন্য কোনও সরকারি হোমরা চোমরা এলে কর্পোরেশনের তরফ থেকে তাদের অভ্যর্থনার এলাহি ব্যবস্থা এখন বন্ধ। এখন স্বাগত সমারোহ হয় মহাত্মা গাঁধী, মতিলাল, লাজপত রায় বা আজমল হাকিম খানের মতো নেতাদের জন্য। শহরকে চিত্রকরের মতো দৃষ্টি মেলে দেখছেন এক সোনার ফ্রেমের চশমাপরা স্বপ্নময়, খদ্দরধারী যুবক। নাগরিক জীবনে আসছে এক নতুন চেতনা। দিনে দিনে তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব প্রখরতর হয়ে উঠছে। সেই বিকাশে অনেকে বিস্মিত আবার অনেকে আতঙ্কিত। আই সি এস পদে ইস্তফা দিয়ে যেদিন তিনি হাওড়া স্টেশনে পা রেখেছিলেন সেইদিন থেকেই অনেকগুলো চোখ নিরন্তর নজর রাখছিল তাঁর ওপর। কলকাতা কর্পোরেশনের বাড়িটার ওপরও এখন সেই চোখগুলোর শ্যেনদৃষ্টি। কে এল, কে গেল প্রত্যেকদিন তার বিবরণ রাখতে

হয় তাদের। গভীর রাত্রে সুভাষ যখন শয্যায় গা এলান তখনও তাদের নজর রাখা শেষ হয় না। অনেক দিন রাতে সুভাষ যান বাসন্তী দেবীর কাছে। সেখানেই রাতের খাওয়া সেরে গল্পগাছা করেন। বাইরে হয়তো বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তার দিকে তাকালে দেখা যায় ল্যাম্পপোস্টের তলায় এক বেচারি টিকটিকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। বাসন্তী দেবী তাড়া লাগান, 'সুভাষ ওঠ। কতক্ষণ আর কষ্ট দিবি বেচারিকে।'

একদিন রোগা, লম্বা এক মহিলা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পরনে সাদা থান, মাথার সিঁথি সাদা। এককালের ফরসা রং জ্বলে গেছে। শরীর শুধু রোগা নয় বলতে গেলে রুগ্‌ণ। চেহারায় দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর ছাপ। কিন্তু চোখে এখনও সংকল্পের দ্যুতি।'চিনতে পার সুভাষ।' করুণস্বরে বললেন মহিলাটি। গলার আওয়াজ দারুণ চেনা মনে হল। স্মৃতির গভীরে হাতড়াতে থাকেন সুভাষ। হদিশ মেলে না। মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি।

পথশ্রমে ক্লান্ত মহিলাটি বিনা অনুমতিতেই সামনের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন। খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'চৌরঙ্গি রোডের সেই বাড়িটা— ড. ভট্টাচার্য—বোমা—।' সুভাষচন্দ্রের মনের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল—মুখ থেকে আপনিই যেন বেরিয়ে এল, 'মায়ী?' মহিলাটিকে ভাল করে দেখে বিষাদে মন ভরে যায়। সাদা থান, শুভ্র সীমন্ত। সুভাষ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে হল? ড. ভট্টাচার্য—?'

ইঙ্গিতে চুপ করতে বললেন মহিলাটি। তার মুখটা আরও ফ্যাকাসে হয়ে যায়। কিছু একটা বলতে চান তিনি। সুভাষ আরদালিকে দরজা বন্ধ করতে বললেন। টেবিলে রাখা গেলাসের জলটুকু ঢকঢক করে খেয়ে চুপিচুপি বলতে লাগলেন, 'তিনি আছেন। কখনও অন্ধ্রে, কখনও দিল্লিতে। জানোই তো তাঁর হাতে বোমা তৈরির জাদু আছে। সারা শরীর পুড়ে গিয়েছিল কিন্তু প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন সে যাত্রায়। বোমা তৈরিও চলছে।'

'তবে আপনার এ বেশ কেন মায়ী?'

'বাড়িতে বৃদ্ধ মা বাবা। রোজ রোজ পুলিশের হামলা— তল্লাশি, জবানবন্দি নেওয়া। তারপর একদিন তিনি নিজে হাতে আমার মাথার সিঁদুর মুছে দিলেন। বললেন, স্বামী থাকা সত্ত্বেও বিধবার মতো থাকার যন্ত্রণাটা তোমাকে সইতে হবে দেশের জন্য।'

ফুঁপিয়ে ওঠেন মায়ী। 'তিনি তো হিল্লি দিল্লি ঘুরে বোমা বানাচ্ছেন। এদিকে আমাদের সংসার অচল। শুনলাম তুমি এখন মস্ত লোক। তাই এলাম। পেট চালাবার মতো একটা চাকরি যদি দিতে পার।' আর বলতে পারেন না মায়ী।

'এখানে কি করবেন মায়ী?'

'ঝাড়ুদারনির কাজ পেলেও চলে যাবে।'

'ঠিক তো। ঝাড়ুদারনিদের কাজ দেখাশোনার কাজ করতে পারেন আপনি।'

মায়ী আশীর্বাদ করে উঠে দাঁড়ালেন। 'সুভাষ একলা আমাকে দেখলেই কিন্তু হবে না। কারাগারে, দ্বীপান্তরে যারা গেছে তাদের স্ত্রীপুত্ররা একেবারে অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছে। যতটা পার তাদের সহায় হও।'

রামাইয়াকে ডেকে পাঠালেন সুভাষ। পরের দিন থেকে মায়ীকে কাজে নিয়োগের আদেশ দিলেন তিনি।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল সুভাষের কাছে আসছে বিচিত্র সব মানুষেরা। রুগ্‌ণ দেহ, জীর্ণ পোশাক, দিশেহারা চোখ। পটাপট চাকরিও পেতে থাকে তারা। রামাইয়া বুঝতে পারে না এমন সব লোকের ওপর সুভাষের এত দরদ কেন? সন্ধানী দৃষ্টি সতর্ক থাকে তার।

হঠাৎ একদিন পুলিশ কমিশনারের গাড়ি কর্পোরেশনের দরজায় এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামলেন স্বয়ং চার্লস টেগার্ট। কর্পোরেশনে চাঞ্চল্য। টেগার্টের পরিচিতি বিপ্লবীদের যম হিসেবে। এই খ্যাতিমান ব্যক্তিটির আগমনে সুভাষ সতর্ক হয়ে উঠলেন।

'আসুন কমিশনার সাহেব।'

'আমি শুধু একটা লিস্ট নিতে এসেছি।'

'লিস্ট? কীসের লিস্ট?'

'নতুন যারা চাকরি পাচ্ছে তাদের লিস্ট।'

প্রিন্স অফ ওয়েলস যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন ডিকির সেই লাখ কথার এক কথা ভোলেননি টেগার্ট, 'হি ইজ ডেঞ্জারাস, টু-উ ডেঞ্জারাস—বিপজ্জনক লোক, ভয়ংকর বিপজ্জনক।'

সম্প্রতি টেগার্ট দিল্লিতে হোম সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনার জন্য গিয়েছিলেন।

'কলকাতার খবর কী মিস্টার টেগার্ট?'

'সব ঠিক আছে।'

'কলকাতা মানে তো স্টেট উইদিন স্টেট—রাজ্যের মধ্যে রাজ্য।'

'স্যার?'

'বুঝতে পারলেন না। বাংলার প্রশাসন স্বরাজ্য দলের হাতে—আর তার মধ্যে আমাদের শাসন।'

'স্যার—!' টেগার্ট বেশ বিব্রত।

চোখ টিপলেন হোম সেক্রেটারি। 'কন্ট্রোল ক্যালকাটা মিস্টার টেগার্ট। নয়তো একদিন দেখবেন লাটভবনে গিয়ে কোনও ছেলেছোকরাকে সেলাম করতে হবে। এভাবে চললে সে দিন আসতে বেশি দেরি হবে না।'

এরকম অস্বস্তিকর অবস্থায় টেগার্ট এর আগে কখনও পড়েননি। সুভাষের সামনে বসে অসংখ্য প্রশ্ন উঁকি মারে তাঁর মনে। আই সি এস পাশ করেও তাতে একজন কী করে ইস্তফা দিতে পারে? হয়তো এই ছোকরা আন্তর্জাতিক কোনও দলের একজন! তারপর দেশবন্ধুর প্রধান চেলা—চিফ একজিকিউটিভ অফিসার পদে নিয়োগ—এসবের পেছনের রহস্যটা কী? গুপ্তচরদের খবর সত্যিও হতে পারে। যুগান্তর সমিতির লোকেরাই একে ওই পদে বসাবার জন্যে দেশবন্ধুকে চাপ দিয়েছে। তাই তাদের উপকারের প্রতিদান দিতে এই ছোকরা বিপ্লবীদের আত্মীয়স্বজনদের ঢালাও নিয়োগপত্র দিয়ে চলেছে বেআইনিভাবে। এটা নিশ্চয়ই আতঙ্কবাদীদের পরিকল্পনার একটা অংশ। যে-কোনও মুহূর্তে কলকাতায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

সুভাষের সঙ্গে কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখলেন টেগার্ট। 'কেমন লাগল আমাদের কাজকর্ম? গরিব জনতা যাতে কর্পোরেশনকে তাদের নিজেদের ভাবে তার প্রতিই লক্ষ্য আমাদের।' সুভাষ বললেন।

'গরিবরা না হোক বিপ্লবীরা তো কর্পোরেশনটা তাদের বলে মনে করছে, তাতেই কাজ হবে।' গলায় বিষ ঢেলে বলেন টেগার্ট।

৮

'সুভাষ, এবার বিয়েটা সেরে বখেড়া মিটিয়ে ফেল। একগাদা মেয়ে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তো বটেই, তবে তাদের চাইতেও বেশি হেদিয়ে মরছে মেয়ের বাবারা।' দেশবন্ধু বললেন।

'সবার ধারণা যে সুভাষ যদি বিয়ে করে একমাত্র দাশবাবুর কথাতেই করবে।' বাসন্তী দেবী বলে ওঠেন।

'ব্যাপারটা তা নয় মা। এখন বিয়ে তো দূরের কথা বিয়ের কথাবার্তাও আমার পক্ষে অসম্ভব। কর্পোরেশনের দায়িত্ব, প্রদেশ কংগ্রেসের সেক্রেটারির কাজ আর জামশেদপুরের শ্রমিকদের জন্য কাজ—একসঙ্গে এতগুলো কাজ। সময় কোথায় বলুন? এই প্রসঙ্গ ছাড়া আর যা ইচ্ছে বলুন।' সুভাষ তাড়াতাড়ি বিষয়ান্তরে চলে গেলেন। কিন্তু বাসন্তী দেবীর মনে ঘুরে ফিরে একই কথা। মেয়েপক্ষরা তাঁকেই ধরাধরি করছে। এমনকী সুভাষের মা-ও পেছনে লেগে রয়েছেন। ক্রমাগত বলে চলেছেন, 'বাসন্তী একটু দেখ। কত ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে। তারা হাপিত্যেশ করে বসে আছে। বারবার খবর নিচ্ছে। তা আমি কী করব? এক তুমি যদি রাজি করাতে পার। এখন তো মা বলে, তোমাকেই বেশি মানে।' কথাটা মিথ্যে বলেননি সুভাষজননী।

ভেবে কূল পান না বাসন্তী দেবী। পরশু থেকে অনবরত লোক আসছে শ্যামকান্ত দত্তের স্ত্রীর কাছ থেকে। বিরাট অবস্থা, দেশবিদেশে আমদানি রপ্তানির ফলাও ব্যাবসা। তাঁর মেয়ে মোহিনী নাকি অসাধারণ ভাল ছবি আঁকে। তা ছাড়া সবাই বলে মেয়েটি নিজেও যেন একটি পটে আঁকা ছবি। দেশবন্ধুকে বললেন সব কথা।

'তা তুমি কী বললে?' দেশবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন।

'বললাম ছেলেই রাজি হচ্ছে না আমরা আর কী করতে পারি? কিন্তু ভবি তো ভোলার নয়। দু'একদিনের মধ্যে একেবারে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন বলেছেন।'

সকালের জলখাবার পর্ব মিটেছে। গুরুশিষ্য কাজে বেরোবেন, এমন সময় বাইরে গাড়ি এসে থামল। হেমন্ত নীচে থেকে বলল, 'দেশবন্ধু, এক ভদ্রমহিলা একটি মেয়েকে সঙ্গে করে এসেছেন।'

সুভাষচন্দ্রের মুখের অবস্থা দেখে দেশবন্ধু আর বাসন্তী দেবী মজা পান। দেশবন্ধু চোখ নাচিয়ে বললেন, 'কী সুভাষ? অতঃ কিম্?'

'আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।' সুভাষ তাড়াতাড়ি বলেন।

'যাবে কোথা দিয়ে? দুয়ারে দাঁড়ায়ে তিনি।' দেশবন্ধু তারিয়ে তারিয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করছেন।

বাসন্তী দেবী বললেন, 'এসেই যখন পড়েছে, আলাপটা করেই যাও না।'

'না, না। মা আমার দিব্যি রইল। ওটা করবেন না। আমি বরঞ্চ এখানে বসে থাকি। অতিথিরা বিদায় হলেই বের হব।' সুভাষের রীতিমতো কাতরতা।

অতিথিরা নীচে বসার ঘরে বসে আছেন। দেশবন্ধু নীচে নামলেন। সুভাষ যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে মাতা-কন্যাকে স্পষ্ট দেখা যায়, তবে ওঁরা সুভাষকে দেখতে পান না।

মেয়েটির নাম মোহিনী। সার্থক নাম। মনে হচ্ছে কোনও কাব্যের নায়িকা জীবন্ত হয়ে এসে হাজির হয়েছে। সত্যিই হরিণের মতো চোখ, গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট, ললিত লবঙ্গলতা চেহারা, কাটাকাটা মুখ, খোলা চুল পিঠ ছেয়েছে। মেয়েটির মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। গলার আওয়াজও মিষ্টি। বারবার ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে। মেয়েটিকে দেখে বাসন্তী দেবীর মন ভরে যায়।

'আমাদের মেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পাঁশ করেছে।' মেয়েটির মা বললেন।

পাশ থেকে মেয়েটি বলল, 'ফিলজফি নিয়ে।'

দত্তগিন্নি বললেন, 'জানেন দিদি আমাদের ওনার আমদানি-রপ্তানির কারবার। খড়্গপুরে একটা কারখানাও আছে। মোট সম্পত্তি তা মা লক্ষ্মীর দয়ায় কোটি টাকার হবে। একটাই মেয়ে। সুভাষকে আমাদের সকলের খুব পছন্দ।'

'জানেন তো সুভাষের পায়ে চাকা লাগানো। ওর দ্বারা সংসার কী করে হবে?' বাসন্তী দেবী বললেন।

'আমার মোহিনী সব সামলে নেবে। আপনারা একটু চেষ্টা করুন। তারপর দেখবেন বিয়েতে কিচ্ছুটি বাদ পড়তে দেব না।'

কাজের অজুহাত দেখিয়ে বাসন্তী দেবী ওপরে এলেন। সুভাষের কাছে গিয়ে বললেন, 'কী কেমন?'

'ভাল।'

'নীচে গিয়ে বলছি তা হলে।'

'না, না।' সুভাষ সজোরে মাথা নাড়েন।

'তুমি একটা পাগল। এমন চাঁদের মতো মেয়ে। নিজে থেকে এসেছে। এরকম মেয়ে আর কখনও পাবে তুমি?'

'মা আপনি এখন এখান থেকে যান দেখি।' সুভাষ দাবড়ে ওঠেন।

নীচে ততক্ষণ মা মেয়ের আঁকা ছবির তাড়া বার করেছেন। ছবিগুলো খুব সুন্দর। বেশির ভাগই প্রাকৃতিক দৃশ্য। পাহাড়, নদীর পাড়, বৃষ্টি-ভেজা গ্রাম— সব বেশ পাকা হাতের কাজ। এরপর দত্তগিন্নি দুটি পোর্ট্রেট অতি সাবধানে বার করলেন। একটা মোহিনীর নিজের আর একটা সুভাষচন্দ্রের। সুভাষ ওপর থেকে নিজের ছবিটা দেখতে থাকেন। মাথায় সাদা টুপি, গলার পাশ দিয়ে গায়ের শালের পাড় নেমে গেছে। মুখে সুভাষের সেই বিশিষ্ট হালকা হাসি। সত্যি অপূর্ব ছবিটি।

লজ্জা লজ্জা ভাবে মোহিনী বলে, 'আসলে উনি এত সুন্দর, এত... কী বলব— এত ব্যক্তিত্বময় যে ওঁর ছবিটা যদি খারাপ হত তা হলে আমার তুলিটাই ভেঙে ফেলতাম।'

'সত্যি দিদি সুভাষ কী সুন্দর! এক মতিলাল নেহরুর ছেলে জওহরলাল ছাড়া ওর পাশে কেউ দাঁড়াতেই পারে না,' দত্তগিন্নি রীতিমতো গদগদ।

বাসন্তী দেবী আর দেশবন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। অনেকবার মামলার ব্যাপারে দেশবন্ধু আর মতিলাল আদালতে মুখোমুখি হয়েছেন। এলাহাবাদ আর কলকাতার হাইকোর্ট দু'জন দু'পক্ষে দাঁড়িয়ে সওয়ালের তুবড়ি জ্বালিয়েছেন। সারাদিন আদালতে ধুন্ধুমারের পর রাতে চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে মজলিশ জমেছে দুজনের। মতিলালের সঙ্গে জওহরলালও বার দুই এসেছেন এই বাড়িতে।

দেশবন্ধু এবার মোহিনীকেই বললেন, 'দ্যাখো মা, সুভাষের ব্যক্তিত্ব যতই হোক ওকে দিয়ে কি সংসার হবে? তা ছাড়া ব্রিটিশের প্রচণ্ড রাগ ওর ওপর। সুযোগ পেলে ফাঁসি দেবে ওকে। সুভাষকে বিয়ে করা মানে জ্বলন্ত কয়লা আঁচলে বাঁধা।'

'সুভাষের ফাঁসি' কথাটা শুনেই মোহিনীর চোখ ফেটে জল আসে। কিন্তু তারই মধ্যে এক অদ্ভুত জ্যোতি তার জলভরা চোখে। একটুও না দমে সে আস্তে আস্তে বলল, 'এমন শক্তিমান

পুরুষকে আঁচলে বেঁধে যদি বাকি জীবনে বৈধব্যও বরণ করতে হয় তা হলেও নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবব আমি।'

এবার দত্তগিন্নি হাল ধরলেন। 'দেখুন এ বিয়ে যদি হয় তবে টিলক ফান্ডে একলাখ-দুলাখ দান করতেও রাজি আছি আমরা।'

মাতা-কন্যা যাবার জন্য উঠলেন। পোর্ট্রেট দুটো আলাদা করে বাসন্তী দেবীর হাতে দিয়ে মোহিনী বলে, 'আমার হয়ে এই ছবিদুটো দয়া করে তাঁর হাতে তুলে দেবেন। অন্তত আমার ছবিটা তো থাকবে তাঁর কাছে।' বলে মুখ ফেরায় সে। গাড়ি চলে যায়।

এতক্ষণ একভাবে বসে থাকার পর অবসন্নভাবে উঠে দাঁড়াল সুভাষ। ঠিক তখনই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে দেশবন্ধু উঠে এলেন। ছদ্মগাম্ভীর্যে বললেন, 'শ্রীমান সুভাষচন্দ্র। আপনার একটি মাত্র সিদ্ধান্তে কংগ্রসের কী বিরাট লোকসান হয়ে গেল! টিলক ফান্ডের জন্য দু'লক্ষ টাকা আসতে আসতে চলে গেল। ঘাটে এসে নৌকো ডোবার জন্য তুমিই দায়ী।'

সবাই হেসে ফেললেন। হেমন্তও সুভাষকে খেপাতে ছাড়ে না। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। একেবারে দুপুরের খাওয়া সেরেই বেরোবার সিদ্ধান্ত হল। বাসন্তী দেবী সকলের জন্য তাড়াতাড়ি ভাতে ভাত ফুটিয়ে দিলেন। পোর্ট্রেটটা সুভাষেরও ভাল লেগেছিল। বাসন্তী দেবী বললেন ও দুটো নিতে সুভাষ যেন ভুলে না যায়। এত ভাল সম্বন্ধ হাতছাড়া হওয়ায় বাসন্তী দেবীর সত্যিই মন খারাপ। তিনি বললেন, 'সুভাষ। এখন তো অনেক বয়েস হয়ে গেছে। তবু মনে হয় জীবনে আদর্শের যেমন দাম আছে, ভালবাসারও তেমনি দাম আছে।'

'কিন্তু মা, আমার মনের সব ভালবাসা যে আমার আদর্শকে ঘিরে। আর কিছুর জায়গাই নেই সেখানে।' সুভাষ বলেন।

'ওরে ভাগ্যের দান অবহেলায় ঠেলে দিলে ভাল হয় না।'

'মা আপনি বুঝে দেখুন...।'

সুভাষকে থামিয়ে দেন বাসন্তী দেবী। 'কিছু বোল না আমাকে। তোমার কোনও কথা শুনতে আমার ইচ্ছে করছে না।' বাসন্তী দেবী রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সদা হাস্যময়ী, মূর্তিমতী প্রেরণাস্বরূপ বাসন্তী দেবীকে এত বিক্ষুব্ধ আগে কখনও দেখেননি সুভাষ। তাঁর এমন মূর্তি দেখে সুভাষ তো বটেই দেশবন্ধুও হতচকিত।

৯

সুভাষের বাড়ি ফিরতে রাত ভোর হয়ে গিয়েছিল। চনমনিয়ে রোদ্দুর উঠে গেছে। ঘরের মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়ে সুভাষ তখনও গভীর ঘুমে। বিভাবউদি বার দুই উঁকি মেরে দেখে গেছেন। ছোট ঠাকুরপোর ওঠার কোনও লক্ষণ নেই। মা ঠাকুরঘরে অনেকক্ষণ ঢুকেছেন। নীচের ঘরে মেজদাদা কাজে ব্যস্ত। স্বরাজ্য দলের অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন তিনি। ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্রের খাস সহায়ক হলেন তরুণ নীরদ চৌধুরী। চৌধুরীবাবু এ মাসের ছাত্রবৃত্তি বাবদ খরচের হিসেব করছেন। অনেক দুঃস্থ ছাত্রকেই পড়াশোনার জন্য সাহায্য করেন শরৎচন্দ্র।

সকালে ঘর সাফ করতে পরিচারিকাকে নিয়ে বিভাবতী সুভাষের ঘরে এলেন। হঠাৎ নজরে পড়ল বিছানার পাশে খবরের কাগজে মোড়া একটা বান্ডিলের দিকে। কাছে গিয়ে বুঝলেন ওটার মধ্যে ছবি আছে। চৌধুরীবাবুকে ডেকে বাইরে নিয়ে যেতে বললেন বান্ডিলটা। ঠাকুরের ছবি হলে ঠাকুরঘরে আর কোনও গণ্যমান্যের হলে কাছারি ঘরে রেখে দিতে বললেন চৌধুরীবাবুকে।

বিভাবতী রান্নাঘরে ঢুকেছেন এমন সময় নীচ থেকে জোরে জোরে ডাক শুনতে পেলেন। 'মা মা শিগগির আসুন। এই দেখুন নতুন বউদি।' তাড়াতাড়ি বাইরে আসেন বিভাবতী। দুটো ছবির একটা সুভাষচন্দ্রের আর একটা একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ের। কার ছবি জিজ্ঞেস করার আগেই চৌধুরীবাবু 'নতুন বউদি, নতুন বউদি' বলে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন। চেঁচামেচি শুনে অশোক, শিশির, অমিয় সব ভাইপো আর তাদের সঙ্গে ভাইঝিরা এসে জমা হল সেখানে। সবাই মোহিনীর ছবিটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বাচ্চারা সবচেয়ে খুশি। এ ওকে ধাক্কা দিয়ে, চোখ বড় বড় করে বলে, 'কী সুন্দর না?'

গোলমাল শুনে মা-জননীও ঠাকুরঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন। 'কী হয়েছে বিভা? দেখি দেখি। এ কে গো? কার ছবি এটা?' ছবিটা হাতে নেন তিনি। সারা মুখে একটা খুশির হাসি ঝলক দিয়ে ওঠে। আনন্দে তিনি বলেন ওঠেন, 'বাঃ, বাঃ। কী সুন্দর না? যেমন ঝলমলে চেহারা তেমনি মুক্তোর মতো দাঁত। আহা! হাসিটা ভারী মিষ্টি।' সবাই খুশি। বাচ্চাদের দু-তিনজন শরৎবাবুকে ডেকে আনতে কাছারি ঘরে দৌড়ল।

মা-জননী আনন্দে আত্মহারা। তিনি বললেন, 'যাক বাবা। একটা চিন্তা গেল। সুভাষের পছন্দ। ছেলে আমার ভুল করার পাত্র তো নয়। কিন্তু বিভাবতী এসব হল কখন?'

'কালকের ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

শরৎবাবু এসে পড়লেন। সকলের মতো তিনিও খুশি। তাঁরও খুব পছন্দ হয়েছে মোহিনীকে। দুটো ছবি পাশাপাশি রেখে বাচ্চারা আনন্দে উচ্ছল। বিভাবতী দাশবাড়িতে তাড়াতাড়ি ফোন করলেন, 'বাসন্তী, এ ছবিটা কার? কী সুন্দর ছবিটা!'

'সামনে থেকে দেখলে চোখ আরও জুড়িয়ে যাবে! আপনাদের পছন্দ হয়েছে?' বাসন্তী দেবীর কথা ভেসে আসে ফোনে।

'সারা বাড়ি খুশিতে ডগমগ।'

'আমার-ও কাল সন্দেহ হয়েছিল। সুভাষ চুপচাপ ছবিটা নিয়ে গেছে দেখেই বুঝেছি এবার মাছের গলায় বঁড়শি গেঁথেছে।'

'হ্যালো, মেয়েটি কার?'

'শঙ্কর দত্তের মেয়ে।'

'বাঃ বাঃ। দেখছি পালটি ঘরেরই মেয়ে।'

'বিভা, আমরা দুজনেই তোমাদের ওখানে আসছি। সবাই মিলে হইচই করা যাবে।'

বাড়িতে মিষ্টি বিলি শুরু হল। হাসি ঠাট্টায় বাড়ি জমজমাট। ড্রাইভার, চাকরবাকর সবাই আনন্দে ভাসছে। দেশবন্ধু আর বাসন্তী দেবীও ইতিমধ্যে এসে পৌঁছলেন। খুশির ঢেউ আরও উচ্ছল। হাসির ফোয়ারা উঠছে। হইচই-এ সুভাষচন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেল। ঘর থেকেই হাঁক মারলেন তিনি, 'কী ব্যাপার? এত হইচই কীসের?'

সুভাষের আওয়াজ পেয়ে কচিকাঁচারা 'রাঙাকাকা উঠেছে, রাঙাকাকা উঠেছে' বলতে বলতে ঘরে এসে বিছানার ওপর উঠে পড়ে। কেউ তার ওপর দাঁড়িয়ে লাফায়, কেউ ডিগবাজি খায়, কেউ বিছানার ওপর নাচতে থাকে।

'রাঙাকাকু, চকোলেট দিতে হবে, খাওয়াতে হবে আমাদের।'

'সে দেব এখন। এখন বল তো, কী ব্যাপার?'

'একলা একলা গিয়ে বিয়ে ঠিক করে ফেললে, আমাদের নিয়ে গেলে না কেন?'

'তোমাকে এর জন্য ফাইন দিতে হবে।'

'কাকি কী সুন্দর দেখতে।'

সুভাষচন্দ্র ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। ব্যাপার গুরুতর মনে হচ্ছে। চট করে বৈঠকখানায় এলেন তিনি। সবাই যেন পাকাদেখার আসর জমিয়ে বসেছেন। সামনে রাখা ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে সব বুঝে যান তিনি। তাঁর চেহারা দেখে চুপ করে যান সকলে। সুভাষবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'সেই আমেনটা কোথায়?'

আমেন ড্রাইভার কাঁচুমাচু মুখে সামনে এসে দাঁড়ায়। সুভাষচন্দ্র ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে? এই দ্বিতীয় ছবিটা এখানে এল কী করে?'

'আপনিই তো কাগজে মুড়ে ছবিটা গাড়ির ডিকিতে রাখতে বলেছিলেন।'

'আমি তো শুধু আমার ছবিটা রাখতে বলেছিলাম।'

'না বাবু। আপনি শুধু বলেছিলেন ছবি রাখতে। আমি কী জানি একটা ছবি না দুটো ছবি? তা ছাড়া আমি তো দেখিওনি। কাগজে মুড়ে ডিকিতে রেখে দিয়েছি।'

রঙ্গরস উধাও। সবাই মুষড়ে পড়লেন। এক মা-জননী দমলেন না। তিনি সুভাষচন্দ্রকে বললেন, 'যা হবার হয়েছে। কিন্তু মেয়েটি কী মিষ্টি দেখতে। ছেলের বউ হিসেবে খুব পছন্দ হয়েছে আমার। সম্ভব হলে শুভ কাজটা করে ফেলাই আমার ইচ্ছে।'

'কিন্তু মা, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করবে নাকি তোমরা!' সুভাষ রেগেমেগে বললেন।

'ঠিক আছে। যা ইচ্ছে কর। অন্যকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কী পারিস তুই?' চোখের জল মুছতে মুছতে মা নিজের ঘরে চলে গেলেন।

হাসি থেমে গেছে। শরৎবাবুর মুখ নিচু। চুপচাপ কোর্টে চলে গেলেন তিনি। বাচ্চারাও বিমর্ষ। দিন দুপুরেই বসুবাড়িতে যেন আঁধার নেমেছে। দেশবন্ধু আর বাসন্তী দেবীও চলে গেলেন। সুভাষচন্দ্রের কোনও দিকে লক্ষ নেই। বই পড়তেও ভাল লাগছে না। নীচে যারা অপেক্ষা করছে তাদের বলে পাঠালেন আজ কর্পোরেশনে যেতে পারবেন না। শরীর ভাল নেই। মন ভার। তিনতলার ছাদে গিয়ে বাড়ির পেছনের বাগানে নজর পড়ল তাঁর।

নিজের হাজার কাজের মধ্যেও সময় করে ঢাকা থেকে দার্জিলিং যেখানেই গেছেন নজরকাড়া গোলাপগাছের চারা নিয়ে এসেছেন তিনি। বাগানে লাগিয়েছেন নিজের হাতে। অনেকগুলো গাছ সময়মতো জল না পাওয়ায় শুকিয়ে গেছে। ছাদ থেকে দেখে দারুণ দুঃখ পান মনে। বাগানের এককোণে মালি খুরপি হাতে আগাছা নিড়োচ্ছিল। তাকে ডেকে চিৎকার করে ওঠেন সুভাষ, 'এই আহাম্মক। গাছ শুকিয়ে গেছে কেন? সময়মতো জল দিস না? কী করিস সারাদিন?'

ছাদ থেকে তরতর করে নেমে আসেন তিনি। জামা খুলে, গেঞ্জি গায়ে ঝারি হাতে বাগানের দিকে চললেন তিনি। সিঁড়িতে মা দাঁড়িয়ে। বিষাদের মূর্তিমতী প্রতিমা। ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে। চোখে মেঘ জমেছে। সুভাষকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'বাগানে। দেখ না গাছগুলো জল না পেয়ে শুকিয়ে গেছে।'

জমাট মেঘ থেকে এবার বৃষ্টি নামল। চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল ঝরছে। সুভাষ চমকে উঠলেন।

'বাবা। বাগানে গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে তার জন্য কত দরদ তোর! তোর বাকি ভাইরা সবাই ঘরসংসার করছে। তোর ভাইপোদেরও শিগগির-ই বিয়ে দিতে হবে। তোর বংশ কোথায় থাকবে বাবা?' মা চোখ মোছেন।

সুভাষ এগিয়ে এসে মায়ের কাঁধে হাত রাখলেন। মাকে ধরে ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন।

আস্তে করে নীচে বসালেন। তারপর বোঝাতে লাগলেন, 'মা তোমার এই একটা ছেলের জন্য এত দুঃখ করছ তুমি? পূর্বপুরুষদের পাপেই হোক আর অন্য কোনও অভিশাপেই হোক আমাদের এই প্রায় মহাদেশের মতো দেশটা দুশো বছর ধরে শত্রুরা শোষণ করছে মা। এই দেশের ত্রিশ কোটি সন্তানের দিকে একবার তাকিয়ে দেখবে না মা? ওদের শাপমুক্তি কী ভাবে হবে ভাববে না একবার?'

মা কেঁদেই চলেছেন। সুভাষ বলে চলেন, 'মা আমার একমাত্র ধ্যান— দেশমাতৃকার মুক্তি। আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত ভালবাসা, সবকিছুই আমার দেশ। তোমাকে দুঃখ দিয়েছি এতে আমার দুঃখ কম নয় মা। আমাকে ক্ষমা করে দাও মা। কিন্তু অনুমতি দাও, আশীর্বাদ কর আমি যেন দেশের জন্য সংগ্রামে ব্রতী হতে পারি।'

১০

আগামী দিনে বাংলায় যাতে মার্শাল ল জারি না করতে হয় তার জন্য এখন থেকে ব্যবস্থা নিন। 'এ স্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন।'

বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন বলছিলেন। তার পেছনে ফৌজি পোশাকে দুই এ ডি সি সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে। আইনশৃঙ্খলার অবস্থার কথা উঠতেই চিফ সেক্রেটারি পুলিশ কমিশনার টেগার্টের দিকে তাকালেন। টেগার্ট সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়োর একসেলেন্সি, কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদে বোসের নিযুক্তি যাতে না হয় তার জন্য আমি আগেই বলেছিলাম। আমার কনফিডেন্সিয়াল নোটে অনুরোধ ছিল, যে করেই হোক এ নিযুক্তি ঠেকানো হোক।'

'কিন্তু আইন অনুসারে মেয়রের সুপারিশ অগ্রাহ্য করতে আমি পারি না।' লর্ড লিটন চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন।

লাটভবনে প্রশাসনের সর্বোচ্চ আধিকারিকদের এই বৈঠক অনেকক্ষণ ধরেই চলছে। লর্ড লিটন তাঁর খাস পরিষদবর্গকে সচেতন করে দেন, 'বাংলায় উগ্রবাদীরা যেভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তা আতংকের কারণ হয়ে উঠছে। চারদিকের সাপের গর্তে সাপের বাচ্চাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখনই যদি কিছু একটা না করা হয়, তবে বিষে নীল হয়ে যেতে বেশিদিন লাগবে না।'

'বেশি কিছু করতে হবে না। শুধু বোসকে পায়ে বেড়ি পরাবার অনুমতি দিন আপনি। বাকি আমরা সামলে নেব।' টেগার্ট আবার দাঁড়িয়ে বলেন।

'মিস্টার টেগার্ট, আপনিই তো পুলিশ কমিশনার। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করার দায়িত্ব আপনারই।'

'বোস প্রমাণ রেখে কাজ করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বহু বিপ্লবীদের আত্মীয়স্বজনকে চাকরি দিয়েছে সে। কিন্তু তার দ্বারা কিছু প্রমাণ হবে না। বোসই আমাকে হত্যা করার জন্য গোপীনাথ সাহাকে নিযুক্ত করেছিল। শুধু তাই নয়, বোসের সহকারী যতীন দাস আর সত্যরঞ্জন বক্সি সবসময় গোপনে বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সরা সিভিল সার্ভিসের অনেক পদস্থ অফিসারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছে। আজ আমাকে মারার ষড়যন্ত্র চলছে, কাল আপনাদের তাক করা হবে। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। এখনই নজর না দিলে বিপদ হবে।'

'মিস্টার টেগার্টের কথা ঠিক। দিনের পর দিন বাংলায় ক্রমশ বেড়ে চলা বিপ্লবী কার্যকলাপ

আমাদের সকলের পক্ষেই বিপজ্জনক। তা ছাড়া আমাদের সাম্রাজ্যের পক্ষেও এটা এক অশনি সংকেত। একথাটা আমরা যেন ভুলে না যাই।' ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন লর্ড লিটন।

উপস্থিত সবাই নীরব। লর্ড লিটন গম্ভীর। একটু পরে গলা খাঁকারি দিয়ে গলা সাফ করে আবার বলতে শুরু করলেন, 'একথা আমাদের প্রত্যেককে মানতে হবে যে আমাদের অসাবধানতার জন্যই আজ স্বরাজ্য দল বাংলায় জমিয়ে বসেছে। আজ পর্যন্ত মুসলমানরা আমাদের একটা প্রধান সহায়স্তম্ভ ছিল। কিন্তু আজ পরিস্থিতি আলাদা। চিত্তরঞ্জন দাশ সুরাবর্দীকে ডেপুটি মেয়র করেছে। কলকাতার মুসলমান তরুণেরা সুভাষের পেছনে দাঁড়িয়েছে। এ সব কী হচ্ছে? এই জোট যদি এইভাবে টিকে থাকে তো, আমরা রাজত্ব চালাব কী করে?'

লর্ড লিটন একটু জল খেয়ে নিলেন। এখানে উপস্থিত সবাই যে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোক এই কথাটা আর একবার সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিশ্চিত হলেন। তারপর বললেন, 'আপনাদের সবাইকে বিশ্বাস করি তাই বলছি। প্রতিবার গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল মিটিংয়ে দিল্লিতে যাওয়ার সময় আমার ভয় করে। ভাইসরয় রিডিং সাহেব টিটকিরি দিয়ে বলেছেন, বাংলায় যত সিভিল সার্ভিসের লোক আছে তাদের ফিরিয়ে এনে স্বরাজ্য দলের লোকদের সেসব জায়গায় বসিয়ে দিলেই তো হয়। আর এই অবস্থার জন্য দায়ী একটি মাত্র লোক।'

সভায় নিশ্ছিদ্র নীরবতা। লর্ড লিটনের আক্ষেপ থামে না। 'এখন অন্য রাজ্যের গভর্নররাও আমাদের টিটকিরি দিতে শুরু করেছেন। বোম্বাইয়ের গভর্নর অভিযোগ করেছেন। এই সুভাষ বোস পুনাতে ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিল। পুনার কাছেই সিংহগড় বলে শিবাজির একটা দুর্গ আছে। তা ছাড়া পুনাতে টিলকেরও বাড়ি রয়েছে। টিলক আর শিবাজির স্মরণে প্রত্যেক জায়গায় সুভাষ বোস নাকি দু'ঘণ্টা করে ভাবসমাধিতে বসেছিল। তার চোখ দিয়ে নাকি গড়াচ্ছিল অবিরাম অশ্রুধারা। একবার ভাল করে ভাবুন তো, এ দৃশ্য দর্শকদের মনের ওপর কী প্রভাব ফেলবে? পঞ্জাবের গভর্নর বলছিলেন সুভাষ বোস যখন সেখানে গিয়েছিল চারদিন ঘুমোতে পারেননি তিনি।'

মুশকিল হচ্ছে সুভাষকে ফাঁসাবার কোনও প্রমাণ হাতে পাওয়া যাচ্ছে না। সে প্রসঙ্গ উঠতেই লিটন সাহেব জ্বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বোস কিছুই করে না। অথচ সব কাজের পেছনে ওই হচ্ছে নাটের গুরু। মনে রাখবেন আইন আমরাই বানাই, আমরাই প্রয়োগ করি আর তার আওতা কতটা তাও আমরাই স্থির করব।'

প্রচলিত আইনে কাজ হচ্ছে না। দরকার নতুন অর্ডিন্যান্সের। লর্ড লিটন চিফ সেক্রেটারির কাছে জানতে চাইলেন ভাইসরয় এখন কোথায় আছেন। সিমলায় আছেন জেনে বললেন, 'কাগজপত্র তৈরি করুন। দু'দিনের মধ্যে আমাকে সিমলা যেতে হবে।'

১১

হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি চলল, সোজা লালবাজারে। গেটের সামনেই দেখা হল শরৎ বসুর সঙ্গে। দুই ব্যারিস্টার দ্রুত পায়ে চললেন টেগার্ট সাহেবের কামরার দিকে।

যে কেউই কার্ড পাঠাক তাকে বাইরে ঘণ্টা দুই বসে থাকতে হয়। তার অবস্থা বেশ ঢিলে করে দিয়ে তবেই তাকে ডাকেন টেগার্ট সাহেব। কিন্তু মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশের কার্ডটা পাশে সরিয়ে রাখার সাহস টেগার্টেরও নেই। ভেতরে ঢুকতেই কমিশনার বললেন, 'শুনেছিলাম বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সিমলায় গিয়েছিলেন?'

'আপনারা বিশ্রাম নিতে দিলে তো?' সাহেবের প্রশ্নটা এড়িয়ে দেশবন্ধু বললেন, 'আমাদের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসুকে কোন আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে জানতে এলাম।'

'সেটা বলা যাবে না।' টেগার্ট উত্তর দিলেন।

'কমিশনার সাহেব প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেও আমি একজন ব্যারিস্টার। সুভাষের পক্ষের ব্যারিস্টার হিসেবে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি— কোন আইনে সুভাষকে আটক করা হয়েছে?'

ছাদের দিকে তাকিয়ে টেগার্ট নীরব। এইবার গর্জে উঠলেন শরৎচন্দ্র। 'তার বিপক্ষে অভিযোগটা আইনের কোন ধারায় সেটা অন্তত বলুন।'

'আমি জানি না।'

'সুভাষকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে দেওয়া হয়েছিল কি?'

টেগার্ট নিরুত্তর।

'মিস্টার কমিশনার। আমরা এখানে গল্প করতে আসিনি।' দেশবন্ধুর গলা এবার চড়া। 'আপনি নিজেকে আইনের রক্ষক বলে মনে করেন। আপনার সামনে যে দুজন দাঁড়িয়ে দুজনেই ব্যারিস্টার, এ কথাটা স্মরণে রেখে উত্তর দিলে বাধিত হব।'

টেগার্ট এবার চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। দেশবন্ধু আবার প্রশ্ন করেন, 'কোন আইনে সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেফতার করা হয়েছে?'

'রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৮১৮।'

'তা হলে তো বোসকে আপনাদের আদালতে উপস্থিত করতে হবে।' এবার শরৎবাবু বললেন।

একসঙ্গে দুই ব্যারিস্টারের মুখোমুখি হয়ে টেগার্ট সাহেব নাজেহাল। তবু শান্তভাবে বললেন, 'যে সকালে সুভাষ বোসকে আটক করা হয়েছে তার আগের দিন রাত্রে একটা অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে।'

'অর্ডিন্যান্স? এত চটপট?' দেশবন্ধু প্রশ্ন করেন।

'স্বয়ং লর্ড লিটন অর্ডিন্যান্সের প্রস্তাব নিয়ে সিমলায় ভাইসরয়ের কাছে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই টেলিগ্রামে অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে।'

'যাই হোক, আইন অনুসারে বোসকে আপনাদের আদালতে হাজির করতেই হবে।'

'এখন আগের মতো তার আর প্রয়োজন নেই।'

'কেন?'

'সেইজন্যই এই অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে। সরকার এখন যে কাউকে যে-কোনও সময় গ্রেফতার করে যতদিন খুশি হাজতে রাখতে পারে। কোর্টে হাজির করার প্রয়োজন নেই।'

দুই ব্যারিস্টার এবার চুপচাপ। একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছেন। অভ্যাসমতো গোঁফে তা দিচ্ছেন টেগার্ট সাহেব। দেশবন্ধুর দিকে মিটমিট করে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'মিস্টার দাশ, একটা ব্যাপার আমার খুব খারাপ লাগে। সুভাষ বোসের আচরণ আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আপনার মতো কালচার্ড মানুষের যখন বেচাল দেখি দুঃখ হয়।'

'মিস্টার টেগার্ট। আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন, সুভাষ বোসকে গ্রেফতার করার নৈতিক অধিকার আপনাদের আছে? সুভাষ সংগ্রাম করছে নিজের দেশের জন্য। অন্যদিকে অন্যের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে যারা লুটপাট করে তাদের বলা হয় লুটেরা, গুন্ডা,

চোর। মিস্টার টেগার্ট সেই বিচারে আপনি থেকে শুরু করে ইংল্যান্ডের রাজা পর্যন্ত সবাই লুটেরা। আপনাদের মুখে তাই কালচার কথাটা মানায় না।'

পাথরে মাথা কুটে লাভ নেই। দেশবন্ধু আর শরৎবাবু বেরিয়ে এসে কর্পোরেশনের দিকে চললেন। গাড়িতে দেশবন্ধু শরৎবাবুকে বললেন, 'সুভাষের সম্পর্কে এবার ভয় হচ্ছে আমার। অর্ডিন্যান্স আর তার পেছনে কী খেলা চলছে সেটা একটু বুঝে দেখুন। সুভাষ এখন চট করে ছাড়া পাবে মনে হয় না।' দেশবন্ধুর চোখ জলে ভরে যায়।

'সি. আর. আপনি যদি এরকম করেন আমি কী করে বুক বাঁধি। সুভাষ ছাড়া বেশিদিন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' শরৎবাবু বলেন।

দেশবন্ধু আসাতে কলকাতা কর্পোরেশন হয়ে উঠেছে নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর গর্বের প্রতীক। সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্র আর অনিলবরণ সহ স্বরাজ্য দলের সত্তরজন প্রথম সারির কর্মকর্তাকে আটক করা হয়েছে। শহরে উত্তেজনা। সিমলা থেকে অসময়ে ফিরে দেশবন্ধু কর্পোরেশনে এসেছেন একথা ছড়িয়ে পড়ল। তেত্রিশটি ওয়ার্ডের সব ক'জন প্রতিনিধি কর্পোরেশনের দিকে রওনা হলেন। কর্পোরেশন বাড়িটি যেন একাধারে রোমের ক্যাপিটাল আর সেনেট। রোমান সেনেটারদের মতোই কাঁধে শাল ঝুলিয়ে বাঙালি কাউন্সিলররা কর্পোরেশনে চলাফেরা করেন। সাধারণ মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার সেখানে। নগর সেবকদের পেছনে পেছনে আসে সাধারণ মানুষ। দেশবন্ধু যখন এসে পড়েছেন কিছু একটা নিশ্চয়ই হবে।

ভেতরের সভার পর দেশবন্ধু বাইরে জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'বন্দেমাতরম্।' শ্রীঅরবিন্দের মামলার সময় থেকে শুরু করে বাংলার মানুষ দেশবন্ধুর অনেক রূপ দেখেছে। তাঁর লেখা পড়েছে। গাঁধীজির উপস্থিতিতে সেই বিরাট সভা আর মিছিল দেখেছে। কিন্তু আজকে তাঁর মধ্যে যেন এক অন্য দীপ্তি। মনে হচ্ছে বৃদ্ধ সিংহ যেন কেশর ঝাঁকিয়ে খাঁচার মধ্যে পায়চারি করছে। বজ্র গম্ভীরস্বরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করে দেশবন্ধু বলতে থাকেন, 'সুভাষের গ্রেফতার এক অত্যাচারীর জঘন্য কাজ। কেন এই গ্রেফতার? অভিযোগ নেই, প্রমাণ নেই, আদালতে হাজির করার সাহস নেই, কোনও রকম আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। তবু কেন এই গ্রেফতার?'

'ব্রিটিশ যদি সুভাষকে বিপ্লবী মনে করে, তা হলে সে তো আমার চেয়ে বড় বিপ্লবী নয়। আমাকে গুরু বলে মানে সে। সে যদি অপরাধী হয় তো আমি দশগুণ অপরাধী। হিম্মত থাকলে আমাকে গ্রেফতার করুক ওরা। চলুন বন্ধুগণ। আমরা সবাই মিলে আন্দোলন গড়ে তুলি। যতদিন না সুভাষ ছাড়া পাচ্ছে ততদিন থামবে না এই আন্দোলন।'

সুভাষচন্দ্রের জন্য আকুল দেশবন্ধু টেলিগ্রাম করলেন গাঁধীজি, মতিলাল নেহরু, ড. মুঞ্জে আর এন. সি. কেলকারকে। গাঁধীজির কাছে বিশেষ আবেদন জানালেন, 'বাপুজি, আন্দোলনের জন্য ডাক দিন। ওরা আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।' তার উত্তরে গাঁধীজির বিবৃতি বেরোল, 'আইনসভায় স্বরাজ্য দলের সাফল্যে ভয় পেয়ে প্রশাসন তাদের মূলে আঘাত করার জন্যে কুঠার তুলেছে। সুভাষের মতো দ্যুতিমান কর্মকর্তাকে তাই তারা আটক করেছে।' দেশবন্ধু যেন জানকীবাবুর জায়গা নিয়েছেন। রাতে ঘুম নেই, কোনও কিছুতে মন লাগে না। একদিন বাসন্তী দেবীকে বললেন, 'সুভাষের জন্য কেন এমন হয় আমার? চিররঞ্জনের জন্যও তো এত ব্যাকুল হই না আমি।'

তাই বোধহয় হয়। রক্তের সম্বন্ধের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায় আত্মার আত্মীয়তা।

সুভাষকে যতদিন প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হল ততদিন সেখান থেকেই কর্পোরেশনের কাজ

সামলাচ্ছিলেন সুভাষ। জনতার সঙ্গে সম্পর্ক তার থেকেই যাচ্ছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে স্থানান্তরিত করল বহরমপুর জেলে। সুভাষ চলে গেলেন আরও দূরে। চিত্তরঞ্জনের চিত্তই বিকল। সবসময় সুভাষের কথা, সুভাষের চিন্তা। বাসন্তী দেবী বললেন, 'এখানে বসে দিবারাত্র ওর কথা চিন্তা না করে ওর সঙ্গে দেখা করে এস না।' সুভাষের প্রিয় নানান মিষ্টি তৈরি করে দেশবন্ধুকে দিলেন তিনি।

বহরমপুর জেলের অবস্থা দেখে দেশবন্ধুর চোখে জল আসে। সুভাষ এখন দেশবন্ধুকে বাবা বলেন। তিনি বললেন, 'বাবা আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'স্বরাজের স্বপ্ন?'

'না। আপনিই তো শিখিয়েছেন অনেকের আত্মবলিদান ছাড়া স্বরাজ আসবে না।'

'তবে কী স্বপ্ন?'

'আপনি যেন আমার ওপর রাগ করে অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন।'

'না সুভাষ। সেরকম কখনও হবে না। আমার প্রাণ যায় যাক। তোমাকে বেশিদিন জেলে আটকে রাখতে কিছুতেই দেব না।'

দেশবন্ধুর চোখে যেন আগুন জ্বলছে, সমস্ত শরীরে যেন এক আলোড়ন। 'সুভাষ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে লড়াইয়ের দামামা শুনছি। কিন্তু আজ আমার সমস্ত অস্ত্র আমি তোমার হাতে দিয়ে যেতে চাই।' আনমনা হয়ে যান চিত্তরঞ্জন। ভেতর থেকে জেগে ওঠে কবি চিত্তরঞ্জন। তবে নিজের নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে। বিড়বিড় করে আবৃত্তি করেন তিনি,

> এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,/ এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
> মৃত আবর্জনা। ওরে, জাগিতেই হবে;/ এ দীপ্ত প্রভাতকালে;

সুভাষের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন তিনি, 'কালো মেঘের সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে জ্যোতির্ময় প্রভাতের ছটা দেখতে পাচ্ছি আমি। এবার এই ক্লান্ত বিহঙ্গটিকে শান্তির নীড়ে আশ্রয় নিতে দাও।'

১২

'সুভাষ বোসের মতো লোককে কলকাতায় কেন, ভারতবর্ষের কোথাও ছেড়ে রাখা যাবে না। তাকে একবারে পাকাপাকিভাবে কয়েদ করে রাখতে পারলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গল।' গভর্নর লর্ড লিটন সবাইকে আবার সতর্ক করে দিলেন।

সুভাষ আর অন্য রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য মেয়র চিত্তরঞ্জন প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন। তাঁর শরীর যারপরনাই খারাপ। তা সত্ত্বেও এই বয়সে তিনি এমন ছুটোছুটি কেন করছেন সেটা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের কাছে একটা প্রচণ্ড ধাঁধা। দেশবন্ধু সুভাষের মুক্তির জন্য অনেক সভার আয়োজন করেছেন। তবে ১৯২৪ সালের ৩১ অক্টোবরের বিশাল সভা শুধু জনসাধারণের কাছে নয়, পুলিশও চট করে ভুলতে পারবে না। লক্ষ লক্ষ লোকের সেই সভায় অগ্নিবর্ষী ভাষণ দিলেন মহাত্মা গাঁধী, মতিলাল নেহরু আর দেশবন্ধু স্বয়ং।

লাটভবনে আবার বৈঠক। 'সুভাষ বোসের সমস্ত চিঠিপত্রের ওপরে আমাদের কড়া নজর রয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তেমন আপত্তিকর কিছু এখনও হাতে পড়েনি। তবে দাশ আর শরৎ বোস দুজনেরই বহু বিদেশি আইনজ্ঞের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক আছে। ক্লাব আর বিভিন্ন

হোটেলে তাদের সঙ্গে এইসব লোকেদের অনেক সময়ই হাত মেলাতে দেখা গেছে। তবে পরদার পেছনে আর কী হচ্ছে সেটা অবশ্য জানা নেই।' চার্লস টেগার্ট বললেন।

'সুভাষের মতো ছেলেরা বাইরে থাকলেই বিপদ। ওদের জেলখানার গরাদের বাইরে থাকাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।' লর্ড লিটন আবার বললেন।

প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা একমত হয়ে ঠিক করলেন, 'সুভাষকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। যতদিন সম্ভব তাকে আটক রাখা হবে। আইন যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে আইন বদলাতে হবে। তাকে এমন সব জায়গায় রাখতে হবে যাতে তার হাড়মাস কালি হয়ে যায়। সুভাষের অনমনীয় মনোভাব, তার সমস্ত উদ্দীপনা টিনের চালের গরমে আর স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের মধ্যে নিংড়ে শেষ করে ফেলতে হবে।'

বাংলার আইনসভায় কিছু একটা ঘনিয়ে উঠছে তার আঁচ পেলেন দেশবন্ধু। নতুন 'বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' শিগগিরই আইনসভায় উত্থাপিত হবে। সরকার বাহাদুর যাকে ইচ্ছে বিনা তদন্তে পাঁচ বছর জেলে রাখতে পারবেন এই আইনের বলে। বৃদ্ধ সিংহ অধীর হয়ে উঠলেন। বিল উত্থাপনের দিনটিতে দেশবন্ধুর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। অনেকেই তাঁকে মিনতি করতে থাকেন, এইরকম শরীরের অবস্থায় কিছুতেই তাঁর অ্যাসেমব্লিতে যাওয়া উচিত নয়।

'আমার জন্য ভাবার কী আছে? আমি এখন ঝরা পাতা।' দেশবন্ধু বলে ওঠেন, 'আগামী দিনের ইতিহাস যারা সৃষ্টি করবে তারা, আমার সুভাষের মতো ছেলেরা, জেলখানায় পচছে। তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা লোপ করে দেওয়ার জন্য আনা এই জঘন্য আইন আমাকে ঠেকাতেই হবে।'

প্রচণ্ড জ্বর নিয়েও দেশবন্ধু বেরিয়ে পড়লেন। হুইল চেয়ারে বসে তাঁর দুর্বল কিন্তু সংকল্পে দৃঢ় মূর্তি পৌঁছল সভাগৃহে। তাঁর পাশে ড. বিধানচন্দ্র রায় ওষুধ-ইঞ্জেকশন নিয়ে তৈরি। তাঁর দৃপ্তভাষণে অ্যাসেমব্লি কক্ষ আবার একবার অনুরণিত হল। স্বরাজ্য দলের সভ্যরা ছাড়া অন্য দলের সভ্যরাও সমর্থন করলেন তাঁকে। বিল বহু ভোটে পরাজিত হল। তখন একটু শান্ত হলেন দেশবন্ধু।

সে রাত্রে নিশ্চিন্তমনে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বাসন্তী দেবী। কিন্তু পরের দিনই খবরের কাগজে জানা গেল, লর্ড লিটন তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে এই কালা কানুনে স্বাক্ষর করেছেন। দুপুরেই আবার হু হু করে জ্বর বাড়ল দেশবন্ধুর।

এক সকালে ১৪৮ নম্বর রসা রোডের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এক খদ্দরধারী সর্বত্যাগী মানুষ। পাশে দাঁড়িয়ে বাসন্তী দেবী। দুজনের সামনে একটা ট্রাঙ্ক আর একটা বেডিং। এ ছাড়া শুধু পরনের জামাকাপড়। নিজের প্রাসাদোপম বাড়ি বিক্রি করে এবং আর সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে ৮ লক্ষ টাকা একটি ট্রাস্টের হাতে সমর্পণ করেছেন তিনি। চিত্তরঞ্জন ট্রাস্টের বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিধানচন্দ্র রায়কে।

রসা রোডের দৃশ্য বড় করুণ। রাতারাতি রাজপ্রাসাদের রাজা সর্বস্ব ত্যাগ করে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন—একেবারে আক্ষরিক অর্থে। একদিন এই বাড়িতে যেসব জিনিস ছিল তা লাটভবনেও ছিল না। সেসব ত্যাগ করে প্রসূতিসদন সেবাসদন করার জন্য নিজের বাসভবনটি দান করে দেশবন্ধু আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। চারধার থেকে লোক আসছে। তাদের চোখে জল। ভিড় বাড়ছে। এই অতুলনীয় ত্যাগের মহিমা দর্শকেরা দেখছে করুণ চোখে। কেউ একজন বাসন্তী দেবীর কাছ থেকে ট্রাঙ্কটা হাতে নিল।

চিত্তরঞ্জন দাশের অনেক অনুরাগী গুণমুগ্ধেরা সামনে এগিয়ে আসেন। মুখার্জিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কোথায় থাকবেন দাশবাবু?'

'বৈরাগীর কি ঘর লাগে? কংগ্রেস গঙ্গার তীরে আমার জন্যে যদি একটা চালাঘর করে দেয় তা হলে আর চিন্তা কী?'

চারদিনের মধ্যেই দেশবন্ধু ফরিদপুরে কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের জন্য রওনা হলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাঁধীজিও ফরিদপুরে যাওয়ার জন্য কলকাতায় এলেন। চিত্তরঞ্জন সদনের শূন্য বাড়িটা দেখতে এসে শরৎবাবুকে তিনি বললেন, 'পৃথিবীতে তাঁর নিজের বলতে এই শেষ সম্পত্তিটুকুও দেশের জন্য সমর্পণ করে গেলেন তিনি।' গাঁধীজির চোখে জল।

গাঁধীজি যখন ফরিদপুরে পৌঁছলেন তখন সেখানে সহস্র লোকের ভিড়। দেশবন্ধুর ভাষণ সবাইকার মর্ম স্পর্শ করল। ব্রিটিশ সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে তিনি গর্জন করে উঠলেন, 'বাংলায় এই অর্ডিন্যান্স আর কালা কানুন কায়েম করে সুভাষের মতো অসংখ্য দেশভক্তকে কারাগারে বন্ধ করে সরকার তাদের এই অত্যাচারের জগদ্দল রথ বেশিদিন চালাতে পারবে না।' সভায় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি হাজির হয়েছেন। মতিলালপুত্র জওহরলালও এসেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব আর বাগ্মিতা নজর কাড়ে সবার। সভার পর গাঁধীজির সান্ধ্যকালীন প্রার্থনাসভা শেষ হল। শিবিরে গাঁধীজির সঙ্গে প্রাণ খুলে আলোচনা হল। গাঁধীজি বললেন, 'চিত্তরঞ্জনবাবু। আপনি বাংলায় শক্তিমান কর্মী তৈরি করেছেন, আগামী পঞ্চাশ বছরেও বাংলায় দায়িত্ব নেবার লোকের অভাব হবে না।'

দেশবন্ধু জওহরলাল সম্পর্কে খুব আগ্রহের সঙ্গে খবর নিতে লাগলেন। জওহরলাল এবং সুভাষের মধ্যে কখনও দেখা হয়েছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে জওহরলাল মাথা নাড়িয়ে 'না' জানালেন।

'তোমরা দুজনে একদিন দেখা করো। আমাদের আর কী? পরপারের ডাক এসে পৌঁছেছে। আগামীদিনের ভারতের ভার তো তোমাদেরই নিতে হবে।'

'বাংলার বিপ্লবীরাই হোক, সুভাষই হোক আর আপনি স্বয়ংই হন—আপনারা বাঙালিরা সবাই এত সেন্টিমেন্টাল কেন?' গাঁধীজি হাসতে হাসতে বলেন।

'বাংলার মাটিতে সৌরাষ্ট্রের হিসেব করে চলার গুণটা নেই বলে,' দেশবন্ধুর চটজলদি জবাবে হো হো করে হেসে ওঠেন গাঁধীজি আর অন্যরা সবাই। গাঁধীজি বাসন্তী দেবীর দিকে ফিরে বললেন, 'দেশবন্ধুর শরীরের অবস্থাটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না।'

দেশবন্ধু বললেন, 'গাঁধীজি, আপনি শুধু আমার ভাঙা শরীরটাই দেখছেন কিন্তু আমার ডান হাতটা যে ভেঙে গেছে সেটা দেখছেন না। আজ কতদিন হয়ে গেল সুভাষ আর আমার অন্য সহকর্মীরা জেলে আটক রয়েছে। আমার ছেলেরা জেলে পচছে আর আমি শান্ত থাকব। এটা কী হয়?' দেশবন্ধু আর বলতে পারেন না। গলা বুজে আসে তাঁর।

ফরিদপুর থেকে কলকাতায় ফেরার পর দেশবন্ধুর শরীর আরও খারাপ হল। ঠিক হল হাওয়া বদলের জন্য তাঁকে দার্জিলিং নিয়ে যাওয়া হবে। দেশবন্ধুর হাবভাবে মনে হচ্ছিল দার্জিলিং নয়, তিনি যেন প্রস্তুত হচ্ছেন মহাপ্রস্থানের পথে যাওয়ার জন্য। না আছে কোনও কাজের লোক, না কোনও মালপত্র। নিঃস্ব ফকিরের মতো দার্জিলিং পৌঁছলেন তিনি। দার্জিলিংয়ের 'স্টেপ অ্যাসাইড' বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তাঁর। বাসন্তী দেবী দেশবন্ধুকে দেখেছেন নানান রূপে। শ্রীঅরবিন্দের মামলার সময় দৃপ্ত ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ, অসহযোগ আন্দোলনযজ্ঞের হোতা-পুরোহিত চিত্তরঞ্জন আর স্বরাজ্য দলের নেতা সিংহবিক্রমী দেশবন্ধু।

আজকের দেশবন্ধু যেন শীর্ণ, শ্রান্ত পথিক। ক্লান্ত শরীরে কয়েক পা মাত্র চলাও দুষ্কর। মাথায় টুপি, হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা কোটে তাঁকে দেখায় পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মতো। শরীরের দখল নিয়েছে রাক্ষুসে জরা কিন্তু ম্লান করতে পারেনি মুখের হাসিটুকু। সে হাসি যেন আরও মোহময়। চোখে শিশুর সারল্য।

দিন দিন শরীরের আরও অবনতি হচ্ছে। বাসন্তী দেবী আকুতি করেন, 'তোমার মনে কিছু একটা হচ্ছে বুঝতে পারছি। কী সেটা খুলে বলো না।'

'সত্যি বলব বাসন্তী? গাঁধীজির সঙ্গে যদি একবার দেখা হত তো বড় ভাল হত। ফরিদপুরে সব কথা বলা হয়নি আমার। তাঁকে আরও অনেক কিছু বলার আছে আমার।'

'কিন্তু শরীরের এই অবস্থায় তাঁর কাছে যাবে কী করে?'

'তুমি তাঁকে একটা চিঠি লেখ না। তিনি যদি এখানে আসতে পারেন।'

চিঠি পেয়েই গাঁধীজি তাঁর সফর স্থগিত রেখে দার্জিলিং রওনা হলেন। গাঁধীজির সঙ্গে ইদানীং দেশবন্ধুর সম্পর্ক খুব ভাল। গাঁধীজির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে স্বরাজ্য দলের কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছে। কংগ্রেস আবার এক হয়েছে।

দেশবন্ধু গাঁধীজির স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। জলপাইগুড়ি থেকে পাঁচটি দুধেলা ছাগল নিয়ে আসা হল। গাঁধীজির থাকার ব্যবস্থা হল। গাঁধীজি যখন তাঁর অনুগামী আর লটবহর নিয়ে দার্জিলিং পৌঁছলেন, দেশবন্ধুর মধ্যে যেন এক সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার হল। অক্ষম পায়ে শক্তি ফিরে এল। খুব ভোরে উঠে দুজনে পাহাড়ি পথে হাঁটতে যান। চরকা, খাদি, গ্রামবিকাশ— এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। একসঙ্গে বসে সুতোকাটা হয়। বাসন্তী দেবীর হাত সুতো কাটাতে বেশি পাকা বলে গাঁধীজি দেশবন্ধুর সঙ্গে রসিকতা করেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে গাঁধীজি বললেন, 'মুসলমানদের সম্পর্কে আপনার উদার দৃষ্টিভঙ্গি আমার খুব ভাল লাগে।'

'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য সংগ্রামের প্রেরণা আমি পেয়েছি বাংলার কৃষকদের কাছ থেকে। জানেন তো বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে বাংলায় কীরকম কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।' প্রসঙ্গ উঠতে দেশবন্ধু আরও বলেন, 'কলকাতা কর্পোরেশনে বেশি করে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করার জন্য সুভাষের নামে অনেক সমালোচনা বেরিয়েছে, অনেকে টিটকিরিও দিয়েছে।'

'আমি কিন্তু "ইয়ং ইন্ডিয়া"তে সুভাষকে এর জন্য তারিফ করে একটা বিশেষ প্রবন্ধ লিখেছিলাম', গাঁধীজি বলেন।

'এই সমস্যা খুব শান্তভাবে, ধৈর্য নিয়েই সমাধান করা যাবে।'

'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য আমি রক্ত দিতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু রক্ত দিলেও কী ওইসব ধর্মান্ধদের চোখ খুলবে?' গাঁধীজির গলায় বিষণ্ণতা ঝরে পড়ে। 'কোনও ধর্ম যদি অন্যের ওপর অত্যাচার করার, অসত্যকে সত্য বলে প্রচার করার শিক্ষা দেয়, তবে আমার মতে সেটা ধর্ম নয় অধর্ম, সে দেবতা দেবতা নয় পাথরের টুকরো।' গাঁধীজি যেন স্বভাববিরুদ্ধভাবেই খানিকটা উত্তেজিত।

একরাত্রে আলোচনা খুব জমে উঠেছে। আরও আগে কেন এভাবে একসঙ্গে থাকা হয়নি তার জন্য দুজনের মনেই দুঃখ। কথা বলতে বলতে দেশবন্ধু বিমর্ষ হয়ে যান।

'গাঁধীজি। আমার জীবনের আর কোনও নিশ্চয়তা নেই। শরীর আর বইছে না। আজ শুধু দুটো চিন্তা আমাকে সবচেয়ে বেশি কুরে কুরে খাচ্ছে। একটা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্ন। আমি

জানি এ প্রশ্নের সমাধানে আপনিও আমার মতো সমান আগ্রহী। দ্বিতীয় চিন্তা আমার সুভাষ!'

'আমিও তার অসামান্য কর্মক্ষমতা আর অতুলনীয় দেশপ্রেমের তারিফ করি। কিন্তু আপনার মতো পরিপক্কতা অর্জন করতে তার এখনও অনেকদিন লাগবে।'

'না গাঁধীজি না। আমার প্রশংসা করতে গিয়ে সুভাষকে ছোট করে দেখবেন না আপনি।' দেশবন্ধু যেন যন্ত্রণায় কাতরে ওঠেন। 'গত ছ' বছর ধরে আমি তার উদ্যম, সংগঠন শক্তি, দেশপ্রেম খুব কাছ থেকে দেখছি। ও একটা উজ্জ্বল হিরে। হয়তো কিছুটা কঠোর, কখনও হয়তো আত্মহারা, কখনও বড় অধীর। ওকে নিয়মের বাঁধনে বাঁধতে যাওয়া ঘূর্ণিবাতাসকে ঘরে আটকাবার চেষ্টা। দেশের কল্যাণের জন্য ঝড় তোলার ক্ষমতা ওর সহজাত। তাকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাবার ভার আপনি নিন। আমি চলে যাওয়ার পর ওকে ভেসে যেতে দেবেন না।' দেশবন্ধুর সারা গা ঘামে ভিজে উঠেছে। গাঁধীজির হাত দুটি ধরে তিনি বলেন, 'আমাকে কথা দিন আমি চলে যাওয়ার পর সুভাষকে দেখবেন আপনি।'

'কথা দেওয়ার মধ্যে একটা পর-পর ভাব আছে। তাই নয় কি?' গাঁধীজি বললেন।

'গাঁধীজি আজ আপনাকে একটি কথা আমি মন থেকে বলতে চাই। আমি দেশের জন্য কী করেছি হয়তো ভবিষ্যৎ একদিন তার বিচার করবে। হয়তো সে বিচারে আমি কিছুই করিনি এই সিদ্ধান্ত হবে। সেদিন যেন দেশ এইটুকু মনে রাখে আমি অন্তত সুভাষকে এনে দিয়েছি দেশের জন্য।'

দার্জিলিং থেকে গাঁধীজি তাঁর সফরের জন্য রওনা হলেন। মাঝখানে চারটি দিন শুধু কাটল। তারপর দেশবন্ধুর শরীরের দ্রুত অবনতি হতে লাগল। কলকাতা থেকে রওনা হওয়া চিকিৎসকরা পৌঁছবার আগেই এক সন্ধ্যায় পাহাড়ি ঠান্ডা বাতাস নিবিয়ে দিল ক্ষীণ দীপশিখাটিকে।

দেশবন্ধুর মরদেহ যখন ট্রেনে কলকাতায় আনা হচ্ছিল সারা বাংলায় তখন ঢেউয়ের মতো উত্তাল হয়ে উঠেছে অগণিত মানুষ। অসমের পথে খবর পেয়ে গাঁধীজি পাঁচ-দশ মিনিট নীরব-নিস্পন্দ হয়ে রইলেন। সফর বাতিল করে রওনা হলেন কলকাতার দিকে।

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে আড়াই মাইল লম্বা শবযাত্রা চলেছে দেশবন্ধুর শরীরটাকে বয়ে নিয়ে। পাঁচ লাখেরও বেশি লোক সেই বিষণ্ণ যাত্রায় শামিল হয়েছে।

গাঁধীজি, মৌলানা আজাদও কাঁধ দিয়েছেন মৃতদেহ বহনে। কিরণশঙ্কর, হেমন্ত সরকার, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—দেশবন্ধুর সমস্ত তরুণ সহকর্মীদের চোখে সর্বহারার দৃষ্টি। কোমর ভেঙে গেছে তাদের। সেই জনসমুদ্রে নেই শুধু একজন—দেশবন্ধুর প্রাণপ্রিয় শিষ্য, তাঁর মানসপুত্র সুভাষ।

অস্তরবির রশ্মি আভায় কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে হু হু করে চিতা জ্বলছে। তার সঙ্গে জ্বলছে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন। একটু দূরে বিষণ্ণ শোকাকুল গাঁধীজি বসে। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস করছেন শরৎচন্দ্র বসু আর মৌলানা আজাদ। চোখের জল ফেলতে ফেলতে গাঁধীজি বললেন, 'সারা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি তো হলই, কিন্তু বাংলা আজ অনাথ হয়ে গেল। ছ'বছর আগে আমরা হারিয়েছি লোকমান্য টিলককে। তখনও বড় অসহায় লেগেছিল নিজেকে। শুধু একটা সান্ত্বনা ছিল—হিন্দু আর মুসলমানরা সেদিন ছিল গলাগলি করে। আজ ধর্মান্ধরা গলাগলি ছেড়ে একে অপরের গলা কাটার জন্য গোপন ছুরি শানাচ্ছে। তাদের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারতেন দেশবন্ধু। তাঁকে যখন দেশের বড় প্রয়োজন তখনই ঈশ্বর তাঁকে ডেকে নিলেন। এ দেশকে কে সামলাবে আজ?'

একসময় চিতা নেবে। অন্ধকার নেমে আসে। মৃত্যুহীন প্রাণের ডালি দেশজননীর পায়ে নিবেদন করে চলে গেলেন রাজভিখারি।

শ্মশান খালি হয়ে এসেছে। এককোণে শুধু বসে বড় বড় চোখ মেলে এক বাউন্ডুলে দামাল কবি। কাগজের বুকে আঁচড় পড়ছে—ফুটে উঠছে অক্ষর।

মৃত্যু আজিকে হইল অমর পরশি' তোমার প্রাণ,
কালো মুখ তার হ'ল আলোময়, শ্মশানে উঠিছে গান!
অগুরু-পুষ্প-চন্দন পুড়ে হ'ল সুগন্ধতর,
হ'ল শুচিতর অগ্নি আজিকে, শব হ'ল সুন্দর!
ধন্য হইল ভাগীরথী-ধারা তব চিতা-ছাই মাখি',
সমিধ হইল পবিত্র আজি কোলে তব দেহ রাখি'।

শুধু চোখ নয়—ঘরছাড়া বিবাগী অঞ্জলি দিয়েছেন নিজের জীবন উপড়ে দিয়ে। দনুজদলনী জাগেন কিনা সেই প্রতীক্ষায় ভবিষ্যতের কাছে বার্তা পাঠান কাজী নজরুল ইসলাম। পাগল ছেলে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে লিখে চলেন,

জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু-মুসলমান,
ঈর্ষা পঙ্কে পঙ্কজ হয়ে ফুটুক এদের প্রাণ!

৪

এক খাপ—দুই তলোয়ার

১

মান্দালয় জেলের জানলা দিয়ে পাহাড়, পাহাড়ের ওপরকার প্যাগোডা দেখছেন সুভাষচন্দ্র। কেন যেন মনে হয় প্যাগোডাটা এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে। সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে তাঁকে পাঠানো হয়েছে বর্মার মান্দালয় জেলে।

বিপিন গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস করেন, 'সুভাষ, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী?'

'আমরা সবাই মিলে বাংলার গভর্নরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলাম।'

'তার প্রমাণটা কী?'

'প্রমাণ ওরা তৈরি করে নেবে। গভর্নরকে হত্যার জন্য আমরা নাকি কলকাতায় অনেক অস্ত্রশস্ত্রও আমদানি করেছিলাম।'

'কী শয়তানি!'

'সরকারের শয়তানি অনেক কিছুই করতে পারে বিপিন। আসল উদ্দেশ্য আমাদের মতো ছেলেদের জেলে আটকে দেশবন্ধুর হাত অকেজো করে দেশকে জাগাবার জন্য তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ করা আর তার সঙ্গে কংগ্রেসের পায়ে কুড়ুল মারা।' সুভাষ চিড়বিড়িয়ে ওঠেন।

মান্দালয়ের জেল একটা দুর্গের মতো। চারপাশে খাদ। একসময়ে এখানেই থাকতেন বর্মার রাজা। জেলের ভেতরের দেওয়ালগুলো কাঠের তৈরি—ইট বা পাথরের নয়। দেখলে মনে হয় সার্কাসের খাঁচা। ব্রহ্মদেশে ঠান্ডার সময় বেজায় ঠান্ডা, গরমে গা পোড়ানো গরম, বর্ষার সময় মুষলধারে বৃষ্টি—এ দেশে কোনও ঋতুই আরামের নয়। সুভাষ অনেক সময়েই লোকমান্য টিলককে যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল সেই সেল-টার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, এই পরিবেশে বসেও কী করে *গীতারহস্য* লিখেছিলেন তিনি।

সুভাষের জন্য দিনরাত চিন্তা মেজদার। সুভাষের জন্য তিনি কোট, ওভারকোট, কম্বল—সব পাঠিয়েছেন। সুভাষের জেলের কুঠরিটা কেমন, তার জামাকাপড় কীরকম, খাবার-দাবারই বা কী ধরনের—এইসব প্রশ্নে ভরা তাঁর চিঠিগুলো। মেজদা এখনও বারবার পুলিশের সদর দপ্তরে যান। অভিযোগের তালিকা দাবি করেন। সুভাষের বিরুদ্ধে অন্তত মামলাটা শুরু করার অনুরোধ জানান। ব্যারিস্টার মেজদা তাঁর সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে অভিযোগের স্বরূপটা জানতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভবি তো ভোলবার নয়।

মান্দালয়ে দুর্ভোগের শেষ নেই। বর্ষা গেলেই শুরু হয় ধুলোর উৎপাত। 'মায়ের দয়া' থেকে যারা বাঁচে তাদের ধাওয়া করে প্লেগের ইঁদুর। মান্দালয়ে আসার দিনটি থেকে সুভাষ ভুগছেন পেটের নানা গোলমালে। জানোয়ারের মতো এই কাঠের খাঁচায় আর কতদিন যে কাটাতে হবে

কে জানে! বেড়াল, টিয়া, ময়না আর পায়রাদের সাহচর্যে ভুলে থাকতে চেষ্টা করেন বন্দিরা। তাঁর মন কেমন করতে থাকে বাড়ির জন্য। ভরা ভরতি বাড়ি, দাদা, বউদি, ভাইপো-ভাইঝি—সবাই ভিড় করে দাঁড়ায় মনের আয়নায়। কোন পাষণ্ড পৃথিবীতে জেলখানার সৃষ্টি করেছিল?

মাত্র দু'মাসে তাঁর ওজন কমেছে এগারো সের। অসম্ভব রোগা হয়ে গেছেন সুভাষ। হঠাৎ একদিন সেই নিদারুণ খবর জেলেও পৌঁছল। দেশবন্ধু নেই। সাতজন বন্দির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সবাই বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সারারাত জেলের গরাদ ধরে কান্না থামে না সুভাষের। পাশের ব্যারাকে সুরেন্দ্র ঘোষ রাগে দুঃখে মাথা কোটেন। 'সুভাষ, বাংলা আজ অনাথ হয়ে গেল।'

সুভাষ নীরব। মনের মধ্যে ছবির পর ছবি। দেশের জন্য সর্বস্ব দান করা সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন, অসংখ্য নিরাশ্রয়ের আশ্রয় চিত্তরঞ্জন, মোল্লা-মৌলবিদের চেয়েও মুসলমানদের অনেক বেশি প্রিয় চিত্তরঞ্জন, জাতি-ধর্মের গণ্ডি ছাড়ানো দেশবন্ধু। কোনওভাবে যদি বাসন্তী মায়ের কাছে পৌঁছনো যেত! অবিরল চোখের জল ভিজিয়ে দেয় বন্দিশালার ধুলো।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কারাগারের দিনগুলো আরও যেন কষ্টের হয়ে ওঠে। দিন কাটে। দেশের জন্য মন কাঁদে বন্দিদের। দেশে আন্দোলন চলছে। এদিকে জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ক্রমাগত বিরোধ। জেলে দুর্গাপুজোর দাবিতে অবস্থা একসময়ে চরমে পৌঁছয়। অত্যাচার আরও বাড়ে।

এরই মধ্যে বাংলার আইনসভার নির্বাচন এসে পড়ে। সুভাষের জীবনে এই প্রথম আইনসভার নির্বাচন। প্রার্থী কারাগারে। নমিনেশন পেপারে সই নেবার জন্য ছোটভাই শৈলেশ ফর্ম নিয়ে পৌঁছলেন মান্দালয়ে। নির্বাচনের সঙ্গে প্রার্থীর সম্পর্ক শুধু ওই সইটুকু। কারান্তরাল থেকে নির্বাচন লড়া অকল্পনীয়। কিন্তু সুভাষের অগণিত অনুরাগীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। বাসন্তী দেবী আবেদন জানালেন। মা আর বিভাবউদি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করলেন। কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে সুভাষের ছবিগুলোই শুধু চেয়ে থাকে—সুভাষ বহুদূরে।

একদিন খবর এল। সুভাষচন্দ্র বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। মান্দালয় জেল অনুরণিত হল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে। কিন্তু বিজয়ের এ আনন্দ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। সুভাষের অসুস্থতা ক্রমশ বেড়ে চলে। জেলার দুশ্চিন্তায় পড়েন। ভারত থেকে ডাক্তারদের একদল এসে পৌঁছল মান্দালয়ে। দলে সুভাষচন্দ্রের দাদা ড. সুনীল বসুও ছিলেন। পরীক্ষায় ধরা পড়ল সুভাষের যক্ষ্মা হয়েছে। বিধানসভায়ও আলোচিত হল সুভাষের প্রসঙ্গ। তাঁকে অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন।

একদিন জেলার আসল ব্যাপারটা সুভাষকে বললেন। তাঁর মতো বিপজ্জনক কয়েদির ভার নিতে ভারতের কোনও জেলই রাজি নয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচি সব জায়গা থেকেই অস্বীকার করা হয়েছে এ দায়িত্ব। সুনীলবাবুর দু-তিনবার আসা যাওয়া হয়ে গেল। বর্মায় আসা প্রচণ্ড অসুবিধে তাঁর পক্ষে। কিন্তু ছোট ভাইয়ের জন্য আসতেই হয় তাঁকে। দ্বিতীয়বারেই সুভাষের অবস্থা দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে সুনীলও কেঁদে ফেলেন।

'দাদা এর চিকিৎসা কি নেই?'

'একটাই উপায় আছে। তোকে সুইজারল্যান্ডে পাঠানো।'

সুভাষের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। জেল কর্তৃপক্ষও ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন। রেঙ্গুন আর কলকাতার মধ্যে টেলিফোন-টেলিগ্রামের বিরাম নেই। ভাল-মন্দ কিছু হয়ে গেলে বর্মার জেল কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব নিতে নারাজ।

একদিন সকালে সুভাষ জেগে উঠে দেখলেন জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে কলকাতার গঙ্গার বুকে। বাইরে গঙ্গার পরিচিত গেরিমাটি রঙের জল। বন্দির ভার নিতে জেল কর্তৃপক্ষ এসে পৌঁছলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের শরীরের অবস্থা দেখে দায়িত্ব নেওয়ার সাহস হচ্ছে না তাঁদের। মেজদা এসে কাছে দাঁড়ালেন। সুভাষের অবস্থা দেখে তাঁর চোখ ভরে জলে আর মন আতঙ্কে। ভাঙা গলায় সুনীলকে অসহায়ভাবে প্রশ্ন করেন, 'কী করি বল তো সুনীল?'

'কিছু তো একটা করতেই হবে মেজদা।'

'কিন্তু এই অবস্থায় একে সুইজারল্যান্ড কী করে নিয়ে যাবি?' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেন শরৎবাবু। ধুতির খুঁটে চোখ মুছে বলেন, 'সুইজারল্যান্ড ছেড়ে দে, একে বাড়ি পর্যন্তই বা নিয়ে যাই কী করে?'

টেগার্ট সাহেব বন্দরে এসে সুভাষের রোগজীর্ণ দেহ স্বচক্ষে দেখলেন। ডাক্তারি রিপোর্ট নিয়ে গেলেন গভর্নরের কাছে। কাগজপত্র দেখে গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনও প্রচণ্ড চিন্তায় পড়েন। 'এ তো একেবারে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। সুইজারল্যান্ড যাবে কী করে?'

'কিন্তু স্যার একে ছেড়ে দিলে আবার আগুন ছড়াবে।'

'আর আমাদের হাতে থাকা অবস্থায় যদি মরে যায় তবে সব দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চাপবে। খামোখা ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিতে হবে না। ওকে আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হোক।'

'ইয়েস, ইয়োর একসেলেন্সি।'

সুভাষচন্দ্রকে আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হল। বাঁচা-মরার দায়িত্ব এবার তাঁদের। টেগার্ট এবং আর সব কর্তাব্যক্তিরা এবার হাত ঝেড়ে ফেললেন।

সুইজারল্যান্ড আপাতত পাঠানো যাচ্ছে না। এলগিন রোডের বাড়িতে শুরু হল আলমোড়া নিয়ে যাবার উদ্যোগ আয়োজন। খুব দেরিতে ঘুম ভাঙল সুভাষের। তাঁর মাথা বাসন্তী দেবীর কোলে। সুভাষের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তিনি। শুকনো কলাপাতার মতো সুভাষের ত্বক।

সুভাষ দেখলেন তাঁর বাসন্তী মায়ের শূন্য সিঁথি। চোখের জলের বন্যা নামে। ছোট ছেলের মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদেন তিনি। শ্যামাঙ্গী বাসন্তী দেবী অনেক ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন।

'সুভাষ শান্ত হ বাবা।'

'কী করে শান্ত হব মা? মায়ের শূন্য সিঁথি, রিক্ত কপাল দেখে ছেলে কী করে শান্ত থাকবে মা? আমার গুরুকে কোথায় রেখে এলে মা?'

'সুভাষ তোকে আবার উঠে দাঁড়াতে হবে বাবা। সেটাই হবে তোর গুরুদক্ষিণা। তোকে আবার দাঁড়িয়ে উঠে এই শয়তানি শাসনের মোকাবিলা করতে হবে বাবা।' আর বলতে পারেন না বাসন্তী দেবী।

সুভাষের মনে পড়ে বহরমপুরে দেশবন্ধুর সেই বিড়বিড় করে আবৃত্তি—'এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,/এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,' চোখ বোজেন তিনি।

২

ব্যারিস্টার জে. এম. সেনগুপ্ত আর সুভাষ এসেছেন এলাহাবাদে আনন্দ ভবনে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ। এবার ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে কলকাতায়। গাঁধীজি রাজি হননি সভাপতি হতে। কলকাতার কংগ্রেস নেতাদের আন্তরিক ইচ্ছে গাঁধীজি রাজি না হলে মতিলাল নেহরু সভাপতি হন। কিন্তু মতিলাল রাজি হচ্ছেন না। তাঁকে সম্মত করানোর চেষ্টাতেই এসেছেন সুভাষ আর যতীন্দ্রমোহন। সুভাষ যখন বর্মার জেলে তখন গাঁধীজি ব্যারিস্টার

সেনগুপ্তর ওপরে বাংলার কংগ্রেসের কর্তৃত্ব অর্পণ করেছিলেন। সুভাষের ফিরে আসার পরে বাংলার কংগ্রেসে অন্তর্বিবাদ শুরু হয়েছে সুভাষ আর যতীন্দ্রমোহনের অনুগামীদের মধ্যে। তবে মতিলালের সভাপতি হওয়ার ব্যাপারে দুটি গোষ্ঠীই একমত।

সুভাষ এবং জওহর সবসময় একসঙ্গে। বেশ কিছুদিন পর দেখা হয়ে দুজনেই গল্পে মশগুল। এদিকে ব্যারিস্টার সেনগুপ্ত এবং যতীন্দ্রমোহনের খুব জমেছে। মতিলালের চালচলন, কথাবার্তা সবেতেই বেশ নবাবি আদব-কায়দা। কাজুবাদাম মুখে ফেলে সেনগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'তারপর? কংগ্রেসের সভাপতির কথা কী ভাবছ তোমরা?'

'আপনাকে রাজি করাতেই তো আমি আর সুভাষ এখানে এসেছি।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ মতিলাল। সামনে রাখা গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে হঠাৎ বললেন, 'সেনগুপ্ত, জওহরকে সভাপতি কর না তোমরা।'

'না। ওর তো বয়স কম। উনি তো পরেও এ সম্মান পেতে পারবেন। এই মুহূর্তে আপনার মতো প্রবীণ নেতার নির্দেশ আমাদের বড় প্রয়োজন।'

মতিলাল আপাতত নীরব থাকাই বোধহয় শ্রেয় মনে করলেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, 'সেনগুপ্ত, তোমাদের এই সুভাষ এখনও বিয়ে করছে না কেন বলো তো?'

'কেন করছে না জানি না। তবে করছে যে না, সেটা স্পষ্ট। অনেক ভাল ভাল জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসে মাথা কোটাকুটি করে ফিরে গেছে।'

'ও কি ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা-টতিজ্ঞা নিয়েছে নাকি?'

'সেরকম কিছুও জানা নেই। তবে ভীষণ একরোখা। কোনও কিছু মাথায় ঢুকলেই হল, হাত ধুয়ে লেগে পড়বে তার পেছনে।'

'তরুণদের ওপর ওর প্রভাব কীরকম?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন মতিলাল।

'যদিও সুভাষ আমাদের বিরোধী গোষ্ঠীতে তবু সত্যি কথা বলতেই হবে। বাংলা, বিহারের তরুণদের মাতিয়ে তুলতে সুভাষের জুড়ি নেই। তা ছাড়া যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠনের সুবাদে সুভাষ এবং জওহর এখন সারা ভারতে সুপরিচিত।'

'তাই তো বলছি। এ বছর তোমরা জওহরকেই সভাপতি করো।'

সেনগুপ্ত হতচকিত। মতিলালজির কথাবার্তা যেন কেমন গোলমেলে। অনেক বছর পর দুই স্কুলের সহপাঠীর দেখা হলে যেমন হয় সুভাষ আর জওহরের সেইরকম ভাব। অনেক সময়েই মতিলাল জানলা দিয়ে নীচের বাগানে এদের দেখতে থাকেন। মতিলালের বয়স এখন আটষট্টি—বলতে গেলে জীবনের শেষপ্রান্তে। নিজের বয়স সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তবে তাঁর উন্নত ললাট, গৌরবর্ণ, দৃঢ়সংবদ্ধ অধরোষ্ঠ, সরু হয়ে আসা চিবুক সব মিলিয়ে এ বয়সেও তাঁর চেহারা চেয়ে দেখার মতো। রোমান ভাস্কর্যের আভাস সেই চেহারায়।

আজ মতিলাল একটু আনমনা। মনের কোণে উঁকি মারছে আসন্ন সমাপ্তির সম্ভাবনা। ঘুরে ফিরে নজর পড়ে জওহরের দিকে। অনেক কষ্ট করে মতিলাল নেহরু পরিবারকে বৈভবশিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আসলে নেহরুরা ছিলেন দরিদ্র কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ। শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান এবং সুদর্শন বলে খ্যাতি ছিল নেহরুদের। এঁদের বাড়ির মেয়েদেরও সৌন্দর্যখ্যাতি সুপরিচিত। এঁদের পূর্বপুরুষ রাজ কাউল মুঘল দরবারে চাকরি করতেন। তাঁর বাড়িটা ছিল একটা নহর অর্থাৎ খালের ধারে। এই নহরের ধারে বাস করাই তাঁদের নেহরু উপাধিপ্রাপ্তির পটভূমি।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় নেহরু পরিবারকে দিল্লি ছেড়ে আগ্রায় চলে আসতে হল। মতিলালের জন্ম আগ্রাতে। এলাহাবাদে তখন তাঁর পিতৃবন্ধু নন্দলাল নামজাদা উকিল। কিন্তু

হঠাৎ মারা গেলেন তিনি। মাত্র ছাব্বিশ বছরের মতিলালের কাঁধে পড়ল পরিস্থিতি সামলানোর ভার। অসীম ধৈর্য আর আপ্রাণ পরিশ্রম করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন তিনি। সেই সঙ্গে কাজে লাগল ইংরেজি ভাষা আর আইনে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পরিচিতি পেলেন একজন পয়লা সারির আইনজ্ঞ হিসাবে।

জওহরের বয়স এখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। বাড়ির বড় ছেলে। মতিলাল আর স্বরূপরানি দুজনেরই খুব আদরের। জওহরলাল যখন দশ বছরের তখন আনন্দভবন তৈরি হয়। বাড়ি তো নয় বলতে গেলে প্রাসাদ। চারদিকে চওড়া বারান্দা, সামনে মখমলি লন, পেছন দিকে ফলের বাগান। দুটো সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট। কম্পাউন্ডের মধ্যে দুটো ছোট বাড়ি, আর আস্তাবল। বাড়ির ঠাটবাটও সেইরকম। পশ্চিমি, মুসলমানি আর হিন্দু—তিন রকমের রসুইখানা। অসংখ্য চাকরবাকর, অনেকগুলো ঘোড়া, জগতের সেরা মদিরার সংগ্রহ সেলারে। ছেলের জন্য মতিলাল মর্ত্যে স্বর্গলোক তৈরি করে রেখেছেন।

চিন্তাগ্রস্তভাবে মতিলাল বললেন, 'ছয় সাত বছর আগে মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন, তখন সে আন্দোলনে জওহরও মেতে উঠল। সেই হল আনন্দভবনে প্রথম মেঘ সঞ্চার।'

'শুনেছি তখন আপনি জওহরলালের কাজে আপত্তি জানিয়েছিলেন!' সেনগুপ্ত বললেন।

'শুধু আপত্তি? একদিন ক্ষোভে দুঃখে আমি বলেছিলাম, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা। আবার জওহর যখন জেলে গেল তখন তার কষ্ট অনুভব করার জন্য একরাত আমি খালি মেঝেতে সারারাত শুয়েছিলাম। শীতে ঠকঠকিয়ে কেঁপে রাত কাটল। সেই প্রচণ্ড ঝগড়া, সেই রাগ—আজ মনে পড়লে হাসি পায়।'

'তারপর ঝগড়াটা মিটল কীসে?'

'গাঁধীজি আনন্দভবনে আসার পরে সব বদলে গেল। জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক ঘটনা আমার চোখ খুলে দিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত রূপ আমি উপলব্ধি করলাম।'

রাত হল। স্বরূপরানি খবর পাঠালেন, খাবার তৈরি। সুইমিং পুলের পাশে পাতা হয়েছে বিশাল টেবিল। সুভাষ আর জওহর আগেই এসেছেন। জওহরজায়া কমলাকে কেমন উদাস দেখায়। স্বরূপরানির পাশে বসে এগারো বছরের নাতনি ইন্দিরা। মতিলাল আর সেনগুপ্তও এসে বসলেন। জওহরলাল মতিলালকে বললেন, 'তা হলে শুরু করা যাক।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। সুভাষ আর সেনগুপ্তের জন্য বাঙালি মিষ্টি কিছু বানিয়েছ তো?'

'সব তৈরি। শুধু মিষ্টি কেন? বাঙালি খানাও তৈরি। তবে ছেলেদের বিলিতি অভ্যেস। তাই বিলিতি খানাও আছে।' স্বরূপরানি উত্তর দিলেন।

ইয়ুথ লিগের ব্যাপারে সুভাষ আর জওহরের অনেকবার দেখা হয়েছে। কিছুদিন আগেই কলকাতা সফরের সময় জওহর সুভাষের বাড়িতেই উঠেছিলেন। নেহরুবাড়িতে টেবিলে নানারকম খাবার দেওয়া হলেও সবাই খুব মেপে খান। সুভাষ লক্ষ করলেন একেবারে আকণ্ঠ খাওয়া এদের কারও অভ্যেস নয়। খাবার সময় সুভাষ বারবার কমলা বউদিকে দেখছিলেন। শান্ত, ধৈর্যপ্রতিমা কমলা। কস্তুরবার মতো। 'বড় গাছের ছায়ায় ছোট গাছ বাড়তে পায় না' কথাটার সত্যতা আর একবার উপলব্ধি করলেন সুভাষ।

পরদিন ভোর থেকে আনন্দভবনের আস্তাবলে হইচই পড়ে গেছে। প্রত্যেকদিনই অবশ্য পিতাপুত্র ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যান তবে আজ সুভাষও এদের সঙ্গী হবেন। সেনগুপ্ত অবশ্য ঘোড়ার গাড়িতেই যাবেন। ছোট্ট ইন্দিরাও রয়েছেন তাঁর সঙ্গে। এলাহাবাদ পেছনে ফেলে নদীর

ধারে পৌঁছলেন সকলে। জওহর আর সুভাষ সবার আগে। ঘোড়া চালাতে চালাতেই আলোচনা চলছে তাঁদের।

'ইংরেজ-শাসন দেশের পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ।' সুভাষ বললেন।

'পরাধীনতার চেয়ে বড় অভিশাপ আর নেই।' জওহর বললেন।

'কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করার জন্য গাঁধীজি আজও তৈরি নন। মতিলালজিও তৈরি নন।' সুভাষ আক্ষেপের সঙ্গে বললেন।

'প্রাচীনেরা পিছিয়ে পড়লেও আমাদের ঘোড়া ছোটাতেই হবে।' জওহরের গলায় দৃঢ়তা।

রোদ বাড়ছে। ঘোড়ারাও ক্লান্ত। অনেক দূর গিয়ে ঘোড়ার মুখ ফেরে। এরা দুজনে যে কতদূর গেছে, মতিলাল সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না। তিনি নিজের শ্রান্ত ঘোড়াটিকে একটা আমগাছের নীচে দাঁড় করিয়েছেন। কাছেই সেনগুপ্তর গাড়ি। সামনে একটা টিলা থাকায় পেছনের রাস্তা দেখা যায় না। মতিলাল বেশ অস্থির হয়ে পড়লেন। বারবার সামনের দিকে তাকাচ্ছেন। অনেকক্ষণ পরে ঘোড়া দুটি আসছে দেখা গেল। দুলকি চালে একেবারে ঠিক পাশাপাশি চলছে দুটি ঘোড়া।

মতিলালজি শান্ত হন। তিনি হেসে সেনগুপ্তকে বললেন, 'দুজনেই ঠিক পাশাপাশি আসছে। আমার জওহর যদি পিছিয়ে পড়ত আমার একটুও ভাল লাগত না।'

'কেন?'

'আজকের ভারতে এই দুজনই যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণ সেটা আমার স্থির বিশ্বাস। তাই এদের সবসময় এগিয়ে থাকতেই হবে।'

দুপুরবেলা আবার সেনগুপ্ত আর মতিলালের বৈঠক জমে। মতিলালের চোখের সামনে ফুটে উঠছে রাশিয়া সফরের পর জওহরের অস্থিরতা, মাদ্রাজ কংগ্রেসে গাঁধীজির বিরোধিতা সত্ত্বেও 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর প্রস্তাব উত্থাপনের স্মৃতি। দেশের তরুণদের মধ্যে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে কমিউনিস্ট আর সমাজবাদী চিন্তা। জওহরও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তা ছাড়া সুভাষ, নরিম্যান, লালা শঙ্কর প্রমুখ নবীনদের সাহচর্যে তাঁর এ বিষয়ে আগ্রহ আরও বাড়ছে। এবার তিনি সেনগুপ্তকে স্পষ্ট করেই বললেন, 'গাঁধীজি যদি রাজি না হন জওহরকেই সভাপতি করো তোমরা।'

'কিন্তু বাবুজি। আমাদের কমিটি আপনাকেই সভাপতি করার প্রস্তাব নিয়েছে।'

'আবার প্রস্তাব নাও।'

'সেটা সম্ভব নয়।'

সেনগুপ্ত বেশ আতান্তরে পড়েছেন। কংগ্রেস সভাপতির তুল্য সম্মান দেশে আর নেই। সেই সম্মান অস্বীকার করে মতিলালজির নিজের ছেলেকে সভাপতি করার ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন? অবশ্য গত দু' বছর ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল এ ব্যাপারে। মতিলাল এ পর্যন্ত স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তবে শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে রটনাটা সত্যি!

নতুন যুগের আহ্বানে কংগ্রেসের গতিপথের মোড় ঘোরাতে হবে, পৃথিবীর কাছে তুলে ধরতে হবে ভারতের দুর্দশার কথা, বিশ্বজনমতকে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলতে হবে— এইসব বিষয়ে দুই বন্ধু একমত হলেন। জওহর বললেন ইতিমধ্যেই তিনি লন্ডনে কৃষ্ণ মেননকে এ বিষয়ে কাজ করতে বলেছেন।

সম্প্রতি ইউরোপ সফর করে ফিরেছেন জওহর। তার অভিজ্ঞতার কথাই বলছিলেন তিনি সুভাষকে। 'সুভাষ পৃথিবীর কোনও দেশের সঙ্গেই রাশিয়ার তুলনা চলে না। রাশিয়ার বিপ্লবের

দশ বছর পূর্তি উৎসবে আমাদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি থাকেন একটি তিন কামরার বাড়িতে।'

'আর আমাদের বড়লাট বাহাদুর থাকেন তিনশো কামরার প্রাসাদে। দেখে আমার মাথা ঝিমঝিম করে।' সুভাষ বলেন।

'রাজনৈতিক স্বাধীনতা বড় কথা নয় সুভাষ। সমাজতান্ত্রিক পথে দেশকে গড়াই হবে আমাদের বড় কাজ। এ ছাড়া এ দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।'

'শুধু স্বাধীনতা পেলেই চলবে না। তারপরে দেশকে পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা এখন থেকেই নিতে হবে আমাদের।' সুভাষ বললেন।

জওহরের সমাজবাদী চিন্তাধারা, গোলামি বিরোধিতার পরিচয় পেয়ে সুভাষ দারুণ খুশি। কিন্তু মাদ্রাজ কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা মনে পড়ায় তিনি সতর্ক হলেন।

'জওহরজি। কংগ্রেসের তেতাল্লিশ বছর পূর্ণ হতে চলল। আজও প্রবীণ নেতারা পূর্ণ স্বরাজের কথা বলতে গিয়ে তোতলাতে থাকেন। এই অবস্থায় সমাজতন্ত্রের কথা কী করে তুলবেন আপনি? এ প্রসঙ্গ তুলতে গেলে গাঁধীজি সমেত অন্যান্য প্রবীণ নেতাদের বিরোধিতার জন্য তৈরি থাকতে হবে আমাদের।'

'সেই সংঘাতের সূচনা তো আমি মাদ্রাজ কংগ্রেসেই করে এসেছি।' জওহর বলেন, 'গাঁধীজির বিরোধিতা বাবার একটুও পছন্দ হয়নি।'

'এর পরেও তিনি এটা পছন্দ করবেন বলে মনে হয় না।'

'পূর্ণ স্বরাজের দাবি কংগ্রেসকে গ্রহণ করাতেই হবে। তারপর আমরা প্রাণপণে লড়ব স্বাধীনতা পাবার জন্য।' জওহর বললেন।

'এখন আর কীসের অপেক্ষা? কলকাতা কংগ্রেসেই শুরু করতে হবে কাজ।' সুভাষ বললেন।

নতুন সংকল্পে দুজনেই খুশি। কিন্তু পাশাপাশি মনে আসছে বাধা এবং দায়িত্বের কথা। তাই দুজনেই গম্ভীর। সুভাষ একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বললেন, 'দেখুন। এ সময়ে আমাদের কারওরই পিছে হটা চলবে না।'

'একবার চলতে শুরু করে ফেরার কথা আসছে কী করে?'

'মতিলালজি দেশের একজন প্রবীণ নেতাই তো শুধু নন, আপনার বাবা।'

'সুভাষ, আমাদের উদ্দেশ্যও তো মহান।' জওহর আবেগের সঙ্গে বলতে থাকেন। 'এর জন্য যদি বাবার সঙ্গেও বিরোধ হয় তো হবে। কিন্তু আজ তোমার আর আমার জন্য সারা দেশের তরুণদের মধ্যে যে আগুন জ্বলে উঠছে তার একটা ফুলকিও নিবতে দেব না আমি। আমি কথা দিচ্ছি সুভাষ, এ পাপ কখনও করব না আমি।'

দুটি শক্ত হাত একে অপরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে মেলে। দুজনে দুজনের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে। স্থির হল কলকাতা কংগ্রেসের চারদিন আগেই যুব-কংগ্রেসের অধিবেশনের আয়োজন হবে। সেখান থেকেই ধ্বনিত হবে এই নবীন পথের আহ্বান, নবীন সংকল্পের তূর্যনিনাদ।

৩

সুভাষ আর যতীন্দ্রমোহনকে বিদায় জানাতে পিতাপুত্র এলাহাবাদ স্টেশনে এসেছেন। মতিলালকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। সাইমন কমিশন কিছুদিন আগে ফিরে গেছে। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সারা দেশে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দিয়েছিল। যেখানে যেখানে কমিশন গেছে সেখানেই আওয়াজ উঠেছে 'সাইমন গো ব্যাক।' লাহোরের বিক্ষোভে পুলিশের নির্দয় লাঠিচার্জে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন লালা লাজপত রায়। এই আঘাতের ফলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পঞ্জাব বদ্ধপরিকর। কিন্তু সাইমন কমিশন প্রসঙ্গে ব্রিকেনহেড সাহেব খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন জাতীয় নেতাদের। 'জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বজনগ্রাহ্য একটা প্রস্তাব রচনা করে দেখান জাতীয় নেতারা।' জাতীয় নেতারা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। মতিলালের অধ্যক্ষতায় 'নেহরু রিপোর্ট' তৈরি হয়েছে এক বছর ধরে। সেই রিপোর্টের খসড়া তৈরির জন্য ব্যারিস্টার সপ্রু আর মতিলালের সঙ্গে সুভাষও অনেকদিন ধরে পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু এখন সে রিপোর্ট সম্পর্কে সুভাষ এবং জওহর যে ভিন্নমত পোষণ করেন সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সম্প্রতি দিল্লিতে 'ইয়ুথ লিগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং সাধারণ সম্পাদক জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র। এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বোম্বাইয়ের নরিম্যান, পঞ্জাবের কেদারনাথ সেহগল। যোগ দিয়েছেন যমুনাদাস মেহ্‌তা, কিরণশঙ্কর রায়, লালা শঙ্করলাল। এইসব দেশভক্ত তরুণের উৎসাহ মতিলাল একটু উদ্বেগের সঙ্গেই লক্ষ করছেন। এদের সঙ্গে এসে জুটেছেন বিবেকানন্দ-ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

দুই বাঙালি নেতাকে বিদায় জানিয়ে পিতা-পুত্র ফিরলেন। ফেরার পথে দুজনের কেউই বিশেষ কিছু কথা বলেননি। তবে বাড়ির কাছে এসে মতিলাল নিজে থেকেই প্রসঙ্গ তুললেন।

'জওহর এবার অন্যদিকেও একটু নজর দাও।'

'মানে?'

'সুভাষ আর সুভাষ। গত তিনদিনে আমি তোমার মুখে সুভাষ ছাড়া আর কিছু শুনিনি।' মতিলালজির গলায় উষ্মা স্পষ্ট।

'তাতে কি দোষ হয়েছে কিছু?'

'বন্ধুত্ব ভাল জিনিস। কিন্তু বন্ধুত্বের জন্য কি নিজের ব্যক্তিসত্তা, নিজের আদর্শের কথা ভুলে যেতে হবে। কংগ্রেস সভাপতি তোমাকে করার জন্য আমি গাঁধীজিকে নিজে বলেছিলাম। তুমি রাজি হলে না কেন?'

'তাতে কী হয়েছে। বাবা বা ছেলে যেই-ই হোক কংগ্রেসের হাল ধরার লোকটি তো সেই আনন্দভবনেরই।' জওহর পরিস্থিতি হালকা করতে চান।

'জওহর আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আর কদিন? যাবার আগে আমি সব ব্যবস্থা করে রেখে যেতে চাই। দেখতে চাই কংগ্রেসের রাজমুকুট তোমার মাথায়।' মতিলাল আবেগে আপ্লুত।

মতিলালের ভাব দেখে জওহর বিস্মিত। 'আজ না হয় কাল কংগ্রেস সভাপতি আমি নিশ্চয়ই হব। তার জন্য এত অধীর হওয়ার কী আছে?'

'কারণ আছে। আজ দেশের রাজনৈতিক আকাশে আস্তে আস্তে উদয় হচ্ছে অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র।'

'সেটা তো ভাল কথা। তারায় তারায় আকাশ ভরে উঠবে।'

'বাকিদের খবরে আমার দরকার নেই। আমি শুধু ভাবছি আমার পরে কংগ্রেসের লাগাম থাকবে কার হাতে।'

'বাবা, ঘুরিয়ে না বলে স্পষ্ট করে বলুন না, কী বলতে চাইছেন আপনি?' জওহর বলে ওঠেন।

'হ্যাঁ, স্পষ্ট করেই বলছি। ভবিষ্যতে সুভাষের মতো তোমার অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী একে একে উঠে আসবে।' মতিলাল বললেন।

'আপনি ভুল করছেন বাবা। সুভাষ শুধু আমার অন্তরঙ্গই নয়, ভাইয়ের মতো।'

'জওহর, এত পড়াশোনা করে কী শিখলে তুমি? ওই প্রবাদটার কথা ভুলো না—এক খাপে দুটো তলোয়ার কখনওই থাকতে পারে না।'

'আপনি এত উচ্চাকাঙ্ক্ষী কেন?'

'উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি পাপ? আজ যদি তোমাদের দুজনের তুলনা করা হয় তবে কী দেখা যাবে? তোমরা দুজনেই কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। তুমি ব্যারিস্টার, সুভাষ আই সি এস। তোমার জন্য তরুণেরা পাগল কিন্তু সুভাষের ডাকে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্যও অনেকে তৈরি। তুমি যদি কোনও ভুল করে ফেল তবে সুভাষের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।'

মতিলালজি এবার জওহরের কাছে এসে তাঁর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'জওহর, সময় থাকতে সুভাষ আর বামপন্থীদের মতাদর্শ থেকে দূরে সরে আসাই তোর পক্ষে মঙ্গল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোরা গাঁধীবিরোধী রাস্তায় চলেছিস।'

'বাপুজি তাঁর নিজের রাস্তায় চলছেন। কিন্তু আমরা তরুণেরা বিশ্বাস করি গাঁধীজির গ্রামীণ বিকাশ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, কুটিরশিল্প—এসবের চেয়ে দেশের আজ অনেক বেশি প্রয়োজন ভারী শিল্প। আমাদের এই চিন্তাধারা তুলে ধরতে আমরা গাঁধীজির বিরোধিতা করার জন্য তৈরি হচ্ছি।'

'জওহর কার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চলেছ তোমরা? আজ জনসাধারণের কাছে গাঁধীজির যে প্রতিষ্ঠা তার সামনে ফুঁয়ে উড়ে যাবে তোমরা।'

'বাবা, ভয় না পাওয়াই তো তারুণ্যের ধর্ম।'

'ওরে, কার বিরুদ্ধে হিম্মত দেখাতে চলেছিস তোরা? দেশবন্ধু দাশ আর লাজপত রায়ের মতো লোকেদের সঙ্গে নিয়েও তোর জন্মদাতা পিতা যাঁর সঙ্গে পেরে ওঠেনি তাঁর সঙ্গে? আর তোরা তো বাচ্চা ছেলে!' আনুষ্ঠানিকতা ছেড়ে এক ব্যাকুল পিতা এবার স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

সে রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মতিলালের চোখে ঘুম নেই। আগামী দিনের ভারতে তার প্রিয় জওহর দেশের আকাশে সূর্যের মতো জ্বলবে এই আকাঙ্ক্ষা তার প্রতিটি শিরা উপশিরায় প্রবহমান।

মাঝরাতে উঠে ঘুমহারা চোখে চিঠি লিখতে বসলেন তিনি। 'বাপুজি—দয়া করে কলকাতা অধিবেশন বয়কট করবেন না। তরুণ প্রজন্ম জোট বাঁধছে। তাদের মতিগতির কথা কিছু বলা যাচ্ছে না। আমার নিজের ছেলেকেও ভরসা করতে পারছি না আমি। অন্যদের তো কথাই নেই। আপনাকে আসতেই হবে।—ইতি, বিনীত মতিলাল।'

ময়দানে তখনও আলো ফোটেনি। একপাশে পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে। কমিশনার টেগার্ট এক জুনিয়র অফিসারের গাড়িতে করে পৌঁছলেন ময়দানে। দূর থেকে আওয়াজ আসছে, 'লেফট টার্ন, রাইট টার্ন, ফরোয়ার্ড মার্চ।' হাজার খানেক তরুণ-তরুণীকে 'ফরোয়ার্ড মার্চ' করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের পাশেই আপাদমস্তক সামরিক পোশাক পরা দৃপ্ত ভঙ্গিতে এক যুবক, যেন কোনও জেনারেল তাঁর ফৌজ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন সীমান্তের দিকে। দীপ্ত ভঙ্গিতে কুচকাওয়াজ পরিচালনা করছেন সুভাষচন্দ্র।

আলো ফুটল। ভোরের আলোয় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্যারেড এবার স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরে সুভাষ কলকাতার এইসব তরুণ-তরুণীকে প্যারেড করাচ্ছেন। ভোর হবার আগে থেকেই শোনা যায়, 'ফরোয়ার্ড মার্চ।' টেগার্টের দুশ্চিন্তার কারণ অবশ্য আলাদা। তাঁর গোয়েন্দারা খবর এনেছে যে 'অনুশীলন সমিতি' আর 'যুগান্তর' দলের নেতারাই রয়েছে এই প্যারেডের আয়োজনের পেছনে। অধিবেশনের সময় অনেক বিপ্লবী শহরে আসবে এ খবরও দিয়েছে তারা। এসব খবরে চিন্তিত টেগার্ট।

'ইট হ্যাজ টু স্টপ সাম হোয়্যার'—টেগার্ট নিজের ওপরেই রেগে ওঠেন। বর্মার জেলখানা থেকে সুভাষ কোনওদিন ফিরবে না—দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর। হয়েছে উলটোটা। তাকিয়ে দেখলেন সুভাষের পেছন পেছন আসছেন তাঁর বাহিনীর এক ক্যাপ্টেন। তাকে যতীন দাস বলে চিনতে পেরে টেগার্টের চোখ ছানাবড়া। গোয়েন্দাদের খবর যে ইদানীং যতীন দাস ঘনঘন পঞ্জাব যাচ্ছেন। 'নওজওয়ান ভারতসভা'র উগ্রপন্থীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তা ছাড়া বাংলায় তখন 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' নামে এক তৃতীয় গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। রাগে গরগর করতে করতে টেগার্ট ময়দান থেকে চলে গেলেন।

প্যারেড শেষ করে সুভাষ উডবার্ন পার্কে ফিরে এলেন। বাড়িতেও কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তুতির কাজ চলেছে জোরকদমে। ঘর্মাক্ত সুভাষকে দেখে বিভাবতী পেছনে লাগেন, 'ঠাকুরপো, দেখো—যেন ছাপোষা লোকগুলোর বেচারি মেয়েগুলোর ঠ্যাং না ভাঙে।'

'তুই নারীবাহিনী তৈরি করবি নাকি?' বাসন্তী দেবী জিজ্ঞেস করেন।

'ভগবান যদি সে সুযোগ দেন, নিশ্চয় করব। তোমাদের দুজনকে কিন্তু "অধিনায়িকা" হতে হবে সে বাহিনীতে।'

সুভাষচন্দ্রের বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলেন দুজনে। 'নিশ্চয় হব'—দুজনেই সমস্বরে বলে উঠলেন।

'কিন্তু ঠাকুরপো, মেয়েদের ব্যাপারে আজকাল তোমার যেন একটু বেশি আগ্রহ দেখছি। এত পুলক কেন?' বিভাবতী পেছনে লাগতে ছাড়েন না।

'কারণ আমি বিবেকানন্দ আর দেশবন্ধুর চেলা।'

'তার মানে?'

'একেবারে অঙ্কের হিসেব বউদি। মেয়েদের বাদ দেওয়া মানে ত্রিশ কোটির থেকে পনেরো কোটি বাদ দেওয়া। শতকরা পঞ্চাশজন মানুষ, যাদের স্বামীজি থেকে শুরু করে আমরা সবাই 'শক্তিরূপিণী' বলে বেড়াই, তারা থাকবে চৌকাঠের সীমানায় বাঁধা? আমরা আনব আর তোমরা খরচ করবে এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আহা হা! যা খুশি বললেই হল না। আমরা কুঁড়েমি করে দিন কাটাই বলে মনে হয় নাকি তোমার?'

'ঠাট্টা-ইয়ারকি বাদ দিয়ে একটু ভাব তো বউদি। ত্রিশ কোটি মানুষের ষাট কোটি হাত যদি একসঙ্গে মেলে তা হলে কী কাণ্ডটা হবে! এদের মিলিত প্রয়াসে সারা পৃথিবীর মধ্যে আমরা এক মহান রাষ্ট্র হয়ে উঠব।'

শরৎচন্দ্র সম্প্রতি উডবার্ন পার্কে এই তিনতলা বিরাট বাড়িতে উঠে এসেছেন। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে এ বাড়ি বেশি দূরে নয়। ভাইয়ের ক্রমবর্ধমান কাজ দেখে আর একটা বাড়ির প্রয়োজন উপলব্ধি করছিলেন তিনি। উডবার্ন পার্কের এই নতুন বাড়িতে শরৎবাবু আর বিভাবতী সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে আসার পর থেকে কাজে নতুন জোয়ার এসেছে।

নীচের তলার একটা বড় ঘর জওহরলালের জন্য ঠিকঠাক করে রাখা হয়েছে। যুব কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েকদিন আগেই এসেছেন তিনি। জওহর আর সুভাষের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ টেনে আনছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ নেতাদের। প্রতি রাতে আলোচনা হয়। 'পূর্ণ স্বরাজের' প্রস্তাব কীভাবে আনা হবে তার রূপরেখা ঠিক হয়।

সূর্যোদয়ের আগেই সুভাষের পুজো আর ধ্যান শেষ হয়। বিছানায় খবরের কাগজ পড়ার সময়েই নাপিত এসে দাড়ি কামায়। জওহর নিজেই দাড়ি কামান। কিন্তু কাল শোবার আগে সুভাষ দাড়ি কামাতে বারণ করে গেছেন। সকালে সুভাষ এলেন জওহরের ঘরে। তার পেছনে টুপি আর পাঠানি কোট পরা একজন লম্বাচওড়া লোক। জওহরলাল মনে করলেন বোধহয় সীমান্তপ্রদেশ থেকে আসা কংগ্রেসের কোনও কর্মকর্তা। নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে জওহর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সেই রয়্যাল নাপিত কোথায় সুভাষ?'

স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো খটাং করে স্যালুট করে আগন্তুক কেতাদুরস্ত কায়দায় বললেন, 'পণ্ডিতজি আই অ্যাম দ্য রয়াল বার্বার।'

নেহরু হকচকিয়ে দেখতে থাকেন তাঁকে। মনে হল লোকটি খালি হাতেই এসেছে। ক্ষৌরকর্মের সাজসরঞ্জাম তাঁর কাছে দেখা যাচ্ছে না। ঠিক তখনই আগন্তুক শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস একটা একটা করে তাঁর জামার পকেটগুলো খালি করতে শুরু করলেন অনেকটা ম্যাজিসিয়ানের ভঙ্গিতে। বেরোতে লাগল যন্ত্রপাতি। অতি সুকৌশলে তিনি তাঁর সব সাজসরঞ্জাম পোশাকের বিভিন্ন জায়গায় রেখেছেন। নেহরুর গালে সাবান ফেনিয়ে উঠল, হরিচরণের জিভও তেমনি চলতে শুরু করল।

'গণ্যমান্যদের দাড়িতে হাত লাগাবার সাহস আমি ছাড়া কলকাতায় আর কারও নেই।'

সুভাষ হাসতে হাসতে বললেন, 'আইনভঙ্গ আন্দোলনের সময় কয়েদিদের চেয়ে আদালতের জজ আর উকিলসাহেবদের দাড়ি কেন বেশি বড় হয়েছিল বলতে পারেন জওহরজি?'

'নিশ্চয়ই তোমার এই রয়্যাল বার্বার মহাশয় তখন অসুস্থ ছিলেন।'

'আরে না। উনি তখন দেশের জন্য দু' মাস জেলে গিয়েছিলেন।'

'কিন্তু হাতের গুণ কি আর গোপন থাকে স্যার? বাইরে জজসাহেবরা আতান্তরে আর জেলের ভেতরে জেলার সাহেব আনন্দে আটখানা।' হরিচরণ বেশ দেমাকের সঙ্গে বলতে থাকেন, 'আমার হাতে দাড়ি কামিয়ে জেলার সাহেব এত খুশি যে বলেই ফেললেন, হরিচরণ তোমাকে জেল থেকে ছাড়াই উচিত নয়।'

জওহর আর সুভাষ হো হো করে হেসে উঠলেন। নিজের মোলায়েম গালে হাত বুলিয়ে

জওহরও খুশি কিন্তু হরিচরণ ওঠেন না। মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বললেন, 'পণ্ডিতজি আমার এই অস্তরগুলো সার্থক হোক, এটা আমার অনেকদিনের স্বপ্ন।'

'মানে।'

'লাটসাহেবের মাথাতেও হাত লাগিয়েছি। বাকি আছেন এক গাঁধীজি। একবার যদি গাঁধীজির গালদুটো মোলায়েম করতে পারি তো আমার অস্তরগুলোর সাতজন্মের পুণ্যি হবে।'

পণ্ডিতজির কাছ থেকে কথা আদায় করে শাহি কায়দায় হরিচরণ বেরিয়ে গেলেন। নীচের ঘরে পঞ্জাবের শার্দূল সিং কবীশ্বর, দিল্লির লালা শঙ্করদয়াল, বোম্বাইয়ের নিমকর জোগলেকার এবং অন্যান্য সব নেতাদের এসে পৌঁছনোর খবর এল। সকালের জলখাবারের জন্য বিভাবউদি আর শরৎচন্দ্র বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন।

জওহর আর সুভাষ প্রবীণ নেতাদের আপসধর্মী দীর্ঘসূত্রিতা সহ্য করতে পারছেন না। দেশের জন্য জীবনপণ করা আইরিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের মানসিক সাযুজ্য খুঁজে পাচ্ছেন। রাশিয়ার শ্রেণিহীন শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রভাবিত করেছে জওহরের চিন্তাধারাকে।

জামশেদপুরে টাটা কোম্পানির ইস্পাত কারখানার বিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেছে। সেই ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুভাষ। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মের কাছে 'পূর্ণ স্বরাজে'র কোনও বিকল্প নেই। স্বাধীনতা মানে পূর্ণ স্বাধীনতা, পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। পূর্ণ স্বরাজের জন্য লড়াই করার উদাত্ত আহ্বান নিয়ে জওহরলাল আর সুভাষ ছুটে বেড়াচ্ছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

সকালের জলখাবার খেতে খেতে শরৎবাবু বললেন, 'আজ ভোরে গাঁধীজি সোদপুর আশ্রমে এসে পৌঁছেছেন।'

'গাঁধীজি?' সুভাষ আর জওহর দুজনেই দারুণ বিস্মিত।

খাওয়া বন্ধ হল সুভাষচন্দ্রের। আশ্চর্য হয়ে তিনি জওহরলালকে বললেন, 'কলকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত থাকার জন্য আমরা গাঁধীজিকে বারবার অনুরোধ করেছি। বলতে গেলে কাকুতি মিনতি করা হয়েছে। প্রত্যেকবার গাঁধীজি শান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আজ হঠাৎ কী হল যে তিনি সাত তাড়াতাড়ি কলকাতায় এসে হাজির হলেন?'

গাঁধীজির আগমন অধিবেশনের সুরটাকেই বদলে দেবে। সুভাষ আর জওহর দুজনেই চিন্তিত। জওহরলাল বললেন, 'পূর্ণ স্বরাজের জন্য তরুণদের আহ্বান জানানোর প্রস্তাবের কী হবে সুভাষ?'

'মতিলালজির নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করানোর জন্য প্রবীণেরা কোমর বাঁধবেন। ও প্রস্তাব না মানলে মতিলালজি আর গাঁধীজি অসন্তুষ্ট হবেন। যদি ও প্রস্তাবে আমরা সম্মত হই পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব থেকে আমরা সরে আসব এবং তাতে তরুণ প্রজন্ম আমাদের ওপর বিশ্বাস হারাবে। এ অবস্থায় সকলের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।' সুভাষ বললেন।

'পাল্লার একদিকে আদর্শ আর অন্যদিকে পিতা। এ অবস্থায় তোমার সিদ্ধান্ত কী হত সুভাষ?'

'সেটা কি খুলে বলতে হবে?' সুভাষ হাসলেন।

'আমিও তাই করব। কোনওমতেই আমার সিদ্ধান্ত বদলাব না।'

জওহরলাল দৃঢ় পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। দুজনে বাড়ির সামনের আঙিনায় পৌঁছে দেখতে পেলেন, গেটের পাশে বহু লোক জমা হয়েছে। ওপরের ব্যালকনি থেকে শরৎচন্দ্র আর বিভাবতী অপলকে দেখতে থাকেন এদের দুজনকে। 'মহাত্মা গাঁধী কী জয়', 'বন্দেমাতরম্', 'হিন্দুস্থানকে প্যারে লাল—সুভাষ আউর জওহরলাল'—এইসব শ্লোগান উঠল চারদিক থেকে।

এই আনন্দোল্লাসের মধ্যেই সুভাষ এবং জওহর গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে গেলেন। বিভাবতী তাঁদের চলে যাওয়ার পথের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। দেখে শরৎচন্দ্র একটু খেপাতে চেষ্টা করেন, 'কী ব্যাপার? একেবারে মুগ্ধ অবস্থা যে?'

'দেখছিলাম দুজনের মধ্যে কে চাঁদ আর কে সূর্য!'

'কী স্থির করলে?' এবার শরৎচন্দ্রের গলাতেও কৌতূহল।

'কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।' বিভাবতী বলেন, 'যেই চাঁদ আর যেই সূর্য হোক না কেন, এদের জুটি যেন অক্ষয় হয়, কারও নজর না লাগে।'

'ভগবান করুন তাই যেন হয়।' শরৎবাবু বলেন। 'বিভা এক পর্বতে অনেক শিখর থাকতে পারে কিন্তু দুই পর্বতের এক জায়গায় থাকার ওপরে মহাকালের অভিশাপ আছে। তাই তাদের আলাদা করার জন্য থাকে নীচের উপত্যকা।'

৫

পার্ক সার্কাস ময়দানের বিশাল সভামণ্ডপে জওহর আর সুভাষ এসে পৌঁছলেন। চারদিক থেকে প্রচণ্ড হাততালিতে তাঁদের স্বাগত জানানো হল। যুব কংগ্রেসের অধিবেশনে সারা দেশ থেকে হাজারের বেশি তরুণ-যুবক একত্র হয়েছেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের ঠিক আগেই একই শামিয়ানায় যুব কংগ্রেসের অধিবেশনের আয়োজনে, প্রবীণ নেতারা একরকম চ্যালেঞ্জ হিসাবেই গণ্য করছেন। নেহরু-রিপোর্ট প্রসঙ্গ এই যুব সম্মেলনেও গভীর ছায়া ফেলেছে। এই কলকাতাতেই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের অধিবেশনে 'নেহরু রিপোর্ট'কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এখন তরুণেরাও যদি তার খুঁত ধরতে শুরু করে তবে সমূহ গন্ডগোলের সম্ভাবনা। তাই গাঁধীজির অনেক অনুগামীও এই সম্মেলনে শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে উপস্থিত।

সাদা খদ্দরের পোশাকে সুভাষের চেহারা আজ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। সম্মেলনের সভাপতি ব্যারিস্টার নরিম্যান। তাঁকে স্বাগত-অভিনন্দন জানিয়ে সুভাষচন্দ্র নিজের ভাষণ শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন লালা লাজপত রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে। ধিক্কার জানালেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর নেতার ওপর ব্রিটিশ সৈন্যদের কাপুরুষের মতো নৃশংস লাঠিচার্জকে। সভা এই জঘন্য নারকীয় আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠল 'শেম, শেম' ধ্বনিতে। কয়েকজন পঞ্জাবি যুবক উত্তেজিত হয়ে মঞ্চে উঠে এল। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'লালাজি অমর রহে, অমর রহে', 'হিন্দুস্থানকে দো লাল সুভাষ আউর জওহরলাল।' পঞ্জাবের নওজওয়ান ভারতসভা থেকে আসা তরুণদের চোখ জলে ভরা। লালাজির জন্য সবচেয়ে বেশি বিক্ষুব্ধ এরা।

কিছুক্ষণ পর সুভাষ আবার বলতে শুরু করেন। 'বন্ধুগণ, আমাদের এই সংগঠন নিষ্ক্রিয়, নিষ্প্রাণ কোনও ন্যাড়া পাহাড় নয়। এই সংগঠন কোনও সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান বা দুর্ভিক্ষ ত্রাণের সংগঠনও নয়। চলতি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য যাদের বুকে আগুন জ্বলছে সেইসব আদর্শবাদী যুবকদের সংগঠন এই যুব-কংগ্রেস।' রাশিয়া, চিন, জার্মনির উদাহরণ দিয়ে সুভাষ বলতে লাগলেন, 'যেখানে যেখানে প্রবীণ নেতারা ভীত, সন্ত্রস্ত, নির্জীব, পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, সেখানেই যুবকেরা হাল ধরেছে নবজাগরণের যাত্রাপথে। নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে নতুন পথে দেশকে গড়ে তোলার ভার। আজ ব্রিটিশ ভারতকে আর্থিক, সামাজিক সমস্ত ব্যাপারে চারদিক থেকে আটকে রেখে দিয়েছে। ব্রিটিশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে

তবেই প্রগতির রাজপথে আমাদের যাত্রা শুরু করতে পারব আমরা। তাই আজ প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধভাবে এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য জীবনপণ সংগ্রাম।'

সুভাষের কণ্ঠস্বর পরদায় পরদায় চড়ে এখন একেবারে তুঙ্গে। তিনি একবার মঞ্চে উপবিষ্ট জওহরলালের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—তারপর সামনে বসা যুবশক্তির দিকে। অনেকদিন ধরে জমে ওঠা আবেগ তাঁকে অস্থির করে তোলে। আবেগমথিত স্বরে তিনি বলতে থাকেন, 'আজ ভারতে দুটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে বেশি—প্রথমটি সবরমতীর ধারে গাঁধীজির আশ্রম আর দ্বিতীয়টি পন্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। এক যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে যখন আমি এই দুই আশ্রমের দিকে তাকাই তখন কী দেখতে পাই? পন্ডিচেরির মতে ধ্যান-চিন্তনের চেয়ে মহত্তর আর কিছু নেই। পন্ডিচেরি যোগাভ্যাস আর অধ্যয়নের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়।' সুভাষের কথায় সভায় উপস্থিত শ্রীঅরবিন্দের প্রবীণ ভক্তদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। এবার সুভাষ সবরমতীর দিকে এগোলেন। গাঁধীজির জীবনদর্শনের ওপর কঠোর মন্তব্য করে বললেন, 'আধুনিকতার নামে সবরমতী নাক কোঁচকায়। বেশি উৎপাদন সবরমতীর চোখে পাপ। প্রয়োজন বাড়ানো আর আরও ভালভাবে বাঁচার ইচ্ছে অপরাধ। তা হলে কি আমরা গোরুর গাড়িতে করে অতীত যুগে ফিরে যাব? আত্মিক শক্তিই সব! তার জন্য যদি পার্থিব সবকিছু আর সামরিক শিক্ষাকে ব্রাত্য করে রাখতে হয় তো তাও ভাল? এই পবিত্র মাটিতে মঠ বা আশ্রম কিছু নতুন নয়। সন্ন্যাসীদের সম্মান ভারত চিরকাল দিয়েছে আর ভবিষ্যতেও দেবে। আমি শুধু আজকের যুবকদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে যদি আমাদের শক্তিশালী দেশ গড়ে তুলতে হয় তবে সন্ন্যাসের রাস্তায় আমাদের গেলে আমাদের চলবে না। যা কিছু স্থবির, যা কিছু নিশ্চল তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমাদের নতুন দিনের নতুন শস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে।'

গাঁধীজির এক শিষ্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'বাবুজি, শেষ পর্যন্ত এ দেশ কোন রাস্তা নেবে, হিংসা না অহিংসা?'

সুভাষ এক আশ্চর্য গভীর দৃষ্টিতে দেখলেন তাঁদের। চোখে সামান্য কৌতুকের ঝলক। তিনি বললেন, 'আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের আধুনিক শত্রুর মোকাবিলা আধুনিক অস্ত্র দিয়েই করতে হবে।'

যুবকটির সংশয় দূর হল। সুভাষ আবার প্রশ্ন করলেন, 'এবার আপনিই বলুন—স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আমাদের কোন রাস্তায় যেতে হবে?'

'প্রয়োজন অনুযায়ী যে-কোনও রাস্তায়।' যুবকটির নিঃসংশয় উত্তর।

পণ্ডিত নেহরুর দিকে একবার হাসিমুখে তাকিয়ে সুভাষ এবার আবেগাপ্লুত স্বরে বলে উঠলেন, 'এই কথাটি আমাদের মনের মধ্যে ভাল করে গেঁথে নিতে হবে। লাখ কথার এক কথা—প্রয়োজন অনুযায়ী যে-কোনও রাস্তা।'

প্রচণ্ড করতালির মধ্যে সুভাষ আসনে বসলেন। প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল। পূর্ণ স্বরাজ পেতে হবে এবং সেটা শুধু অহিংসা নয়, প্রয়োজনে যে-কোনও রাস্তায় পেতে হবে। প্রস্তাব গৃহীত হবার পর যতীন দাস কয়েকজন পঞ্জাবি যুবককে নিয়ে পেছন দিক দিয়ে মঞ্চে এলেন। যতীন দাস সমস্ত আন্দোলনে সুভাষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গের যুবকেরা সবাই নওজওয়ান ভারতসভার সদস্য। তাঁদের মধ্যে একজন যুবকের চেহারা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গভীর বাঙ্ময় চোখ। মুখে দাড়িগোঁফ খুব বেশিদিন ওঠেনি। চেহারায় একটা দ্যুতি। যতীন দাস তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনি ভগৎ সিং।'

সুভাষচন্দ্র তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'এঁকে চিনি আমি। সর্দার অজিত সিং-এর ভাইপো তো? পঞ্জাবের পরিস্থিতি কেমন?'

ভগৎ সিং-এর মুখে বেদনার কুঞ্চন। ধরা গলায় তিনি বললেন, 'লালাজির হত্যার আঘাত প্রত্যেকটি পঞ্জাবি যুবকের মনে সবসময় বিঁধে রয়েছে।' সুভাষ-জওহরের নেতৃত্বে ভগৎ সিং-এর মনে আশার উদ্দীপনা। তিনি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলন, 'সত্যি করে বলুন বাবুজি। শুধু অহিংসা দিয়ে ব্রিটিশদের কি তাড়ানো যাবে?'

'আপনাদের কী মনে হয়?' সুভাষের প্রতি প্রশ্ন।

'আমি তো সেটা একেবারেই ভাবতে পারি না। একবার, অন্তত একবার, তাদের একটা প্রচণ্ড আঘাত হানতেই হবে।'

'একদম ঠিক।' সুভাষের মুখ খুশিতে ঝলমল।

যুব কংগ্রেসে অভাবনীয় সাড়া পাওয়া গেল। 'গুরু এবং আচার্যদের আমরা নিশ্চয়ই সম্মান করব। চিরদিনই আমরা তাঁদের উঁচু আসন দেব। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে তাঁদের চিন্তাধারা কতটা কার্যকরী?' সুভাষচন্দ্রের এই কথাগুলো গাঁধীজির ভক্তশিষ্যদের অবশ্য মর্মাহত করেছে। 'খোলাখুলিভাবে এরকম উত্তেজক ভাষা এই প্রথম শোনা গেল। তাও কিনা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের মুখ থেকে?'—প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করেন।

রাত্রে খাওয়ার সময় জওহর সুভাষকে বললেন, 'তোমার কথাগুলোর মধ্যে যুক্তি যাই থাক, তোমার বলার ভঙ্গি ফ্যাসিস্টদের মতো?'

'দাদা, আমি প্রচণ্ড ফ্যাসিবিরোধী। কিন্তু ওদের একটা কথা আমার ভীষণ ভাল লাগে—লিভ লাইফ ডেঞ্জারাসলি।' সুভাষ বলেন।

সোদপুর আশ্রমে অধিবেশনের সমস্ত খবর শুধু পৌঁছয় না, অনেক রং চড়িয়ে পৌঁছয়। 'শিগগির দেখা করো' গাঁধীজি এত্তেলা পাঠালেন জওহরকে। রাত অনেক হয়েছে। জওহর গড়িমসি করতে লাগলেন। জওহরের খবর নিয়ে মেজদা এলেন সুভাষের ঘরে। ক্লান্ত সুভাষ তখন শোওয়ার আয়োজন করছেন। শরৎচন্দ্রের মুখে উদ্বেগ স্পষ্ট। সুভাষ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে মেজদা?'

'গাঁধীজির কাছে অভিযোগ গেছে যে, অধিবেশনের জন্য আমরা যে অর্থ সংগ্রহ করেছি তা থেকে আমরা দুই ভাই টাকা সরিয়েছি।'

'এ অভিযোগ কাদের?'

'আমাদের বাঙালি বন্ধুরাই করেছেন।'

'এরকম উদ্ভট অভিযোগ সম্পর্কে আমরা কী করতে পারি? ওঁরা তদন্ত করে দেখুন।' সুভাষ বললেন।

'সুভাষ তদন্ত তো হবেই'—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে শরৎচন্দ্র বলেন। 'সত্যি সত্যি কেউ অপরাধী হোক বা না হোক একবার যদি অভিযোগ আসে তবে তাকে কী নজরে দেখা হবে সেটা নির্ভর করে যে দেখছে তার ওপরে। আর তা ছাড়া বিপদ ডেকে আনা তোর স্বভাব। মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে বিরাট বিপদ ঘনিয়ে আসছে।'

গাঁধীজি মিছিলে ছিলেন না। তিনি সোজা দেশবন্ধু নগরে অর্থাৎ অধিবেশনস্থলে ঠিক সময়ে পৌঁছেছেন। শোভাযাত্রা তখনও পৌঁছয়নি।

কলকাতায় কংগ্রেসের রূপ কিছুটা আলাদা। কুড়ি-তিরিশ বছরের তরুণ-যুবকরা এর আগে কখনও এত বেশি সংখ্যায় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেয়নি। একসময় শোভাযাত্রা এসে পৌঁছল। সবার আগে দু' হাজার যুবক-যুবতী তাল মিলিয়ে লেফট রাইট করতে করতে এগিয়ে আসছে। সবার আগে নস্যি রঙের একটা ঘোড়ার ওপর পুরোপুরি ফৌজি জেনারেলের পোশাকে এক দৃপ্ত যুবক। তার পেছনে চৌত্রিশটি সাদা ঘোড়া টানছে একটি রথ। রথে আসীন কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহরু। তাঁর পাশে স্বরূপরানি আর কন্যা কৃষ্ণা। যেন কোনও রোমান সম্রাটের বিজয় মিছিল।

প্রবেশদ্বারে গাঁধীজিকে দেখতে পেয়ে মতিলালজি সসম্ভ্রমে রথ থেকে নেমে একে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন গাঁধীজিকে। গাঁধীজির চোখ পড়ল ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামা অধিনায়কটির দিকে। মাথায় জেনারেলের গোল কার্নিসওয়ালা টুপি, গায়ে নানারঙের ব্যাজ লাগানো জমকালো খাকি পোশাক, পায়ে নস্যি রঙের গামবুট। কস্তুরবা সকৌতুকে দেখছেন সুভাষকে। 'মা' বলে চিৎকার করে সুভাষ দৌড়ে এসে কস্তুরবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। কস্তুরবা নিজের শীর্ণহাত আশীর্বাদের ভঙ্গিতে সুভাষের মাথায় রাখতেই তাঁর দৃষ্টি গেল কটমট করে তাকিয়ে থাকা গাঁধীজির ওপর। তাড়াতাড়ি হাত টেনে নেন তিনি।

'সুভাষ এই কুচকাওয়াজের সং কীসের জন্য?' গাঁধীজি হাসি চেপে জিজ্ঞেস করেন। পাশে দাঁড়ানো ঘনশ্যামদাস বিড়লা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সতীশ দাশগুপ্ত আর কৃপালনিজি অবশ্য হাসি চেপে রাখতে পারেন না।

'গাঁধীজি এতে করে শৃঙ্খলাবোধ আর আস্থাবোধের বিকাশ হবে যুবকদের মধ্যে।' সুভাষ নম্র কিন্তু দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন।

'কিন্তু এসবের প্রয়োজন কী?' গাঁধীজি হেসে ফেলেন এবার। 'আমার তো এটা সার্কাসের তামাশার মতো লাগছে। পার্ক সার্কাসের সার্কাস!'

মতিলাল এবং গাঁধীজি এবার দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন। আজ সিলেক্ট কমিটির বৈঠকের দিনে চারদিকে উত্তেজনা। যেভাবেই হোক 'নেহরু রিপোর্ট' পাশ করাতেই হবে। গাঁধীজি আর মতিলালের মুখ ভীষণ গম্ভীর। প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে গাঁধীজি বলেন, 'নেহরু রিপোর্ট অনেকদিনের ভাবনা আর পরিশ্রমের ফসল। এই রিপোর্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত হওয়া একান্ত জরুরি একথা আপনারা স্মরণে রাখবেন।'

'পূর্ণ স্বরাজ ছাড়া আর কোনও কিছুই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।' জওহরলাল উঠে বললেন।

'মুসলিম লিগ এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে। কংগ্রেসে সেইজন্যও এ রিপোর্ট গ্রহণ নিতান্ত জরুরি।' গাঁধীজির এবার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

'কিন্তু কেন আমরা ডোমিনিয়ন স্টেটাস দাবি করব? ভারত কবে ব্রিটিশের ডোমিনিয়ন ছিল?' জওহর আবার প্রশ্ন করেন।

'পূর্ণ স্বরাজ ছাড়া আর কিছুই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।' এবার সুভাষচন্দ্র বলেন।

তরুণদের মধ্যে থেকে প্রতিবাদ শান্ত হওয়ার লক্ষণ নেই। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে।

জওহর আর সুভাষ গাঁধীজিকে যে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে সেটা বল্লভভাই পটেল আর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভালভাবেই লক্ষ করলেন। মতিলালজিও গভীর চিন্তাগ্রস্ত। যদি তাঁর রিপোর্ট আজ এখানেই প্রত্যাখ্যাত হয় তবে আগামীকাল প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁর ইজ্জত কোথায় থাকবে? আর ভাবতে পারেন না মতিলালজি। উত্তেজিতভাবে তিনি বলে উঠলেন, 'স্বয়ং সভাপতির এতদিনের পরিশ্রমে তৈরি রিপোর্ট যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তবে এখানে আমার থাকার প্রয়োজনটা কোথায়? এ অপমান মেনে নেওয়ার চেয়ে আমি এখনই এলাহাবাদ চলে যাচ্ছি।'

মতিলালজির মানসিক অবস্থা বুঝতে পারেন গাঁধীজি। মতিলালকে শান্ত থাকতে বলে এবার তিনি স্বয়ং সভার হাল ধরলেন।

গতকাল সবরমতী আশ্রমের ওপর সুভাষের মন্তব্য তাঁকে আগেই ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তারপর স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের হিংসার নীতিতে বিশ্বাসী অনেক তরুণের অংশগ্রহণ তাঁকে ব্যথিত করেছে। সুভাষকে জি ও সি অর্থাৎ 'সেনানায়ক' আখ্যা দেওয়ার পেছনে এইসব তরুণ-যুবকদের হাত আছে বলে শুনেছেন তিনি। সুভাষের ফৌজি পোশাকও তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছে। সুভাষের ফৌজি কায়দায় গটমট করে চলতে চলতে 'ফরোয়ার্ড মার্চ' কম্যান্ড তাঁর কাছে অহিংসা নীতির অবমাননা বলেই মনে হয়েছে। তরুণদের মতিগতির ওপর বিশ্বাস নেই আর। গাঁধীজি নিশ্চিত যে কংগ্রেস বিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। তরুণ প্রজন্মকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি গম্ভীরভাবে বলতে লাগলেন, 'তরুণরা মনে রেখো স্বরাজ-মন্দির রাতারাতি তৈরি হবে না। এর জন্য প্রয়োজন অনেক শ্রমের, সইতে হবে অনেক যন্ত্রণা। কেবল উচ্ছ্বাস আর আবেগ দিয়ে স্বাধীনতা আসবে না।' গাঁধীজির স্বর বেদনার্ত। তরুণদের দিকে আঙুল তুলে তিনি এবার গলা চড়ালেন, 'তোমরা শোনো। এই সভায় নেহরু রিপোর্ট গ্রহণের প্রস্তাব আমি নিজে উত্থাপন করছি। সুভাষ আর জওহর তোমাদের বিশেষ করে বলছি। দেশের জন্য আমি কিছুমাত্র কাজ করেছি এটা যদি তোমরা স্বীকার করো তবে তোমরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করো। নয়তো মতিলালজি যেমন বলেছেন সেইরকম আমিও বলছি আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাব। তোমাদের কংগ্রেস তোমরা সামলাও।'

গাঁধীজির স্পষ্ট ভাষণে সভার আবহাওয়া বদলে গেল। গাঁধীজি দুঃখ পেলে যে সত্যি সত্যিই তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদিকে যুবনেতারাও পিছু হটতে রাজি নন। স্বরাজের জন্য আর কত বছর অপেক্ষা করতে হবে? অধিবেশনে গুঞ্জন উঠল। ব্রিটিশদের কিছুদিন সময় দেওয়া হোক। মধ্যপন্থীরা এবার এগিয়ে এলেন। গাঁধীজি এই সময় দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করলেন। দু'বছর অর্থাৎ ১৯৩১-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক। তখন পর্যন্ত যদি ডোমিনিয়ন স্টেটাস না পাওয়া যায় তবে আন্দোলন শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিলেন গাঁধীজি।

গাঁধীজির কংগ্রেস ত্যাগ করার ইচ্ছের প্রকাশ ব্যথিত করে তুলল জওহরকে। আবেগে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আবেগমথিত স্বরে তিনি বলতে লাগলেন, 'বন্ধুগণ। সত্যি কথা বলতে গেলে গাঁধীজির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধের শক্তি আমার মধ্যে নেই। যে মহাত্মার পায়ের কাছে বসে আমি রাজনীতির পাঠ নিয়েছি তাঁর সঙ্গে বিরোধ? তার চেয়ে গাঁধীজির পতাকা কাঁধে নিয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারলেই অনেক বেশি খুশি হব আমি।' তরী টলমল, জওহরলাল উলটো গাইছেন।

মতিলাল চোখের জল মুছলেন। জওহরলালের উলটো গাওয়াতে তরুণ কংগ্রেসিরা ম্রিয়মাণ। 'ইয়ুথ লিগ'-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে গুঞ্জন। সুভাষচন্দ্র জওহরলালের এই পক্ষ

পরিবর্তনে স্তম্ভিত। গাঁধীজি সামনে এলেই তাঁর এই প্রাণের বন্ধু এরকম তোতলাতে থাকেন কেন বুঝতে পারেন না তিনি! তরুণেরা অন্তত কয়েক পা পিছিয়ে গেছেন এটা স্পষ্ট। গাঁধীজিকে এতক্ষণে একটু খুশি দেখাচ্ছে। এবার তাঁর পরিচিত ভঙ্গিতে পা মুড়ে বসলেন তিনি। প্রসন্ন স্বরে বললেন, 'আমিও আমার মত বদলাচ্ছি। দু'বছর নয়, ব্রিটিশকে এক বছর সময় দেওয়া হোক। ব্রিটিশ সরকার যদি এই সময়সীমার মধ্যে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ না নেয়, তবে আমি নিজে আবার লড়াইয়ের আহ্বান জানাব।'

করতালি ধ্বনিতে মুখর হল সভামণ্ডপ। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন গাঁধীজি। তাঁর ভঙ্গি বদলে গেল। তাঁর উন্মুক্ত দেহ নিস্পন্দ, মনে হয় নিজের মধ্যেই হারিয়ে গেছেন তিনি। মন্দিরে মন্ত্রোচ্চারণের মতো ধীর গম্ভীর স্বরে প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে বলতে থাকেন তিনি, 'আমার তরুণ বন্ধুরা। যেদিন আমরা আমাদের ইষ্ট লাভ করব, ধ্যেয়কে অধিগত করব, সেদিন হয়তো আমার অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসবে। আমার সেই গলিত অন্ধ, পলিত কেশ শরীরের পাশে তোমরা থাকবে না। কাছে এসেও হয়তো চিনতে পারবে না। আমার কথায় সেদিন কান দেবে না তোমরা। হয়তো ঠেলে ফেলে দেবে আমাকে। ইউ উইল নট দেন লিসন টু মি।'

৭

'গাঁধীজির ঘাটেই যদি আপনাদের নৌকো ভেড়াবার ইচ্ছে ছিল, তবে আমাদের ডেকে আনলেন কেন? কেনই বা আমাদের মুখের ওপর থাপ্পড় মারলেন?' উত্তেজিত প্রশ্ন যুবকটির।

একটা ক্যাম্পে সুভাষ আর জওহর অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বসে রয়েছেন। আশেপাশে ঘিরে রয়েছেন অনেক ছাত্র আর যুবক কর্মকর্তা। 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রস্তাবের বদলে কেন আপনারা গাঁধীজির ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রস্তাবে সায় দিলেন—এটাই তাঁদের বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা। পঞ্জাবের নওজওয়ান সভার কর্মকর্তারা, পূর্ব বাংলার সূর্য সেনের দল, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, প্রাক্তন বিপ্লবীরা—এরা সবাই চূড়ান্ত বিক্ষুব্ধ। ভগৎ সিং আর যতীন দাস তো আগুন হয়ে আছেন।

যতীন দাস প্রশ্ন করলেন, 'গাঁধীজির চাপের সামনে আপনারা দুজনেই কী করে মাথা ঝুঁকিয়ে ফেললেন? এই আধখানা স্বাধীনতার জন্যই কি প্রাণপাত করেছি আমরা?'

'যতীন একবার যখন গাঁধীজিকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে, সেটা আমাদের রাখতেই হবে।' সুভাষ বললেন।

'সে কথা আপনাদের ফিরিয়ে নিতে হবে। দেশকে দেওয়া কথা রাখার জন্য গাঁধীজিকে দেওয়া কথা ভুলতে হবে আপনাদের।' সমস্বরে বলে ওঠেন চার কর্মকর্তা।

সত্যরঞ্জন বক্সি বললেন, 'অন্যথা দেশের নবীন প্রজন্মকে অন্য পন্থার কথা ভাবতে হবে।'

সুভাষ বাকিদের অনুরোধ করলেন যে তাঁকে আর জওহরকে একটু একান্তে আলাপের সুযোগ দিন তাঁরা। অনুরোধ মেনে নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে গেলে একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। গাঁধীজিকে দেওয়া কথার খেলাপ হলে ভীষণ কাণ্ড ঘটে যাবে।

ধীরে ধীরে সুভাষ বলেন, 'জওহরজি, লখনউতে আপনি যা বলেছিলেন আজ আমি তাই বলছি। এই তরুণ নেতারাও সে কথাই বলছেন। সত্যি বলতে কী ডোমিনিয়ন স্টেটাস মেনে নেওয়া আত্মহত্যার শামিল। তা ছাড়া মাদ্রাজে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব আপনিই এনেছিলেন—আমি নই।'

জওহরও বিষণ্ণ। তিনি বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কী সুভাষ পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব থেকে সরে আসতে আমারও ভাল লাগছে না।'

'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম, রিপোর্টের বিরোধ মানে নিজের পিতার সঙ্গে বিরোধ।' সুভাষ স্মরণ করিয়ে দেন।

জওহরলাল অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। তারপর মনস্থির করে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'সুভাষ, স্বাধীনতা আমাদের প্রাণবায়ুর মতোই দরকার। স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের চলবে না।'

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে জওহর আর সুভাষ পিছিয়ে যাওয়ায় সমস্যার সমাধান হয়েছিল। খুশি হয়েছিলেন গাঁধীজি। তাঁর মনে পড়েছিল ছোটবেলার একটা ঘটনা। বাবা করমচাঁদের সঙ্গে তিনি একদিন সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন। সেই সার্কাসে ছিলেন এক সুদক্ষ রিং মাস্টার। তাঁর হুংকার আর চাবুকের আওয়াজে বাঘ সিংহগুলোও থরথর করে কাঁপত। সেই সার্কাসে ছিল দুটি সিংহশাবক। একসঙ্গে থাকলেই তাদের দুজনের মিলিত গর্জনে কেঁপে উঠত সার্কাসের তাঁবু। আবার আলাদা খাঁচায় রাখলে তাদের চিৎকারে সারারাত রিং মাস্টার বা অন্য কারও ঘুম হত না। দুটিতে মিলে যখন খেলা দেখাত দর্শকরা মোহিত হয়ে যেত। তবে অনেক সময়েই দুটোতে মিলে রিং মাস্টারকে যেন চ্যালেঞ্জ জানাত। অন্য জানোয়ার আর দর্শকদের সামনে অপমানিত বোধ করত রিং মাস্টার।

রিং মাস্টারের উভয়সংকট। সার্কাসও চালাতে হবে আবার নিজের ইজ্জতও বজায় রাখতে হবে। তা ছাড়া সিংহশাবক দুটিও খুব প্রিয় তার। কিন্তু এদের গর্জন যেন তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাত।

রোজ রোজ অশান্তি আর ভাল লাগে না। একদিন এক বনের মধ্যে দিয়ে সার্কাসের গাড়ি চলেছে। খাঁচার দরজা খুলে রিং মাস্টার দুটি বাচ্চার মধ্যে যেটি বেশি অবাধ্যতা করত সেটিকে বনের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। তারপর দেখা গেল দ্বিতীয়টি আর টুঁ শব্দটিও করছে না। বিমর্ষ হয়ে থাকে সে। অন্য জন্তুগুলোও এবার চুপচাপ। জওহর আর সুভাষকে একসঙ্গে দেখে গাঁধীজির সেই কথাটা মনে পড়ে। তবে ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব প্রত্যাহার করায় সংঘর্ষ আপাতত মিটেছে।

প্রকাশ্য অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল। ঐতিহাসিক 'নেহরু রিপোর্ট' সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে উঠে দাঁড়ালেন স্বয়ং গাঁধীজি। হাতে তাঁর প্রস্তাবের কাগজ। ভাষণ শুরু করার আগেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সুভাষ। গাঁধীজির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আর একটি কাগজ তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। গাঁধীজি সচকিত। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী এটা?'

'আপনার প্রস্তাবের ওপর একটা সংশোধনী প্রস্তাব।'

গাঁধীজি বিস্ময়ে বিমূঢ়। তাঁর মুখে বিস্ময়, খেদ, দুঃখ, আক্ষেপ সব মিলে এক অদ্ভুত ভাব। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার সুভাষ আর একবার জওহরের দিকে তাকিয়ে কাগজটা না পড়েই তিনি মতিলালের হাতে দিলেন। অধিবেশনে চাঞ্চল্য শুরু হল। এইসব তরুণ-তুর্কিরা আবার কী ঝঞ্ঝাট বাধাল তাঁর চিন্তায় গাঁধীজির অন্তরঙ্গদের মুখে উদ্বেগের ছায়া। তরুণদের চোখে-মুখে উল্লাসের লহর। হাত তুলে সবাইকে শান্ত থাকতে অনুরোধ করলেন গাঁধীজি। বললেন, 'আমার প্রস্তাবের উপর সুভাষচন্দ্র বোস একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চান। তিনি তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করার পর আমি আমার বক্তব্য রাখব।' গাঁধীজি এবার আসন গ্রহণ করলেন।

সুভাষ উঠে দাঁড়ালেন। সবার দৃষ্টি তাঁর ওপরে। তিনি বললেন, 'এই রিপোর্টের অন্য সমস্ত বিষয় বাস্তবিক অভিনন্দনযোগ্য। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। আপনাদের মধ্যে কেউ কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন ব্রিটিশ সরকার কথা দিলেও কথা রাখবে? এক

বছরের মধ্যে পূর্ণ স্বরাজের কথা ছেড়েই দিলাম, ডোমিনিয়ন স্টেটাস দিতেও কি রাজি হবে তারা? বলুন আপনারা?'

'না না!'—তরুণদের সমস্বরে চিৎকারে অধিবেশনমণ্ডপ অনুরণিত হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র বিস্তারিত করতে থাকেন তাঁর বক্তব্য।

'নির্মম লাঠির আঘাতে লালা লাজপত রায়ের ঝরে পড়া রক্তে রক্তাক্ত আমাদের হৃদয়। কানপুর আর লখনউয়ে ব্রিটিশের অমানুষিক অত্যাচার ভুলতে পারি না আমরা। তাই আমরা, তরুণেরা আশা করেছিলাম কংগ্রেসের এই অধিবেশন কোনও সাহসী সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য। মাদ্রাজ কংগ্রেসে সম্পূর্ণ স্বরাজের যে নিশান উড়েছিল তাকেও আজ গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে।'

করতালিতে ফেটে পড়ে মণ্ডপ। শ্লোগান উঠতে থাকে চারদিক থেকে, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'হিন্দুস্থান কে দো লাল সুভাষ আউর জওহরলাল'।

'পূর্ণ স্বরাজের দাবি দেশের অধীর তরুণদের। আপনারা যাই মনে করুন প্রকৃতপক্ষে আমি এবং আমার প্রিয় বন্ধু জওহরলাল এঁদের তুলনায় খুবই নরমপন্থী। তবু সবদিক বিচার করেই আমি আজ এই প্রস্তাব নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। অহিংসা অতি উত্তম জিনিস। কিন্তু আজ প্রতিটি রাষ্ট্র প্রাণপণে নিজেদের স্বার্থে অস্ত্রশক্তি বাড়িয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের কর্মসূচি ভবিষ্যতে আমাদের দেউলিয়া প্রতিপন্ন করবে। দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন আমাদের মুখোমুখি হতে হবে আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত শত্রুর সঙ্গে, অস্ত্রবলে বলীয়ান হত্যাকারীদের সঙ্গে।'

চোখের সামনেই অস্ত্রশস্ত্রের স্বপক্ষে এই প্রকাশ্য ওকালতিতে গাঁধীজির মন মুষড়ে যায়। গাঁধীজি আর মতিলালের দিকে নির্দেশ করে সুভাষচন্দ্র বলে চলেন, 'কেউ যদি মনে করেন প্রবীণ নেতাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই, সম্মান নেই, সবিনয়ে তাঁদের বলব দয়া করে আমাদের ভুল বুঝবেন না। ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা, ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠা এক জিনিস আর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আর এক জিনিস। পূর্ণ স্বরাজের এই সংশোধনী প্রস্তাব কোনওমতেই কেউ যেন প্রবীণ, শ্রদ্ধেয় নেতাদের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন বলে না মনে করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা কারও চেয়ে কম নয়। তাঁদের কাছে আমাদের শুধু একটিমাত্র অনুরোধ। তাঁরা যদি আমাদের মধ্যে যে তীব্র জ্বালা রয়েছে সেটা নাও বোঝেন অন্তত সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলুন এইটুকুই আমাদের মিনতি। উই ওয়ান্ট দেম টু কিপ অ্যাব্রেস্ট অফ টাইম।'

সুভাষচন্দ্রের নির্ভীক, স্পষ্ট ভাষণে মতিলাল এবং গাঁধীজি দুজনেই স্তম্ভিত। সুভাষের ভাষণ শ্রোতাদের করতালি আর সোচ্চার উল্লাসে বারবার অভিনন্দিত হয়েছে। বাংলার অনেক তরুণ 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। মনে হচ্ছে কংগ্রেস চলে গেছে তরুণদের দখলে। আবেগের সঙ্গে সুভাষ বলে চলেন, 'কবিরা পূর্ণ স্বাধীনতার বন্দনা গেয়েছেন স্তোত্রপাঠের নিষ্ঠায়, শহিদেরা রক্তের আলপনায় স্বাধীনতার বেদি রঞ্জিত করেছেন। বিশ্বাস করুন, আমি শপথ করে বলতে পারি, পূর্ণ স্বরাজের যে পতাকা আমরা তুলে ধরেছি, তা একটি মুহূর্তের জন্যেও আমরা মাটিতে নামিয়ে রাখতে পারি না। বন্দেমাতরম্।'

সুভাষ বসে পড়ার পরেও বহুক্ষণ হাততালি থামছিল না। তাঁর মোহময় ভাষণে অনেকেরই মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন দাঁড়িয়ে আছেন স্বাধীনতার উদয় দিগন্তে।

সত্যমূর্তি তাঁর ভাষণে সুভাষকে সমর্থন জানালেন। তাঁর পরে হরি সর্বোত্তম রাও গাঁধীজির পক্ষে জোরালো ভাষণ দিলেন। কখনও এ পক্ষে, কখনও ও পক্ষে ভাষণের পালা চলল ঘণ্টার

পর ঘণ্টা। অধিবেশনের দর্শক আর প্রতিনিধিরা দুলতে থাকেন সংশয়ের দোলায়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল। রাত সাতটা। কেউ বুঝতে পারছেন না আর কতক্ষণ চলবে এই আলোচনা। মতিলালজি গাঁধীজির সঙ্গে পরামর্শ করে জওহরলালকে ডেকে কিছু বললেন। জওহরলাল উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'সুভাষের সংশোধনীর ওপরে ভোট নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই সভা এক ঘণ্টার জন্যে মুলতুবি রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ আজকের এই সভায় এখন দর্শক এবং প্রতিনিধিরা এমনভাবে মিশিয়ে আছেন যে, সুষ্ঠুভাবে ভোট নেওয়া সম্ভব হবে না বলেই সভাপতি মনে করেন।'

স্রোতের মতো শামিয়ানা থেকে লোক বেরোতে শুরু করে। গাঁধীজির প্রধান শিষ্যরা ভিড় করলেন গাঁধীজির চারপাশে। রাত সোয়া আটটায় আবার সভা শুরু হল।

জওহরলাল যখন তাঁর ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালেন, তখন বিশাল শামিয়ানায় হাজার হাজার মানুষ নীরব, নিশ্চুপ। সভায় বোধহয় পিন পড়লে শব্দ পাওয়া যায়। আশার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন মতিলাল আর গাঁধীজি। হয়তো এখনও তাঁর সুবুদ্ধির উদয় হবে, গতকালের মতোই সমর্থন করবে গাঁধীজিকে। দর্শক আর প্রতিনিধিরাও উৎসুকভাবে অপলকে তাকিয়ে। কংগ্রেস সভাপতির পদে, দেশের শ্রেষ্ঠতম পদে পিতা সমাসীন আর পুত্রের হাতে বিদ্রোহের পতাকা। লখনউয়ের আদবদুরস্ত হিন্দিতে জওহরলাল তাঁর ভাষণে বললেন, 'ভারত কোনওদিন ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল না। তাই পূর্ণ স্বরাজের দাবি থেকে তিলমাত্র সরে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি সুভাষের সংশোধনী প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।'

মতিলালজির মুখ বেদনায় মলিন। তরুণরা জয়ধ্বনি দিতে শুরু করল। গাঁধীজি অসম্ভব গম্ভীর। রাত তখন সোয়া দশটা। সংশোধনী প্রস্তাবের জবাব দিতে উঠে দাঁড়ালেন গাঁধীজি। রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে সবাই তাকিয়ে। শুরুতে গাঁধীজি বিষাদের সঙ্গে বললেন, 'বাংলার তরুণ প্রজন্ম যদি এ কথা মনে করে যে এক গুজরাতি বানিয়া তাদের আবেগ নিয়ে খেলা করছে তবে সেটা প্রচণ্ড ভুল হবে। আমি তাদের মিনতি করছি এ ধরনের সমস্ত ভুল ধারণা মন থেকে দূর করে দিতে।'

তরুণ নেতাদের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে, আবেগকম্পিত গলায় বলে চলেন তিনি, 'জওহর, সুভাষ। মাত্র গতকাল রাত্রেই তোমরা আমাকে "নেহরু রিপোর্ট"-কে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। আমি একা নই, কংগ্রেস কমিটির সমস্ত সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আরে, তোমরা নিজেদের দেওয়া কথার মর্যাদা বারো ঘণ্টাও যদি না রাখতে পারো, কোন মুখে তোমরা স্বাধীনতার বুলি আওড়াও?' সুভাষ এবং জওহর মাথা হেঁট করে বসে থাকেন। গাঁধীজি প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, 'বুক পেতে গুলির আঘাত নেবার জন্য তৈরি থাকতে হবে তোমাদের। তবেই তোমাদের স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠবে। কিন্তু সে সময় এখনও আসেনি। অকারণে প্রাণ দিয়ো না। ছায়া দেখে ভয় পেয়ো না। তোমাদের ধৈর্য বাড়াতে হবে। স্বাধীনতার জন্য তোমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। উত্তম কথা। যেদিন সময় আসবে আমি চাই যে তোমরা সেদিন বীরের মতো মরণকে বরণ করে নেবে। আই ওয়ান্ট ইউ টু ডাই অ্যাট প্রপার টাইম। আমি চাই তোমাদের সেই মৃত্যুবরণ যেন সার্থকতা পায়।'

মধ্যরাত্রে শুরু হল ভোট নেওয়া। 'মহাত্মা গাঁধী কী জয়' ধ্বনির প্রত্যুত্তরে ধ্বনি উঠছে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। সুভাষ আর জওহরের পাশে যারা রয়েছে তাদের উদ্দীপনা বেশি কিন্তু সংখ্যা কম। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে গাঁধীজি রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেবেন এ আশঙ্কা ছেয়ে আছে বেশির ভাগ লোকের মনে।

রাত তখন একটা। ১৯২৮ এখন অতীত। শুরু হয়েছে ১৯২৯। সভাপতি মতিলাল ভোটের ফল ঘোষণা করলেন। গাঁধীজির প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ১৫৫০ জন আর বিপক্ষে পড়েছে ৯৭৩টি ভোট। 'মহাত্মা গাঁধী কী জয়' ধ্বনিতে মুখর হল শীতের রাত্রি। গাঁধীজিকে এভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর স্পর্ধাপ্রকাশে দক্ষিণপন্থীরা দারুণ বিক্ষুব্ধ। 'পূর্ণ স্বরাজের' প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাওয়াতে তরুণদের সঙ্গে বিপ্লবপন্থীরাও বিমর্ষ।

জওহর আর সুভাষ উডবার্ন পার্কের দিকে রওনা হলেন। সারাদিনের শ্রান্তি ছাপিয়েও দুশ্চিন্তা তাঁদের মনে। ভবিষ্যতে সংঘর্ষ কঠিনতর হবে সে ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট।

জওহরলাল বললেন, 'গাঁধীজির প্রস্তাব গৃহীত হলেও তরুণদের এই ধরনের বিরোধিতায় খুবই আঘাত পেয়েছেন তিনি।'

'শুধু যে গাঁধীজি আঘাতই পেয়েছেন তা নয়। ভবিষ্যতে আমাদের এর ফলভোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সাধারণ মানুষের শাপমন্যির মধ্যেও শাপমুক্তির ক্ষমাশীলতা হয়তো থাকতেও পারে এবং থাকে। কিন্তু ঋষিমুনিদের অভিশাপ বড় ভয়ানক। সে অভিশাপ ক্ষুরের চাইতেও ধারাল। তাঁদের চোখের আগুনের কাছে হার মানে খুনে বাঘের চোখ। সেই অভিশাপে মানুষের কথা ছেড়ে দাও, ধরিত্রীও বিদীর্ণ হয়।'

৮

রাত প্রায় পৌনে দুটোর সময় গাঁধীজি সোদপুর আশ্রমে পৌঁছলেন। সোদপুর আশ্রমে গাঁধীজি সবরমতীর মতোই স্বচ্ছন্দ। সতীশ দাশগুপ্ত জেগেই ছিলেন। গাঁধীজিকে তাঁর কুঠি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তিনি।

গাঁধীজির চোখে ঘুম নেই। সুভাষ আর জওহরলালের ভাষণের প্রতিটি শব্দে ঝরে পড়ছিল উগ্রতা। উগ্রপন্থার দিকে তাঁদের এই আকর্ষণ দারুণ আঘাত করেছে গাঁধীজিকে। এই মনোভাবকে তারুণ্যসুলভ ভাবাবেগ বলে মানতে পারেন না তিনি। সত্য আর অহিংসার ভিত্তিতে রাজনীতির বিরোধিতা করে পূর্ণ স্বরাজের জন্য তাঁদের অধীরতা গাঁধীজিকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। অনেক বছর ধরে অনেক দেখে, অনেক গ্রীষ্ম বর্ষার অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ রাজনীতিক মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী কালকের ঘটনায় শুধু ব্যথিত নন—হয়তো খানিকটা ভীত, শঙ্কিত।

আধ ঘণ্টাখানেক পরেই মতিলালজির গাড়ি পৌঁছল সোদপুর আশ্রমে। গাঁধীজিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, 'বাপুজি। আপনি কলকাতায় না এলে আমার সম্মান, আব্রু ধুলোয় মিশত। এই উগ্র তরুণেরা "নেহরু-রিপোর্ট" হুগলি নদীতে ফেলে দিত।'

'আমিও সেটা আন্দাজ করেছিলাম।'

'যাই হোক। এ দেশের মানুষের বেশির ভাগ যে আপনাকেই মানে সেটা তো প্রমাণ হয়ে গেল।'

'মতিলালজি আপনি ভুলে যাচ্ছেন প্রস্তাবের পক্ষে ১৫৫০টি ভোট পড়লেও, বিপক্ষেও পড়েছে ৯৭৩টি ভোট। আপনার কাছে কি সংখ্যাটা খুব কম মনে হচ্ছে?'

গাঁধীজির মনে পড়ছে পোরবন্দরের সেই সার্কাসের কথা, সেই দুটি সিংহশাবকের উদ্দামতার কথা। তিনি মতিলালজিকে বললেন, 'এইসব বাঙালিবাবুদের বিশ্বাস কী? হিংসার প্রতি আকর্ষণ এদের মজ্জায় মজ্জায়। ভুলবেন না এদের প্রিয় দেবতা কৃষ্ণকানহাইয়া নন কালী করালবদনী। তা ছাড়া সুভাষ আর বিপ্লবীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।'

'কিন্তু এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ কি কিছু পেয়েছেন?'

'উঠতে বসতে প্রমাণের কাগজপত্র দেখে তো আর পৃথিবী চলে না মতিলালজি! সুভাষ হয়তো নিজে বিপ্লবী সংগঠনে নেই, কিন্তু জেনে রাখবেন মনের দিক থেকে ও তাদেরই একজন।'

সুভাষ আর জওহরের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁদের বিদ্রোহ গাঁধীজিকে মর্মাহত করেছে। 'মতিলালজি এরা অবুঝ শিশু নয়। দুজনেই পরিশীলিত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত, বিদেশ ঘুরে আসা যুবক। ওরা কি ওদের দায়িত্ব বোঝে না?'

'কিন্তু ওদের তো ত্যাগ করাও সম্ভব নয়।'

'তাও সত্যি। ত্যাগে, নিষ্ঠায়, দেশপ্রেমে ওদের তুলনা নেই। জওহর আনন্দভবনের ঐশ্বর্যের পরোয়া করেনি। সুভাষ আই সি এস চাকরির উজ্জ্বল সম্ভাবনা আবর্জনার মতো ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। একজন ব্যারিস্টার, আর একজন আই সি এস। দুজনেই সুদর্শন, দুজনেরই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মতিলালজি, আমাদের স্বীকার করতেই হবে আজকের তরুণদের স্বপ্নের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে এরাই।'

দেশবন্ধুর কথা স্মরণে এল গাঁধীজির। তিনি বললেন, 'দাশের তারিফ করতে হয়। সুভাষের গুরু হওয়া কম কথা নয়। সুভাষকে সামলানো আপনি কি সহজ মনে করেন?'

গাঁধীজি চান কংগ্রেসের নৌকো তাঁর দেখানো রাস্তায় চলুক। যাই ঘটুক হাল তাঁকে নিজের হাতে রাখতে হবে। তবে এটাও সত্যি যে, কংগ্রেস-তরীর পালে যদি নবচেতনার হাওয়া না লাগে তবে নৌকো বেশিদূর যাবে না। তারুণ্যের অসন্তোষ বেশিদিন চেপে রাখা যাবে না। আবার এটাও সত্যি যে তারুণ্যের উথাল-পাথাল নৌকোটাকেই ডুবিয়ে দিতে পারে। কংগ্রেস আজ জাতীয়তার প্রতীক, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকাবাহক। কংগ্রেস ভেঙে যাওয়ার অর্থ দেশের রাজনীতিতে শুধু অস্থিরতা নয়, অরাজকতা। এই বহুবিচিত্র দেশের সার্কাসের রিং মাস্টারি করতে হলে তাঁকে আরও সতর্ক হতে হবে।

মতিলালজি বললেন, 'জওহরের বাবা হিসাবে নয়, নিরপেক্ষভাবেই বলছি। গাঁধীজি, আজ ভারতের সবচেয়ে প্রয়োজন আপনার বুদ্ধি আর জওহরের কণ্ঠস্বর।'

গাঁধীজি চকিত দৃষ্টিতে মতিলালের দিকে তাকালেন। রিং মাস্টারের হাত নিশপিশ করছে। ন' দশ বছর আগে ব্যারিস্টার জিন্না নামের আর এক চিতাবাঘ তাঁর দিকে তাকিয়ে গরগর করছিল। সেই সময় গাঁধীজির রাজনীতিকের সত্তা তাঁর মহাত্মা সত্তাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সবরকম উপায় অবলম্বন করে জিন্নাকে খড়কুটোর মতো কংগ্রেস থেকে তুলে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। আজ সেই চিতাবাঘ মুসলিম লিগের ছোট্ট খাঁচাটিতে। বিশেষ কেউ তাকে আর ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। সার্কাস ঠিকমতোই চলছে।

মতিলাল আবার বললেন, 'গত দু'বছর ধরে আমি আপনাকে বলে আসছি জওহরকে কংগ্রেসের সভাপতি করুন। বাপু, আপনি আর জওহর একসঙ্গে হোন। তারপর কে আগে আর কে পরে থাকবে তার পরোয়া আমি করি না। ইফ ইউ অ্যান্ড জওহর স্ট্যান্ড টুগেদার, ইট ডাজ নট রিয়্যালি ম্যাটার হু স্ট্যান্ডস ইন ফ্রন্ট অ্যান্ড হু ইজ বিহাইন্ড।'

এক খাপে দুই তরোয়াল রাখার অসুবিধের উপমাটি মতিলালের খুব প্রিয়। গাঁধীজিকেও তিনি শোনান সেটা। গাঁধীজির চোখে ভেসে ওঠে দুই অবাধ্য সিংহশাবকের ছবি। তাঁর মনে হল দর্শকদের ভিড়ে ঠাসা সার্কাসে তারা যেন দাঁত খিচিয়ে রিং মাস্টারকে বলছে, 'আপনাকে আমরা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বাধ্য করব।' গাঁধীজির মুখে ফোটে এক বিচিত্র হাসি।

মহাত্মার আবরণের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে পোড়-খাওয়া ঝানু রাজনীতিক। ব্রিটিশের 'ডিভাইন্ড অ্যান্ড রুল' নীতির কট্টর সমালোচক গাঁধীজি কিন্তু এবার নিজেই কাজে লাগাবেন সেই নীতি। রিং মাস্টার দুটি সিংহশাবকের মধ্যে যেটি বেশি অবাধ্য সেটাকেই বনে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটেছে। আশ্রমে প্রার্থনাসভার ঘণ্টা বাজছে। গাঁধীজি এখন দ্বিধামুক্ত। মতিলালের কাঁধে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত রেখে প্রার্থনাসভার দিকে এগিয়ে চললেন তিনি।

৫

বলিদান, আত্মবলিদান

১

'তোমাদের ব্রহ্মচারী নেতা তো বেশ ভালই রং জমিয়েছেন। তাঁর বিয়েটাও হয়ে গেছে!'

'কী আজেবাজে বলছ?'

'হেমন্ত, ভুলো না আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার। তাঁর সব গোপন চিঠি আমাকেই খুলতে হয়। তুমি দেখতে চাও?'

হতবাক হেমন্তর হাতে অফিসারটি একটি চিঠি তুলে দিলেন। 'মাই ডিয়ার হাজব্যান্ড'— সম্ভাষণটুকু পড়েই হেমন্তর সব গুলিয়ে গেল। সুভাষচন্দ্রের এত বড় একটা খবর গোপন রয়েছে। অবিলম্বে বাসন্তী দেবীর কাছে খবরটা পৌঁছে গেল।

দিল্লি সফর থেকে সদ্য ফেরা সুভাষের দিকে তাকিয়ে বাসন্তী দেবী বললেন, 'আজকাল তোর মহারাষ্ট্র সফর একটু বেশি ঘন ঘন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। ব্যাপারটা কী?'

'তার মানে?'

'মেয়েটি কে রে?'

'কোন মেয়েটি?'

'বোম্বাইয়ের মেয়েটি— যে তোর জন্য পথ চেয়ে বসে থাকে।'

'তাই নাকি?'

'বিয়েটা কবে করলি?'

'কী যা তা বলছ? সে রকম কিছু হলে আগে তোমাকে বলতাম না?'

'তাই যদি না হবে তা হলে "প্রিয়তম স্বামী" বলে চিঠি লেখে কেন? তুই কি জানিস মেয়েটির প্রেমপত্র পুলিশের ফাইলেও আছে।'

কিছুদিন হল মুগ্ধা নামে একটি মরাঠি তরুণী সুভাষকে চিঠির পর চিঠি লিখছে। চিঠি পড়ে সুভাষ হেসে বাঁচেন না। তাঁর সব চিঠিই পুলিশ দপ্তরে আগে খোলা হয়। তারাও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বোঝার জন্য তারাও খোঁজখবর করছে।

সফর থেকে ফিরে সুভাষ ক্লান্ত। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে বাসন্তী দেবী সুভাষকে খেতে দিলেন। বাসন্তী দেবীর হাতের রান্না সুভাষের দারুণ পছন্দ। তবে আজ যেন কী রকম আনমনা।

'কী হয়েছে রে? তোকে যেন কেমন দেখাচ্ছে।'

'বন্ধুবিচ্ছেদে বড় কষ্ট হয় মা।'

'কার সম্বন্ধে বলছিস?'

'জওহর।'

'আরে, কলকাতা কংগ্রেসের সময়ও তোরা একসঙ্গে ওঠাবসা করছিলি। হঠাৎ কী হল?'

'নজর লেগেছে মা।'

'কার নজর?'

'এক মহাত্মা ব্যক্তির। গাঁধীজির প্রভাবে জওহর পূর্ণ স্বরাজের পক্ষ আর তার সঙ্গে আমাদের বামপন্থী পক্ষ ছেড়ে দিচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে।'

'এ সব তোর মনের ভুল।'

কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছেন সুভাষ আর কিরণশঙ্কর রায়। হাওড়া স্টেশনে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে হেডলাইন পড়ে কিরণশঙ্কর বললেন, 'দিল্লিতে ভাইসরয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনার একটা শেষ চেষ্টা গাঁধীজি করেছিলেন। কিন্তু যেদিন গাঁধীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে সেদিন সকালেই একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছে। ভাইসরয় ফিরছিলেন দক্ষিণ ভারত সফর শেষে। সকালে ঘন কুয়াশার মধ্যে তাঁর ট্রেন দিল্লি পৌঁছবার ঠিক আগে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল।'

সুভাষ তাড়াতাড়ি কাগজটা টেনে নেন। লর্ড আরউইন একটুর জন্যে বেঁচে গেছেন তবে তাঁর আরদালি জখম হয়েছে। সুভাষ বললেন, 'ভাইসরয় বলেছেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের সম্বন্ধে আমাদের নেতারা কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। এইসব অর্থহীন আলোচনার কী কোনও মানে আছে?'

'তুমি কী বলতে চাইছ?' কিরণশঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন।

'সংঘর্ষ— লড়াই! সুভাষ গর্জে উঠলেন। ব্রিটিশের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ভরসা না করে গাঁধীজির উচিত সোজাসুজি লড়াইয়ের জন্য ডাক দেওয়া।'

'গাঁধীজি বলেন সেরকম পরিস্থিতি আজও আসেনি। তাই তিনি আন্দোলনের জন্য তৈরি নন।'

'এটাই তো আমাদের দুর্ভাগ্য। সাধারণ মানুষ প্রস্তুত আর নেতারা পঞ্জিকা দেখছেন শুভ মুহূর্তের জন্য।'

'এইসব বলার জন্যই তো ব্রিটিশ সরকার খাপ্পা তোমার ওপরে। ভগৎ সিং আর যতীন দাসকে তুমি তারিফ করার পর থেকে সরকার তোমাকে পয়লা নম্বর দুশমন ভাবছে।'

'হ্যাঁ সরকারও শত্রু ভাবছে আর সর্বদা গাঁধীজির সমালোচনা করার জন্য তিনিও আমাকে মিত্র ভাবেন না।'

নওজওয়ান ভারতসভার ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত দুজনে মিলে এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা ছুড়ে দিলেন। 'আমাদের বোমা ছোড়ার প্রধান কারণ অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া'— নির্ভীক বিবৃতি দিয়েছিলেন এই দুই বিপ্লবী। পালিয়ে না গিয়ে ধরা দিয়েছিলেন তাঁরা। বোমা বিস্ফোরণের সময় জন সাইমনও উপস্থিত ছিলেন সভাকক্ষে। এই ঘটনার পরে কয়েকটা দিনও কাটেনি— যতীন দাসের গ্রেফতার হওয়ার খবরে বাংলা বিষণ্ণ। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সুভাষচন্দ্রের চারপাশে জাল বিছোলেন। দিনরাত গুপ্তচরদের কড়া নজর তাঁর ওপরে। যতীন দাস আর সুভাষের সম্পর্ক সবারই জানা। পুলিশের তদন্তে প্রকাশ পেল যে ভগৎ সিংয়ের সহযোগীদের বোমা তৈরি করতে যতীন দাসই শিখিয়েছেন।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে লালা লাজপত রায়ের ওপরে পুলিশের যে নির্মম লাঠিচার্জ হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে ভগৎ সিং আর তাঁর সহকারীরা যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন সন্ডার্স নামে এক পুলিশকর্মীকে। ভগৎ সিং সারা দেশের কাছে এখন শৌর্যের প্রতীক। লাহোর জেলে দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে বন্দিদের আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছেন যতীন দাস। অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন তিনি। পুলিশ তাঁকে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল— ফল হয়নি কিছু। তেষট্টি দিন অনশনে থেকে ১৯২৯-এর ১৩ সেপ্টেম্বর শহিদ হয়েছেন যতীন দাস।

পঁচিশ বছরের তরতাজা যুবক যতীন দাসের মৃতদেহ কলকাতায় এসে পৌঁছলে সুভাষ আর ব্যারিস্টার জে. এম. সেনগুপ্ত সারারাত মৃতদেহ আগলে বসেছিলেন। খালি পায়ে শবানুগমন করেছেন তাঁরা। দেশবন্ধুর পরে এত বিশাল শবযাত্রা কলকাতা আর দেখেনি।

এইরকম উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যেই সুভাষ গিয়েছিলেন পঞ্জাব সফরে। পঞ্জাবের সর্বত্র তরুণ যুবকেরা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন প্রচণ্ড উদ্দীপনার সঙ্গে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল পঞ্জাবের আকাশ-বাতাস। ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে লাহোর জেলে দেখা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সুভাষ, কিন্তু অনুমতি মেলেনি। কৃষকদের সংগ্রাম দিনে দিনে শক্তিশালী হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র। শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তিত করে তুলেছে।

ইরাবতী নদীর তীরে দুশো একর জমিজুড়ে গড়ে উঠেছে লালা লাজপত নগর— লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশন স্থল। পঞ্জাবে এই সময়টা হাড়কাঁপানো ঠান্ডা পড়ে। নেতাদের শিবিরই হোক কিংবা প্রতিনিধিদের তাঁবুই হোক, সব যেন ঠান্ডায় সিঁটিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নওজওয়ান ভারতসভা পঞ্জাবের তরুণদের মনে জাগিয়ে তুলেছে জাতীয়তাবোধের আগুন। এখানে তাদের মনে ব্রিটিশের নিষ্ঠুর লাঠির আঘাতে পঞ্জাবকেশরি লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর ক্ষত দগদগে হয়ে রয়েছে। যেখানে অধিবেশন হচ্ছে তার থেকে সামান্য দূরেই সম্পন্ন হয়েছিল লালাজির শেষকৃত্য। তাঁর ছবিতে ফুল আর মালা দিচ্ছেন কাতারে কাতারে মানুষ। গাঁধীজি আর জওহরলাল এসে পৌঁছেছেন। অধিবেশন পরিচালনার ভার গাঁধীজি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন— কিন্তু পঞ্জাবের মাটিতে ভগৎ সিং আর নওজওয়ান সভার চরমপন্থী মতের গন্ধ ছড়ানো।

অধিবেশনের সভাপতি জওহরলালের শিবিরের লাগোয়া গাঁধীজির শিবির। অন্যান্য অগ্রণী গাঁধী অনুগামীরাও কাছাকাছিই আছেন। সুভাষ এবং অন্যান্য নেতাদের তাঁবু অনেকটা দূরে। সারা দেশের যুবনেতারা পৌঁছে যাওয়ার পরেও পুরো একটা দিন কেটে গেছে। কিন্তু যুব কংগ্রেসের নামও শোনা যাচ্ছে না। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন দূরস্থান, কোনও বৈঠক হওয়ারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যুবনেতাদের মনে অস্বস্তি কী করা যায়? আলোচনা করার জন্যে তাঁরা জড়ো হলেন সুভাষচন্দ্রের তাঁবুতে। সেই রাত্রেই সুভাষের সঙ্গে তাঁরা পৌঁছলেন কংগ্রেস সভাপতির শিবিরে।

জওহরলালকে খুবই খুশি খুশি লাগছে। সহকর্মীদের স্বাগত জানালেন তিনি। সুভাষচন্দ্রই প্রথম আলোচনা শুরু করলেন।

'কলকাতা অধিবেশনের মতো এখানেও যুব কংগ্রেসের অধিবেশন হবে এইরকমই কথা হয়েছিল—'

কথা শেষ করতে না দিয়েই জওহর বললেন, 'সেটা ঠিক। তবে বাপুজি বললেন, জওহর, কংগ্রেসই তো এখন যুব নেতার সভাপতিত্বে। তবে আর আলাদা যুব কংগ্রেসের প্রয়োজনটা কোথায়? তা ছাড়া পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব উত্থাপন করবেন বাপুজি। এর বেশি আর কী চাই তোমার?'

'শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করলেই তো কাজ হবে না। সরাসরি সংগ্রামের ডাক গাঁধীজি কবে দেবেন? কংগ্রেসের চুয়াল্লিশ বছর পূর্ণ হল। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি কতটুকু?' সুভাষ বললেন। জওহর বুঝলেন তাঁর ইঙ্গিত।

'সুভাষ। এটা সত্যি যে আমি গাঁধীজির শিষ্য। কিন্তু তার মানে এ নয় যে আমি বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাস হারিয়েছি কিংবা আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছি?'

'জওহর ভুলে যাবেন না আমরা দুজনেই কংগ্রেসে প্রগতিশীল, কার্যকরী আর বিজ্ঞাননিষ্ঠ নীতির প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়েছিলাম।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুভাষ আবার বলতে থাকেন, 'ইয়ুথ লিগ কে তৈরি করেছিলেন? আর মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাবের উত্থাপক তো আপনিই ছিলেন, জওহর।'

'কে অস্বীকার করছে সে কথা? আমি শুধু বুঝতে পারছি না তোমার ভয়টা কোথায় এবং কেন?'

'গাঁধীজি আমাদের বামপন্থী চিন্তাধারার মধ্যে বিভেদ আনতে চাইছেন।' এবার সুভাষ তাঁর আশঙ্কা স্পষ্ট করেন।

'গাঁধীজির নামে এ ধরনের অভিযোগ কিন্তু অত্যন্ত গুরুতর সুভাষ।'

'আমি প্রমাণ দিতে পারি।'

'কী প্রমাণ?'

'কলকাতা কংগ্রেসে না আসার কথা বারবার দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও কেন সেখানে গাঁধীজি এলেন? ইতালি এবং তুরস্ক সফরের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি কেন তিনি বাতিল করলেন?'

'শুধু এই?'

'না শুধু এইটুকুই নয়। গাঁধীজি আপনাকেই কংগ্রেস সভাপতির জন্য বেছে নিলেন কেন? সত্যি কথা বলতে কী এই পদে এবার প্রকৃত দাবি ছিল সর্দার বল্লভভাই পটেলের সেটাই হত গণতন্ত্রসম্মত।'

জওহর স্তব্ধ। সুভাষের চড়াস্বরে আহত বোধ করেন তিনি। তারপরেই চিড়বিড়িয়ে ওঠেন, 'সুভাষ, কংগ্রেস সভাপতির পদ তো আমিও চাইনি। উলটে আমি সবরমতী গিয়ে বাপুজিকেই সভাপতি হবার জন্য অনেক কাকুতিমিনতি করেছিলাম। বিশ্বাস কর সুভাষ, আমাকে জোর করে সভাপতি করা হয়েছে। আই হ্যাভ বিন পিচফর্কড ইনটু দ্য চেয়ার।'

অনেক রাত্রে আলোচনা শেষ হল। জওহর সহকর্মীদের সম্বোধন করে শেষ কথা বললেন, 'একথা নিশ্চয়ই সত্যি যে আমি বাপুজির মতো মহাত্মার আর আমার বাবার সম্মান নিশ্চয়ই রাখব। কিন্তু আমার মন সবসময়ই বামপন্থী প্রগতিশীল বিচারধারারই পক্ষে থাকবে। আপনারা ভুলে যাবেন না যে আমি নিজে এখনও যুবক।'

অধিবেশনের শুরুতেই লর্ড আরউইনের ওপর বোমা নিক্ষেপের নিন্দাপ্রস্তাব উত্থাপন করতে উঠে দাঁড়ালেন স্বয়ং গাঁধীজি। তাঁর ইচ্ছে প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হোক। কিন্তু সভায় গুঞ্জন শুরু হল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন অনেকে। সুভাষচন্দ্রের মুখে অসন্তোষের

ছায়া স্পষ্ট। শার্দূল সিং কবীশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'সুভাষজি, গাঁধীজির প্রস্তাবে কি আমরা সবাই একমত হব?'

'কীসের জন্য? ভাইসরয়ের জীবনহানি না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠছে গাঁধীজির। আমাদের যতীন দাসের মৃত্যুর জন্য তিনি কি টুঁ শব্দটুকুও করেছেন? অন্য সময় "ইয়ং ইন্ডিয়া" পত্রিকায় স্বাস্থ্য আর আহার সম্বন্ধেও কত কথাই লেখেন তিনি। যতীন দাসের জন্য তো একটুখানি উদ্বেগও প্রকাশ করতে পারতেন তিনি।'

সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব পাশ হওয়া ভেস্তে গেল। ৯৪২টি ভোট পেয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল কিন্তু বিপক্ষেও পড়ল ৭৯৪টি ভোট। অহিংসার নীতিতে অবিশ্বাসীদের সংখ্যা এত বেশি দেখে গাঁধীজি প্রচণ্ড ব্যথিত।

পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য গাঁধীজি যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন সমবেত সবার নজর তাঁর মুখের ওপর। জওহর, সুভাষ, আর বামপন্থীরা তো বটেই— সবার মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি। আনন্দ নেই শুধু গাঁধীজির মুখে। মন ক্লিষ্ট তাঁর। তাঁর স্থির বিশ্বাস দেশ পূর্ণ স্বরাজের জন্য এখনও তৈরি নয়। বিগত বছর কলকাতা অধিবেশনে যে প্রস্তাব পাশ করানোর জন্য জওহর-সুভাষ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, আর বানচাল করার জন্য গাঁধীজি স্বয়ং সবরকমের চেষ্টা করেছিলেন, সেই প্রস্তাব উত্থাপন করার দায়িত্ব আজ গাঁধীজিরই ওপরে। তরুণদের চালে একরকম হার মেনেই এ প্রস্তাব উত্থাপনের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়েছে।

প্রস্তাব উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে ফেটে পড়ল সভা। প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেছে এইরকম একটা ভাব প্রায়। ঠিক তখনই মঞ্চে উঠে এসে সুভাষচন্দ্র দাঁড়ালেন মাইকের সামনে। তাঁর মুখচ্ছবি শান্ত— কিন্তু বাকিদের মুখে উদ্বেগ। আবার কী চান তিনি? গত অধিবেশনের কথা মনে পড়ল অনেকের।

সুভাষ বলতে শুরু করে প্রথমেই গাঁধীজিকে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য অভিনন্দন জানালেন। তারপর বললেন, 'গাঁধীজির প্রস্তাবে আইন অমান্য আন্দোলনের শুধু উল্লেখটুকুই আছে। কিন্তু শ্রমিক, কৃষক, সমাজের নিষ্পেষিত শ্রেণির প্রকৃত উপকার তখনই হবে যখন আমরা নিজেরাই সরকার গঠন করব। তাই আমাদের স্থাপন করতে হবে "সমান্তরাল সরকার"। যে পর্যন্ত আমরা এই "সমান্তরাল সরকার" না তৈরি করতে পারছি এই পূর্ণ স্বরাজের বাস্তবমূল্য কতটুকু?'

'সমান্তরাল সরকার'-এর উল্লেখে গাঁধীজি সচকিত। ভাইসরয় সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করাতেই যে ঝঞ্ঝাট হয়েছে তাতে তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। এরপরে যদি সুভাষের সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় তো সেটা হবে তাঁর সমস্ত ধ্যানধারণার পরাজয়। অধিবেশনের গতিপ্রকৃতি যাতে হাতের বাইরে না চলে যায় তাই এবার তিনি স্বয়ং উঠে দাঁড়ালেন সুভাষের সংশোধনী প্রস্তাবের উত্তর দেওয়ার জন্য। কখনও কৌতুক, কখনও বাছা বাছা অলংকার কখনও বা স্রেফ বয়সের সুযোগ নিলেন তিনি নিজের বক্তৃতায়। 'সুভাষচন্দ্র বোস আমার খুবই আদরের। মুশকিল হচ্ছে সুভাষ আমাকে ষাট পেরোনো বুড়ো ভাবে। এটা সত্যি যে বয়সের জন্য আমি এখন দুর্বল। সুভাষ যে-কোনও সময়ে আমাকে উঠিয়ে পটকে দিতে পারে।' বলতে বলতে গাঁধীজি হাসছিলেন। তাঁর কথার ভঙ্গিতে উপস্থিত সবারই হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়। হো হো করে হেসে উঠে এবার গাঁধীজি বললেন, 'আমি কিন্তু নিজেকে এখনও তরতাজা তরুণ বলেই দাবি করি। ষাট পেরোলেও আমি এখনও ঘোড়া হাঁকাতে পারি। আপনারা কি মনে করেন? পারব না?'

দর্শক-প্রতিনিধিদের মধ্যে হাসির রোল। একজন চেঁচিয়ে বললেন, 'গাঁধীজি আপনি সব করতে পারেন।'

'আমি কিন্তু ঘোড়ায় না উঠেই ঘোড়া হাঁকাব। বলুন তো কেমন করে? পারলেন না তো? আমি লাগাম দিয়েছি জওহরের হাতে। সুভাষের সমান্তরাল সরকার স্থাপনের প্রস্তাব দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে। জওহর রাষ্ট্রকে ঠিক রাস্তায় চালাতে পারবে।'

রাত তখন বারোটা। তুমুল করতালি ধ্বনিতে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হল। মাঝরাতের প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে ইরাবতী নদীর তীরে হাজার হাজার মানুষ। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অভিবাদন জানানো হল। আনন্দের আতিশয্যে জওহরলাল সত্যি সত্যি নাচছিলেন। অন্তত কাগজপত্রে তো তরুণদের পূর্ণ স্বরাজের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে।

পরের দিন কংগ্রেসের নতুন ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাচন। একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, অন্যটি যমুনালাল বাজাজ। দুটি তালিকা থেকেই সাবধানে বাদ দেওয়া হয়েছে সুভাষ এবং তাঁর সহযোগীদের। বাংলা থেকে অসম নাগাল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার বিশেষ কেউ স্থান পাননি। একমাত্র জে. এম. সেনগুপ্তর জন্য মতিলাল জেদ ধরেছিলেন। গাঁধীজিও মেনে নিলেন সেটা।

লাহোর থেকে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছেন প্রতিনিধিরা। সুভাষকে গাঁধীজি কী ভাবে দাবিয়ে দিয়েছেন সেটা সাধারণ প্রতিনিধিরাও বুঝেছেন। অনেকে মনে করছেন এটা অন্যায় হয়েছে। তাঁদের মনে বিক্ষোভ। গাঁধীজি আর সুভাষের ক্রমবর্ধমান দূরত্বে অবশ্য সবচেয়ে খুশি ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দারা। এই ব্যাপারটা জানতে পেরে সুভাষও দুঃখিত। জওহর আজ গাঁধীজির বর্মে সুরক্ষিত। ইরাবতী পেছনে ফেলে ট্রেন ছুটেছে দিল্লির দিকে। সুভাষের সঙ্গে একই কামরায় আছেন অন্ধ্রের কংগ্রেস নেতা এবং শল্য চিকিৎসক ড. পট্টভি সীতারামাইয়া। তিনি বললেন, 'মহাত্মাজি একেবারে পাকা সিদ্ধান্তের মানুষ। জাতির অগ্রগতির পথের মানচিত্র একেবারে পরিষ্কার তাঁর কাছে। হাতের কম্পাসও নির্ভুল। আমি সবচেয়ে খুশি গাঁধীজি জওহরকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন বলে।'

সুভাষ বললেন, 'বুকের মধ্যে না মুঠোর মধ্যে?'

৩

ইলিউশিয়ান রো-র থানায় বিনিদ্র অফিসাররা জড়ো হয়েছেন। কাল ২৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র আর তাঁর সহকর্মীরা ময়দানে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। লাহোর কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রতিবছর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হবে। আগামীকাল কলকাতার অনুষ্ঠান যাতে সারা দেশের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য সুভাষ প্রাণপাত চেষ্টা করছেন। টেগার্টের কানে পৌঁছেছে সে খবর।

টেগার্টের চোখে জিঘাংসা। মাথায় একটা ঝটকা দিয়ে তিনি বললেন, 'বাঙালি বিপ্লবীদের খুব বাড় বেড়েছে। কাজকর্ম চালানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'স্যার আপনার ওপর যে দুঃসাহসী আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমরা সবাই শুধু মর্মাহত নয়, লজ্জিত বোধ করেছি।'

আলোচনা নিজের দিকে ফিরতে দেখে টেগার্টের রাগ আরও বাড়ে। এর আগে গোপীনাথ সাহা টেগার্ট ভেবে আর একজন ইংরেজকে হত্যা করে বসেছিলেন। কিন্তু গত ২৫ আগস্ট

বিপ্লবীরা টেগার্টকে আবার একবার ভাল রকম চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। সামান্য কিছুক্ষণের জন্য টেগার্টের গাড়িই দাঁড়িয়েছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের রাস্তায়। ঠিক সেই সময় অমিয় সেন আর দীনেশ মজুমদার বোমা ছোড়েন তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে। সৌভাগ্য টেগার্টের! ড্রাইভারের হঠাৎ সামনের আয়নায় নজর পড়ে যায়। পেছনে সন্দেহজনক কিছু হচ্ছে টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে দেয় সে। সেই মুহূর্তেই পেছন থেকে আসে বোমার আওয়াজ। সে আওয়াজ যেন আজও টেগার্টকে কাঁপিয়ে দেয়।

কালকের ময়দানের কর্মসূচি কীভাবে ঠেকানো যায় তার সম্পর্কে খুঁটিয়ে আলোচনা হচ্ছে বৈঠকে। সমস্ত আলোচনা-পর্যালোচনার পর টেগার্ট বললেন, 'কাল যদি ঘোড়ার পায়ের নীচে দু-চারটে সত্যাগ্রহীর হাড়গোড় ভাঙে তো ক্ষতি নেই। ঘোড়সওয়ার পুলিশদের তৈরি রাখতে হবে।'

'ইয়েস স্যার।'

'আর কোনও ভাগ্যবান ঘোড়ার খুর কলকাতার মেয়রের মাথায় যদি পড়ে তা হলে রোজকার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।'

বৈঠক শেষ হওয়ার পরে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে টেগার্ট বললেন, 'জালিয়ানওয়ালাবাগে চারশো লোককে মারলেও ডায়ারকে ফাঁসি যেতে হয়নি। কাজেই ব্রিটিশ সম্রাটের হিতের জন্য আপনারা যাই করুন না কেন কেউ আপনাদের কেশস্পর্শ করতে পারবে না।'

মনের বিষ পুরো উগরে দিয়ে টেগার্ট বিষঢালা গলায় বললেন, 'এইবার দুনিয়াকে দেখিয়ে দিতে হবে, কলকাতার পুলিশ ঘাস খায় না। লাহোরের পুলিশ লাজপত রায়কে যা করেছিল সে রকম একটা কিছু করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন। তারপরের দায়িত্ব সরকারের।'

পুলিশের সদর দপ্তরের চেয়েও নিদ্রাহীন এলগিন রোডের বাড়িটা। সে বাড়িতে সুভাষচন্দ্র বৈঠক করছেন সহযোগীদের সঙ্গে। দেওয়াল ঘড়ি জানিয়ে দিল রাত তখন দুটো। মা উঁকি মারলেন বৈঠকের ঘরে।

মা সবসময়েই আতঙ্কে থাকেন। আটদিন আগেই মালদা স্টেশনে জ্বালাময়ী ভাষণ দেবার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। কালই জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। তার ওপরে ২৬ জানুয়ারির জন্য প্রস্তুতি। গত বছর আলিপুর জেলে থাকার সময় সোমদত্ত নামে এক জেলার তাঁকে নির্মমভাবে লাঠি দিয়ে মেরে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিল। বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ভিজিটিং রুম পর্যন্ত হেঁটে যাবার শক্তিটুকুও ছিল না।

আজ বিভাবউদি আর মেজদাও এলগিন রোডের বাড়িতেই থেকে গেছেন। বিভা দেখছেন সুভাষের খাওয়া। তবু ভাল আজ অন্তত পেটে কিছু পড়ল। কাল যে কী হবে কে জানে। আবার হয়তো জেলের লপসি। মা-ও বসে রয়েছেন।

সুভাষ বললেন, 'গাঁধীজি আর আমার সম্পর্ক নিয়ে ঠাকুর যে-খেলা খেলছেন তিনিই জানেন। অন্য সময় লড়াইয়ের ডাক দিন, ডাক দিন বলে আমি চেঁচাই। গাঁধীজি চট করে মানেন না। তারপর তিনি যখন আন্দোলনের ডাক দেন সে সময় অবধারিতভাবে আমি থাকি জেলে। তাঁর ডান্ডি অভিযানের সময়ও ঠিক তাই ঘটেছে।'

'সুভাষ, ভুলে যাস না গাঁধীমহারাজ আমার সবচেয়ে প্রিয় নেতা।' মা বলে উঠলেন।

'মা আমাদের বাদবিবাদ একমাত্র নীতির ব্যাপারে। যতটা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি রং চড়িয়ে ফলাও করে রটানো হয় সেই সব ঝগড়ার কথা। নইলে গাঁধীজির ওপর শ্রদ্ধা তোমার চাইতে আমার কম নয় মা।'

শীতের দীর্ঘরাত্রি। শরৎচন্দ্র আর বিভাবতীর কানে খবর পৌঁছেছে এবার সুভাষকে জালে জড়াবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভালরকম আটঘাট বাঁধছে। বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে আছেন নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়, মহিলা সংগঠনের নেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, বর্ষীয়ান ললিত দাশগুপ্ত, সত্যরঞ্জন বক্সি প্রমুখ সুভাষ অনুগামীরা।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বৈঠক চলছে। সুভাষ সহকর্মীদের বোঝাচ্ছিলেন, 'দীর্ঘদিনের পরাধীনতা দেশকে প্রায় নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে। এই ঝিমিয়ে পড়া দেশকে জাগিয়ে তুলতে আজ প্রয়োজন বিরাট এবং ব্যাপক আন্দোলনের।'

বাইরে পুলিশভ্যানের সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল। তারপরই সিঁড়িতে বুটের খটখট আওয়াজ। পুলিশ অফিসার পুলিন চ্যাটার্জি এসে ঢুকলেন। 'আগামীকাল কোনও রকম জমায়েতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার শেষবারের মতো সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, অনুষ্ঠান বন্ধ করাই আপনাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।'

সুভাষ তাঁর মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন, 'আপনার বসকে গিয়ে বলুন, এই নিষেধাজ্ঞা আমরা মানব না।'

অবিলম্বে এলগিন রোডের বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেলল পুলিশ। বাকি রাতটুকু পুলিশের দৌড়োদৌড়ির আওয়াজে সারা ভবানীপুর সন্ত্রস্ত। খুব ভোরে কোনওমতে পুলিশের হাত এড়িয়ে নরেন্দ্রনারায়ণ এলেন সুভাষের বাড়িতে। সিঁড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা হতে বললেন, 'খুব জরুরি, সুভাষের সঙ্গে এখুনি দেখা হওয়া দরকার।'

'কিন্তু সে কোথায়?'

'তার মানে?'

'বাড়িতে নেই সেটা জানি। এর বেশি কিছু জানি না।'

সকালেই খবর পাওয়া গেল কিরণশঙ্কর আর পূর্ণবাবুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য নেতাদের ধরপাকড় চলছে। তারই মধ্যে হাওয়ার মুখে খবর ছড়াল, 'সুভাষের খবর পাওয়া যাচ্ছে না।'

সকালের রোদ্দুরে আস্তে আস্তে ঠান্ডা কমতে থাকে। সকালেই স্বয়ং টেগার্ট সঙিনধারী পুলিশদের ময়দানে কুচকাওয়াজ করিয়েছেন। ক্রুদ্ধস্বরে ঘোষণা করেছেন, 'এবার আমি কলকাতাকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে যেতে দেব না।' সারা ময়দানে দাপিয়ে সরেজমিনে সবকিছু দেখে গেছেন তিনি। কিন্তু সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকায় লোকেরা জমা হয় শপথগ্রহণের জন্য। এক শুধু চৌরঙ্গি আর অক্টারলোনি মনুমেন্টের মূল অনুষ্ঠানের জায়গাটা 'কী হয় কী হয়' ভাবে দম ধরে আছে। দোকানগুলোর সব আধখানা দরজা বন্ধ। রাস্তায় ট্রাম অনেক কম। সুভাষ কোথায় কেউ জানে না।

বেলা তখন দুটো। হঠাৎ ময়দানের কাছ থেকেই শ্লোগানের বজ্রধ্বনি শোনা গেল। ব্যাপার কী দেখার জন্য লোকেরা ছুটছে। উজ্জ্বল রৌদ্রে দেখা গেল দৃঢ় হাতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা নিয়ে এগিয়ে আসছে সুভাষের দৃপ্ত মূর্তি। বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সি দেড় হাজার যুবকের সুশৃঙ্খল বাহিনী তাঁকে অনুসরণ করছে। পরনে তাদের শুভ্র খদ্দরের পোশাক— হাতে পতাকা। আশেপাশের গলি থেকে, পাড়া থেকে সারি বেঁধে ছোট ছোট শোভাযাত্রা বেরিয়ে আসছে শিবাজি কিংবা রানা প্রতাপের গেরিলাবাহিনীর মতো, মিশে যাচ্ছে মূল মিছিলে। ক্রমশ বিশাল হয়ে উঠছে মিছিল। সুভাষের পাশেই জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলির নেতৃত্বে চার-পাঁচশো মেয়ের দলটি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সকলের। পরনে তাদের খদ্দরের শাড়ি আর হাতে তিনরঙা চুড়ি। বজ্রকঠিন

স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে 'বন্দেমাতরম্', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। সুভাষচন্দ্রের আশেপাশে স্বেচ্ছাসেবকরা যেন দেওয়াল তুলে দিয়েছেন। ফৌজি কায়দায় তালে তাল মিলিয়ে বলছেন তাঁরা। গাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন দেশভক্তির গান, দেশমাতার বন্দনা গান।

সুভাষচন্দ্র চলেছেন খালি পায়ে। এই ধরনের যে-কোনও বিশেষ উপলক্ষে খালি পায়েই চলেন তিনি। যতীন দাসের অন্তিম যাত্রায়ও খালি পায়েই হেঁটেছিলেন তিনি। বিরাট মিছিল চৌরঙ্গি রোড ছেড়ে মনুমেন্টের দিকে এগোতেই রবার্টসন এবং ব্যানার্জি এই দুই পুলিশ অফিসার মিছিলের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। 'আপনারা আর এক পা-ও এগোবেন না।' সতর্ক করে দিলেন তাঁরা।

'আমরা চলেছি স্বাধীনতার শপথ নিতে। আপনারা আমাদের আটকাবার কে?'

'এটা স্বয়ং পুলিশ কমিশনারের আদেশ।'

'স্বয়ং ভগবানের আদেশও আমাদের পথ আটকাতে পারবে না। আপনাদের পুলিশ কমিশনার তো তুচ্ছ।'

'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি এবার আরও উঁচু পরদায়। আইন ভাঙার জন্য প্রস্তুত মিছিল এগিয়ে চলে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। হঠাৎ শোনা গেল গুলিবর্ষণের আওয়াজ আর তার সঙ্গে ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি রব। কী যে ঘটছে ভাল করে বোঝার আগেই ঢেউয়ের মতো মিছিলের ওপর ঘোড়ার দল আছড়ে পড়ল। মাউন্টেড পুলিশদের হাতের ব্যাটন উন্মাদের মতো স্বেচ্ছাসেবকদের পিঠে পড়ছে। ঘোড়ার খুরে কারও হাত ভাঙে, কারও চোয়াল। চারদিকে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ছে তারা। চারদিক থেকে ঘোড়সওয়াররা সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ করে এগিয়ে আসছে। ব্যাটনের আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে তাঁর দেহ। কয়েকজন অশ্বারোহী পুলিশ তাঁকে ঘিরে ধরে ঘোড়া নাচাতে লাগল। রক্তস্নাত সুভাষ গর্জন করে উঠলেন, 'বন্দেমাতরম্', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। মিছিল ইতিমধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। চারিদিকে লোক ছুটছে। তাদের পেছনে অবিরাম গুলিবর্ষণ আর বেপরোয়া ব্যাটন। ঘোড়াগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে হিংস্র বিক্রমে। এক ঘোড়সওয়ার সুভাষচন্দ্রের হাত থেকে পতাকা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। বজ্রমুষ্টি শিথিল হয় না। ঘোড়সওয়ার আঘাত করতে থাকে সুভাষকে। প্রাণপণে নিশান আঁকড়ে ধরে সুভাষ চিৎকার করে ওঠেন, 'আমাকে মেরে ফেললেও ঝান্ডা আমি ছাড়ব না।'

নিশান হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া গেল না। এবার দুজন পুলিশ নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি ইশারা করে। টেগার্টের গোপন জিঘাংসা রূপায়িত করার সুযোগ এসেছে এবার। 'ক্র্যাশ হিম'— দুজনে বলে ওঠে। স্বেচ্ছাসেবকদের দল মাড়িয়ে সুভাষচন্দ্রের দিকে ঘোড়া ছোটে। তাদের হাতের ব্যাটন এক জান্তব হিংসায় উন্মাদ। সুভাষচন্দ্রের কম্পমান কণ্ঠ বার বার সোচ্চার হয়— 'বন্দেমাতরম্'।

এক মাউন্টেড পুলিশ এবার লাগাম টেনে ধরে ঘোড়াকে খাড়া করে তুলে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যাটনের আঘাত করে সুভাষের মাথায়। রক্তের ফোয়ারা ছোটে। পাশেই জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলির গায়ে রক্ত ছিটকে গিয়ে লাগে। বাঘিনীর মতো এগিয়ে এসে সুভাষের মাথা সস্নেহে কোলে তুলে নেন তিনি। চিৎকার করে ওঠেন, 'শয়তানের দল, আমাদের নেতার গায়ে আর একবার হাত দিয়ে দেখ!'

শয়তানের ব্যাটন মমতাহীন, বিবেকহীন। নিষ্ঠুর আঘাত পড়ে জ্যোতির্ময়ীরও দেহের ওপর। সুভাষচন্দ্র অনেক আগেই জ্ঞান হারিয়েছেন। কে একজন চিৎকার করে উঠল, 'সুভাষচন্দ্রকে ওরা মেরে ফেলেছে।' সে চিৎকারে একশো স্বেচ্ছাসেবক চারদিকে থেকে দৌড়ে এসে সুভাষের

অচৈতন্য দেহ ঘিরে দাঁড়ায়। পতাকাদণ্ড খুলে নিয়ে এবার মারমুখী শয়তানদের মুখোমুখি দাঁড়ায় তারা। তাদের কিছুক্ষণ আগের শ্বেতশুভ্র পোশাকে এখন রক্তের ছিটে। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে টেগার্টের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল।

আহত সুভাষকে নিয়ে পুলিশ ভ্যান চলেছে লালবাজারের কালাকুঠরির দিকে। সুভাষের ডানহাত ভেঙেছে, পোশাক ছিন্নভিন্ন। অজ্ঞান, শরীর অসাড়।

৪

প্রেসিডেন্সি জেলের ভিজিটিং রুমে মেজদা বসে রয়েছে। ছ'মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সুভাষকে। গত কয়েকদিন যাবৎ গাঁধীজির সঙ্গে ভাইসরয় আরউইনের বৈঠক চলছে দিল্লিতে। সেখানে কী স্থির হয় তার দিকে দৃষ্টি সারা ভারতের। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক যে কোনও কাজে আসেনি সে কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি দিল্লি আলোচনার ওপর। এক পরাধীন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমান স্তরে ব্রিটিশ সরকারের আলোচনার দৃষ্টান্ত এই প্রথম। দেশবিদেশের সাংবাদিক আর আলোকচিত্রীরা ভিড় করেছে ভাইসরয়ের প্রাসাদ আর গাঁধীজির দিল্লির আস্তানা আনসারি ভবনের আশেপাশে। খবরের কাগজের পাতা জুড়ে শুধু বৈঠকের খবর।

মেজদা চলে গেছেন। সুভাষ ফিরে গেলেন নিজের সেলে। অন্ধকার রাত্রি অসংখ্য প্রশ্ন তুলছে তাঁর মনে। গাঁধীজির ডাকে এই দ্বিতীয় ভারতব্যাপী আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। খাজনা বন্ধ আন্দোলন গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলায় আশ্চর্যরকম সফল। 'বিদেশি পণ্য বর্জন' আন্দোলনও দারুণ সাড়া তুলেছে। ষাট থেকে সত্তর হাজার কংগ্রেস কর্মী ও নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। দেশের সমস্ত কারাগার উপচে পড়ছে রাজনৈতিক বন্দিদের ভিড়ে। বহু জায়গায় অস্থায়ী কারাগারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সীমান্ত গাঁধীর লালকোর্তা দল ব্রিটিশের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু ভারত নয় সারা বিশ্ব গাঁধীজির লড়াইয়ের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে। একমাত্র ব্রিটেনের ধামাধরারা খুশি নয় গাঁধীজির এই সাফল্যে। ব্রিটেনের জাঁদরেল নেতা উইনস্টন চার্চিল, সরকার গাঁধীজির সঙ্গে আলোচনায় বসায় মর্মাহত। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি। 'আজ আমাদের দেখতে হচ্ছে এক ঘৃণ্য জঘন্য দৃশ্য। এক সময়ের যিনি ছিলেন ইনার টেম্পল-এর এক মামুলি উকিল আর আজকে এক নিঃস্ব ফকির, তিনি আজ প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় ভাইসরয়ের প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ব্রিটেনের রাজপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমকক্ষ হয়ে আলোচনা চালাচ্ছেন এর চেয়ে লজ্জার কী হতে পারে!' বিবৃতির প্রতিটি শব্দে সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্য আর পরাধীন দেশের ওপরে ঘৃণা উপচে পড়ছে।

পরের দিন খবরের কাগজে দিল্লিতে গাঁধী-আরউইন চুক্তির খবর বেরোল। কিরণশঙ্কর, বীরেন্দ্র শাসমল, বাগচি, ক্ষিতীশ— সমস্ত সহযোগীদের সুভাষচন্দ্রের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। চুক্তির বিশদ বিবরণ এখনও বেরোয়নি। তবে জেলার এসে বললেন, 'দিল্লি থেকে নির্দেশ আসছে। আপনাদের সকলকে আজ কিংবা কাল ছেড়ে দেওয়া হবে।'

আলিপুর জেল থেকে নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে নেতাদের বেশি সময় লাগল না। সাধারণ কর্মকর্তারা নেতাদের মুক্তিতে সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন। কিন্তু সে ব্যাপারে কারও

উৎসাহ নেই। দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই সবাই উডবার্ন পার্কে হাজির হলেন। শরৎচন্দ্র আর ললিতবাবুও বৈঠকে উপস্থিত। কেউ একজন কোনও খবরের কাগজের দপ্তর থেকে এক কপি 'গেজেট অফ ইন্ডিয়া একস্ট্রা অর্ডিনারি' নিয়ে এসেছেন। চুক্তির সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে রয়েছে তাতে। সুভাষ আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন সেটা। একসময় কাগজটা ভাঁজ করে তিনি সামনের দিকে ছুড়ে দিলেন সেটা।

'কী হল সুভাষ?' মেজদা প্রশ্ন করলেন।

'দেখোই না?' একমাস আলোচনার পর এই বিশদ চুক্তিতে পূর্ণ স্বরাজের সম্বন্ধে একটি কথাও নেই। তবে কেন এই চুক্তি?

'আমরা কী পেলাম তবে?' বাগচি প্রশ্ন করেন।

'দ্বিতীয় গোলটেবিলের জন্যে বাদশাহি নেমন্তন্ন আর সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের তদন্ত। ব্যস— ধর ভাই লক্ষ্মণ, ফল ধর আর চুপটি করে বস।'

সবাই গম্ভীর। শরৎবাবু বললেন, 'গাঁধীজি ওন দ্য ব্যাটল অ্যান্ড লস্ট দ্য ওয়ার। এত বড় একটা আন্দোলনের এ রকম পরাজয় অভাবনীয়।'

সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেদের শক্তি অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন। বৈঠক শেষ হল।

সুভাষ অসুস্থ, শয্যাশায়ী। ব্যর্থতার বেদনায় মন অস্থির। গেজেটটা হাতে নিয়ে শরৎবাবু আবার এলেন তাঁর কাছে।

'রাজবন্দি সংক্রান্ত ধারাটা খুঁটিয়ে পড়েছিস?'

'নতুন কিছু খুঁজে পেলে নাকি?'

'যে সমস্ত রাজবন্দির বিরুদ্ধে হিংসাচারের অভিযোগ আছে সরকার তাদের ছাড়বে না। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে কোনটা হিংসাচার সেটাও স্থির করবে সরকার।' শরৎচন্দ্র বললেন।

সুভাষ দারুণ রকম চিন্তাগ্রস্ত। 'তার মানে বাংলার যে পাঁচশোরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক ছাড়া পাননি তাদের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। দেশকে ভালবাসার অপরাধে তাদের সংসারগুলো ছারখার হয়ে যাবে।'

রাজবন্দিদের ওপর সরকারের আচরণ কতটা পাশবিক রকমের কঠোর, দুই ভাইয়েরই সেটা ভালভাবেই জানা আছে। কিছুদিন আগেই সোলাপুরে মাল্লাপ্পা ধনশেট্টি, জগন্নাথ শিন্দে, সারডা আর কুর্বান হুসেন এই চারজনকে দেশভক্তির অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। দিল্লি চুক্তির ফলে আন্দোলন থেমে গেছে। আরও কতজন রাজবন্দির স্ত্রী-পুত্র পথে বসবে কে জানে?

মা, বিভাবউদি, পরিবারের সকলের আশা ছিল জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষ অন্তত কয়েকদিন বাড়িতে থাকবে। কিন্তু গাঁধী-আরউইন চুক্তির বয়ান অস্থির করে তুলেছে তাঁকে। কলকাতায় এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না। চুক্তির ব্যাপারে গাঁধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে প্রশ্ন করার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন তিনি। তা ছাড়া শিগগিরই করাচিতে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হবে। চুক্তি সম্বন্ধে সেখানে কী স্থির হবে, কংগ্রেসের আগামী পদক্ষেপ কী হবে এইসব চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁকে। কিরণশঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বাইতে গাঁধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বোম্বাই মেলে অবিলম্বে রওনা হলেন সুভাষ।

কিরণশঙ্কর আর সুভাষ যখন মণিভবনে গাঁধীজির কাছে পৌঁছলেন, তাঁর মুখের ভাব দেখেই গাঁধীজি বললেন, 'সুভাষ আমি আগেই জানতাম এই চুক্তি তোমাকে খুশি করতে পারবে না।'

'চুক্তির কোন ধারা খুশি হবার মতো আছে সেটা একটু বলুন।'

গাঁধীজি অস্বস্তিতে পড়লেন। সুভাষচন্দ্র আর থাকতে পারলেন না। আপনা থেকেই গলার স্বর চড়ে গেল তাঁর।

'গাঁধীজি পূর্ণ স্বরাজের দাবি সম্পর্কে যদি একটা কথাও চুক্তিতে থাকত তো নিজেকে ধন্য মনে করতাম আমি।'

'বাদ পড়ে গেছে হয়তো।'

'এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে গেল?'

'ঠিক আছে। উল্লেখ না হয় নাই থাকল। তাই বলে পূর্ণ স্বরাজের দাবি আমি ত্যাগ করেছি তাই মনে কর নাকি তুমি।' গাঁধীজির গলায় এবার স্পষ্ট বিরক্তির সুর।

দুজনের আলোচনার মধ্যেই কস্তুরবা এসে বসলেন। গাঁধীজিকে হাতপাখার হাওয়া করতে করতে একদৃষ্টে সুভাষের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। গাঁধীজি এবার গলা নামিয়ে বললেন, 'সুভাষ তুমি মস্ত বড় নেতা। কিন্তু এই ধৈর্যহীনতা, এই ছটফটানি তোমাকে শোভা পায় না।'

'প্রশ্নটা আমার ছটফটানির নয়। চুক্তির প্রতিটি শব্দ গুরুত্বপূর্ণ, গাঁধীজি।'

'কোন শব্দ থাকল আর কোনটা থাকল না, তাতে তেমন কিছু যায় আসে না।'

'কেন যায় আসে না বাপুজি? মঠের মন্ত্রোচ্চারণ করে তো আর ব্রিটিশরা সরকার চালায় না।'

'কী বলতে চাও তুমি।'

'বাপুজি, পুলিশ অফিসাররা অন্যের প্রাণ নিয়ে খেলা করে আর প্রশাসনের ঝানুরা শব্দ নিয়ে খেলে।'

গাঁধীজির সঙ্গে আলোচনা করতে করতে সুভাষের চোখের সামনে যেন লাহোর জেলের ছবিটা ভেসে ওঠে। সেই কুখ্যাত জেলখানার ফাঁসির মঞ্চটা যেন নিজের লেলিহান জিভ চাটছে হিংস্র আনন্দে। উদ্বেগের স্বরে সুভাষ গাঁধীজিকে প্রশ্ন করেন, 'ভগৎ সিং, রাজগুরু আর সুখদেবের কী হবে বাপুজি?'

'এ প্রশ্ন কেন?'

'এই চুক্তিতে "অহিংস আন্দোলনে যারা অংশ নিয়ে কারাবরণ করেছে" এই শব্দগুলো রয়েছে। তবে ভগৎ সিংয়ের কী হবে?'

এইবার গাঁধীজিকে চিন্তিত দেখাল। একজন রাজনীতিক হিসেবে ভগৎ সিংয়ের জনপ্রিয়তা ভালভাবেই বোঝেন তিনি।

'ওখানে লাহোর জেলে তাঁকে আর তাঁর সহযোগীদের শিগগিরই ফাঁসিতে লটকানোর প্রস্তুতি চলছে। তাই জিজ্ঞেস করছি। ফাঁসি যে-কোনওদিন হতে পারে, কয়েকদিনের মধ্যেই হতে পারে। হয়তো অধিবেশনের আগেই।'

গাঁধীজি নিরুত্তর। কস্তুরবা আর কিরণশঙ্কর চুপ করে বসে রইলেন। সুভাষচন্দ্রের আবেগ, তাঁর গলার চড়া আওয়াজ গাঁধীজির গা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে, অসহ্য লাগছে তাঁর। তাঁর আশ্রমে, তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্ত আসে দর্শনাকাঙ্ক্ষায়, পথের নির্দেশ পেতে, বাণী নিতে। তাঁর মুখের ওপর তাঁকে প্রশ্ন করার দুঃসাহস কারও হয় না। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মহাদেব দেশাইও অস্বস্তি বোধ করছেন। একটু ঢোক গিলে গাঁধীজি বললেন, 'সুভাষ তোমার আর আমার চিন্তাধারায় আশমান জমিন ফারাক।'

'থাক না ফারাক। কিন্তু দুজনের লক্ষ্য তো এক বাপুজি, স্বাধীনতার স্বর্ণদ্বার।'

'কিন্তু তোমার পথ আমার নয়। সুভাষ, প্রয়োজন হলে স্বাধীনতার জন্য আমি যুগযুগান্ত অপেক্ষা করতে রাজি আছি। কিন্তু হিংসাচারের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা পাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না আমি।' গাঁধীজির স্বর মৃদু কিন্তু দৃঢ়।

৫

বোম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনে সুভাষ আর কিরণশঙ্কর দাঁড়িয়ে। ফ্রন্টিয়ার মেলে দিল্লি যাবেন। একই গাড়িতে যাচ্ছেন গাঁধীজি। তাঁর তৃতীয় শ্রেণির কামরার সামনে বহু মানুষের ভিড়। তাদের মধ্যে কুলি থেকে অভিজাত নরনারী সবস্তরের মানুষই আছেন। সেনাপতি বাপট আর অন্য কয়েকজন কর্মকর্তা সুভাষের কাছে দাঁড়িয়ে। গাড়ি চলতে শুরু করলে 'গাঁধী মহারাজ কী জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হল প্ল্যাটফর্ম। সুভাষ আর কিরণশঙ্কর প্রথম শ্রেণির যাত্রী। গাঁধীজির কামরা বেশ খানিকটা দূরে।

কিরণশঙ্কর বললেন, 'সুভাষ, সর্দার পটেলের অনেক আগেই কংগ্রেস সভাপতি হওয়া উচিত ছিল।'

'ঠিক বলেছ। বারদোলি সত্যাগ্রহের কী বিরাট কৃতিত্ব তাঁর। কিন্তু জওহরের জন্য গাঁধীজি তাঁর প্রতি অবিচার করলেন।'

'তার কারণ?' কিরণশঙ্কর প্রশ্ন করেন।

'কারণ, বামপন্থী জোটের এক নেতাকে ভাঙিয়ে নেওয়া আর দলে নিজের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ রাখা। লাহোর অধিবেশনের আগে থেকেই গাঁধীজি জওহরলালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। জওহরলালের সুদর্শন ব্যক্তিত্ব, তার হাতে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত ইত্যাদি প্রশংসার বান ডেকেছিল। বলতে ইচ্ছে করে, বাপুজি রাষ্ট্রের জন্মটা অন্তত হতে দিন— তার পরে তার সুরক্ষার কথা ভাবা যাবে।'

'আচ্ছা, ভগৎ সিংয়ের কী হবে বলে মনে হয় তোমার।' কিরণশঙ্কর বললেন। 'গাঁধী-আরউইন চুক্তি শুধু ভগৎ সিং নয়, সমস্ত বিপ্লবীদের ফাঁসি দেওয়ার রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে।' সুভাষ বললেন।

কিরণশঙ্করের ঘুম পাচ্ছিল। তাঁর চোখ লেগে এল। মাঝে মাঝে কোনও স্টেশনে থামলে 'গাঁধী মহারাজ কী জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হয় প্ল্যাটফর্মগুলো। ঘুমের চটকা ভেঙে যায়। আবার ঘুম। অনেক দেরিতে ঘুম ভাঙলে চোখ মিটমিট করে কিরণ দেখলেন ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর শাল চাপিয়ে সুভাষ বাইরে যাচ্ছেন।

সুভাষ পৌঁছলেন গাঁধীজির কামরায়। গাঁধীজিকে ঘিরে অনেক কর্মকর্তার ভিড়। তাঁর সঙ্গে একই কামরায় অনেক সাধারণ শ্রমিক কিষানও রয়েছে। সুভাষ কাছে আসতে গাঁধীজি তাঁর সামনেই বসার জায়গা করে দিলেন। গাঁধীজির বয়স অনুসারে তৃতীয় শ্রেণিতে যাতায়াতটা মোটেই আরামের নয়। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে গভীর দূরদর্শিতা।

পরশুদিন মণিভবনে যখন গাঁধীজির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন সুভাষ ছিলেন বিক্ষুব্ধ। মনের ক্ষোভ বেরিয়ে এসেছিল কথায়। আজ কিন্তু আলোচনা অনেক খোলামেলা, বেশ নির্মল।

'গাঁধীজি আপনার অহিংসার নীতিতে সারা পৃথিবীর মানুষের, মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে।'

'আর ভারতের অকল্যাণ! তোমার তো তাই মত, না?' বলেই গাঁধীজি হো হো করে হেসে উঠলেন।

'অকল্যাণ তো বলিনি। তবে এই অহিংসার নীতি দেশের প্রগতির পক্ষে যে বাধার সৃষ্টি করে সেটা আমি বিশ্বাস করি।'

'কী রকম বাধা?' গাঁধীজি প্রশ্ন করেন।

'মনে করুন আপনার জায়গায় আমি যদি আরউইনের সঙ্গে চুক্তি করতাম—'

'কী করতে তা হলে?'

'যেন তেন প্রকারেণ দেশের প্রতিটি সমস্যার বিষয়ের উল্লেখ করে চুক্তিটা পূর্ণাঙ্গ করতাম।'

গাঁধীজি, কস্তুরবা, মহাদেব দেশাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে রাত যে কত হয়েছে খেয়ালই ছিল না। ঘনঘন সফরের ধকলে সুভাষের মাথায় মাঝে মাঝেই ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তাঁকে কপালের দু'পাশে রগ টিপে ধরে থাকতে দেখে গাঁধীজি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল সুভাষ? শরীর ঠিক নেই?'

'মাঝে মাঝেই বড্ড মাথা ধরে।'

গাঁধীজি হাত রাখলেন সুভাষের কপালে। সাবধানে নিজের বটুয়া খুললেন। বটুয়ায় নানান ধরনের জড়িবুটি। প্রাকৃতিক চিকিৎসা, জড়িবুটির ওপর গাঁধীজির আগ্রহ সম্পর্কে জানতেন সুভাষ। এ বিষয়ে গাঁধীজির লেখাও পড়েছেন তিনি। গাঁধীজি কি একটা শিকড় বার করে নিয়ে খলনুড়িতে পিষে একটা প্রলেপ বানিয়ে সুভাষের কপালে লেপে দিলেন। সুভাষের মন ভরে যায়। লোকে বলে গাঁধীজির ব্যক্তিত্বের একটা দিকে সেবার ভাব। কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করলেন সুভাষ।

জানলা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছিল। জানলায় মাথা রাখলেন তিনি। মাঝরাতে সামনের বার্থে কোনওমতে একটু আধশোয়া হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন সুভাষ। ভোরে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে একটা স্টেশনে। ফেরিওয়ালার হাঁকডাক, কংগ্রেস কর্মীদের হইচই-এ ঘুম ভাঙল তাঁর।

'শরীর কেমন এখন?' গাঁধীজি প্রশ্ন করলেন।

'ভাল। খুব ভাল ঘুম হয়েছে।'

'আমার কাছে সব রোগেরই দাওয়াই আছে।' হেসে বলেন গাঁধীজি।

'এই বিদেশি শাসনের রোগের কিছু একটা ধন্বন্তরি ওষুধের জন্য আমি তো কবে থেকে আপনার পেছনে লেগে আছি।'

'রোগী যতই বলুক যে তার পেটে ভীষণ ব্যথা, কোন সময় কোন ওষুধ দেওয়া হবে সেটা স্থির করার দায়িত্ব চিকিৎসকের।'

হো হো হাসির হররা উঠল চারদিকে। কস্তুরবা জীবনে কখনও বোধহয় এত মন খুলে হাসেননি। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল তাঁর।

গাড়ি আগ্রা স্টেশনে এসে দাঁড়ালে গাঁধীজি উত্তর ভারতের জনমতের আঁচ পেতে শুরু করলেন। দলে দলে লোক এসে গাঁধীজির কামরার পাশে ভিড় করে। 'গাঁধীজি ভগৎ সিংয়ের প্রাণ বাঁচান,' 'গাঁধীজি যেমন করে হোক এই তিনজনের প্রাণ বাঁচান' বলে চিৎকার করছে তারা।

দিল্লিতেও একই মনোভাব। আনসারি ভবনেও ভয়ের ছায়া দেখলেন গাঁধীজি। সেখানেই সুভাষ আর জওহরলালের সাক্ষাৎ।

জওহরলালও দ্বিধাগ্রস্ত তবু গাঁধীজিকে সমর্থন করছিলেন তিনি। তিনি বললেন, 'দিল্লি চুক্তি থেকে আমাদের কিন্তু অনেক লাভ হয়েছে।'

'সত্যি নাকি? বিদেশি সাংবাদিকদের তো আপনিই বলেছিলেন যে গাঁধীজি আরউইনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।' সুভাষ বলতে ছাড়েন না।

'আরে যেতে দাও না। সত্যিটা কী হয়েছে সেটা তো তুমি জানোই।' পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক মোড় নিচ্ছে। জনমতের উত্তাপ বাড়ছে। গাঁধীজি তাড়াতাড়ি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে চললেন। তাঁর যাওয়ার সময় গাড়ির চারপাশে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পটেল প্রমুখ অনুগামীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। গাড়ির দরজা বন্ধ করার সময় জওহর বললেন, 'বাপু। যে করেই হোক ভগৎ সিংদের প্রাণ বাঁচান। জনতা কিন্তু ভীষণ উত্তেজিত।'

'চুক্তির মর্যাদা রাখা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।'

পাশ থেকে সুভাষচন্দ্র বললেন, 'কিন্তু তার জন্য আমাদের এতটা কেন নেমে যেতে হবে? চুক্তির ধারা কিছু বেদবাক্য নয়। বাপুজি এ ধরনের চুক্তি আয়ারল্যান্ডের "সিন ফিন" পার্টি অনেকবার ভেঙেছে।'

গাঁধীজি কোনও উত্তর দিলেন না। গাড়ি চলে গেল। ভাইসরয় প্রাসাদ থেকে যখন ফিরে এলেন তাঁকে দেখেই সবার বুক ধক করে উঠল। তাঁর মুখে যেন স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'ভগৎ সিং আর বাঁচবেন না।'

'ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি যদি মকুব না হয় তবে কী হবে?' সর্দার পটেল জিজ্ঞেস করলেন।

'এরকম কিছু ভাবছ কেন? তাড়াহুড়ো করে কিছু ঠিক কোরো না। দশ হাজার লোকের সই করা দরখাস্ত ভাইসরয় তো পেয়েছেন। তাঁকে নিশ্চয় সেটার ব্যাপারে ভাবতে হবে।'

কংগ্রেস কর্মকর্তারা করাচির পথে রওনা হলেন। দিল্লি থেকে রওনা হবার আগেই গান্ধীজি আরউইনকে লিখে পাঠালেন 'ভগৎ সিং-এর ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দয়া করে চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।' জওহরসহ অন্যান্য অনেক কংগ্রেস নেতাও এই একই মর্মে ভাইসরয়কে অনুরোধ জানিয়েছেন। ২৩ মার্চ কংগ্রেস নেতারা সবাই করাচির পথে।

২৪ মার্চ সকালবেলা। ট্রেনে যেন বোমা পড়ল। কংগ্রেস নেতাদের কামরায় নীরবতা। ২৩ মার্চ রাত্রেই ভগৎ সিং, রাজগুরু আর সুখদেবকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে লাহোর জেলে। শহিদদের মৃতদেহ পর্যন্ত তাঁদের আত্মীয়দের দেওয়া হয়নি। জেলের মধ্যে অন্তিম সৎকার করে চিতাভস্ম ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে নদীতে। প্রতিটি মানুষ শোকস্তব্ধ। পঞ্জাবের প্রতি বাজারে, চৌমাথায় পাড়ায় পাওয়া অন্য কোনও কথা নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পথের প্রতিটি স্টেশনে দল বেঁধে ভিড় করে আসছে অগণিত মানুষ। তাদের মধ্যে টকটকে লাল জামা পরা নওজওয়ান সভার ছেলেরাই বেশি। শোকে পাগল সাধারণ মানুষও ট্রেনের দিকে ছুটে আসছে। কয়েক জায়গায় গাড়ি আটকে শ্লোগান দেওয়া হয়েছে, 'গাঁধীজি, ফিরে যান', 'ভগৎ সিং-এর ফাঁসির জন্য দায়ী কে? গাঁধীবাবা আবার কে?' 'মহাত্মা গাঁধী মুর্দাবাদ', 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ'।

করাচির কাছে মালির স্টেশনে বিরাট ভিড়। লাল জামা পরা নওজওয়ান সভার সভ্যরা গাঁধীজিকে কালো পতাকা দেখালেন। সমস্ত পঞ্জাব উত্তর চাইছে গাঁধীজির কাছে। তাদের প্রশ্নের উত্তর নেই তাঁর কাছে।

করাচিতে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে দাঁড়াল। নওজওয়ান সভার হাজার হাজার তরুণ জমা হয়েছে সেখানে। তারা ভিড় করছে সুভাষচন্দ্রের তাঁবুর চারধারে। আচার্য কৃপালনি আর রাজাজি ভেবে নিলেন এসব সুভাষেরই কারসাজি।

সুভাষের সঙ্গে দেখা হলে জওহরলাল বললেন, 'সুভাষ, ভগৎ সিংয়ের মৃত্যুতে তোমার

মতো আমিও মর্মাহত। ভগৎ সিংয়ের মৃতদেহ আজ ইংল্যান্ড আর ভারতের মধ্যে পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

'কিন্তু এটা এড়ানো যেত। তাড়াহুড়ো করে চুক্তিতে সই করার কোনও দরকার ছিল না।' ব্যথাহত সুভাষ কোনও মতে বললেন।

'সুভাষ। তুমি আমাকে দাদার মতো দেখ তাই না? আমার একটা কথা রাখ। নিজেকে একটু সামলাও।'

'কী করে সামলাব দাদা? গাঁধীজি এই অপমানজনক চুক্তিতে সই করে সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের মাথা হেঁট করে দিলেন। এই চুক্তি ব্রিটিশের স্পর্ধা এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়েই তারা ভগৎ সিংদের ফাঁসি দেওয়ার হিম্মত পেয়ে গেছে।'

সুভাষ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কংগ্রেস নগরেই এক জায়গায় গাঁধীজি ভাষণ দিচ্ছিলেন। লোক প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ। তাঁর ভাষণ বন্ধ করার দাবিতে তরুণরা ঘন ঘন শ্লোগান দিচ্ছেন। গাঁধীজি এবার নিজের এলেম দেখালেন। তিনি দর্শকদের বললেন, 'আমার ওপর তোমাদের বড্ড রাগ, তাই না? আমার এই শুকনো ক'খানা হাড় তোমরা অনায়াসে গুঁড়িয়ে দিতে পারো। কিন্তু যে নীতির জন্য যে আদর্শের জন্য আমার সংগ্রাম তাকে কেউ কোনওদিন ধ্বংস করতে পারবে না।'

গাঁধীজির ভাষণ একপাশে দাঁড়িয়ে সুভাষও শুনছিলেন। পাশে দাঁড়ান কবীশ্বরকে তিনি বললেন, 'চুক্তির ব্যাপারে যদি এত তাড়াহুড়ো না হত তবে এই দিনটাকে দেখতে হত না।'

অধিবেশনের সভাপতি সর্দার বল্লবভাই পটেল তাঁর নীতিসংক্রান্ত ভাষণে কৃষক প্রশ্নের ওপর জোর দিলেন। গাঁধীজি উঠে প্রথমে হিংসাচারের নিন্দা করলেন। কিন্তু ভগৎ সিং এবং তাঁর সহযোগীদের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বললেন, 'এটা সত্যি যে ভগৎ সিংদের সম্বন্ধে আমার ভুল হয়েছে। তাই বলে চুক্তি করাটা ভুল হয়েছে একথা আমি মোটেই মনে করছি না।'

যে-কোনও সংকট থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল এখন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা ভালভাবেই শিখে গেছেন। তাঁরা ভগৎ সিংয়ের বৃদ্ধ পিতা কিষণ সিংকে সম্মান জানাতে মঞ্চে আনলেন। তাঁকে সামনে রেখে তরুণদের রাগ কমাবার চেষ্টা শুরু করলেন তাঁরা।

কংগ্রেসের সভামণ্ডপ থেকে একটু দূরে চলেছে ভিন্ন ধরনের আয়োজন। রাতারাতি নওজওয়ান সভার সদস্যেরা তৈরি করেছেন আর একটি মণ্ডপ। সেখানে তরুণ-যুবকদের স্বতন্ত্র অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। তরুণরা একবাক্যে সুভাষচন্দ্রকে অধিবেশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত করলেন। সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যেন এক উন্মাদনা ভর করল। নিজের ভাষণে তিনি ন্যায়, সাম্য আর স্বাধীনতার পাশাপাশি শৃংখলা আর পরস্পরকে ভালবাসার ওপর জোর দিলেন।

দেশের জন্য কী ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন সে কথার উত্তরে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, 'ভারতের জন্য আমাদের প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। আমরা যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি, সে স্বাধীনতা পূর্ণ, পরিপূর্ণ, নিখাদ, ভেজালহীন এক বিপ্লবী সমাজব্যবস্থা। যে পথকে অনেকে উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ বলে ভয় দেখাচ্ছেন বিপ্লবের জন্য সে রকম সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা সহজে আসবে না। আজকের কংগ্রেসের নীতি এবং কর্মপন্থার মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট ফাঁক। ঢিলেঢালা, লজ্জাজনক আপসের মনোভাব।'

'সুভাষবাবু, আপনাদের বিপ্লবী কর্মসূচি কী?' তরুণরা জিজ্ঞেস করেন।

'আমরা চাই সমাজতান্ত্রিক নীতি নিয়ে শ্রমিক আর কৃষকেরা সংগঠিত হোক। কঠিন শৃংখলার সঙ্গে তরুণরা সংগঠিত করুন নিজেদের। জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতার অভিশাপ দূর হোক। সবরকম অন্ধশ্রদ্ধা আর গোঁড়ামির উন্মাদনা থেকে মুক্তি পান দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ।

নবজাগরণের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুন দেশের মা-বোনেরা। বিদেশি পণ্য বর্জন করুন সকলে। শহিদ ভগৎ সিংয়ের নামে শপথ নিন, যে প্রেরণা তিনি আমাদের দিয়েছেন, যে আগুন তিনি আমাদের প্রাণে জ্বালিয়েছেন, আমরা তাকে নিবে যেতে দেব না।'

পাশের এই অধিবেশনের উল্লাস সহ্য হয় না আচার্য কৃপালনির। প্রাণপ্রিয় গাঁধীজির নীতির কী ধরনের সমালোচনা হচ্ছে এখানে সেটা দেখতে চুপচাপ এসেছেন তিনি। গাঁধীজির এই চুক্তি অসম্পূর্ণ, অন্তঃসারশূন্য, মূল্যহীন বলে অভিহিত করে সুভাষ বললেন, 'কিন্তু তাই বলে এই চুক্তি যিনি করেছেন, তাঁর দেশপ্রেমের ওপর আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই। কিন্তু সংগ্রাম যখনই দুঃসাহসী মোড় নিতে যায় তখনই জনতাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে ঘাতক ব্রিটিশ সরকারের রক্তে রাঙা হাত শক্ত করার রাজনীতি আমরা চলতে দেব না। স্বামীজির কথা মনে করুন। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। উঠুন, জাগুন, স্বপ্নকে সাকার করে তুলুন। ভারতের বুকে বিপ্লবের এমন আগুন জ্বালিয়ে তুলুন, যার দীপ্ত শিখা সমস্ত পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের তৈরি বিভেদের পাঁচিল চুরমার করে দেবে।'

আচার্য কৃপালনি মনে মনে ফুঁসছেন। গাঁধীজি সম্পর্কে এমন ধরনের কথা? সময় এলে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প করেন তিনি।

একজন অবশ্য দারুণ খুশি সুভাষের এই জ্বালাময়ী ভাষণে। তিনি পঞ্জাবের পুলিশ কমিশনার। দিল্লি আর কলকাতা থেকে তাঁর কাছে নির্দেশ এসেছে, সুভাষের বিরুদ্ধে প্রমাণ এককাট্টা করবার। ঝুড়িভরতি প্রমাণ এখন তাঁর হাতে।

বোম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে দু'লক্ষ লোক জড়ো হয়েছে। রাত অনেক, তবু লোক বসে রয়েছে। গোলটেবিল বৈঠক থেকে গাঁধীজির প্রত্যাবর্তনে জনসাধারণই এই সভার আয়োজন করেছে। লন্ডনে বাস্তবিক কী হয়েছে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৈঠকের সাফল্য-অসাফল্য কতটা তাই নিয়ে সাধারণ মানুষের মাথাব্যথা নেই। গাঁধীজি ফিরে এসেছেন এই আনন্দেই বোম্বাই আত্মহারা।

ময়দানের চারিদিকে প্রহরার বেড়াজাল। বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার স্বয়ং সভার কর্মসূচির নোট নিচ্ছেন। দেশের পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে আবার 'খাজনা বন্ধ' আন্দোলন শুরু হয়েছে। গাঁধীজির সঙ্গে আলোচনার জন্য আসার পথেই জওহরলালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সীমান্ত প্রদেশ 'খুদাই খিদমদগার'-দের আন্দোলনে টালমাটাল। আবদুল গফফর খানের এই 'লাল কোর্তা' বাহিনী ব্রিটিশের চক্ষুঃশূল। তাই তারা গ্রেফতার করেছে গফফর খানকে। গত সপ্তাহেই এই দুটি ঘটনাতে সরকারের কঠোর আক্রমণাত্মক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সাদা ফুলপ্যান্ট আর গলাবন্ধ কোট পরিহিত ব্যারিস্টার নরিম্যান সভায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। বোম্বাইয়ের এই প্রভাবশালী নেতা সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে তাঁর পরিচিতি। চশমার আড়ালে চোখে একটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তাঁর। গাঁধীটুপি পরা নরিম্যানের সুদর্শন চেহারা অনেক দিন পর দেখতে পাচ্ছে বোম্বাইয়ের জনতা।

পরের দিন ওয়ার্কিং কমিটির একটি গোপন বৈঠক বসল। 'শিগগিরই অহিংস আইনভঙ্গ আন্দোলন শুরু হচ্ছে' গাঁধীজির কাছ থেকে একথা জানতে পেরে সুভাষের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

নতুন ভাইসরয় প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক নীতি নিয়েছেন। গাঁধীজি বা কংগ্রেসের তিনি তোয়াক্কা করেন না। তাঁর মতে, দিল্লি চুক্তি একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কারণ কংগ্রেসকে সারা দেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এই চুক্তিতে। গাঁধীজিকে বাড়াবাড়ি রকমের তোয়াজ করা হয়েছে। এবার আর কংগ্রেসের আন্দোলন কোনও মতেই দানা বাঁধতে দেওয়া হবে না। উলটে কংগ্রেসকে একটা ঝটকা দিয়ে ব্রিটিশের বশংবদ ব্যবসায়ী আর দেশীয় রাজ্যের রাজা-রাজড়াদের এবং সেই সঙ্গে তাদের দেশি দালালদের কাছে টেনে নিতে হবে। এটাই হবে এবার ব্রিটিশ নীতি।

বাংলায় এখন উগ্রপন্থী কার্যকলাপ প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। দু'বছর আগেই সূর্য সেন আর তাঁর সশস্ত্র সহকারীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই এগারোজন অফিসার গুলিতে নিহত হয়েছেন। বহু জায়গা থেকেই বাজেয়াপ্ত হয়েছে বোমা আর কার্তুজ। সূর্য সেনের মামলা শরৎবাবু স্বয়ং নেওয়াতে আগুনে ঘি পড়েছে।

'বসু ভ্রাতাদের ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা নাও'— গোপন আদেশ এসেছে দিল্লি থেকে। প্রশ্ন শুধু একটাই— উপযুক্ত সময় বেছে নিতে হবে। বাংলার মাটিতে তাঁদের গ্রেফতার করার মানে আগুন নিয়ে খেলা করা।

বাড়ি পৌঁছে নরিম্যান বললেন, 'গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফেরার পর গাঁধীজির নৈরাশ্য আর চাপা নেই। এই বিরাট ব্যর্থতার কারণ কী সুভাষ।'

'কারণ গাঁধীজি নিজেকে সবসময় দুটি ভূমিকায় দেখতে চান—একটা ভূমিকা শাশ্বত জগদ্‌গুরুর আর একটা রাজনৈতিক। এই দুই ভূমিকার মধ্যে অনেক সময়ই গোল বাঁধে।'

সুভাষচন্দ্র নরিম্যানের বাড়িতেই রয়েছেন। নরিম্যানের জন্ম বোম্বাইয়ের কাছেই থানেতে এক মধ্যবিত্ত পারসি পরিবারে। বাবা ছিলেন, প্রথমে জাঞ্জিবার দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান পরে বেলগাঁওয়ের পুলিশ ইন্সপেকটার। নরিম্যানের আইন শিক্ষা বোম্বাইতে। খুর্সেদ নরিম্যান সুভাষের চেয়ে বছর চোদ্দো-পনেরোর বড় হবেন। গত ১৫ বছর যাবৎ নরিম্যান বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে জিতে আসছেন। বহুবার তিনি বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গাঁধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি 'আইন পরিষদ বর্জন' আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আস্তে আস্তে গাঁধীজির অহিংসা আর আপসের নীতিতে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন নরিম্যান।

নরিম্যানের বাড়িতে সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনেক কর্মকর্তা এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'সুভাষবাবু, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।'

'কেন বলুন তো?'

'শুনতে পাচ্ছি কলকাতা পুলিশ আপনাকে ধরার জন্যে তক্কে তক্কে আছে।'

এমন সময় সুভাষের জন্য একটা ফোন এল। নরিম্যান রিসিভারটা এগিয়ে দেন তাঁকে। সুভাষ ফোন ধরলেন কিন্তু অপর ব্যক্তিটির কোনও উচ্চবাচ্য নেই। সুভাষ ফোন রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ পর পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সুভাষ বিস্মিত। 'ব্যাপারটা কী বলুন তো নরিম্যান।'

'সুভাষবাবু, বোম্বাইতে আপনার অন্তরঙ্গ কেউ আছেন?'

'কেন আপনিই তো আছেন!' হাসতে হাসতে বলেন সুভাষ।

'সে রকম না মানে—'

'আমার কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুও থাকেন এখানে।'

'না আমি বলতে চাই কোনও তরুণী?'

এবার হতচকিত সুভাষ বললেন, 'সে কী? আপনার কাছেও খবর পৌঁছেছে নাকি?'

'নয়তো কী? আপনার বোম্বাই আসার খবর আপনার আগেই তার কাছ থেকে এসে যায়। কতবার যে ফোন করে। মুগ্ধা নাম তার।'

'হ্যাঁ। ওর চিঠি তো কলকাতায় হইচই ফেলে দিয়েছে। অনেকে তো বটেই এমনকী পুলিশেরও ধারণা আমি বোম্বাইতে বিয়ে করেছি।'

পরের দিন সকালে সুভাষ বাড়ি থেকে বেরোবার সময় দেখলেন একটু দূরে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে। চোখ বড় বড় করে সে দেখছে তাকে। পাঁচ ফুট মতো লম্বা, ফরসা, সুডৌল শরীর, চুল খোঁপা করে বাঁধা। বুঝতে পারা যায় মেয়েটি মরাঠি। সুভাষকে দেখে সে যেন খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে, হাতের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে চোখ আলতো করে ঢেকে এক ছুটে পাশের গলিতে পালাল।

'এই সেই মেয়ে।' নরিম্যান বললেন।

'তা ওরকম পাগলের মতো পালাল কেন?'

'মহারাষ্ট্রের একে বলা হয় "লাজনা"। নিজের প্রিয়তমকে দেখে লজ্জা পাওয়া।' শুনে সুভাষ হেসে উঠলেন।

সুভাষ তাড়াতাড়ি গাঁধীজির সঙ্গে দেখা করতে গেলে, গাঁধীজি হেসে বললেন, 'আমার ঝান্ডার নীচে লড়াইয়ের ইচ্ছের কথা সবসময় বল তুমি। এইবার তোমার ময়দান খোলা।'

'আপনিও দেখবেন গাঁধীজি সারা দেশের মধ্যে বাংলা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।'

সারাদিন ধরে অনেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ শেষ করে সুভাষ রাত্রে দাদার স্টেশন থেকে কলকাতা মেলে উঠলেন। ট্রেন চলতে শুরু করল। মনের মধ্যে হাজার স্বপ্ন। গাঁধীজিকে এবার বাংলার ক্ষমতা, বাংলার জাদু দেখিয়ে দিতে হবে। দেখতে দেখতে কল্যাণ স্টেশন এল। গাড়ি এখান থেকে নাসিকের দিকে বাঁক নেবে। দিনটি ১৯৩৩-এর দোসরা জানুয়ারি।

ঠিক তখনই স্টেশনে পুলিশের হুইসল বাজল। জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন সুভাষ। ঠিক তখনই কলকাতা পুলিশের একটি দল কামরায় ঢুকল। সাহায্যকারী বোম্বাই পুলিশবাহিনী সারা স্টেশন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও ভয়ানক দাগি ফৌজদারি আসামিকে ধরার মতো বিশাল আয়োজন করে সুভাষকে গ্রেফতার করা হল। কল্যাণের বহু কংগ্রেস কর্মকর্তা আর স্বেচ্ছাসেবক সুভাষের গ্রেফতারের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনে দৌড়ে এলেন। ভিড় বাড়ছে। পুলিশ এবার পরের ট্রেন ধরল।

তীক্ষ্ণস্বরে সুভাষ জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?'

'জানি না।' পুলিশ অফিসারের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'তবে আপনারা জানেনটা কী?'

'ওপরওয়ালার নির্দেশ।'

সত্যিই জানেন না এঁরা। মাঝে মাঝে স্টেশনে ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে নির্দেশ আসছে। ট্রেনেই থাক। ট্রেন ছুটছে। সুভাষ অসম্ভব হতাশ। গাঁধীজির লড়াইয়ে অংশ নেবার সুযোগ ভেস্তে দিল ব্রিটিশ।

গাড়ি এখন মধ্যপ্রদেশের রুক্ষ মালভূমির দেশে। তারপর কয়েকটা পাহাড় পেরিয়ে এক জনহীন বিস্তীর্ণ পাথুরে এলাকা। প্রায় মরুভূমি। তারই মাঝে শিওনির জেলখানা। চারদিকে আর কিছু নেই।

জেলখানায় না আছে বিদ্যুৎ না আছে জলের ব্যবস্থা। আকৃতিতে আর ব্যবস্থার দিক থেকে মধ্যযুগীয় কারাগার। চারদিকে যতদূর নজর যায় ধূসর, রুক্ষ, পাথুরে কর্কশ মাটি।

সুভাষের আসার দু'দিন পরে জেলার এসে জানালেন, গাঁধীজি আর তাঁর সহকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ সংগঠন ঘোষণা করে সমস্ত কংগ্রেস অফিস সিল করে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের সমস্ত তহবিল আর কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। হাজার হাজার কর্মী আর কর্মকর্তাদের ধরপাকড় চলছে।

তার মধ্যে এই শিওনির কারাগার এক মহা ভয়ংকর জায়গা। এর আগেই ছ'বার জেলে গেছেন সুভাষ। কিন্তু এ জেল সবার চেয়ে আলাদা। মাথায় টিনের চাল রোদ্দুরে আগুনের মতো গরম হয়ে ওঠে। শিওনির জেল নরকের নামান্তর। না আছে দরজা, না আছে জানলা। বাইরে দাঁড়িয়ে শুধু কঠোর প্রহরী। কি গ্রীষ্ম, কি শীত বন্দিদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হয়। কোনওমতে মাটি সমান করে ইট বিছানো হয়েছে। অনেক কয়েদির বহুদিন ধরে ব্যবহার করা টোল খাওয়া কালিপড়া বাসন আর গায়ে কামড় বসানো দড়ির খাটিয়া। এই নরকপুরীতে কতদিন কাটবে কে জানে!

সুভাষ প্রত্যেকদিন বিস্তীর্ণ রুক্ষ প্রান্তরে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের পরে অন্ধকার নেমে আসা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। প্রচণ্ড গরমের দিনে কখনও কখনও দূরে দেখা যায় মৃগতৃষ্ণিকা। কোনও রাত্রিতে জ্যোৎস্না ছেয়ে যায়। কোনওদিন ভোরবেলা শুকতারা দেখা যায়। সুভাষের মনে হয় ওই শুকতারাটি যেন তাঁর মায়ের চোখ—একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

বইপত্তরও কাছে নেই। গা পোড়ানো গরম। অসহ্য হলকা। এর সঙ্গে শুরু হয়েছে অজীর্ণ রোগ। কোমর থেকে উঠে আসে একটা দারুণ যন্ত্রণা। মন হতাশ। বর্মা মুলুকের জেলখানার কথা মনে পড়ে। সেখানকার অসুস্থতা, সেখানকার ব্যথা বেদনা সব আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। অনেক ওজন কমে গেছে তাঁর। স্বর্ণচাঁপার মতো গায়ের রঙে কালি পড়েছে।

একদিন দুপুরে চোখের সামনে মেজদার মূর্তি। সুভাষের শীর্ণ হাত শরৎ তুলে নিলেন নিজের হাতে। বলা নেই, কওয়া নেই মেজদা কোথা থেকে এসে পড়লেন? একটু দূরে সঙিনধারী পুলিশ দাঁড়িয়ে। মেজদাকে গ্রেফতার করে এই জেলেই নিয়ে আসা হয়েছে। রাজবন্দিদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাকে দু'ভাইকে পাশাপাশি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকেন সুভাষ। শরৎবাবুও অবাক হয়ে দেখছেন তাঁকে। মাত্র এই ক'মাসে শরীর এত ভেঙে গেছে সুভাষের? সুভাষের হাত তাঁর হাতে, চোখ জলে ভরা। সুভাষ প্রায় কাতরে ওঠে, 'মেজদা তুমি এখানে কেন?'

'রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৮১৮—ধারা তিন।'

'আদালতে হাজির করা হয়েছিল?'

'এ আইনে এ রকম কিছু নেই।'

'গ্রেফতার করার কারণটা কী?'

'সে কথাও জানাতে বাধ্য নন সদাশয় সরকার। তাঁদের শুধু আটক করার অধিকারটা ভাল করে দেওয়া আছে।'

'কিন্তু কতদিন?'

'সেটাও কিছু নির্দিষ্ট নয়। যতদিন খুশি।'

একই জেলের একই ওয়ার্ডে দাদাকে পেয়ে সুভাষের একটু ভাল লাগে। বর্মা মুলুকের চেয়ে অন্তত ভাল। ব্যারাকের দরজা নেই। দুই ভাই বারান্দায় পাশাপাশি বসলেন।

মামলার কাজে শরৎ গিয়েছিলেন বিহারে। সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করে সোজা শিওনিতে নিয়ে আসা হয়েছে। ভাইকে পাওয়ার আনন্দ বেশিক্ষণ থাকল না সুভাষের। 'মেজদা জেলে' একথা মনে হলেই ঘাম দেয় তাঁর শরীরে। বিরাট সংসার, গাড়ি, চাকরবাকর—ছেলে অশোক বিদেশে পড়ছে। ওকালতি করে যা উপার্জন করেন, সুভাষ আর অন্যদের জন্য তা হাত খুলে খরচ করেন। বহু রাজবন্দির অসহায় সন্তানেরা সাহায্য পায় তাঁর কাছ থেকে। এখন কী হবে? কে দেখবে তাদের? ঘরের কাকাতুয়াটা পর্যন্ত তাঁর পথ চেয়ে রয়েছে।

দুই ভাই-ই জেলে। কিন্তু রাজবন্দিদের ন্যায্য কোনও অধিকার তাঁদের দেওয়া হচ্ছে না। শরৎবাবু হোম সেক্রেটারি থেকে শুরু করে ভাইসরয় পর্যন্ত চিঠির পর চিঠি লিখছেন। 'আমাদের অপরাধ কী? কোন প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের এই গ্রেফতার? কেন আমাদের আদালতে তোলা হচ্ছে না? কতদিন জেলে থাকতে হবে আমাদের?' উত্তর দূরস্থান, প্রাপ্তি সংবাদটুকুও আসে না। মাথার ওপর তেতে ওঠা টিনের চাল ঘিলু পর্যন্ত যেন গলিয়ে দেয়।

একদিন সকালে হঠাৎ বিভাবতী শিওনিতে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর শীর্ণ চেহারা দেখে চমকে উঠলেন দুই ভাই। বিভাবতীর মুখের সেই রানির মতো হাসি কবেই মিলিয়ে গেছে। চোখে অবশ্য সেই গভীর দৃষ্টি রয়েছে তবে সে চোখের চারপাশে কালি পড়েছে। সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞেস করেন তাঁকে, 'বউদি বাড়ির খবর কী?'

'ছোট ঠাকুরপো নিজেদের যত্ন নাও। আমাদের চিন্তা কোরো না!' একটু চুপ করে থেকে বিভাবতী বলেন, 'ওঁকে গ্রেফতার করার পর বাড়িতে পুলিশ হামলা করে কাগজপত্র ওলট-পালট করে ঘরে তালা মেরে দিয়েছিল। এখনও গোয়েন্দারা বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে।'

শরৎবাবু বললেন, 'বিভা আমাদের পড়ুয়া ছেলেগুলোর কী খবর?'

'প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধে হয়েছিল। ছেলেগুলোও খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন এদিক ওদিক থেকে ব্যবস্থা করে ফেলেছি।'

'পয়সায় কুলোচ্ছে?'

'অনেক ছেলে এখন অর্ধেক বৃত্তি নিচ্ছে। কেউ কেউ কিছু কিছু কাজকর্ম জুটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সবাই এখন তোমার ছাড়া পাওয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।' বলতে বলতে চোখ মোছেন বিভাবতী।

জমাদার তার হেঁড়ে গলায় জানিয়ে গেল, দেখা করার সময়সীমা পেরিয়ে গেছে। বিভা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখেন।

'আমি দিল্লি যাব। ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করব। তোমাদের ন্যায্য অধিকার না দেওয়া পর্যন্ত থামব না আমি।'

বিভাবতী যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'বিভা, মা-বাবা কেমন আছেন?'

'ও হ্যাঁ। তাঁরা বলে পাঠিয়েছেন তাঁদের জন্য চিন্তা কোরো না। নিজেদের যত্ন নাও।'

মেজবউদির সঙ্গে দেখা হবার পরে দু'দিন পর্যন্ত মন ভার সুভাষের। আবার অজীর্ণের উপসর্গগুলো দেখা দিল। কোমরে যন্ত্রণাটা বেড়েই চলেছে। গলা ভেঙে গেছে। কখনও কখনও খুব ব্যথাও হয়। মনে হয় খুব চিৎকার করলে যন্ত্রণাটা বোধহয় কমত একটু। কিন্তু মেজদা টের পাবেন। তাই যন্ত্রণা চেপে থাকেন সুভাষ। কিন্তু তাঁর যন্ত্রণা মেজদার চোখ এড়ায় না। গরম আবার দারুণ বেড়েছে। সেই সঙ্গে সুভাষের উপসর্গগুলোও বেড়ে চলেছে। শক্ত খাবার কিছুই

আর হজম হয় না তাঁর। জেলারকে মিনতি করে শরৎচন্দ্র নিজেই রসুইখানায় গিয়ে ভাতের মণ্ড আর মুরগির সুপ বানান। অনেক সময় সুভাষ আর বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। মেজদা চামচে করে কচি বাচ্চার মতো খাইয়ে দেন তাঁকে।

একটু উন্নতি হয় শরীরের। একদিন আর মণ্ড খেতে চান না সুভাষ। সুপও মুখে তোলেন না। মেজদা ভয় পান। অনেক করে বোঝাতে থাকেন তিনি। দাদা হিসাবে ধমকধামকও করেন। কিন্তু সুভাষ অনড়। জলটুকুও খাচ্ছেন না তিনি। তাঁর স্বভাব মা বাবার চেয়ে মেজদাই বেশি বোঝেন। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। বিষণ্ণ শরৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কী করেছি সেটা তো বল। এ রকম পাগলামি কেন করছিস?'

এবার ফুঁসে উঠলেন সুভাষ, 'নিজের রোগ লুকিয়ে রেখে আমার শুশ্রূষা করা হচ্ছে। চাই না আমার ওরকম শুশ্রূষা।'

'তার মানে?'

'তোমার ডায়বেটিস বেড়েছে। আমাকে লুকিয়ে দু'বেলা ইনসুলিন নিচ্ছ, আমি কিছু বুঝি না, না?'

এবার হেসে উঠলেন শরৎবাবু। 'ঠিক আছে কাল থেকে তুই আমার ডাক্তার। যা বলবি শুনব। এখন একটু মণ্ড আনি?'

৭

গাঁধী-আরউইন চুক্তির কয়েকদিন আগেই ভারতের রাজধানী পুরনো দিল্লি থেকে নতুন দিল্লিতে সরিয়ে আনা হয়েছিল। এডওয়ার্ড লুটিয়েন্স আর হেনরি বেকারের পরিকল্পিত এই শহরে সরকারি দপ্তরগুলো সাম্রাজ্যবাদী অহংকারের প্রতিফলন। তারই মধ্যে আবার হোম সেক্রেটারির দপ্তরটি সম্ভ্রমের চাইতে ভয়ের উদ্রেকই বেশি করে। বেশি মানুষ চট করে সেখানে যেতে সাহস করে না। আজ কিন্তু এক বাঙালি কুলবধূ খোদ স্বরাষ্ট্র সচিবের কামরার ঠিক বাইরেই বসে আছেন। তাঁর হাতে একটা ফাইল। মরিস হ্যালেট—হোম সেক্রেটারি—নেমপ্লেটটির দিকে মাঝে মাঝে ফিরে দেখছেন তিনি।

অনেকক্ষণ পরে আরদালি এসে তাঁদের ভেতরে নিয়ে গেল। বিভাবতীর অভিজাত চেহারা এক নজর দেখে নিয়ে হ্যালেট বললেন, 'বলুন ম্যাডাম, আপনার জন্য কী করতে পারি আমি?'

'আমার দেওর খুব অসুস্থ। তাঁকে মুক্তি দিন।'

'রোগটা কী?'

'যক্ষ্মা এবং তার সঙ্গে পেটেও কিছু একটা হয়েছে।'

'টিউবারকুলোসিস? তা হলে তো আগেই তাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা। নামটা বলুন তো।'

'সুভাষচন্দ্র বোস।'

হ্যালেট সাহেব চমকে উঠলেন। সুভাষ সংক্রান্ত ফাইল চেয়ে পাঠিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য দেখতে লাগলেন তিনি। 'সুভাষচন্দ্র বোস দারুণ রকম ব্রিটিশ-বিদ্বেষী জাতীয়তাবাদী নেতা। আতঙ্কবাদীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শত্রুদের যদি ক্রমাঙ্ক নির্ধারণ করা হয় তবে পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষচন্দ্র—।' হ্যালেট তাড়াতাড়ি ফাইল বন্ধ করলেন।

হ্যালেটের লাল মুখে কথা নেই। আঙুল দিয়ে টেবিল বাজাতে বাজাতে তিনি মাথা ঝাঁকালেন।

'সরি ম্যাডাম। আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।'

'এটা শোনবার জন্যে আমি কলকাতা থেকে এতদূর নিশ্চয় আসিনি।'

'আপনার দেওরের মতো ডেঞ্জারাস রেভোলিউশনারি এদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। তবু অসুস্থ যখন, কিছু একটা করার চেষ্টা করব।'

'কী চেষ্টা করবেন আপনারা? শিওনি আর জব্বলপুরের জেল আমি নিজে দেখে এসেছি। সেখানে মানুষের কথা ছেড়ে দিন— গোরু ছাগল থাকলেও অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

একজন ভারতীয় মহিলা কতখানি মরিয়া হলে এভাবে কথা বলতে পারে হ্যালেট বুঝলেন। তিনি বললেন, 'আপনার আর্জি সম্বন্ধে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমি অপারগ।'

'অর্থাৎ সরকার চাইছেন এইভাবে একটু একটু করে তাঁর মৃত্যু হোক।' চোখ মুছে বললেন বিভাবতী।

'সেটা সত্যি নয়। তাঁর চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজে খোঁজ করেছিলাম আমরা। কিন্তু সেখানেও তাঁর চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাঁকে তো বলরামপুরেও পাঠানো হয়েছিল, তাই নয় কী?'

'তাঁর এক ভাই সুনীল ডাক্তার। তাঁকে দেখতে দেওয়া হচ্ছে না কেন?'

'কোনও এক বিশেষ কারণে।' বলে হ্যালেট প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। শরৎ আর সুভাষ দুজনেই জেলে থাকায় সংসারটা যে কীভাবে টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে সেটা এক বিভাবতীই জানেন। তবু তিনি বললেন, 'তাঁর চিকিৎসার দায়-দায়িত্ব সব আমরা নেব। শুধু তাঁকে বাংলার কোনও জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

হ্যালেট নিরুত্তর। কিছুদিন আগে বাংলার গভর্নর আর ভাইসরয়ের সাক্ষাতের সময় তিনি নিজেই উপস্থিত ছিলেন। গভর্নর ভাইসরয়কে বলেছিলেন, 'সুভাষ বোসকে বাংলার কোনও জেলে পাঠাবার কথা চিন্তাতেও আনবেন না। বাংলার মাটিতে সুভাষের উপস্থিতি মানেই বিপ্লবী কার্যকলাপ বাড়িয়ে তোলা। তার বদলে প্রয়োজন হলে একশো দাগি কয়েদিকে পাঠিয়ে দিলে আপত্তি নেই।' হ্যালেট এবার বিভাবতীকে বললেন, 'আর কোনও প্রদেশে।'

'বোম্বাইতে পাঠিয়ে দিন। আমার আর এক দেওর শৈলেশ বোস বোম্বাইতে থাকেন।'

হ্যালেট আবার ফাইল দেখলেন। 'অনেক আন্তর্জাতিক গুপ্ত সংগঠনের নেতাদের বোম্বাইতে আসা যাওয়া আছে। তাই বোম্বাইতে সুভাষ বোসকে পাঠানো বিপজ্জনক।' হ্যালেটের কপাল কোঁচকানো দেখে বিভাবতী বললেন, 'তা হলে পঞ্জাবে পাঠান। ডালহৌসিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।'

পঞ্জাবে সুভাষের পা পড়ামাত্রই পঞ্জাবের উগ্রপন্থীরা সুভাষকে কেন্দ্র করে জড়ো হবে। ভগৎ সিংয়ের মৃত্যুর পর পঞ্জাব এমনিতেই একটা দারুণ বিস্ফোরক অবস্থায় রয়েছে। পঞ্জাবের গভর্নরও আগেই জানিয়েছেন যে সুভাষকে পঞ্জাবে পাঠানো মানেই বিপদ ডেকে আনা।

'ম্যাডাম, ক্ষমা করবেন। আপনার দেওরের মতো বিপজ্জনক লোককে নিতে কোনও প্রদেশই রাজি নয়।'

'অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বাঁচতে দেবেন না।'

'দেখুন, বিদেশে যদি তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় তবে আমরা নিশ্চয়ই অনুমতি দেওয়ার কথা ভাবব।' হ্যালেট সাহেব শেষ কথা বলে দিলেন।

বিভাবতী কলকাতায় ফিরে এলেন। শরৎচন্দ্র জেলে। সংসার বেহাল। ধারকর্জ করে

সুভাষের ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। জানকীনাথ অসুস্থ। বৃদ্ধা শাশুড়ির দেখাশোনা করতে হয়। বসু বাড়ির ওপর নির্ভরশীল ছাত্রদের কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল। শরৎবাবুর অন্য পাঁচ ভাই অবশ্য উপার্জন করছেন। তবে তাঁদের তো নিজের নিজের সংসার রয়েছে। কাজেই এ বাড়ির সব দায়দায়িত্ব এখন বিভাবতীর ওপরে।

দিল্লি থেকে ফেরার ধকল গেছে। একটু বেশি বেলাতেই ঘুম ভাঙল বিভাবতীর। বাচ্চারা দৌড়ে এল। 'মা দাদু যেন কোথায় চলে যাচ্ছেন।' বিভাবতী এসে দেখলেন জানকীনাথ চেয়ারে তৈরি হয়ে বসে রয়েছেন।

'কোথায় যাচ্ছেন বাবা?' বিভাবতী প্রশ্ন করলেন।

'কটকে।'

'সে কী? আপনিই তো আমাদের ভরসা এখন।'

'সত্যিকারের ভরসা দেবার জন্যই তো যাচ্ছি মা।'

বিভাবতী স্তম্ভিত। 'আপনি এটা কী বলছেন বাবা? এই বয়সে আবার ওকালতি শুরু করবেন? তাও শরীরের এই অবস্থায়?'

'হ্যাঁ মা। আমার দুই উপযুক্ত ছেলে জেলে। সংসারে এত রকমের খরচ। তোমার মাথার বোঝা একটু হালকা না হলে আমি কী করে চুপ করে থাকি বল তো? আমার মন যে আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না।'

কোনওমতে নিজেকে সামলে জানকীনাথের সুটকেসটা নিয়ে ভেতরে রেখে এলেন। দিল্লিতে কী হয়েছে তা জানিয়ে চোখ মুছতে মুছতে তিনি বললেন, 'আপনি ভাববেন না বাবা। কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই।'

জানকীনাথের চোখেও জল। বিভাবতীকে কাছে ডেকে তাঁর মাথায় হাত রাখলেন তিনি। বললেন, 'একটা কথা দেবে মা? আসছে জন্মে তুমি আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে! তোমাকে খাওয়াব, পরাব, সব করব। তোমার ঋণ তো এজন্মে আর শোধ হবে না, আসছে জন্মে চেষ্টা করব।'

৮

'ক্ষিতীশ ডাক্তাররা একমত হচ্ছেন না। মাদ্রাজের ডাক্তাররা বলছেন আমার ফুসফুসে যক্ষ্মা হয়েছে। ভাওয়ালির স্পেশালিস্ট বলছেন, আমার ফুসফুসে কিছুই হয়নি।' সুভাষের গলায় অভিযোগের সুর।

'যাই হয়ে থাক, তোমার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। চার মাসে বিশ-বাইশ সের ওজন কমে যাওয়াটা চিন্তার বিষয়, সুভাষ।' ক্ষিতীশ বললেন।

'এইভাবে বিছানায় পড়ে না থেকে যদি লড়াইয়ের ময়দানে নামতে পারতাম।'

'তোমার সুইজারল্যান্ড যাবার অনুমতি তো দিয়েছে সরকার, তাই না?'

'এর জন্য সব কৃতিত্ব মেজবউদির।' সুভাষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলেন।

অনেক মাস হল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে এ জেল থেকে ও জেলে ঘোরাচ্ছে। এমনকী ডাক্তারি পরীক্ষার জন্যও তাঁকে কোনও প্রদেশের কর্তৃপক্ষই রাখতে রাজি নয়। একবার কোনওক্রমে মাদ্রাজ সরকার রাজি হয়েছিল। সেখান থেকে ভাওয়ালি স্যানাটোরিয়ামে। তারপর বলরামপুর। পেটের রোগটা ভাল হয়েছে তবে ফুসফুসের সমস্যাটা রয়েই গেছে। রোজ জ্বর আসছে। সায়াটিকার পুরনো ব্যথাটা রয়েই গেছে।

চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাওয়া ছাড়া আর রাস্তা নেই। সুভাষ ক্ষিতীশকে বললেন, 'ক্ষিতীশ, ইউরোপ যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ আর গাঁধীজির কাছ থেকে যদি পরিচয়পত্র চাই, দেবেন কি ওঁরা?'

'না দেওয়ার কী আছে?'

সুভাষের খুব ইচ্ছে ইউরোপ যাওয়ার আগে মা-বাবার সঙ্গে একবার দেখা করা। দেখা করার অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা তারও কিছু নিশ্চয়তা নেই। অন্তত ভাইদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়ার আর্জি জানালেন সুভাষ। শেষ পর্যন্ত প্রশাসন একটু নরম হল। মেজদার সঙ্গে চারটে দিন কাটল সুভাষের। মেজদা মুখ ফুটে বলে ফেললেন যে নিজের ছেলেদের চেয়েও সুভাষের প্রতি টান তাঁর অনেক বেশি। সুভাষের সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর পক্ষে অসহ।

ইউরোপ যাত্রার দিন এগিয়ে এল। দু-একদিন আগে কলকাতা থেকে অনেকে জব্বলপুরে এসে পৌঁছলেন। মেজদার ছেলেরা অর্থাৎ অমিয়, শিশির তো বটেই বাসন্তী দেবী আর বিভাবতীও এলেন। এক সঙ্গে এতজনকে দেখা করার অনুমতি দিতে জেলার কোনওমতেই রাজি নন। জব্বলপুরের জেলের তেতে ওঠা টিনের চাল দেখে বাসন্তী দেবীর চোখ বিস্ফারিত, মেজাজ সপ্তমে। তিনি জেলারকে কড়াগলায় বললেন, 'আমাদের সবাইকেই দেখা করতে দিতে হবে।'

'ওপর থেকে সে রকম হুকুম নেই।'

'ওপর মানে কত ওপর? আশমান থেকে হুকুম আনতে হবে নাকি?'

জেলারের পরোয়া না করে বাসন্তী দেবী এগোলেন। সুভাষের চেহারা দেখে তাঁর বুকটা ধক করে উঠল। গাল বসে গেছে, চশমার আড়াল থেকে চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়, হাত-পা কাঠি কাঠি। সেই অস্থিসার শরীরের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভেতরটা উথালপাথাল। সুভাষ তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলেন, 'মা।' কারওরই চোখের জল আর বাঁধ মানে না।

'সুভাষ, ভাগ্যের ওপর তো হাত নেই বাবা। তবে, আশা স্বরাজ এলে আর কারও ছেলেকে এভাবে মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে না।' নিজেকে সামলে নিতে নিতে আপ্রাণ চেষ্টায় বাসন্তী দেবী বলেন।

সবাই বিষণ্ণ মনে সুভাষের কাছ থেকে বিদায় নেন।

পরের দিন যখন স্ট্রেচারে করে সুভাষকে জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন শরৎবাবুর সমস্ত স্থৈর্যের বাঁধ ভাঙল। স্ট্রেচার থেকে সুভাষ মেজদার দিকে মাথা ফেরালেন। আর থাকতে না পেরে সুভাষের ওপর আছড়ে পড়লেন শরৎবাবু। সুভাষকে জড়িয়ে ধরে এবার শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন তিনি।

সুভাষকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বোম্বাইতে। বোম্বাইয়ের কথা মনে হতেই মনে ভেসে আসে কত কথা। লক্ষ্য এক তবু পথ কত আলাদা। বাংলা আর সবরমতীর মধ্যে অনেকটা দূরত্ব। বাংলায় একদিন সবরমতীর শান্তি নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু সবরমতী কি কোনওদিন বুঝবে বাংলার বুকের জ্বালা?

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া পরিচয়পত্র নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। 'শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপ যাচ্ছেন। তাঁকে প্রয়োজনমতো সাহায্য করলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশি হব।' নিরুত্তাপ, নিতান্ত আনুষ্ঠানিক এই পরিচয়পত্র কোন কাজে লাগবে? রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষ একটু বেশিরকম ছটফটে তরুণ নেতা মাত্র। সুভাষের মনে আশা শেষ মুহূর্তে হলেও গাঁধীজির কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিশ্চয় আসবে। বোম্বাই মেল ভি টি পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে কামরা ঘিরে দাঁড়াল

সঙিনধারী সিপাইরা। প্রাদেশিক হোম সেক্রেটারি স্বয়ং খবরদারি করছেন সুভাষের গতিবিধির। ছোট ভাই শৈলেশ তাঁর জন্য বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছেন। তাঁর সঙ্গে কোনও কথা না বলতে দিয়ে স্ট্রেচারসমেত মিউনিসিপ্যাল অ্যাম্বুলেন্স ছুটল আর্থার রোড জেলের দিকে।

দিল্লির গোয়েন্দা দপ্তরের দুজন অফিসার ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন হোম সেক্রেটারির দপ্তরে। সুভাষের পাশপোর্ট হাতে নিয়ে হোম সেক্রেটারি দেখলেন তাতে লাল কালিতে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে 'পাশপোর্ট নম্বর ৭২৩০৮—ইংল্যান্ড আর জার্মানি যাওয়া নিষিদ্ধ।'

ব্যাখ্যা দিলেন গোয়েন্দা অফিসার, 'হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যান্টি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানস লিভিং টুডে। এমনিতে ইংল্যান্ডে যেসব ভারতীয় ছাত্র পড়ছে তাদের মধ্যে সোস্যালিস্ট আর কমিউনিস্ট মতবাদ ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। তার ওপরে বোস যদি সেখানে যায় ছাত্রদের মাথা একদম বিগড়ে যাবে।'

হোম ডিপার্টমেন্টের তলবে এস এস গঙ্গা জাহাজের ক্যাপ্টেন এলেন দপ্তরে। দিল্লি থেকে আসা অফিসার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার জাহাজ কোন রুটে যাবে।'

'স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রুটে।'

'হান্‌সা রুটে নয় তো?'

'নিশ্চয়ই না।'

ক্যাপ্টেন চলে গেলে দিল্লির অফিসারটি বললেন, 'হান্‌সা রুটে অস্ত্রশস্ত্র স্মাগলিং হয়। ও রাস্তায় অনেক দুষ্কৃতী আতঙ্কবাদীদের অস্ত্র জোগাতে সবসময় তৈরি। বোসকে ও রাস্তায় কিছুতেই যেতে দেওয়া যায় না।'

সুভাষের জাহাজ যে পর্যন্ত বন্দর না ছাড়ে সে পর্যন্ত নাভাল অফিসারদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পরের দিন রাত্রে জাহাজ ছাড়বে। কিন্তু সকালেই অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছল জেটিতে। পুলিশ চেয়েছিল সকালেই চুপচাপ তাঁকে জাহাজে তুলে দিতে। কিন্তু তার আগেই সাংবাদিকরা তো বটেই, ব্যারিস্টার নরিম্যান, এস. কে. পাটিল, ড. ভি. ডি. সাঠে প্রমুখ কংগ্রেসিরা বন্দরে হাজির। অ্যাম্বুলেন্স থেকে স্ট্রেচার নামানোর সময় ধ্বনি উঠল, 'বন্দেমাতরম্', 'সুভাষবাবু কী জয়'। পুলিশ কমিশনার কংগ্রেস কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের দাবি সরাসরি নাকচ করে দিলেন। মুখ শুকনো করে ছোটভাই শৈলেশ, তাঁদের পরিবারের সকলে একপাশে দাঁড়িয়ে। আঙুলের ইশারাতে ছোটদের কাছে ডেকে আদর করলেন সুভাষ। সুভাষ একবার পুলিশ অফিসারকে বললেন, 'আমাকে ছোটভাইয়ের সঙ্গে দুটো কথা বলতে দিন।'

'এমন ভাষায় কথা বলবেন যাতে আমরা বুঝতে পারি।'

সুভাষ চটলেন। বললেন, 'ছোটভাইয়ের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলা তো দূরে থাক, আপনাদের সামনে কিছুই বলার ইচ্ছে নেই আমার।'

স্ট্রেচার জাহাজের দিকে এগোলে পায়ে পায়ে জনতাও এগোতে থাকে। এমন সময় গাঁধীজির আশ্রম থেকে এক কর্মকর্তা দ্রুত পায়ে এলেন সেখানে। সুভাষের কানে কানে কিছু বললেন তিনি। দূর থেকে দেখা গেল স্ট্রেচার এস এস গঙ্গায় তোলা হচ্ছে। সুভাষবাবু জাহাজের সিঁড়ি থেকে একবার কিনারার দিকে চাইলেন। চোখে জল। হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন সবাইকে। 'সুভাষবাবু কী জয়', 'বন্দেমাতরম্' আর একবার মুখরিত হল গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার পরিসর।

রাত্রি বারোটার পর জাহাজ ছাড়ল। জাহাজ কিনারা থেকে একটু দূরে গেলে তাঁকে মুক্তির আদেশ শোনানো হল। আকাশে জ্যোৎস্না ঝলমল করছে। বোম্বাই বন্দরের লাইটহাউস আস্তে

আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে। জাহাজের চারপাশে কালো জলের ঢেউ। শেষ মুহূর্তে আসা গাঁধীজির বার্তায় সুভাষ কষ্ট পেয়েছেন। 'সুভাষ তুমি নিজেই যথেষ্ট। তোমার পরিচয়পত্রের কী দরকার?' চিনির আস্তরণ দেওয়া তেতো ওষুধের বড়ির মতো সেই বার্তার অন্তর্নিহিত রাজনীতি না বোঝার মতো বাচ্চা সুভাষ নন।

দরদর করে ঘামছেন সুভাষ। রুমালে ঘাম মুছলেন তিনি। কাছেই দাঁড়িয়ে এক ডাক্তার। জাহাজের বিছানায় শুয়ে সুভাষের মনে কেমন একটা উদাসীনতা ছেয়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল কিছুদিন আগে একটি ছোট ছেলে তাঁর কাছে অটোগ্রাফ চাইলে তিনি তাঁর খাতায় লিখে দিয়েছিলেন কয়েকটা লাইন। আজ সেই কথাগুলো তাঁর মনে যেন গুঞ্জন তুলছে—

সুগন্ধী গোলাপ পেতে হলে
কাঁটা কি রাখতে পারো দূরে?
নূতন ঊষার স্বর্ণচ্ছটা
ওঠে শুধু আঁধারকে চিরে।
স্বাধীনতা পেতে চাও যদি
পেতে চাও মুক্ত সে প্রাণ,
দিতে হবে অর্ঘ্য সাজিয়ে,
বলিদান, আত্মবলিদান।

৬
দেশগৌরব

১

সুভাষচন্দ্রের কাছে ইউরোপ কিছু নতুন নয়। তাঁর এবারের ইউরোপ প্রবাস শুরু হল ভেনিস শহর থেকে। অপরূপ জলময় শহর এই ভেনিস। সমস্ত শহর যেন নীলজলে ভাসছে। রাস্তার জায়গায় রয়েছে অসংখ্য খাল। লোকে যাতায়াত করে গন্ডোলা অর্থাৎ একরকমের ছোট নৌকোতে। জল আর মাটির এরকম সহাবস্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

ভেনিসের হাওয়া ভিজে ভিজে, আকাশ মেঘে ছাওয়া। বোম্বাই থেকে সুভাষের সঙ্গ নিয়েছেন মিশ্র নামের এক উকিল। কোনও মতেই সুভাষের সঙ্গ ছাড়ছেন না তিনি। সুভাষের ভাইপো অশোক এখন ইউরোপে। ভেনিসে সুভাষকে নিতে এসেছেন তিনি। গন্ডোলায় যাচ্ছেন দুজনে— এক কোণায় মিশ্র বসে।

পরের দিন ভোরে সুভাষ আর অশোকনাথ জিনিসপত্র গুছিয়ে হোটেলের লবিতে নেমে এসেছেন। দেখলেন ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে আগে থেকেই মিশ্র বসে আছে সেখানে। সুভাষের দিকে নজর তার।

'অশোক, দারোয়ানকে ক্যাব ডাকতে বলে এসো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তিনজনের জন্যে একটা ক্যাবই যথেষ্ট।' সবজান্তার ভঙ্গিতে বলে উঠল মিশ্র।

'আপনি কোথায় চললেন?' সুভাষের গলায় উষ্মা স্পষ্ট।

'ভিয়েনায়।'

'আমরা সেখানে যাচ্ছি বলে?'

'না সে রকম কিছু নয়। আসলে আমার কয়েকজন আত্মীয় আছেন সেখানে। আসলে আমরা তো এক জায়গা থেকেই আসছি, একই দেশের মানুষ, হেঁ-হেঁ।'

'এবার আপনার এই খেলাটা বন্ধ করুন তো। ইউ রাস্কেল, ব্রিটিশ এজেন্ট! তোমার ওইসব ফন্দি এখানে চলবে না। এটা ব্রিটিশ মুলুক নয়।'

সুভাষের স্পষ্ট কথায় মিশ্র হকচকিয়ে গেল। কেটে পড়ল সে। ব্রিটিশ পুলিশ এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে দেখে অশোক হতভম্ব। দুজনে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা পৌঁছলেন। সেখানে ড. ফ্যুর্থ-এর হাসপাতালে সুভাষের চিকিৎসা শুরু হল।

শিগগিরই তিনি স্যানাটোরিয়ামের হোটেল দ্য ফ্রান্সে থাকবার জায়গা পেলেন। কিন্তু যেখানেই থাকুন সাংবাদিক আর ভারতীয় ছাত্ররা ভিড় করে তাঁর কাছে। প্রাকৃতিক চিকিৎসার কল্যাণে তাঁর শরীরও একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছে। শরীর যেমন সুস্থ হতে থাকে মনের ছটফটানি তেমনি বেড়ে চলে। পাশাপাশি চলতে থাকে জার্মান ভাষা-শিক্ষা

আর ভিয়েনা মিউনিসিপ্যালিটির কাজের ধরনধারণ অভিনিবেশের সঙ্গে দেখা।

দুটো মাস কেটে গেল। খবর পাওয়া গেল ব্যারিস্টার বিঠ্ঠলভাই পটেল আমেরিকা থেকে ভিয়েনাতে বিশ্রামের জন্য আসছেন। যেদিন তাঁর আসার কথা সকালের দারুণ শীত উপেক্ষা করে সুভাষ চললেন ভিয়েনা স্টেশনে— বিঠ্ঠলভাইকে অভ্যর্থনা করতে। পাহাড়গুলো অপরূপ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে বরফের সাদাটুপি পরে পাহাড়গুলো সকালের রোদ পোয়াচ্ছে। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া তার ওপর হালকা তুষারপাত শুরু হল। তারই মধ্যে ট্রেন এসে পৌঁছল। হাতে ছড়ি, মাথায় টুপি, গায়ে ওভারকোট— এক বৃদ্ধ নেমে এলেন গাড়ি থেকে। ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকা বৃদ্ধটিকে দেখে সুভাষ হতবাক। এই কি সেই বিঠ্ঠলভাই। কী দারুণ পরিবর্তন! বার্ধক্য মানুষকে কতটা বদলে দিতে পারে বিঠ্ঠলভাই যেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বুক পর্যন্ত সেই দাড়ি এখন পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে অবশ্য সেই দীপ্তি কিন্তু তার মধ্যে কেমন যেন গভীর বিষণ্ণতা। একটু ঝুঁকে ছড়িতে ভর দিয়ে হাঁটছেন তিনি।

সুভাষচন্দ্রকে স্টেশনে দেখে বিঠ্ঠলভাই অবাক। গাড়িতে বসলেন দুজনে। বিঠ্ঠলভাই ক্লান্ত তবু উৎসাহে ঘাটতি নেই। আমেরিকাতে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে একশোরও বেশি ভাষণ দিয়ে এসেছেন তিনি।

দেশবন্ধু আর বিঠ্ঠলভাইয়ের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। দেশবন্ধুর মুখ থেকে সুভাষ সম্পর্কে অনেকবার শুনেছেন তিনি। দেশবন্ধু বলেছিলেন সুভাষ আমার ভাণ্ডারের অনুপম রত্ন। সুভাষের বারবার কারাবরণ, তাঁর বিভিন্ন আন্দোলন, অসাধারণ সংগঠনক্ষমতা সব কিছুরই খবর রাখেন বিঠ্ঠলভাই।

সুভাষ আর বিঠ্ঠলভাইয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল গাঁধীজির উপস্থিতিতে বোম্বাইয়ের মণিভবনে।

'আইন অমান্য আন্দোলন কেমন চলছে?' বিঠ্ঠলভাই প্রশ্ন করেন।

'এখনও পর্যন্ত তো ভালই। কাল পর্যন্ত খবর পেয়েছি এক লাখ বিশ হাজার লোক গ্রেফতার হয়েছে। হাজার হাজার মহিলাও কারাবরণ করেছেন?'

'সুভাষ সারা পৃথিবী এই আন্দোলনের দিকে লক্ষ রাখছে। ভগবান করুন গাঁধীজির এই আন্দোলন যেন সফল হয়।' একটু থেমে তিনি বলেন, 'কী রকম ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখ তুমি?'

সুভাষচন্দ্র প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, 'আমরা চাই এক শক্তিশালী রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র শ্রমিক-কৃষকদের হিতের দিকে লক্ষ রাখবে। রাশিয়ার মতো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে ভারী শিল্প। শুরু হবে সত্যিকারের গ্রামোন্নয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। জাতিভেদ দূর হবে। প্রতিটি ভাষা সমান মর্যাদা পাবে। আমরা গড়ে তুলবো নতুন সাম্যবাদ।'

'সাবাস!'

হোটেল দ্য ফ্রান্সে নিজের ঘরে ঘুমোতে যাবার সময় নিশ্চিন্ত বোধ করেন বিঠ্ঠলভাই।

সবে দুটো দিন কেটেছে। তৃতীয় দিন বেশ সকালেই বিঠ্ঠলভাইয়ের কামরায় বেল বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখলেন খবরের কাগজ হাতে সুভাষ দাঁড়িয়ে। মুখে তীব্র অসন্তোষ। হাতের কাগজটা বিঠ্ঠলভাইয়ের সামনে মেলে ধরলেন সুভাষ। এবার চমকাবার পালা বিঠ্ঠলভাইয়ের। গাঁধীজি বিনাশর্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন। সুভাষচন্দ্র হাত মুঠো করে, দাঁতে দাঁত ঘষে রাগে থরথর করতে করতে বলেন, 'গাঁধীজি এটা ঠিক করলেন না। কী প্রয়োজন ছিল আন্দোলন প্রত্যাহারের? এবার তো আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস ছিল।'

'কেন যে বারবার এমন হয় বুঝতে পারি না সুভাষ।' বিঠ্ঠলভাইয়ের স্বরে হতাশা, দুঃখ সব একসঙ্গে ফুটে উঠেছে। 'বারবার অনশন করে আমাদের সেনাপতিটি কি এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন? তাঁর তেরো বছরের সংগ্রামের মোদ্দা প্রাপ্তি কতটুকু? ভারতবর্ষের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ, আশাভঙ্গের বেদনা, আগুনের হলকা আর ব্রিটিশদের ন্যূনতম ক্ষতি। সুভাষ, রাজনীতিক হিসাবে পুরোপুরি ব্যর্থ গাঁধীজি। আমার মনে হচ্ছে এর পর তাঁকে শ্রদ্ধা করার অর্থ নিজেরই অপমান।'

দুদিন সমানে আলোচনা চলল দুজনের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে কিছু একটা করা একান্ত প্রয়োজন। বিঠ্ঠলভাই তাঁর এক সাংবাদিক বন্ধু আলফ্রেড টির্নাবুরকে ডেকে পাঠালেন।

'আলফ্রেড, আমি আর আমার এই তরুণ বন্ধুটি অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে হিন্দুস্থান আজ এক প্রচণ্ড বিপ্লবের দোরগোড়ায় এসেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।'

'শুধু আলাপ-আলোচনা আর অনশন করে ইতিহাসের মোড় ঘোরানো যায় না। তার জন্য দরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।' সুভাষ বলেন।

'তাই আমরা দুজনে মিলে একটা বিবৃতির খসড়া তৈরি করেছি। সুভাষ তুমিই পড়ে শোনাও।'

সুভাষ বিবৃতিটি পড়তে শুরু করলেন।

'এর আগে মহাত্মা গাঁধী দেশের জন্য কাজ করে অসাধারণ গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্তু আজ তাঁর অবস্থা অনেকটা ঘরে পড়ে থাকা বাতিল হয়ে যাওয়া আসবাবের মতো। সত্যিকারের সাফল্যের পথে তিনি আজ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কংগ্রেস সংগঠনের আজ অবিলম্বে নেতৃত্বের পরিবর্তন প্রয়োজন। গাঁধীজির নেতৃত্বে আমাদের বাস্তব কোনও প্রগতি হবে, এ বিশ্বাস আমাদের আর নেই। কংগ্রেস যদি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রগতির রাস্তায় না চলে তবে আমাদের নতুন দলের সৃষ্টি করে নিতে হবে। দেশের সমস্ত চরমপন্থী সংগঠনকে আজ এক হয়ে দুর্বার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

স্বয়ং গাঁধীজিকে এইভাবে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানাতে দেখে আলফ্রেড হতচকিত। তিনি বললেন, 'মিস্টার পটেল। এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না আপনার?'

'আলফ্রেড, আমার এই তরুণ বন্ধুটির ইচ্ছে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে যা হোক একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ফালাফালা করে ফেলা। সত্যি বলতে কী বিবৃতির ভাষা আমিই কিছুটা নরম করে দিয়েছি।'

'কিন্তু আপনার কাছে এটা দুঃসাহস মনে হচ্ছে না?' আলফ্রেড প্রশ্ন করেন।

'উলটে আমার মনে হচ্ছে সুভাষের মধ্যে আমি দেশের তরুণদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। কেউ হয়তো মনে করবেন এ আওয়াজ দৃপ্ত তারুণ্যের অগ্নিময় প্রকাশ, কেউ ভাববেন এটা নিছক আহাম্মকি! কিন্তু নতুন বিপ্লবের আহ্বান, নবযুগের পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি সুভাষের মধ্যে।'

বৃদ্ধ বিঠ্ঠলভাইয়ের চোখ দিয়ে নেমে আসে জলের ধারা। ধুতির খুঁটে চোখ মোছেন তিনি। আলফ্রেড প্রশ্ন করলেন।

'হঠাৎ আপনি এত ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলেন কেন?'

'আজ পর্যন্ত আমরা চাকায় বাঁধা রাজনীতি করেছি। স্বরাজ রয়ে গেছে দূরে, বহুদূরে, দিগন্তের অন্তরালে। আজ যদি ভগবানের ইচ্ছে হয়ে থাকে যে আমরা দ্বিধা ত্যাগ করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব, তবে কে তাকে আটকাবে?'

'পটেল-বোস' যৌথ বিবৃতি ভারতে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। নাসিক জেলে আটক বল্লভভাই ভাবলেন, সুভাষ তাঁর ভাইকে সম্মোহিত করেছেন।

যতই অসুস্থ হোন বিছানায় বেশিদিন শুয়ে থাকা সুভাষের ধাতে নেই। চেকোশ্লোভাকিয়ায় চলে গেলেন তিনি। বর্ষার মুখে গেলেন পোল্যান্ড। লেনিনের রাশিয়ায় যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার আগেই ব্রিটিশ সরকারের গোপন চিঠি রাশিয়ার বিদেশ দপ্তরে এল। মস্কোর ভিসা না পাওয়াতে ফিরতে হল ভিয়েনায়। যেখানেই তিনি যান, তাঁর আগেই সে সব জায়গায় পৌঁছে যায় ব্রিটিশের গুপ্তচর আর দালালেরা। ফ্যাসিস্ট দেশে তারা প্রচার করে তিনি কমিউনিস্ট আর কমিউনিস্ট দেশে ফ্যাসিস্ট।

জুলাই মাসে বিঠ্ঠলভাইয়ের শরীরের দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। এরই মধ্যে ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রাঁচির জেলে আটক থাকা অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন বলে খবর এল। সুভাষ শোকস্তব্ধ। ভিয়েনার ভারতীয়রা সেনগুপ্তর স্মৃতির উদ্দেশে স্মরণসভার আয়োজন করলেন। বিঠ্ঠলভাইয়ের চলার ক্ষমতা নেই। তবু হুইল চেয়ারে বসে সভায় উপস্থিত হলেন তিনি।

সুভাষ বিঠ্ঠলভাইকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বিঠ্ঠলভাই বললেন, 'কী ভাবছ সুভাষ?'

'আপনি যা ভাবছেন আমিও তো তাই ভাবছি।'

'কিন্তু, আজ তোমার একটা কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

'লন্ডনের কয়েকটি মুসলমান ছাত্র পাকিস্তান বলে মুসলিমদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তুলেছে। ভারতবর্ষ ভাগ করতে চায় তারা। ব্যারিস্টার জিন্না সমর্থন করছেন তাদের।'

'আমাদের এই মহান দেশকে ভাগ করার কথা যাদের মাথায় আসে তাদের মাথার চিকিৎসা দরকার।' বিঠ্ঠলভাই বললেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ তিনি বললেন, 'ব্যারিস্টার জিন্না আর মহাত্মা গাঁধী দুজনেই আমাদের গুজরাতের সন্তান। তাঁদের মধ্যে এই বিবাদ আমার বড় খারাপ লাগে সুভাষ। তুমি নাগপুর কংগ্রেসের সেই ঘটনাটা জানো?'

'কোন ঘটনা?'

'সেখানে জিন্না তাঁর ভাষণে "মিস্টার গাঁধী" বলে সম্বোধন করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাঁধীজির চেলারা "মহাত্মা গাঁধী বলুন" বলে চিৎকার শুরু করলেন। জিন্না তাঁর জেদ না ছেড়ে "মিস্টার গাঁধী" চালিয়ে গেলেন। গাঁধীজির চেলারাও হল্লা শুরু করলেন। কংগ্রেস মঞ্চ ছেড়ে সেই যে জিন্না বেরিয়ে গেলেন আর কখনও ফিরলেন না। সুভাষ, ব্যারিস্টার জিন্না একেবারে আলাদা ধরনের লোক। বন্ড স্ট্রিটের স্যুট, দামি মদ তাঁর চাইই। মুসলমান হয়েও মসজিদে যান না। প্রচণ্ড জেদি, আত্মকেন্দ্রিক আর ব্যক্তিগত জীবনে দারুণ দুঃখী। আচ্ছা সুভাষ যদি দেশভাগের প্রসঙ্গ আসে তুমি কী করবে?'

'নিজের সর্বস্ব দিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত থামব না আমি।' সুভাষ আর বলতে পারেন না। তাঁর চেহারাই যেন বদলে যায়।

কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে বিঠ্ঠলভাই বললেন, 'সুভাষ, তোমার জন্য গর্ব হচ্ছে আমার।'

অসুখ দুজনকেই যন্ত্রণা দিচ্ছে। বিঠ্ঠলভাইয়ের শরীরের দ্রুত অবনতি দেখে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ভিয়েনা থেকে সুইজারল্যান্ডের গ্ল্যান্ড বলে একটা গ্রামে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সুভাষচন্দ্রের পেটে একটা প্রচণ্ড ব্যথা তাঁকে বারবারই কাবু করে ফেলছে। কিন্তু বিঠ্ঠলভাইয়ের অবস্থা খারাপ শুনে তিনি নিজের কষ্ট উপেক্ষা করে গ্ল্যান্ডে এলেন। বিঠ্ঠলভাইকে দেখে শরশয্যায় ভীষ্মের কথা মনে হল তাঁর।

বিঠ্ঠলভাইয়ের বিছানার পাশে সবসময় থাকেন সুভাষ। তিনিই বিঠ্ঠলভাইয়ের আত্মীয়দের খবর পাঠালেন।

ইংল্যান্ড থেকে বিঠ্ঠলভাইয়ের আত্মীয় নাথালাল পারেখ আর ভোগিভাই ঝাভেরি চলে এলেন। সর্দার পটেলের অনুমতি মিলল না বিদেশ যাওয়ার। তিনি তখন নাসিক জেলে বন্দি।

রোগশয্যা থেকে সুভাষের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন বিঠ্ঠলভাই। একদিন তাঁর মাথায় হাত রেখে হঠাৎ বললেন, 'বড় দেরি করে এলে সুভাষ। আরও আগে কেন পেলাম না তোমাকে?' পরপারের যাত্রী বিঠ্ঠলভাই পটেলের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

রাত তখন অনেক। সুভাষ বিঠ্ঠলভাইয়ের কফি তৈরি করে দিলেন। এরপর রাত্রে সেদিন নাথালাল থাকবেন তাঁর কাছে। সকালে আবার আসবেন সুভাষ। সুভাষ চলে গেলে বিঠ্ঠলভাই নাথালালকে বললেন, 'নাথালাল, আমি উইল করতে চাই।'

'উইল কেন? তার কী দরকার?'

'দেশের কাজের জন্য আমি একজনকে কিছু টাকা দিয়ে যেতে চাই।'

'কাকে?'

'সুভাষ বোসকে।'

'আমরা ভাবতাম আপনি আপনার সম্পত্তি গাঁধী আশ্রমে দিয়ে যাবেন!'

'নাথালাল, গাঁধীজি আর বল্লভভাইয়ের সহায়তা করবার জন্য অনেক পুঁজিপতি আছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি সুভাষ একা। আমার মৃত্যুর পর তাকে দেখো নাথালাল।' থেমে থেমে বলেন বিঠ্ঠলভাই।

'বিঠ্ঠলভাই!'

'যাবার দিন এসে গেছে। এবার যেতে হবে। সুভাষকে দেখো নাথালাল। তার মধ্যে আমি এক নির্ভীক যোদ্ধাকে দেখতে পাই। আদর্শের সঙ্গে কখনও সে আপস করবে না। একটু অস্থির প্রকৃতির ঠিকই কিন্তু ওর স্বভাবে ত্যাগ আর সেবার এক অপূর্ব মিশ্রণ তুমি দেখতে পাবে। তাকে বোঝাও। কাল সকালেই রেজিস্ট্রারকে ডেকে নিয়ে এস। আর সময় নেই।'

পরের দিনই উইলের সইসাবুদ হয়ে গেল। বিঠ্ঠলভাই নাথালাল আর সুভাষের হাত এক করে একবার নিজের হাতে ধরলেন। তারপর চোখের জল মুছে বললেন, 'সুভাষ, তুমি আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। ভারতের মঙ্গলের জন্য আমি আমার সম্পত্তি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। সারা পৃথিবীতে ভারতের কথা প্রচার করার জন্য তুমি এ সম্পত্তি ব্যবহার কোরো।'

'বিঠ্ঠলভাই, আপনার হৃদয় আকাশের মতো বিশাল। কিন্তু আমাকে মাপ করুন, আমি এ সম্পত্তি নিতে পারি না।'

'সুভাষ, এ আমার একেবারে আমার একার কষ্টার্জিত সম্পত্তি— কেন নেবে না তুমি?'

'বল্লভভাই তো বটেই, গাঁধীজিও পছন্দ করবেন না সেটা।'

'আমার সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে সুভাষ।' জোর করে উইলের কপি সুভাষের হাতে গুঁজে দিলেন বিঠ্ঠলভাই।

২২ অক্টোবর, ১৯৩৩। বাইরে দারুণ ঠান্ডা। সারারাত বরফ পড়েছে।

দুপুরে বিঠ্ঠলভাইয়ের জ্ঞান ফিরল। অক্সিজেনের নল দূরে সরিয়ে দিলেন তিনি। সুভাষের কান্না দেখে একটু হেসে বললেন, 'সি. আর. দাশ তোকে ক্রাইং ক্যাপ্টেন বলতেন, না?' তারপর সুভাষের চোখ মুছে দিয়ে বললেন, 'তোমাকে যে আরও কিছুদিন সহায়তা করব সেটা বিধাতা আমার ভাগ্যে লেখেননি। নিজের ক্ষমতাতেই এগিয়ে যাও তুমি। গো অ্যাহেড মাই সন।' এই ছিল তার শেষ কথা।

সুভাষ তাঁর চাদরের মধ্যে বুকের ওপর একটি গীতা রেখে দিলেন, রোজ তিনি বিঠ্ঠলভাইকে যে গীতাটা পড়ে শোনাতেন। তারপর কয়েক পা পিছিয়ে এসে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে স্যালুট করলেন তাঁর আরেক গুরুকে।

২

সুভাষ বেশ কম ভাড়াতেই ভিয়েনায় একটা সুন্দর ফ্ল্যাট পেয়ে গেলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর তাড়াতাড়ি তাঁকে একটা বই লিখতে হবে। বন্ধু ড. মাথুরকে সে কথা বললেন তিনি। ডাক্তার বললেন, 'হঠাৎ লেখার কথা তোমার মাথায় এল কেন? সম্প্রতি জওহরলালজির আত্মজীবনী ইউরোপে হইচই ফেলেছে বলে?'

'সে রকম কিছু নয়।' টেবিলের ওপর থেকে একটা চিঠি তুলে মাথুরের হাতে দিয়ে তিনি বললেন, 'এটা পড়। লন্ডনের উইজহার্ট প্রকাশন আমাকে একটা বই লিখতে অনুরোধ করেছে। সাম্মানিকের অগ্রিম হিসেবে একটা চেকও পাঠিয়েছে। তবে শরীর তো সুস্থ নয়। লেখবার জন্য যদি কাউকে পেতাম তো ভাল হত।'

'তার আর কী অসুবিধে। ইউরোপে এখন অনেক ছেলেমেয়ে বেকার বসে আছে। মন্দার বাজার ইউরোপকে এখন কাবু করে ফেলেছে।'

'কিন্তু যে কেউ হলেই তো হবে না। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা আমার পেছন ছাড়েনি। কাজেই বিশ্বাসী হওয়া চাই।'

শিগগিরই মাথুর একটি মেয়েকে সুপারিশ করে পাঠালেন। কিন্তু সে বেচারি দু-জায়গায় পার্ট টাইম কাজ করে। কাজেই এ কাজের জন্য দরকার মতো সময় দেওয়া সম্ভব নয় তার। একদিন দুপুরে ডাক্তারসাহেবের সুপারিশ নিয়ে আর একটি মেয়ে এল। দমকা হাওয়ার মতো তার আবির্ভাব। সুভাষ তাকিয়ে দেখলেন। মেয়েটি বেশ সুন্দরী তবে সাধারণের চেয়ে একটু বেঁটে। চেহারায় একটা মিষ্টি ঘরোয়াভাব। প্রথম দেখাতেই মনে হল বেশ মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে।

'বসুন।'

'ইয়েস স্যার।' বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে চেয়ার সরিয়ে নিয়ে বসে হাতের ফাইল টেবিলে রেখে বলল মেয়েটি।

গুপ্তচরের ভয় রয়েছে। তাই ভাল করে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

'আপনাদের পারিবারিক কাজ কী?'

'দাদুর বেশ বড় একটা জুতোর দোকান ছিল। মন্দার বাজারে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। বাবা ভেটেরিনারি সার্জেন।'

এমিলির কথায় সুভাষ বুঝলেন অনেক কষ্ট করেই লেখাপড়া শেষ করেছে মেয়েটি। একটু আধটু ব্যাকরণগত ভুল থাকলেও ইংরেজিটা বেশ ভালই জানে। তা ছাড়া এমিলির

জার্মানভাষার দখল সপ্রশংসভাবে লক্ষ করলেন সুভাষ। অনেকক্ষণ ধরে তিনি তাঁর আশ্চর্য সুন্দর চোখের দিকে লক্ষ করছিলেন। এমিলির চোখে একটা অন্যরকমের দীপ্তি রয়েছে। খুশি মনে সুভাষ বললেন, 'ওকে ওকে, আই সিলেক্ট ইউ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠলেন এমিলি। যাবার সময় আস্তে দরজাটা বন্ধ করে চলে গেলেন তিনি। তাঁর শালীন ব্যক্তিত্বে সুভাষ মুগ্ধ। ডাক্তার মাথুরকে ফোন করলেন তিনি।

'কী সুভাষ, সেক্রেটারি পছন্দ হল?'

'হ্যাঁ বুদ্ধিমতী, ভদ্র। সেক্রেটারি হিসাবে খুবই ভাল হবে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া মেয়েটির চাকরির প্রয়োজন খুবই।'

'আরে একটু থেমে! প্রশংসার যে বান ডাকিয়ে দিলে। কী ব্যাপার? মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেলে নাকি?' ফোনের ওধার থেকে ড. মাথুরের হো হো হাসি ভেসে এল।

'কী যে যা তা বলো না!' সুভাষ ফোন রেখে দিলেন।

'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' লেখা শুরু হল। সুভাষচন্দ্র বলে যান আর এমিলি নির্ভুলভাবে লিখে নেন। কখনও রাতে ইচ্ছে হলে সুভাষ তাড়াহুড়ো করে নিজেই লিখতে বসে যান। এত তাড়াতাড়ি লেখেন যে অনেক সময় নিজের লেখা নিজেই পড়তে পারেন না। কিন্তু এমিলি চট করে পড়ে টাইপ করে ফেলেন। বই লেখার জন্য প্রচুর তথ্য দরকার। ভিয়েনাতে দরকারমতো বই পাওয়ার অসুবিধে। সুভাষ এর আগে মেজদাকে লিখে কিছু বই আনিয়েছেন। কিছু বই জওহরলালও পাঠিয়েছেন। তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক খবরের জন্য ভালরকম ছুটোছুটি করতে হয়। কাটাকুটি, পরিবর্তন, আবার লেখা সব ঝামেলাই এমিলি সামলান।

সুভাষচন্দ্রের শরীর এখনও অসুস্থ। বিশেষ করে খাওয়ার পরে পেটে মাঝে মাঝেই বেশ ব্যথা হয়। পেটের যন্ত্রণায় ওষুধের ওপর ওষুধ খেতে হয়। তাঁর এরকম অবস্থা দেখে এমিলি একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে? কী হয়েছে আপনার?'

'অনেক বছর জেলের অতি অখাদ্য খাবার খেতে হয়েছে, ফলে অজীর্ণ রোগ ধরেছে। অনবরত দৌড়ঝাঁপ, সফর— সব মিলিয়ে গলব্লাডারটি জখম হয়ে গেছে।'

'আমি কী আপনার জন্য কিছু করতে পারি?'

'ওষুধটা ফুরিয়েছে। যদি দোকান থেকে এনে দাও তো ভাল হয়?'

'এতে সংকোচ করার কী আছে?'

এমিলি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গিয়ে ওষুধ নিয়ে এলেন। একদিন সুভাষ তাঁকে বললেন, ছাব্বিশে জানুয়ারিতে তাঁর ওপরে ব্রিটিশ অশ্বারোহী পুলিশের হামলার কথা। শুনে এমিলি বিমূঢ়। আর একদিন তাঁর কাছে বর্মার জেলের কথা শুনেও এমিলি স্তম্ভিত হয়ে যান।

সুভাষ জার্মান ভাষাটা আরও ভাল করে শিখতে চান। এমিলি জার্মান ভাষায় অসামান্য পারদর্শিনী। লেখার ফাঁকে ফাঁকে জার্মান ভাষা শিক্ষা শুরু হয়। অনেক অভিধান ইত্যাদি সংগৃহীত হয়। ক্রমশ পড়া এগিয়ে চলে।

একদিন সুভাষ এমিলিকে বললেন, 'দেশে এখন কী হচ্ছে খুব জানতে ইচ্ছে করে।'

'তাতে অসুবিধে কী? জার্মান ভাষায় খবরের কাগজের তো অভাব নেই!'

'কিন্তু ওগুলোর বড্ড দাম!'

'আমাদের এই রাস্তাতেই একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে পড়া যায়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, গিয়েই দেখুন না।'

এমিলির 'হ্যাঁ'-টা ভারী মিষ্টি। শুরু হল রোজ একঘণ্টা করে রেস্তোরোঁতে গিয়ে কাগজ পড়া। এক কাপ কফি দুজনে ভাগ করে খান। হেডলাইন দেখে দেখে সুভাষ এমিলিকে বলেন পড়তে। এমিলি সেগুলো পড়ে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দেন।

একদিন এমিলি বললেন, 'আচ্ছা, আপনারা মিস্টার গাঁধী না বলে গাঁধীজি বলেন কেন?'

'জি শব্দটা সম্মানের। তাই আমরা তাঁকে সম্মান করে "গাঁধীজি" বলি।'

'আমিও তো আপনাকে সম্মান করি। আমি কি আপনাকে "সুভাষজি" বলতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

এমিলির কাজের বোঝা বেড়ে চলে। আসবার পথে লাইব্রেরির বই আনা, রান্নার জিনিসপত্র আনা। সুভাষ কখনও কখনও পড়তে পড়তে সব ভুলে যান। হয়তো সময়মতো জলখাবার খাওয়া হয় না। এমিলি এসে পাউরুটি সেঁকে জ্যাম কিংবা মাখন লাগিয়ে নিয়ে আসেন তাঁর কাছে। সুভাষ চা-কফি খেতে ভালবাসেন। মাঝে মাঝে তার ব্যবস্থাও করেন এমিলি।

একদিন সুভাষ বললেন, 'আমার জন্য বড় কষ্ট করতে হয় তোমাকে।'

'আমি কিন্তু তা মনে করি না।'

'তোমাকে একটা ভাল কিছু উপহার দেওয়ার ইচ্ছে হয় আমার। কী তোমার পছন্দ?'

'আমার পছন্দ খুব উঁচু পাহাড়, পাহাড়ের ওপরকার উঁচু শিখর। দেবেন?'

'ওরে বাবা! ওটা আমার সাধ্যের বাইরে।'

দুজনেই প্রাণখুলে হেসে ওঠেন।

ধীরে ধীরে সুভাষচন্দ্র টের পান তাঁর মধ্যে কী যেন একটা পরিবর্তন হচ্ছে। নাম না জানা কোনও এক মধুর আবেশ যেন তাঁর শরীরে সঞ্চারিত হয়। এমিলি আসার মুহূর্তে দোরঘণ্টি বেজে উঠলে উন্মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। বন্ধুরা তাঁকে 'বাথরুম সিঙ্গার' বলে। বাথরুমে স্নানের সময় রবীন্দ্রসংগীত আর নজরুলগীতি গাওয়া তাঁর অভ্যাস। হঠাৎ সেটা বন্ধ হল কেন? জলের বালতির মধ্যে এমিলির অস্পষ্ট ছায়া তাঁকে যেন ইশারা করে। রাত্রে জানলার পাশে গাছের পাতার শব্দে এমিলির অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পান তিনি। ইদানীং কেন তিনি এমিলির প্রতীক্ষায় বসে থাকেন? হঠাৎ হঠাৎ তাঁর দিকে কেন লুকিয়ে তাকান তিনি? একদিন নিজের ওপরেই রাগ হল তাঁর। এই বয়সে প্রেমে পড়লেন নাকি? ছত্রিশ বছর বয়স তাঁর। আই সি এস পরীক্ষার পর কত হরিণাক্ষি তাঁর জন্য পাগল হয়েছিল। তিনি ফাঁসি গেলে তাঁর জন্য বিধবা হতেও তৈরি ছিল সেই অপরূপা মেয়েটি, যার নাম মোহিনী। সুভাষের জন্য পাগল কত মেয়ে বাসন্তী মায়ের কাছে ঘুরঘুর করত। তাঁর জন্য পাগল ছিল মুগ্ধা নামের সেই মরাঠি মেয়েটি। কিন্তু কেউই তাঁকে রাজি করাতে পারেনি। তাঁর বন্ধুরা ধরেই নিয়েছিলেন যে তিনি কাউকে না বললেও আসলে ব্রহ্মচর্যের শপথ নিয়েছেন। সুভাষ নিজেও ভাবতেন স্বাধীনতা যতদিন না আসে ততদিন বিয়ের শেকলে বাঁধবেন না নিজেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই এমিলি নামের অস্ট্রিয়ান মেয়েটি তাঁর মন এরকম অশান্ত করে তুলল কী করে? এর উত্তর নিজেও খুঁজে পান না তিনি।

এমিলি কিছুই বলেন না। তবু তাঁর অস্তিত্ব যেন জড়িয়ে থাকে সমস্ত সত্তায়। একদিন টেবিলে খাবার সময়ে এমিলি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'সুভাষজি, আপনি বিয়ে করেননি কেন?'

চমকে উঠলেন সুভাষ। চার ঢোক জল খেয়ে হাত নেড়ে বললেন, 'চাইনি বলে।'

'কেন চাননি?'

'একটা কারণ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুভাষ বললেন, 'কাউকে সুখ দিতে না পারলেও, দুঃখ কেন দেব? তাই।'

'তত্ত্বকথা বলবেন না। আপনার কাছে যে-ই আসুক, সে সুখী হবেই।'

'আমার অস্থির চঞ্চল জীবন। যতদিন এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত করে ফেলতে না পারছি ততদিন আমার শান্তি নেই। কবে যে গুলি আমার বুক ঝাঁঝরা করে দেবে, কিংবা মাথাটা চুরমার হয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। আমার কাছে যে আসবে তার ভাগ্যে জুটবে জ্বলন্ত আগুনের অসহ্য উত্তাপ। সব জেনেশুনে একটা মেয়েকে কেন কষ্ট দেব বলো?' বলতে বলতে সুভাষ যেন হারিয়ে ফেলেন নিজেকে।

আর বেশি কথা হল না সেদিন। কয়েকদিন কাটল। লেখা চলছে। সুভাষ বলে যাচ্ছেন। রাত বেশ অনেকটা হয়েছে। এমিলির নজর গেল সুভাষের কোটের দিকে। পকেটে কলমের কালি চুঁইয়ে দাগ লেগেছে। ভিজে থাকতে থাকতেই ধুয়ে ফেলার জন্য জল নিয়ে এলেন এমিলি। তুলো ভিজিয়ে কালির দাগ তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সেই উষ্ণ স্পর্শে সুভাষের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কী হচ্ছে বোঝার আগে এমিলি তাঁর বুকে মাথা রাখলেন। তাঁর চুলের নরম স্পর্শে, তাঁর সান্নিধ্যে সুভাষচন্দ্র চমকে উঠলেন। কী মধুর সে স্পর্শ। কিন্তু সামনে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্তব্য। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলেন, 'এ কী করছ তুমি?' দূরে সরিয়ে দিলেন এমিলিকে।

এমিলি হরিণীর মতো ত্রস্ত, একটু অপ্রস্তুত। তারপর সমস্ত প্রাণ যেন এক মুঠোয় ধরে বললেন, 'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম— আমার ভাল লাগে উঁচু পাহাড়, তাদের সমুন্নত শিখর। মানছি আপনি একজন বিরাট নেতা। কিন্তু আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন না।'

সুভাষের সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে, বইছে উষ্ণশ্বাস। নিজেকে কঠিন করে তিনি বললেন, 'এমিলি! কী পাগলামি করছ?'

'কেন? আয়ু কম বলে প্রজাপতি কী একটু বিশ্রাম নিতে পাহাড়ের গায়ে বসতে পারে না?'

কাঁপছেন সুভাষ। এমিলি আবার তাঁর কাছে এলেন। সুভাষের সারা শরীরে কী যেন একটা যন্ত্রণা উঠে আসছে, শিরাগুলো ফুলে উঠছে। এমিলির অবস্থা আগুনের আঁচে গলতে থাকা মাখনের মতো। চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'আমাকে ক্ষমা কর এমিলি। যাঁর প্রতি ভালবাসায় আমি আজন্ম পাগল, যাঁর জন্য আমি আমার শৈশবের আনন্দ, তারুণ্যের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করেছি, যাঁর জন্য আমি পদ, যশ, প্রতিষ্ঠা সবকিছু বাজি ধরেছি, আমার সেই দুঃখিনী জন্মভূমিকে আমি যে ভুলতে পারি না।'

এমিলি উঠলেন। তটে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মতো ফিরে গেলেন তিনি। পরের দিনের লেখা শেষ হল, পড়া শেষ হল। দুজনের মধ্যেই কেমন যেন একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। সব কিছু ঘটছে যেন যান্ত্রিকভাবে। এমিলি যখন যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, সুভাষ বললেন, 'কিছু বলবে না?'

'কী বলব?'

'যা তোমার ইচ্ছে।'

'আপনি শুনবেন?'

'হ্যাঁ কেন শুনব না?'

এমিলির চোখে বর্ষার ধারাবর্ষণ। চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বললেন, 'সুভাষজি, দুঃখ কমে অন্যের সঙ্গে সেটা ভাগ করে নিলে। আমি তো আপনাকে আমার জন্য ফুল বিছিয়ে দিতে বলিনি। চেয়েছি আপনার দুঃখের ভাগ নিতে। আপনার লক্ষ্যের জন্য শরীরপাত করতে পারলে আমি ধন্য হব।'

সুভাষের মন ফিরল। বর্ষা কাটল। দুজনে চেকোশ্লোভাকিয়ার কার্লোভিতে [Karlovy] বেড়াতে গেলেন। সেখানে একটা সুন্দর কুরহাউস ভাড়া করা হল। কুরহাউস হচ্ছে এক ধরনের রিসর্টের মতো জায়গা। কনসার্ট হল, কনফারেন্স রুম, লাইব্রেরি এমনকী সুইমিং পুলও আছে সেখানে। কাছেই একটা উষ্ণ প্রস্রবণ। এখানে সুভাষের শরীর আস্তে আস্তে ভাল হতে লাগল। বই লেখা তো চলছিলই।

রোজ ভোরে দুজনে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে বেরোন। আস্তে আস্তে শীত এগিয়ে আসছে। পাতাঝরা শুরু হয়েছে। রাস্তার দুধারে আঙুর খেতে থোকা থোকা আঙুর পেকে টসটস করছে। মাঝে মাঝে আঙুরের গোছা নিয়ে চেখে দেখেন দুজনে। একদিন সুভাষ এমিলিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্যোয়েটের কথা জানো তুমি?'

'বা রে। মহাকবি গ্যোয়েটে আমাদের গর্ব। সারা পৃথিবী জানে তাঁকে, আর আমি জানব না?'

'কিন্তু তোমাদের এই মহাকবি আমাদের কালিদাসের শকুন্তলা নিয়ে কী রকম উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তা জানো? শকুন্তলা পড়ে গ্যোয়েটে বলেছিলেন, কেউ যদি তারুণ্যের ফুল আর পরিণতির ফল একসঙ্গে দেখতে চায় তো তাকে শকুন্তলা পড়তে হবে। এটা কিন্তু একটা ফাঁকা উচ্ছ্বাস নয়। সত্যিকারের রসাত্মক বিশ্লেষণ। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে জার্মান তাত্ত্বিকদের গবেষণার কোনও তুলনা নেই।'

এমিলি ধরে পড়লেন— তাঁকে শকুন্তলার গল্পটা বলতে হবে। শকুন্তলা অনেক দিন আগে পড়েছেন সুভাষ। বলতে বলতে মাঝে মাঝে খেই হারায়। নদীর পারে কণ্বমুনির আশ্রমে লতার সঙ্গে ফুলের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক ঠিক সেইভাবেই গাছগাছালি, হরিণসমেত প্রকৃতির সঙ্গে সহজ সম্পর্ক নিয়ে বেড়ে উঠেছেন শকুন্তলা। যৌবনের দীপ্ত পৌরুষ নিয়ে মৃগয়াভিলাষী দুষ্মন্তকে দেখে ভয় পাওয়া হরিণ, সরলতার মূর্তিমতী প্রতিমা শকুন্তলার তাঁকে দেখে বিহ্বলতা— শুনতে শুনতে কখন যেন এমিলি শকুন্তলার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন।

সুভাষ বললেন, 'এমিলি, এর আগে যে কেন কারও প্রেমে পড়িনি সেটা ভেবে একটু দুঃখ হচ্ছে।'

এমিলি হাসলেন। ভাবলেন, 'তা হলে আমার পাহাড়, গিরিশিখর তো আর আমার কাছে আসত না।'

বইয়ের অনেকটা ছাপতে চলে গেছে। লন্ডন থেকে প্রুফ আসে দেখার জন্য। এমিলির হাতের ছোঁয়ায় বদলে গেছে ঘরের চেহারা। কাচের বাসনগুলো ঝকঝক করছে। বইগুলো সুন্দর করে সাজানো। তাঁর নাইট গাউনটা যে এত বেশি ঢিলেঢালা ছিল আগে সেটা বোঝেননি সুভাষ। এমিলি দর্জিকে দিয়ে সেটা ঠিকঠাক করে আনার পর আশ্চর্য লাগে তাঁর।

কেমন একটা আবেশের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কখনও ঝগড়া, অভিমানও হচ্ছে। সুভাষের মনে গান গুনগুনিয়ে ওঠে, 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার।'

একদিন হঠাৎ পোস্টম্যান এসে দাঁড়াল দরজায়। মা টেলিগ্রাম করেছেন, বাবা খুব অসুস্থ। অস্থির সুভাষ তাড়াতাড়ি ভিয়েনাতে ফিরলেন। প্লেনে দেশে ফেরার ব্যবস্থা হল। দুজনে এলেন এয়ারপোর্টে। এমিলি বললেন, 'বাবার খবর দিয়ে টেলিগ্রাম কোরো?'

'হ্যাঁ। ভেব না।'

'চিঠি লিখবে। চিঠি মানে চার লাইনের চিরকুট নয়। খুব লম্বা চিঠি লিখবে। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার দমবন্ধ হয়ে আসবে।'

চেকিং শেষ হল। ব্যাগ ভেতরে চলে গেছে। এমিলি দূরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সুভাষের কিছু

একটা মনে হল। ডিউটিরত অফিসারকে মিনতি করে ত্রস্তপায়ে বাইরে এলেন তিনি। এমিলি ভয় পেয়ে এগিয়ে গেলেন।

'কী হল?'

'তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছ। সাবধানে রাস্তা পেরোবে। রাস্তায় অনেক গাড়িঘোড়া—'

'কী আশ্চর্য! শুধু এই কথা বলার জন্য ফিরে এলে?'

'হ্যাঁ।' সুভাষ বলেন।

এমিলি হেসে ফেললেন। তাঁর হাসি দেখে লজ্জা পেলেন সুভাষ। ফিরে যেতে যেতে নিজের মনেই বললেন, 'মাই ফুলিশ লাভ!'

৩

মেঘের ওপর দিয়ে বিমান উড়ে চলেছে। নীচের জমি সাদা কুয়াশায় ঢাকা। বিমান কায়রোয় নামল। সে সময় রাত্রে বিমান চালানো হত না। তাই কলকাতা পর্যন্ত যাবার জন্য চার জায়গায় রাত্রিবাস করতে হবে। কয়েকটা ছবির সঙ্গে এমিলিকে একটা চিঠি লিখলেন তিনি। তবে চিঠিতে তিনি তাঁকে সতর্ক করে দিলেন, 'প্রিয়তমাসু! জীবনে এই প্রথম এ ধরনের চিঠি লিখছি। এ চিঠির কথা আপাতত গোপন রেখো। আমার দিব্যি রইল, অনুরোধটা রেখো।'

সকালে বিমান উড়ল পুবের দিকে। সূর্য উঠছে। এত সুন্দর সূর্যোদয় কতকাল দেখেননি সুভাষ। ইউরোপের আকাশে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসছে। রাত সাড়ে আটটায় বিমান পৌঁছল করাচিতে। চারদিকে অন্ধকার। তবু তাঁর মনে যেন আলোর ঝলকানি। কতদিন পর মাতৃভূমির মাটিতে পা দিচ্ছেন তিনি। খুব সকালেই হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন করাচির মেয়র জামশেদ মেহতা আর জননেতা চৈতরাম। সবাই মিলে বিমানবন্দরে পৌঁছলেন। বিমানবন্দরে 'পেট্রিয়ট' কাগজ খুলে নজরে পড়ল 'পরলোকে সুভাষচন্দ্রের পিতা'। খবরটা পড়তেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সামনের দেওয়ালটা ধরে হাউহাউ করে বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে উঠলেন তিনি।

সিকিউরিটির লোকেরা তন্ন তন্ন করে তাঁর ব্যাগ পরীক্ষা করল। দাড়ি কামানোর ক্ষুর থেকে শুরু করে সমস্ত কাগজপত্র আঁতিপাঁতি করে দেখল তারা। মেজদাকে দেখাবার জন্যে 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এর কয়েকটা ফর্মা ছিল। পুলিশ কমিশনার সেগুলো বাজেয়াপ্ত করলেন।

বিকেল চারটে নাগাদ দমদম পৌঁছল বিমান। বিমান মাটি ছোঁওয়া মাত্র বিমানবন্দরে উপস্থিত নিরাপত্তাবাহিনীর মধ্যে শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান দেখার মতো চাঞ্চল্য শুরু হল। বিমানের প্রপেলার থামার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক ঘিরে দাঁড়াল সশস্ত্র সৈনিকেরা। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল সুভাষ যেন কোটের মধ্যে করে বোমা নিয়ে আসছেন। কর্কশ সাইরেনের আওয়াজ তুলে তীব্র বেগে রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে এল দুটো পুলিশের গাড়ি। নীচে নামতেই একটা গাড়িতে সুভাষচন্দ্রকে, আর তাঁর মালপত্র আর একটা গাড়িতে তোলা হল। সে গাড়িটা পাইলট কারের মতো সামনে সামনে চলল।

সুভাষচন্দ্রের গাড়িতে ছিলেন এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার। সুভাষের হাতে একটা সরকারি আদেশের কাগজ দিয়ে সই করালেন তিনি। পথের দু'পাশে আনন্দোচ্ছল সুভাষ অনুরাগী জনতা। দূর থেকেই গাড়ি লক্ষ করে ফুলের মালা ছুড়ে দিচ্ছেন তাঁরা। ধ্বনি উঠছে 'বন্দেমাতরম্'। চারদিকে সাইরেন আর হুইসলের আওয়াজ। হাতের হলদেটে কাগজটার দিকে তাকিয়ে প্রথমেই সুভাষের নজর গেল।

'বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আর্টিকল ২ (১)' শব্দগুলোর দিকে। অফিসারটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বলুন, এর পর কী করতে হবে?'

'আপনাকে আপনার বাড়িতে নজরবন্দি হয়ে থাকতে হবে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার সবসময় আপনার পাহারায় থাকবেন। যে-কোনও চিঠি, পার্সেল এলে সেটা আপনার হাতে দেওয়ার আগে, তিনি খুলে দেখবেন। কাগজের একটা টুকরোও তাঁর বিনা অনুমতিতে আপনার হাতে দেওয়া যাবে না।'

'যদি হুকুম না মানি?'

'কমপক্ষে সাত বছর জেল।' নতুন আইনের স্বরূপটা বুঝিয়ে দিলেন তিনি। সৈন্যরা যেমন দুর্গ অবরোধ করে, এলগিন রোডের বাড়িতে সে রকম অবস্থা। সিঁড়ির ওপর মেজদা দাঁড়িয়ে। সুভাষকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। মেজদার কাঁধে মাথা রেখে ছোটছেলের মতো চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন সুভাষ।

'বড্ড দেরি করে ফেললি সুভাষ।'

'আমার তো কোনও উপায় ছিল না মেজদা।'

'তোর কথা ভেবে ভেবে বাবা বড় অশান্তিতে ছিলেন রে।'

'কী বলতেন তিনি?'

'মরবার সময় আমাকে ডেকে বললেন, সুভাষকে বোলো, ওর মতো ছেলের বাবা হবার জন্য আমি গর্বিত। আমার আর কোনও খেদ নেই। ভগবান তোমাদের আর এই দুর্ভাগা দেশের মঙ্গল করুন।'

বাড়ি শোকাচ্ছন্ন। আত্মীয়, কুটুম্ব, সাত ভাই, চার বোন সবাই বসে আছেন। মা ভেতরে ঠাকুরঘরে। মায়ের মুখোমুখি হবার সাহস পাচ্ছেন না সুভাষ। কী বলবেন তাঁকে? প্রায় পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে কাটিয়ে বাবাকে ছাড়া কী করে থাকবেন মা? সুভাষচন্দ্রের কাছে বসে আছেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বুঝিয়ে বললেন সুভাষকে। অন্ধকার হলে পায়ে পায়ে ঠাকুরঘরে গেলেন সুভাষ। 'মা' বলে ডাকতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন মা। রুক্ষ খোলা চুল, রিক্ত কপাল, পরনে সাদা থান। মায়ের দিকে আর তাকাতে পারেন না সুভাষ। মা জড়িয়ে ধরলেন সুভাষকে। মায়ের মাথাটা কোলে নিয়ে ঠাকুরঘরেই ঠায় বসে রইলেন সুভাষ।

মেজদা গাঁধীজির টেলিগ্রাম সুভাষচন্দ্রের হাতে দিলেন। 'তোমার বাবার মৃত্যুর খবরে মর্মাহত। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রণাম। তাঁর অসাধারণ সন্তানদের জন্য আমিও গর্ব অনুভব করি। পরমেশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।'

বসুবাড়িতে একসঙ্গে দুই কয়েদি। বাবার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পুলিশ শরৎবাবুকে বাড়িতে এনেছে। তিনিও নজরবন্দি। পুলিশের বাড়াবাড়ির কোনও শেষ নেই। কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে দেয় না তারা। দূর থেকেও কথা বলতে দেয় না তারা। একদিন সুভাষ ছাদে ছিলেন। সামনের রাস্তায় সত্যরঞ্জন বক্সি, হেমন্ত আর সত্যেনবাবুর সঙ্গে ইশারায় কথা বলছিলেন সুভাষ। অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার সেটা দেখতে পেয়ে এসে খুব চেঁচামেচি করলেন। মেজদার কাছে গিয়ে সুভাষ বললেন, 'এ তো ফৌজির কায়দাকানুনকেও হার মানাচ্ছে মেজদা। তুমি সহ্য করছ কী করে?'

'এ তো কিছুই না। এই পরোয়ানাটা দেখ একটু।'

কাগজটাতে চোখ বুলিয়ে সুভাষ দেখলেন, পিতার অন্ত্যেষ্টি সৎকারে উপস্থিত থাকার জন্যে পুত্রকে অনুমতি। তারিখটা দেখে চমকে উঠলেন সুভাষ।

'মেজদা এতে তো কয়েকদিন আগের তারিখ দেখছি। তোমরা কী বাবার মৃত্যুর...'

'হ্যাঁ। মৃত্যুর আগেই পুলিশের কাছে দরখাস্ত করতে হয়েছিল। ওরা বলল, 'সময়ে দরখাস্ত যদি জমা না পড়ে তা হলে অনুমতি না পাওয়া গেলে আমাদের দোষ দিয়ো না।'

পৃথিবীর বহু বিপ্লবীর জীবন, তাঁদের বিভিন্ন কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ সম্বন্ধে অনেক পড়েছেন সুভাষ। কিন্তু এরকম পাশবিক ব্যবহার এই প্রথম দেখছেন তিনি। ব্রিটিশের পৈশাচিক আচরণের, এই জঘন্য নমুনা স্তম্ভিত করে দিয়েছে তাঁকে।

অশৌচের দিনগুলোতে সকলে কঠোরভাবে নিয়মরীতি মেনে চলেন। রাতে গায়ে ধুতির খুঁট জড়িয়ে মেঝেতে শুয়ে থাকেন তাঁরা। পুলিশ দিনরাত পাহারা দেয়। বাকি চিকিৎসার জন্য সুভাষকে আবার ইউরোপ যেতে হবে। শোকে, অশৌচের কঠোর নিয়মপালনে তাঁর শরীর আবার খারাপ হয়েছে।

এবারকার যাওয়ার সময়কার দৃশ্যটা অবশ্য গতবারের মতো করুণ নয়। কংগ্রেসের অনেক কর্মকর্তা আর সাংবাদিক সুভাষচন্দ্রকে ঘিরে রয়েছেন। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'আমরা শুনেছি আপনি হিটলারের প্রশংসা করেন।'

'আমার কাছেও এটা একটা নতুন খবর। আচ্ছা বলতে পারেন নাৎসিদের গায়ের কোট আমাদের মাপে কী করে হবে? অর্থনীতির দিক থেকে হিটলার বড় বড় শিল্পপতিদের হাতের পুতুল। সত্যি কথা যদি বলি তা হলে বলতে হয়, আমি হিটলারকেও পছন্দ করি না, নাৎসি মতবাদও পছন্দ করি না। কিন্তু ভার্সাইয়ের ভস্মস্তূপ থেকে তিনি জার্মানিকে যেভাবে এবং যত কম সময়ের মধ্যে আবার প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তার জন্য তাঁর পরিশ্রমকে আমি সেলাম করি।'

কারও স্বাধীনতা হরণ করে কতদিন তাঁকে দেশের বাইরে থাকতে বাধ্য করা যায়? সুভাষের নির্বাসনের পর পাঁচটি বছর পেরিয়ে গেছে। দেশের তরুণরা নিজেদের প্রিয় নেতাকে আবার ফিরে পেতে চায়। বিপ্লবীরা হারিয়েছে তাদের মানসিক আশ্রয়। এমনকী সুভাষের অনুপস্থিতিতে গাঁধীজির কাছেও রাজনীতি বিস্বাদ লাগছে। প্রিয় সুভাষকে কাছে না পেয়ে আত্মীয়রা বিষণ্ণ। আইন অমান্য আন্দোলনে আটক সমস্ত বন্দি ছাড়া পেয়েছে। ১৯৩৫-এর ভারত আইন অনুযায়ী শিগগির দেশে নির্বাচন হবে। কংগ্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর কংগ্রেস এখন সাংগঠনিক পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত। সিল করা অফিসগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। দেশে একটা নতুন চেতনার হাওয়া বইছে। এ সময় সুভাষ কেন নেই?

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা সর্বত্র একই প্রশ্ন 'সুভাষচন্দ্র কোথায়? তাঁকে দেশের মাটিতে ফিরতে দাও।' অনেকদিন পর লখনউতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে। এবার জওহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ায় প্রগতিপন্থী তরুণের দল আনন্দে উচ্ছ্বসিত। নতুন কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টির কর্মকর্তারা দল বেঁধে ফিরে আসছেন। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, 'সুভাষচন্দ্র কোথায়? কবে আসবেন তিনি?'

কেন্দ্রীয় আইনসভায় ব্যারিস্টার ভুলাভাই দেশাই মোটাসোটা বেঁটেখাটো শরীরে, পালোয়ানি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সরকার পক্ষকে প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বর্তমানে কোথায় আছেন? তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, এ কথা কি সত্যি?'

হোম মেম্বার হ্যারি ক্যারিক স্পষ্টই বলে দিলেন, 'বোসের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন অথচ বিপথগামী ব্যক্তিকে ফিরে আসতে দিলে বিপ্লবীদের সহায়তা করে আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে সে। আমরা সেটা হতে দিতে পারি না।'

'শেম শেম' ধ্বনিতে মুখর হল আইনসভা। ভুলাভাই বললেন, 'সুভাষের বিরুদ্ধে কোনও রকম কোনও প্রমাণ ছাড়াই নানারকম গুরুতর অভিযোগ আনছেন আপনারা। তাঁকে দেশে আসতে দিন তারপরে ক্ষমতা থাকে তো তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করুন।'

সভায় মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপিত হল। ব্যারিস্টার জিন্না এবং তাঁর মুসলিম লিগের সদস্যরা ভোটদানে বিরত থাকলেন। মুলতুবি প্রস্তাব ৮২—৪৯ ভোটে গৃহীত হল। জাতীয়তাবাদী নেতারা উল্লসিত— সরকারপক্ষ ত্রস্ত।

লন্ডনে হাউস অফ কমনস-এও এ প্রসঙ্গ সোচ্চার হয়ে উঠল। লেবার পার্টির সদস্যরা নাস্তানাবুদ করে তুললেন সরকার পক্ষকে।

লখনউ কংগ্রেসে জওহরলাল তাঁর ভাষণে সুভাষের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি প্রাধান্য দিলেন। তিনি গাঁধীজিকে বললেন, 'সুভাষের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি রাখার ব্যাপারে ভিয়েনার ব্রিটিশ রাজদূত চিঠি দিয়েছেন। এই কথা জানতে পারার পর রাতে আমার ভাল করে ঘুম হয়নি। আই স্পেন্ট এ ব্যাড নাইট। নিষেধাজ্ঞার পরোয়া না করে সুভাষ ইতালিয়ান জাহাজ কাউন্ট ওয়ার্দেতে রওনা হচ্ছে দেশে ফেরার জন্য।'

'এ রকম সাহস সুভাষকেই সাজে। একটা বীর বটে। হি ইজ ব্রেভ এনাফ!' গাঁধীজির মুখে প্রশ্রয়ের হাসি।

লখনউ অধিবেশনের পর থেকে জওহরের সুভাষের কথা বারবার মনে হচ্ছে। কলকাতা অধিবেশনের সেই তুলকালাম, ইয়ুথ লিগের গোড়াকার দিনগুলোর স্মৃতি ভিড় করে আসে তাঁর মনে। সুইজারল্যান্ডে লুসার্নের হাসপাতালে গত কয়েকমাস জওহরের পত্নী কমলা দুরন্ত ব্যাধিতে শয্যাগত ছিলেন। সুইজারল্যান্ডের ঠান্ডায় সারা শরীরে যেন জমাট বেঁধে যায়। কমলার জীবনের সেই ভয়ংকর শেষ কয়েকটা দিনে তাঁর শয্যার পাশে ইন্দিরাকে ভরসা দিতে ছিলেন শুধু ড. অটল আর সুভাষচন্দ্র। নিজের অসুস্থতা উপেক্ষা করে প্যারিস থেকে চলে এসেছিলেন তিনি।

সুইজারল্যান্ডে বরফ ঢাকা গিরিশিখর আর বিস্তীর্ণ লেকের পাশে কমলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে চিরকালের মতো তাঁকে বিদেশে রেখে জওহর ফিরেছিলেন দেশে। সেই সময় তাঁকে শক্তি জুগিয়েছিলেন সুভাষই। ভিয়েনার বিমানবন্দরে তখন বরফ পড়ছিল। সেটাই এখনও পর্যন্ত সুভাষের সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎ।

'সুভাষ আমি তো দেশে ফিরে যাচ্ছি। তুমি কবে ফিরবে?' জওহর প্রশ্ন করেছিলেন।

'দাদা, মাতৃভূমি ছেড়ে কোথাও একটা মুহূর্ত-ও আমার ভাল লাগে না।'

'তোমার শারীরিক অবস্থা এবং মানসিকতার দোহাই দিয়ে তোমাকে এইভাবে নির্বাসিত করে রাখার কোনও অধিকার সরকারের নেই। আমরা লড়ব সে জন্য।' নেহরু বলেছিলেন।

এপ্রিল ১৯৩৬। বোম্বাইয়ের আলেকজান্দ্রা ডকে এসে থেমেছে ইতালিয়ান জাহাজ। নানান মানুষ ভিড় করে এসেছেন সেখানে। যেই ডেকে সুভাষচন্দ্রকে দেখা গেল, ধ্বনি উঠল, 'বন্দেমাতরম্', 'ঝান্ডা উঁচা রহে হামারা', 'ডাউন ডাউন উইথ দ্য ইউনিয়ন জ্যাক'।

ডেক থেকেই সুভাষ গাঁধীজির শারীরিক অবস্থার খবর নিচ্ছেন। তিনি জানেন, নামলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। শিকারি কুকুরের মতো পুলিশ তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

ডকে পা দিতে না দিতে পুলিশ অফিসার এসে তাঁর হাত ধরে জেলের দিকে রওনা দিলেন।

জনতার আনা মালাগুলো শুকিয়ে এসেছে। কয়েকজন মালাগুলো ছুড়ে দিল তাঁর দিকে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আবার মুখর হল ডক এলাকা। পুলিশ অফিসারের হাত থেকে জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুভাষ হাত তুললেন নিশানের ভঙ্গিতে। জনতার দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন, 'আজাদি কা ঝান্ডা উঁচা রাখনা।' পুলিশ ভ্যানের মধ্যেই এক সেপাইয়ের হাত থেকে খবরের কাগজ নিয়ে দেখলেন, পাতা জুড়ে লখনউ অধিবেশনের খবর বেরিয়েছে। জওহরলাল ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষচন্দ্রকে সসম্মানে স্থান দিয়েছেন। সুভাষের মুক্তির জন্য আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বোম্বাইয়ের আর্থার রোড জেলে এরকম বিপজ্জনক কয়েদিকে দু-চারদিনের বেশি রাখাটা নিরাপদ নয়। তাই বোম্বাই পুলিশ সুভাষকে স্থানান্তরিত করল পুনার ইয়েরাওয়াডা [Yeravada] জেলে। ১০ মে, ১৯৩৬— পালিত হল 'সুভাষ দিবস' হিসাবে। করাচি, দিল্লি, কলকাতা, ঢাকা, লাহোর, বোম্বাই, মাদ্রাজ— সর্বত্র মিছিল বেরোল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠল, 'গুলামিকা জঞ্জির তোড় দো, প্যারে সুভাষকে ছোড় দো।' সভায় নেহরু বললেন, 'সুভাষের গ্রেফতার, তাকে আটকে রাখা ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর এক জঘন্য, অন্যায় আক্রমণ। এটা আমাদের সকলেরই শ্বাসরোধ করার প্রয়াস।'

কিছুদিন পরে সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে সুভাষকে কার্শিয়াঙে শরৎবাবুর বাড়িতে রাখা হবে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় যাতে কোনও গোলমাল না হয় সে জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হল, অতি গোপনে। ১৬ মে, ১৯৩৬। কাউকে জানতে না দিয়ে বন্দিকে হড়পসার স্টেশনে নিয়ে আসা হল। রাস্তায় যে সব প্রদেশ পড়বে তাদের প্রত্যেকটিকে খুব সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে। জনসাধারণ তো দূরস্থান, কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে। দিল্লির কঠিন নির্দেশ সুভাষকে কোনওমতেই কলকাতার আশেপাশে নেওয়া যাবে না। বিকাল চারটের সময় হড়পসার থেকে গাড়ি ছাড়ল। খুব ভোরে গাড়ি মানমদে এসে পৌঁছল। সেখান থেকে লখনউ যাবার রাস্তা ধরে কিছুটা গিয়ে আবার দিক পরিবর্তন। এইরকম বিচিত্র ঘুরপথে অবশেষে বেনারস হয়ে শিলিগুড়ি। তারপর দেখা দিল দেবতাত্মা হিমালয়ের গিরিশিখর। কার্শিয়াঙে এক বছরের জন্য নজরবন্দি রাখা হল সুভাষকে। ইউরোপে গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে। পরীক্ষার জন্য তাঁকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে দেখানো দরকার। শেষ পর্যন্ত ১৭ মার্চ, ১৯৩৭ ব্রিটিশ তাঁকে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিল।

এরপর পাঁচ মাস বিশ্রাম। পঞ্জাবে ডালহৌসিতে চলে গেলেন তিনি। ভিয়েনায় চিঠি যায় আসে অতি গোপনে। এদিকে দেশের রাজনীতি সুভাষের প্রতীক্ষায় রয়েছে। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের ফলে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসে ক্ষমতায় এসেছে। ফৈজপুর কংগ্রেস শেষ হল। ফৈজপুর কংগ্রেসেও জওহরলালই সভাপতি। সভাপতির অভিভাষণে তিনি আবার সুভাষ প্রসঙ্গ তুলে বললেন, 'কংগ্রেস তার পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের এই বীর সহকর্মী, যার কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা, তার সাহচর্য থেকে আমরা এক বছর বঞ্চিত। আওয়ার কমিটি হ্যাজ বিন ডিপ্রাইভড অফ হিজ কাউন্সেল অ্যান্ড আই হ্যাভ মিসড থ্রু আউট দ্য ইয়ার দিস ব্রেভ কমরেড অন হুম উই অল কাউন্টেড ভেরি মাচ।'

নতুন করে দামামা বাজল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে কলকাতায় শরৎচন্দ্রের বাড়িতে। রাজনীতিতে সুভাষ আবার ফিরে আসায় এক নতুন চেতনা জেগে উঠছে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের কয়েকদিন আগেই জওহরলাল, ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মীকে নিয়ে শরৎবাবুর বাড়িতে এসে উঠলেন।

জওহর সুভাষকে বললেন, 'তুমি অনেক সময়ই কোনওরকম রাখঢাক না করে একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দাও— সেটা ঠিক আছে। তাই বলে গাঁধীজিকে 'বাতিল হয়ে যাওয়া আসবাব'— গাঁধী ইজ আউটডেটেড পিস অফ ফার্নিচার বলা—আর সে বলাটাও নিজেদের মধ্যে নয়, একেবারে বিবৃতিতে এবং সারা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে বিবৃতিতে!'

নিজের বিবৃতির ভাষা মনে পড়ে সুভাষ লজ্জিত হন। জওহর হেসে বললেন, 'এরকম দুঃসাহস আমার কস্মিনকালেও হবে না।' বেশ খানিকক্ষণ সুভাষের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে জওহর বললেন, 'তোমার সবকিছুই বড্ড বেশি, সুভাষ। যেমন রাগ তেমনি অনুরাগ। সত্যি কথা যদি বলি, তোমার দেশের প্রতি ভালবাসারও কোনও তুলনা নেই।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুভাষ বললেন, 'আমি জানি। রাগটা আমার বড় বেশি।'

'সামর্থ্যও বেশি, সেটাও মানতে হবে।' বলে জওহরলাল এবার হাসলেন একটু।

রাত্রে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া হল। নিজের শোবার ঘরে খাওয়ার আগে বিজয়লক্ষ্মী জওহরলালের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কাছে পিঠে কেউ নেই দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'দাদা, বাবা তোমাকে মিছিমিছি সতর্ক করতেন না।'

'মানে?'

'সুভাষবাবুর সঙ্গে তোমার বেশিদিন জমবে না।'

'তুই একটা পাগল। গত দশ বছর ধরে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু সুভাষ।'

'সো হোয়াট? অল সেইড অ্যান্ড ডান সুভাষ ইজ সুভাষ! সুভাষ সুভাষ-ই।'

দুদিন পরেই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে। নেহরু তো আগেই এসেছেন বাকি সদস্যরাও আসছেন। এই সঙ্গে গাঁধীজিও এ বাড়িতে আসবেন। সুভাষ দারুণ খুশি।

গাঁধীজি এসে এখানেই থাকবেন সেটা ধরে নিয়ে গত কয়েকদিন যাবৎ বসুবাড়িতে প্রস্তুতি চলছে। তাঁর সেবায় যেন কোনও ত্রুটি না থাকে তার জন্য বিভাবতী আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সোদপুর আশ্রমের কর্মীদের, গাঁধীজির ভক্ত অনুগামীদের কাছে গাঁধীজির পছন্দ অপছন্দের কথা জেনে নিয়েছেন তিনি। সেই অনুযায়ী একটা লিস্টও তৈরি হয়েছে। গাঁধীজিকে রোজ বাড়িতেই দেখতে পাওয়া যাবে ভেবে সুভাষ-জননীও দারুণ খুশি।

বিভাবতী গাঁধীজির জন্য বাড়ির দোতলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছেন। দোতলাতেই বড় হলে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে। তা ছাড়া গাঁধীজির প্রার্থনাসভার জায়গা যদি কম পড়ে তার জন্য চারতলার ছাদও রয়েছে।

গাঁধীজিকে নিয়ে গাড়ি পৌঁছনোর সঙ্গে হইচই পড়ে গেল। বসুপরিবারের সবাই দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে স্বাগত জানাতে। ক্ষীণ দেহ, হাড়গুলো গুনে ফেলা যায়, সামনের দাঁত পড়তে শুরু করেছে। গাঁধীজির সমস্ত শক্তি যেন সংহত হয়েছে তাঁর চশমার ফ্রেমের পেছনের দুটি উজ্জ্বল চোখে।

ভেতরে বৈঠকখানায় জাজিমের ওপর বসলেন গাঁধীজি। সবাই ভিড় করেছে তাঁর আশেপাশে। গাঁধীজি সবার আগে মায়ের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। কস্তুরবা বসলেন তাঁর পাশে। কুশল সংবাদ শেষ হলে মা-জননী বললেন, 'বাপুজি, আমার সুভাষের ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।'

'তার জন্য ওকে বিপ্লবীদলের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে হবে।'

চটজলদি সুভাষও জবাব দিলেন, 'সবচেয়ে বিপজ্জনক বিপ্লবী তো আপনি নিজে।'

ঘরে হাসির রোল উঠল।

সে বিকেলটা গাঁধীজি বাচ্চাদের সঙ্গে যেন বাচ্চা হয়ে কাটালেন। গল্পটল্প শেষ হলে সুতো কাটা শুরু হল। গাঁধীজির সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই, প্যারেলাল, ড. সুশীলা নায়ার আর কনু গাঁধীরা গাঁধীজির জন্য সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিতে লাগলেন। গাঁধীজি নিজে খুব খুশি। তবে তাঁর খাদি পরা জাঁদরেল চেহারার সঙ্গীরা ভীষণ ব্যতিব্যস্ত। তাঁদের তাগাদা আর মন্তব্যের শেষ নেই।

গাঁধীজির কী কী চাই বা চাই না তার ফিরিস্তি মহাদেব দেশাই নতুন করে দিতে লাগলেন।

'ভাল করে বুঝে নিন বিভাবতী দেবী। সিম, বেগুন, বরবটি, ভেজানো মুগ, চার সের রাঙাআলু, পাঁচ ছয় ডজন কলা, দু কিলো ঘি, দু কিলো মাখন...।'

'ওরে বাবা। এ তো গোটা বাজারটাকেই উঠিয়ে আনতে হবে!' ছোট্ট অমিয় মাঝখান থেকে বলে বসল।

'চুপ কর।' বিভাবতী ধমকে উঠলেন তাকে।

'সেটা সত্যি। বাজারটাকেই উঠিয়ে আনতে হবে।' মহাদেব দেশাই বললেন।

'কোনদিন কোন সবজি উনি খাবেন, আগের দিন জানতে পারলেই হবে।'

'ধুর, এত দিন বাপুজির সঙ্গে দিনরাত রয়েছি এখনও বুঝতে পারলাম না কখন উনি কী চেয়ে বসবেন।' মহাদেব দেশাই স্পষ্টই বলে দিলেন।

খাবার জিনিসের ব্যাপারে জানা গেল। তবে শরৎবাবুর এক ভাইপোর তরকারির বাজারে দোকান আছে। তাই সে ব্যাপারে খুব একটা চিন্তার কিছু নেই।

'শরৎবাবু ছাগলের দুধের কী ব্যবস্থা করেছেন? দেখুন ছাগল কিন্তু আমার সামনেই দোয়াতে হবে। আমার একটা খাস পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিতে পরীক্ষা না করলে বাপুজি কিন্তু এক ফোঁটা দুধও খাবেন না।'

'ঠিক আছে একটা ছাগল নিয়ে আসছি।' শরৎ বললেন।

'একটা নয় বেশ কয়েকটা। কম সে কম দশ বারোটা ছাগল এনে বেঁধে রাখুন। তারপর কী করতে হবে আমি বলে দেব।'

গাঁধীজির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা শুনে বিভাবতীর দম আটকে আসার অবস্থা। শরৎবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'সরোজিনী নাইডু ঠিকই বলেছিলেন। গাঁধীজিকে রাখা একটা বিশাল খরচের ব্যাপার।'

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বাইরে লোকের ভিড়ও বাড়ছে। 'গাঁধী মহারাজ কী জয়', 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে চারদিক মুখর। 'বাপুজি বাইরে আসুন', 'বাপুজি আমাদের দর্শন দিন' বারবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আজ সন্ধ্যার প্রার্থনার একটু দেরি হয়ে গেছে। গাঁধীজি স্থির করলেন প্রার্থনাসভাতেই তিনি সবার সঙ্গে দেখা করবেন। গেট খোলা হল। হুড়োহুড়ি করে সবাই ছাদে গিয়ে ভিড় করল। জনতা একেবারে যাকে বলে, 'নানা জাতি, নানা মত, নানা পরিধান।' মা গিয়ে সবার আগে কস্তুরবার পাশে বসলেন। প্রার্থনার আগে গাঁধীজির ভাষণ শুরু হল। সরু গলায় আস্তে আস্তে বলেন তিনি কিন্তু লোকের মন স্পর্শ করে। তাঁর বক্তৃতায় কোনও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য নেই, নেই কোনও নাটকীয়তা। অনেকটা যেন দাদু নাতিনাতনিদের

গল্প বলছেন এরকম ভাব। একেবারে ঘরোয়া ভঙ্গি তাঁর। বক্তৃতা শেষ হলে মৃদঙ্গ-পাখোয়াজের বোলে শুরু হল গান।

রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম,
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান।

প্রার্থনার সময়েই শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে গাঁধীজির ছেলে দেবদাসও আছেন। তিনি বিড়লার কাছেই চাকরি করেন। বিড়লাজি আর মহাদেবভাইয়ের অন্তরঙ্গতা সবারই জানা। সামনে মহাদেবভাইকে পেয়ে একেবারে খলবল করে উঠলেন ঘনশ্যামদাস, 'আরে মহাদেব! আমার রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি ছেড়ে এ কোথায় এসে উঠেছ তোমরা?'

'শেঠজি এটা তো চার মাস আগে থেকেই স্থির ছিল।'

'তাতে কী হয়েছে? গাঁধীজির সেবায় আমাদের কি কোনও ত্রুটি হয়েছে?' কী যে বলবেন মহাদেব ভেবে পান না। শেঠজি বাপুজির খুব কাছের মানুষ। মহাদেবের সেটা ভাল করেই জানা। গাঁধীজির মুখপত্র 'হরিজন' বিড়লাজির দাক্ষিণ্যেই প্রকাশিত হয়।

'তোমরা আমার ঘরের লোক। আমাদের শহরে এসে উঠলে কি না বোসবাড়িতে। আর গোলটেবিল বৈঠকে শিল্পপতিদের প্রতিনিধি হিসেবে একলা আমিই ছিলাম।'

'হ্যাঁ। কিন্তু...'

'লন্ডনে পর্যন্ত আমাকে ছাড়া বাপুজির এক মুহূর্ত চলত না। আর এখানে এসব কী লাগিয়েছ তোমরা?'

বিড়লা আর দেবদাস গাঁধীজির কাছে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা বলে বেরোবার সময় মহাদেবভাইকে বলে গেলেন, 'আমার আপত্তি আমি বাপুজিকে জানিয়েছি। দু-একদিনের মধ্যে এখানকার পাট চুকিয়ে আমার হাভেলিতে চলে এসো।'

মহাদেবভাই আর বিড়লাজির ফিসফিস শরৎ দেখলেন। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি কলকাতার বিশাল মাড়োয়ারি সমাজের অনেকেরই পছন্দ নয়। বসুবাড়ির দুই ভাই হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর দুই প্রধান প্রবক্তা। উল্টোদিকে বিড়লাজি কলকাতার, মাড়োয়ারি সমাজের মুকুটমণি। বিড়লার ক্ষমতা ভালমতোই জানেন শরৎবাবু। একই সঙ্গে গাঁধীজি আর ভাইসরয় দুজনের সঙ্গেই দহরম মহরম তাঁর।

গাঁধীজির দর্শনার্থীদের হইচইতে বসুবাড়ি কাকভোরেই জেগে ওঠে। সকালের প্রার্থনাসভায় প্রচণ্ড ভিড় হয়। বাড়িতে যেন দুর্গোৎসবের ধুমধাম। পনেরো-ষোলোটা ছাগলের দড়ি ধরে বাইরে এক গয়লা দাঁড়িয়ে আছে। ছাগলগুলো পরিত্রাহি ব্যা ব্যা করে চলেছে। সকাল নটা বাজলে মহাদেবভাই নীচে নামলেন। তাঁর 'বিশেষ পদ্ধতি'তে ছাগলগুলো যাচাই করার জন্য তিনি একবার ডাইনে থেকে বাঁয়ে আবার বাঁয়ে থেকে ডাইনে ঘুরতে লাগলেন। ছাগলগুলোর চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে কী যেন দেখেন তিনি। শেষে একটা ছাগল কানঝাড়া দিয়ে মহাদেব ভাইয়ের চোখে চোখ রেখে পা ঠুকল। ঝুঁকে পড়া মহাদেবভাই চট করে সোজা হয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'এইটার দুধ দোয়াও। বাপুজি এইরকম তেজি ছাগলের দুধই পছন্দ করেন।'

গাঁধীজির নানান খুঁটিনাটির সঙ্গে বসুপরিবারের পরিচয় হতে লাগল। একমাত্র কনু গাঁধীর হাতের রুটি খান তিনি। খাবার জিনিসের সংখ্যা ঠিক পাঁচ হতে হবে। দুপুরবেলায় ড. সুশীলা

নায়ার ইলার সঙ্গে মীরাকে পাঠালেন। শহর থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে তাঁরা নদী থেকে একেবারে মাখনের মতো মোলায়েম কাদা নিয়ে এলেন। গাঁধীজির 'প্রাকৃতিক চিকিৎসা'র জন্য এরকম মাটির প্রলেপ লাগাতে হয় পেটে আর কপালে। বৈঠকের জন্য একজন একজন করে কংগ্রেস নেতা এসে পৌঁছচ্ছেন। সর্দার পটেল এসে পৌঁছবার পর এবার কংগ্রেস সভাপতি কে হবেন তার আলোচনা শুরু হল।

অন্ধ্রের কৃষক নেতা এন. জি. রঙ্গা গাঁধীজির সঙ্গে দেখা করে সুভাষচন্দ্রকে এবারকার সভাপতি করার অনুরোধ জানালেন। বিহারের কৃষক নেতা স্বামী সহজানন্দ ভারতীও সেই অনুরোধই জানালেন। এসব জানতে পেরে আচার্য কৃপালনি রাত্রেই গাঁধীজির কাছে হাজির হলেন। তাঁর চেহারার উদ্বেগ, খাড়া নাকের সিঁটকানো ভাব, আর শরীরের ভঙ্গি দেখে গাঁধীজি আন্দাজ করলেন তাঁর শুভাগমনের হেতু। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি আসল প্রসঙ্গে আসতে চেষ্টা করেন কিন্তু গাঁধীজি পাত্তা দেন না। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে বিড়লাবাড়িতে তাঁর থাকার জায়গায় ফিরে গেলেন তিনি।

গাঁধীজি আর নেহরুর উপস্থিতিতে বসু বাড়ির সবাই সন্ত্রস্ত। কিন্তু একজন সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা বাড়িতে। তিনি হলেন দ্য গ্রেট রয়্যাল বার্বার হরিচরণ দাস। গাঁধীজির আসার পনেরো দিন আগে থেকেই শরৎবাবুর কাছে আর্জি জানিয়ে রেখেছেন তিনি। এবার স্বয়ং গাঁধীজির মাথায় হাত দিতে পারবেন তিনি এই কল্পনাতেই দারুণ ফুর্তি তাঁর। অনেকগুলো পকেটওয়ালা নতুন কোট বানিয়ে সরঞ্জাম তৈরি রেখেছেন তিনি।

গাঁধীজিকে প্রথমবার কামাবার সময়ই প্রায় কেঁদেই ফেললেন হরিচরণ। গাঁধীজিকে খেউরি করার ফটো তুলিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখলেন তিনি। বেশ একটা কেষ্টবিষ্টু কর্মকর্তার ভঙ্গিতে উডবার্ন পার্কে ঘুরে বেড়ান তিনি। রাত্রে স্ত্রী অনুযোগ করেন, 'সারাদিন কোথায় থাক? আজ চারজন উকিল, দুজন ডাক্তার আর একজন জজের কাছ থেকে ডাক এসেছিল।'

রেগে উঠে স্ত্রীকে বলে উঠলেন তিনি, 'আরে আজকাল গাঁধীজি আর নেহরুর মুন্ডু ছাড়া অন্য কারও মাথায় হাত দেবার সময় কোথায়?'

'কী মুশকিল। বাইরে থেকে ডাক আসছে বললাম না?'

'আসতে দাও। সব কংগ্রেস কর্মকর্তারা আমার কাছে খেউরি করার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। এইরকম সময়ে অন্যদের কথা ভাবার সময় নেই আমার।' হরিচরণ সদর্পে উত্তর দেন।

কিন্তু এ হেন হরিচরণ গাঁধীজিকে একলা পেলেই ধীরে ধীরে ক্ষুর চালাতে চালাতে বলেন, 'বাপুজি আপনি মহাত্মা— পর্বতপ্রমাণ ব্যক্তিত্ব আপনার। কিন্তু আমাদের সুভাষবাবুও আপনার মতোই মহান। তাঁর দিকেও একটু মন দিন।' হরিচরণ দাসের এই ভাবনা বাংলার সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের মনের কথা। গাঁধীজি জানেন সেটা।

একদিন খাওয়ার সময় ঘনশ্যামদাস এসে উপস্থিত হলেন। গাঁধীজি স্বাভাবিকভাবেই তাঁকেও খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। শরৎবাবুও খেতে বসেছেন সবার সঙ্গে। শরৎ মহাদেবভাইকে কিছু বলছিলেন। বিভাবতী পরিবেশন করছেন। ঘনশ্যামদাস গাঁধীজিকে কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিভাবতীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। অস্থির পায়ে ভেতরে চলে গেলেন তিনি। আর ফিরে এলেন না। খাওয়া শেষ হতেই রান্নাঘরে গেলেন শরৎবাবু। সেখানে দাঁড়িয়ে বিভাবতী চোখ মুছছেন। শরৎবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বললেন বিড়লা শেঠ?'

'উনি জিজ্ঞেস করলেন, তরকারিগুলো টাটকা তো? তাও গাঁধীজির সামনে।'

যেমন করেই হোক উডবার্ন পার্কের বাড়ি থেকে গাঁধীজিকে নিয়ে যাবার চেষ্টার কথা বুঝে

শরৎবাবুর ঝাঁকুনি লাগে। তিনি জওহরলালকে মুখের ওপর বলে দিলেন 'কোটিপতির এই ভিখিরিপনা দেখতে ভাল লাগে না।'

পরের দিন দেবদাস এলেন গাঁধীজির কাছে। বললেন, 'বাপু, আমার মনে হয় আপনার বিড়লা পার্কে গিয়ে থাকাই ভাল।'

'কেন?'

ঠিক পেছন থেকে জওহরের গলা পেয়ে চমকে উঠলেন দেবদাস।

'দেবদাস, প্রত্যেকবার গাঁধীজিকে বিড়লা পার্কেই থাকতে হবে এটাই আইন করে দিয়েছেন নাকি বিড়লাজি।'

জওহরের কথায় গাঁধীজি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি হাসলেন।

৬

বৈঠকখানায় পণ্ডিত দ্বিবেদি চিন্তাগ্রস্তভাবে বসে রয়েছেন। তাঁর মোটাসোটা শরীরটাকে সকৌতুকে লক্ষ করছেন সত্যরঞ্জন বক্সি। ভাল করে হিন্দি শেখার জন্য সুভাষ পণ্ডিতজিকে ঠিক করেছেন। কয়েক মাস আগে নাগপুরে সুভাষের একটা বিশাল সভা হয়ে গেছে। সেই সভায় সুভাষ বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছেন একমাত্র ভাষার জন্যই তিনি হিন্দিভাষীদের থেকে কতটা দূরে থেকে গেছেন। সেই সভাতেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, 'আগামী বছর আমি আবার যখন নাগপুরে আসব, হিন্দিতেই আমার বক্তব্য শুনতে পাবেন আপনারা। দোভাষীর মাধ্যমে নয়। সরাসরি আমার কাছ থেকে।'

প্রত্যেকদিন কাজের চাপে সময় পান না সুভাষ। কিন্তু তাঁর শিক্ষক নির্বাচন একেবারে নির্ভুল। গুরুও একেবারে নাছোড়বান্দা।

পণ্ডিত দ্বিবেদির হিন্দি অসাধারণ ভাল। সুভাষের বাঙালি উচ্চারণে কষ্ট পান তিনি। ষাট পেরিয়েছেন দ্বিবেদিজি।। অনেক অভিজ্ঞতা তাঁর। সুভাষকে স্কুলের ছাত্রের মতো ভেবে নিয়ে শেখাতে চান তিনি। আজ দ্বিবেদিজি একটু বেশিই অস্থির। বক্সি তাঁকে মজা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'পণ্ডিতজি আপনার ছাত্র কী বলে?'

'সময় কোথায় তার! দায় পড়েছে তার পড়াশোনার দিকে নজর দিতে। উঠতে বসতে শুধু রাজনীতি।'

'ভাগ্য ভাল তাঁর যে আপনি এখনও ছড়ি হাতে নেননি।' সত্যরঞ্জন খোঁচালেন।

'দেখুন গুরুজনদের সঙ্গে ঠাট্টা করবেন না।' বেজায় রেগে গেলেন দ্বিবেদিজি। 'শিক্ষক শব্দের অর্থ বোঝেন আপনি? শিক্ষক সমাজের ভিত্তিস্তম্ভ। ইংল্যান্ডের সম্রাটই হোন আর ফ্রান্সের রাজাই হোন কার কাছে শিখেছেন তাঁরা? আমার মতো কোনও শিক্ষকের কাছেই তো, নাকি? এই যে আপনি, আমার মতো কোনও শিক্ষকই তো আপনাকে দিগগজ করে তোলার গোড়াপত্তন করেছিলেন, নাকি?'

সেই সময় সুভাষ আর জওহরও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য নীচে নেমে এলেন। পণ্ডিতজির অগ্নিদৃষ্টি তাঁর চোখ এড়াল না। গুরুকে বিনীতভাবে বললেন তিনি, 'পণ্ডিতজি ক্ষমা করে দিন। কাল রাত্রে একদম সময় পাইনি। আজও পড়া তৈরি হয়নি।' দ্বিবেদি সুভাষের সামনেই ড্রাইভার আমিনকে বললেন, 'এই হিন্দি বইগুলো নাও। সুভাষ গাড়িতে বসলেই তার হাতে দেবে। কালকের পড়াও হয়নি। আজকেও যদি পড়া না হয়

তবে সাহেবকে কিছু না বললেও তোমার কান মুলে দেব আমি। বুঝতে পারলে?'

'সুভাষ হিন্দির হাত থেকে তোমার আর নিস্তার নেই।' জওহরলাল হেসে বললেন।

এসময় জওহর-সুভাষের দারুণ বন্ধুত্ব। এতদিন ভোগান্তির পর জওহরলাল চান, সুভাষই কংগ্রেস সভাপতি হোন। ১৯৩৫-এর ভারত-শাসন আইনের ফলে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা আইনসভায় ঢোকার জন্য উদ্‌গ্রীব। অন্যদিকে অচ্যুতরাও পটবর্ধন, আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি, এস. এম. জোশি, এন. জি গোরে প্রমুখ তরুণ নেতারা সমাজবাদী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। উত্তর ভারতে স্বামী সহজানন্দ ভারতী, অন্ধ্রে এন. জি. রঙ্গার নেতৃত্বে কৃষকরা সংগঠিত হচ্ছে—কৃষক আন্দোলন দানা বাঁধছে। এরকম সময় সুভাষচন্দ্রের মতো প্রগতিশীল চিন্তাধারার তরুণ নেতা যদি কংগ্রেসের সভাপতি হন তো বামপন্থীদের পক্ষে মঙ্গল।

এলগিন রোডের বাড়িতে চারদিন ধরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলছে। কে সভাপতি হবেন তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। শেষদিন রাত্রে গাঁধীজি সর্দার পটেলকে একলা তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

'সর্দার তোমার কী মনে হয়। সুভাষ আজ পর্যন্ত যে কষ্টভোগ করেছে, যে যোগ্যতা প্রমাণ করেছে—তার পুরস্কার তার এবার পাওয়া উচিত?'

সর্দার পটেল হেসে বললেন, 'বাপুজি, প্রত্যেক বছর কংগ্রেস সভাপতি কে হবেন, সেটা টিলকের মৃত্যুর পর থেকে আপনিই স্থির করে আসছেন। আপনি যা বলবেন তাই হবে।' সর্দার পটেলের সঙ্গে সুভাষের এমন কিছু রেষারেষিও ছিল না। বারদোলি আর ডান্ডি যাত্রার সময় সুভাষ জেলে ছিলেন। কিন্তু বিঠ্‌ঠলভাইয়ের উইল নিয়ে অশান্তির সূচনা হয়েছিল। আচার্য কৃপালনি তো একান্তে বলেই দিলেন, 'বিঠ্‌ঠলভাইয়ের মৃত্যুশয্যায় সুভাষই কাছে ছিল। উইলে সই করার সময় বিঠ্‌ঠলভাই প্রায় অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এই সই করার পেছনে বাঙালি জাদুর খেলা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' সর্দার পটেল বিঠ্‌ঠলভাইয়ের সম্পত্তির ব্যাপারে তেমন কিছু মনে করেননি। তবে গাঁধীজিকে 'বাতিল আসবাব' বলায় প্রচণ্ড আহত বোধ করেছিলেন।

গাঁধীজি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'তোমাকে সত্যি কথা বলছি সর্দার। সুভাষের মতো সংগ্রামী দেশভক্তর এর আগেই, একবার কেন—দু'বার কংগ্রেস সভাপতি হওয়া উচিত ছিল। আমিই সেটা ঠেকিয়েছি। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে আর কাউকে সভাপতি করা সম্ভব না—হাউ এভার দেয়ার ইজ নো বডি বাট হি হু ক্যান বি দ্য প্রেসিডেন্ট—কিন্তু—'

'আপনি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছেন, তখন আর চিন্তা করছেন কেন?' সর্দার প্রশ্ন করলেন।

'তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না সর্দার। কাল রাতে আমি দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। এখনও চোখ জ্বালা করছে আমার। আধোঘুমে রাত কেটেছে।' গাঁধীজি বসে বসেই ভাঁজ করা পা একবার সোজা করে নিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার হাঁটু মুড়ে বসলেন। কেমন একটা হতাশার সঙ্গে বললেন, 'সুভাষ আজন্ম বিদ্রোহী। তার ওপরে আমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই—আই হ্যাভ অবজারভ্‌ড দ্যাট সুভাষ ইজ নট অ্যাট অল ডিপেন্ডেবল। আমার ভয়, আমার অস্বস্তি শুধু এইজন্য যে আমি তার উত্থান ঠেকাতেও পারব না আবার তাকে আমার রাস্তায় চালাতেও পারব না।'

৭

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যেরা ডেরা বেঁধেছেন বিড়লা পার্কে। সর্দার পটেল আর রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে ঘনশ্যামদাসজি বসে গল্পগাছা করছেন। একটু পরে হনহন করে আচার্য কৃপালনি এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর কালো রং আরও কালো দেখাচ্ছে। মনের মধ্যে কী যেন অশান্তি। অবশ্য ওপরে ওপরে শান্তই দেখাচ্ছে তাঁকে।

'যাই বলুন সর্দার, সুভাষ সভাপতি হলে আচার্যজির তাঁর অধীনে কংগ্রেস সম্পাদকের দায়িত্ব সামলানোটা একটা দর্শনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।' রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন।

'কী? সেক্রেটারির কাজ কি আমি জানি না? গত চার বছর কংগ্রেসের সাংগঠনিক দিকটা তো আমিই সামলেছি। জওহরও তো তার মধ্যে দু'বছর সভাপতি ছিল।' ফরাস থেকে একটা তাকিয়ে বাগিয়ে নিয়ে আচার্য একটু সামনে ঝুঁকলেন। সর্দার আর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'এসব কী করছেন আপনারা? এমন একজন লোক, উঠতে বসতে যার গাঁধীজির সমালোচনা না করলে পেটের ভাত হজম হয় না, তিনিই আজ কংগ্রেস সভাপতি হতে চলেছেন। এটাকে কী বলবেন আপনারা?'

'বাপুজি নিশ্চয় ভেবেছেন এ ব্যাপারে।' রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন।

'এ আবার কীরকম ভাবা? তিনি মহাত্মা। যাঁর ওপর দয়া হবে, পরনের ধুতিটাও দিয়ে দেবেন তাঁকে। তাই বলে আমরা চুপ করে থাকব?' কৃপালনির প্রত্যেকটা কথা থেকে আক্ষেপ ঝরে পড়ছে।

'বাপুজি সুভাষকে সভাপতি করতে চেয়ে মহত্ত্ব দেখিয়েছেন।' সর্দার বললেন।

'সর্দার, যে ধরনের ব্যাপার-স্যাপার আমাদের চোখের সামনে একবার নয় বারবার ঘটেছে সেগুলো আমরা কী করে ভুলব? কী কলকাতার অধিবেশন, কী লাহোর কংগ্রেস, কী করাচির সেই তামাশা! যেখানে সেখানে এই লোকটি বাপুজির অপমান করেছে। এখন চলেছে সভাপতি পদে বসতে! গাঁধীজির অপমান সারা দেশের অপমান—আমরা কিছুতেই সহ্য করব না সেটা।'

সর্দার আর প্রসাদ বুঝে গেলেন যে কৃপালনি নিজের সিদ্ধান্তে একেবারে অনড়। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বেশ ভালরকম ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

'ছি ছি! একটা ফ্যাসিস্ট—যে কিনা বারবার মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করে...।'

'আচার্যজি। ভুলবেন না গাঁধীজিও মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করেছিলেন।' সর্দার বললেন।

'তাই বলে গাঁধীজি নিজে ফ্যাসিস্ট নন। কোথায় গাঁধীজির মহান ব্যক্তিত্ব আর কোথায় এই হিংসার পূজারি। ব্রিটিশ সরকারের তো আর মাথা খারাপ হয়নি যে বারবার এমনি এমনি সুভাষকে জেলে ভরবে। নিশ্চয়ই প্রমাণ আছে তাদের হাতে।'

'বাদ দিন আচার্যজি।' রাজেন্দ্রপ্রসাদ বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'লাহোরে কি জওহরকে সভাপতি করেননি বাপুজি? সুভাষও একবার তখ্‌তে বসলেই ঠান্ডা হয়ে যাবে। আমার মনে হয় গাঁধীজি এরকমই ভাবছেন।'

'লিখে রাখুন আপনারা। কার সম্বন্ধে কী বলছেন? দেখবেন এতে আগুন আরও বেশি করে জ্বলে উঠবে।' আচার্য কৃপালনি ছাতি ঠুকে বলে ওঠেন।

বহুদিন ধরেই কৃপালনির গাঁধীজির অন্তরঙ্গ মহলে আনাগোনা। অনেক বছর তিনি গুজরাত বিদ্যাপীঠে ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপনা করেছেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল। তাঁর বন্ধুরা বলেন, 'ইংরেজদের ওপর তাঁর যত রাগ, ইংরেজির ওপর ঠিক ততটাই ভালবাসা।'

সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদের এক বৈষ্ণব পরিবার থেকে আসা কৃপালনির ধারাল বুদ্ধি আর আরও ধারাল জিভ-এর খ্যাতি আছে।

'সুভাষ আগে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা স্পষ্ট করুন তারপর কংগ্রেস সভাপতি হবার স্বপ্ন দেখুন।' সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কৃপালনি বললেন। গাঁধীজির কাছে এ খবর পৌঁছবার দিনেই কৃপালনি হাজির হলেন তাঁর কাছে। অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক চেষ্টা করে যখন দেখলেন গাঁধীজি বিষয়টি উত্থাপন করছেন না তখন নিজেই বললেন, 'বাপুজি, সভাপতি নির্বাচন নিয়ে বাইরে নানান কথা বলাবলি হচ্ছে।'

'আপনি নিজে এ ব্যাপারে যদি বেশি কথা না বলেন তা হলে সব কথা আপনিই বন্ধ হবে।' গাঁধীজির কথায় প্রচণ্ড আহত বোধ করে আচার্য বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

কলকাতা থেকে ফেরার পথে কৃপালনিকে চুপচাপ দেখাচ্ছে। সর্দার পটেল তাঁকে বললেন, 'কেন যে বাপুজি এ সিদ্ধান্ত নিলেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কোন সিদ্ধান্ত?'

'সুভাষকে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি করার সিদ্ধান্ত। বুঝতে পারছি না এটা কি সুভাষকে বড় করা না ব্রিটিশ সরকারকে ইশারা দেওয়া!'

৮

'সুভাষ ওয়ার্ধা থেকে ফিরেছে?' শরৎবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ। আজ সকালেই এল।' বিভাবতী বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে নাইট গাউন পরা অবস্থাতেই শরৎ সুভাষের ঘরে এলেন। সুভাষ দাড়ি কামাচ্ছিলেন। তাঁকে বেশ প্রসন্ন দেখে শরৎবাবুও স্বস্তি বোধ করলেন। গাঁধীজির সব মাতব্বর অনুগামীদের সঙ্গে কংগ্রেস চালানো যে কতটা কঠিন সেটা ভালমতোই জানেন মেজদা। তাই সুভাষের সভাপতির অভিভাষণ সম্পর্কে গাঁধীজির সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়ার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। জওহরলালেরও একই পরামর্শ। তাঁর জন্যই ওয়ার্ধা গিয়েছিলেন সুভাষ।

'গাঁধীজি কী বললেন?'

'পুরো খসড়াটা দেখে খুশি মনেই হাসলেন তিনি।'

'তার মানে তুই লড়াইটা অর্ধেক ফতে করেছিস।' মেজদাও খুশি মনে বললেন।

বাইরের ঘরে ভিড় বাড়ছে। পণ্ডিত দ্বিবেদির গলা পাওয়া যাচ্ছে। দু'মাস আগে কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনের পর সুভাষকে বিদেশ সফরেও যেতে হয়েছিল। এক ফাঁকে ব্যাডগেস্টাইনে গিয়ে প্রিয়তমা এমিলিকেও দেখে এসেছেন তার মধ্যেও পণ্ডিত দ্বিবেদির মোটাসোটা চেহারা আর কড়া নজরের কথা সবসময় মনে থাকত তাঁর। হিন্দি-উর্দু ভাল করে শেখার জন্য রাতের পর রাত পরিশ্রম করেছেন সুভাষ।

কিছুক্ষণ পর কয়েকজন গুজরাতি ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সম্প্রতি হরিপুরায় ঘুরে এসেছেন। তাঁদেরই একজন বললেন, 'দশেরার সময় বল্লভভাই গাঁধীজিকে হরিপুরার জায়গা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। লোকালয়ের বাইরে চারশো একর জমিতে ছিল শুধু কাঁটাগাছের জঙ্গল। কিন্তু গত তিন-চার মাসের অক্লান্ত চেষ্টায় সর্দার একেবারে ভানুমতীর খেল দেখিয়েছেন। আপনার দেখে তাক লেগে যাবে।'

'হরিপুরা আসলে তাপ্তি নদীর ধারে একটা ছোট্ট গ্রাম। রাস্তা কাঁচা, বিদ্যুৎ আসেনি। নদীর ওপর

পুল ছিল না। কিন্তু সর্দার পটেল নদীর ওপর একটা অস্থায়ী কাঠের পুল তৈরি করিয়েছেন। অনেকটা দূরের আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির সহযোগিতায় বিদ্যুৎও আনা হয়েছে।'

হরিপুরা থেকে রোজ জোরদার প্রস্তুতির খবর এসে পৌঁছচ্ছে। সেখানে পৌঁছনোর জন্য সুভাষও অধীর। রওনা হওয়ার আগের রাত্রে সুভাষ কতকগুলো নোট লেখা কাগজ হাতে শরতের ঘরে এলেন। মেজদা, আমার মনে হচ্ছে আমার ভাষণে আরও কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ থাকা দরকার। যেমন দেশীয় রাজ্যগুলোর আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, রাশিয়ার মতো ভারীশিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা আর ফ্যামিলি প্ল্যানিং।'

'কিন্তু যে-সব প্রসঙ্গে বিতর্ক রয়েছে সেগুলো আগে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেওয়া দরকার।' শরৎবাবু পরামর্শ দেন।

'না মেজদা। গত দু-তিন রাত আমি এ নিয়ে ভেবে ভেবে কাটিয়েছি। মন যাতে সায় দেয় না সে বিষয়ে ভান করার কী দরকার? এ সব বিষয় যদি আমি উত্থাপন না করি তবে সেটা হবে আত্মপ্রতারণা, আদর্শের সঙ্গে আপস। যে আদর্শের জন্য আমি সারাজীবন লড়ছি, ভাষণে তার উল্লেখ করা আমার একান্ত কর্তব্য।'

'ঠিক আছে।' মেজদা সম্মতি দেন।

'তা ছাড়া কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অনুমোদনটাও প্রয়োজন মনে করি আমি।'

'সুভাষ ইউ আর ফার টু ইনোসেন্ট। বড্ড ছেলেমানুষ তুই।' এই প্রথম সুভাষকে শরৎ এভাবে বললেন। 'সুভাষ, কংগ্রেসের সমাজবাদী গোষ্ঠীর রামমনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ যুব নেতারা সবসময় জওহরলালকে ঘিরে থাকেন। কিন্তু জওহরলালকে গাঁধীজির কাছে তাদের জন্য বলতে তুই কখনও দেখেছিস? গাঁধীজির কাছে একমাত্র কংগ্রেসই প্রিয়। কংগ্রেস এক হয়ে থাকুক এটাই মনেপ্রাণে চান তিনি। এসব গোষ্ঠী, দল আদপেই পছন্দ করবেন না তিনি। খামোখা নিজের ওপর এ আগুন টেনে আনিস না তুই।'

'ঠিক আছে মেজদা।' সুভাষ মাথা হেলালেন।

হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য রওনা হওয়ার দিন এসে পড়ল। কংগ্রেস সভাপতির মতো সম্মানের পদ ভারতে আর দুটি নেই। চল্লিশ পেরোতে না-পেরোতেই সুভাষ পেলেন এই সম্মান। পূর্বপুরুষদের প্রণাম জানিয়ে, বয়োজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ নিয়ে, ঠাকুরঘরে প্রণাম করে সুভাষ রওনা হলেন। যাবার পথে একটু ঘুরে দেশবন্ধুর বাড়িতে (যেখানে তখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদন) গিয়ে গুরুর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে হাওড়ার রাস্তায় চললেন।

সদলবলে কংগ্রেস সভাপতি বোম্বাই মেলে হরিপুরা যাবেন সবাই জানে। স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড়। ট্রেনের অনেক কামরা স্বেচ্ছাসেবক আর স্বেচ্ছাসেবিকাতে ভরতি। সেকেন্ড ক্লাসের যে কামরায় সুভাষ যাবেন সেটা ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা আর রং-বেরঙের ঝালরে সাজানো। কামরায় মা প্রভাবতী, মেজবউদি, মেজদা, বাসন্তী-মা ছাড়াও সুভাষের অনেক ভাইপো, ভাইঝি, আত্মীয় বন্ধু বসে আছেন। কামরা একেবারে ঠাসাঠাসি। এর আগেই কয়েকজন হরিপুরায় রওনা হয়ে গেছেন। ট্রেন চলতে শুরু করতেই, প্ল্যাটফর্মের বিশাল ভিড় থেকে শ্লোগান দেওয়া শুরু হল 'সুভাষবাবু কী জয়', 'মহাত্মা গাঁধী কী জয়', 'বন্দেমাতরম্।'

ট্রেন দূরে চলে গেছে, তখনও আওয়াজ উঠছে স্টেশনে। রাস্তার সব স্টেশনেই লোকের ভিড়। ট্রেন থামলেই প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম শ্লোগানে মুখর। হাসিমুখে সুভাষ মালা, ফুলের তোড়া গ্রহণ করছেন। প্রতিটি জায়গায় সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি জনতাকে আহ্বান জানাচ্ছেন, স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য কোমর বেঁধে তৈরি থাকতে।

দাদারে যখন গাড়ি পৌঁছল স্টেশন তখন লোকে লোকারণ্য। ব্যারিস্টার নরিম্যান, সেনাপতি বাপট প্রমুখ নেতারা সুভাষের কংগ্রেস সভাপতি হওয়ায় আনন্দে অধীর।

আগেই জানা ছিল যে অধিবেশনের উপস্থিতি লাখ ছাড়িয়ে যাবে। অভ্যাগতরা যাতে খাঁটি দুধ পেতে পারেন তার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে পাঁচশো গোরু কেনা হয়েছে। আগে একটা চিঠি পোস্ট করতে পনেরো মাইল হাঁটতে হত। অভ্যর্থনা সমিতি অস্থায়ী ডাকঘরের ব্যবস্থা করেছে। উধনা স্টেশনে বিশাল একটা ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছেন সর্দার পটেল আর দরবার গোপাল দাস। সুভাষ গাড়ি থেকে নামতেই সর্দার পটেল তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললেন। সুভাষ এর আগে অনেক অধিবেশন দেখেছেন। কিন্তু এমন সুন্দর সাজানো, এত সুচিন্তিত প্রস্তুতি আর একটা ছোট্ট গ্রামে এরকম প্রচণ্ড উৎসাহ আগে কখনও দেখেননি। এটা কংগ্রেসের একান্নতম অধিবেশন। তাই নন্দলাল বসু একান্নটি সুন্দর তোরণ তৈরি করেছেন। একটি দেশীয় রাজ্য থেকে শোভাযাত্রার জন্য একটা রথ আনা হয়েছে। সেটা টানবে একান্নটি বলদ। তিন মাস রাতদিন পরিশ্রম করে সাত হাজার স্বেচ্ছাসেবক আর চার হাজার শ্রমিক গড়ে তুলেছেন এই অধিবেশনস্থল। গোধূলি বেলায় সভাপতিকে নিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হল। শ্বেতশুভ্র খদ্দরের পোশাকে সুভাষের ব্যক্তিত্বময় প্রসন্ন চেহারা যেন আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তাঁর একপাশে দাঁড়িয়ে সর্দার পটেল, অন্যপাশে পণ্ডিত নেহরু।

'সুভাষবাবু কী জয়।'

'বন্দেমাতরম্।'

'মহাত্মা গাঁধীজি কী জয়।'

জয়ধ্বনি চলছে তো চলছেই। নন্দলালের পরিকল্পিত বাঁশের কাজ দিয়ে সাজানো অধিবেশন নগরী অস্তসূর্যের আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে। শোভাযাত্রার সামনে সামনে চলেছে ঢোল, লেঝিম, কাঠিনাচ, রাজস্থানের লোকশিল্পীরা। নৃত্য করতে করতে চলেছে স্বেচ্ছাসেবিকাদের একটা দল। সারা দেশের এই সম্মানে সুভাষের মন ভরে যায়। কিন্তু অস্তরবির রশ্মি-আভায় তিনি যেন দেখতে পান সর্বস্ব ত্যাগ করা যতীন দাস, গোপীনাথ সাহার মুখ। দেখতে পান ভগৎ সিং-এর তরুণ মুখচ্ছবি। মনে ভিড় করে আসে আজ দেশের নানা কারাগারে আটক সংগ্রামীরা।

অনেক রাত পর্যন্ত বোম্বাই আর আহমেদাবাদ থেকে ট্রেনে লোক আসতেই থাকে। দু' লাখের ওপর লোক জমা হয়েছে অথচ কোথাও কোনও অব্যবস্থা নেই। বিঠ্ঠলভাইয়ের নামে উৎসর্গ-করা এই কংগ্রেস নগরে দুটি বিশাল বাজার আর প্রায় চারশো দোকানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একসঙ্গে দশ হাজার লোক খেতে পারে এমন জায়গা রয়েছে পাঁচ-ছ'টা।

সভাপতির জন্য ফোর্ড কোম্পানি একটা বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সমস্ত প্রধান প্রধান নেতাদের জন্য আলাদা আলাদা শিবির আর তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের জন্য রয়েছে দুটি বিশাল শিবির। তাঁর শিবিরের সামনেই জওহরলালের শিবির। শুধু গাঁধীজির বিশেষ নির্দেশে তাঁর শিবিরটি বেশ খানিকটা দূরে রাখা হয়েছে।

শোভাযাত্রার পর রেওয়াজ অনুযায়ী পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান শুরু হল। ঝান্ডাচকে উপস্থিত হয়েছে দেড় লাখেরও বেশি মানুষ। পাশেই বিঠ্ঠলভাই পটেলের বিরাট তৈলচিত্র। সেই ছবিতে মালা দেওয়ার সময় সুভাষের চোখ জলে ভরে আসে। সভাপতির দায়িত্ব হস্তান্তর করার জন্য জওহরলাল মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন সুভাষের গলায়। সুভাষ জড়িয়ে ধরলেন জওহরকে। মঞ্চে বসা গাঁধীজি আর শরৎবাবুর চোখেও জল।

একদিকে বিঠ্ঠলনগরে শুরু হল নির্ধারিত অনুষ্ঠান। অন্যদিকে পুলিশদের মধ্যে প্রচণ্ড

তৎপরতা। সরকারি কাগজপত্রে যাকে 'অসংশোধনীয় অপরাধী', 'আতঙ্কবাদী', 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক নম্বর শত্রু' এইসব চোখা-চোখা অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে তিনি আজ গাঁধীজিসহ সারা দেশের নয়নমণি হয়ে উঠেছেন।

দিল্লির এক অফিসার আক্ষেপ করলেন, 'হিংসায় বিশ্বাসী এরকম একজন নেতাকে অহিংসার পূজারি গাঁধীজি এত উঁচু আসনে বসতে দিলেন—এটা একটা দারুণ দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।'

'সুভাষ যত উঁচু আসনেই বসুক, তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। এই অধিবেশনের স্মৃতিটা লোকের মনে একটু বাসি হতে দাও। তারপর আপত্তিকর বক্তৃতা দেবার অজুহাতে তাঁকে জেলে আটকাবে। খোদ হোম সেক্রেটারি এই নির্দেশ দিয়েছেন।' দিল্লি থেকে আসা আর এক অফিসার বললেন।

তারপর গোপনীয় লেখা একটা কাগজ বার করে পুলিশ কমিশনারের হাতে দিলেন।

'কী এটা?'

'রাসবিহারী বোসের চিঠি। রাসবিহারী বোস হল সেই ব্যক্তি যে দিল্লিতে ভাইসরয়ের শোভাযাত্রার ওপর বোমা ছুড়েছিল। রাসবিহারী এখন জাপানে। চিঠিটা এ মাসেই লেখা। পড়ে দেখুন।'

চিঠিটা পড়তে পড়তে কমিশনারের চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

'অহিংসা মন্ত্রে বশীভূত হয়ে যেয়ো না। বিপ্লবের পথে যদি আমাদের চিতা সাজানো হয়, জেনো সেই চিতা থেকেই একদিন আগুন ছড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘটবে, দাসত্বের শৃঙ্খল টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

এবার বোম্বাইয়ে পুলিশ কমিশনার বুঝলেন, সুভাষকে নিয়ে ভারত সরকারের এত মাথাব্যথা কেন।

অধিবেশন চলছে। সুভাষ যখন সভাপতির ভাষণ দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তখন তাঁর সামনে এক বিশাল জনসমুদ্র। সমস্ত দেশ যেন উদ্‌গ্রীব তাঁর ভাষণ শোনার জন্য। গাঁধীজির স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ভারতের একটা বিশেষরূপ। জওহরলালের স্বপ্নের ভারত আলাদা। সুভাষ স্বপ্ন দেখেন এক অখণ্ড, ধর্মনিরপেক্ষ, শক্তিমান ভারতবর্ষের। তিনজনেই নিজের নিজের স্বপ্নে বিভোর।

মাইকে হাত রেখে সুভাষ একবার গাঁধীজির দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'ভগবান করুন এই দেশ যেন অনেক অনেক বছর গাঁধীজির সাহচর্য ও আশীর্বাদ পায়।'

হাততালিতে ফেটে পড়ল সভা। আকাশ কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠল, 'মহাত্মা গাঁধী কী জয়', 'সুভাষবাবু কী জয়', 'হিন্দুস্থান কে দো লাল, সুভাষ আউর জওহরলাল'।

প্রধান মঞ্চের পাশেই সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারদের মধ্যে চাঞ্চল্য। ইংল্যান্ডের লর্ড স্যামুয়েল ছাড়াও নানান দেশের সাংবাদিকরা উপস্থিত সেখানে। সামনেই বসে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকা আর সিংহল (এখনকার শ্রীলঙ্কা) থেকে আসা বিশেষ প্রতিনিধিরা।

সেই বিশাল জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সুভাষের মনে জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের ছবি ভেসে আসে। ধীর গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করেন তিনি।

'আপনারা আজ যে সম্মান দিয়েছেন আমি তার যোগ্য, একথা চিন্তা করার মতো ঔদ্ধত্য আমার নেই। আমি এই সম্মান আমাদের দেশের যুবসমাজের প্রতি সম্মান বলেই মনে করি। যে আসন একদিন ভারতমাতার সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রকন্যারা অলংকৃত করেছেন, আমি আজ সেখানে বসতে চলেছি ভীতি আর শিহরন নিয়ে।' পাশেই বসে আছেন মা, বিভাবতী, বাসন্তী মা। চোখভরা জল তাঁদের।

বিগত এক বছরে যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন যেমন, জওহর-জননী স্বরূপরানি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও ঢাকা জেলে অনশন ধর্মঘট করে শহিদ হওয়া হরেন্দ্র মুন্সি প্রমুখ অন্যান্য যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মূল বক্তব্যে এলেন তিনি। সরাসরি চলে গেলেন তাঁর অস্থিমজ্জায় যে প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

'পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্য, একদিন অতি দ্রুত সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছবার পরে আরও দ্রুত পতনের সম্মুখীন হয়েছে এবং অবশেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য আলাদা কোনও নিয়ম সৃষ্টি হয়নি। সে সাম্রাজ্যের অবসানও ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে একদিন হবেই। একদিন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হবে ব্রিটেন।'

কিন্তু এর পরেই ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে দেশভাগের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বললেন, 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল—এই নীতির নিপুণ প্রয়োগে ব্রিটেনের তুলনা নেই। তারা সেই নীতি প্রয়োগ করেছে আয়ারল্যান্ড এবং প্যালেস্তাইনে। সেই একই বিভেদনীতির প্রয়োগ একটু অন্য আকারে দেখা দিয়েছে নতুন ভারত আইনে। অর্থাৎ বিভেদনীতির বীজ পোঁতার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।'

সুভাষের কথায় গাঁধীজি চমকে তাকালেন। দেশভাগের সম্ভাবনার কথায় চমকে উঠেছেন তিনি। অবশ্য সুভাষের বক্তব্যের মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখলেন না তিনি।

এরপর দেশীয় রাজাদের দুঃশাসনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামরত দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানালেন সুভাষ। তারপরেই কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কে শুরু হল বিস্তারিত বিশ্লেষণ।

সংখ্যালঘুদের প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নীতির প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানালেন তিনি। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন যে সংখ্যালঘুদের সবরকম রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের অধিকার থাকতে হবে। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি যখন প্রতিটি নাগরিকের সংগঠিত হবার অধিকার, সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি এবং লিপি সংরক্ষণ, প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, ভারতের সর্বত্র অবাধ বিচরণের অধিকার এবং আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার এইসব মৌলিক অধিকারের কথা তুলে ধরছিলেন—গাঁধীজি তখন অপলকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছিলেন। তিনি আরও বললেন স্বাধীনতা লাভের পরে দেশকে পুনর্গঠিত করার দায়িত্ব কংগ্রেসকেই নিতে হবে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগব্যাধি নির্মূল করা আর উৎপাদনের সমবণ্টনের জন্য দেশকে সমাজতান্ত্রিক নীতিই অনুসরণ করতে হবে বলে সুচিন্তিত বিশ্লেষণ তুলে ধরলেন তাঁর বক্তব্যে।

'ভারতের প্রগতির জন্য একটিমাত্র লিপির প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক রোমান বর্ণমালাকে আমার সমর্থনে হয়তো অনেকেই আহত হবেন।' বলার সঙ্গে সঙ্গে সত্যি সত্যিই অনেকে চমকে উঠলেন। কিন্তু সুভাষ বলে চললেন, 'লিপি সম্পর্কে পবিত্রতা, অপবিত্রতা ইত্যাদি চিন্তার জড়তা আঁকড়ে ধরার পেছনে কোনও যুক্তি নেই। একটিমাত্র ভাষার প্রবর্তনে আমরা অসমর্থ। কিন্তু একটিমাত্র লিপির ব্যবহার দেশের প্রগতি সুনিশ্চিত করবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

জনসংখ্যার বিস্ফোরণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শুনে অনেক দক্ষিণপন্থী গাঁধীবাদী নেতা আবার চমকালেন।

'বন্ধুগণ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সময় থাকতেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতি দশ বছরে তিন কোটি বাড়তি লোকের চাপ আসছে। এই বৃদ্ধির হার যদি অব্যাহত থাকে তবে একদিন এমন আসবে, যেদিন আমাদের সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা শীতের সময়ে গাছের পাতার মতো

ঝরে পড়বে।' তরুণরা কিন্তু এই নতুন নীতির প্রতি সোল্লাসে সমর্থন জানালেন। আর্থিক বিকাশের জন্য পৃথক 'পরিকল্পনা কমিশন প্রয়োজন' এরকম কথাও কংগ্রেসের মূলমঞ্চ থেকে এই প্রথম উত্থাপিত হল। শিল্পবিকাশের সপক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্যের পাশাপাশি কুটিরশিল্পের উন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথাও বললেন তিনি।

সুভাষচন্দ্রের প্রগতিশীল বক্তব্য সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট মতের সমর্থকদের মুহুর্মুহু করতালিতে অভিনন্দিত হচ্ছিল। গাঁধীজি তেরছা নজরে তাঁকে দেখছেন তবে তাঁর মনের চাঞ্চল্য বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে না। কিন্তু ওয়ার্ধাতে তাঁকে দেখান প্রাথমিক খসড়া আর সুভাষের এই ভাষণের মধ্যেকার তফাত ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাঁর কাছে। বামপন্থী প্রগতিশীল বিচারধারার এক-একটা ধাক্কা আসছে সুভাষের বক্তব্যে আর সঙ্গে সঙ্গে গাঁধীজির অনুগামীদের অস্বস্তি বেড়ে চলেছে।

এরপর আমলাতন্ত্রকে নিয়ে পড়লেন সুভাষ। 'মন্ত্রীরা আসবেন, যাবেন! কিন্তু আমলাতন্ত্রের ইস্পাতের খাঁচা থাকে অটুট। এই খাঁচাটার আমূল পরিবর্তন যদি না করা যায় তবে মন্ত্রীরা তাঁদের নীতির বাস্তব রূপায়ণে ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইংল্যান্ডে ১৯২৪ আর ১৯২৯ সালে শ্রমিক দলের ব্যর্থতার এটাই কারণ। ভারতে ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থের জন্যই এই আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করেছে। এই আমলাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয়তা কিংবা জাতীয়তা কোনওটাই নেই। এই আমলাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিক গঠনের পরিবর্তন না হলে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন আদৌ সম্ভব হবে না। তাই সবার আগে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে এই ইস্পাতের খাঁচাটিতে।'

কংগ্রেস পুনর্গঠনের জন্য কর্মীর প্রয়োজনের কথা বলতে গিয়ে তিনি দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটকে থাকা রাজবন্দিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তারপরে সুভাষচন্দ্র একটু থামলেন। তারপর কারও তোয়াক্কা না করে নির্ভয়ে বললেন, 'কংগ্রেসের সংবিধানের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কৃষক সভা, ট্রেড ইউনিয়ন আর সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অস্তিত্বের মধ্যে আপত্তিকর কিছু আমি দেখতে পাই না। সমাজতন্ত্র আমাদের কোনও অব্যবহিত সমস্যা না হলেও স্বাধীনতার পরে দেশগঠনের ভিত্তির জন্য সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিতির প্রয়োজন আছে আর এই প্রয়োজন মেটাতে পারে একটি সুসংবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী। তাকে ব্লক, গোষ্ঠী, লিগ যে নামই দিন তাতে কিছুই যায় আসে না।'

তাঁর মন্তব্যে উল্লাসে মুখর হয়ে উঠলেন সমাজতান্ত্রিক তরুণেরা। হাততালিতে ফেটে পড়লেন তারা। গাঁধীজির মুখ কঠোর হয়ে উঠেছে। অস্বস্তি বোধ করছেন শরৎবাবু। কিন্তু কোনও রকম রাখঢাক না রেখে সুভাষ আগুনের ফুলকি সভায় ছড়িয়ে দিয়ে খোলসা হলেন।

প্রায় তিন ঘণ্টার ভাষণ। প্রগতিশীল চিন্তাধারার দিক থেকে কোনও কংগ্রেস সভাপতির এরকম ভাষণ অভূতপূর্ব। তরুণ সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্টপন্থীরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছেন। শেষ করার সময় সুভাষের গলা ভেঙে গেছে। 'আগামী অনেক বছর ধরে আমাদের দেশ যেন গাঁধীজির সাহচর্য আর আশীর্বাদ লাভ করে,' এই প্রার্থনা জানিয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের সংগ্রাম শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই নয়, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও। আমাদের লড়াই শুধু ভারতের স্বার্থে নয়, মানবতার স্বার্থে। ভারতের মুক্তির অর্থ মানবতার পরিত্রাণ। বন্দেমাতরম্।'

প্রবল হাততালির মধ্যে সুভাষ বসলেন। দক্ষিণপন্থীরা চূড়ান্ত অসন্তুষ্ট। বামপন্থীরা উল্লসিত। আচার্য কৃপালনির মুখে একটা আসুরিক হাসি। সমস্ত বর্ষীয়ান নেতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কান এঁটো করা হাসি হাসছেন তিনি। 'ভোগো এখন কৃতকর্মের ফল'—এরকম একটা

ভঙ্গি তাঁর। সভামণ্ডপ থেকে বেরোবার সময় সুভাষ এসে গাঁধীজির পাশে দাঁড়ালেন। অন্যদিনের মতো গাঁধীজি হাসলেন না আজ। শুধু বললেন, 'সুভাষ তুমি আমার কত কাছে, তবু মনে হয় যেন কত দূরে আছ তুমি!'

৯

'মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী রাজাজি অধিবেশনে আসেননি?'

'তিনি কী করে আসবেন?'

'কেন?'

'সুভাষবাবু সভাপতি না?'

শিবিরে হাসির রোল উঠল। বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছিলেন। ১৯৩৫-এর ভারত আইন অনুযায়ী ভারতের ১১টি রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে। তার মধ্যে সাতটি রাজ্যে কংগ্রেস জিতে ক্ষমতায় এসেছে। ব্যারিস্টার জিন্নার মুসলিম লিগ অনেকটা পিছিয়ে থাকায় তিনি খুবই বিমর্ষ। তবে প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত কংগ্রেসিরা খুব খুশি। প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রীদের বলা হয় প্রধানমন্ত্রী। হরিপুরায় বেশির ভাগ কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রীই এসেছেন তবে একজনের অনুপস্থিতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—তিনি মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী রাজাজি।

অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে স্পষ্টতই দুটি দল দেখা যাচ্ছে। একদল আইনসভায় প্রবেশ করে ক্ষমতা আস্বাদনের জন্যে উদ্‌গ্রীব। তাঁরা চান এবার কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রবেশ করে ক্ষমতা পেতে। অন্য আর একদল চান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিরোধী প্রত্যক্ষ আন্দোলন। এই দ্বিতীয় দলে জওহর-সুভাষ সহ তরুণরাই সংখ্যায় বেশি। গাঁধীজি অবশ্য দুটি দলের ব্যাপারেই কোনও সময়ে সমর্থন, কোনও সময়ে বিরোধিতা করেন। সংগ্রাম-সমঝোতা-সংগ্রাম এটাই তাঁর ধরন। কখনও অসহযোগ আর অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন আহ্বান করেন তিনি। কিন্তু আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগোলে তা প্রত্যাহার করে অন্যদিকে এগোন তিনি।

বামপন্থীরা শাসনক্ষমতা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে রাজাজি এ প্রস্তাবের সপক্ষে তাঁর সমস্ত বাগ্মিতা দিয়ে লড়ে গেছেন। কখনও অভিমান, কখনও চেঁচামেচি, কখনও হুমকি আবার কখনও মধুক্ষরা শব্দে মিনতি। তাঁর ভাণ্ডারের সব অস্ত্রই ব্যবহার করেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে ক্ষমতায় আসার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়ে ছেড়েছেন তিনি। সে কারণেই আজ তিনি মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী।

অধিবেশনের সমগ্র উপস্থাপনা খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতি আর অলংকরণের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। এখন পর্যন্ত যতবার গুজরাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে প্রতিবারই সভাপতি ছিলেন বাংলার কোনও সুসন্তান। সেই কথা স্মরণ করে সর্দার পটেল বললেন, 'এবারকার সভাপতি অবশ্য বঙ্গভূমির সবচেয়ে তেজিয়ান সন্তান।' সুভাষের প্রশংসা করবার সময়ে সরোজিনী নাইডুর কাব্যপ্রতিভাও যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। একুশ বছর আগে ইংল্যান্ডে যে ছাত্রটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তিনি যে এইভাবে 'দেশগৌরব' হয়ে উঠবেন সেটা ধারণা করতে পারেননি তিনি। তিনি বললেন, 'সেদিনকার সেই নবাগত সৈনিকের হাতে আজ সেনাপতির তরবারি। আগামী বছরে কঠিন পরীক্ষা তাঁর সামনে। এ পরীক্ষায় তাঁকে তাঁর সমস্ত শক্তি—মেধা, বুদ্ধি, সহ্যশক্তি, অদম্য সংকল্প আর সৈনিকের নিষ্ঠা নিয়ে সম্মুখীন হতে হবে। আমি জানি, সুভাষ বাংলার অসীম ত্যাগ আর বীরত্বের প্রতীক।'

বিশেষণের পর বিশেষণে ভরা ভাষণের উপসংহারে তিনি বললেন, 'আমি শুধু একটি অনুরোধ করব। প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য না দিয়ে এখন থেকে প্রতিটি বিষয় তাঁকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে।'

সরোজিনীর এই শেষ মন্তব্য স্পর্শকাতর সুভাষের একেবারে মনে গিয়ে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তর দিলেন, 'সমগ্র ভারতের এক অখণ্ড সুজলাং সুফলাং রূপ ছাড়া আর কোনওকিছুই চিন্তায় আসে না আমার। হিমালয়ের দীপ্ত পৌরুষ যাঁর মাথা, পঞ্জাবের কঠিন মাটি যাঁর কাঁধ, গঙ্গা-যমুনায় বিগলিত যাঁর হৃদয়, অসম আর বেলুচিস্তান যাঁর হাত, দক্ষিণের মালভূমি যাঁর পা—সেই দেশদেবতাকেই বন্দনা করি আমি। একমাত্র বাংলার সীমিত বাঁধনে আমার মনের মুক্তি কোথায়? আমার শিরায় শিরায় অখণ্ড ভারতের শোণিত ধারা। আমার কল্পনায় সব সময়েই দীপ্ত—আমার সমগ্র মাতৃভূমি।'

শিবিরগুলো একে একে গোটানো হচ্ছে। প্রতিনিধিরা যে যার ঘরে ফিরছেন। হরিপুরা কংগ্রেস দারুণ সফল। সুভাষচন্দ্রের শিবিরেও বাঁধাছাঁদা চলছে। দু'দিন পরেই বোম্বাই হয়ে কলকাতা যাবেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেসের মহাসচিব আচার্য কৃপালনিকে জরুরি তলব পাঠালেন। কৃপালনি এলেন সুভাষের শিবিরে। সুভাষচন্দ্র সভাপতি হওয়ায় কৃপালনির অসন্তোষ জওহরলালের অজানা ছিল না। তাই হরিপুরায় আসার আগেই কৃপালনিকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন সুভাষের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা করতে। একই সঙ্গে সুভাষকে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যতদূর সম্ভব কৃপালনিকে এড়িয়ে চলতে। গাঁধীজির অন্তরঙ্গ চক্রে কৃপালনির সম্মান যে কত বেশি সেটা জওহরের অজানা ছিল না। জীবিত কৃপালনি আর জওহরলালের বয়েসও প্রায় সমান। কিন্তু সুভাষের চেয়ে জীবিত আট-নয় বছরের বড়। তা ছাড়া গত চার বছর এলাহাবাদে কংগ্রেসের অফিস মানেই 'জীবিত কৃপালনি' এরকম একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল।

কৃপালনিকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সুভাষ বললেন, 'কংগ্রেস সভাপতির পদ তো সাজিয়ে রাখার পদ নয়। এক হিসেবে সারা দেশের প্রতীক। জনগণ মনে করে, কংগ্রেস সভাপতি পাহাড়কেও ইচ্ছে করলে সরিয়ে দিতে পারেন।'

'বাবুজি, আপনি আমার কাছে মহাসচিব হিসেবে যে সহযোগিতা চাইবেন তাই পাবেন।'

'সেটাই দরকার। আমিও কাজে ডুবে থাকাটাই পছন্দ করি। মাথায় অনেক পরিকল্পনাও আছে। এখন বলুন আপনি কলকাতায় কবে আসছেন?'

'আমার অফিস তো এলাহাবাদে। আমাকে অতদূর যেতে হবে কেন?' আচার্য প্রশ্ন করেন।

'আমি কলকাতায় আর অফিস এলাহাবাদে থাকলে রোজকার কাজ চলবে কেমন করে? আপনি বরং অফিস কলকাতায় নিয়ে আসুন।'

আচার্যর মুখের ভাব সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। চট করে একবার দাঁড়িয়ে উঠে আবার বসলেন তিনি। কোনও গোলমাল বাধলে নিজেকে সামলে রাখার ধাত নয় তাঁর। চড়াস্বরে বলে উঠলেন, 'ইম্‌পসিবল! এলাহাবাদ থেকে অফিস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব! ভুলে যাবেন না সারা দেশের সবকিছু সেখান থেকেই চিরকাল হয়ে এসেছে।'

'দেখুন, বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করলে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় দপ্তর হওয়া উচিত ছিল দিল্লি কিংবা বোম্বাইয়ে। সেটা এলাহাবাদে গেল কেন? কারণ গত দশ বছরের মধ্যে চারবার জওহরলাল ছাড়াও সভাপতি হয়েছেন একবার মতিলাল নেহরু, দুবার রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এদের

সবার পক্ষে এলাহাবাদই ছিল সুবিধাজনক। কিন্তু তাই বলে কেন্দ্রীয় দপ্তর চিরকাল আনন্দভবনেই থাকতে হবে তার কী মানে আছে?'

আচার্যের মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। সুভাষ আবার বললেন, 'ঠিক আছে। অফিস যদি নাই সরান তো সরাবেন না। কিন্তু আপনি কংগ্রেসের মহাসচিব। সেই জন্য মাঝে মাঝে কলকাতায় তো আসতেই হবে আপনাকে।'

আচার্য কৃপালনি এবার আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকালেন সুভাষের দিকে। তারপর দুমদুম করে বেরিয়ে গেলেন।

আচার্য এসে উপস্থিত হলেন জওহরলালের ডেরায়।

'কী ব্যাপার জীবিত? এত রাগ কীসের?' জওহরলাল জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার প্রাণের বন্ধু বঙ্গবীর সুভাষচন্দ্র কী বলছেন জানেন? বলছেন আমি দেখে নেব কেন্দ্রীয় দপ্তর আনন্দভবনে কী করে থাকে?'

'জীবিত তোমার নিশ্চয় কিছু ভুল হচ্ছে।'

'ছেড়ে দিন জওহরলালজি', মাঝপথেই পণ্ডিতজিকে থামিয়ে আচার্য বললেন, 'আপনি যে বন্ধুর পক্ষেই কথা বলবেন সেটা জানাই ছিল আমার। কিন্তু আমি আপনাকে স্পষ্ট বলছি। শুধু আমি কেন কোনও গাঁধীভক্তেরই এই উদ্ধত মানুষটার সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হবে না। দয়া করে আমাকে অন্তত এর হাত থেকে বাঁচান।'

৭

ঝড়ের সংকেত

১

একমাত্র গভর্নর হাউস বাদ দিলে বোম্বাইতে জিন্না ম্যানসন-এর মতো প্রাসাদ আর ছিল না। প্রদেশ-শাসনের সমস্ত কাজকর্ম চলে গভর্নর হাউস থেকে কিন্তু ব্যারিস্টার জিন্নার প্রাসাদ তাঁর একান্ত নিজস্ব। ভারতের বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের তিনিই সবচেয়ে বড় নেতা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মালাবার হিল আলোকে উদ্‌ভাসিত। ব্যারিস্টার জিন্না তাঁর আট ফুট উঁচু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন নিজেকে। ছ' ফুট লম্বা, ছিপছিপে চাবুকের মতো শরীর। গত অনেক বছর ধরেই তাঁর ওজন ধরে রেখেছেন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। কোট প্যান্টের মাপ একই আছে। অভিনেতাদের মতোই নিজের শরীরের যত্ন নেন তিনি।

এই ম্যানসনে তাঁর মতো একজন বিরাট নেতা থাকলেও কর্মকর্তাদের আদৌ আনাগোনা নেই। বাড়িতে কোনওরকম হইচই একদম পছন্দ করেন না মিস্টার জিন্না। তাঁর খাওয়ার টেবিলে থাকে পর্ক, চিকেন, আর সেলারে থাকে উৎকৃষ্ট শ্যাম্পেন, হুইস্কি। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতার বাড়িতে চলে অক্সফোর্ডের চোস্ত ইংরেজি।

পোশাক বদলে জিন্না সাহেব শ্যাম্পেনের গেলাস হাতে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলেন। শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে দিতে সিগারেট হাতে উপভোগ করছেন নিশ্চিন্ত অবসর। ঠিক তখনই এক ভৃত্য এসে দাঁড়াল টেলিফোন নিয়ে। চোখে তীব্র অসন্তোষ নিয়ে তার দিকে তাকালেন সাহেব। ভৃত্যটি ভালভাবেই জানে যে এসময় কারও ফোন তিনি ধরেন না। তা সত্ত্বেও এত আস্পর্ধা তার হল কী করে? বেচারি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

ফোনটা হাতে নিলেন জিন্না সাহেব। বললেন, 'হ্যাঁ বলুন মিস্টার বোস।'

'আমার চিঠি নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কখন? এখন? দেখুন রাত ন'টা বেজে গেছে। এটা আমার বিশ্রামের সময়।'

'কিন্তু কাল খুব সকালেই আমাকে কলকাতা রওনা হতে হবে।'

'ঠিক আছে। আধঘণ্টা পরে আসুন। আমার তৈরি হতে আধঘণ্টা লাগবে।'

বিশাল বেডরুমের একপাশে ওয়ার্ডরোবটা কাপড়ের দোকানকে হার মানায়। সাড়ে তিনশোরও বেশি স্যুটের মধ্যে থেকে কোনটা এখন পরবেন বুঝে উঠতে সময় লাগে তাঁর। নির্বাচন শেষ হলে পোশাকটি পরতে পরতে নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন, 'কংগ্রেস সভাপতি দেখা করতে আসছেন।' একসময় এই 'কংগ্রেস' শব্দটা তাঁর মনকে আলোড়িত করে তুলত একটা অনির্বচনীয় মাধুর্যে। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি দাদাভাই নওরোজির সেক্রেটারি ছিলেন জিন্না। লোকমান্য টিলক আর গোখলের সঙ্গেও তাঁর বেশ সুসম্পর্ক ছিল।

ভারতের রাজনীতির আকাশে গাঁধীর উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল সবকিছু। খাদি, চরকা, প্রার্থনা, আশ্রম—এসবের সঙ্গে রাজনীতির কী সম্বন্ধ? এসব নাটক করার দরকারটা কী? তারপর আলি ভ্রাতাদের সঙ্গে গাঁধীজির দহরম মহরম, মোপলা প্রসঙ্গ, খিলাফত আন্দোলন—আস্তে আস্তে কংগ্রেস থেকে বিশেষ করে গাঁধীজির কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন ব্যারিস্টার জিন্না।

কীসে কম জিন্না? দীর্ঘ ব্যক্তিত্বময় চেহারা। আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন তিনি। প্রচণ্ড জেদি এবং পরিশ্রমী। দরকার হলে চাররাত পরপর জেগে কাজ করতে পারেন তিনি।

ব্যক্তিগত জীবনে অবশ্য মোটেই সুখী নন তিনি। ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়বার সময়েই তাঁর প্রথমা স্ত্রী মারা যান। তারপর প্রায় ষোলো-সতেরো বছর আর বিয়ে করেননি তিনি।

একচল্লিশ বছর বয়সে আবার বসন্ত এল তাঁর জীবনে। এক পার্শি বন্ধুর সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে থাকার সময় তাঁর দৃষ্টি পড়ল এক নবযৌবনা সপ্তদশীর ওপর। অসামান্য দেহসৌষ্ঠব, দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি যখন তার দিকে চেয়ে হাসত মনে হত সারা আকাশ গান গেয়ে উঠছে। মেয়েটিও এই দীর্ঘদেহী, সুদর্শন ব্যক্তিটির প্রতি আকৃষ্ট বোধ করত। মেয়েটির নাম রুটী। ভাল নাম রুতেন।

কিন্তু বাধা অনেক। পৃথিবীর যাবতীয় প্রেম কাহিনির বাধাবিপত্তি যোগ দিলে যা হয় তার চেয়েও বেশি। জিন্না সাহেবের বয়স তখন ৪১ আর রুটী ১৭। তিনি মুসলমান, রুটী পার্শি। তাঁর প্রচুর অর্থ আছে বটে তবে রুটীর বাবার কাছে আছে তার দশগুণ অর্থ। সবচেয়ে বড় কথা, রুটী তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর মেয়ে। অবশেষে বন্ধুত্বের বন্ধন, ধর্মের ব্যবধান, বয়সের তফাত—সব বাধা দূরে সরিয়ে দুটি মন এক হওয়ার শপথ নিল। যেদিন আঠেরো বছর পূর্ণ হল সেই জন্মদিনেই বাবার ঘর ছেড়ে দিয়ে জিন্না সাহেবের ঘরে পা রাখল রুটী।

সাত-আট বছর পরম সুখে কাটল। তারপর স্পষ্ট হয়ে উঠল দুজনের স্বভাবের পরস্পরবিরোধী দিকগুলো। অবশেষে একদিন রুতেন বেগম জিন্না ম্যানসন ত্যাগ করলেন। দশ বছরের সম্পর্ক শেষ হল। ব্যারিস্টার সাহেবের জীবনে আবার ফিরে এল নিষ্ঠুর একাকিত্ব। আর এক বছরের মধ্যেই বেশিমাত্রায় আফিং খেয়ে নিজের জীবনের অবসান ঘটালেন রুতেন বেগম।

কবরে মাটি দেওয়ার সময় থরথর করে কাঁপছিল জিন্না সাহেবের হাত। স্বভাব গম্ভীর ব্যারিস্টার মহম্মদ আলি জিন্না সেদিন বাচ্চা ছেলের মতো হাউহাউ করে কাঁদছিলেন। তারপরে আর কেউ তাঁকে কাঁদতে দেখেনি। সম্পত্তি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে—কিন্তু সে সম্পত্তির ওপর আকর্ষণ আর নেই তাঁর।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময় ব্যক্তিগতভাবেও তাঁর পরাজয় হয়েছিল। ভারতের রাজনীতিতে গাঁধীজির প্রভাব ক্রমশ বাড়ছিল। অনেক মুসলিম নেতাও গাঁধীজির পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। মুসলিম লিগের মধ্যেও প্রাদেশিক স্বার্থ আর অন্য ধরনের কোন্দল প্রকাশ পাচ্ছিল। সবদিক থেকেই দুঃখ আর নৈরাশ্য ঘিরে ধরছিল তাকে। এরকম পরিস্থিতিতে ইউরোপের মুক্ত বাতাবরণের আকর্ষণে স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে তিনি লন্ডনবাসী হয়ে গেলেন।

১৯৩৩ সালের এক বসন্ত দিনে লন্ডনের ওয়ালডর্ফ হোটেলে রহমত আলি চৌধুরী নামে কেমব্রিজের এক স্নাতক জিন্না সাহেবের কাছে প্রস্তাব আনলেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি

নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তোলার। ভারতের একটা মানচিত্র বিছিয়ে দিলেন টেবিলের ওপর। বললেন, 'এদিকে পঞ্জাব, এইদিকে পূর্ববঙ্গ আর এই সিন্ধু প্রদেশ। এসব জায়গায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই অংশগুলো আলাদা করে নিয়ে একটা আলাদা দেশ পাকিস্তান হতে পারে।' রহমত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের নাম দিয়েছিলেন আফগানিয়া। পঞ্জাবের 'P', আফগানিয়ার 'A', কাশ্মীরের 'K', সিন্ধুর 'S', বেলুচিস্তানের 'tan'—এই অক্ষরসমষ্টি নিয়ে নতুন রাষ্ট্রের নাম 'পাকিস্তান' অর্থাৎ পবিত্র স্থান। উর্দুতে পাকিস্তান লেখার জন্যে কোনও 'ই'-কার অর্থাৎ 'i' দরকার পড়ে না।

প্রস্তাব শুনে বিস্মিত জিন্না মন্তব্য করলেন, 'আমার তরুণ বন্ধু এক অবাস্তব অসম্ভবের স্বপ্ন দেখছেন। ইট ইজ অ্যান ইম্‌পসিবল ড্রিম, ইয়ংম্যান।' জিন্নার মুখের হাসিতে বিদ্রুপের আভাস।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের ফলে যে নির্বাচন হল তার ফলে সাতটি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় এল। কোনও রাজ্যেই মুসলিম লিগ কলকে পেল না। তারপর একদিন উত্তরপ্রদেশের মুসলিম লিগ নেতা নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান নিজের বেগমকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে হাজির হলেন। জোড় হাতে মিনতি জানালেন জিন্নাকে, 'এখানে কেন পড়ে রয়েছেন? ভারতে চলুন।'

'কীসের জন্য?'

'গফফর খানকে দলে টেনে গাঁধী সীমান্ত প্রদেশ জিতে নিয়েছে। সব জায়গায় কংগ্রেসের জয়জয়কার। আপনার মতো লোক ছাড়া আমাদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ইসলাম আজ আপনার পথ চেয়ে রয়েছে।'

জিন্না সাহেবের উদাস চোখে আবার আলো জ্বলে উঠল। মুসলিম লিগের লখনউ অধিবেশনে তাঁকে প্রথম ফেজ টুপি আর শেরোয়ানিতে দেখা গেল। শুধু পোশাকেই নয় তাঁর ভাষাতেও এসেছে পরিবর্তন, পরিবর্তন এসেছে বক্তব্যেও।

'কংগ্রেস হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন। ব্রিটিশের হাতের খেলনা এই কংগ্রেস। কংগ্রেসের রাজত্বে হাজার বছরেও মুসলমানরা ন্যায় বিচার পাবে না।' তাঁর ভাষণ এখন প্রচণ্ড জঙ্গি এবং আক্রমণাত্মক। তিনি বুঝে গেছেন যে সাম্প্রদায়িক নাগের মাথায় চড়ে নাচতে পারলে চটজলদি উত্থান, হাততালি, জয়ধ্বনি সব পাওয়া যায়। জিন্না সাহেবের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চোখে এখন এক নতুন চমক। তাঁর স্বাভাবিক দম্ভ এবার আরও প্রকট। গত পনেরো-ষোলো বছরের রাজনৈতিক নির্বাসন এবার সুদে-আসলে পূরণ করে নিতে হবে। আল্লাই তার সুযোগ করে দিয়েছেন।

মুসলিম সমাজের মুসলিম লিগের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ কংগ্রেসের ভেতর মহলকে ভাবিয়ে তুলল। জিন্না সাহেবের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলেন তাঁরা। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত নেহরু কথা বলে এলেন। স্বয়ং গাঁধীজি দিন পনেরো আগে কথা বলে গেছেন। আজ আসছেন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু।

রাত দশটার সময় ফিটফাট খদ্দরের পোশাকে কংগ্রেস সভাপতি জিন্নার বৈঠকখানায় উপস্থিত হলেন। কাঁধের ওপর সাদা শাল আর মাথায় কড়া করে ইস্তিরি করা গাঁধীটুপি। টুপিটার দিকে একবার বিশ্রীভাবে তাকালেন জিন্না। তারপরই স্বাগত জানালেন সুভাষকে।

'কী খাবে? শ্যাম্পেন, ব্র্যান্ডি—কী তোমার পছন্দ?'

'মাফ করবেন। আমি মদ খাই না।'

'গাঁধীজির স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে এখন নিম্বুপানি খেতে শুরু করেছ নাকি?'

দুজনেই হেসে উঠলেন। তারপর এটা ওটা নিয়ে একটু গল্প হল। জিন্না বললেন, 'সুভাষ। গাঁধীর স্বভাব আর আমার স্বভাব একেবারেই আলাদা। আমার ধারণা এইসব সত্যাগ্রহ,

অসহযোগ—সবই অশিক্ষিত 'অঙ্গুঠাছাপ'দের জন্য। আমার মতো লোকেদের জন্য নয়। তোমাদের গাঁধীজির আশ্রম, এই টুপি, মোটা খদ্দরের কাপড়—এইসব নাটক আমার পোষায় না। এবার বলো, কী জন্য এসেছ?'

'আমার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য।'

'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। তোমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু নেহরুকে আমি রাজনীতিক বলে অবশ্য মনে করি না। ইংরেজির অধ্যাপক হলেই ভাল করত সে।'

'কী হয়েছে তার?'

'গত নির্বাচনের সময় তার দম্ভোক্তির কথা জান তুমি? দেশে এখন দুটি মাত্র পক্ষ রয়েছে—একদিকে ব্রিটিশ আর অন্যদিকে কংগ্রেস। সুভাষ, গাঁধী-নেহরুর সঙ্গে তোমাদের সবাইকে বুঝতে হবে যে ভারতের রাজনীতিতে একটি তৃতীয় কোণ রয়েছে আর সেই কোণের শীর্ষবিন্দুটি হচ্ছে মুসলিম লিগ।'

ব্যারিস্টার জিন্না গড়গড় করে বলে চললেন। গাঁধীর সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর কথায়। গাঁধীজির ওপর তাঁর ঘোর অবিশ্বাস একটুও লুকোলেন না তিনি। আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে সুভাষ বললেন, 'হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যেকার বিভেদ মিটিয়ে ফেলা অবিলম্বে প্রয়োজন। এর জন্য আলোচনা, প্রয়োজন হলে চুক্তি—যা কিছু দরকার করতে হবে।'

'ঠিক আছে। তোমার প্রস্তাব আমি মুসলিম লিগের ওয়ার্কিং কমিটির কাছে রাখব। তোমরা হিন্দুদের পক্ষে বলবে আমরা মুসলিমদের পক্ষ থেকে।'

'সেটা কী করে সম্ভব, জিন্না সাহেব? কংগ্রেস তো আর শুধু হিন্দুদের নয়। সেখানে অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাও আছেন। একমাত্র কংগ্রেসই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবার প্রতিনিধিত্ব করে।' দৃঢ়স্বরে বললেন সুভাষ।

'তোমার যা খুশি তুমি ভাবতে পারো। কিন্তু আমরা কংগ্রেসকে একমাত্র হিন্দুদের সংগঠন বলেই মনে করি। যে-কোনও আলোচনায় একমাত্র আমরাই মুসলমানদের পক্ষ থেকে বলব। সে ব্যাপারে তোমাদের কোনও কথাই চলবে না।' জিন্না এবার স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলেন।

কলকাতায় সুভাষের খুব জরুরি কাজ ছিল। কিন্তু জিন্নার সঙ্গে আলোচনার পর প্রচণ্ড অশান্তি তাঁর মনে। ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। দেশের অখণ্ডতা তাঁর কাছে জীবনের চেয়ে অনেক প্রিয়। কলকাতায় যাবার পথে ওয়ার্ধায় নেমে পড়লেন তিনি। জিন্নার সঙ্গে আলোচনার মূল ব্যাপারটা জানালেন গাঁধীজিকে। জিন্নার জেদি, একগুঁয়ে স্বভাব সম্পর্কে ভাল করেই জানা আছে গাঁধীজির। সুভাষ বললেন, 'মুসলিম লিগের ঝান্ডার নীচে ক্রমশই বেশি লোক জমা হচ্ছে। পাকিস্তানের দাবিও ক্রমেই জোরাল হয়ে উঠছে।'

'এই চিন্তা আমাকেও কুরে কুরে খাচ্ছে।' বিষণ্ণস্বরে বললেন গাঁধীজি।

'কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের মধ্যে অবিলম্বে আলোচনা হওয়া দরকার। আমার মনে হয় ব্রিটিশ তাদের কূটনীতির অস্ত্র প্রয়োগ করার আগেই নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে ফেলা দরকার। গাঁধীজি এর জন্য আপনার আশীর্বাদ একান্ত দরকার।'

'সুভাষ। আমার কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্বাধীনতার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যেভাবে মনপ্রাণ ঢেলে এ বিষয়ে ভাবছ তার জন্য গর্ব হচ্ছে আমার। চেষ্টা থামিয়ো না। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাও। এ ব্যাপারে আমার আশীর্বাদ সবসময় ঘিরে থাকবে তোমাকে।' গাঁধীজি অন্তর থেকে বললেন।

জুলাই মাসে ওয়ার্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হল। সেখানেও সুভাষ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপর জোর দিলেন। জিন্না সাহেবকে লেখা চিঠিতেও ঐক্যের ব্যাপারে তাঁদের উৎসুক আগ্রহের কথা জানালেন তিনি। গাঁধীজি এই চিঠির প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে পড়ে সুভাষকে সাধুবাদ জানালেন। শিল্প বিকাশের ব্যাপারে একটা সামগ্রিক পর্যালোচনা করার জন্য সাতটি কংগ্রেসশাসিত রাজ্যের উদ্যোগে মন্ত্রীদের নিয়ে একটি পরিষদ তৈরির প্রস্তাবও গৃহীত হল বৈঠকে। গাঁধীজির খুব কাছে সুভাষকে উপবিষ্ট দেখে অবশ্য অনেকের চোখেই জ্বালা ধরছিল। তবে তাঁদের কাছে তার চেয়েও চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল গাঁধীজির সঙ্গে তাঁর নৈকট্য। বাপুজি সুভাষকে শ্রদ্ধার চোখে দেখছেন, তার সঙ্গে নানান বিষয়ে আলোচনা করছেন। গাঁধীজির প্রিয় বিষয় প্রাকৃতিক চিকিৎসা। তাই নিয়ে সুভাষের সঙ্গে যখন তাঁর আলোচনা হয় তখন কস্তুরবাও অংশ নেন সে আলোচনায়। অনেক গাঁধীভক্তের কাছেই এগুলো অসহ্য লাগে।

এরই মধ্যে জিন্না সাহেবের কাছ থেকে একটা চিঠি এল। চিঠি পড়ে সুভাষ চূড়ান্তরকম অখুশি হয়ে গাঁধীজির কাছে গেলেন। বললেন, 'গাঁধীজি, জিন্না সাহেব তাঁর একগুঁয়েমি ছাড়তে নারাজ। জানিয়ে দিয়েছেন যে কংগ্রেসের মধ্যে থাকা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মুসলিম লিগের ওয়ার্কিং কমিটি স্বীকারই করে না।'

'মুসলিম লিগের ওয়ার্কিং কমিটি!' বিষণ্ণ হাসি গাঁধীজির মুখে। 'কীসের ওয়ার্কিং কমিটি? সবকিছুর সিদ্ধান্ত তো একজনেরই হাতে।' তারপর যেন খানিকটা আত্মগতভাবেই বলতে লাগলেন, 'জিন্না কেবল নামেই মুসলমান। মুসলমান ধর্মের পবিত্রতার কোনও তোয়াক্কাই করে না সে। মদ আর শুয়োরের মাংস ছাড়া তার চলে না। মসজিদের মুখটা যে কোনদিকে সেটাও হয়তো জানা নেই তার। তা সত্ত্বেও "ইসলাম বিপন্ন" এই জিগির তুলে গরিব মুসলমানদের উত্তেজিত করে তুলতে সে এক পায়ে খাড়া। যাই বলো সুভাষ, এই মানুষটা ভবিষ্যতে যথেষ্ট প্যাঁচে ফেলবে আমাদের।'

সুভাষচন্দ্রও বিষণ্ণ। পৃথিবীর ইতিহাস পড়েছেন তিনি। জানেন যে নেতাদের আচরণ থেকেই একটা দেশ যেমন গড়ে উঠতে পারে তেমনি ডুবতেও পারে।

২

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮। সুভাষ উদ্বিগ্নভাবে দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে আছেন। সকালবেলাই অসম থেকে ফিরেছেন তিনি। কয়েকটা দরকারি ফাইল আর সপ্তাহখানেক চলে যাবার মতো কাপড়-চোপড় নেওয়ার জন্য এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি বিমানবন্দর থেকে অনেকটা দূরে। ফিরে আসার সময় রাস্তা থেকেই দেখলেন দিল্লির বিমান উড়ে যাচ্ছে। একটুর জন্য উড়ান ধরতে পারলেন না তিনি। হতবুদ্ধি হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকলেন।

'অসম না গেলেই ভাল করতে?' এক বন্ধু বললেন।

'তা ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটির আজকের বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' শরৎবাবু বললেন।

'অসমে শাদুল্লা সরকারের পতনের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে একটি প্রদেশের শাসনভার যদি হাত থেকে চলে যায় রাজনৈতিক দিক থেকে সেটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক হত। তাই কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সেখানে যাওয়াটা আমার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তাই শিলংয়ে নতুন মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবার পরই ছাড়া পেলাম। এবার অন্য কাজে মন দিতে পারব।' সুভাষ বুঝিয়ে বললেন।

ঠিক সেই সময় এক বন্ধু দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিলেন একটা কোম্পানির সাহায্যে একটা চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শুনে সুভাষের ধড়ে প্রাণ এল।

একটু পরেই চার্টার্ড বিমানটি তৈরি হল। জন দশ-বারো বসার উপযোগী ছোট্ট একটা বিমান। শরৎবাবু বিদায় নিলেন। সুভাষকে এখন বেশ নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। সঙ্গে আছেন তরুণ প্রাণোচ্ছল বন্ধু লালা শঙ্করলাল। বিমান উড়ল। কলকাতা পেছনে ফেলে রেখে, বাংলার সুজলা শ্যামলা মাটির ওপর দিয়ে বিহারের দিকে উড়ে চলেছে বিমান।

সকাল থেকে সুভাষের শরীরটা যেন কেমন অস্থির লাগছে। শঙ্করলালকে বলতে তিনি বললেন যে বোধ করি অসম যাতায়াতের ক্লান্তি এটা। একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে।

জওহরলাল বেশ কয়েক মাস যাবৎ বিদেশ সফরে বাইরে আছেন। অন্তত আপাত দৃষ্টিতে গাঁধীজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের নৈকট্য বাড়ছে। ওয়ার্ধাতে, বিশেষ করে কস্তুরবার সস্নেহ ব্যবহারে সুভাষ খুবই খুশি। কিন্তু মাঝে মধ্যেই উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। সুভাষের ঝড়ের মতো সফরের সময় বিভিন্ন সভায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে অভিনন্দিত করে। সভায় সুভাষ রাশিয়ার অনুসরণে আর্থিক পরিকল্পনার কথা বলেন। তাঁর পরিকল্পনাকে পূর্ণতা দিতে তাঁকে সমর্থন করছেন ড. মেঘনাদ সাহা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতো অনেক বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদ। সুভাষচন্দ্রের মধ্যে দিয়েই কংগ্রেসে আধুনিক চিন্তাধারার ভিত্তিস্থাপন হবে বলে সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

বিমানের মধ্যে সুভাষের অস্বস্তি বেড়ে চলেছে। বিমানের প্রচণ্ড আওয়াজ যেন তাঁর শরীরের সমস্ত রক্তমাংসে গিয়ে বিঁধে যাচ্ছে। প্রবল ঘাম হচ্ছে তাঁর শরীরে। অস্থির হয়ে বারবার ঘাম মুছছেন তিনি।

'বাবুজি, কী অসুবিধে হচ্ছে?'

'শঙ্করলাল, মাথার যন্ত্রণাটা প্রাণ বার করে দিচ্ছে। কমার নামও নেই। মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। একটু জল দাও তো।'

দেখতে দেখতে প্রচণ্ড জ্বর এসে গেল। তাঁর কালো হয়ে যাওয়া মুখ, রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে বিমানচালক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। জ্বর বেড়েই চলেছে। অসুখটা কী জাতীয়? বর্মার জেলের সেই ভীষণ অসুস্থতা কি আবার ফিরে এল্? এমন সাংঘাতিক সময়ে এই অসুস্থতা কী খেলা খেলতে চায় তাঁর জীবনের সঙ্গে? 'যাই কপালে থাকুক দিল্লি যেতেই হবে আমাকে।' সুভাষ বললেন। কিন্তু জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন তিনি। এরকম একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় বিমানচালক। কানপুরের বিমানবন্দরে বিমান নামল।

জীবনের চেয়ে বৈঠক বড় নয়। কিন্তু মনপ্রাণ পড়ে আছে সেখানে। অজ্ঞান অবস্থাতে দুদিন কাটল কানপুরে। মুষলধারায় বৃষ্টিতে আকাশ ভেঙে পড়ছে। তার মধ্যেই দিল্লি রওনা হলেন সুভাষ। কংগ্রেস ভবনের বাইরে হরিবিষ্ণু কামাথ আর অনান্য সহযোগীরা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তাঁর পথ চেয়ে অপেক্ষায় রয়েছেন। নিজের জিনিস সহকারীদের জিম্মায় রেখে সুভাষ দ্রুত বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের এটা তৃতীয় দিন।

'ক্ষমা করবেন। রাস্তাতেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'আপনিই তো আমাদের পাইলট। কংগ্রেসের হাওয়াই জাহাজ জায়গামতো পৌঁছলেই আমাদের আনন্দ।' ছদ্মহাসি হেসে টিপ্পনী কাটলেন রাজাজি।

হাসির একটা রোল উঠল। তা সত্ত্বেও সভায় থমথমে ভাবটা খুবই স্পষ্ট। বামপন্থী আর দক্ষিণপন্থীরা আলাদা আলাদা বসেছেন। পি. সি. জোশি, সোমনাথ লাহিড়ি, নীহারেন্দু দত্ত

মজুমদার ইত্যাদি কমিউনিস্ট আর সমাজতান্ত্রিক মতবাদী তরুণরা প্রবীণ নেতাদের থেকে দূরত্ব রেখে বসেছেন। রাজাজির উপস্থিতি বিশেষ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী রাজা গোপালাচারি ইদানীং বেশ চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছেন। নিজের রাজ্যে পুলিশের সহায়তায় তিনি অনেক কমিউনিস্ট আর সমাজবাদী তরুণ নেতাদের জেলে আটক করেছেন। ব্রিটিশরাজের ওপর তাঁর এই বিচিত্র আনুগত্যে নেহরুও দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'কংগ্রেস কী আপনাকে মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী করেছে না মাদ্রাজের পুলিশ কমিশনার?'

দুপুরের খাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যায় কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মাঝখানের সময়টিতে গাঁধীজির সঙ্গে দেখা করার জন্য সুভাষ চললেন হরিজন কলোনিতে। গাড়িতে সুভাষ কামাথকে বললেন, 'হরি। আজকের অধিবেশন কিন্তু সেরকম জমেনি।'

'বাবুজি, গত চারদিন যাবৎ আমি এই দক্ষিণপন্থীদের গুজগুজ ফুসফুস শুনতে পাচ্ছি।'

'কী ব্যাপারে?'

'আপনার কাজের পদ্ধতি তাঁদের পছন্দ নয়।'

'তাঁদের আপত্তিটা কীসে?'

'সত্যি কথা বলতে গেলে—' কামাথ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন, 'কংগ্রেস পরিচালনা করা নাকি আপনার সাধ্য নয়। সেক্রেটারি কৃপালনি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন যে এলাহাবাদে কাগজপত্রের পাহাড় জমছে। কিন্তু সভাপতি মশাইয়ের সেদিকে নজর দেওয়ার সময়ই নেই।'

'কৃপালনি বোধহয় ভুলে গেছেন যে কলকাতা থেকে এলাহাবাদ কতটা দূরে।'

'তাতে?'

'অফিস স্থানান্তরিত করুন, নিদেনপক্ষে কলকাতায় কয়েকজন কর্মকর্তা নিয়োগ করুন, আমার এই সামান্য কথাটাও রাখতে প্রস্তুত নন তিনি। আমি একা কতটা করব?'

১৯৩৫-এর ভারত আইন আর দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে ফেডারেল স্টেটের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সুভাষ কলকাতায় মিছিল বার করেছিলেন। বারবার তাঁর ভাষণে তিনি আইরিশ আর ইতালির বিপ্লবীদের প্রশংসা করেছেন। তা ছাড়া ব্রিটিশ সরকারকে একটা চরমপত্র দিয়ে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কথাই শুধু নয়, সেই নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন।

হরিজন পল্লিতে সুভাষ-গাঁধী সাক্ষাৎকারের সময় গাঁধীজি বললেন, 'সুভাষ চরমপত্র দেবার ব্যাপারে তোমার বক্তৃতার ভাষা একটু নরম করে আনো। এই চরমপত্র দেবার পরিস্থিতি এখনও আসেনি।'

'কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক উলটো। চারদিকে যুদ্ধের মেঘ যত ঘনিয়ে আসছে ততই আমাদের সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করার উপযুক্ততম সময় এগিয়ে আসছে।'

গাঁধীজির কপালের বলিরেখাগুলো ঠেলে উঠল।

দুপুরের অধিবেশন শুরু হল। শুরুতেই রাজাজি প্রস্তাব আনলেন, 'যদি যুদ্ধের পরিস্থিতি আসে তবে সে বিষয়ে যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকবে ব্রিটিশ সরকারের। তাদের শুভবুদ্ধির ওপর কংগ্রেসের আস্থা আছে।'

রাজাজির এই প্রস্তাব কমিউনিস্ট আর সমাজতান্ত্রিক মতাবলম্বীদের কাছে সরকারের ধামা ধরার শামিল বলে মনে হল। শুরু হল তাদের সরব প্রতিবাদ। উত্তেজিত দত্ত মজুমদার হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে কোনওরকম আপস আমরা করতে দেব না। এ

ব্যাপারে স্বয়ং গাঁধীজিও আগে ভুল করেছেন। সে ভুলের পুনরাবৃত্তি হতে দেব না।' রাজাজির কথার সুর সুভাষের একেবারেই ভাল লাগেনি। বরঞ্চ দত্ত মজুমদারের উত্তেজিত বক্তব্যের মধ্যে তিনি যেন নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন। আপস প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ৭৩ জন বামপন্থী সদস্য বৈঠক বয়কট করলেন।

রাত্রে সবাই গিয়ে জড়ো হলেন গাঁধীজির কাছে। রাজাজি স্পষ্ট বললেন, 'বামপন্থীদের এ ধরনের দলবাজি আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।' ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে গাঁধীজিও রেগে গেলেন। এমন সময় বৈঠক-বয়কট-করা বামপন্থী জোটের সদস্যরা হাজির হলেন তাঁর কাছে। উত্তেজিত কণ্ঠে দত্ত মজুমদার বলে উঠলেন, 'বাপুজি, আপস-মীমাংসার জন্য ধরনা দেওয়া আর কতদিন চলবে? আমাদের সমস্ত বিবেকবুদ্ধি কি আমরা চিরকাল ব্রিটিশের কাছে বন্ধক রেখে দেব?'

'দেখ দত্ত মজুমদার, কংগ্রেসের ধরনধারন তোমাদের যদি পছন্দ না হয় তবে তোমাদের জন্য রাস্তা খোলা আছে। এতে যদি কংগ্রেস ভেঙে যায় তো ভাঙুক। এই ধরনের দলবাজি না করে তোমরা বরং কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাও। কংগ্রেস তাতে পবিত্র হবে।'

গাঁধীজির এই বিষোদ্‌গার সুভাষের মনে গিয়ে বিঁধল। তিনি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন যে যুদ্ধ যদি শুরু হয় তবে কংগ্রেস দু'টুকরো হয়ে যাবে।

৩

এত অল্প বয়সে আই সি এস-এর চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছ কেন? নাগপুরের বিশ্রামাগারে যুবকটিকে জিজ্ঞেস করছিলেন সুভাষ।

'বাবুজি আপনি আই সি এস-এর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন কেন?'

'দেশের জন্য।'

'আমি ইস্তফা দিচ্ছি আপনার জন্য।'

তখন থেকেই সেই টগবগে তরুণ, হরিবিষ্ণু কামাথ, সুভাষের একনিষ্ঠ সহযোগী। হরিপুরা কংগ্রেসের অনেক আগে থেকেই তিনি রাতদিন সুভাষের সঙ্গে থাকেন। শিল্পমন্ত্রীদের বৈঠক ডাকার আহ্বান একেবারে অভিনব ব্যাপার। প্রশাসনের কাজে অভিজ্ঞ কামাথ সোৎসাহে এ কাজে লেগে পড়েছেন।

২ অক্টোবর গাঁধীজির জন্ম-জয়ন্তীর দিন দিল্লিতে এই শিল্পমন্ত্রীদের বৈঠক বসবে। এর জন্য সাতটি কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের শিল্পমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। তা ছাড়া প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাদ সাহা এই বৈঠক সফল করে তোলার জন্য তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাতদিন পরিশ্রম করেছেন।

সুভাষ দিল্লিতে লালা শঙ্করলালের বাড়িতে উঠেছেন। এই বৈঠক সফল করে তোলার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করেছেন সুভাষ। শঙ্করলাল থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবুজি। শিল্পমন্ত্রীদের এই বৈঠকের ব্যাপারে গাঁধীজির মত নিয়েছেন তো?'

'নিশ্চয়। জুলাই মাসে ওয়ার্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেই এই বৈঠকের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আজকাল এইসব মান-অপমানের দিকে খুব দৃষ্টি দিতে হয়।'

হরিবিষ্ণু কামাথের ছুটোছুটির শেষ নেই। সুভাষ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বাঙ্গালোর থেকে বিশ্বেশ্বরায়া আসছেন কিনা।

'ঠিক বলতে পারছি না বাবুজি। তাঁর বয়সটা আশি ছুঁই ছুঁই কাজেই...'—কামাথ বললেন।

'এলে কি ভালই না হবে!'

আগামীকাল কি কি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হবে তার জন্য সুভাষ আর মেঘনাদ সাহা দুজনে মিলে একটা খসড়া করেছেন। কিছুদিন যাবৎ ড. সাহার সাহচর্য সুভাষকে আরও উদ্দীপিত করে তুলেছে। স্বাধীনতা একদিন আসবেই—দুদিন আগে বা পরে! কিন্তু স্বাধীনতার পরে দেশকে কোন পথে গড়ে তুলতে হবে সেই চিন্তায় সুভাষ বিভোর। রাত্রে বালিশে মাথা রাখার আগে প্রতিদিন ড. বিশ্বেশ্বরায়ার *ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা* বইটিকে খুঁটিয়ে পড়েন তিনি। দু' বছর হল ড. বিশ্বেশ্বরায়ার এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বেশ্বরায়ার কাজ ও ভাবনাচিন্তা অত্যন্ত আধুনিক। পুনা শহরের আধুনিক জলনিকাশি প্রকল্পের প্রথম পরিকল্পনা, কাবেরী নদীর ওপরে বিশাল কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধ ছাড়াও আরও অনেক বাঁধ নির্মাণ, হায়দরাবাদ শহরের পরিকল্পনা এসবই তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর। টাটা কোম্পানির অনেক শিল্পোদ্যোগেও কাজ করেছেন তিনি। শুধু স্থাপত্যে নয় মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান হিসাবে প্রশাসনিক কাজকর্মেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

২ অক্টোবর গাঁধীজির জন্ম-জয়ন্তী পালন করে সভার কাজ শুরু হয়। কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর এরকম বৈপ্লবিক পদক্ষেপ এই প্রথম। এর আগের বছরে জওহরলাল সভাপতি থাকার সময় শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা এ সমস্ত কাজ গ্রামস্বরাজের সংকট বলেই মনে করেন।

উদ্বোধনী সংগীত সবে শেষ হয়েছে। এমন সময় সভার পেছন দিকের দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠলেন। মহীশূরি ঢং-এর পাগড়ি পরা, দীর্ঘদেহী, অশীতিপর, সংকল্প দৃঢ় মুখ, এক বৃদ্ধকে লাঠি হাতে কম্পমান পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। 'বিশ্বেশ্বরায়া এসেছেন'—হইচই পড়ে গেল সভায়। সুভাষচন্দ্র দ্রুত পায়ে এসে তাঁকে মঞ্চে নিয়ে গিয়ে সসম্মানে বসালেন। সভা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল নতুন উদ্দীপনায়। ঘনশ্যামদাস বিড়লাসহ অল্প যে কয়েকজন দক্ষিণপন্থী উপস্থিত, তাঁরা সভার কাজের গতি-প্রকৃতির ওপর নজর আরও তীক্ষ্ণ করলেন।

আধুনিকতার সপক্ষে সুভাষচন্দ্র বলতে শুরু করলেন। 'প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভারে এক আমেরিকাই আমাদের সমকক্ষ। কিন্তু সে সম্পদের যথোপযুক্ত উপযোগ না করার ফলে ভয়াবহ বেকারি আমাদের দেশকে গ্রাস করছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ার অবস্থাও ছিল একইরকম। কিন্তু ষোলো বছরের মধ্যে রাশিয়ার কৃষকেরা জাদুর খেলা দেখিয়ে দিয়েছে। গড়ে তুলেছে এক বিশাল, শক্তিমান আধুনিক রাষ্ট্র। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে পরিকল্পিত অর্থনীতি। এ কথা সত্যি যে শিল্পবিকাশ অবিমিশ্রভাবে শুভঙ্কর নয়। কিন্তু আমাদের দেশের গড়ে তোলবার লক্ষ্যে শিল্পোদ্যোগ আজ একান্ত প্রয়োজনীয়। তবে এই শিল্পগুলো যেন পরিবেশ দূষিত না করে সে ব্যাপারে যথাসময়ে নজর দিতে হবে।'

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন প্রশ্ন করলেন, 'বাবুজি। আপনার প্রস্তাবিত শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে কুটিরশিল্প কী করে তাল মিলিয়ে চলবে?'

'প্রশ্ন কুটিরশিল্প বনাম ভারীশিল্পের নয়। ইউরোপের অনেক দেশে ভারীশিল্পের বিকাশ ঘটেছে কিন্তু তাতে কুটিরশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কুটিরশিল্পও একান্ত প্রয়োজনীয়।' বলতে বলতে একটু থামলেন সুভাষ। তারপর সবার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমাদের দেশের প্রয়োজন আজ গতিময়তার। শম্বুক গতিতে চলে আমরা বর্তমান জগতের প্রগতির সঙ্গে তাল রাখব কী করে?' সুভাষের কথায়

সর্বপ্রথম হাততালি দিয়ে উঠলেন বিশ্বেশ্বরায়া আর তার পরেই সারা সভাকক্ষ হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল।

'আগস্ট মাসে ওয়ার্কিং কমিটি আমার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাবে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন এবং সামাজিক পরিকল্পনার জন্যে একটি বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের কমিটি অবিলম্বে গঠন করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকটি প্রদেশে সেখানকার সম্পদ সম্পর্কে সার্ভে করতে হবে। কোনও কোনও সম্পদ হয়তো দুটি প্রদেশের যৌথ আওতায় আসবে। সেজন্যে আন্তঃপ্রাদেশিক কমিটিও গঠন করতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষির জন্য জলসেচ ব্যবস্থা, পানীয় জল, ভূমি সংরক্ষণ এই সমস্ত বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দেশের প্রতিটি নদী এবং তাদের অববাহিকা অঞ্চলের বিস্তারিত সমীক্ষা করতে হবে। আজকে আমাদের দেশের সামনে দারিদ্র্য আর বেকারি করালমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ অবস্থার নিরসনের জন্য চাই আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার।

'তবে শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করলে চলবে না। কৃষকদের সুখী করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে বেকারি দূর করার জন্য, দেশের সমৃদ্ধির জন্যে ভারীশিল্পের সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করতে হবে আমাদের। ভারী, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র—তিন রকমের শিল্পের দিকেই নজর দিতে হবে আমাদের।'

বক্তৃতা দিতে দিতে সুভাষের নজর পড়ল সভায় উপস্থিত কয়েকজন তরুণ ছাত্রের ওপর। তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন, 'একসময় নিজেদের দেশকে আধুনিক আর শক্তিশালী করবার পথের সন্ধান পেতে জাপানি ছাত্ররা দলে দলে দেশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। সেইরকম সংকল্প নিয়ে আজ আমাদের দেশের হাজার হাজার ছাত্রকে বাইরে পাঠাতে হবে। ফিরে এসে দেশের শিল্পবিস্তারের কাজে শামিল হবে।'

দেশের প্রগতির জন্য সুনির্দিষ্ট পথে যাতে এগিয়ে যাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে প্রথম একটি পরিকল্পনা কমিটি আর যথোপযুক্ত সময়ে সেই কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ যোজনা কমিশনে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হল। দেশের বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একটি সর্বাত্মক পরিকল্পনা নেওয়ার কথা স্থির হল। ভারী যন্ত্র, মোটরগাড়ি, জলযান এবং তাদের আনুষঙ্গিক উৎপাদন, শিল্পোদ্যোগের অনায়াস প্রসারের জন্যে রাস্তাঘাট তৈরি করে উপযুক্ত কাঠামো সৃষ্টি করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রাসায়নিক আর সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে অনেক প্রস্তাব সভায় গ্রহণ করা হল।

পরিকল্পনা সমিতির সদস্যদের নাম সভাপতি পরে ঘোষণা করবেন বলে স্থির হল। সুভাষের বারবার মনে পড়ছে পণ্ডিত নেহরুর কথা। মনে মনে সমিতির অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর কথাই ভেবে রেখেছেন সুভাষ। 'জওহর, তোমার অনুপস্থিতি আমি প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছি।' পণ্ডিতজিকে তাঁর লেখা চিঠির কথাগুলো পাক খাচ্ছে সুভাষের মনে।

অধিবেশনের সাফল্যে সুভাষের মন ভরে গেছে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর মনের মধ্যে যে অশান্তি জমাট বেঁধেছিল সেটা সরে গেছে। তৃপ্ত সুভাষ এগিয়ে ড. বিশ্বেশ্বরায়াকে প্রণাম করলেন। বহু পরিকল্পনার রূপকার অশীতিপর বৃদ্ধ তাঁর কম্পমান হাত সুভাষের পিঠে রাখলেন। আবেগমথিত স্বরে বললেন, 'ওয়েল ডান সুভাষ। অতীতকে ভুলে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও—একথা কবে থেকে চিৎকার করে বলে চলেছি আমি। উন্নত রাষ্ট্রগুলির কাছাকাছি পৌঁছতে হলেও আমাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে। এর আগে "পরিকল্পনা" শব্দটা উচ্চারণ করাও একটা অপরাধ বলে গণ্য হত। চরকা ছাড়া আর

কোনওদিকে দেখার প্রস্তুতিটুকুও নেই আমাদের। এরকম পরিস্থিতিতে গাঁধীজির কংগ্রেসের সভাপতি "পরিকল্পনা কমিটি" স্থাপন করছেন সেটা শুনেও কান জুড়িয়ে গেল আমার।'

সুভাষচন্দ্র আবার প্রণাম করলেন বিশ্বেশ্বরায়াকে। আশীর্বাদ নিলেন তাঁর। আগামীদিনের জন্য পথনির্দেশ চাইলেন।

'যে রাস্তা নিয়েছ সেটা ছেড়ো না। যে যাই বলুক, এ দেশের উন্নতি হতে পারে একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যে। সুভাষ, তোমার চলার পথের জন্য রইল আমার শতসহস্র আশীর্বাদ।'

'সুভাষ বোস ইদানীং সব বিষয় নিয়ে কথা বলছে। বোধহয় সে মনে করছে যে— সেই সব জানে।' মৌলানা আজাদ বললেন।

'যতখানি অধিকার সে প্রয়োগ করতে চাইছে, তত অধিকার বা ক্ষমতা কংগ্রেস মহাসমিতি তাকে দেয়নি।' সর্দার পটেল বন্ধুকে বললেন।

কারও পছন্দ হোক আর নাই হোক বসুভ্রাতারা নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই ওয়ার্ধায় এসেছেন দুই ভাই। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ওয়ার্ধা। ঠিক তাও নয়। আসলে গাঁধীজি যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতাও সেখানে। সুভাষ তাঁর ওপরে গাঁধীজির অসন্তুষ্টির কথা ভাল করেই জানেন। তা সত্ত্বেও তিনি আলোচনা শুরু করলেন।

'বাপুজি দিনে দিনে মুসলিম লিগ ক্রমশই আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করছে। যে-সব শহরে বেশি মুসলমানের বাস, সে-সব শহরে জিন্না সাহেবকে হাতিতে চড়িয়ে শোভাযাত্রা বেরোচ্ছে। কংগ্রেস সরকার শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের ওপর ঘোর অন্যায় করা হচ্ছে বলে ক্রমাগত তারস্বরে বলে চলেছেন তিনি।'

'এ ব্যাপারে কী করা যায়?' গাঁধীজি গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা সার্বিক নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সত্যিই যদি কোনও অন্যায় ঘটে থাকে তো সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। মিস্টার জিন্নার অভিযোগ আর সতর্কবাণী উচ্চারণ সময় থাকতে বন্ধ করতে হবে। নয়তো সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফফর খানের অক্লান্ত চেষ্টায় গড়া কেল্লাও হয়তো ভেঙে পড়বে।' সুভাষচন্দ্র বললেন।

বিভেদবাদ আর সাম্প্রদায়িকতা সম্প্রতি যে ভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে তাতে গাঁধীজি খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন। মুসলিম লিগ কোথাও সরকার গড়তে পারেনি। তাই তাদের বক্তব্যে আক্রোশ ফেটে পড়ছে। 'বাপুজি সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে পাকিস্তানের বিভীষিকা একদিন বাস্তব হয়ে উঠে আমাদের গলা টিপে ধরবে।' সুভাষচন্দ্র তাঁর ভয়টা স্পষ্ট করেই বললেন।

'তুমি কী করতে চাও?'

'মুসলিম লিগ ছাড়া অন্য মুসলিম দলগুলো সিন্ধু, পঞ্জাব আর বাংলায় সরকার গড়েছে। কংগ্রেস তাদের সহায়তা করুক। হয় সরকারে অংশগ্রহণ করুক আর নয় তো বাইরে থেকে সমর্থন দিয়ে তাদের শক্তি বাড়াক।'

'তাতে আমাদের লাভ?'

'আমরা যদি তাদের কাছে যাই, আস্তে আস্তে তারা মূল জাতীয়স্রোতে শামিল হবে। তাদের লিগবিরোধিতাও টিকে থাকবে। এইসব প্রদেশে মুসলিম লিগ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। অনেক

জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাও আস্তে আস্তে মুসলিম লিগের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। জেহাদের জিগির বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই এই তিনটি প্রদেশে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে এই সব দলকে মুসলিম লিগের শরণাপন্ন হতে হবে।'

গাঁধীজির মুখে হাসি ফুটল। শরৎবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী শরৎ? সুভাষের কথাগুলো শুনছ তুমি?'

'এ ছাড়াও এই তিন প্রদেশের সরকার যদি আমাদের সহযোগী হয় তবে ব্রিটিশের সঙ্গে আলোচনা করার সময় এটা স্পষ্ট হবে যে কংগ্রেসই সারাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

সুভাষচন্দ্রের বিশ্লেষণ গাঁধীজির মনে ধরেছে বলেই বোধ হচ্ছে। খোলা মনেই বললেন তিনি, 'শরৎ, সুভাষ। এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তোমরা বাংলাতেই প্রথম এগোতে শুরু কর।'

'মৌলানা আজাদের কিন্তু কোয়ালিশন সরকার পছন্দ নয়।'

'কেন?'

'সাম্প্রদায়িক সরকারগুলোর কাছ ঘেঁষতেও রাজি নন তিনি। তাঁর বিশ্বাস যে এইসব দলগুলো একদিন নিজেদের মরণ নিজেরাই ডেকে আনবে। কিন্তু বাপুজি আমার ভয় এরা নিজেদের না মেরে দেশকেই মারবে। আমরা যদি মুসলিম লিগ ছাড়া অন্য মুসলিম দলগুলোকে কাছে না টানি তবে একদিন তারা সবাই মুসলিম লিগের ঝান্ডার নীচে শামিল হবে। তাদের দাপট তখন আমাদের ঘাম ছুটিয়ে ছাড়বে।'

'সাবাস সুভাষ। দেশের ঐক্যরক্ষার ব্যাপারে এত গভীর চিন্তা করতে আর কাউকে দেখিনি আমি। তুমি তোমার প্রয়াস চালিয়ে যাও।'

গাঁধীজির সম্মতি পেয়ে সুভাষ আশ্বস্ত বোধ করেন। আবেগকম্পিত স্বরে তিনি বললেন, 'ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগেই কংগ্রেস যেন এগারোটি প্রদেশেরই হয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথা বলতে পারে সে চেষ্টাই আমি করব বাপুজি।'

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের উন্নাসিকতায় অবশ্য কোনও খামতি নেই। সুভাষের পেছনে তাঁরা সুভাষকে 'বাচ্চা, অবুঝ' ইত্যাদি বলে থাকেন। টিপ্পনীর আর শেষ নেই।

'নিজেই চললেন জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করতে।'

'বড় বড় সায়েন্টিস্ট আর ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে সারা দেশে নেচে বেড়াচ্ছেন। কমিটি করছেন।'

'গাঁধীজির চেয়েও বড় বলে ভাবেন নিজেকে।'

'গাঁধীজির সারা জীবনের কাজের ওপর গোলমাল পাকাবে এ লোকটি।'

'একটু অপেক্ষা কর। আর দু'মাসের মধ্যেই তো বাবুর দখলদারি শেষ হচ্ছে। ত্রিপুরীতে নতুন সভাপতি আসছেন, তারপর দেখা যাবে কী হয়।' নিজেদের মধ্যে বলাবলি হয়।

সুভাষচন্দ্র তখন বোম্বাইতে নাথালাল পারেখের বাড়িতে রয়েছেন। মাদ্রাজে যাবেন তিনি। এমন সময় গাঁধীজির চিঠি পৌঁছল তাঁর কাছে— 'আপাতত কোয়ালিশন সরকারের ব্যাপারে কিছু কোরো না।' মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এরকমটি কেন হল? খোঁজ নিতে লাগলেন তিনি। বাংলার কংগ্রেসের মধ্যেকার বিরোধীরা ঘটিয়েছেন ব্যাপারটা। স্থানীয় রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়েছে। ঘনশ্যামদাস বিড়লা আর নীলরতন সরকার, মৌলানা আজাদকে নিয়ে ওয়ার্ধায় এসেছিলেন।

ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে সুভাষের। নাথালালকে বললেন, 'আমাদের বন্ধুরা সুভাষের ওপর শোধ নেওয়ার জন্য দেশের যে কতবড় ক্ষতি করলেন সেটা বোধহয় বুঝতেও পারছেন না।'

৫

বারদোলিতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে। সদস্যরা এসে পৌঁছেছেন। সন্ধ্যার সময় আশ্রমে হাসিঠাট্টা চলছে। রাজেন্দ্রবাবু বললেন, 'দু'মাসের মাথায় ত্রিপুরী অধিবেশন বসবে। দেখতে দেখতে একটা বছর যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বোঝাই গেল না।'

'সুভাষ নাকি আবার সভাপতি হতে চায়?' সর্দার পটেল বললেন।

কথাটা শুনেই আচার্য কৃপালনির মুখের অবস্থাটা দেখার মতো হয়ে উঠল। মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন বসবে। তার উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। কৃপালনি উদ্বিগ্নভাবে বললেন, 'সত্যি সত্যি সভাপতি শেষ পর্যন্ত কে হবেন?'

'মৌলানা আজাদ আর অন্ধ্রপ্রদেশের ড. পট্টভি সীতারামাইয়াকে নিয়েই আলোচনা চলছে।'

'অর্থাৎ সুভাষ যদি পিছিয়ে যায় তবেই তো?' আচার্য খোলসা করতে চান।

'সুভাষ পিছপা হবে? কী যে আবোল-তাবোল বল জীবিত?' সর্দারের কথার ভঙ্গিতে হাসির রোল উঠল। তবে কৃপালনি গম্ভীর। এমন সময় ড. সীতারামাইয়া এসে উপস্থিত হলেন। আচার্য কৃপালনি এবার একটা খবরের কাগজের কাটিং বার করলেন। কাগজটা সর্দার পটেলের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এই দেখুন। আমাদের উদ্দীপনাময় কংগ্রেস সভাপতির সাম্প্রতিক জালিয়ানওয়ালাবাগ যাত্রার সচিত্র বিবরণ।'

সবাই ছবিটা ভাল করে দেখলেন— 'শহিদ স্মারকে সুভাষচন্দ্র সামরিক কায়দায় অভিবাদন করছেন।' সীতারামাইয়া বললেন, 'যাই বলুন। যেখানেই যান না কেন, এ ব্যক্তিটির চেহারার মধ্যে একটা ফৌজি ভাব ফুটে ওঠে।'

'মিউনিখ চুক্তির সময় থেকেই সুভাষের বক্তব্য ভয়ংকর রকম আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে।'

'কিন্তু কংগ্রেস আর গাঁধীজির সম্মতি ছাড়া এ রকম লড়াইয়ের শিঙে ফোঁকার অধিকার উনি পেলেন কী করে?' আচার্য বলে উঠলেন।

'চিঠিবাজিও খুব চলছে।' ড. সীতারামাইয়া অপ্রসন্ন সুরে বললেন। 'সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নাম্বুদ্রিপাদ, পি. রামমূর্তি, সাজ্জাদ জাহির সবাই "সুভাষকে আবার কংগ্রেস সভাপতি করা হোক" বলে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া হুমায়ুন কবীর, সৈয়দ হুসেন আর আলি চৌধুরীর মতো মুসলিম নেতারাও ঠিক এই সময়ে সুভাষের পক্ষে আবেদন জানিয়েছেন। এ সবের অর্থ কী?' মৌলানা আজাদ প্রশ্ন করলেন।

হরিপুরা কংগ্রেসের পর কিছুটা শান্ত হয়ে আসা, সতর্ক সুভাষের মধ্যেও আবার একটা টগবগানি দেখা দিচ্ছে। 'যে-কোনও স্তরেই হোক, কংগ্রেসকে আপসের ভাষা ছাড়তে হবে। নতুন যুগ আহ্বান জানাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের জন্য। কেন্দ্রে আজ যে ফেডারেল স্টেটের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে তাকে ঠেকাতে হলে আগামী কংগ্রেস সভাপতি বামপন্থীদের মধ্যে থেকেই হতে হবে। এইসব উত্তেজক মন্তব্যে দক্ষিণপন্থীরাও এবার চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

'বারদোলির বৈঠক হওয়ার আগেই ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আর তার প্রতিক্রিয়াগুলো গাঁধীজির গোচরে আনতে হবে।' রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন।

'আমি এখনই গাঁধীজির কাছে নালিশ করব।' কৃপালনি ফেটে পড়লেন।

'দেখুন আচার্য। আপনি একটু ঠান্ডা হয়ে থাকুন। আপনার সুভাষ বিরোধিতা গাঁধীজি ভালই জানেন। তাই আপনার নালিশ তাঁর কাছে খুব গুরুত্ব না-ও পেতে পারে।' রাজেন্দ্রবাবু বললেন।

এমন সময় ভুলাভাই দেশাই এলেন সেখানে। তাঁর সুভাষ বিরোধিতার কথা সবারই জানা।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ভুলাভাই আর ড. সীতারামাইয়া এই দুজনে গাঁধীজির কানে তুলবেন সব কথা। বাপুজির কাছে সবসময় ভিড়ভাট্টা। তাই বিকালে তিনি যখন হাঁটতে বেরোবেন তখনই এসব বলা হবে বলে স্থির হল। এই দুজনের সঙ্গে রাজাজিও জুটলেন।

ড. সীতারামাইয়া গাঁধীজির সঙ্গে রোজই থাকেন। কিন্তু আজ তাঁর সঙ্গে ভুলাভাই আর রাজাজিকে দেখে আশ্চর্য হলেন গাঁধীজি।

'বাপু, আমার মনে হচ্ছে বাংলার গরম রক্ত আর আপনাকে শান্ত থাকতে দেবে না।' বললেন ভুলাভাই।

'কি ব্যাপারে বলতে চাইছ?'

'জয়প্রকাশ, মানবেন্দ্রনাথ রায় এঁরা আজকাল সুভাষের খুব তারিফ করছেন।'

'আজকালকার ছেলেদের চিন্তায় আমি একটা হিটলারি ভাব দেখতে পাই।'

গাঁধীজির খোলামেলা মেজাজের আন্দাজ পেয়ে ভুলাভাই এবার বললেন, 'তরুণদের অহংকার থাকবে এটা আমিও বুঝি। তবে তার একটা সীমা থাকবে না! সুভাষ কৃপালনির মতো প্রবীণ সহযোগীকেও পাত্তা দেয় না, অন্যদের তো কথাই নেই।'

'কংগ্রেস প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক কারচুপির অভিযোগ বাংলা থেকে আসছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের ভোটার তালিকা একেবারেই বোগাস এমন অভিযোগ স্বয়ং ড. বিধানচন্দ্র রায় করেছেন।' রাজাজি ফোড়ন কাটলেন।

'সুভাষকে ওর আচরণ ঠিক করতে হবে।' গাঁধীজি বললেন।

'একান্ন বলদ দিয়ে টানা রথে চড়িয়ে তাঁকে নিয়ে শোভাযাত্রা, হরিপুরা কংগ্রেসের ঠাটবাট মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে ওর। সভাপতি তো প্রত্যেক বছরই হন আবার চলেও যান। এত ঝঞ্ঝাট আগে কেউ করেননি।' রাজাজি বলতে থাকেন।

'নিজের ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইটাতে আপনার আর কংগ্রেসের সম্বন্ধে সুভাষ যে সব মন্তব্য করেছে সেগুলো আপনার দেখা উচিত বাপু।' ভুলাভাই যোগ করলেন।

'বইটা কেমন?'

'কালকেই এনে দেখাব আপনাকে।'

সুভাষচন্দ্রের ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেছিল। মাঝে মাঝে দু-একটা কপি লুকিয়ে চুরিয়ে ভারতে আসে। তবে সম্প্রতি ভুলাভাই লন্ডন থেকে গোপনে একটা কপি আনিয়েছেন। গাঁধীজি দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করার অপেক্ষাটুকু শুধু ছিল। ভুলাভাই আর আচার্য কৃপালনি সারারাত জেগে দরকারি লাইনগুলোতে দাগ দিলেন, পেজমার্ক দিলেন। সকালেই বইটি হাতে করে ভুলাভাই হাজির হলেন গাঁধীজির কাছে। বললেন, 'বাপুজি কয়েকটা নমুনা পড়ে শোনাব কি?'

'পড়ো।' গাঁধীজি অনুমতি দিলেন।

'গাঁধীজির অনেক অনুগামীদের মধ্যেই নিজস্ব চিন্তার ক্ষমতা নেই।' গাঁধীজি গম্ভীর। ভুলাভাই আর এক জায়গা থেকে পড়লেন, 'একটিমাত্র লোকের পায়ের কাছে কংগ্রেসিরা নিজেদের আক্কেলবুদ্ধি বন্ধক রেখেছেন।'

গাঁধীজি এবার ভুলাভাইয়ের হাত থেকে বইটা নিয়ে পড়বার জন্য নিজের কাছে রেখে দিলেন। তবে এত কিছুর পরও গাঁধীজি বিশেষ কিছু বললেন না। তাই ভুলাভাই আর রাজাজি রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েই গাঁধীজির কুটির থেকে বেরোলেন।

দুপুরবেলা একটু নিরিবিলিতে গাঁধীজি সর্দার পটেলকে ডেকে পাঠালেন। চরকায় হাত

ঘোরাতে ঘোরাতে নিজে থেকেই বললেন, 'সর্দার। সুভাষের নামে নালিশের পর নালিশ আসছে। সভাপতির ব্যাপারে কী করা যায়?'

'আমি কী করব? আপনি যা আদেশ দেবেন তাই হবে।'

বাপুজি কিছু বললেন না। চরকা আরও জোরে ঘোরাতে লাগলেন। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। হঠাৎ চরকা থামিয়ে একটু হেসে বললেন, 'সুভাষকে বোঝানো বা সামলানো বড় কঠিন। ওর ত্যাগ আর দেশপ্রেমে আমি চিরকালই মুগ্ধ। কিন্তু...'

'কিন্তু কী বাপুজি?'

'মিউনিখ চুক্তির পর থেকেই ছটফট করছে সুভাষ। চরমপত্র, সংঘর্ষ এসব ছাড়া কথাই নেই তার মুখে।'

চিন্তাক্লিষ্টভাবে সুতো কেটে চলেছেন গাঁধীজি। ঘরঘর ঘরঘর করে চরকা চলছে। গায়ে চাদর নেই। পরনে শুধু খাটো ধুতি। কখনও তাঁকে নির্বিকার দেখাচ্ছে, কখনও বা মুখ কঠোর হয়ে উঠছে। 'দেশে ভারীশিল্পের ভিত্তিস্থাপন করুন', 'রাশিয়ার মতো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করুন', 'আয়ারল্যান্ডের মতো তীব্র সংগ্রাম করুন'— সুভাষের এইসব জ্বালাময়ী ভাষণ কানে বাজছে তাঁর। সেই সঙ্গে রাজাজি, কৃপালনির মতো লোকেদের বিষোদ্গারও তাঁর মনে খোঁচা মারছে। 'সুভাষকে যদি এরকম ছাড় দিয়ে রাখেন তবে কিন্তু আপনার জীবনব্যাপী কাজের ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসবে।'

একসময় চরকা থামল। সুতো কাটাটা মনোমতো হয়েছে। গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে গাঁধীজি এবার উঠলেন। বললেন, 'সর্দার—'

'বাপু?'

'সুভাষকে সভাপতির পদ থেকে সরাতেই হবে। তবে তার অসন্তুষ্টিও আমি চাইছি না। অত্যন্ত উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন নেতা সে।'

গাঁধীজির মনের আন্দাজ বাম বা দক্ষিণ কোনও গোষ্ঠীই আঁচ করতে পারলেন না। সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে এবং গাঁধীজির উপস্থিতিতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের দুটো দিন কেটে গেছে। রাত্রিতে আশ্রমে এক অদ্ভুত শান্তি ছেয়ে রয়েছে। বাইরে কারও গাড়ি এসে থামল। হবে কেউ, ভেবে বাপুজি বড় একটা খেয়াল করলেন না। আশ্রমে সবাইকেই খুব ভোরে উঠতে হয়। তাই বেশির ভাগ লোক তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েন। শোবার আগে হাতজোড় করে বিড়বিড় করে জপ করছেন গাঁধীজি। ঠিক সেই সময় গাঁধীজির কুটিরের দরজায় টোকা দিল কেউ।

'কে?'

'আমি বল্লভ বাপুজি।'

'সর্দার? এত রাত্রে?'

'খুব জরুরি কাজ আছে বাপুজি।'

'ঠিক আছে ভেতরে এস।'

সর্দারের সঙ্গে ছিলেন বোম্বাই প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কানহাইয়ালাল মুন্সি। সারাদিনের ভ্রমণের পরিশ্রমে তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। গাঁধীজির বেশি সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না। সর্দার পটেল ইশারা করতেই কানহাইয়ালাল এগিয়ে এসে একটা মোটাসোটা কালো রঙের ফাইল গাঁধীজির হাতে দিলেন। চশমাটা চোখে দিয়ে গাঁধীজি ফাইলের ভেতরকার কাগজগুলো দেখতে লাগলেন। টাইপ করা ছোট ছোট নোট, টেলিগ্রাম, কাগজের কাটিং, গোপন বার্তা, ফটোগ্রাফ

এইসব দিয়ে ফাইল ভরতি। ফাইল দেখতে দেখতে প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছে তাঁর। গাঁধীজি জোর করে আত্মসংবরণ করলেন। কিছুক্ষণ পর ফাইলের ফিতেটা নিজের হাতেই বাঁধলেন। তারপর সেটা বালিশের নীচে রেখে দিলেন। মুন্সিজির কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' মুন্সি বেরিয়ে যাবার পর গাঁধীজির প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য গাঁধীজির চোখের দিকে তাকালেন সর্দার। গাঁধীজি শুধু বললেন, 'আমার আগেই আন্দাজ ছিল। স্বাধীনতার উদগ্র লালসা ওকে অন্ধ করে দিয়েছে। তার জন্য ও সব কিছু করতে পারে।'

৬

'সুভাষ তুমি ভয়ানক উচ্চাকাঙ্ক্ষী?' জওহরলাল বলছিলেন।

'না দাদা। আমার মাতৃভূমি আর তার কল্যাণের চেয়ে বেশি আমার কাছে কিছুই নয়। একটা কথা বলব, শুনবেন?'

'বলো।'

'আমার জায়গায় আপনি সভাপতি হোন না কেন?'

'তাতে কী হবে?'

'দেশের প্রগতিপন্থীরা আপনার পেছনে দাঁড়াবে। কংগ্রেসের সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়ে নতুন পথে যাত্রা শুরু হবে।' সাগ্রহে বলেন সুভাষ।

'আমার সভাপতি হয়ে কাজ নেই। আর তোমারই বা সভাপতি হবার কী দরকার? সুভাষ ওই পদের চেয়ে তোমার গুরুত্ব অনেক বেশি।'

'দাদা। আমার এখন নিজের লঘুত্ব-গুরুত্ব নিয়ে আদৌ কোনও পরোয়া নেই। আমার দুই কানে খালি বাজছে কালের আহ্বান।'

'কীসের আহ্বান?'

'আমি দেখতে পাচ্ছি মহাযুদ্ধ, আকাশসমান ঢেউ গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে। সে উত্তাল তরঙ্গ সারা পৃথিবী গ্রাস করবে। সেই পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের মধ্যে থেকেই খুঁজে আনতে হবে স্বাধীনতার অমূল্য মানিক। তাই এইরকম দুর্যোগের মধ্যে কংগ্রেসের তরীটি চালাবার জন্যে প্রয়োজন বজ্রমুষ্টির, আপস-সমঝোতার নয়।'

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক কোনওরকম বিবাদ-বিসংবাদ ছাড়া নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। ঝড় শুরু হয়নি তবে বাতাসে বারুদের গন্ধ। সুভাষ সংক্রান্ত কোনও ভয়ংকর ফাইল গাঁধীজির হাতে এসেছে এটা জানেন হাতে গোনা কয়েকজন। তাদের মধ্যে গুজগুজ চলছে সেটা নিয়ে।

দক্ষিণপন্থীদের ভাবগতিক দেখে সুভাষ বুঝতে পারছিলেন সম্ভাব্য সভাপতির তালিকায় তার নাম থাকবে না। দুই ভাই গাঁধীজির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর কুটিরে উপস্থিত হলে সবাই যেন হকচকিয়ে গেলেন। গাঁধীজি অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হেসে বসুভ্রাতাদের স্বাগত জানালেন। শুরুতেই বললেন, 'সুভাষ তোমার বইটা পড়ছি আমি।'

'কেমন লাগছে?'

'আমার ওপর যে সব টিপ্পনী কেটেছ সেগুলো পড়ে বেশ মজা লাগছে। আমি যে কতখানি বুদ্ধু সেটা তোমার বইটা পড়ে বুঝতে পারছি। বেশ ভাল সময় কাটছে আমার।'

শরৎবাবু অবস্থাটা বুঝে বললেন, 'বাপুজি। এই বইটা তিন-চার বছর আগে লেখা। সেই সময়ে লেখকের মত...'

গাঁধীজি শূন্যে তাকিয়ে। তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। গম্ভীরভাবে বললেন তিনি, 'শরৎ, আইন ছাড়াও ইতিহাস সম্পর্কেও তোমার ভাল জ্ঞান আছে। নিশ্চয়ই পড়েছ যে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের বহু আগে থেকে তার লক্ষণ টের পাওয়া যাচ্ছিল, তাই না? আজ কংগ্রেসে এত অনাচার আর ভ্রষ্টাচার ঢুকে পড়েছে যে পঞ্চাশ বছরের সমস্ত অর্জিত পুণ্য থাকা সত্ত্বেও এই সংগঠন শিগগিরই ভেঙে যাবে। এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত আমি।'

বসুভ্রাতারা চুপ করে রয়েছেন। গাঁধীজি তাঁর অশান্ত চিত্তকে সামলাতে পারছেন না। তিনি বলতে থাকেন, 'সুভাষ অনেকদিন ধরেই একটা কথা তোমাকে বলি বলি করেও বলা হয়নি। কিন্তু আর না বললেই নয়। ফেডারেল স্টেট বা কেন্দ্রে সরকারের ব্যাপারে তোমার মত আর বারবার চরমপত্রের হুঁশিয়ারি আমার যে শুধু ভাল লাগছে না তা নয়, বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।'

এতক্ষণে সুভাষ কথা বললেন। 'এটা হুঁশিয়ারি নয় বাপুজি, কালের সংকেত।'

'ফেডারেল স্টেট আমার কাছেও একটা মৃত বিষয়। কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার ইচ্ছে আদপেই নেই কংগ্রেসের।' গাঁধীজি একটু উত্তপ্ত হয়েই জবাব দিলেন।

আগের মতোই শান্তস্বরে সুভাষ বললেন, 'প্রদেশগুলোতে ক্ষমতায় আসার আগেও আমরা সবাই এ কথাই বলছিলাম। পণ্ডিতজি পর্যন্ত এই কথা বলছিলেন। কিন্তু কী হল? আজ ক্ষমতার মোটরগাড়ি ধুলো উড়িয়ে চলছে। দেশসেবা বা সাধারণ মানুষের প্রতি কারও লক্ষ নেই। আমাদের বিধায়করা ব্যস্ত লাটসাহেবের পার্টিতে গিয়ে হাসিঠাট্টা করতে।'

গাঁধীজি বললেন, 'তোমার এই চরমপত্রের ব্যাপারটা এমন অপরিপক্ক, ঠিক করে বলতে গেলে একেবারে ছেলেমানুষি।'

'তা হলে কী করা উচিত বাপুজি? আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে ব্রিটিশের হৃদয় পরিবর্তন হবে, শান্তিপূর্ণভাবে চলে যাবে তারা? খোদ ব্রিটেন হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করলে সেটা হয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আর আমরা তার নাম নিলেই হয়ে যাই ফ্যাসিস্ট। বাপুজি ক্ষমা করবেন। আজ প্রতিটি দেশ নিজেদের স্বার্থ দেখছে। তাই আমারও মনে হয় প্রয়োজন হলে আমাদের অন্য রাষ্ট্রের সহায়তা নিয়েও স্বাধীনতা পেতেই হবে।'

গাঁধীজির সঙ্গে সুভাষের এই বাদানুবাদে শরৎবাবুর অস্বস্তি বেড়ে চলেছে। তিনি সুভাষের গা টিপে তাকে থামাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সুভাষের কোনও খেয়াল নেই। বিক্ষুব্ধস্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'ফেডারেল স্টেটের মতো দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রশ্নে যিনিই সমঝোতা করুন, সে পাপের ভাগী আমি হতে পারব না। তার চেয়ে আমি ইস্তফা দেব। আমাকে ছেড়ে দিন।'

'সুভাষ এ ধরনের কড়া কড়া কথা না বললেই ভাল করতে তুমি।' গাঁধীজি এবার প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, 'বয়সের সম্মানের কথা অন্তত একটু ভাব। আমি তোমার বড় ভাইয়ের সামনেই বলছি— আমার কথা, আমার লেখা, তোমার কাজের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে যদি তোমার মনে হয়, একবার শুধু মুখ ফুটে সে কথাটা বল। ব্যস, আর আমি তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলব না।'

গাঁধীজির চড়া আওয়াজে সুভাষ আহত বোধ করলেন। তবু শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'এক পুতুল সভাপতি হয়ে মালা আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমি খুব সহজেই বছরটা কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু পরিকল্পনা আর পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত, দেশের ঐক্য অটুট রাখার জন্য জিন্না সাহেবের সঙ্গে আলোচনা, আমার স্পষ্ট করে কথা বলা এ সবের ফল আজ

আমাকে ভুগতে হচ্ছে। তবু বাপুজি থেকে থেকেই আমার মনে হচ্ছে যে বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেসের আরও আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করতে হবে আর তার জন্য চাই আপনার আশীর্বাদ।'

তেতো হাসি হেসে গাঁধীজি বললেন, 'তোমার সাহায্যে আমি আসতে পারব না। আমার মতো একটা জগদ্দল পাথর তোমার রাস্তায় না থাকাই তো ভাল।'

দুই ভাই কলকাতায় যাবার জন্য চলে গেলেন।

গাঁধীজি জওহরলালকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সামনে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটা চিঠি ছুড়ে ফেললেন। সে চিঠিতে কবি সুভাষকে আবার সভাপতি করার কথা লিখেছেন।

গাঁধীজি বললেন, 'বাংলার বিপ্লবীদের দূষিত বাতাবরণ যদি সাফ করতে হয় তবে কংগ্রেস সভাপতি বাংলা থেকে না করাই ভাল।'

'বাপুজি, সুভাষকে সভাপতি করাতে যদি আপনার এত যন্ত্রণা বাড়ে তো বাদ দিন না ওকে। তা ছাড়া সুভাষ কী করতে পারবে। আয়ারল্যান্ডের প্রশংসা আর বিপ্লবের বুলি কপচানো— সবই শুধু বারফট্টাই।'

'না জওহর। আমিও তাই ভাবতাম। কেবল মুখের কথা ভেবেই এত বড় ভুলটা করে বসেছি আমি।' গাঁধীজির এত কঠিন চেহারা জওহরকে ভয় পাইয়ে দিল। বিনম্রভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'বাপু, আজ কি কিছু ঘটেছে? আপনার এত রাগ তো কখনও দেখিনি।'

আর কথা না বলে গাঁধীজি সেই ফাইলটা জওহরকে দিলেন। ফাইলটা দেখতে দেখতে জওহর হতভম্ব। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যাপারে জার্মানির এক প্রতিনিধি দল বোম্বাইয়ে এসেছিলেন। তার মধ্যে হিটলারের দুই মন্ত্রীও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র রাত্রে গোপনে তাজমহল হোটেলে গিয়েছিলেন। ফটোতে তাঁর পোশাক একেবারে খাঁটি ইউরোপীয়। ফেল্ট হ্যাট, আপাদমস্তক সাহেবি পোশাক, চট করে চেনা যাবে না এমন পোশাক। দরজা বন্ধ করে তাজমহল হোটেলের কামরায় জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টা ছিলেন তিনি। তিনি কখন এসেছেন, কখন বেরিয়ে গেছেন তার ঠিকঠাক সময় আর করিডরে হ্যান্ডশেকের ছবি ব্রিটিশ গোয়েন্দারা সংগ্রহ করে বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে মুন্সি কানহাইয়ালালের কাছে পেশ করেছেন। সেটিই মুন্সিজি গাঁধীজির হাতে এনে দিয়েছেন।

'হিটলারের এজেন্টদের সঙ্গে আমাদের সভাপতির গোপন সাক্ষাৎকারের কী প্রয়োজন হল?'

'ঠিকই তো।'

'একদিকে আমাদের অহিংসার নীতি সারা পৃথিবীতে একটা শুভবুদ্ধির সূচনা করেছে। অহিংসার নির্মল, শুভ্র আবরণ ধারণ করে আমি কোন মুখে পৃথিবীর সামনে বলব যে আমাদেরই কংগ্রেস সভাপতি গোপনে গোপনে হিটলারের এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।'

'বাপুজি, মনে এত যন্ত্রণা পুষে না রেখে আপনি বরঞ্চ ব্যাপারটা ভুলে যান।'

'ভুলে যাব? সুভাষকে ভুলে যাব? ওর ওপরে আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই। তবু ওর কথা ভাবতে গেলেই আমার ভেতর পর্যন্ত মুচড়ে ওঠে। কেন? সত্য আর অহিংসার পূজারি আমি। সেই আমার ওপর কী জাদু করেছে ও কে জানে?'

অনেক রাত্রে গাঁধীজি তাঁর কুটিরে ফিরে এলেন। কস্তুরবা জেগেই ছিলেন। কী অন্তঃপুরে কী রাজনীতিতে গাঁধীজির কোনও ব্যাপারেই কস্তুরবার তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না।

তবু শীতে, গ্রীষ্মে সমস্ত ঋতুতে, দুঃখে, সুখে গাঁধীজির কাছে থাকার জন্য, রাত জেগে অপেক্ষা করার জন্যই ছিলেন এই পাথরের প্রতিমাটি।

গাঁধীজি জীবনে যা কখনও করেননি হঠাৎ তাই করলেন আজ। কেন যেন কস্তুরবাকে কিছু বলার ইচ্ছে হল। বললেন, 'বা, তোমার সুভাষ বড় কষ্ট দিচ্ছে আমাকে।'

৭

'স্বয়ং গাঁধীজিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সুভাষ নিজেকে কী ভাবে?' কলকাতায় দক্ষিণপন্থী এক প্রবীণ নেতা প্রশ্ন করলেন। বিড়লা পার্ক আর সোদপুরে সতীশ দাশগুপ্তের আশ্রম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম সভাপতিপদের জন্য প্রকাশ্য নির্বাচন হতে চলেছে। সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছেন। দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ থেকে হয় মৌলানা আজাদ নয়তো ড. পট্টভি সীতারামাইয়া দাঁড়াবেন।

কেউই যদি নাম প্রত্যাহার না করেন ২৯ জানুয়ারি, ১৯৩৯ নির্বাচন হবে। এদিকে শরৎচন্দ্রের বড় ছেলে অশোকনাথের বিয়ে ২৮ জানুয়ারি। একদিকে রাজনৈতিক কাজকর্ম অন্যদিকে বিয়ে। বসুবাড়িতে ব্যস্ততার শেষ নেই। সফর থেকে ফিরে আসা সুভাষের হাতে বিভাবতী একটা খাম দিলেন। 'এই নাও— রবীন্দ্রনাথের চিঠি।'

'কী বলছ বউদি? এক মাসে তিনটে চিঠি!' চিঠিটা খুলে সুভাষ বললেন, 'বউদি রাজনীতির কোলাহলের মাঝখানে এইরকম চিঠি বড় শান্তি দেয়। মনে হয় বটগাছের ছায়া। কী যে ভাল লাগে।'

পরের দিনই ড. মেঘনাদ সাহার সঙ্গে শান্তিনিকেতন যাওয়ার কথা সুভাষচন্দ্রের। তার আগেই এই চিঠি। খুশিতে ডগমগ সুভাষ বউদি আর মাকে চিঠি পড়ে শোনালেন। কলকাতা থেকে গাড়িতে শান্তিনিকেতনের পথেও ড. সাহার সঙ্গে এই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল তাঁর।

দিল্লিতে সুভাষের আয়োজিত শিল্পমন্ত্রীদের সভার কথা মনে পড়ে ড. সাহার। তিনি বললেন, 'সুভাষবাবু। আপনার একটা কাজে দেশের সমস্ত বৈজ্ঞানিক আর গবেষকরা দারুণ খুশি।'

'কী ব্যাপারে?'

'পরিকল্পনা, শিল্পায়ন— এইসব বিষয়ে আপনি যেমন নির্ভীকভাবে বলে চলেছেন, এ সবের জন্য যে বিপুল আগ্রহ দেখাচ্ছেন, কাজ শুরু করার জন্য যে সব ব্যবস্থা নিচ্ছেন তাতে আমরা সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে এবার নিশ্চয়ই একটা কিছু হবে।'

নিজের প্রশংসায় অস্বস্তিবোধ করে কথা ঘোরালেন সুভাষ। 'ডক্টর সাহা। আপনার জন্যই শান্তিনিকেতনে এভাবে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি আমি।'

'ও কিছু নয়।' ড. সাহা বলতে থাকেন, 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও আপনার প্রার্থীপদের ব্যাপারে কবিগুরুকে অনুরোধ করেছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকাতে তিনি লিখেছেন। আপনার মতো প্রগতিশীল নেতা যদি আবার কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেন তবে সত্যিই এ দেশে প্রগতির হাওয়া বইবে।'

সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে পৌঁছলেন। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব অনিলকুমার চন্দ, কালীমোহন ঘোষ, সুকুমার চ্যাটার্জি প্রমুখ তাঁকে ফুলের মালা পরালেন। রবীন্দ্রনাথ বার্ধক্যের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন। পিঠটা একটু কুঁজো হয়ে গেছে। সাদা দাড়িতে বুক ঢাকা পড়েছে। তবু প্রসন্ন মুখ, চোখে একটা দীপ্তি ঝকমক করছে। মনে হয় যেন একটা প্রাচীন বটগাছ। সারা শরীরে প্রাচীনত্ব কিন্তু পাতাগুলো এখনও সতেজ। সুভাষ প্রণাম করলেন তাঁকে। আশীর্বাদ করার জন্য শীর্ণ হাত তাঁর মাথায় রাখলেন কবি। বললেন,

'অনেক দিন ধরেই তোমার পথ চেয়ে রয়েছি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তুমি ছোট ছিলে। কী নিষ্ঠা, কী অপূর্ব একতার সঙ্গে সংগ্রামে নেমেছিল সমস্ত বাংলা। কিন্তু আজ বাংলা বড় শক্তিহীন, তার গৌরব অস্তমিত।'

'গুরুদেব, আপনার প্রেরণার বড় প্রয়োজন আমাদের।'

ছোট একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে শান্তিনিকেতনে। সুভাষ তাঁর ভাষণে বললেন, 'আমাদের মতো রাজনীতির কর্মীদের শুকনো মনে কবিগুরুর মতো কবিরা প্রাণসঞ্চার করে তোলেন নবীন চেতনায়। তাঁর মতো কবিদের প্রেরণাতেই সৃষ্টি হয় রাষ্ট্র, জেগে ওঠে দেশ। গাঁধীজি আর কবিগুরু আমাদের দেশের দুই জয়পতাকা।'

কবিগুরু তাঁর ভাষণে বললেন, 'আমি সুভাষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আজ থেকে পনেরো-ষোলো বছর আগেই আমি গাঁধীজির মতো মহাত্মাকেও জোর দিয়ে বলেছিলাম, চরকা, গ্রামস্বরাজ এগুলোই নিজেদের নয়। জগতের দরবারে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য শিল্প আর বিজ্ঞানের আশ্রয় আমাদের নিতেই হবে।'

শ্রীনিকেতনের নতুন কৃষিপদ্ধতি, শিল্প, গ্রামবিকাশ— ইত্যাদি সম্পর্কে পরিকল্পনার কাজ দেখলেন সুভাষ। সন্ধের সময় ফুরফুরে হাওয়ায় ছাত্রদের সঙ্গে বসে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। রাত্রে মন খুলে কথা হল কবির সঙ্গে। তিনি বললেন, 'সুভাষ, তোমাকে সভাপতি করার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠরাও আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমারও সেটাই ইচ্ছে ছিল। তাই আমি তোমার কথা জওহর আর মহাত্মাজিকে লিখেছিলাম।'

বিশ্বকবির এত ভালবাসায় নিজেকে ধন্য মনে হল সুভাষের। গুরুদেবের মনে কষ্ট দেওয়ার মতো কিছু বলতে ইচ্ছে করে না তাঁর। কিন্তু মেঘনাদ থাকতে না পেরে বললেন, 'গুরুদেব। গাঁধীজির ভক্তরা বলছেন যে আপনার বয়সের সুযোগ নিয়ে সুভাষ আপনাকে প্রভাবিত করেছে— সুভাষ ইনডিউসড গুরুদেব। তা ছাড়া তাঁরা বলছেন বাঙালি বলে আপনি তার পক্ষপাতিত্ব করছেন।'

আস্তে আস্তে বললেন তিনি, 'সুভাষের নেতৃত্বের উপর আমার আন্তরিক বিশ্বাসই শুধু ব্যক্ত করেছি আমি। কোনও সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য নয়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমার আর কী চাওয়ার আছে?'

অনেক রাতে সুভাষ আর মেঘনাদ উঠলেন। সুভাষের ওপর ক্রমাগত যে সব অন্যায় হয়ে চলেছে সেটা গুরুদেব জানেন। তিনি বললেন, 'আমি একপাশে পড়ে আছি। কিন্তু বাস্তব পৃথিবীতে কী হচ্ছে তার খবরও রাখি। সুভাষ, তোমার ওপরে যা কিছু অত্যাচার হয়েছে সব জানি আমি। একটা কথা বলি তোমাকে।'

'গুরুদেব।'

'সাময়িক পরাজয় চূড়ান্ত পরাভব নয়। তোমার জীবনেও সেটা দেখেছ তুমি। সে সব পরাজয়ে পা টলেনি তোমার, বরঞ্চ সংকট তোমাকে আরও শক্তিমান করে তুলেছে। পলিটিক্সের আসরে আমি আনাড়ি। তবু তোমার যে প্রয়াস তাতে আমার সাধ্যমতো সহায়তা প্রত্যাশা করার অধিকার তোমার রইল। তোমার তপস্যা সার্থক হোক।'

একটা শ্বাস নিলেন কবি। বড় বেশি রাত হয়ে গেছে আজ। তবু বললেন, 'আর দশদিন পরে কলকাতায় আমার ছাত্রছাত্রীরা একটা নাটক মঞ্চস্থ করবে। সেই দিন আমি তোমার গৌরবগাথার সূচনা করতে চাই। তার জন্য আমার ভাষণের খসড়া আমি তৈরি করেই রেখেছি। তার একটা কপি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে।'

অনিল চন্দ ভাষণের কপি এনে সুভাষকে দিলেন। পড়তে পড়তে চোখে জল আসে সুভাষের। রুমালে চোখ মুছে আবার পড়তে থাকেন। মেঘনাদকে পড়ে শোনান সেটা।

'সুভাষচন্দ্র,

বাঙালি কবি আমি, বাংলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতির রক্ষা আর দুষ্কৃতীর বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজ্যশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্ত-শক্তি বাংলা দেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা।... আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই।...

এইরকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, ... আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।... পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে; কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান।... কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য ব'লে মানো নি...।

এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে, বাংলা দেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই।... বহুকাল পূর্বে একদিন আর-এক সভায় আমি বাঙালি সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর-এক অবকাশে বাংলা দেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলা দেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি।... তার পরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে, যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।'

সুভাষচন্দ্রকে বিদায় দেবার জন্য আশ্রমিকরা জড়ো হয়েছেন গাড়ির আশেপাশে। বটগাছের নীচে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন কবি। বার্ধক্য তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণের অন্তরায়। সুভাষকে আবার একবার কাছে ডাকলেন তিনি। সুভাষের হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলছি যে অধিনায়কের কল্পনা আমি করেছিলাম অনেকদিন আগে, আজ তাকেই দেখছি দীপ্ত ভাস্বরতায়।'

গুরুদেব একটু চুপ করে থাকলেন। জল ভরে এল চোখে। তাঁর কী যেন একটা বলার আছে। তারপর সবার সামনে বলে উঠলেন, 'সুভাষ তোমার আন্দোলনে লাঠিতে ভর দিয়ে হলেও সহযোগী হতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু বার্ধক্যে জর্জর শরীর হতে দিচ্ছে না সেটা। তাই প্রাণ ছটফট করছে।'

সুভাষ প্রাণপণে চোখের জল সামলালেন। ভারাক্রান্ত মনে শান্তিনিকেতন থেকে বিদায়

নিলেন তিনি। শুধু এইটুকু সাক্ষাৎ চারিদিক থেকে ঘিরে আসা সংকটের মুখোমুখি হবার বিরাট সামর্থ্য জুগিয়েছে তাঁকে। মাথার ওপর মেঘমুক্ত আকাশ ঝলমল করে উঠেছে।

৮

দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেসের পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাসে এই প্রথম সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন হতে চলেছে। কে জিতবে, কে হারবে এই নিয়ে সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে। 'অসাধারণ পরিস্থিতিতে একই ব্যক্তি পরপর দু'বার কংগ্রেসের সভাপতি হতে পারেন। কিন্তু এখন সেরকম কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি। অকারণেই সুভাষবাবু এরকম ক্ষতিকর পদক্ষেপ নিতে চলেছেন। তাই তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে।' কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ছয় সদস্যের স্বাক্ষর করা এইরকম একটা বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। জওহরলাল সই না করলেও সর্দার পটেলসহ অন্য প্রধান নেতারা সই করেছেন তাতে।

বিবৃতি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই শুধু বসু বাড়ি বা কলকাতার নয় সারা দেশের বাতাবরণ বদলে গেল। সুভাষ ভাবছেন এটা কি সর্দার পটেলের পুরনো রাগের নতুন প্রকাশ! উডবার্ন পার্কের বৈঠকখানায় দিনরাত নির্বাচনের কাজ চলেছে। শরৎ-সুভাষের ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক দেখারও ফুরসত নেই। নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে অশোকনাথের বিয়ের দিনও এগিয়ে আসছে।

বিভাবতীকে শরৎ বললেন, 'সুভাষের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে আমার। এই নির্বাচনটা মোটেই সোজা নয়। যত দিন যাচ্ছে সুভাষ একা হয়ে যাচ্ছে।'

'এরকম কেন ভাবছ?'

'গাঁধীজির অনুগামীরা বয়সে, অভিজ্ঞতায়, শিক্ষায় সবদিক দিয়েই বড়। প্রত্যেকের পেছনেই এক একটা প্রদেশের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সুভাষের নেতৃত্বগুণ আছে ঠিকই। কিন্তু রাজনীতিতে উকিলি মারপ্যাঁচেরও দরকার আছে। সুভাষ ফাঁদে পড়ে গেছে ধরে নাও।'

'কিন্তু ঠাকুরপো তো বলছে অনেকেই ওকে ভোট দেবে।'

'সুভাষের মতো ফালতু আত্মবিশ্বাস আমার নেই। ওর জেতার আশা খুবই কম।' বলতে বলতে গলাটা যেন একটু কেঁপে যায় মেজদার।

শরৎবাবু বৈঠকখানায় ফিরে গেলেন। সর্দার পটেলের বিবৃতি খুঁটিয়ে পড়তে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে হল তাঁর। সীতারামাইয়াকে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নাকি বারদোলিতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'সুভাষ, তুই তো তখন সভাপতি। এ রকম কোনও সিদ্ধান্ত তো সবার আগে তোরই জানার কথা।'

'সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে কোনও কথাই ওয়ার্কিং কমিটিতে হয়নি। সভাপতির অনুপস্থিতিতে বা এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁরা নেবেন কী করে? কংগ্রেস সংবিধানের কোনও ধারায় এ ধরনের ব্যাপার হতে পারে? মেজদা এ সবই ওই "সত্য আর অহিংসার পূজারি" দক্ষিণপন্থীদের নাটক। আসলে গাঁধীজির চাই একজন পুতুল সভাপতি, আর অন্যের তালে তাল দিয়ে নাচার চেয়ে আমার মৃত্যুও ভাল।' একটু থেমে সুভাষ বললেন, 'মেজদা, "হরিজন" পড়েছ?'

'গত সংখ্যাটা পড়া হয়নি।'

'গাঁধীজি কোনও নাম না নিয়ে আমার ওপর অগ্নিবর্ষণ শুরু করেছেন। বলেছেন এই

নির্বাচনের রাজনীতির ফলে ভ্রষ্টাচার বাড়ছে, কংগ্রেসের নৌকো দিশাহীন হয়ে পড়ছে।'

নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, পরিস্থিতিও ততই খারাপ হচ্ছে। গাঁধীজি এখনও পর্যন্ত কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি না দিলেও কোন দিকে তাঁর অনুরাগ আর কার ওপরে রাগ সেটা সবার কাছেই স্পষ্ট। মৌলানা আজাদকে গাঁধীজিই নির্বাচনে দাঁড়াতে বলেছিলেন কিন্তু সুভাষের মুখোমুখি হওয়ার সাহস তাঁর হয়নি। ড. সীতারামাইয়া অন্ধ্রে ফিরে গিয়েছিলেন। গাঁধীজি তাঁকে জরুরি তলব পাঠিয়ে বারদোলিতে ডেকে এনে নির্বাচনে দাঁড়াতে বললেন। এ সব খবরই ফলাও করে কাগজে বেরিয়েছে।

নির্বাচনের আগের দু-তিনদিন দুই ভাইয়ের ওপর ঝড় বয়ে গেল। সামনে গভীর পিচ্ছিল খাত। পেরোতে পারলে শিখরে পৌঁছনো যাবে নয়তো নিজের রাজনৈতিক হারাকিরি।

মায়ের মনেও প্রচণ্ড অশান্তি। একজন কেউ 'হরিজন'-এর সদ্য প্রকাশিত সংখ্যাটা নিয়ে উডবার্ন পার্কে দৌড়ে এলেন। সুভাষ দেখলেন নির্বাচনের ঠিক আগে আগেই গাঁধীজি 'ইনটারন্যাল ডিকে' অর্থাৎ 'ভেতরের ক্ষয়' নামে এক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখেছেন। অবশ্য কারওই নাম করা হয়নি। তবে আসল কথা বুঝতে কারও অসুবিধে হয় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসে আজ অরাজকতা আর সর্বনাশ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত বিষোদ্গারেই লক্ষ্য বসুগোষ্ঠী। ভোটদানের দু'দিন আগেই প্রতিটি কংগ্রেস সদস্যের হাতে পৌঁছে গেল 'হরিজন'-এর এই সংখ্যাটি। একদিকে নিরপেক্ষ থাকার মুখোশ অন্যদিকে ভেতরের সমস্ত জ্বালা প্রকাশ করেছেন গাঁধীজি। নিঃসন্দেহে তাঁর প্রবন্ধের প্রচ্ছন্ন বার্তা ভোটারদের প্রভাবিত করবে।

কলকাতার সুভাষ-বিরোধীরাও চুপ করে বসে নেই। ড. বিধানচন্দ্র রায় প্রথমে ছিলেন শরৎবাবুর বন্ধু। চিকিৎসক হিসেবে গাঁধীজির সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এখন একেবারে লেপটে গেছেন গাঁধীজির সঙ্গে। বসুদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদেই তাঁর লাভ।

অভিযোগ, পালটা অভিযোগের পালা চুকল। ভোটের দিন পেরিয়ে গেল। ঘটনাচক্রে ভোট গোনার দিনই সাউথ ক্লাবে অশোকের বিয়ে উপলক্ষে পার্টি। সারাদিন ধরে দুশ্চিন্তা করছেন শরৎবাবু।

সন্ধ্যার সময় ক্লাবের সবুজ লনে অতিথিরা একে একে আসতে লাগলেন। তাঁদের অনেকেই কংগ্রেসের কর্মকর্তা।

রাত সাতটা থেকে ফোন আসতে শুরু করল। একটা করে ফোন আসে আর ভাইপোদের মধ্যে কেউ একজন খবর নিয়ে দৌড়ে আসে উডবার্ন পার্ক থেকে সাউথ ক্লাবে। গোড়ার দিকে দু-একটা খারাপ খবর, তারপরই পরিস্থিতি বদলে গেল। অতিথিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুভাষ টেবিলে টেবিলে ঘুরছেন। অতিথিদের মধ্যে কিছু সুভাষ বিরোধীও চুপচাপ বসে আছেন। ভাইপো অমিয় দৌড়ে এল, 'রাঙাকাকা, উত্তর প্রদেশের ফল বেরিয়েছে।'

শরৎ, সুভাষ রুদ্ধশ্বাস। উত্তরপ্রদেশ মানে জওহর আর কৃপালনির দুর্গ। অমিয় পড়তে থাকে কাগজটা থেকে, 'ড. সীতারামাইয়া ১৮৫, রাঙাকাকা তোমার ২৬৯।'

শরৎবাবুর চোখে আনন্দাশ্রু। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষের হাতটা ধরলেন তিনি। তাঁর উষ্ণ স্পর্শ যেন বলছিল, 'আর চিন্তা নেই। তুই জিতে গেছিস ধরে নিতে পারিস।' রাত্রি দশটায় পার্টি শেষ হল। রাত এগারোটার সময় এলাহাবাদের মুখ্য নির্বাচনী অফিস থেকে ফোন এল— ড. সীতারামাইয়া পেয়েছেন ১৩৭৫ ভোট আর সুভাষ পেয়েছেন ১৫৮০ ভোট। নির্বাচনে সুভাষের জয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলায় সুভাষের পক্ষে ৪০৪ ভোট আর বিপক্ষে ৭৯ ভোট। এ ছাড়া পঞ্জাব, অসম, দিল্লি, মাদ্রাজে জিতেছেন সুভাষ। উল্টোদিকে গুজরাতে তিনি

মাত্র ৫টি ভোট পেয়েছেন। বিপক্ষে পড়েছে ১০০ ভোট। রাজেন্দ্রবাবুর বিহার আর ড. সীতারামাইয়ার নিজের প্রদেশ অন্ধ্রতে সুভাষ কম ভোট পেয়েছেন। মহারাষ্ট্রের ভোট মোটামুটি সমান সমান ভাগ হয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে সমগ্র ভারত সুভাষকেই সমর্থন করেছে।

নেতা আর কর্মকর্তারা অনেক রাত্রে একে একে বিদায় নিলেন। বাড়িতে দু' দুটো ব্যাপার সামলে ক্লান্ত বিভাবতী ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙল তাঁর। বাগানে পাখিদের কলরব শুরু হয়ে গেছে। শরৎবাবুকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সারারাত ঘুমোননি তিনি।

'কী নির্বাচন তো শেষ হল। এখন খুশি তো?'

'বিভা এই নির্বাচন জিতে সুভাষ একটা বিরাট বিপদ ডেকে আনল।'

'কেন?'

'মহাত্মাজির আসন টলিয়ে দিয়েছে সুভাষ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরৎবাবু বললেন। 'ক্ষমাশীলতা মহতের মহৎ গুণ। কিন্তু সে কথা ভুলে গিয়ে মহাত্মাজি এই পরাজয় সহজে মেনে নেবেন না। এটা তাঁরই পরাজয়ই বলেই ভাববেন তিনি। তাই সামনে বড় কঠিন সময়। এই সাফল্যের ভার বড় বেশি বিভা, বড্ড বেশি।'

৮

ত্রিপুরী! ত্রিপুরী!

১

সারা দেশের সংবাদপত্রে নির্বাচনের ফল মোটা মোটা হেডলাইনে জ্বলজ্বল করছে। দু'দিন পেরিয়ে গেছে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাজির আওয়াজ কমার লক্ষণ নেই। বসুবাড়িতে খুশির জোয়ার। সারা বাংলায় মিষ্টি বিলি হচ্ছে। উডবার্ন পার্কের হলঘরে কংগ্রেসের পদাধিকারীদের ঠাসাঠাসি ভিড়। অভিনন্দন জানাবার জন্য মানুষের ঢল।

ব্যারিস্টার নরিম্যান, লালা শঙ্করলাল, কবীশ্বর, এন. জি. রঙ্গা, স্বামী সহজানন্দ, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখদের কাছ থেকে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসছে তো আসছেই। গাঁধীজির অনুগামীদের প্রতিক্রিয়া জানবার প্রতীক্ষায় উন্মুখ বসুভ্রাতারা। শরৎবাবু বিশেষ করে এই নিয়ে চিন্তিত।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতি বেরিয়েছে। যা হবার হয়েছে। সুভাষ নিয়মসম্মতভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এখন থেকে আমরাও সহযোগিতা করব।

সবাই খুশি। আর একবার মিষ্টি বিলোনো হল। কিন্তু এ-খুশি একদিনও স্থায়ী হল না। আর সময় না নষ্ট করে গাঁধীজি পরের দিনই নিজের দুঃখের কথা স্পষ্ট করলেন। দুই ভাই একসঙ্গে পড়তে লাগলেন তাঁর বিবৃতি। 'সুভাষচন্দ্র বসু পট্টভিকে নিশ্চিতভাবেই হারিয়ে দিয়েছেন। আমি অনেক ভেবেচিন্তেই সুভাষের প্রথম থেকেই পুনর্নির্বাচনের বিরোধী ছিলাম। পট্টভির নাম প্রত্যাহার না করার দায়িত্বও আমারই। তাই পট্টভির এই পরাজয় আমারই পরাজয় বলেই আমি মনে করি।'

বিবৃতির প্রতিটি শব্দে ফুটে উঠেছে গাঁধীজির তীব্র অসন্তোষ আর দুঃখ। বিবৃতিতে তিনি কংগ্রেসের নীতিবিচ্যুতির কথা আবার নতুন করে তুলে ধরেছেন। দুঃখের সঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন, 'যাই হোক না কেন, সুভাষবাবু তো আর দেশের শত্রু নন। দেশের জন্য তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের অনুগামীদের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'আমি কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই, আজ যাঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসবেন তাঁরাই হবেন দলের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি। কংগ্রেসে থাকতে যাঁদের অসুবিধে হচ্ছে তাঁরা দেশসেবার জন্য বেরিয়ে আসুন।'

ভয়াবহ বিবৃতি শরৎ এবং সুভাষ অনেকক্ষণ চুপচাপ। কী বলা উচিত আর কী বলা উচিত নয় বুঝতে পারছিলেন না তাঁরা। এরকম বেদনা সুভাষ আজ পর্যন্ত কারও কথায় তিনি পাননি। বেদনাহত স্বরে তিনি বললেন, 'সুভাষ দেশের শত্রু নয়।' এই ব্যঙ্গোক্তির মানে কী? মেজদা, আমি দেশের শত্রু?'

'মানে একটাই। তোর জিত মহাত্মাজির মনে গিয়ে বিঁধেছে দারুণভাবে। মঠের মোহান্ত দুঃখ

পেয়েছেন। এর পর শুরু হবে ভৈরবনৃত্য। গুরুর অপমানের শোধ নিতে চেলারা কোমর বেঁধে নেমে পড়বে।'

গাঁধীজির বিবৃতিতে দেশময় অশান্তি। গাঁধীজি যদি আগে একটু আভাসও দিতেন, তৈরি হতে পারতেন বসুদের দুই ভাই। কেউ কেউ বললেনও সে কথা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কংগ্রেস অফিস থেকে বেরোবে সুভাষের বিজয় মিছিল। সে সময়ও বাইরে জমা হওয়া দক্ষিণপন্থী পোড়খাওয়া প্রবীণরা নানান মন্তব্য করছিলেন।

'কি হে? ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে তো?'

'সুভাষ শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে টিকতে পারবে তো?'

'দ্যাখো দেশেই থাকতে পারে কি না!'

গাঁধীজির বিবৃতি, তাঁর অভিযোগ, হতাশা জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে ধন্দে ফেলেছিল অনেক প্রবীণ নেতাকে। 'আমরা কি ভীষণ কোনও অন্যায় করে ফেলেছি?' এ চিন্তা সুভাষচন্দ্রের মনেও উঁকি দেয়। মেজদা তাঁকে বলেন, 'সুভাষ। জওহরলাল শান্তিনিকেতনে এসেছেন।'

'কবে?'

'দু'দিন আগে। সঙ্গে তার মেয়ে ইন্দিরাও আছে। ওর সঙ্গে দেখা কর। দেখ আলোচনার মধ্যে দিয়ে কোনও সমাধান যদি হয়।'

সুভাষের জওহরের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে তো ছিলই, তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের দেখা পাওয়ার ইচ্ছেও ছিল। গাঁধী-সুভাষ বিসংবাদের সময় একমাত্র জওহরলাল অসম্ভব সতর্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সোজা চলে গেছিলেন কুমায়ুন পাহাড়ে বিশ্রাম নিতে। ফিরে আসার পরদিনই শান্তিনিকেতনে কোনও কাজে এসেছিলেন।

সুভাষের করমর্দন গ্রহণ করলেন জওহরলাল। বললেন, 'সুভাষ, তোমার সাহসের তারিফ করি আমি। কংগ্রেসের ইতিহাসে এমন আগে কখনও ঘটেনি। ইট হ্যাভ নেভার হ্যাপেনড, ইট উইল নেভার হ্যাপেন।'

অনেকক্ষণ কথা হল দু'জনে। জওহরলাল বলেন, 'সুভাষ। গাঁধীজির কাছের মানুষ যাঁরা— সর্দার, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা, আমরা সবাই জেলে থাকার সময় খুব কাছাকাছি এসে গেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি তখন ব্রহ্মদেশ বা অন্য কোনও জেলে। আমাতে, গাঁধীজিতে, সর্দারে অনেক তর্কাতর্কি হয়েছে, ঝগড়াও হয়েছে। কিন্তু অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে মতান্তরের বা বিবাদের সমাধান বেরোতেও সময় লাগেনি। তোমার দুর্ভাগ্য এটা তোমার ক্ষেত্রে ঘটেনি।'

পণ্ডিতজির কথার সঙ্গে একমত হলেন সুভাষ। এরই মধ্যে একসময় জওহর ক্ষোভের সুরে বললেন, 'সুভাষ তোমার সময়ে কংগ্রেস অফিসের কাজকর্মে যথেষ্ট গাফিলতি হয়েছে।'

'কী বলছেন আপনি?'

'অনেক টেলিগ্রাম আর চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। কাজ জমা হয়েছে। কর্মকর্তারাই অভিযোগ জানিয়েছেন এ সম্পর্কে।'

'কর্মকর্তারা নয়, বলুন আচার্য কৃপালনি। কংগ্রেস সভাপতির নামে চিঠি তিনি কখনও কলকাতায় রিডাইরেক্ট করেননি। কেবল আমার নামে প্রতিটি অভিযোগের প্রতিলিপি ওয়ার্ধায় এবং তারও আগে সুইজারল্যান্ডে আপনার কাছে যাতে পৌঁছে যায় সেদিকেই নজর ছিল তাঁর। বলুন সত্যি না মিথ্যে?'

হেসে উঠলেন পণ্ডিতজি। বাংলার কৃষক পার্টির কথা পাড়েন তিনি। 'এক সাম্প্রদায়িক,

প্রাদেশিক দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংযুক্ত সরকার গড়ার জন্য তোমরা দু'ভাই কেন জেদ ধরেছিলে? এটা কি কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা নয়?'

'সেটা ছিল দূরদর্শিতা।'

'সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে হাত মেলানো দূরদর্শিতা?'

'আপনি ভুল করছেন পণ্ডিতজি। বাঙালি মুসলমানদের ওপর কৃষক পার্টির বিপুল প্রভাব। তাই তাদের কাছে টেনে আনতে চাওয়া ভবিষ্যতের কথা ভেবে দূরদর্শিতার পরিচয়। নইলে ওই পার্টি মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের স্থায়ী ক্ষতি করবে। সারা পূর্ববাংলা ভাঙনের শিকার হবে।'

পণ্ডিতজি এবার শান্ত হলেন। বললেন, 'সুভাষ, তোমার নেতৃত্ব আর উদ্দেশ্যের সম্পর্কে আমার কোনওদিন কোনও আশঙ্কা ছিল না।'

'গাঁধীজির কথা ছাড়ুন। আপনার কথা বলুন।' একটু হেসে জওহর বললেন, 'গাঁধীজিকে তোমার মতো চ্যালেঞ্জ জানানোর হিম্মত ভগবান আমাকে দেননি। আমি অক্ষম।'

আড়াই ঘণ্টা আলোচনার পরও কোনও সমাধান পাওয়া গেল না। জওহরলাল বার বার সুভাষকে বললেন, 'তুমি গাঁধীজি আর তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে একবার আলোচনা করে নাও। জানো তো দূরত্ব রাগ বাড়ায় আর নৈকট্য আনে স্নেহ।'

'কিন্তু আপনার সাহায্য, অন্তত সহযোগিতা পাবার আশা রাখতে পারি কী?' প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি নিয়ে সুভাষ প্রশ্ন করেন আবার।

'দেখি কী হয়। কিন্তু সুভাষ আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, তুমি, আমি আর গাঁধীজি এক দুর্ভাগ্যের ত্রিভুজে অসম্ভবরকম আটকে গেছি। এ চক্রব্যূহ থেকে বেরোবার রাস্তার কোনও হদিশই পাচ্ছি না।'

জওহরের সঙ্গে আলোচনাতেও কোনও সমাধান পাওয়া গেল না। গুরুদেবের জন্য দেখা করতে উঠলেন সুভাষচন্দ্র। এক বিশাল বটগাছের নীচে বেদিতে বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সুভাষচন্দ্র কাছে এলে তাঁর মুখ খুশির হাসিতে ঝলকে উঠল, 'এসো সুভাষ।'

সুভাষ প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। 'কল্যাণ হোক' বলে আশীর্বাদ করে তিনি তাঁকে কাছে বসালেন। কোনও কিছু বলার আগেই কবি বললেন, 'গাঁধীজির বিবৃতি পড়েছি আমি।'

'পড়েছেন?'

'যেতে দাও। নতুন করে দেখতে পেলাম অহংকারের কবল থেকে মহাপুরুষরাও ছাড় পান না। নির্বাচন হয়েছে যথোচিতভাবে। তাতে একজন তরুণ নেতা জিতেছে বলে এই বুড়োবয়সে গেল গেল ভাব কেন? ঈর্ষা-বিদ্বেষের আড়াল সরিয়ে দৃষ্টি দেবার ক্ষমতা মহাত্মারও থাকবে না?'

'গুরুদেব আপনি একটা রাস্তা দেখান।'

'গাঁধীজির কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বোসো।'

'আবার?'

'তাতে কী ক্ষতি? বয়সে, অভিজ্ঞতায় তিনি তোমার পিতৃতুল্য। আমার মনে হয়, বলতে পার একটা আশা, যে তোমার মতো খাঁটি হিরেকে বোঝার ক্ষমতা তাঁর আছে। তাঁর মধ্যে সেই আগেকার জাদুর একটুও যদি অবশিষ্ট থাকে তবে এই হিরেকে ঠিক করে কেটে নিতে তিনি নিশ্চয়ই সক্ষম হবেন। আর তাঁর নিজের ঝুলিই যদি শূন্য হয়ে গিয়ে থাকে তবে আর তিনি কী দেবেন তোমাকে?'

বিদায়ের সময় গুরুদেবের চোখে জল ছলছল করে উঠল। বেদি থেকে নেমে কয়েক পা এগোলেন তিনি। সুভাষচন্দ্রের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আজ পর্যন্ত ভাবতাম বার্ধক্য আনে অভিজ্ঞতা আর বিচক্ষণতা। আজ অনুভব করছি তার সঙ্গে সে আনে অক্ষমতা। একদিকে মগজকে যখন সে পরিণতি দেয় অন্যদিকে তখনও কেড়ে নেয় চলার শক্তি।'

'গুরুদেব!'

'নয় তো কী? তা না হলে এই দুর্যোগে আমি কি তোমার সঙ্গে পথে নামতাম না?'

২

সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করলেও গাঁধীজির মতো মহামানবের বিশ্বাস আমি অর্জন করতে পারিনি এর চেয়ে দুঃখের, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা আর কিছু হতে পারে না।' সাংবাদিকদের বলেন সুভাষ।

'এ কথা কেন বলছেন? গাঁধীজি নিজেই তো মেনে নিয়েছেন যে পট্টভির পরাজয় তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়।'

'আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন পট্টভি, গাঁধীজি নন। সদস্যেরা ভোট দিয়েছেন হয় আমাকে নয় তো পট্টভিকে।'

গেটে গাড়ি দাঁড়িয়ে। সুভাষচন্দ্রের ওয়ার্ধা যাওয়ার তাড়া ছিল। সাংবাদিকদের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে তিনি বললেন, 'আমি মহাত্মাজির আশীর্বাদ নিতে যাচ্ছি। আপনারা একটি বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন। কংগ্রেস কোনও অবস্থাতেই ভাগ হবে না। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধই থাকবে।'

দু'দিনের ট্রেনযাত্রা। সুভাষচন্দ্র পৌঁছলেন ওয়ার্ধার কাছেই সেবাগ্রাম আশ্রমে। আশ্রমে গাঁধীজির সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড়। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগেই অনেক লোক এসে অপেক্ষায় রয়েছে। সুভাষচন্দ্র একটি কুটিরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মহাদেবভাই সুভাষচন্দ্রের খোঁজখবর নিতে এলেন।

'মহাদেবভাই, গাঁধীজির মুড কী রকম?'

মহাদেবভাই হাসি সামলে বললেন, 'সুভাষবাবু, আজ বেশ মজার কথা বলছেন তো!'

'তার মানে?'

আপনি কবে থেকে 'বাপুজির মুডের পরোয়া করা শুরু করলেন?'

'কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি...'

'আপনার আবার অনুমতি কীসের জন্য? বৃষ্টি কি অনুমতি নিয়ে নামে নাকি?' হাসিঠাট্টা হয় দু'জনের মধ্যে।

সুভাষের আশ্রমে আসার খবর অনেক আগেই মহাত্মাজির কানে পৌঁছেছে। তিনি ডেকে পাঠালেন। গাঁধীজি মা, শরৎবাবুর আর অন্যান্যদের খবর নিলেন। অনেক বিষয়ে আলোচনা হল। কিন্তু আসল কথা অর্থাৎ নির্বাচন, কংগ্রেস সভাপতির পদ, এসব কথার ধার মাড়ান না মহাত্মাজি। অবশেষে সুভাষচন্দ্রই কথা পাড়লেন, 'বাপু! আপনি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। পট্টভির পরাজয়ের পর আপনার বিবৃতি আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধেছে। বাড়ির সবাইও দারুণ দুঃখ পেয়েছেন।'

'হুঁ, তুমি থাকার জন্য তৈরি হয়ে এসেছ তো? রাত্রে নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে।'

সন্ধ্যায় প্যারেলাল, গাঁধীজি আর সুভাষ হাঁটতে বেরোলেন। সত্তর বছর বয়সেও গাঁধীজির হাঁটা যুবকদের লজ্জা দেয়। রাত্রে আলোচনা হল প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। দেশের রাজনীতিতে মুসলিম লিগের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে দু'জনেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন। গাঁধীজির রাগ অনেকটা কমেছে মনে হল। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'মহাত্মাজি, নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে আপনি পরামর্শ দিন।'

'কার কার কথা তুমি ভাবছ?'

'জয়প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দেব, স্বামী সহজানন্দ ভারতী, মানবেন্দ্রনাথ রায়, নরিম্যান আর সর্দার, জওহর, আজাদ তো থাকছেনই।'

'সর্দার পটেল আর তাঁর বন্ধুরা ত্রিপুরীতে তোমায় খুব একটা সহযোগিতা করবেন বলে মনে তো হয় না।'

'মহাত্মাজি নিজেদের মধ্যে বিরোধ ক্রমশই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি নিজে এগিয়ে আসেন তবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'অধিবেশনের আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক কবে?'

'২২-এ ফেব্রুয়ারি। আগামী সপ্তাহে। এই ওয়ার্ধাতেই।'

'ওই দিন এখানে সামনাসামনিই সব আলোচনা করা যাবে। মন থেকে সব ঝুলকালি বার করে দিতে হবে। কিন্তু তুমি যেন মিটিংটায় কোনও গোলমাল করে ফেলো না।' গাঁধীজির ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট।

'আমাকেও এবার যেতে হবে। ত্রিপুরীতে যেসব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন তার একটা খসড়া তো বানাতে হবে।'

পরের দিন হঠাৎ সুভাষচন্দ্রের মাথায় অসহ্য বেদনা। গাঁধীজি জানতে পেরে ডেকে পাঠালেন তাঁকে। নিজেই কী সব জড়িবুটি খলনুড়িতে পিষে একটা লেই মতন বানিয়ে সেটা সুভাষের কপালে লেপে দিতে লাগলেন।

'অসুখটা তাড়াতাড়ি সারবে তো?' সুভাষ প্রশ্ন করেন।

'সে আমি কী করে বলব?'

'তার মানে?'

'আমার ওষুধ দেশের সমস্ত রাজনীতি কর্মীদের ক্ষেত্রেই অব্যর্থ ফল দেয়। এক তুমিই আছ যেখানে আমার দাওয়াই কাজ করে না।'

দু'জনেই প্রাণ খুলে হাসলেন। সেই রাত্রে মাথাব্যথা সেরে গেল। বেশ আরাম বোধ হল। পরের দিন সুভাষচন্দ্র খুশি মনে আশ্রম থেকে বিদায় নিলেন।

ট্রেনে সুভাষের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের খবর বিদর্ভে আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। ওয়ার্ধা, বাডনেরা, নাগপুর সব স্টেশনেই ফুলের মালা আর তোড়া নিয়ে সুভাষভক্তদের ভিড়।' 'সুভাষবাবু কী জয়' ধ্বনিতে রেলস্টেশনগুলো কেঁপে উঠছে। গাড়ি যখন নাগপুর ছাড়াল তখন সুভাষের শরীর খারাপ লাগতে থাকে। ব্যাগ থেকে থার্মোমিটার বার করে দেখলেন জ্বর ১০১ ডিগ্রি। কামরায় শুধু দুই-একটি যাত্রী। 'আপনার কি হয়েছে? আপনার চোখমুখ যেন কেমন লাগছে।' বলতে থাকেন তাঁরা। যতই অসুখ হোক সুভাষের সুদর্শন মুখে তার ছাপ পড়ত না। কিন্তু আয়নায় নিজের মুখ দেখে আজ তিনি চমকে উঠলেন। বারে বারে চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়েও কোনও ফল হল না। জ্বর কখনও ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে কখনও তরতর করে নেমে আসে। হাওড়া স্টেশনে নেমে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছন তিনি।

রাতের গাড়িতেই পাটনা যাওয়ার কথা। কিন্তু শরীর থরথর করে কাঁপছে। বালিশ থেকে মাথা তোলাই অসম্ভব। অসম্ভব যন্ত্রণা। জ্বর আরও বাড়ে।

বিছানায় শুয়ে দিন কাটে। ওয়ার্ধার বৈঠকের দিন এগিয়ে আসছে। ওই বৈঠকে না যাওয়ার অর্থ এক মহাসংকট। ত্রিপুরী অধিবেশনে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে তার একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরি হবে ওয়ার্ধা বৈঠকে। তা ছাড়া দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য মধ্যপন্থা বার করারও প্রয়োজন ছিল। মনে পড়ে গাঁধীজির কথা, 'তুমি যেন মিটিংটায় কোনও গোলমাল করে ফেলো না।' এইরকম একটা বৈঠকে অসুস্থতার জন্য যেতে পারবেন না? বাচ্চা ছেলের মতো ডাক্তারের কাছে জেদ ধরেন তিনি, 'ডাক্তার কিছু একটা করুন। যে-কোনও ভাবেই হোক! কিন্তু আমাকে ওয়ার্ধা যেতে দিন।'

'ওয়ার্ধার কথা ভাবছিই না আমরা। আমাদের চিন্তা ত্রিপুরী অধিবেশনে আপনি উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না।' ডাক্তার বললেন।

'কী?'

সুভাষের মুখ কালচে হয়ে গেছে। সারা শরীর আরও আনচান। বন্ধুরা ছুটোছুটি শুরু করলেন। ওয়ার্ধা বৈঠকের অসীম গুরুত্ব সবারই জানা। ছুটোছুটি করে নাগপুর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য এক প্রাইভেট বিমানের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা।

'ইঞ্জেকশন দিয়ে হোক, যা করে হোক, আমাকে যেতে দিন।' ডাক্তারদের কাকুতি-মিনতি করেন সুভাষ। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রায় দিলেন ডাক্তাররা, 'বিমানে আপনি হয়তো পৌঁছতে পারবেন, তবে ফিরে আসার জন্য বেঁচে থাকবেন কি না তার নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারি না।' বিছানায় শুয়ে রাগে দুঃখে বিড়বিড় করেন সুভাষ, 'এই অসুখটা আমাকে শেষ করে দেবে।' ঠিক তাই হল। সর্দার পটেলকে টেলিগ্রাম করলেন, তিনি দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বৈঠকে আসতে অক্ষম। অধিবেশন পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখুন।'

শরৎবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। রোগটা ধরাই যাচ্ছে না। জ্বর নামছেই না। বিছানার চারপাশে মা, বিভাবতী, ইলা, মীরা, দাদা সুনীল— সবাই বসে। রোজ নতুন নতুন সংকট তৈরি হচ্ছে। তারপর একদিন সেই ভয়ংকর ধাক্কাটা এসে পৌঁছল। ওয়ার্ধা থেকেই সর্দার পটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদসহ বারোজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ইস্তফা পাঠিয়েছেন।

কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের মুখরোচক খবর আবার কাগজে কাগজে সবিস্তারে বেরোল। সর্দার পটেলের চিঠিটা হাতে এসে পৌঁছবার আগেই সুভাষচন্দ্র সেটা পড়তে পেলেন সংবাদপত্রে। শরীরে জ্বর ১০৩ ডিগ্রি। কাঁপা কাঁপা হাতে 'সহযোগীদের স্নেহভরা পত্র' পড়তে থাকেন তিনি।

'প্রিয় সুভাষ,

তোমার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আমরা সকলে খুব দুঃখিত। শারীরিক ঝুঁকি নিয়ে তোমার ওয়ার্ধা আসার কথা আমরা চিন্তা করি না। তাড়াতাড়ি ভালভাবে আরোগ্যলাভ করবে, এই আশাই করছি।

আমাদের মনে হয়, এই সময়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফা দেওয়াই সবার পক্ষে হিতকর। তাই ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পূর্ণ অধিকার তোমার রইল।'

চিঠিতে সর্দার পটেলসহ বারোজনের সই। ত্রয়োদশ সদস্য জওহর। তাঁর স্বাক্ষর এই চিঠিতে

নেই। তিনি এক পৃথক বিবৃতি দিয়েছেন। ভাষা বেশ গোলমেলে। তিনি সুভাষের পক্ষে না বিপক্ষে তা কিছু বোঝা যায় না। অবশিষ্ট দুই সদস্য— শরৎচন্দ্র এবং সুভাষচন্দ্র নিজে।

ডাক মারফৎ সেই ইস্তফাপত্রের প্যাকেট এলগিন রোডের বাড়িতে পৌঁছল। মেজদা সেগুলো চোখের আড়ালে রেখে দিলেন। দুপুরে সুভাষ বিছানার ওপর একটু উঠে বসলে, মেজদা চিঠিগুলো তাঁর হাতে দিলেন।

ভারাক্রান্ত মনে চিঠিগুলো সুভাষ বালিশের পাশে রেখে দিলেন। হঠাৎ কী যেন মনে এল তাঁর। চিঠির তাড়া থেকে শুধু কৃপালনির ইস্তফাপত্রটি বার করে ওপরে রাখলেন। চিঠিটিতে সই করলেন। ভাইপোকে ডেকে বললেন, 'এক্ষুনি পোস্ট-অফিসে গিয়ে আচার্যকে টেলিগ্রাম কর— আপনার পদত্যাগপত্র আমি সবার আগে গ্রহণ করলাম।'

শরীরের অবস্থার একটুও উন্নতি নেই। মা আর বিভাবউদি ঠায় মাথার কাছে বসে। প্রত্যেকদিন দুঃসংবাদ এসে পৌঁছচ্ছে। আকাশটা যেন ঘুরছে, তারাগুলো খসে পড়ছে। গাঁধীজি ঘোষণা করলেন, ত্রিপুরী অধিবেশনে তিনি যাচ্ছেন না। এর পর কী হবে। এই অসুখ আর কী কী ডেকে আনবে! যার জন্য কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে সারাজীবনের মতো শত্রুতার সৃষ্টি হল, সেই অধিবেশনের মণ্ডপ চোখে দেখতে পাওয়া যাবে তো?'

একদিন কপালে হাত রেখে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'গাঁধীবাবাকে সব কথা তুই ঠিক ঠিক বলেছিলি তো বাবা? তিনি কী বলেছিলেন?'

'মা। অনেক আশা নিয়ে আমি বার বার মহাত্মার আশ্রমে গেছি। কিছু আজ বুঝতে পারছি আসলে মহাত্মার দেখা আমি একবারও পাইনি। দেখা হয়েছে এক ঝানু রাজনীতিবিদের সঙ্গে।'

৩

ত্রিপুরী কংগ্রেসের দু'তিন দিন আগে গাঁধীজি ঘোষণা করলেন, রাজকোটের দেশীয় রাজার অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি সেখানে গিয়ে অনশন করবেন। তার জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি। ওয়ার্কিং কমিটির অনেক সদস্য ত্রিপুরী যাওয়ার জন্য আশ্রমে জমা হয়েছেন।

'বাপু। কংগ্রেসের অধিবেশন ছেড়ে এরকম একটা ছোট্ট বিষয় নিয়ে আপনি কেন অনশন করতে চলেছেন?'

'আমার কাছে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' গাঁধীজি জবাব দেন। কাছে বসা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'তোমরাই বা ত্রিপুরী যাচ্ছ কেন?'

'আমাদের যেতেই হবে বাপু। আমরা যদি না যাই তা হলে সারা কংগ্রেস বাঙালিদের কবজায় চলে যাবে। আমাদের জন্য কোনও জায়গাই থাকবে না।' ভুলাভাই বললেন।

হঠাৎ মনে পড়ল গাঁধীজির। জিজ্ঞেস করলেন, 'আর তোমরা ত্রিপুরী কী হিসাবে যাচ্ছ? তোমরা সবাই তো পদত্যাগপত্র তাড়া বেঁধে সুভাষকে পাঠিয়ে দিয়েছ। তোমাদের যাওয়ার নৈতিক অধিকারটা কোথায়?'

'যেতে হলে আমরা আইনসম্মতভাবেই যেতে পারি। আমাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়নি তো।' সর্দার পটেল আইনের ফ্যাকড়া বার করলেন।

হাসতে হাসতে পেট কেঁপে ওঠে গাঁন্ধীজির। 'তার মানে নীতিগতভাবে এক আচার্য কৃপালনির যাওয়া উচিত নয়! ওঁর পদত্যাগপত্র তো গ্রহণ করাও হয়ে গেছে।'

বৈঠকে হাসির রোল উঠল। আচার্য মুখ বেঁকালেন। গাঁন্ধীজির সঙ্গীরা ত্রিপুরী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাপুজি প্রস্তুত হতে লাগলেন রাজকোট যাওয়ার জন্য। তাঁর জীবনে এই প্রথম অনশন, যখন তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রধান সঙ্গীরা থাকবেন না। সবাই চলে যাবেন ত্রিপুরী অধিবেশনে।

গাঁধীজির রাজকোটের অনশনে তাঁর সঙ্গে থাকবেন বৃদ্ধা কস্তুরবা। দুজনের যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। কস্তুরবা জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজকোট থেকে ত্রিপুরী কত দূর?'

'খুব একটা দূর নয়।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা বলেন না কস্তুরবা। তাঁকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। গাঁধীজি তাই দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে, বা?'

'আপনি তো শুকনো পাতার ওপরেও পা ফেলেন না, পাছে তার নীচে থাকা পিঁপড়েগুলো মরে যায় এই ভয়ে।'

'তো?'

'সবাই বলছে সুভাষ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে। আমার মন যেন কেমন করছে।'

'ও দিকে মন দিয়ো না। বাঙালিদের প্যাঁচঘোঁচ বোঝার সাধ্যি তোমার নেই। অসুখ-টসুখ সব ভাঁওতা।'

'কী করে জানলেন?'

'কৃপালনিরা সবাই বলছে।'

'আপনার আশেপাশের লোকেদের চোখ দিয়ে না দেখে যদি আপনি নিজের চোখে সব দেখতেন তা হলে বোধহয় ভাল হত। যাই হোক, কিছুক্ষণের জন্য হলেও ত্রিপুরী যাব। কংগ্রেসও আমাদের, সুভাষও আমাদের আপনজন।' কস্তুরবা আবিষ্টের মতো বলেন।

গাঁধীজির ভেতর থেকে যেন আগুনের হলকা বেরিয়ে আসে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কস্তুরবার দিকে তাকিয়ে গর্জন করে ওঠেন তিনি, 'ত্রিপুরীর জন্য যদি তোমার প্রাণ এতই কাঁদে স্বচ্ছন্দে সেখানে চলে যাও। গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

কস্তুরবা আর কিছু বললেন না। মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে চোখ নিচু করলেন।

৪

উডবার্ন পার্কের পরিস্থিতি ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সুভাষ শয্যাশায়ী। ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সুভাষের শরীর ভাল হওয়ার বদলে ক্রমশ আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। শরৎচন্দ্র আর বিভাবতীর দিনরাত ঘুম নেই। একটু আগে দাদা ডাক্তার সুনীল বসু ইঞ্জেকশন দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। শরৎবাবুর নীচের হলে আরামকেদারায় একটু গা এলিয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন এক মরাঠি ভদ্রলোক। মাথায় কালো টুপি, গায়ে দেশি ঢঙের কোট, বোতাম খোলা, মুখে ক্লান্তির ছাপ। শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। কে হতে পারে? রোজ দেখা লোকজনের থেকে যেন একটু আলাদা। পরক্ষণেই বিদ্যুৎঝলকের মতো মনে পড়ল শরৎবাবুর। মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ড. এন. বি. খারে। গাঁধীজির সঙ্গে বিরোধের ফলস্বরূপ যাঁকে সরে যেতে হয়েছিল।

'আসুন ডাক্তার সাহেব। হঠাৎ এসে পড়লেন যে?'

'সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে আমায়। তাঁকে একটা ভয়ংকর খবর দেওয়ার আছে।'

'কী খবর? কী ব্যাপারে?'

'ব্যাপার তা হলে আপনারাও জানেন না?'

'কীসের ব্যাপার?'

'গাঁধীজি আর তাঁর চেলারা ত্রিপুরী অধিবেশন পণ্ড করে দেবার ব্যবস্থা করছেন।' চাপা স্বরে বলেন ড. খারে।

'আপনি কি কংগ্রেস সভাপতিকে এই কথাটাই জানাতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। এ-খবর একেবারে ষোলো আনা সত্যি।'

'হতে পারে। তবে আপনার সঙ্গে সুভাষের সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়।' সরাসরি বলে দেন শরৎবাবু।

'দয়া করে এ কথা ভাববেন না গাঁধীজির ওপর শোধ তোলার জন্য সুভাষকে তাতিয়ে তুলতে এসেছি আমি। সেটা ভাবলে, দারুণ ভুল করবেন, শরৎবাবু। মনে রাখবেন আজ পর্যন্ত এই সবরমতী আশ্রমের সন্ত মহারাজটি কোনও বিরুদ্ধবাদীকে অক্ষত ছেড়ে দেননি। হোমরুলনেত্রী অ্যানি বেসান্ত থেকেও না থাকার মতো হয়ে গিয়েছিলেন, ব্যারিস্টার জিন্না চিরদিনের মতো কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেছেন, মতিলাল আর দেশবন্ধু নতুন দল গড়বার পরেও তাকে ভেঙে দিয়ে আবার আপস করে ফিরে এলেন। এসবের পেছনে কারণটা কী?'

'কী কারণ?'

'সব দিক দিয়ে নিজের বিরোধীদের কীভাবে শেষ করে দিতে হয় এই বৃদ্ধটি তার ফন্দি ফিকির বা বলতে পারেন জাদু, ভালই জানেন। নিজের মঠে শুধু যাঁরা ঘাড় কাত করে থাকবেন, এমন লোকেদেরই থাকতে দেন তিনি। শিরদাঁড়ায় এতটুকু তাকত যাদের আছে তাদের ওয়ার্ধার দিকে যাওয়া উচিত নয়।'

'কিন্তু অধিবেশন পণ্ড করা হবে এ কথা কীসের ভিত্তিতে বলছেন আপনি?'

'পদ্ধতি নানারকমই হতে পারে তবে উদ্দেশ্যটা এক। ত্রিপুরী থেকে বিধ্বস্ত হয়ে যখন ফিরবেন, তখন আমার কথাগুলো মনে পড়বে আপনাদের।' বলতে বলতে ড. খারের গলা ক্ষোভে দুঃখে কাঁপতে তাকে।

'মাপ করবেন ডাক্তার সাহেব। এ খবর আমি কংগ্রেস সভাপতিকে দিতে পারব না।'

'দেওয়া-না-দেওয়া আপনার মর্জি। আমার কাজ সাবধান করে দেওয়া। তবে অনুশোচনা করবেন একদিন...'

সে রাত্রে শরৎবাবুর ঘুম আসছিল না। অনেক দিন আগেকার কথা মনে আসছিল তার মাঝে মাঝে তন্দ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। মহানদীর ধারে ছোটবেলায় শেকসপিয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের অভিনয়। সিজারের ভূমিকায় সুভাষ। অনেক রাজ্য জয় করে রোমের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকছে তাঁর বিজয় মিছিল। আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল তাঁর রোমের অধিবাসীদের ওপর আর তার চেয়েও বিশ্বাস বেশি ছিল নিজের প্রাণপ্রিয় সহযোগীদের ওপর। গর্বোন্নত শিরে তিনি চলেছেন সেনেটের দিকে। ঠিক সেই সময় এক তীক্ষ্ণ চিৎকার আকাশ বিদীর্ণ করে সহস্র মানুষের ভিড় ঠেলে তার সামনে এসে দাঁড়ায় এক পাগল, সমস্ত শক্তি দিয়ে সে চিৎকার করে বলে, 'সিজার, বিওয়ার দি আইডস অফ মার্চ।' সিজার সাবধান আস্তিনে লুকনো ছুরির হাত থেকে। বিজয়ের উন্মাদনায় সিজার তার কথায় কান দেন না। শেষ পর্যন্ত এক পা এক পা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান সিজার।

সেই পাগল আর্ত চিৎকারে সাবধান করে দিচ্ছে। তার মুখে এখন ড. খারের মুখের আদলটা

স্পষ্ট। তিনি চিৎকার করে বলছেন, 'বিওয়ার অফ আইডস অফ মার্চ! ত্রিপুরী...ত্রিপুরী...।' ধড়মড় করে উঠে বসেন শরৎবাবু। গলা শুকিয়ে কাঠ। কী ভয়ানক স্বপ্ন!

৫ মার্চ, ১৯৩৯। জব্বলপুর স্টেশনে মহাকোশলের কংগ্রেস কর্মকর্তারা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে রয়েছেন।

সবার মনে একটাই চিন্তা। অধিবেশন হবে কী হবে না! সভাপতি এখান পর্যন্ত ঠিকমতো পৌঁছতে পারবেন তো? গাঁধীজি রাজকোটের দেশীয় রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনশন শুরু করেছেন দুদিন হল। গাঁধীজির অনুপস্থিতিতে অধিবেশন কীভাবে চলবে, ঈশ্বরই জানেন। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যান্ড স্তব্ধ। বাজিয়েদের শরীরে যেন প্রাণ নেই। স্বাগত-তোরণগুলো পর্যন্ত যেন ম্রিয়মাণ।

একসময় মেল এসে দাঁড়ায় স্টেশনে। ত্রিবর্ণ পতাকায় সজ্জিত কামরার দিকে নজর পড়ল সবার। হাতে ঝান্ডা নিয়ে দৌড়ল স্বেচ্ছাসেবকের দল। একটু পরেই নামলেন ড. সুনীল বসু। সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে ঢুকলেন ছেদিলাল আর পণ্ডিত দুবে। ভেতরে একেবারে বিপরীত দৃশ্য। বার্থে সাদা খদ্দরের পোশাক পরা এক নিস্তব্ধ দেহ— প্রাণটুকু অবশ্য রয়েছে। আয়োজকদের বুক ভেঙে যায় সে দৃশ্যে। স্থানীয় ডাক্তার সেইখানেই তাঁকে পরীক্ষা করেন। সভাপতির জ্বর ১০৪ ডিগ্রি। কাছেই স্ট্রেচার প্রস্তুত। শরৎবাবু সুভাষচন্দ্রের মাথার নীচে হাত দিয়ে তাঁকে সাবধানে স্ট্রেচারে নামাতে সাহায্য করলেন। শ্রান্ত মা স্ট্রেচারের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সুভাষচন্দ্রকে সেই অবস্থায় স্টেশনে দাঁড়ানো অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল। উপস্থিত সবাই উদ্বেগে উদ্বেল। স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যান্ড বাজাবার বা শ্লোগান দেবার সাহসই হল না। কেন এরকম হল? কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই তরুণ সভাপতিকে! ওই স্ট্রেচারে শোওয়া শরীরটা বোম্বাইয়ের কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বদলে নর্মদা তীরের এই জায়গায় কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? ড্রাম, ব্যান্ড, মালা, তোড়া, স্বেচ্ছাসেবকদের অভিবাদন— সব পড়ে রইল। ঝড়ের বেগে অ্যাম্বুলেন্স ছুটল ক্যাম্পের দিকে।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও সভাপতির জন্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। নর্মদার তীরে তৈরি হয়েছে বিশাল বিষ্ণুদত্ত নগর। সেখানে সকাল থেকে দলে দলে জড়ো হয়েছে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। বাহান্নতম অধিবেশন উপলক্ষে রংবেরঙের সাজে সেজে বাহান্নটি হাতি সুভাষচন্দ্রের প্রতীক্ষায় কখন থেকে দাঁড়িয়ে। ১৯২৬ সালে গৌহাটি অধিবেশনে এরকম হাতির শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। অসমে হাতি জোগাড় করাটা সহজ। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ বা মহাকোশলে কোথায় পাওয়া যাবে এত হাতি? তবু শিরগুজা আর রেওয়ার মহারাজাদের এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গিরদার-ইনামদারদের সহযোগিতায় স্বেচ্ছাসেবকেরা জোগাড় করতে পেরেছে এত হাতি। প্রত্যেক হাতির হাওদায় কালানুক্রমে এক একজন প্রাক্তন সভাপতির ছবি ঝোলানো হয়েছে। বাহান্নতম হাতি সাজানো হয়েছে অপূর্ব কলাকৃতিতে। সুভাষচন্দ্র বসবেন তার ওপরে। হাওদার পেছনে বাঁধা হয়েছে ধ্বজাদণ্ড— তাতে পতপত করে উড়ছে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। পটকা, তুবড়ি আরও অনেক আতসবাজি জ্বালানো হল। বিষ্ণুদত্ত নগরে জমায়েত দু' লক্ষ মানুষ এককণ্ঠে ধ্বনি দেয়, 'মহাত্মা গাঁধী কী জয়', 'বাবু সুভাষচন্দ্র জিন্দাবাদ', 'বন্দেমাতরম্।' শোভাযাত্রায় এক বিশেষ রথে চলেছেন পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার পটেল, আচার্য কৃপালনি, রাজা গোপালাচারি, মৌলানা আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ। অনেকে মনে করেছিল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা রাজকোট

যাবেন, অধিবেশনে আসবেন না। ওয়ার্কিং কমিটির বেশির ভাগ সদস্য ত্রিপুরীতে উপস্থিত থাকায় জনতা খুশি। তারপর যখন বাহান্নতম হাতিটিকে হেলতে দুলতে আসতে দেখা গেল তখন জনতা উদ্‌গ্রীব, অধীর। লোকের মনে আলোড়ন। সুভাষচন্দ্রের বুদ্ধিদীপ্ত, হাস্যোজ্জ্বল মুখ এখুনি দেখা যাবে হাওদার ওপর থেকে। কিন্তু প্রতীক্ষা নিষ্ফল। তাঁর আসনে তাঁর জায়গায় তাঁর ছবি। জনতা হতচকিত। এর কারণ কী?

ত্রিপুরী অধিবেশনের প্রথম রাত্রি। নর্মদার ধারে ছোট বড় সব তাঁবুতেই জোরদার আলোচনা চলছে। এরকম অবস্থায় সুভাষ সভাপতির কাজ সামলাবেন কী করে? রাজকোট থেকে গাঁধীজি এসে পড়বেন এরকম আশা উদ্যোক্তরা করছেন। অন্যান্যরাও করছেন। তিনি আসবেনই ধরে নিয়ে নর্মদার ধারে তাঁর জন্য একটা বিশেষ গাঁধীকুটিরও তৈরি হয়েছে। দেশের নানান দিক থেকে আসা মানুষ তাঁর দেখা পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব। বাপুজি সেখানে নেই। তবু ভক্তদের শ্রদ্ধানিবেদন বন্ধ নেই। গাঁধীকুটিরের দিকে লোকের সারি। সেখানে পুষ্প অর্পণ করে ফেরে তারা। চারিদিক জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। অনেকেই শুধু কংগ্রেসনগরে এদিক-ওদিক দেখে বেড়াচ্ছে। সভাপতির শিবিরের দিকেও লোকের সারি। কিন্তু সভাপতি অসুস্থ। তাই তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে শরৎবাবু বাইরে আসছেন। হাতজোড় করে নমস্কার করছেন উপস্থিত জনতাকে। তাঁর বিষণ্ণ মুখ সবাইকে চিন্তায় ফেলে। অসুখটা কতটা বেশি? সুভাষচন্দ্রকে দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

গত অধিবেশনে ইচ্ছে করে অনুপস্থিত থাকলেও ত্রিপুরীতে প্রবল উৎসাহে হাজির হয়েছেন রাজা গোপালাচারি। কৃপালনি কাল পর্যন্ত বলছিলেন, 'আমি তো বাপুজির ছায়া। আমাকে তো রাজকোটে যেতেই হবে।' আজ কিন্তু তিনি ত্রিপুরীতে। এসেছেন সর্দারজি আর পণ্ডিতজি। দক্ষিণপন্থী নেতারা জড়ো হলেন সর্দার পটেলের শিবিরে। সুভাষচন্দ্রকে হরিপুরার মতো এবার আর স্বাগত জানাতে যাননি সর্দার পটেল। যাননি পণ্ডিতজিও। শুধু মহাকোশলের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যেরা গিয়েছিলেন। সুভাষবাবু যে সত্যিই সাংঘাতিক অসুস্থ সে কথা উদ্বেগের সঙ্গে জানাচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু কেউই কথাটা বিশ্বাস করছিলেন না।

'সুভাষ শুধু ঘুঘুই দেখেছ ফাঁদ দেখেনি', বললেন রাজাজি, 'গাঁধীজির মতো মহাত্মার গায়ে কাদা ছিটিয়ে, এখন আর অধিবেশনে মুখ দেখানোর হিম্মত নেই। তাই অসুখের ভান করে বিছানায় মুখ ঢেকেছে। এ ছাড়া আর কী?'

'পণ্ডিতজি, সর্দারজি— আপনারা ভাগ্যবান।' আচার্য কৃপালনি বলেন, 'আপনাদের পদত্যাগপত্র সভাপতি চেপে রাখলেন। শুধু আমারটাই তড়িঘড়ি গ্রহণ করে টেলিগ্রাম পাঠালেন।'

'আপনার ওপর সুভাষের নেকনজর তো আগের থেকেই আছে।' রাজাজি জোরে হেসে উঠলেন। বৈঠকেও হাসির রোল উঠল।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ মোটাসোটা মানুষ। বললেন, 'আমি এ-অধিবেশনে প্রমাণ করব এ-দেশে বড় কে— গাঁধীজি না আর কেউ? তার আগে ত্রিপুরী ছাড়ছি না।'

জওহরলাল আর সর্দার পটেল নানা কারণে ক্ষুব্ধ সুভাষের ওপর। কৃপালনির দুঃখ স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্য মসনদ আঁকড়ে থাকার জন্য সুভাষ কঠোর সমালোচনা করেছিলেন পন্থ আর রাজাজির। তাই দেশের এই দুই প্রধানমন্ত্রী, উত্তর প্রদেশের পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ

আর মাদ্রাজের রাজাজি বেজায় খাপ্পা সুভাষের ওপর। সাতটি রাজ্যের বেশির ভাগ বিধায়ক আর তাঁদের ছত্রচ্ছায়ায় গড়ে ওঠা স্তাবকমণ্ডলীও অসন্তুষ্ট সুভাষের ওপর।

আলোচনা সবে শুরু হয়েছে। এমন সময় এলেন ড. দুবে আর জব্বলপুরের ড. ডি সিলভা। সঙ্গে আয়োজকদের কয়কজন। আস্তে করে পণ্ডিতজিকে পাশে ডাকলেন তারা। ফিসফিসিয়ে বললেন, 'সভাপতির জ্বর একভাবে ১০৩ ডিগ্রিতে বাঁধা রয়েছে।'

'সত্যি?'

'যে কোনওরকম শারীরিক বা মানসিক ধকলে তাঁর প্রাণসংশয় হতে পারে। তাঁকে অবিলম্বে বড় হাসপাতালে নিয়ে যান। অধিবেশন পিছিয়ে দিন।' কথা শুনে পণ্ডিতজির মুখে চিন্তার ছায়া পড়ে।

সভাপতির শিবিরে মৃত্যুর কালোছায়া। খাটের ওপর শোয়া সুভাষচন্দ্রকে হাওয়া করছে তাঁর ভাইপো। মা আর বিভাবতী তাঁর কপালে জলপটি দিচ্ছেন। একজন এসে শরৎচন্দ্রকে বললেন, 'পণ্ডিত নেহরু, সর্দার পটেল বা কংগ্রেসের অন্য নেতারা সভাপতির অসুস্থতার কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন।'

শরৎচন্দ্র ঝাঁজিয়ে ওঠেন, 'যার যা খুশি মনে করুক, যা খুশি বলুক। ইদানীং এত কিছু খারাপ দেখেছি আর শুনেছি যে সব সয়ে গেছে। এখন আর কিছুতেই কিছু হয় না। আমাদের মন এখন পাথর।'

৫

পরের দিন বোম্বাইয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ড. গিলডার দেখে এলেন সুভাষচন্দ্রকে। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। পণ্ডিতজি আর সর্দারজি তাঁর দিকে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। প্রবীণদের শিবিরেও বিষণ্ণতার ছায়া। কিন্তু তারই মধ্যে অবশ্য অনেকে হাসিঠাট্টাও করছিলেন। এ দেখে জব্বলপুরের এক প্রবীণ নেতা শর্মাজি ফেটে পড়লেন, 'জওহর, সর্দার এসব কী হচ্ছে?' তোমাদের মতো বড় বড় নেতাও কী হিংসেতে মনুষ্যত্ব হারালে?'

গর্জে উঠলেন, রাজাজি, 'মুখ সামলে কথা বলুন শর্মাজি।'

শর্মাজি ধমকে দাবিয়ে দেন তাঁকে, 'আপনি চুপ করুন।'

সর্দার আর পণ্ডিতজিকে বলেন, 'এই কৃপালনি আর রাজাজির আজেবাজে কথাগুলো শুনে কেন নিশ্চিন্তে বসে আছ তোমরা? আমি দু'বার নিজে গিয়ে দেখে এসেছি তাঁর অবস্থা! সুভাষের জন্য না যাও, নিজেদের জন্য অন্তত যাও তোমরা। ভগবান না করুন, ত্রিপুরী থেকে সুভাষের মৃতদেহ যদি ফিরে যায়, তবে কৈফিয়ত দেবে তোমরা নিজেদের কাছে?'

'ডাক্তার, সত্যি কী অবস্থা?' গিলডারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন নেহরু।

'হিজ কন্ডিশন ইজ অ্যালার্মিং!'

নেহরুর মুখে ভয়। তাড়াতাড়ি জুতো পরে বেরিয়ে আসেন তিনি। তাঁর পেছনে সর্দারও আসেন।

সুভাষচন্দ্রের শরীর অস্থিসার। মুখ বিবর্ণ, চোখ লাল। তাঁর এই চেহারা দেখে নেহরুর ভেতর অবধি আলোড়ন! দলা পাকিয়ে ওঠে যেন গলার কাছে।

'সুভাষ পাগলের মতো এ কী জেদ ধরে বসে আছ?'

'দাদা। আমার ভেতর থেকে শুনতে পাচ্ছি, ঘনিয়ে আসা মহাযুদ্ধের আওয়াজ। সময়

এসেছে। সমস্ত দেশকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসকে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে গোলামির শেকল ছিঁড়ে ফেলার জন্য।'

'সুভাষ পাগলামি ছাড়। তোমাকে তাড়াতাড়ি ভরতি করতে হবে জব্বলপুরের বড় হাসপাতালে। সব ডাক্তারের একই মত।'

'ইচ্ছা করলে আমাকে নর্মদার জলে ডুবিয়ে দিন। কিন্তু আমার কথা না বলে আমি কিছুতেই যাব না।'

খানিকক্ষণ কথা বলে নেহরু-পটেল যাবার জন্য পা বাড়ালেন। ঠিক তখন সুভাষের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'গাঁধীজি কি রাজকোট থেকে এখানে আসবেন, জওহর?'

'সে রকম কোনও খবর তো নেই।'

'আমি কিন্তু নিশ্চিত যে তিনি আসবেন, নিশ্চয়ই আসবেন।'

মায়ের চোখ জলে ভরে ওঠে। জওহর আরও চিন্তিত হন।

স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সুভাষচন্দ্রকে বিছানা থেকেই নিয়ে আসা হল। মঞ্চে বিছানো হল রোগশয্যা। মাথায়-পিঠে দু-তিনটে পাতলা বালিশ দিয়ে একটু উঁচু করে দেওয়া হল, যাতে সুভাষ শুয়ে শুয়েও প্রতিনিধিদের দেখতে পান। তাঁর গায়ে কম্বল দেওয়া হল। ড. সুনীল বসু তাঁর মাথায় বরফ দিচ্ছিলেন। ইলা আর শীলা হাওয়া করছিল। কালচে মেরে যাওয়া মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তবু চোখের দৃষ্টি সংহত করে কর্মসূচির কাগজে হাতে সভা পরিচালনা করছিলেন তিনি। সে দৃশ্য দেখে শীতল স্রোত বইছিল অনেকের মনে। ভীষ্ম নয়, স্বাধীনতার যুদ্ধে ব্রিটিশ কৌরববাহিনীর সঙ্গে সমরোন্মুখ অর্জুনই যেন পড়ে আছেন শরশয্যায়।

রাজকোটে গাঁধীজির অনশন ভঙ্গের খবর সকালেই এসেছে কংগ্রেস নগরে। শুরুতেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে, নিয়মমাফিক সভার কাজ শুরু হল।

সুভাষচন্দ্র মাইকে আহ্বান জানালেন, 'সর্দার পটেল, মঞ্চে আসুন।' সর্দার মঞ্চের দিকে এগোলেন। হাততালিতে ভরে উঠল সভা। আচার্য কৃপালনি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থী নেতারা বসে ছিলেন প্রতিনিধিদের মধ্যে। সুভাষ সসম্মানে তাঁদেরও আমন্ত্রণ জানান মঞ্চে।

এদের পেছনে পেছনে মোটাসোটা গোবিন্দবল্লভ পন্থ মঞ্চে উঠে একতাড়া কাগজ দিলেন সুভাষচন্দ্রের হাতে। হাতে নিয়ে খুলে দেখলেন সুভাষ। দক্ষিণপন্থীদের চোখ চকচক করছে খুশিতে। রুদ্ধশ্বাস, সতর্ক প্রতীক্ষা বামপন্থীদের। শান্তস্বরে সুভাষ বলেন, 'কংগ্রেস কমিটির ১৬০ সদস্যের স্বাক্ষর সংবলিত একটি দরখাস্ত এসেছে আমার কাছে। পণ্ডিত পন্থ এ-ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে চান।'

সভাপতির শারীরিক অবস্থা দেখে সচিব শ্রীনরসিংহম্ পড়লেন পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব। বামপন্থীগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই ফিসফিস শুরু করলেন। তার মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রস্তাব বিস্তারিতভাবে বলার জন্য তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। 'এই প্রস্তাবে আমরা বিগত বর্ষের কার্যনির্বাহী সমিতির ওপর আস্থা প্রকাশ করছি। মহাত্মা গাঁধীর মহান নেতৃত্বের ওপর অগাধ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস রেখে আমরা প্রস্তাব করছি যে বর্তমান বর্ষেও "তাঁর ইচ্ছা এবং মর্জি অনুসারে" কার্যনির্বাহী সমিতি মনোনীত করা হোক। এই প্রস্তাব অবিলম্বে গ্রহণ করার জন্য আমরা সভাপতিকে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

পণ্ডিত পন্থের বক্তব্য শেষ হতে-না-হতে সভায় বিতণ্ডা শুরু হল। উত্তেজিত শার্দূল সিং

কবীশ্বর প্রশ্ন করলেন, 'ওয়ার্কিং কমিটির মনোনয়ন যদি গাঁধীজির ইচ্ছা এবং মর্জি অনুসারে হয়, তবে কংগ্রেসের সভাপতি পদ রাখার কী দরকার?'

'বন্ধুগণ, সুভাষবাবুকে ঠুঁটো জগন্নাথ করার জন্য এটা একটা কূট চাল।' গর্জে উঠলেন ব্যারিস্টার নরিম্যান।

'না, না, প্রস্তাব পেশ করতে দিতেই হবে।' গুজরাত আর অন্ধ্রের প্রতিনিধিরা চেঁচাতে থাকেন।

'বেআইনি প্রস্তাব পেশ হতে আমরা দেব না। এ প্রস্তাবের অর্থ গণতন্ত্রের হত্যা।' তারস্বরে বলতে থাকেন পঞ্জাব আর বাংলার প্রতিনিধিরা।

পন্থের প্রস্তাবে তুমুল হট্টগোল শুরু হল। কেউ কারও কথা শুনছেন না। সভার কাজ আধঘণ্টা মুলতুবি করা হল। 'প্রস্তাব বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে বিবেচনার জন্য পেশ করা হোক' বলে সুপারিশ করা হল। বিরতির পর মহাসমিতিই কাজ শুরু করল বিষয়-নির্বাচনী কমিটি হিসাবে। যেন তেন প্রকারেণ এ প্রস্তাব শুধু পেশ নয়, 'পাশ'ও করাতে হবে, এর জন্য পণ্ডিত পন্থ, সর্দার পটেল, কৃপালনি প্রমুখেরা কোমর বেঁধেছেন। অন্যদিকে প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্রের সভাপতির অধিকার ও স্বাধীনতা হরণের ষড়যন্ত্র বামপন্থীদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার।

সুভাষচন্দ্রকে কীসের জন্য ফাঁসানো হচ্ছে, মানবেন্দ্রনাথ রায় সেটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। সভায় উঠে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখলেন তিনি, 'এ প্রস্তাবের কোনও সাংবিধানিক ভিত্তিই নেই। এ প্রস্তাব আউট অফ অর্ডার ঘোষণা করুন।'

'প্রস্তাব গ্রাহ্য করতেই হবে।' দক্ষিণপন্থীরা মারমুখী হয়ে ওঠেন। হাত তুলে সবাইকে শান্ত হওয়ার জন্য শোওয়া অবস্থাতেই আকুল অনুরোধ জানান সুভাষ। একটু থেমে রইলেন তিনি। সিদ্ধান্ত তাঁরই হাতে। সভা নিশ্চুপ। কী হবে প্রস্তাবের? গ্রহণ না বর্জন? কী অন্যায় প্রস্তাব! গলার ফাঁসির মতো, বিষাক্ত সাপের ছোবলের মতো।

'দেখুন, আমায় সবাইকে সুযোগ দিতে হবে।'

'কাকে সুযোগ দিচ্ছেন আপনি? এ প্রস্তাবে আপনাকে শেষ করে দেবার স্পষ্ট প্রয়াস। আপনি কেন এ প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিচ্ছেন?' কবীশ্বর প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ সবাইকে সুযোগ দিতে হবে আমায়। যাঁরা আমার বিরোধী তাঁদেরও।' ইতিহাসের ভলতেয়ার যেন ভর করেছেন তাঁর ওপরে। 'আপনাদের মত আমি মানি না। কিন্তু সে মত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে আপনাদের আর আপনাদের সে অধিকারের জন্য আমি সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করব।' সভাগৃহে যেন শিহরন ওঠে। যেন ফরাসি তাত্ত্বিক ভলতেয়ারের প্রতিধ্বনি।

'আমার কথা শুনুন। এ প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দেবেন না।' মানবেন্দ্রনাথ চিৎকার করে বলতে থাকেন। এলেন রায়ও হাত তুলে, 'এরকম করবেন না', বলতে থাকেন সবটুকু শক্তি দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব পেশ করতে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। বামগোষ্ঠীর তরুণ সদস্যরা বিষণ্ণ। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের খুশি চেপে রাখতে পারছেন না। তবু গোলমাল থামে না সভায়। বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। তাই স্থির হল প্রকাশ্য অধিবেশনে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সভার কাজ শেষ হল। সুভাষচন্দ্রকে স্ট্রেচারে করে স্বেচ্ছাসেবকেরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শ্রান্ত ক্লান্ত সেই দেহের দিকে তাকিয়ে কাকা গাডগিল, বাপুজি আনেকে বললেন, 'হি ইজ নায়দার লেফট নর রাইট। বাট হি ইজ আপরাইট।'

জ্যোৎস্নালোকে বয়ে চলে নর্মদা। কংগ্রেসনগরে প্রত্যেকের মুখে একটিই আলোচনা। পন্থ প্রস্তাবের কী হবে।' সহকারী মনগটে চাওত তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'বাবুজি, এই পাহাড়ের বোঝা কেন নিচ্ছেন মাথায়?' বিষণ্ণ হেসে সুভাষ বলেন, 'সত্য আর অহিংসার সেবকদের একটু বুঝতে দাও না, আমরাও আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছি।'

৬

যে শিবিরে ওয়ার্কিং কমিটির প্রবীণ সদস্যরা ছিলেন, সেখানে বামগোষ্ঠীর কয়েকজন এসে অনুরোধ জানালেন, 'অন্তত কিছুদিনের জন্যও অধিবেশন পিছিয়ে দিন।'

'অসম্ভব', সটান না বলে দেন তাঁরা। 'অধিবেশন হবে আর ভালভাবেই হবে।'

'সুভাষবাবুর যদি ভালমন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তার জন্য কে দায়ী হবে?'

পন্থ প্রস্তাবের জালে ভালভাবেই ফেঁসেছেন সুভাষ। এ সময় কি তাঁকে ছেড়ে দেওয়া যায়? দক্ষিণপন্থীরা কুলিশকঠোর।

বিছানায় শুয়ে জালে পড়া মাছের মতোই ছটফট করছেন সুভাষ।

'অসুখের জন্য মনের মতো করে অভিভাষণটাও লিখতে পারলাম না। ভেবেছিলাম সভার মঞ্চ থেকে ব্রিটিশদের ভালমতো ছেঁকা দেব এবার। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে দেশের মঙ্গলের কাজে লাগাবার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলব, জাগিয়ে তুলব বিপ্লবের জন্য। অথচ আজ সভার মঞ্চে নিজে ওঠারও ক্ষমতা নেই আমার!'

অস্তসূর্যের আলোয় শরৎবাবু সুভাষের অভিভাষণের ইংরেজি বয়ান পড়তে থাকেন। হিন্দি অভিভাষণ পড়েন নরেন্দ্র দেব।

ভাষণের শুরুতেই সুভাষচন্দ্র রাজকোটে অনশন সমাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন মহাত্মাজিকে। শরৎবাবুর মুখ দিয়ে সুভাষের কথাগুলো ধ্বনিত হচ্ছিল লাউডস্পিকারের মধ্যে দিয়ে।

'গত সেপ্টেম্বরে, গণতন্ত্রের নামে নিত্য যারা কথার পাহাড় খাড়া করেন, সেই ব্রিটেন আর ফ্রান্স নাজি জার্মানির কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মিউনিখের মৈত্রী চুক্তিতে শামিল হয়েছে। জগতের শক্তিমান রাষ্ট্রগুলিও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে গিরগিটির মতো রং পালটায়। শুধু আমরা নিজেদের চারপাশে সত্য আর অহিংসার মাকড়সার জাল বুনে সরলমনে পরাধীনতার অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছি।'

'আজ ব্রিটেনের হাতে পাথর চাপানো। আরবি মুলুকের আরবদের আর প্যালেস্তাইনের ইহুদিদের তোষামোদ করছে তারা। ব্রিটেন আজ নিজের সুরক্ষা নিয়ে ভীত, ত্রস্ত। এটাই আমাদের লক্ষ্য পূরণের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সংকট থেকে একবার বেরিয়ে আসতে পারলে ব্রিটেন পরাধীনতার ফাঁস আরও আঁট করে ধরে ভারতের প্রাণ অতিষ্ঠ করে দেবে। তাই তার আগে ব্রিটেনকে চরমপত্র দিতে হবে এবং স্বাধীনতার দাবিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে হবে। সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। ব্রিটিশ যদি তাতে কর্ণপাত না করে, তবে স্বদেশের মুক্তির জন্য আমাদের তুলে নিতে হবে হাতিয়ার। সত্যাগ্রহ আর আইনভঙ্গ আন্দোলন তীব্রতর করে তুলতে হবে।

'এগিয়ে চলুন। কালচক্রের গতি পালটে দিন। এরকম অমূল্য সুযোগ ক্বচিৎ কদাচিৎ দেশের ভাগ্যে আসে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম করুন।'

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সভার আলোচনা শুনতে শুনতে চোখ জলে ভরে আসে সুভাষচন্দ্রের। দু'দিন বিশ্রামের পর অন্তত প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারবেন, আশা ছিল তাঁর। ভাগ্য বিমুখ। বাঘের মতো বিক্রম নিয়ে তাঁর প্রস্তাবিত বিপ্লবের রূপরেখা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। নিজে মঞ্চে উপস্থিত থাকলে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেক সহজ হত। দুঃখে, গ্লানিতে জর্জর সুভাষ বলেন, 'মাগো। কয়েক হাত মাত্র দূরে দেশের ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে আর আমি এখানে শুয়ে আছি! মা কালী এ কী পরীক্ষা নিচ্ছেন আমার?'

গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা সান্ত্বনা দেন তাঁকে, 'বাবা, হয়তো এর চেয়েও কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে তোকে। তাই হয়তো ভগবান তোকে যাচাই করে নিচ্ছেন, আরও শক্তিমান করে তুলছেন।'

দুপুরে গাঁধীকুটিরের কাছ দিয়ে জওহরলালের মোটর অধিবেশনের দিকে যাচ্ছিল। কুটিরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের জন্য দলে দলে মানুষ আসছেন। হঠাৎ দেখলেন সুভাষ-জননী চলেছেন ফুল হাতে। দাঁড়িয়ে পড়েন জওহর। 'মা, সুভাষ কেমন আছে?'

'গায়ের জ্বর তেমনই আছে। কোনও উন্নতি নেই।'

নর্মদার দিকে তাকিয়ে জওহর দাঁড়িয়ে। মা বললেন, 'জওহর, আজ পর্যন্ত আমি ভাবতাম তোমার আর সুভাষের জুটি চাঁদ আর সূর্যের মতোই চিরস্থায়ী।'

নেহরু বলেন, 'আপনি তো জানেন মা, সুভাষ কীরকম সেধে ঝগড়া ডেকে আনেন।'

মা বললেন, 'সুভাষ নিজের স্বার্থের জন্য ঝগড়া করেছে, এরকম একটা দৃষ্টান্তও কি দিতে পার তোমরা?'

জওহর সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'না, পারি না, সে কথা অবশ্য সত্যি!'

'গাঁধীজির মতো মহান মানুষ। আমি সবসময় ভেবেছি, তিনি এখানে আসবেন, নিশ্চয় আসবেন। অন্তত রাজকোটে অনশনভঙ্গের পর আসবেন। কিন্তু বুঝি না কেন মনকে এত কঠিন করে তুলেছেন তিনি। যদি আসতেন হয়তো ঝগড়ার অবসান হত।

'মা, রাজকোটে ফোনে কথা বলবেন?'

'না। তিনি ভাববেন আমি পুত্রস্নেহে গান্ধারীর মতো চোখ ঢেকেছি।' দৃঢ়স্বরে মা বলেন। 'আর তা ছাড়া জওহর, কত আর খারাপ হবে? ছেলে আমার জন্মদাত্রী মায়ের কোল ছেড়ে চিরদিনের মতো তার অনেক বড় মায়ের কোলে, জন্মভূমি মায়ের কোলে চলে যাবে, এর চেয়ে বেশি তো কিছু ঘটবে না।'

জওহর মাকে গাড়িতে বসিয়ে শিবিরের দিকে চললেন। মা অনেক রোগা হয়ে গেছেন। নেহরু বলেন, 'মা, সুভাষ আর বাপু দুজনেই অনড়। এদের ঝগড়া মেটাতে মেটাতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। সুভাষ আমার ভাইয়ের মতো, কিন্তু বাপু যে আমার বাবার জায়গায়।'

ড. গিলডার আর কর্নেল ড. মুকুন্দ এসেছেন। সুভাষকে পরীক্ষা করলেন তাঁরা। নাড়ি পরীক্ষা করতে করতে বললেন, 'ডানদিকের ফুসফুসে নিউমোনিয়া হয়েছে। এঁকে শিগগির জব্বলপুর নিয়ে যান।'

'সুভাষ শুনলে? কীসের এত জেদ তোমার? রাজনীতির চেয়ে জীবন অনেক বেশি জরুরি।' মিনতির সুরে বলেন জওহর।

'জীবনের চেয়ে দেশের ভবিষ্যৎ অনেক বড়।' পাশ ফেরেন সুভাষ।

জওহরলালের ভেতরটা ছটফট করে। উঠে কংগ্রেসনগরের পোস্ট অফিসে গেলেন তিনি। গাঁধীজির সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এ জটিলতার একটা সমাধান করতে হবে। যে-কোনও সময়ে

সুভাষের কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। পণ্ডিতজি স্বয়ং এসেছেন। পোস্ট অফিসের লোকেরা তড়িঘড়ি রাজকোটে ফোন লাগালেন। মহাদেবভাই ফোন ধরলেন। পণ্ডিতজি আকুলস্বরে বললেন, 'সুভাষের শারীরিক অবস্থা বেশ খারাপ। বাপুর পরামর্শ চাই। পন্থ তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করে পরিস্থিতি প্যাঁচালো করে তুলেছেন। সে ব্যাপারেও আমার তাঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার। দয়া করে বাপুকে ফোনে ডেকে দিন।' মহাদেবভাই ফোন পাশে রেখে দিলেন। অনেকক্ষণ পর গাঁধীজির গলা অস্পষ্টভাবে শোনা গেল। কিন্তু উত্তর দিলেন মহাদেবভাই, 'বাপু কাছাকাছি নেই।' কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন জওহর। তারপর উঠলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'বাপুজি বোধহয় বধির হয়ে গেছেন।' স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. গিলডারকে সুভাষের কাছে ফেরত পাঠিয়ে, পণ্ডিতজি চললেন প্রকাশ্য অধিবেশনের দিকে।

পণ্ডিতজি সুভাষের অবস্থা সম্পর্কে ডাক্তারদের অভিমত পড়ে শোনালেন। তাঁর স্বরে উদ্বেগ। সুভাষচন্দ্রের জায়গায় সভার কাজ পরিচালনা করছিলেন মৌলানা আজাদ। বিভিন্নভাবে পন্থ প্রস্তাবের ঢেউ বার বার আছড়ে পড়ছিল সভায়। বাপুজি আনে প্রস্তাব করলেন, অধিবেশনের পরে কংগ্রেস কমিটিতে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। তাঁর কথার মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিলেন পণ্ডিত পন্থ। 'আনের প্রস্তাব সম্পর্কে সভার মত নেওয়া হোক।' একদিক 'হ্যাঁ হ্যাঁ' অন্যদিকে 'না না'-র হই হট্টগোল। গাঁধীজির তথাকথিত 'পরাজয়'-এর বদলা নেবার জন্য দক্ষিণপন্থীরা কোনও মিটমাটের জন্য বিলকুল রাজি নন। অন্যদিকে পন্থ প্রস্তাবের ফাঁদ তৈরি হওয়াতে বামপন্থীরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। গোলমালের মধ্যেই মৌলানা আজাদ গলা চড়িয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন, 'এ বিষয়ে কাল বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে মত নেওয়া হবে।'

'কেন? আলোচনা যদি করতেই হয় তবে প্রকাশ্য অধিবেশনেই তা করা হোক না। পরদার আড়ালে বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে কেন?' চিৎকার করে প্রশ্ন করেন ব্যারিস্টার নরিম্যান।

'প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচনা করতে ভয় পাচ্ছেন কেন আপনারা?' এন. জি. রঙ্গার প্রশ্ন শোনা গেল গোলমাল ছাপিয়ে। উত্তর দিলেন ব্যারিস্টার নরিম্যান, 'সুভাষ আবার জিতে যাবেন। তাই খোলা রাস্তা ছেড়ে চোরাগলিতে যেতে চান এঁরা।'

'কেন যে সুভাষবাবু এ প্রস্তাব আনতে দিলেন। গাঁধীজোটের প্যাঁচের জালে সুভাষ ক্রমশই ফেঁসে যাচ্ছেন।' বলতে বলতে জলে ভরে যায় কবীশ্বরের চোখ দুটো।

বারবার অন্যায়ের শিকার হয়ে বামপন্থীরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। সভায় হুল্লোড়। এরই মাঝে পণ্ডিত নেহরু কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় হট্টগোল। 'বসে পড়ুন, বসে পড়ুন', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' আওয়াজ উঠল চারদিক থেকে। অনেকেই বুঝে গিয়েছেন যে জেনে-বুঝে, বার বার সুভাষচন্দ্রের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ক্ষমতা ছেঁটে দিয়ে শক্তিহীন করে দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত অনেকেই। প্রতিনিধিরা তাই আর কারও ভাষণ শুনতে রাজি নন। কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁকে বলতেই দেওয়া হচ্ছে না এরকম একটা অকল্পনীয় ব্যাপারে প্রচণ্ড আহত জওহরলাল। থরথর করে হাত কাঁপছে তাঁর।

'গুন্ডার দল, ফ্যাসিস্ট', চোখা চোখা বিশেষণ বেরিয়ে আসে তাঁর মুখ থেকে। উত্তেজিত এম. এন. রায় চিৎকার করে পালটা জবাব দেন, 'পণ্ডিত, গলির গুন্ডা, বসে পড়।' কেউ কারও কথা শুনছে না। পনেরো-কুড়ি মিনিট ব্যর্থ চেষ্টা করে বসে পড়লেন পণ্ডিতজি। আস্তে আস্তে কাছ ঘেঁষে এলেন রাজাজি। ঘেমে নেয়ে উঠেছেন পণ্ডিতজি। তাঁকে হিসহিসিয়ে বলেন রাজাজি, 'কি? মিত্রপক্ষের ব্যবহারটা দেখলে? কাদের জন্য তিলে তিলে নিজেকে শেষ করছ তুমি?'

শরৎবাবু মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'দয়া করে শান্ত হয়ে বসুন', আকুল আবেদন

জানাতে থাকেন তিনি। শান্ত হয় না সভা। এক ঘণ্টা ধরে গোলমাল চলতেই থাকে। গোলমাল একটু কমলে শরৎবাবু আবার উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। জওহরলাল ভুলতে পারেন না এম. এন. রায়ের কথাগুলো। ঠিক তেমনি ভুলাভাইয়ের 'বোস ব্রাদার্স আর স্কাউন্ড্রেলস' কথাগুলো কানে বিঁধে রয়েছে শরৎবাবুর। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় হট্টগোল থামল কোনওরকমে। পণ্ডিতজি তাঁর ভাষণে বললেন, 'কংগ্রেসের মধ্যে নির্মমতা, দুর্নীতি আর অন্তর্কলহ সম্পর্কে গাঁধীজি ঠিকই বলেছেন! গত ছাব্বিশ বছরে প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত থেকেছি আমি। এরকম দুঃখজনক কলহ কখনও দেখিনি।'

পন্থ প্রস্তাবের ওপর আলোচনার সিদ্ধান্ত বজায় রইল। কাল কী হবে তার প্রতীক্ষায় রাত্রি পৌনে বারোটায় সভা শেষ হল।

অধীর ঔৎসুক্য নিয়ে বয়ে চলে নর্মদা। কী হবে কাল?

৭

ত্রিপুরীর এই শেষের রাত্রি এল নানান বৈচিত্র্য নিয়ে। রাত্রি বাড়ে। তার সঙ্গে বাড়ে আলোচনা, গুপ্তবৈঠক, ষড়যন্ত্রের কাজকারবার। রাজাজি নিজের সঙ্গীসাথিদের বলতে থাকেন, 'জওহর আর বাপুর মতপার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। অনেকবারই কথা কাটাকাটি হয়েছে তাদের মধ্যে। তবু জওহর কখনও গাঁধীজিকে ডিঙিয়ে যায় না। উল্টোদিকে সুভাষের স্বভাব পেছন থেকে ছুরি মারা। তার নামে অভিযোগ ভরতি অনেক ফাইল রয়েছে বাপুজির আলমারিতে। সাংঘাতিক সে সব অভিযোগ। বাপুজি কিন্তু তাদের সম্বন্ধে একটা টুঁশব্দও করেননি কারও কাছে।'

'গাঁধীজির জন্য কেউ যদি গর্ত খোঁড়ে, আমরা তার জন্য খাদ খুঁড়ব।' কৃপালনি বলে ওঠেন। সারা রাত পটেল আর নেহরু শিবিরে শিবিরে হাজির হয়ে সাক্ষাৎ করেন বিভিন্ন জনের সঙ্গে। বামপন্থীদের ওপর জওহরলালের যেটুকু সহানুভূতি ছিল তা দুপুরেই সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তাঁকে বলতে দেওয়া হয়নি, এতে দারুণ আঘাত লেগেছে তাঁর মনে। বহুক্ষণ কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল তাঁর। শেষে ঠিক করে ফেললেন, সর্দার যা বলবেন, তাই করবেন তিনি। এবার মহানদী নয় নর্মদার তীরে জমে উঠেছে 'জুলিয়াস সিজার'-এর অভিনয়। ছুরি বার করেছেন সিজারের প্রাণের বন্ধু ব্রুটাস।

সাতটি প্রদেশের কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী আর অন্য মন্ত্রীরাও প্রচারে নামলেন। 'গাঁধীজির সম্ভ্রম বাঁচান, কংগ্রেস বাঁচান।' আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রশাসনযন্ত্র পটেল-প্রসাদের হাতে। নির্বাচনী টিকিটপ্রাপ্তি থেকে মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত সৌভাগ্যপ্রাপ্তি যাঁদের জন্য ঘটেছে, তাঁদের ঋণ শোধ করার সুযোগ পেয়ে ক্ষমতাশালীরা ছুটোছুটি শুরু করলেন। রাত্রি আরও গভীর হলে তাঁরা গিয়ে বসলেন সমাজবাদীদের জোটের সঙ্গে। চট করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধাত নয় সমাজবাদীদের। তাদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল। তাদের ইতস্তত ভাব দেখে সর্দার পটেল বললেন, 'পন্থ প্রস্তাব যদি না গৃহীত হয় গাঁধীজির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নেতাই কংগ্রেস ত্যাগ করবেন।'

'গাঁধীজিই যদি না থাকেন, কংগ্রেসের কী থাকবে তা হলে।' করুণ সুরে বলেন জওহরলাল।

'তাই বলছি কী করবেন ঠিক করুন। একদিকে মহাত্মাজির মহান নেতৃত্ব আর অন্যদিকে ফ্যাসিস্টদের জালে ফাঁসা— এই দুয়ের মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে আপনাদের। অহিংসার পক্ষ নেবেন না হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হবেন— তার সিদ্ধান্ত আপনাদেরই নিতে হবে।' সর্দার পটেল সাবধান করে দেন সকলকে।

গাঁধীজি বেরিয়ে যাবেন কংগ্রেস থেকে এই সম্ভাবনা দ্বিধা থেকে মুক্তি দিল অনেককে। তা ছাড়া জয়প্রকাশের মতো বহু তরুণের গাঁধীজির সঙ্গে পারিবারিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। গাঁধীবাদ সমর্থন না করলেও সমাজবাদীরা গাঁধীজির প্রয়োজন সরলভাবেই মানতেন। সমাজবাদীদের মধ্যেও বইতে শুরু করল বিপরীত স্রোত।

কমিউনিস্টরাও একমত হতে পারছিলেন না। গতদিনে তাঁরা তিনবার ডিগবাজি খেয়েছেন। পি. সি. জোশি গোষ্ঠীর মত প্রস্তাবের সময় হয় অনুপস্থিত থাকা নয়তো চুপ করে থাকা। কিন্তু বাংলার কমিউনিস্টরা তাতে ভীষণ ক্ষুব্ধ। সুভাষচন্দ্রের ওপর যে অন্যায় হতে চলেছে তাতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ তাঁরা। পি. সি. জোশি তাঁদের ওপর রেগে আগুন হয়ে বললেন, 'আদর করে জড়িয়ে ধরে গলা কাটছ তোমরা । রাবিশ বাঙালি!'

'গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির বড় কর্তারা নারাজ হবেন এই ভয় করছেন বোধহয়? কিন্তু ভারতের গলাটা তো বাঁচবে!' বাঙালি সদস্যরা উত্তর দিলেন।

ভোর রাত্রেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলছিল দৌড়াদৌড়ি, বৈঠক, সমঝোতা। সকালে জয়প্রকাশের এমন মত পরিবর্তন দেখে বামপন্থীরা হতভম্ব। এইচ. ভি. কামাথ ছুটলেন শরৎবাবুর কাছে।

'শরৎবাবু, ত্রিপুরীর মণ্ডপে আগুন ছড়াচ্ছে!'

'কী হয়েছে?'

'সারা রাত নেহরু আর পটেল তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে সুভাষের বিপক্ষে প্রচার চালিয়েছেন।'

কামাথের সঙ্গে শিবিরের বাইরে এলেন শরৎবাবু। ফরসা হয়েছে। ভোরের ঠান্ডায় শান্ত চারদিকে। তাঁবুগুলো চুপচাপ। যাদের কপালে তাঁবু জোটেনি, সেইসব কংগ্রেসকর্মীরা খড়ের ওপর কম্বল বিছিয়ে, শিবিরগুলোর দরজার পাশে, গাছের নীচে গোরুরগাড়ির নীচে যে যেখানে পেরেছেন ঘুমোবার জায়গা করে নিয়েছেন। এঁরা রাজনীতির ঘোর-প্যাঁচের ধার ধারেন না। স্বাধীনতার জন্য নিরন্তর সংগ্রামরত কংগ্রেসের অধিবেশন আর শ্রদ্ধেয় নেতাদের দেখা যাবে এই আশা নিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে পৌঁছেছেন তারা। বহমান নর্মদার ধীর গম্ভীর কল্লোল ভেসে আসছে।

তখন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে রেখেছিলেন শরৎবাবু। এবার তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। শিবিরের মধ্যে অন্যদের সামনে কাঁদতেও তো পারেন না তিনি। হঠাৎ বলে ওঠেন তিনি, 'সুভাষ রে! আকাশের সব গ্রহ তারা একসঙ্গে হঠাৎ তোর ওপর বিমুখ কেন হল? ওয়ার্ধাতে, ত্রিপুরীতে তোর কথাগুলো অন্তত তুলে ধরার সুযোগটুকুও ভাগ্য তোকে কেন দিল না?'

কামাথ বললেন, 'আমাদের প্রতিনিধিরা নেহরুকে অকারণ বিক্ষুব্ধ করে তুললেন।'

'তা না হলেও তফাত কি কিছু হত? তিনি তো থেকেও না থাকার মতোই ছিলেন । শুধু মুখের সহানুভূতিতে তো আর দুনিয়া চলে না।'

অধিবেশনের শেষ দিন। সমস্ত প্রতিনিধিদের বসানো হয়েছে বিষয়-নির্ধারণ কমিটির ছোট সভাকক্ষে। প্রতিনিধি ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার নেই। আলাদা আলাদা ভাগে বসানো হয়েছে আলাদা আলাদা অঞ্চলের প্রতিনিধিদের। একদিক দিয়ে বলতে গেলে ব্যূহ রচনা করা হয়েছে, কঠোর সতর্কতা নিয়ে। সকাল আটটা কুড়ি মিনিটে শুরু হল 'ইন ক্যামেরা' অধিবেশন। প্রস্তাব পুনরুত্থাপন করে পণ্ডিত পন্থ বললেন, 'যে-কোনও রাষ্ট্রে একজনই নেতা থাকেন। যেমন জার্মানিতে হিটলার, ইতালিতে মুসোলিনি, রাশিয়ায় লেনিন। এ সব রাষ্ট্রের প্রগতির মূল ভিত্তি একটি মাত্র নেতার ওপর তাদের অনড় বিশ্বাস। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা গাঁধীজিকে

পেয়েছি। কেন সে সৌভাগ্যের সুযোগ নেব না আমরা?' আবেগের বশে পণ্ডিত পন্থের গাঁধীজির সঙ্গে হিটলার-মুসোলিনি-লেনিনের তুলনা করাটা একটু গোলমাল হয়ে গেলেও দক্ষিণপন্থীরা পন্থের প্রস্তাবে সোচ্চার সমর্থন জানালেন। কাকা গাডগিল প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এর পর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে উঠে দাঁড়ালেন ব্যারিস্টার নরিম্যান। আবেগে আপ্লুত তাঁর স্বর। 'জন্ম-জন্মান্তরের শত্রুও যখন রোগশয্যায় অসহায় হয়ে পড়ে থাকে, তার প্রতি সহানুভূতি দেখানো ভারতের আবহমানকালের সংস্কার। অথচ আজ এখানে কংগ্রেস সভাপতিকে তাঁরই সহকর্মীদের কাছ থেকে এই সামান্য সৌজন্যটুকু ভিক্ষে করতে হচ্ছে।' বলতে বলতে গলা কাঁপে তাঁর। 'কীসের জন্য এত তাড়া আপনাদের? সভাপতি কি মুখ লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন? ডাক্তারদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর এ অবস্থাতেও পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কলকাতা থেকে এতদূরে আসেননি?'

'নরিম্যান', রাজাজি গর্জন করে উঠলেন, 'আপনি যা খুশি তাই বলুন। কিন্তু ভাঙা নৌকোয় পাড়ি দিতে গিয়ে যমুনায় ডুবে মরার শখ আমাদের নেই।' সভাকক্ষে হাসির রোল উঠল। বামপন্থীদের মুখে নিরাশা। রাজাজি টিপ্পনীর পরেই 'মহাত্মা গাঁধী কী জয়' ঘোষণায় সভাকক্ষ গমগম করতে লাগল।

দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শার্দূল সিং। 'গাঁধীজির নাম নিয়ে আপনারা দয়া করে অন্যের গলা টিপে ধরবেন না। সভাপতির ওপর "ভোট অব সেন্সর" আপনারা গ্রহণ করবেন না।' সংশোধনী প্রস্তাবে তিনি বললেন, 'গাঁধীজির ইচ্ছা এবং মর্জি অনুসারে' কথাগুলো বদলে, 'গাঁধীজির পরামর্শ অনুসারে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত করা হবে'— এই কথাগুলো বসানো হোক। পণ্ডিত পন্থ চিৎকার করে বললেন, 'আমার প্রস্তাবে শব্দ তো দূরের কথা, একটা কমা-সেমিকোলনও আমি বদলাতে দেব না।' বাপুজি আনে এবার উঠে দাঁড়ালেন, 'সভাপতিকে এভাবে জাঁতাকলে ফেলার অধিকার কংগ্রেসের সংবিধান আমাদের দেয়নি। সর্দার পটেল যাই বলুন, ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন কংগ্রেস সভাপতিরই অধিকার। পন্থ প্রস্তাবের বেঁকা তেড়া চোরাগলির বদলে আপনারা সরাসরি অনাস্থা প্রস্তাবের সোজা রাস্তা গ্রহণ করছেন না কেন?'

সভার অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ— শার্দূল সিং, ভরদ্বাজ, নরিম্যান, নুরুদ্দিন বিহারী প্রমুখের আনা প্রত্যেকটি সংশোধনী প্রস্তাব একইভাবে অগ্রাহ্য করে চলেছিলেন। ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা জোর করে ঝুঁকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল অন্যায়ের দিকে। তারপর যা হবার তাই হল। ভোটাধিক্যে গৃহীত হল পন্থ প্রস্তাব। গাঁধীজির আব্রু রক্ষা পেল। দক্ষিণপন্থী জোটে উল্লাসের কলরোল। সভায় চুপ করে থাকা সমাজবাদী জোট আগামী দিনের গণতন্ত্রের এই মহড়া দেখতে লাগলেন লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ফিরে যাওয়ার পথে প্রতিনিধিরা ভারাক্রান্ত মনে নিজেদের মনে আলোচনা করতে থাকেন। এর পরে কী হবে? পন্থ প্রস্তাব কি সুভাষচন্দ্রকে বেঁধে রাখতে পারবে? কোন রাস্তা বেছে নেবেন তিনি? বিদ্রোহ না পদত্যাগপত্র দাখিল করে গাঁধীজির পায়ে সাষ্টাঙ্গপ্রণতি? ভবিষ্যতে কী হবে ভবিষ্যৎই জানে। তবে ত্রিপুরী কংগ্রেস স্থাপন করেছে অকল্পনীয়, অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

ছোট বড় তাঁবু আর শিবিরগুলো গোটানো হচ্ছে। রুগ্‌ণ সভাপতির সঙ্গীরাও প্রস্তুত হতে লাগলেন ফিরে যাবার জন্য। অসুস্থ সুভাষকে কলকাতায় না নিয়ে গিয়ে অন্য এক ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন শরৎবাবু। দেশের ইতিহাসে নতুন মোড় আনতে চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। এর জন্য লড়াই করতে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন পাগলের মতো

জেদ নিয়ে। এই কঠিন অসুখ তাঁকে নামতেই দিল না লড়াইয়ের ময়দানে। আটকে রেখে দিল শয্যাশায়ী করে।

জুলিয়াস সিজারের জীবননাট্যে রক্ত ছিটকে পড়েছিল রোমের সেনেট প্রাঙ্গণে। অহিংসার পূজারিরাও ত্রিপুরীপ্রাঙ্গণে ঘটিয়েছেন এক সিজার বধের পালা। অহিংসার বেদিতে বলিদান পর্ব ভালভাবেই শেষ হয়েছে। বর্মভেদ করে খঞ্জর বিদ্ধ করেছে পঞ্জর। তফাত শুধু এই যে সেই তীব্র বিষাক্ত ছুরির আঘাতে রক্ত পড়াটা চোখে দেখতে পাওয়া যায়নি।

৯
দূরান্তের ডাক

১

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল, ১৯৩৯।

'জওহরলালজি, আমার অপরাধটা কী? গাঁধীজির প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো? তার জন্য এইরকম বয়কট? এত রাগারাগি, এত অপমান?'

'যাই ঘটুক আমাদের তিনজনকে একসঙ্গেই থাকতে হবে—তুমি, আমি আর বাপুজি।' জওহর বললেন।

গভীর রাত্রি। উডবার্ন পার্ক ঝিমিয়ে পড়েছে। বহুক্ষণ ধরেই আলোচনা চলছে দুজনে। শরৎবাবু বেশ কয়েকবার এসে ঘুরে গেছেন। সুভাষ-জওহর—দুজনের মুখের ভাবেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সমস্যার কোনও সমাধান এখনও পাওয়া যায়নি এবং পাওয়ার আশাও নেই। সুভাষ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু জটিলতার এত সহজে সমাধান হবে বলে মনে হয় না। এই নিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারও সরগরম। বিস্ফোরণ এখনও ঘটেনি বটে তবে পলতের আগুনও নেবেনি।

উডবার্ন পার্কে দারুণ উদ্বেগ। মা আর বিভাবতীর চোখেও ঘুম নেই। শরৎবাবু অনেকের সঙ্গেই পরামর্শ করছেন। সবারই চোখ-কান জওহরলালের কামরার দিকে। হঠাৎ ড্রাইভার আমিনকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জওহর আর সুভাষ গাড়িতে বেরিয়ে গেলেন।

চৌরঙ্গিতে বিহারীলালের পানের দোকানও তখনও খোলা। এত রাত্রে এই দুই বিখ্যাত ব্যক্তিকে দেখে তাড়াতাড়ি দু' খিলি মিঠেপান দুজনের হাতে দিল সে। এত রাত তবু কোথা থেকে যেন মানুষ এসে ভিড় করছে চারদিকে। গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। এবার ফাঁকা রাস্তা দেখে দেখে উদ্দেশ্যহীন ঘোরা শুরু হল।

জওহর বললেন, 'সুভাষ একটু ধৈর্য ধরো।'

'আমি তো পেছনের দরজা দিয়ে সভাপতি হইনি, সিংহদরজা দিয়েই ঢুকেছি। এটা মেনে নিতে বাপুজি আর তাঁর শিষ্যদের এত কষ্ট হচ্ছে কেন?' সুভাষ বললেন।

'শিষ্যদের কথা বাদ দাও কিন্তু গাঁধীজির সঙ্গে ঝগড়া করে কংগ্রেস চালানো সম্ভব নয় সুভাষ।'

'আমি তো বলেছি গাঁধীজিকে—ওয়ার্কিং কমিটি তিনিই ঠিক করুন। তিনিই তো রাজি হচ্ছেন না।'

অনেক রাতে গাড়ি ফেরার আওয়াজ পেয়ে শরৎ এবার বিছানায় এলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সুভাষকে রাজনীতি থেকে তাড়ানোর ব্যাপারটা ঘটাতে কেন যে এরা কলকাতাকেই বেছে নিলেন? আর কোনও জায়গা পেলেন না!'

বিভাবতী বললেন, 'চিন্তা কোরো না। হিরে মাটিতে পড়লেও তার দ্যুতি কমে না।'

সুভাষ শুতে যাবার জন্য 'গুডনাইট' বললেন। জওহরের মুখ বেদনার্ত। বললেন, 'শেকসপিয়রের ট্র্যাজেডির মতো আমাদের মধ্যেও গড়ে উঠছে দুস্তর ব্যবধান।'

২

গাঁধীজি রয়েছেন সোদপুরে। সেখানে যাওয়ার জন্য সুভাষ আর জওহর বেরোলেন। এই নিয়ে পরপর তৃতীয় দিন যাচ্ছেন তাঁরা।

আশ্রম থেকে একটু দূরেই সুভাষ গাড়ি থামাতে বললেন।

'জওহর, আপনি একলাই যান। আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'এখান পর্যন্ত এসে না যাওয়ার কি মানে আছে? ইচ্ছে না হলে ভেতরে যেয়ো না। তবে আমি আজ বাপুকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করব।'

সুভাষ বাইরের বাগানে বসে রইলেন। জওহর ভেতরে গেলেন। বাপুজি চিঠি লিখছিলেন। জওহরকে দেখে চিঠি লেখা থামালেন।

'বাপুজি। আজ ওয়ার্কিং কমিটির শেষ দিন। গতকাল সুভাষ ইস্তফার চিঠি দিয়েছে। এইভাবে একজনকে বের করে দেওয়াটা খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে বাপুজি।'

'আমি বার করে দেবার কে? তুমি তো এক্ষুনি বললে যে কাল ও নিজে থেকেই ইস্তফা দিয়েছে।'

জওহরলাল অনেক বোঝালেও গাঁধীজি অনড়। সুভাষকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন তিনি। বললেন, 'সুভাষ তোমার ওয়ার্কিং কমিটি তুমিই মনোনয়ন করো, সেটাই আমি চাই।' সহজভাবে মুখে হাসি নিয়ে বললেও বোঝা গেল নিজের জেদ থেকে এক পা-ও সরতে রাজি নন তিনি। ত্রিপুরীর রাগ একটুও পড়েনি এখনও।

'আপনার শিষ্যরা আমার গলায় পন্থ-প্রস্তাবের যে ফাঁসটা পরিয়ে দিয়েছেন, তার কী হবে? তাতে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে, "গাঁধীজির ইচ্ছা ও মর্জি অনুসারে" ওয়ার্কিং কমিটি গড়তে হবে। এর চেয়ে ওরা স্পষ্টই বলুন না যে সুভাষকে দেশের লোক চাইলেও আমরা চাই না।'

গাঁধীজি কোনও মন্তব্য করলেন না। সুভাষ ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে চললেন। পেছনে পেছনে জওহরও এলেন। উত্তেজিত স্বরে সুভাষ বললেন, 'গত তিনদিন যাবৎ একই কথা শুনে আসছি। জট যদি ছাড়াতেই চাইতেন বাপুজি তা হলে এইভাবে সোদপুরে বসে থাকতেন না। উনি যদি একবার বৈঠকে আসতেন তা হলে সমস্যা মিটতে এক মিনিটও লাগত না। আমাকে একঘরে করার জন্য এইসব খেলা চলছে।'

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গাড়ি পৌঁছলে স্বেচ্ছাসেবকরা ভিড় করে এল তাদের প্রিয় নেতার কাছে। সুভাষচন্দ্র ইস্তফা দিয়েছেন জেনে সারা বাংলায় উত্তেজনা। এবার কী হবে?

কংগ্রেস মহাসমিতির বৈঠক শুরু হতেই সরোজিনী নাইডু বললেন, 'সুভাষ, আপনি ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করুন।'

উত্তর দেবার জন্য শুভ্র খদ্দরের পোশাকে সুভাষ যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন সভাতে এক আশ্চর্য নীরবতা। শুধু সভায় উপস্থিতরাই নন, সারা কলকাতা তাঁর দিকে তাকিয়ে। এই শহর তাঁকে মেয়র, জননেতা, কংগ্রেস সভাপতি, অদম্য বিপ্লবী—অনেক রূপে দেখেছে। তাঁকে নিয়ে মিছিল বার করেছে। অনেক আশা অনেক স্বপ্ন তাঁকে ঘিরে। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে

আবালবৃদ্ধবনিতা পথে নেমেছে। জ্যোতির্ময়ীর মতো মেয়েরা রক্ত ঝরিয়েছে মাটিতে। যাঁকে দেখলে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, আজ তাঁর নিজের মুখই যেন কেমন দেখাচ্ছে। মুখে হাসিটি আছে তবে তাতে ভেতরের ভাব চাপা পড়ছে না।

পন্থ-প্রস্তাবের শক্তিশেলের স্বরূপ বাংলায় কারও অজানা নেই। সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনের পর চারটে মাসও কাটেনি—তারই মধ্যে এই দুর্যোগ। মুষ্টিমেয় কয়েকজন গাঁধীভক্ত ছাড়া বাংলার প্রত্যেকটি মানুষ মনে করছেন এ অন্যায় শুধু সুভাষের ওপর নয়—তাদের সকলের ওপরে।

সুভাষ মাইকের কাছে এলেন। সারা সভা থমথম করছে। রাজাজি তাঁর কালো চশমাটা খদ্দরের ধুতিতে একবার মুছে নিলেন। কৃপালনির মুখটা অত্যন্ত কঠিন দেখাচ্ছে। কবীশ্বর, ব্যারিস্টার নরিম্যান আর অন্য বামপন্থী তরুণ নেতারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছেন। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সুভাষ বললেন, 'সমস্ত বাংলাকে আমি গর্বের সঙ্গে জানাতে চাই যে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই আমি আজ এই আসনে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের প্রবীণ নেতারা মনে করছেন আমি তাঁদের পথে একটা জগদ্দল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছি। কংগ্রেস মহাসমিতি যদি আজ নতুন একটা ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচন করতে চায় তাতে বাধ সাধার ইচ্ছে আমার নেই।'

সভায় কোলাহল। আওয়াজ উঠছে, 'সুভাষবাবু ইস্তফা দেবেন না,' 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দেমাতরম্।' গোলমাল থামানো যাচ্ছে না। এমন সময় জওহরলাল উঠে দাঁড়ালেন। গোলমাল থামল। জওহর কি বলেন, শোনার জন্য সভা উন্মুখ। সুভাষের কাঁধে হাত রেখে জওহর বললেন, 'আমারও অনুরোধ সুভাষ, আপনি ইস্তফা দেবেন না।' সুভাষ আবার মাইকের সামনে এলেন। দৃঢ়স্বরে বললেন, 'নির্বাচিত সভাপতির কাজ করার স্বাধীনতা লোপ করার জন্য পন্থ-প্রস্তাবের দড়ি দিয়ে তার হাত পা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। গাঁধীজির এমন একজন সভাপতি চাই যিনি কিছু শুনবেন না, কিছু বলবেন না, কিছু দেখবেন না—কালা হয়ে, বোবা হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকবেন। সামান্য আত্মসম্মানবোধটুকুও যার আছে সেরকম লোকের পক্ষে কি এটা মেনে নেওয়া সম্ভব? সত্য আর অহিংসার পূজারিদের দুর্গ অটুট থাকুক, আমার জন্য রইল জন-আন্দোলনের বন্ধুর পথ।'

সুভাষচন্দ্রের এই চূড়ান্ত ঘোষণায় দক্ষিণপন্থীরা উল্লসিত আর বামপন্থীরা মর্মাহত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সভা উত্তাল। 'শেম শেম', 'রাজেন্দ্রবাবু কেন? তোমাদের সীতারামাইয়ার কী হল?'

সভামণ্ডপে প্রবল উত্তেজনা। বাইরে হাজার লোকের ভিড়। তারা চিৎকার করছে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সভার কাজ চালানো অসম্ভব। মঞ্চ থেকে নেমে নেতারা বাইরে যেতে গেলে জনতা তাদের পথ আটকাল। নেহরু ভীষণ উত্তেজিত। জনতাও ছেড়ে দেবে না।

গোলমাল শুনে সুভাষ আর শরৎবাবু দৌড়ে এলেন সেখানে। প্রাণপণে জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন তাঁরা। কিন্তু উত্তেজনা বাড়ছে। কয়েকজন রগচটা যুবক নেহরু আর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ধাক্কা মারল। একজন আচার্য কৃপালনির জামা টেনে ধরল।

তখন সুভাষ গর্জে উঠলেন। 'আর এক পাও যদি এগোন তো ভাল হবে না। সংযত করুন নিজেদের।' স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে কোনওরকমে নেতাদের বার করে নিয়ে এলেন সুভাষ।

উডবার্ন পার্কে যখন ফিরলেন তখন জওহর রেগে আগুন হয়ে আছেন। তাঁর মুখের দিকে তাকান যাচ্ছে না। রাজনৈতিক উত্তেজনা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেও তুফান তুলছে।

সুভাষের ভাইঝি গীতা কফির ট্রে হাতে বৈঠকখানায় এল। জওহরকে দেখামাত্র তার চোখে

জল টলমল করে উঠল। তার হাত থরথর করে কাঁপছে দেখে শরৎ ট্রেটা নিলেন। বললেন, 'গীতা এটা কী করছিস? রাজনীতি ব্যক্তিগত জীবনে ঢুকে পড়বে কেন মা?' কথাটা শুনে জওহর আর সুভাষও একে অন্যের দিকে তাকালেন।

অনেকক্ষণ পর জওহর একটু শান্ত হলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে তাঁকে বাইরে আসতে হয়েছে সেটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না তিনি। অন্যদিকে সুভাষের ওপর যে অন্যায় হয়েছে সেটাও তাঁর মনে খোঁচা দিচ্ছে। দূরে থেকেও গাঁধীজি কংগ্রেসে তাঁর ক্ষমতা ভালভাবেই দেখিয়েছেন। রিং মাস্টারের চাবুকটা বড়ই বিষাক্ত।

সহজভাবে হাসার চেষ্টা করে সুভাষ বললেন, 'জওহরজি, যতরকম "ইজম" আছে, যেমন কমিউনিজম, সোস্যালিজম—তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান "ইজম" কোনটা বলুন তো?'

'তুমি-ই বলো।'

'ফেভারিটিজম। বুঝলেন, ফেভারিটিজম ইজ মোর পাওয়ারফুল দ্যান এনি আদার ইজম।'

অনেকক্ষণ জওহরলাল চুপ করে রইলেন। বাইরের গাছগুলোও যেন কান পেতে রয়েছে দুই বন্ধুর কথা শোনার জন্য। সুভাষ জওহরের হাতে হাত রাখলেন। বললেন, 'একটা কথা বলব দাদা। এটা প্রচারের কথা নয়। বাস্তব পরিস্থিতি। বিদেশের বন্ধুদের সঙ্গে যেটুকু কথা হয়েছে তাতে বুঝতে পারছি একটা মহাযুদ্ধ শিগগিরই শুরু হতে চলেছে।'

'জওহরজি আপনি-ই বরং নেতৃত্ব দিন—আমি খুশি হয়ে আপনার পেছনে থাকব। কিন্তু এরকম অমূল্য সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।'

জওহর শান্তভাবে বললেন, 'কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও গাঁধীজির সম্মতি তো চাই।'

'সবকিছু তাঁর মত অনুযায়ী হতে হবে এরকম কোনও কথা আছে। মনে করুন আমাদের ইয়ুথ লিগের দিনগুলো। কলকাতা কংগ্রেসের সেই আবেগ। আমরা যদি আবার নতুন উদ্দীপনা নিয়ে শুরু করি সারা দেশ আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াবে।'

'না সুভাষ। গাঁধীজির অমতে এক পা-ও এগোনো এখন আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সুভাষের গলায় এবার ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'এটাকে কীভাবে নেব আমি? সংগ্রামের ভয়—না বয়স বেড়ে যাওয়ায় তারুণ্যের অবসান?'

'তোমার যেমন ইচ্ছে তেমনই ভেবে নিতে পারো। কিন্তু এটা তোমাকে মানতেই হবে যে গাঁধীজিকে ছাড়া ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্ভব নয়। গাঁধীজি ইজ ইন্ডিয়া।'

'কোনও মহাত্মা কেন, স্বয়ং পরমাত্মাকেও দেশের চেয়ে বড় বলে মানি না আমি।'

'সুভাষ, আমার মন তোমার জন্য, কিন্তু প্রাণ গাঁধীজির পায়ে। গাঁধীজিকে তোমার মতো চ্যালেঞ্জ জানাবার সাহস আমার নেই সুভাষ।'

রাত বাড়ছে। দুজনের মতৈক্য হল না। হবার নয়। এক সিংহশাবক অন্য আর একটাকে বারবার তার সঙ্গে এককাট্টা হতে ডাকছে। কিন্তু রিং মাস্টারের সম্মোহনে সম্মোহিত হয়ে আছে সে। মহাযুদ্ধ যে ঘনিয়ে এসেছে রিং মাস্টারও জানেন সেটা। অবাধ্য সিংহশাবকটি বনের মুক্তির স্বাদ পেতে চাইছে এই সুযোগে। গাছপালার ভিড়ের মধ্যে পথ খুঁজে পেতে চাইছে।

সারারাত ঘুম হয়নি। মেজদা দরজায় টোকা দিলেন। সুভাষ তাড়াতাড়ি উঠে তৈরি হয়ে নিলেন। কাঁধের শাল ঠিকঠাক করার সময় জওহর এলেন সে ঘরে। বললেন, 'সুভাষ। তুমি ভাবছ আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। আমি তোমার সঙ্গেও থাকতে চাই আবার গাঁধীজিকে ত্যাগ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমাকে কী করতে বলেন আপনি?'

'আমি কী বলব? বাঘের সঙ্গে লড়তে চলেছ তুমি। তোমার কর্মপন্থা তোমাকেই ঠিক করে নিতে হবে।'

গাড়ির ডিকিতে মাল তোলা হল। সুভাষ আর জওহর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। জওহর গাড়িতে বসতে যাচ্ছেন এমন সময় গীতা একটা লাল গোলাপ হাতে দৌড়ে এল সেখানে। তার জানা ছিল লাল গোলাপ চাচাজির খুব প্রিয়। সুভাষ ফুলটা হাতে নিয়ে ডাঁটিটা ভেঙে ফেলে দিয়ে জওহরের কোটের বাটনহোলে ফুলটা পরিয়ে দিলেন। তখনই জওহরের নজর গেল যে সুভাষের আঙুলে গোলাপের কাঁটা ফুটে রক্ত বেরোচ্ছে। 'সুভাষ, রক্ত' বলেই পকেট থেকে রুমাল বার করে আঙুলটা ধরতে গেলেন। দু'পা পিছিয়ে সুভাষ বললেন, 'থাক, বিধাতাই হয়তো আপনার জন্য ফুল আর আমার জন্য কাঁটার ব্যবস্থা করেছেন।'

৩

ভোরবেলা। ময়দানের আশেপাশে সবে গাড়ি ঘোড়া চলতে শুরু করেছে। জাপানি কনসাল অপেক্ষা করছেন একটা জায়গায়। দেখলে মনে হবে প্রাতর্ভ্রমণ করছেন তিনি। একটা অন্য গাড়িতে সত্যরঞ্জন বক্সির সঙ্গে সুভাষ এসে পৌঁছলেন।

'আমাদের সহায় সাহেব কি টোকিয়োতে আপনাদের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন?' সুভাষ প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। তিনি আর রাসবিহারী বোস কিছু কথা বলেছেন আমাদের নেতাদের সঙ্গে।'

জাপানি কনসাল আর সুভাষের অনেকদিনের পরিচয়। একটু হৃদ্যতাও আছে দুজনের মধ্যে। সুভাষ বললেন, 'ভবিষ্যতে আপনাদের দেশের কাছ থেকে সাহায্যের আশা রাখি আমরা।'

'মুক্তিসংগ্রামে আপনাদের সহায়তা করতে জাপান সরকারও আগ্রহী।' কনসাল ভরসা দিলেন।

গাড়িতে সত্যরঞ্জন বললেন, 'কংগ্রেসের নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের লিস্টটা দেখেছেন?'

'বাংলা থেকে ড. বিধান রায় আর প্রফুল্ল ঘোষকে তো বেছে নিয়েছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ।'

'কিন্তু কেন? এঁরা বোসেদের দুই ভাইয়ের বিরোধী বলেই তো?'

'দিন বড় তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে সত্যরঞ্জন। নইলে এই সেদিন পর্যন্ত ছায়ার মতো যে সঙ্গে সঙ্গে থাকত সেই কিরণশঙ্কর আজ বিরোধী শিবিরে কেন?' কিরণশঙ্করের নামটা খুব মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন সুভাষ।

উডবার্ন পার্কে পৌঁছতেই মেজদা হাতে একটা খাম দিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠি। তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে পড়তে লাগলেন সুভাষ।

'অত্যন্ত উদ্বেগজনক প্রতিকূল পরিস্থিতির যেভাবে সম্মুখীন হয়েছ তুমি, তার জন্য সাধুবাদ জানাই তোমাকে। তোমার আজকের পরাভব ভবিষ্যতের বিচারে বিজয় বলেই গণ্য হবে এটা স্থির জেনে রেখো।' চিঠি তো নয়, এক অপরূপ আশ্বাসের বার্তা।

ফরোয়ার্ড ব্লক নামে একটা বামপন্থী জোটের প্রতিষ্ঠার কথা সদ্যই ঘোষণা করেছেন সুভাষ। তাঁর এই জোটে যোগ দিয়েছেন বহু প্রগতিশীল তরুণ নেতা। ফরোয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় অধিবেশন বসবে বোম্বাইতে—২৯ জুন। ব্যারিস্টার নরিম্যান আর সেনাপতি বাপট দারুণ পরিশ্রম করছেন সে জন্য। প্রত্যেকটি প্রদেশ থেকে যেভাবে বিপুল সংখ্যায় প্রতিনিধি আসছে,

তা দেখে ব্রিটিশ পুলিশ তো বটেই, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদেরও চোখ কপালে। রাত্রে নরিম্যানের বাড়িতে শীর্ষ নেতাদের বৈঠক বসেছে।

'আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি?' সহযোগীরা প্রশ্ন করলেন।

'ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে জোর করে যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে ফেলবে। যুদ্ধ তাদের, আর উপকরণ যোগাব আমরা; রক্ত দেব আমরা, সাফল্য পাবে তারা। এসব কিছু করেও কি পরাধীনতার থেকে মুক্তি পাব আমরা? না বন্ধু। তাই আমাদের জেগে উঠতে হবে।'

ফরোয়ার্ড ব্লকের সংগঠন ক্রমশ দানা বাঁধছে। সংগঠন গতি পাচ্ছে। উদ্দেশ্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হরিবিষ্ণু কামাথ একটা খবরের কাগজ নিয়ে এসে সুভাষের সামনে রাখলেন।

'বাবুজি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ফরমান জাহির করেছে যে এখন থেকে কেউ বা কোনও জোট প্রদেশ কমিটির বিনা অনুমতিতে কোনও আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ করতে পারবে না।' কামাথ বললেন।

'এর মানে হচ্ছে, আগামীকাল আমি কোথায় যাব তার জন্যও প্রদেশ কমিটির অনুমতি নিতে হবে।' সুভাষ বললেন।

'কিন্তু বাবুজি এতে তো কোথাও আপনার নাম নেওয়া হয়নি?'

'নাম না থাকলেও নিশানা যে আমি, সেটা না বোঝার মতো বুদ্ধু আমি নই কামাথ। এতদিন বিদেশিরা আমাদের আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করত আজ তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমাদের দেশের লোক। সর্বাঙ্গীণ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি, কামাথ।'

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সব সদস্যই এসে পৌঁছেছেন। শুধু গাঁধীজির প্রতীক্ষা। সেক্রেটারি আচার্য কৃপালনিকে খুব অস্থির দেখাচ্ছে। খবরের কাগজগুলোতে ফরোয়ার্ড ব্লকের খবর বেরিয়েছে। বোম্বাইয়ের বৈঠক দারুণ সফল। কংগ্রেসের অনুমতির তোয়াক্কা না করে সুভাষ বোম্বাইতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। একদিক থেকে দেখলে কংগ্রেসের ঐতিহ্য আর গাঁধীজির কর্তৃত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ।

'বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে এইভাবে নেচে বেড়ানো, কংগ্রেসকে এইভাবে ছোট করার আস্পর্ধা সুভাষ পায় কোথা থেকে?' আচার্য কৃপালনি হুংকার দিয়ে উঠলেন। 'আপনারা সবাই চুপ করে মজা দেখছেন। বাপুজিও একেবারে ভোলা মহেশ্বর। এই বাঙালি বীরপুঙ্গবটি কাছে এসে একটু মিষ্টি হাসলেই ব্যস, সব ভুলে যাবেন।'

'তা আমরা কীই বা করতে পারি?' জওহরলাল প্রশ্ন করলেন।

'একবার এটা তো স্পষ্ট হয়ে যাক যে এদেশে কে বড়? গাঁধীজি বড়, দেশ বড় না, ওই বাঙালিটি বড়?'

সর্দার পটেল একটু মৃদু হাসলেন। তাই দেখে আচার্য আরও গরম হলেন। 'হরিজন'-এর সর্বশেষ সংখ্যাটি ওখানেই পড়েছিল। ইদানীং কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার আর ক্ষমতার অপব্যবহার প্রচণ্ড বেড়ে গেছে বলে গাঁধীজি আক্ষেপ করেছেন তাঁর লেখায়। লেখার মূল লক্ষ্য সুভাষ।

একসময় গাঁধীজি দ্রুত পায়ে সভায় এসে পৌঁছলেন। প্রথমেই সুভাষের নাম না নিয়ে বাপুজি

বললেন, 'আজ হিংসাচারের প্রাদুর্ভাবে দেশের বাতাবরণ দূষিত। "সমান্তরাল সরকার", "চরমপত্র", বিক্ষোভ আর উগ্রবাদীদের হইচই শুনে শুনে আমি এখন ক্লান্ত।' হাতের প্যাড বাগিয়ে ধরে আচার্য কৃপালনি সাগ্রহে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাপু। প্রস্তাবে কি লিখব বলুন।'

'প্যাডটা আমাকে দাও'—গাঁধীজি বললেন।

আচার্য আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে দেখতে লাগলেন। প্যাডটা হাতে নিয়ে পা ভাঁজ করে বসলেন বাপুজি। কোলের ওপর প্যাডটি রেখে চশমার ফ্রেমের ওপর দিয়ে আচার্যের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে গাঁধীজি বললেন, 'আজকের প্রস্তাব আমি নিজেই লিখব।'

'আপনি?'

গাঁধীজি কী লিখবেন কেউ বুঝতে পারছেন না। আচার্য তাকিয়ে আছেন তাঁর খসখস করে লিখে চলা কলমটার দিকে। একসময়ে লেখা শেষ হল। এবার প্রসন্ন হাসি হাসলেন গাঁধীজি। তিনি প্যাডে লেখা প্রস্তাব আচার্যের হাতে দিলেন। আচার্য তাড়াতাড়ি পড়তে শুরু করলেন। 'অখিল ভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। শ্রীযুক্ত বসু আগামী তিন বছর পর্যন্ত কংগ্রেসের কোনও পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না।'

'বাঃ বাঃ', উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠলেন আচার্য জীবিত কৃপালনি। 'বাপু। মুসাবিদা করার ব্যাপারে আমার খুব গর্ব ছিল। গত পাঁচ বছরে কয়েক শো প্রস্তাবের মুসাবিদা করেছি আমি। কিন্তু আপনার এই একটা মুসাবিদা আমার সব গর্ব চূর্ণ করেছে। এমন প্রাঞ্জল ভাষা আমার দ্বারা সম্ভব হত না।'

'বন্ধুগণ, যে-কোনও মুহূর্তে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হবে এই মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে। শত্রুর দুঃসময়ই আমাদের সুসময়। স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য এটা আমাদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ।'

মাদ্রাজের মেরিনা বিচ বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা বিচগুলোর একটা। নীল সাগরের পারে এই সুদীর্ঘ বিচে এত বড় সভা এ পর্যন্ত আর কখনও হয়নি। সভায় হাজির হয়েছে দু' লাখের ওপর লোক। সুভাষের কণ্ঠস্বর তখন সপ্তমে। 'গাঁধীজির মতো সন্তমহারাজেরা প্রসন্ন মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদরূপী সাপকে দুধ খাওয়াতে থাকুন। কিন্তু আমি সাপকে সাপ বলেই গণ্য করব। একবার কেন বারবার আমাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করে দিন তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমি যতদিন এই সাম্রাজ্যবাদের দাঁত উপড়ে ফেলে আমাদের সোনার দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের বহিষ্কার না করতে পারব ততদিন কিছুতেই চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়।'

হাততালি আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি বোধহয় সাগরের ওপারে পৌঁছে যাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র একেবারে আত্মহারা। অনেকক্ষণ ধরেই এক পার্টি কর্মী তাঁর হাতে একটা কাগজ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। একসময়ে তাঁর দিকে নজর পড়ল সুভাষের। কাগজে লেখা অক্ষরগুলোর উপর নজর পড়তেই চমকে উঠলেন তিনি। তাঁর জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ মাইক মারফৎ জনতার কাছে পৌঁছচ্ছে। সবাই চোখ বিস্ফারিত করে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রাস করেছে তাকে। ব্রিটেন যুদ্ধঘোষণা করেছে জার্মানির বিরুদ্ধে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো

এই বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও ভারতকে জড়িয়ে দিয়েছেন যুদ্ধের সঙ্গে।

'বন্ধুগণ। এই দেখুন। একটু আগেই আমি আপনাদের যে কথা বলছিলাম ঠিক তাই ঘটেছে। ব্রিটিশ আমাদের বিনা কারণে মহাযুদ্ধের দাবানলে ছুড়ে দিয়েছে।'

মাদ্রাজে আরও কয়েকটা সভা ছিল। হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল। '৮ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধাতে কংগ্রেসের জরুরি বৈঠক। সুভাষ তোমাকে আসতেই হবে। বাপু।' আগেকার কর্মসূচির পরিবর্তন করে নাগপুর হয়ে ওয়ার্ধা পৌঁছলেন সুভাষ। মহাযুদ্ধের দামামা নির্ঘোষে সমস্ত বিশ্বপরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেন বাপ-ঠাকুরদাদার সম্পত্তি এইভাবে ভারতের জনমতের পরোয়া না করে লর্ড লিনলিথগো আটত্রিশ কোটি মানুষকে যুদ্ধের আগুনে ঠেলে দিয়েছেন। এরকম একটা সময়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটা জানতে সুভাষও উদ্‌গ্রীব।

গাঁধীজির মুখে সেই হালকা হাসি আর এক রহস্যময় ভাব।

'বাপু। আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন?' শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন সুভাষ।

'কিছু আলোচনা করার জন্য।'

'মহাত্মাজি আপনি কি ভুলে গেছেন যে আপনিই কংগ্রেস থেকে আমাকে বের করে দিয়েছেন। তারপরে তো এক মাসও কাটেনি এখনও। এর মধ্যেই আবার আমার কথা মনে পড়ল আপনার! যাক গে। একজন মহাত্মা কাটা ঘায়ে কী করে নুনের ছিটে দেন সেটা দেখার সৌভাগ্য তো হল। সেটা পাওয়াই বা কম কীসে?'

গাঁধীজি হেসে বললেন, 'সুভাষ। সত্যি কথা যদি বলি বেশ নরম শাস্তিই দিয়েছি তোমাকে।'

'দু'বার কংগ্রেসের সভাপতি থাকা, বর্তমানে বাংলার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের কংগ্রেস অধ্যক্ষকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, আগামী তিন বছর কোনও পদাভিষিক্ত হওয়ার পক্ষে অযোগ্য ঘোষণা করার মতো শাস্তিটা নরম বলে মনে হচ্ছে আপনার? বাপুজি, রাস্তার মধ্যে আমার কাপড় খুলে দিলে যদি আপনার মহান শিষ্যরা খুশি হন আর সে কাজটা যদি আপনার সত্য আর অহিংসানীতিসম্মত হয় সেই বাকি কাজটাও করে ফেলুন একদিন।'

'সুভাষ। তুমি বড় নিষ্ঠুর।' গাঁধীজি বললেন।

'ভাল। তা আমার নিষ্ঠুরতার কী দেখলেন আপনি?'

'সুভাষ। তোমাকে কংগ্রেস থেকে বার করে দেওয়াটা আমার পক্ষে সহজ কাজই ছিল।' গাঁধীজির আওয়াজ একটু যেন কেঁপে যায়। 'কিন্তু আমার মন থেকে তোমাকে দূর করে দিতে আজও পারিনি আমি।'

বলতে বলতেই গাঁধীজির চোখে চুপিসারে দেখা দিল স্ফটিক বিন্দুর মতো দুটি অশ্রুবিন্দু।

সুভাষের কাঁধে হাত রেখে গাঁধীজি যখন সভায় উপস্থিত হলেন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। 'ব্রিটিশের দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে স্বরাজের দাবি তোলা হবে না' এই প্রস্তাবের পক্ষে গাঁধীজির 'মানবতাবাদী' নীতির পোঁ ধরার জন্য যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। সভায় সুভাষের শরীরটাই শুধু রয়েছে, মনটা নেই। ব্রিটিশকে প্যাঁচে ফেলার এমন সুযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সে জন্য বুক ফেটে যাচ্ছে তাঁর। গাঁধীজি তাঁর মত জিজ্ঞেস করলেন। সুভাষ আবার তাঁর 'চরমপত্র' দেওয়ার আর 'সর্বাত্মক আন্দোলন'-এর কথা তুলে ধরলেন। আজ পর্যন্ত যা কিছু তিনি মনের মধ্যে জমিয়ে রেখেছেন তা সম্পূর্ণ উজাড় করে দিলেন। দক্ষিণপন্থীরা এসব কথা কীভাবে নেবেন তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা থাকা সত্ত্বেও বললেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। নিম গাছের মাথায় সোনালি আলো। চড়ুইয়ের কিচিমিচির। কস্তুরবা সুভাষকে বললেন, 'তোমাকে দেখলে বাপু যেন কেমন হয়ে যান!'

'তাঁকে দেখলে আমিও কেমন যেন হয়ে যাই।' অকপট স্বীকৃতি দিতে গিয়ে কথা যেন আটকে যায় সুভাষের। বিষণ্ণ হয়ে তিনি বললেন, 'কিন্তু বা, আমাদের এই আবেগ, এই আকর্ষণ যে কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে সেটা ঠিক বুঝি না আমি।'

'এভাবে কেন বলছ?'

'কারণ বাপুজি তাঁর নীতি থেকে আর আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও সরি না।'

গাঁধীজির প্রার্থনাসভায় সুভাষও উপস্থিত ছিলেন। রাত্রে তিনি পাশের বাগানটিতে হরিবিষ্ণু কামাথের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একসময় হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ে সুভাষ বললেন, 'এ আশ্রমে আমার ভাল লাগছে না হরি। আমার লড়াইয়ের ক্ষেত্র আলাদা। অন্য কোথা—অন্য কোনওখানে।'

চাঁদ উঠেছে। কাকজ্যোৎস্নায় নীল আকাশে একটা বলাকা উড়ে গেল ডানায় শব্দ তুলে।

৫

যুদ্ধ! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ!

এ যুদ্ধ কত লোকের উচ্চাকাঙ্ক্ষাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনকারী আর তাদের দালালদের তো কপাল ফিরে গেছে।

ভাইসরয় লিনলিথগোর চোখে ঘুম নেই। ব্রিটেনের জন্য সৈন্য আর রসদ সংগ্রহে অহোরাত্র চেষ্টা করছেন তিনি। অনেক ভারতীয় যুবকই পেটের তাগিদে সৈন্যদলে ভরতি হয়ে, জাহাজ ভরতি করে ইউরোপে, আফ্রিকায় রক্ত ঝরাতে চলে যাচ্ছে।

বাংলার গভর্নর স্যার হারবার্টেরও ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। তাঁর সামনে বসে আছেন বাংলার আই জি, চিফ সেক্রেটারি আর হোম সেক্রেটারি। রাত বাড়ছে কিন্তু আলোচনা শেষ হচ্ছে না। গভর্নরের টেবিলে ইংল্যান্ড থেকে এসে পৌঁছনো ভারত সচিবের চিঠি। তার ওপরে লাল কালিতে লেখা ভাইসরয়ের মন্তব্য।

হারবার্ট পড়তে লাগলেন। 'যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। এই সময় আমাদের সাম্রাজ্যের শত্রু সুভাষ বোস সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক থেকে তার চলাফেরার ওপরে কড়া নজর রাখুন। সে চুপ করে থাকার পাত্র নয়। যদি চুপচাপ থাকে তা হলে বুঝতে হবে চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছে।'

চিঠিটা পড়া শেষ করে হারবার্ট হোম সেক্রেটারির দিকে তাকালে, তিনি বললেন, 'ভারত রক্ষা আইনে যাতে সুভাষকে আটক করা যায় তার জন্য আমরা নথিপত্র তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে কান দিতে রাজি হননি। তাঁর মতে বাংলার পূর্ব এবং পশ্চিম দুই অংশেই বহু মুসলমান সুভাষকে দারুণ মানে। সুভাষকে আটক করলে মুসলমান ছাত্ররাও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে।'

'ঠিক আছে। আপাতত যেমন চলছে চলুক। সুভাষ বোস কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, কাদের চিঠি লিখছে, কাদের সঙ্গে দেখা করছে এসব খুঁটিনাটির ওপর কড়া নজর রাখুন।'

মহাযুদ্ধ! বিশ্বযুদ্ধ!

সুভাষ অস্থির। প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাচ্ছে আর তাঁর অস্থিরতা বাড়ছে। উডবার্ন পার্ক আর এলগিন রোডের বাড়ির ওপর দিনরাত গোয়েন্দাদের চোখ রয়েছে।

শরৎবাবু তাঁর কাছারি ঘরে বসে কাজ করছিলেন। রাত তখন ন'টা। উকিলের বেশে দুজন পঞ্জাবি ভদ্রলোক এলেন। তাঁরা কাছারিঘর থেকে ভেতরের কামরায় গেলেন। গোয়েন্দারা জানে এটা ছাত্রদের থাকার ঘর। ঘরের ভেতরে সুভাষ একলা আগন্তুকদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আগন্তুকদের একজন হচ্ছেন নিরঞ্জন তালিব। কলকাতার শিখ সমাজে জনপ্রিয় পঞ্জাবি মাসিক পত্রিকা 'দেশদর্পণ'-এর সম্পাদক। সুভাষের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি সঙ্গী তরুণটির পরিচয় দিলেন। 'ইনি অচরসিং চিনা। পঞ্জাবের কীর্তি কিষান পার্টির একজন উদ্যমী নেতা। প্রায়ই আফগান সীমান্তে যাতায়াত করতে হয় এঁকে।'

'খুব ভাল কথা। তালিব সাহেব, বর্তমান পরিস্থিতি দেখে তো জার্মানিই জিতবে বলে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া জার্মানি আর রাশিয়ার মৈত্রীও রয়েছে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চটপট আমাদের কিছু করা দরকার।' সুভাষচন্দ্র বললেন।

'আপনি শুধু হুকুম করুন।' তালিবসাহেব বললেন।

সুভাষ প্রস্তুত হয়েই বসেছিলেন। চট করে ভারত, আফগানিস্তান আর রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের একটা ম্যাপ বার করে তাতে একটা নীল রেখার দিকে আগন্তুকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন, 'এই যে অকসাস নদী দেখছেন এটা পেরিয়ে আমি রাশিয়া যেতে চাই। লেনিনের এই বিপ্লবী দেশের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পাব বলেই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।'

'অকসাস পার করে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের', অচরসিং চিনা বললেন। 'ওই এলাকাতে আমাদের অনেক কমরেড আছেন। আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারব।'

'তা হলে কাজে লেগে পড়ুন।' সুভাষ বললেন।

'কয়েকদিনের মধ্যেই ভগৎরাম তলোয়ার নামে আমাদের এক বুদ্ধিমান তরুণ কর্মকর্তা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'উকিল' দুজন চলে গেলেন। তাঁদের বিদায় দেবার জন্য এবার সত্যিকারের উকিল, ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু গেট পর্যন্ত এলেন।

মহাযুদ্ধ চলছে।

মহাযুদ্ধের দানব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জন্যও অনেক সমস্যার সৃষ্টি করছে। এই সময় ব্রিটিশকে কোনও অসুবিধেতে না ফেলার সিদ্ধান্ত অবশ্য নেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'ব্রিটেনের এই যুদ্ধে বিনা কারণে ভারতবর্ষকে কেন জড়ানো হয়েছে তার কারণ দেখানো হোক' বলে ওয়ার্কিং কমিটি প্রশাসনের কাছে দাবি রেখেছেন। তবে এদের কোনও কথায় ভাইসরয় লিনলিথগো থেকে শুরু করে কেউই কান দিচ্ছেন না।

'সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা সত্ত্বেও তিনি এখনও বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ ছাড়ছেন না কেন?' আচার্য কৃপালনি গাঁধীজিকে প্রশ্ন করলেন।

'তার কারণ বাংলা প্রদেশ সুভাষের সমর্থনে অনড়। দু-দুবার, একবার জুন মাসে আর একবার আগস্ট মাসে, প্রদেশ কংগ্রেস তাঁর ওপরে আস্থা ঘোষণা করে প্রস্তাব নিয়েছে।' বাপুজি বললেন।

'অর্থাৎ আমাদের তোয়াক্কা না করেই সুভাষ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রয়েই গেল। এতে অবশ্য আমাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু সম্মানহানি হচ্ছে আপনার আর কংগ্রেস সংগঠনের।' রাজাজি আগুনে তেল ছিটোলেন।

ঠিক হল যেন তেন প্রকারেণ সুভাষকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরাতে হবে।

সারা বাংলা তাঁর পেছনে আছে তো কী হয়েছে? সংগঠনের শৃঙ্খলা রাখার দায়িত্ব তো ওয়ার্কিং কমিটিরই! কংগ্রেসের ইতিহাসে যা কখনও হয়নি তাই হল। সুভাষকে সরাবার জন্য সম্পূর্ণ প্রদেশ কংগ্রেসকেই বরখাস্ত করা হল। নতুন অ্যাড হক কমিটি মনোনীত হল। বসুদের দুই ভাইয়ের বিরোধী সমস্ত নেতাদের জড়ো করা হল সে কমিটিতে। বাংলায় একসঙ্গে দুটি কংগ্রেস কমিটি কাজ করতে লাগল।

মহাযুদ্ধ নিজের গতিতে এগোচ্ছে। স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সুভাষের মন অশান্ত। বন্ধু লালা শঙ্করলাল জাপানি ভিসা পেয়ে চুপিচুপি জাপান চলে গেলেন। চারদিকে চেষ্টা চলছে। যেখান থেকেই সাহায্য আসুক, স্বাধীনতার জন্য সব সাহায্যই গ্রহণযোগ্য। বাইরের সাহায্য নিয়ে ভেতর থেকে আন্দোলন গড়ে তুলতে সুভাষ স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন।

ফরোয়ার্ড ব্লককে সংগঠিত করার কাজ চলছে। লখনউতে এর জন্য একটা বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। কিন্তু শুরুতে উৎসাহ দেখালেও অনেক সমাজবাদী নেতাই এখন পিছিয়ে গেছেন। কমিউনিস্টরাও তথৈবচ।

'বৈঠকে আসার জন্য যাঁরা প্রস্তুত হচ্ছিলেন এরকম কয়েকশো ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীকে গত দুদিনে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের আইনের নানান ধারায় জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। গাঁধীজিও বৈঠক বয়কট করার জন্য ফতোয়া জারি করেছেন।' প্রফেসর রঙ্গা জানালেন।

বৈঠক সফল হল না। বিষণ্ণ মনে সুভাষ লখনউ স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন। কর্মীদের কাছ থেকে একটু দূরে। কাছে রয়েছেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। হঠাৎ সুভাষ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'নীহারেন্দু, গা ঢাকা দেবে?'

'সুভাষবাবু। আমার চেয়ে আপনারই গা ঢাকা দেওয়াটা বেশি দরকার।' নীহারেন্দু বললেন।

'আমি গা ঢাকা দেব?'

'হ্যাঁ। কেন নয়? চিনে ড. সান ইয়াৎ সেন আত্মগোপন করেছেন; ইতালিতে মাৎসিনি দেশত্যাগ করেছেন দেশেরই প্রয়োজনে।

ইশারায় নীহারেন্দুকে চুপ করতে বলে সুভাষ গলা নামিয়ে বললেন, 'নীহারেন্দু দয়া করে একথা আর কোথাও উচ্চারণ কোরো না।'

মহাযুদ্ধ এগিয়ে চলেছে।

চিনে যাবার জন্য সুভাষ ভিসার দরখাস্ত করলেন। হারবার্টের চোখ আনন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠল। যাক শত্রু পরে পরে। অনুমোদনের ছাপ শুধু নয়, বিশেষরকম সুপারিশ করে কাগজপত্র দিল্লি পাঠান হল।

পরের দিনই ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর ফোন এল।

'বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমার কিছুই জানা নেই মনে হচ্ছে।

'স্যার, স্যার...' হারবার্ট তোতলাতে থাকেন।

'সুভাষকে চিনে পাঠাবার সুপারিশ করেছ কোন ভিত্তিতে?'

'স্যার। অতি সম্প্রতি পণ্ডিত নেহরুকে এ ধরনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি ফিরেও এসেছেন।'

'নেহরু চাইলে আবার তাকে ভিসা দেওয়া হবে। কিন্তু বোসকে নয়। রাশিয়া চিনের লাগোয়া। বোস যদি একবার সেখানে যেতে পারে তবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে

জুটে আমাদের জান কয়লা করে দেবে।' ভাইসরয় রাগের চোটে ভাষার শালীনতা হারালেন।

মহাযুদ্ধ।

এবার গাঁধীবাদীরাও দারুণ অস্বস্তিতে রয়েছেন। যুদ্ধের কারণ দর্শাতে ব্রিটিশ সরকার রাজি নয়। প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেছে।

মার্চ, ১৯৪০। বিহারের রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। একই সময়ে অধিবেশনের স্থল থেকে অল্প দূরেই ফরোয়ার্ড ব্লক 'আপস বিরোধী সম্মেলন'-এর বৈঠক আয়োজন করল। সেখানে কংগ্রেসের মধ্যপন্থার তীব্র সমালোচনা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করার সংকল্প ঘোষণা করা হল। ব্রিটিশের প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের বিরোধিতা করা হল। ব্রিটিশ সরকারও চুপ করে বসে নেই। হরিবিষ্ণু কামাথ, শার্দূল সিং কবীশ্বর, অধ্যাপক রঙ্গা সহ ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির ন'জন সদস্যকেই গ্রেফতার করা হল। সুভাষ বোসকে গ্রেফতার করার জন্য ওপর থেকে চাপ আসছে।

সুভাষ সুযোগ খুঁজছেন বাইরে চলে যাওয়ার। গোয়েন্দাদের কড়া নজর তাঁর ওপরে। তারই মধ্যে ভাইপো অমিয়র মাধ্যমে রাশিয়াতে গোপনে একটা চিঠি পাঠালেন তিনি। কমরেড রণদিভেকে অনুরোধ করলেন দরকার হলে মস্কোতে গিয়েও রাশিয়ান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য একটিই উপায়—সামরিক পদক্ষেপ। অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

একদিন গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী অধিকর্তা জে. এইচ. পুকতো লাটসাহেবের কাছে এসে খবর দিলেন।

'স্যার, লোকটা আজ কর্পোরেশনের মেয়রের কেবিনে স্কুলের বাচ্চার মতো ধেই ধেই করে নেচেছে।'

'লোকটা মানে।'

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক নম্বর দুশমন সুভাষ বোস।'

'হঠাৎ নাচানাচির কারণ?'

'রেডিয়োতে প্যারিসে জার্মন ফৌজের প্রবেশের খবর পাওয়ামাত্র ঘরের মধ্যেই লাফাতে শুরু করে দিল। খুব নাচানাচি করল।'

লাটভবনে বৈঠক আগে থেকেই চলছিল। সবাই হারবার্ট সাহেবের দিকে তাকালেন। সাধারণত হারবার্টের চোখের দৃষ্টি শান্তই। কিন্তু আজ তাঁর চোখ লাল। অন্যদের মতো তিনিও আজ নিশ্চিত যে লোকটা শুধু নিজে নাচবে না, তাদেরও নাচিয়ে ছাড়বে।

'বা, একটা কথা আমি নিজেই বুঝতে পারি না যে, জিন্না থেকে শুরু করে অনেকের সঙ্গেই একবার ছাড়াছাড়ি হবার পর আমি আর তাদের দিকে ফিরেও তাকাইনি। কিন্তু তোমার আদরের সুভাষের ব্যাপারটাই খালি আলাদা। কী যে হয় কিছুতেই তার টান আমি কাটিয়ে উঠতে পারি না!'

কস্তুরবা দেখলেন গাঁধীজি বেশ 'মুডে' আছেন। সাহস করে বলে ফেললেন, 'ত্রিপুরী

কংগ্রেঝেসর সময় যখন ওকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি চলছিল তখন যদি জওহরের কাছ থেকে আসা ফোনটা আপনি ধরতেন কত ভাল হত।'

'ত্রিপুরী! ত্রিপুরী আর রাজকোট দুটোই বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছিল বা। মরণের মুখে দাঁড়িয়ে সুভাষ জেদে অটল আর অন্যদিকে আমি তখন অহংকারে অন্ধ। ত্রিপুরীর তিক্ত স্মৃতি মনে হলে আজ আমার বুক ফেটে যায় বা। গোবিন্দবল্লভ পন্থের সেই "প্রস্তাব" কি আদৌ কোনও প্রস্তাব ছিল? কিন্তু সুভাষ আমাকে খাটো করছে—এই চিন্তায় আমি অন্ধ। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নিজের ত্যাগময় ব্রতী জীবনে কখনও কারওর ব্যাপারে কথা বলেননি। কিন্তু তিনিও বারবার আমাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন, "সুভাষের ওপর অবিচার করবেন না।"

'আপনি গুরুদেবকে কী উত্তর দিলেন।'

'আমি বলেছিলাম, সুভাষ হচ্ছে আমার পরিবারের বয়ে যাওয়া ছেলে। ওকে একটু শাসন করা দরকার হয়ে পড়েছে।'

'হঠাৎ আজ সুভাষের কথা আপনার এত বেশি কেন মনে পড়ল?'

'আজ রাত্রে সেবাগ্রামে আসছে সুভাষ। আমি তাকে রাত আটটায় আসতে বলেছি। মহাদেব থাকবে। তোমরা দুজনে মিলে তার কী লাগবে টাগবে একটু দেখো। অন্যবারের মতোই তার যত্ন নিয়ো।'

গাঁধীজি বেরিয়ে গেলে কস্তুরবা আর মহাদেব দেশাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সুভাষকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার মনোভাব আর এখনকার কথার অসামঞ্জস্যেই হাসি পেল তাঁদের।

দুপুর চারটের সময় এক ধূলিধূসর মোটরগাড়ি এসে থামল আশ্রমে। গাড়ি থেকে সাদা খদ্দরের পোশাকে সুভাষ আর নাথালাল পারেখ নেমে এলেন। কস্তুরবাকে দেখেই সুভাষের মুখ হাসিতে ভরে গেল। এসেই বাপুজির শরীর সম্বন্ধে খবর নিলেন তিনি। কস্তুরবা হেসে বললেন, 'তোমরা দুজনেই আড়ালে পরস্পরের সম্বন্ধে এত ভাল ভাল কথা বলো আর যখন মুখোমুখি হও বাঘ আর সিংহের গর্জন শুরু হয়ে যায়। তোমাদের মতো লোকেরা যদি নিজেদের রাগ দুঃখ একটু সামলে চলতে তো আমাদের মতো নিরীহ বেচারিরা একটু স্বস্তিতে থাকত।'

কস্তুরবার কৌতুকে খুব মজা পেলেন সুভাষ। সন্ধ্যা পর্যন্ত কস্তুরবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতে লাগলেন তিনি। আর একটু রাত হলে গাঁধীজি ফিরে এলেন। এসেই সুভাষকে নিজের কুঠিয়াতে ডেকে পাঠালেন তিনি। কিন্তু তাঁকে দেখেই চমক লাগল তাঁর। সুভাষের মুখে স্বাভাবিক উজ্জ্বল ভাবটা নেই। কী যেন একটা আলোড়ন চলছে তাঁর মনে।

'বাপুজি। বিশ বছর আগে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য যখন মণিভবনে গিয়েছিলাম, মহাদেবভাই আমাকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "সাবধানে যেয়ো। সিঁড়িটা বেঁকা আর পিছল। অবশ্য এমনিতে মজবুত।"

সুভাষের কথায় গাঁধীজি হেসে ওঠেন। সুভাষ কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেলেন। আর্তস্বরে বললেন, 'বাপুজি, স্বাধীনতার স্বপ্নে আমি এদিক-ওদিক অনেক ঘুরেছি। কিন্তু এখন বুঝেছি এই সিঁড়িটা সবচেয়ে মজবুত। এবার থেকে আপনার কথা অনুযায়ী চলব আমি।'

সুভাষের কথায় নাথালাল আর মহাদেবভাই চমকে উঠে পরস্পরের দিকে তাকালেন। সুভাষের কথায় আত্মহারা হয়ে যাওয়ার মতো কাঁচা লোক গাঁধীজি নন।

'স্পষ্ট করে বলি সুভাষ। আমাকে গুরু বানালে তুমি হয়তো খুশি হবে তবে তোমার গুরু হওয়া যে কত কঠিন সেটা ভালই জানা আছে আমার।'

'কিন্তু বাপু, এত অবিশ্বাস কেন?' সুভাষের গলায় অভিমানের সুর। 'আমি কী করেছি?'

'এটা সত্যি যে প্রত্যক্ষভাবে কোনও হিংসাত্মক ব্যাপারে তুমি নিজেকে জড়াওনি। কিন্তু তুমি যে কোন স্তর পর্যন্ত যেতে পারো সেটা ভালই জানা আছে আমার। হিটলারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করার কী দরকার ছিল?'

'সেটা তো ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা সদিচ্ছা-বিনিময় সাক্ষাৎকার। এটা তো আগেই আপনাকে বলেছি আমি।'

'কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতির এমন সব লোকেদের সঙ্গে সদিচ্ছা বিনিময়ের দরকারটা কী? বল্লভভাই, রাজেন্দ্রবাবু, কৃপালনির মতো সহযোগীদের পেয়েছি আমি। ব্যক্তিগত জীবনে এইসব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছিলেন। সব ছেড়ে দিয়ে আমার মতো একটা ফকিরের সঙ্গে বিশ-পঁচিশ বছর ধরে রয়েছেন এঁরা। কিন্তু আমার এইসব শিষ্যদের মান তুমি রাখনি।'

'বাপুজি। মান-অপমানের কথা পরে দেখা যাবে। এখন সবার আগে দরকার যে সুযোগ এসেছে তার সদ্ব্যবহার। ব্রিটিশ এখন যুদ্ধের ফাঁদে পড়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এর চেয়ে ভাল সময় আর হয় না। বাপুজি আপনি শুধু লড়াইয়ের ডাক দিন। এই সুভাষ প্রথম সত্যাগ্রহী হয়ে এগিয়ে যাবে।'

সুভাষের লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন গাঁধীজি। কোনও আশ্বাস, কোনও সান্ত্বনার বাণী বেরোল না তাঁর মুখ দিয়ে। সুভাষের আবেগ যে তাঁর মনকে একটুখানিও স্পর্শ করেছে, মুখে অন্তত তার কোনও আভাস নেই। শুধু বললেন, 'সুভাষ, রাত অনেক হয়েছে। এখন বিশ্রাম করো গে যাও। কাল আলোচনা করা যাবে।'

সুভাষকে পাঠিয়ে দিয়ে গাঁধীজিও বিশ্রামের জন্য উঠলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝছিলেন যে আজ তাঁরও ঘুম আসবে না। গলায় মাফলার জড়িয়ে, আসনপিঁড়ি হয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে লেখালেখি করলেন তিনি। কিন্তু কিছুতেই যেন মন লাগছে না। কস্তুরবা রোজকার মতো গাঁধীজির পায়ের তলায় তেল মাখিয়ে দেবার জন্য এলেন। কিন্তু একটু পরেই গাঁধীজি আবার উঠে হাঁটু মুড়ে বসলেন। বাপুর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে কস্তুরবা ভয় পেলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাঁধীজি বললেন, 'সুভাষকে আজ ভাল করে দেখেছ বা? কিছু মনে হল তোমার?'

'না তো।'

'বাপুজির মুখে এমন একটা উদ্বেগের ছাপ যে কস্তুরবা ভয় পেয়ে গেলেন।' গাঁধীজি বললেন, 'এখন শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, সুভাষকে আর দেশে ধরে রাখা যাবে না।'

পরদিন দুপুরে আবার আলোচনা শুরু হল। শুরুতেই সুভাষ বললেন, 'বাপুজি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা ভাবলেই হিমালয়ের পর্বতশ্রেণির কথা মনে হয় আমার। আমাদের এই আন্দোলনে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পর্বতমালার কী বিরাট বিরাট শিখর! গাঁধী, নেহরু, প্রসাদ, আজাদ, পটেল, নাইডু—কত আর নাম করব? আকাশে কত তারা একসঙ্গে। ঠিক সেইরকম ভারতের আকাশে একসঙ্গে এত জ্যোতিষ্ক। জগতের ইতিহাসে এর তুলনা নেই। চাঁদকে ঘিরে হাজার তারার আরতি যেন। আজ পর্যন্ত আপনার নেতৃত্বের যে বিরাট অবদান সেটা অমূল্য, তবু—'

'তবু!' গাঁধীজি শ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন।

'এখন প্রয়োজন একটা চূড়ান্ত আঘাত। বাপুজি, মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ এখন ব্যস্ত—আপনি শুধু একটা হাঁক দিন লড়াইয়ের জন্য।'

'বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব নয়।' মাথা নেড়ে বললেন গাঁধীজি।

'বাপুজি এমন সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না।'

'সোনার সুযোগ আসবে যাবে। কিন্তু তোমার মতো সোনার চেয়েও অনেক দামি রত্নকে বোঝানোটা আমার কাছে বেশি জরুরি। সুভাষ, চিরকালই তোমাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। তোমার সাহস, তোমার ত্যাগ, নিষ্ঠা সবকিছু খুব ভাল করে লক্ষ করেছি আমি। তুমি যেমন অসম্ভবরকম আবেগপ্রবণ তেমনি কুশল, তেমনি তেজি। আমি মনপ্রাণ দিয়ে চাই তোমার এইসব গুণগুলো কাজে লাগাতে। তাড়াহুড়ো কোরো না। ধৈর্য ধরো।'

'বাপুজি আপনি একবার শুধু লড়াইয়ের ডাক দিয়েই দেখুন না।'

'বললাম তো, আন্দোলনের সময় এখনও আসেনি।' গাঁধীজি অনড়।

গাঁধীজির স্পষ্ট অসম্মতিতে সুভাষের চোখে জল আসে। 'আপনি আমার কথা মানলেন না সেটা আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারছি না। পরাধীনতার শৃঙ্খল আর সহ্য করতে পারছি না আমি। যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার সময়, তখন জেলে বসে সময় নষ্ট করা আমি পাপ মনে করি। এইরকম নজরবন্দি অবস্থায় দেশে থেকে না পারি, দরকার হলে বিদেশ থেকে লড়াই করব আমি।'

'সুভাষ তুমি, তোমার পরিবারের লোকেরা, দেশের যে নিরলস সেবা করেছ, যত কষ্ট সহ্য করেছ তাকে অস্বীকার করার মতো কৃতঘ্ন আমি নই। আমি জানি স্বাধীনতার জন্য এত অধীরতা, দেশের জন্য এত ভালবাসা আর কারও মধ্যে নেই।'

'বাপু, আমার মধ্যে যদি এত গুণ দেখে থাকেন আপনি তবে দিন না একটা সুযোগ। আপনার একটা ডাকের অপেক্ষায় সারা দেশ উন্মুখ।'

'দেশ হয়তো তৈরি। কিন্তু আমি তৈরি নই।' গাঁধীজি আবার স্পষ্ট করে দিলেন।

সুভাষ উঠলেন। কান গরম হয়ে গেছে তাঁর, নাকের ডগা লাল। প্রণাম করার জন্য ঝুঁকলেন তিনি, কিন্তু পা সরিয়ে নিলেন গাঁধীজি।

'গাঁধীজি, আশীর্বাদটুকুও দেবেন না আপনি?'

'আমার আশীর্বাদে তোমার কী দরকার? তুমি নিজেই একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতা। আর যে ব্যাপার আমার পছন্দ নয়, তার জন্য আশীর্বাদ আমি দেব কী করে?'

'বাপুজি, আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি, একদিন আসবে যেদিন ব্রিটিশের শুভবুদ্ধির ওপরে আপনার এই অটল বিশ্বাস ভেঙে যাবে। অহিংসার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থেকেও আপনাকে সংগ্রামের আদেশ দিতে হবে।'

'এই যুদ্ধের সময়?'

'হয়তো! কে বলতে পারে?'

গাঁধীজির আগের একটা চিঠির একটা লাইন আজ সুভাষের মনে পড়ল। 'উই মাস্ট সেইল ইন ডিফারেন্ট বোটস।' আর কিছু বলা বা করার নেই। সন্ধ্যায় মালপত্র ওঠানো হল গাড়িতে। বিষণ্ণ সুভাষ নাথালালকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন। তাঁদের পেছনে গাঁধীজি আর কস্তুরবা অনেকটা দূর পর্যন্ত এলেন। গাড়িটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। বা-কে খুব দুঃখী দেখাচ্ছে। দূরে মাঠের ওপারে সূর্যাস্ত হচ্ছে। গাছের পাতায় আলো, নীচেটা ছায়া ছায়া। গাছের ডালে কা কা করছে কতকগুলো কাক।

গাঁধীজি আর কস্তুরবা গাড়ির কাছে এলেন। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ল গাঁধীজির। গাড়ির গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সুভাষের কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, 'সুভাষ, তোমার চাইতে

আঠাশটা বছর বেশি দেখেছি আমি। বলতে গেলে আমি তোমার বাবার বয়সি। একটা কথা বলি। আমার এই কেশশূন্য মাথা, মুখের এই বলিরেখা, শুকনো হয়ে আসা চামড়া এগুলো কিন্তু এমনি এমনি হয়নি। এর জন্য অনেক বর্ষায় ভিজতে হয়েছে, অনেক শীত সহ্য করতে হয়েছে। বার্ধক্য মানুষের অনেক কিছুই হরণ করে সুভাষ, কিন্তু ভরে দেয় অভিজ্ঞতার ঝুলি।' বলতে বলতে গাঁধীজির স্বরে আবেগের ঢেউ ওঠে। কঠোর রাজনীতিকের আড়াল থেকে যেন বেরিয়ে আসে একটা আবেগপ্রবণ মন। কীরকম একটা আর্তস্বর তাঁর কথায়। 'সুভাষ, আমার কথা শোনো। আমার বার্ধক্যের দিব্যি দিয়ে মিনতি করছি তোমাকে, দেশ ছেড়ে যাবার চিন্তা ছাড়ো তুমি।'

অস্তরবির রশ্মি আভায় চিকচিক করছে সুভাষের গালে নেমে আসা অশ্রুধারা। প্রাণপণে নিজেকে সামলে সুভাষ বললেন, 'বাপুজি, বার্ধক্যের দানের মতো, তারুণ্যের আহ্বানও বড়ই প্রবল। তারুণ্য চিরদিনই বিদ্রোহের ঝান্ডা তুলে ধরে। আশীর্বাদ দিন আর নাই দিন, আমি চললাম।'

গাঁধীজির পায়ের ধুলো নিয়ে গাড়িতে বসলেন সুভাষ। ঝড়ের মতো ধুলো উড়িয়ে গাড়িটা চলে গেল। গাঁধীজি আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন, কিন্তু সেটা শোনার জন্য সুভাষ তখন কাছে নেই। চোখের জলের অঝোর ধারাবর্ষণের মধ্যে কস্তুরবা নিজেকে প্রাণপণে সামলাতে চেষ্টা করছেন।

৭

লালা শঙ্করলাল জাপান রওনা হবার পর অনেকগুলো মাস কেটে গেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে দশ মাস আগে। ধরপাকড়, গোয়েন্দাদের লেগে থাকা, আরও অনেক রকম উপায়ে ব্রিটিশ সরকার ফরোয়ার্ড ব্লকের নবোদ্ভিন্ন ডানা নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলতে ব্যস্ত। তারা যেটুকু বাকি রাখছে সে কাজটা করবার জন্য কংগ্রেস নেতারা রয়েছেন। এরকম পরিস্থিতিতে একটা ক্ষতবিক্ষত নবজাত দলের উত্থান অসম্ভব। সত্যিকারের প্রয়োজন বিদেশে পাড়ি দেওয়ার। কিন্তু তার কোনও সুযোগ দেখা যাচ্ছে না। পূর্ব এশিয়ার দরজা বন্ধ। পশ্চিমদিক থেকেও কোনও খবর নেই। সুভাষের মন অস্থির।

অনেকদিন পর দুই ভাই একসঙ্গে খেতে বসেছেন। মেজদা ফিসফিস করে বললেন, 'কাবুল কান্দাহার থেকে কুটুমরা এসেছে।' শুনেই তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে সুভাষ উঠে পড়লেন। ঠিক তখনই রোজকার মতোই কালি বাগচি এলেন। বললেন, 'আবদ খান, ভগৎরাম তলোয়ার আর রামকিষন ব্যাবসার ব্যাপারে আফগানিস্তান থেকে এসে পৌঁছেছেন।'

'কোথায় উঠেছেন?'

'বড় বাজারের এক হোটেলে।'

মেজদা ইতিমধ্যে জাপানি কনসালের সঙ্গে দেখা করে এলেন। তাঁর এক উকিল বন্ধুর বাড়িতে খানাপিনার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সূত্রে কনসাল সেখানে এসেছিলেন। কনসাল জানিয়েছেন, আপাতত কোনও উপায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ পূর্বদিকের দরজা বন্ধ। তা ছাড়া সেখানে যুদ্ধও বাধেনি। সুতরাং পশ্চিমদিকে যাওয়াই শ্রেয়। রাশিয়ার তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তর হাতছানি দিচ্ছে সুভাষকে। জার্মনি আর রাশিয়ার মৈত্রীর সুযোগ নিয়ে, সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে ভারতের সীমান্তে আসা! বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই একমাত্র পথ।

আফগানিস্তান থেকে আগত বন্ধুরা রাশিয়া আর আফগানিস্তানের সীমান্ত সম্বন্ধে ভালভাবেই ওয়াকিবহাল। সেখানকার পাহাড়, অরণ্য, নদীতে তাঁদের নিত্য যাওয়া আসা। বহুদিনের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ এসে গেছে। সুভাষের সারা গায়ে শিহরন।

দু'দিন পরে কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ড. দে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে ভাইপো দ্বিজেন্দ্রনাথ।

'সুভাষবাবু। আপনি বিদেশ যাওয়ার আগেই এই ছেলেটাকে চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের চেয়ারটায় বসিয়ে দিলে বড় উপকার হয়।'

সুভাষ চমকে উঠলেন। 'কী বলছেন ডক্টর দে? আমি বিদেশ যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ। রাশিয়াতে।' শান্তস্বরে বললেন ড. দে।

'আপনাকে কে বলল?'

'কাল রাত্রেই ড. বলদের সিং বলেছেন।'

সুভাষ সামলে নিলেন নিজেকে। হেসে উঠে বললেন, 'কাল রাতে বলদের সিং-এর সঙ্গে ক' পেগ চড়িয়েছেন ডক্টর? সারা রাত মাইফেল চলেছে নাকি?'

চালচলন পুরোপুরি বদলে গেল সুভাষের। কারণটা মেজদাও বুঝতে পারছেন না। আফগানিস্তান থেকে আগত বন্ধুদের কাছ থেকে বারবার খবর আসছে। সুভাষ ব্যস্ত হলওয়েল মনুমেন্ট সরানোর আন্দোলনে।

হলওয়েল মনুমেন্ট অনেকদিন ধরেই দেশপ্রেমিকদের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের মনগড়া কাহিনির স্মারক এই মনুমেন্ট সরানোর জন্য সুভাষ প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করলেন। পরিণামে যা হবার তাই হল। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে জেলে আটকাবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করল না। প্রেসিডেন্সি জেলে রওনা করে দেওয়া হল তাঁকে। এ খবর পেয়ে সীমান্তপার থেকে আসা বন্ধুরা হতাশ হয়ে তড়িঘড়ি কলকাতা ত্যাগ করলেন।

মনুমেন্ট আন্দোলনের সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে একে একে সহযোগীরা জেলে আসছেন। হেমন্তকুমার সরকার, অনিল রায়, ফণী মজুমদার, নীরেন্দ্র নারায়ণ, কালি বাগচি সবাই জেলে।

একরাতে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী ব্যারাকে সুভাষকে প্রশ্ন করলেন, 'সুভাষবাবু। নিজেকে খামোখা এইরকম একটা কাজে না জড়ালে আজ আপনি কোথায় বলুন তো?'

'সীমান্ত প্রদেশের কোনও একটা জেলে।'

'তার মানে?'

সুভাষ হেসে বললেন, 'দে সাহেবের কাছ থেকে শুনেই আমি খুঁটিয়ে খবর নিতে শুরু করলাম এবং জানতে পারলাম যে আমার বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারটা কলকাতায় সর্বত্র চাউর হয়ে গেছে। যেটা নিয়ে বড়বাজারেও আলোচনা চলছে সেটা পুলিশ হেড কোয়ার্টারের জানা থাকবে না?

'তাই আপনি—?'

'ইয়েস স্যার! তাই আমি ওদের তাগা ওদের গলাতেই পরিয়ে দিলাম।' সুভাষ হেসে বললেন।

৮

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল সুভাষের। সুভাষ বললেন, 'কবে যে এখান থেকে ছাড়া পাব, কে জানে!'

'অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি আমরা?'

'কিন্তু আর কত অপেক্ষা করা যায়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর একটা বছর কেটে গেছে।'

নরেন্দ্র এবার বাস্তব সত্যিটা স্পষ্ট করে দিলেন। 'চারদিকে মহাযুদ্ধের আগুন। এরকম সময়ে সুভাষ বোসের মতো সিংহকে খাঁচার বাইরে ছেড়ে দেওয়ার মতো মূর্খ ব্রিটিশ সরকার নয়।'

'কিন্তু কতদিন? কতদিন আটকে থাকতে হবে আমাকে?'

'অন্তত, মহাযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত।'

'এভাবে বোলো না নরেন্দ্র।' বলতে বলতে থরথর করে সুভাষের ঠোঁট কাঁপছে। 'এই মহাযুদ্ধের বেড়া আগুনের মধ্যে দিয়েই আমাদের পৌঁছতে হবে স্বাধীনতার সিংহদ্বারে।'

একদিন নরেন্দ্র বললেন, 'সুভাষবাবু খবর শুনেছেন। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্ররা আপনার মুক্তির জন্য প্রবল আন্দোলন শুরু করেছে? কলেজের সীমানার মধ্যেই গুলি চলেছে। অনেক মুসলিম ছাত্র পাঠান সেপাইদের হাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে।'

সুভাষচন্দ্রের মুখ বিষণ্ণ। নরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'সুভাষবাবু এবার নিয়ে কতবার জেলে এসেছেন আপনি?'

'এগারোবার।'

'বাপরে। জেল আর নির্বাসনে মোট কত বছর হল?'

সুভাষ হিসাব করতে লাগলেন। 'কুড়ি বছর আগে রাজনীতিতে এসেছি। জেল, নির্বাসন, নজরবন্দি থাকা—সব যদি ধরেন তো বাইরে ছিলাম মোট সাড়ে ছয় কী বড়জোর বছর সাতেক হবে।'

হলওয়েল মনুমেন্ট নিয়ে গোলমাল যাতে আর বেশি না বাড়ে সে জন্য সরকার মনুমেন্ট স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অনেককে ছেড়ে দেওয়া হলেও সুভাষচন্দ্রকে জেলেই রাখা হল। অন্ধকার কুঠরির মধ্যে দিন কাটে তাঁর। বাইরে তখন যুদ্ধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে।

ছাড়া পাওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। অন্তত নরেন্দ্রও যদি ছাড়া পেত? বাইরে গাঁধীজি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। প্রথম সত্যাগ্রহী হিসাবে বিনোবা ভাবে কারাবরণ করেছেন।

মাঝে মাঝে অনেক ঘুরপথে, অন্যদের চিঠির ভেতরে এমিলির চিঠি আসে। এমিলির চিঠি জেলের দমবন্ধ করা হাওয়ার মধ্যে নিয়ে আসে স্নিগ্ধতার আবেশ। চিঠি দেখে অন্য কেউ বুঝতে পারবে না কিছু। এমনকী এটা কোনও পুরুষের চিঠি না নারীর—তাও নয়। শুধু সুভাষ বোঝেন। 'তোমার সার্টের হাতা নাইট গাউনের মতো লম্বা দেখায়। একটু ছোট করে নিয়ো।' এসব লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে এক অনির্বচনীয় কোমলতা, যেটা শুধু মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব। সুভাষের কঠোর বিপ্লবী ধ্যানধারণার মধ্যে চাপা পড়ে যাওয়া একটা কবিমন জেগে ওঠে। তিনি লেখেন, 'দূরে থেকেও সবসময় কাছে থাকো তুমি। তোমার এই কাছে থাকা জেলের দুঃসহ অবস্থাকেও সহনীয় করে তোলে আমার কাছে।' এমিলির জন্য তাঁর উদ্বেগও চাপা থাকে না অবশ্য। 'তোমার গল ব্লাডারের অসুখটা কি সেরেছে? বড় চিন্তা হয় তোমার জন্য।'

যেন তেন প্রকারেণ রাশিয়ায় পৌঁছতে চান সুভাষ। সেখানে সৈন্য সংগঠিত করে ভারতের

দিকে এগোতে হবে। জেল এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। জেলের মেজর পাটনি সরকারি কর্মচারী হলেও মানুষ হিসাবে সজ্জন। নিয়মিত খোঁজখবরটা অন্তত নেন। কোনও ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করেন না। একদিন সুভাষ নরেন্দ্রকে বললেন, 'শিবাজির পালাবার কাহিনিটা মনে আছে?'

'অনেকদিন আগে স্যার যদুনাথের বইতে পড়েছিলাম।'

'ওই বইটা আবার পড়তে খুব ইচ্ছে হচ্ছে।' সুভাষ বললেন।

বাড়ি থেকে খাবার আসার অনুমতি ছিল। খাবারের সঙ্গেই বইটাও এসে পৌঁছল। আওরঙজেবের কড়া পাহারার বেড়াজাল কাটিয়ে মেওয়া আর মিষ্টির ঝুড়িতে করে পুত্র শম্ভাজিসহ শিবাজির পালানোর ঘটনার বিবরণ খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন সুভাষ।

সুভাষচন্দ্রের আগেই নরেন্দ্রর মামলার দিন পড়ল। সুভাষের হঠাৎ মনে হল, নিজে যদি নাও পারেন অন্তত নরেন্দ্রকে বিদেশে পাঠাতে পারলে ভাল হয়।

সারারাত জেগে দুটো চিঠি লিখলেন সুভাষ। অনেক কাটাকুটি ঘষামাজা করে চিঠি দুটো লেখা হল।

'কাকে চিঠি লিখলেন?'

'একটা হিটলারকে আর একটা স্তালিনকে।'

চিঠি লেখা শেষ হলে একটা সাবানের ভেতরে গর্ত করে তার মধ্যে মোমঘষা কাগজের খামে রোল করে একটা চিঠি রাখলেন সুভাষ। অন্যটা নরেন্দ্রের জুতোর শুকতলার নীচে রাখা হল। কিন্তু এত কিছু করে লাভ হল না কিছু। নরেন্দ্র ছাড়া পেলেন না।

এবার আরও অস্থির হয়ে উঠলেন সুভাষ। সারা দিনরাত একটাই চিন্তা। এর মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। অসুখটা অবশ্য একদিক থেকে দেখতে গেলে শাপে বর হল। অসুখের জন্য তাঁর দাদা সুনীল বোস তাঁর কাছে আসতে পারলেন। মেজর পাটনি সুভাষের মনোভাবের আন্দাজ পেয়েছেন কিছুটা। বললেন, 'বোস, এ রাস্তায় গেলে লাভ হবে মনে হয় না আপনার?' কে জানে! কিন্তু একটাই যে রাস্তা সুভাষের সামনে—যে-কোনও রাজবন্দির শেষ রাস্তা! আমরণ অনশন। সেই রাস্তাই বেছে নিলেন সুভাষ।

১৯৪০ সালের কালীপুজোর দিন সুভাষ ঘোষণা করলেন, 'আজ থেকে আমরণ অনশন শুরু করলাম আমি। আমার এই সংকল্প নিছক হুমকি বলে যেন কেউ না মনে করেন। এটা আমাকে এই বেআইনিভাবে আটকে রাখার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ'—বাংলার গভর্নর আর প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন তিনি।

অনশন শুরু হল। অসুস্থ সুভাষের শরীরের অবস্থা নিয়ে আরও চিন্তায় পড়লেন দাদা সুনীল। প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই মেজদা এসে বললেন, 'আইনসভা থেকে সোজা আসছি আমি। তোর এই সিদ্ধান্তে সবাই চিন্তিত।'

সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে সুভাষ অনশন ত্যাগ করেন। কিন্তু সুভাষ অনড়।

দিনে দিনে তাঁর আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। অস্থিসার দেহ। তবু শরীরের সবটুকু শক্তি একত্রিত করে বুকের নীচে বালিশ রেখে লাটসাহেবকে চিঠি লিখে সতর্ক করে দেন তিনি।

'জোর করে আমার অনশন ভাঙার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হবে। এ জগতে সবই নশ্বর। কিন্তু উজ্জ্বল স্বপ্নের সাধনাকে মৃত্যুও স্পর্শ করতে পারে না। যুগ পেরিয়ে যুগান্তরে চলে সাধনা। ব্যক্তি মরে, স্বপ্ন মরে না। জন্ম-জন্মান্তরে অবিরাম চলে সাধনার ধারা।'

অনশনে শরীর অবশ। এই কি শেষ। এবার কি 'হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য উপহারে' 'জন্মশোধ শেষ পূজা?' কোথায় যেন ভেসে চলেছেন তিনি। হঠাৎ... এ কী হল? কে তাঁকে

থামাল? কেন থামালো? কে যেন তাঁর কানের কাছে বলছে, 'মুক্তি! আপনি ছাড়া পাচ্ছেন।' চেতনা ফিরছে একটু একটু করে। মুখের কাছে কে যেন লেবুর শরবত ধরে আছে। বাইরের আলো চোখে ঝাপটা মারছে। চোখ খুলতে পারা যাচ্ছে না। জল গড়াচ্ছে চোখ দিয়ে। চারপাশের দেয়ালগুলো যেন জলে সাঁতার কেটে কেটে দূরে চলে যাচ্ছে। জলের মধ্যে ভাসছে মেজর পাটনি আর নরেন্দ্রনারায়ণের হাসি হাসি মুখ। মুক্তি!

৯

'সুভাষবাবুকে গিয়ে বলুন, কলকাতার মেয়র আবদুল সিদ্দিকি এসে আধঘণ্টা ধরে বসে আছেন।' মেয়রের ব্যক্তিগত সহকারী বললেন। সুভাষের ব্যক্তিগত সহকারী বিষ্ণু দাস ভেতরে গিয়ে আর বাইরে এলেন না। সিদ্দিকি সাহেব ভয়ংকর অপমানিত বোধ করলেন। অন্ধ্র অঞ্চল থেকে ফরোয়ার্ড ব্লকের কয়েকজন কর্মকর্তা এসেছেন দেখা করার জন্য। কিন্তু সুভাষের ভাইপো কল্যাণ সবাইকে বলল, 'কাকা ভীষণ অসুস্থ। আগামী কয়েকদিন কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারবেন না।'

সুভাষের ভাইঝি গীতা এসে মেয়রকে বলল, 'ডাক্তারের কড়া হুকুম, কোনওরকম চলাফেরা চলবে না। কাকা তাই আপনাকে নমস্কার জানিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন।'

গীতার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রেগেমেগে মেয়র বেরিয়ে গেলেন। বাইরে পুলিশের গোয়েন্দারা চোখ ঠারাঠারি করল। কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে বসবার ঘরে যাঁরা অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের সবাইকে চলে যেতে বলা হল। সদর বন্ধ করার সময় বলে দেওয়া হল যে আগামী পনেরো দিন সুভাষ কারও সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। নজরবন্দি সুভাষ স্বেচ্ছায় নিজেকে যেন আরও বেশি করে বন্দি করে ফেলেছেন। এলগিন রোডের বাড়িটা এখন খুব চুপচাপ লাগে।

নাতনি মিনুর বিয়ের নেমন্তন্ন করার জন্য একদিন বাসন্তী দেবী এলেন। সুভাষের শরীরের অবস্থা দেখে তাঁর দুশ্চিন্তা হল। সজল চোখে বিদায় নিলেন তিনি। বাসন্তী দেবী চলে যাওয়ার পরই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সুভাষ নেমে এলেন নীচে। একবার সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে পেছনের দরজার দিকে আর একবার পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে সামনের দরজার দিকে দেখতে লাগলেন। তাঁকে দরজায় দেখে পাহারাদার পুলিশটি দারুণরকম অবাক হল। কিছু বোধগম্য হচ্ছে না তার।

নীচের বারান্দায় ঝোলান খাঁচা থেকে লালঠোঁট টিয়াপাখিটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। ধীরে ধীরে খাঁচাটার কাছে গেলেন সুভাষ। পাখিটা রাগী রাগী চোখে দেখছে তাঁকে। একটুক্ষণ তার দিকে তাকালেন সুভাষ। তারপর পাখিটাকে খাঁচার বাইরে এনে দু'হাতে ধরে উড়িয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে পাখিটা গাছপালার ওপর দিয়ে চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। স্বস্তিবোধ করলেন সুভাষ।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন সুভাষ। কালই তাঁর ভাইপো শিশির তাঁর জার্মান ওয়ান্ডারার গাড়িটা নিয়ে ধানবাদ গেছেন। এখনও ফেরেননি তিনি। সতেরো বছরের শিশির বসু পরিবারের সবার মধ্যে সবচেয়ে স্বল্পভাষী। স্বভাব খুবই মার্জিত। মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। একদিন সুভাষ তাকে ডেকে নিয়মিত মস্কো রেডিয়োর খবর শুনে আর সেগুলো নোট করে রাখতে বললেন। তখনও পর্যন্ত শিশির রাঙাকাকার সঙ্গে একটা সসম্ভ্রম দূরত্ব রেখেই চলত। সুভাষবাবু তাকে ভাল করে গাড়ি চালানোটাও প্র্যাকটিস করতে বললেন।

রাঙাকাকুর আদেশ শিরোধার্য করে ওয়ান্ডারার গাড়ি নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় শিশির। মাঝে মাঝে গ্যারেজে গিয়ে গাড়িটার পার্টসগুলো সম্বন্ধেও ভাল করে জানতে চেষ্টা করে। একদিন সে একটানা বর্ধমান পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে গেল।

মহাযুদ্ধের খবর রেডিয়োতে শুনতে শুনতে সুভাষের সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরে। বাড়ি আর জেলখানার মধ্যে তফাতটা কোথায়?

শুধু পুলিশের নজর নয়, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী সবার দৃষ্টি এড়িয়ে কীভাবে বিদেশে পাড়ি দেওয়া যায় সেটাই সমস্যা! ধরা যাক, রাত্রে বাড়ি থেকে বেরোলেন আর ফিরলেন না। আত্মীয়রাই হইচই বাধিয়ে দেবেন আর সেই সঙ্গে পুলিশ শিকারি কুকুরের মতো তন্নতন্ন করে খুঁজবে তাঁকে।

একদিন হঠাৎ শিশিরকে বৈঠকখানাতে ডেকে পাঠালেন সুভাষ। তাঁর সামনে লাল চেহারার, কটা চোখওয়ালা লম্বা চওড়া এক পাঠান বসে আছে। অচেনা লোকটির পরিচয় দিয়ে সুভাষ বললেন, 'ইনি হচ্ছেন আমাদের মিঞা আকবর শাহ্। আজই পেশোয়ার চলে যাচ্ছেন উনি। যাওয়ার পথে কিছু জিনিসপত্র কিনে হাওড়া যাবেন। এঁকে একটু হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো।'

গাড়িতে উঠে আকবর শাহ্ ওয়াছেল মোল্লার দোকানটায় যেতে চাইলে শিশির তাঁকে নিয়ে ধর্মতলায় গেল। আকবর শাহ্ ওয়াছেল মোল্লার দোকান থেকে কালো ফেজ টুপি, কাবুলিওয়ালাদের পরার মতো কিছু পোশাক আর কয়েকটা মোজা কিনে এনে গাড়ির পেছনের সিটে রেখে দিলেন। আকবর শাহ্কে হাওড়া পৌঁছে গাড়ি যখন ফিরছে তখন দেখা গেল জিনিসগুলো পেছনের সিটেই রয়েছে।

এরপর শুরু হল একটি একটি করে নানারকম জিনিস জোগাড় করা। ছাপাখানা থেকে মহম্মদ জিয়াউদ্দিন-এর নামে ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে আনা হল। পরিচয়—'এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানির ভ্রাম্যমাণ ইন্সপেক্টার। ঠিকানা—সিভিল লাইনস, জব্বলপুর। একটা সুটকেস-এর ওপর M. Z. লেখা হল। এ ছাড়া পাঠানি ফ্যাশনের দুটো নস্যি রংয়ের কোট, বালিশের ওয়াড়, চাদর একটা হোল্ড অল, পুরনো একটা কোরাণ, কয়েকটা হেকিমি ওষুধের শিশিও জোগাড় হল। এল একজোড়া কাবলি জুতো।'

সুভাষের ঘরে এসে একদিন মা বললেন, 'সুভাষ তোর কী হয়েছে বল তো? চুপচাপ থাকিস, আবার গুন্ডাদের মতো দাড়িগোঁফ রাখছিস?'

'মা, রাজনীতি করতে আর ভাল লাগছে না। ইচ্ছে করছে সব ছেড়ে দিয়ে এবার জপতপ, আর সাধনভজন নিয়েই থাকব।'

'সেই কলেজের সময়ের ভূত বুঝি আবার মাথায় সওয়ার হয়েছে? আবার কি হিমালয়ে যাবার মতলব করছিস নাকি? পরিমল রায়, মুখার্জি, বিষ্ণু দাস—তিনজন সেক্রেটারিকেই আসতে বারণ করে দিয়েছিস, কেন?'

'বললাম যে। আর রাজনীতি করব না। ঘেন্না ধরে গেছে আমার।'

একদিন চিঠির একটা বান্ডিল শিশিরের হাতে দিলেন সুভাষ। চিঠিগুলো এন. জি. রঙ্গা, কামাথ, সহজানন্দ সরস্বতী, ড. ধর্মবীর—এইসব বন্ধুদের নামে লিখেছেন তিনি। ডাকটিকিট লাগিয়ে, ঠিকানা লিখে একদম রেডি চিঠিগুলো। 'কোন তারিখে কোন চিঠি পোস্ট করতে হবে তার একটা লিস্ট করে রাখো।'

ঘরের মধ্যে জমা হয়েছে গীতা আর অন্য কয়েকটা ধর্মগ্রন্থ। তা ছাড়া এসেছে রুদ্রাক্ষের মালা, ব্যাঘ্রাসন আর অন্যান্য পুজোর সরঞ্জাম।

একবার ধ্যানে বসলে আর কারও সঙ্গে কথা বলবেন না সুভাষ। দেখাও করবেন না কারও সঙ্গে। তাই সাধনা শুরু হওয়ার আগে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে একদিন খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হল।

কলাপাতা পেতে মাটিতে খেতে বসেছেন সবাই। সুভাষচন্দ্রকে যোগীর মতো দেখাচ্ছে। কপালে চন্দন, সন্ন্যাসীর বেশ, দাড়িগোঁফ তো আছেই। কাছে বসে মা খাওয়ার তদারক করছেন।

আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বসে এটাই কি জীবনের শেষ খাওয়া? সুভাষের ভেতরটা গুমরে উঠছে। খাবারের গ্রাস গলায় আটকে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাচ্ছেন তিনি। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এখন থেকে আমি আর কারও সঙ্গেই দেখা করব না। চান করার পর পরবার কাপড় আর আমার খাবার, ঘরের পরদার বাইরেই রেখে দেবে। ভীষণ প্রয়োজন হলে ইলা, দ্বিজেন্দ্র অথবা অরবিন্দকে বলবে। কখন কী করতে হবে তা ওদের বুঝিয়ে বলেছি আমি। আর কারও সঙ্গেই দেখা করব না আমি।'

সুভাষ তাঁর কামরা থেকে আর বেরোল না। বাইরে পাহারাদার পুলিশরা শুধু দেখে—ছাড়া কাপড় বাইরে আসে, খাবার আর ধোওয়া কাপড় ভেতরে যায়। এ ছাড়া ভেতর থেকে স্নানের আর মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেওয়ার আওয়াজ পাওয়া যায়। সকলের আসা-যাওয়া বন্ধ।

রোজ রাত ন'টা নাগাদ গাড়ি নিয়ে শিশির বেরিয়ে যান। মাঝ রাত্তিরে একবার বাড়িতে আসেন আবার বেরিয়ে যান। সবকিছুই নিখুঁতভাবে পরিকল্পনামাফিক চলছে। ভুল হলে আর শোধরাবার কোনও উপায় থাকবে না।

১৬ জানুয়ারি, ১৯৪১। কলকাতায় বৃষ্টি। দুপুরবেলা শরৎবাবু সুভাষের কামরায় এলেন। ত্রিপুরীর ঘটনার পর আর যুদ্ধ শুরুর সময় থেকে সুভাষের মনে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে সেটা তাঁর চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। আজ সুভাষ চলে যাবেন। মেজদা অস্থির। প্রাণপণে সামলাচ্ছেন নিজেকে। যাওয়ার সময় চোখের জল ফেললে যে অকল্যাণ হবে।

'আবার কবে দেখা হবে রে? মানে একটা আন্দাজ...'

'স্বাধীনতা পাওয়ার পর। কে জানে কতদিন লাগবে তার জন্য। হয়তো কুড়ি বছর।'

আকাশ মেঘে ভরা। মেঘ জমেছে দুই ভাইয়ের মনে, চোখে। যে-কোনও সময় শুরু হতে পারে বর্ষণ।

'মেজদা, সারাটা জীবন তুমি শুধু আমার জন্যই করে গেলে। আমাকে স্টেজে তুলে দিয়ে চিরকাল উইংস্-এর পাশে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি। আমাকে আলোতে আনতে নিজের জন্য বেছে নিলে অন্ধকার। এই পাগল সুভাষের জন্য কী করোনি তুমি?'

'চুপ কর সুভাষ। কতটুকুই বা করতে পেরেছি!'

'চুপ করব? মেজদা, সবসময় আমার বলতে ইচ্ছে করে ভাই তো সবাই পায়, কিন্তু এমন দেবতার মতো ভাই, আমি ছাড়া আর কে পেয়েছে?'

১০

রাত হল। হলদেটে রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠল। এলগিন রোড আর উডবার্ন পার্কের বাড়ি দুটো ঢিল ছোড়া দূরত্বে। বিভাবউদি জানেন, এলগিন রোডে কী হচ্ছে।

অরবিন্দ যখন সেখানে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, আদরের দেওরের কথা ভেবে ফুঁপিয়ে উঠলেন বিভাবতী।

'মা। রাঙাকাকার সঙ্গে দেখা করতে যাবে?'

'না রে। ওর সামনে সামলাতে পারব না নিজেকে।' আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলেন বিভাবতী।

রাত তখন ন'টা কি দশটা হবে। ঠিক যে কী ঘটতে যাচ্ছে কয়েকজন মাত্র জানে। পাহারাদার পুলিশদের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। তারা দেখছে সুভাষের কামরায় আলো জ্বলছে। নীচে মোটরগাড়ি থামার আওয়াজ পাওয়া গেল। এগারোটা বেজে গেছে। শিশির ভেতরে এলেন। অরবিন্দ, দ্বিজেন্দ্র আর ইলা সুভাষকে সাহায্য করছেন। হঠাৎ শিশিরকে হনহনিয়ে ঢুকতে দেখে তিনজনই চমকে তাকাল। তারপর চোখের ইশারায় সুভাষ জানালেন যে শিশিরও ব্যাপারটা জানে।

সুভাষকে জিয়াউদ্দিন সাজাবার কাজ শুরু হল। কাঁচি দিয়ে সুভাষের দাড়ি একটু ছোট করে দিল অরবিন্দ। ঢিলে পায়জামা, চকোলেট রঙের শেরওয়ানি, মাথায় কালো ফেজ টুপি। গলার বোতাম বন্ধ করতে করতে সুভাষ আরশিতে নিজেকে একবার দেখে নিলেন। চশমাটা বদলাতেই হবে! দশ বছর আগে, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে অন্য একটা চশমা পরতেন সুভাষ। ডিমের আকারের কাচ, সোনালি ফ্রেম। ঠিক হল সেটাই পরা হবে। ফেজ টুপিটা একটু নামিয়ে দিতে চওড়া কপাল ঢাকা পড়ল। সব যখন প্রায় হয়ে এসেছে হঠাৎ সুভাষের একটা কথা মনে পড়ল। বললেন, 'বাবা মারা যাবার সময় আমাকে যে ঘড়িটা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা কোথায়?'

'ওটা তো এখন কল্যাণ ব্যবহার করে।'

'না। ওটা আমি রেখে যেতে পারব না। বাবার দেওয়া ঘড়ি। ওটা আমার চাই।'

তিনতলায় কল্যাণের ঘর থেকে অরবিন্দ ঘড়িটা নিয়ে এল। ঘড়িটা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকালেন সুভাষ। বাবার কথা মনে পড়ে ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে।

সাজসজ্জা পুরো হল। বাগানের গাছগুলোর আড়াল থেকে চাঁদ উঠে এল। বাইরে দারুণ ঠান্ডা। জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখে নিলেন দ্বিজেন্দ্র।

রাস্তার পুলিশ ফাঁড়িটা দুটো বাড়ির মাঝামাঝি। পুলিশ দুটো ভারী কোট পরে আগুন পোয়াচ্ছে। বেডিং, ব্যাগ সব তৈরি। সুভাষ মা কালী আর বাবার ছবির সামনে প্রণাম করলেন। কাবলি জুতোটা পায়ে ঠিক লাগছে না। বাধ্য হয়ে পুরনো জুতোজোড়া পরতে হল। এমন সময় দ্বিজেন্দ্র গলা খাঁকারি দিয়ে জানিয়ে দিল যে রাস্তা এখন সাফ। যাবার জন্য পা বাড়িয়ে সুভাষের নজরে পড়ল মায়ের ঘরে যাবার মাঝখানের দরজাটা। সেদিকে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। মা যদি সামলাতে না পারেন নিজেকে? যদি আটকে দেন? তার চেয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে যাওয়াই ভাল। কিন্তু কী লিখবেন? তোমার সঙ্গে দেখা না করেই আমি যাচ্ছি? সারা মন তোলপাড় করে খুঁজে পান না সুভাষ। শেষ পর্যন্ত কাগজটাতে একটাই কথা লিখলেন সুভাষ—'মা'। আস্তে আস্তে কাগজটা অরবিন্দের হাতে দিলেন তিনি।

রাত তখন প্রায় দেড়টা। বেডিংটা নিয়ে পা টিপে টিপে অরবিন্দ এগোল। পেছনে ব্যাগ নিয়ে শিশির। তিনজনে বাড়ির পেছন দিকে সিঁড়ির দিকে চললেন। তিনজনেই জুতো খুলে হাতে নিয়েছেন।

অরবিন্দ বেডিংটা ড্রাইভারের সিটের পাশে পায়ের কাছে রাখল। সুভাষ বসলেন পেছনের সিটে। বাড়িটার দিকে একবার চোখ ভরে তাকালেন সুভাষ। কাকজ্যোৎস্না ফুটেছে। কাকগুলো ডাকছে। গেটে পুলিশগুলো ঢুলছে। গাড়িটা খুব ধীরে ধীরে গেট থেকে বেরোল।

উডবার্ন পার্কের সামনে দিয়ে যাবার সময় গাড়ির চেনা আওয়াজ কানে গেল শরৎবাবুর। আর কান্না সামলাতে পারলেন না তিনি। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই ভেঙে পড়লেন বিভাবতী। সারা কলকাতা ঘুমোচ্ছে। অনেকটা দূর গিয়ে গাড়ির দরজাটা ভাল করে বন্ধ করলেন সুভাষ। পাছে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হয় তাই এতক্ষণ দরজাটা হাতে ধরে রেখেছিলেন তিনি। চারদিকে নজর রেখে চলতে চলতে হাওড়া স্টেশনের কাছে এল গাড়ি। স্টেশন প্রায় ফাঁকা— দুটো একটা ট্যাক্সি আর কয়েকটা রিকশা শুধু দাঁড়িয়ে আছে। শিশির এবার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরল। ভোর হতে বেশি দেরি নেই। ঝিরঝিরে ভোরের বাতাস বইতে শুরু করেছে।

সবকিছুই আগের মতোই চলছে। রোজ সকালে পরদার সামনে ধোওয়া ধুতি আর চাদর রেখে দেওয়া হয়। ভেতর থেকে স্নান করার আওয়াজ শোনা যায়। দুপুরে শরবতের গেলাস আর ফলের থালা রাখা হয় আবার ঘণ্টাখানেক বাদে খালি থালা বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। খাবার দিতে দেরি হলে ভেতর থেকে ঘণ্টা বাজে। বাইরে পাহারাদার সিপাইরা ঘড়ির দিকে নজর করে বলে, 'বাবুজির খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

এলগিন রোডের ওপর একটা ডাকবাক্সে কোনওদিন হরিবিষ্ণু কামাথ, কোনওদিন শার্দূল সিং কবীশ্বর, কোনওদিন ব্যারিস্টার নরিম্যানের নামে চিঠি পোস্ট হয়। বাড়ির সামনে মোতায়েন গোয়েন্দা নোট করে নিয়ে পুলিশের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়। রাতে শুতে যাওয়ার আগে মা যখন সুভাষের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন তখন রোজ গলা খাঁকারি, নাক ঝাড়া কখনও অল্প অল্প কাশির আওয়াজ পাওয়া যায়। গেটে মোতায়েন পুলিশটাও হাই তুলে ঢুলতে থাকে।

আঠেরো তারিখে মিনুর বিয়েতে সুভাষের নিজের হাতে লেখা চিঠি আর উপহার এসে পৌঁছল।

পুলিশ দপ্তরও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সুভাষ বোস সত্যি সত্যি সন্ন্যাসী হয়ে যাবে নাকি? ইতিমধ্যে দিল্লির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে নির্দেশ এল। পূর্বপ্রান্তে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে। সুভাষ বোসের ওপর কড়া নজর রাখো। এলগিন রোডের ওপর আরও কড়া পাহারার ব্যবস্থা হল। রাত্রে সুভাষ কতবার গলা খাঁকারি দিয়েছেন ডিউটির গোয়েন্দারা তারও হিসেব রাখতে লাগলেন।

২৭ তারিখে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জন ব্রিন স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। 'বোসকে ডাকুন। আজ তার কোর্টে হাজির হওয়ার তারিখ।' ঠিক সেই সময় অরবিন্দ ওপরের তলা থেকে চিৎকার করতে করতে নেমে এলেন। 'রাঙাকাকাকে দেখতে পাচ্ছি না। রাঙাকাকা কোথায়?' যাকে সামনে পায় তাকেই জিজ্ঞেস করতে থাকে অরবিন্দ। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে মা সুভাষের ঘরে এসে হাজির হলেন। সুভাষের শূন্য বিছানায় পাশে পড়ে থাকা চাদর, বালিশ, বই, ফাইল যা হাতের কাছে পান তাই আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন তিনি। 'কোথায় গেল আমার মানিক? কে নিয়ে গেল তাকে?' বাড়ির চারদিকে ততক্ষণে সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি আর হুইসল দেওয়া পুলিশদের ছুটোছুটি। খবর শুনে ওবাড়ি থেকে শরৎবাবু আর বিভাবতী তাড়াতাড়ি হাজির হলেন। তাদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে মা চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। বাড়িতে হুলস্থুল। কোথায় সুভাষ?

১১

১৯ জানুয়ারি, ১৯৪১। পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের মিটমিটে আলোগুলো চারপাশের অন্ধকারকে আরও ঘন করে তুলছে। বড় স্টেশনের ঝুঁকিতে না গিয়ে মিঞা আকবর শাহ্ এখানেই অপেক্ষা করছেন। সঙ্গে রয়েছেন মহম্মদ শাহ্ আর ভগৎরাম।

'সুভাষবাবু নিজেই তো ষোলো তারিখের কথা বলেছিলেন, না?' মহম্মদ শাহ্ বললেন।

'গত তিনদিন ধরেই তো অপেক্ষা করছি আমরা। আজ অন্তত তাঁর আসা উচিত।'

'আচ্ছা। উনি যদি ষোলো তারিখে রওনা হয়ে থাকেন? তবে—' কী এক আশঙ্কায় কথাটা শেষ করতে পারেন না মহম্মদ শাহ্।

একসময় ফ্রন্টিয়ার মেল এসে পৌঁছল। গাড়ি থেকে নামল অনেক পাঠান আর শিখ যাত্রী। এক কোণায় একটু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন এঁরা তিনজন। হঠাৎ মিঞা আকবর শাহ্-র নজরে পড়ল এক মৌলবি ধীরে ধীরে স্টেশন থেকে বেরোচ্ছেন। পরনে গলাবন্ধ শেরওয়ানি আর মাথায় ফেজ টুপি। আকবর শাহ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি চিনে ফেলল মৌলবিকে—সুভাষ!

বাইরে টাঙ্গা তৈরিই ছিল। একটাতে সুভাষ আর আকবর শাহ্। পেছনে আর একটা টাঙ্গাতে ভগৎরাম আর মহম্মদ শাহ্। চারদিক সতর্কভাবে দেখতে দেখতে আসছেন। আকবর শাহ্ 'দীন' হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু ছোট হোটেলে পুলিশের নজর বেশি। তাজমহলের মতো বড় হোটেলে সে ঝামেলা কম। তাজ হোটেলে জায়গা ছিল না। কিন্তু ম্যানেজার সাহেবের কৃপায় একটা কামরার ব্যবস্থা কোনওরকমে হয়ে গেল।

স্টেশনে নামার পর থেকেই শীত করছে সুভাষের। আকবর শাহ্ আগুনের ব্যবস্থা করলেন। জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে রাখার পরে আকবর জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তায় কোনও অসুবিধে হয়েছে কিনা?

'না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধানবাদে আমার ভাইপোর বাড়িতে ছিলাম। সেখান থেকে শিশির, অশোক, অশোকের স্ত্রী সবাই এসে গোমো স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল।' বিদায়ের সময় ওদের মুখগুলো মনে পড়ে তোলপাড় করে উঠে সুভাষের মন। আর দেখা হবে কিনা কে জানে?

'২৭ তারিখ কোর্টে হাজির করার জন্য পুলিশ আসবে বাড়িতে। তার আগেই ভারতের সীমানা পার হতে হবে।'

পরের দিন সুভাষকে আবদ খান নামে এক বন্ধুর বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হল। ভগৎরাম, আবদ, মহম্মদ শাহ্ আর আকবর শাহ্ মিলে এবার ভবিষ্যৎ যাত্রার পরিকল্পনা শুরু করলেন। মহম্মদ শাহ্ পাঠানি রীতি-রেওয়াজ শেখাতে লাগলেন সুভাষকে। শুধু চলা বা বলাই নয় সবাই মিলে একথালাতে খাওয়া, চওড়া মুখওয়ালা মাটির 'কান্দোলি' থেকে জল খাওয়ার কায়দা সবকিছু শিখতে হচ্ছে সুভাষকে। বিশাল ঢিলে পায়জামা, গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলওয়ালা জামা, কাবুলি ঢংয়ের জুতো এক রাতের মধ্যেই তৈরি হয়ে এল সুভাষের জন্য।

সুভাষের সঙ্গে কাবুল যাওয়ার জন্য আকবার মিঞা একপায়ে খাড়া। কিন্তু সবাই চেনে তাঁকে। মহম্মদ শাহ্ আর ভগৎরামের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে যাওয়ার জন্য।

আকবর শাহ্কেই জিজ্ঞেস করলেন সুভাষ, 'কাকে নিলে ভাল হয়?'

'দুজনেই আমাদের লোক। তা হলেও আপনি ভগৎরামকেই নিয়ে যান। রোগাপটকা হলে কি হবে? দারুণ সাহসীও আর চটপটেও বটে।'

'কিন্তু বিশ্বাসী তো?'

'বিশ্বাসী?' আকবর শাহ্‌র চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'ভগৎরামের সমস্ত পরিবার দেশভক্ত। ওর বাবা গুরুদাসমল তলোয়ার ছিলেন এক অনন্য দেশপ্রেমিক। ওর আপন ভাই পঞ্জাবের গভর্নর স্যার জেফ্রি মন্টেমোরেন্সির-র ওপর গুলি চালিয়েছিল। ব্রিটিশরা ফাঁসি দিয়েছে তাকে।'

সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সুভাষ দেখলেন ভগৎরামকে। বললেন, 'পাখতুন ভূমির মাটিতে তোমার পরিবারের লোকেরা দেশের জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন তার জন্য আমার প্রণতি জানিয়ো তাঁদের।'

ভগৎরামের নাম হল রহমত খান। পুরোপুরি মুসলমান সাজলেন তিনি। সুভাষ জিয়াউদ্দিনই থাকলেন। দুজনের সাজপোশাকে আকবর শাহ্ খুশি। কারও চেনার সাধ্য নেই।

'কিন্তু ভাষার কী করা যায়? পুস্তু তো আমার দ্বারা হবে না?' সুভাষ চিন্তিত।

'আপনি হবেন সম্পূর্ণ বোবাকালা লোক। আদা শরিফে প্রার্থনা করতে যাচ্ছেন ভাল হয়ে যাবার জন্য।'

সুভাষচন্দ্র হেসে ফেললেন কথাটা শুনে। 'অর্থাৎ নেতা থেকে এবার অভিনেতা হতে হবে! ঠিক আছে। আইডিয়াটা দারুণ তোমার। সাবাস।'

২১ জানুয়ারি ভোরবেলা আবদ খান গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। সকাল সাড়ে ছ'টায় অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে সুভাষ আর ভগৎরাম গাড়িতে বসলেন। আকবর শাহ্ বিদায় নিলেন।

জামরোডের চৌমাথায় গাড়ি থামাতে হল। আবদ খান গিয়ে রেজিস্টারে সবার নাম-ধাম লিখলেন। কিন্তু হাবিলদারের নজর গেল পেছনের সিটে বসা সুদর্শন পাঠানটির দিকে। 'তোমার নাম কী? কোথায় যাচ্ছ?'

'আউ আউ।' সুভাষ একবার কানে হাত দেন তারপরে হাত দুটো প্রার্থনার ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তুলে ধরেন।

রহমত খান বললেন, 'সাহেব। এ আমার ভাই। বেচারি বোবা কালা।'

'আউ আউ।' কুর্নিশ করে করুণ চোখে হাবিলদারের দিকে তাকান সুভাষ।

আফ্রিদি মুলুকের শিনওয়ারি দরগার কাছে গাড়ি থামাল। আবদ খান সবাইকে নিয়ে পিরের দর্শন করে এলেন। এরপর রাস্তা বড়ই দুর্গম। আবদ খানকে এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে। সুভাষ আর ভগৎরামকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে একজন গাইড। শীতের দিন। পায়ের নীচে পাথুরে রাস্তা। রাস্তার দুদিকে গাছপালা তো নেই-ই একটু ঘাস-ও নেই। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা কাঁটাঝোপের দেখা মেলে।

পথে কোথাও কোথাও দেখা যায় একসঙ্গে গুটি দশ-বারো মাটির ঘর। এগুলোই এখানকার গ্রাম। পাহাড়ের পর পাহাড়। চড়াইয়ের পর উতরাই তারপর আবার চড়াই।

রাতে পিরাখান মৈনা বলে একটা জায়গায় পৌঁছলেন এঁরা। সেখানে হুজারা বলে একটা ধর্মস্থানে থাকার জায়গা পাওয়া গেল। ষোলো ফুট বাই পঞ্চাশ ফুট একটা কামরায় পঁচিশজন লোক। ঘরের মধ্যে কেউ কেউ ধুনি জ্বালিয়ে হাত-পা সেঁকছে। শোবার জন্য খড় বিছানোর ব্যবস্থাটা অবশ্য বেশ ভাল। ভগৎরাম কোথা থেকে নুন লাগানো ভুট্টা আর খেতে পাঁচনের মতো হলেও বেশ হাতে গরম চা জোগাড় করে আনলেন।

ক্লান্ত ভগৎরাম ঘুমিয়ে পড়লেও, গুমট ধোঁয়াভর্তি ঘরে দম আটকে আসে সুভাষের। একবার বাইরে গিয়ে খোলা হাওয়ায় দম নেন তিনি আবার ভেতরে আসেন। সারারাত এইভাবেই কাটল।

পরের দিন ভোরবেলাতেই এক শিখ দোকানদারকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভগৎরাম একটা খচ্চরের ব্যবস্থা করে ফেলল। পরের ডেরাতে গিয়ে খচ্চর ছেড়ে দিতে হবে। তবুও এই দুর্গম রাস্তায় খচ্চরটা পাওয়াতে খুব সুবিধে হল।

সকাল সকাল বেরিয়ে পড়া গেল। দুপুরে আবার পাহাড় শুরু হল। পাহাড়ের গা দিয়ে এক ভীষণরকম আঁকাবাঁকা গিরিপথ। সেই রাস্তায় রাত ন'টার সময় খচ্চর ঢুকল। অন্ধকার রাস্তায় খচ্চরের পা পিছলে যাচ্ছে। খচ্চরের দড়ি ধরে পাশে পাশেই চলছে তার মালিক। একসময় উতরাই শুরু হল। একপাশে জঙ্গল আর একপাশে গভীর খাত। হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া শুরু হল এবার। রাস্তায় বরফের আস্তরণ। মাঝে মাঝে তুষার বর্ষণ হচ্ছে। একটা বাঁকে বরফের ওপর চলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল খচ্চরটা। সুভাষ ছিটকে পড়লেন। ভগৎরাম এসে তুলল তাঁকে। ভাগ্য ভাল। একটু ছড়ে টড়ে গেলেও খুব একটা চোট লাগেনি। এরপরে আর 'অশ্বেতর-আরোহণ' বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সুতরাং বাহন ছেড়ে দিয়ে হেঁটেই চলতে থাকেন সুভাষ। পায়ের জুতো ভিজে ঢোল। রাত একটার সময় ছোট একটা গ্রামে পৌঁছলেন তাঁরা।

গাইড লোকটি তার একজন পরিচিত লোকের বাড়িতে গিয়ে দরজায় ঠকঠক করল। বেশ খানিকক্ষণ বাদে চোখ মুছতে মুছতে একজন দরজা খুলল। একটা কোণে একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে। ঘরে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। কালই বাড়ির কর্তার বিয়ে ছিল। বিয়ের পর এটাই প্রথম রাত। তবু নববিবাহিতা বধূটি নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে অতিথিদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে ভোর হয়ে গেল। বাইরে মোরগ ডাকছে।

বাড়ির মালিক আগন্তুকদের সন্দেহের চোখে দেখছেন। এ লোকগুলো আফিমের চোরাকারবারি নয় তো? খামোখা খানাতল্লাশির ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে তা হলে! তার স্পষ্ট ইঙ্গিতে ভাল করে ফরসা হবার আগেই আবার বেরিয়ে পড়লেন যাত্রীরা।

দুপুর তিনটে নাগাদ সুভাষ আর ভগৎরাম বসোল নামে একটা গ্রামে পৌঁছলেন। দারুণ খিদে পেয়েছে। কিন্তু এত বেলায় গ্রামে খাবার পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জালালাবাদ পৌঁছনো ভাল। অনেক চেষ্টা করে ভগৎরাম শেষ পর্যন্ত একটা লরিতে লিফট্ পাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ব্যাগ আর বেডিং নিয়ে দুজনে উঠে পড়লেন পেছনে। লরিতে পাহাড় প্রমাণ চায়ের বাক্স। তার ওপরেই বসলেন দুজনে। সবসময় ভয় পড়ে যাওয়ার। কোনওমতে দড়িদড়া আঁকড়ে ধরে বসে থাকলেন দুজনে।

একসময় সন্ধ্যা হল। আবার বরফ পড়া শুরু হল। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। চোখ খুলে রাখাই মুশকিল। তার ওপরে মাঝে মাঝে রাস্তার দু'ধারের গাছের ডালগুলোর ঝাপট খাওয়ার সম্ভাবনা। কোনওরকমে চায়ের বাক্সের আড়ালে মাথা লুকিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে লাগলেন দুজনে। এই রাজকীয় সফর শেষ হল মাঝরাত্তিরে।

পরের দিন আবার যাত্রা। টাঙ্গা পাওয়া গেল না। অনেক লরিকে হাত দেখিয়ে কোনওমতে একটা লরিতে জায়গা পাওয়া গেল। কাবুল আর বেশিদূর নয়। সুভাষ খুশি।

ভোর চারটের সময় বুতখাক নামে একটা গ্রামে শেষ চেকিং। শেষ চেকিং বলেই এখানে কড়াকড়িটা সাধারণত বেশি হয়। কিন্তু ভাগ্য ভাল। সারারাত তুষারবর্ষণের মধ্যে ডিউটি করে পুলিশরাও ক্লান্ত। কেউ কেউ ধুনি জ্বেলে আগুন পোয়াচ্ছে। সবাই বেশ নিস্তেজ। ড্রাইভারকে সামান্য দু-চারটে নিয়মমাফিক কথা জিজ্ঞেস করে শ্রান্ত হাবিলদার গাড়ি ছাড়বার অনুমতি দিল। গাড়ি এগিয়ে চলল।

১২

তুষারস্নাত কাবুলকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সুভাষ বিশ্রাম না নিয়ে শহরটা চিনতে বেরিয়ে পড়লেন। কাবুল যেন বিশাল একটা গ্রাম। পাকাবাড়ি খুবই কম। আমিরের প্রাসাদ ছাড়া আর যে কয়েকটা পাকাবাড়ি আছে তাদের বেশির ভাগই বিদেশিদের বাড়ি। বাকি সব বাড়িরই মাটির দেওয়াল। তুষারপাত হয়েই চলেছে। মনে হচ্ছে চারদিকে পেঁজা তুলো উড়ছে। বাড়ির ছাদগুলো যেন বরফের কান ঢাকা টুপি পরেছে। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় ধপধপে সাদা তুষারস্তূপ।

জিয়াউদ্দিন আর রহমত খান সরাই থেকে বেরোলেন কিছু কেনাকাটা করার জন্য। কাবুলের মতো শহরে সরাই-ই উপযোগী। ঘরগুলো যদিও একেবারেই ছোট আর গুমট তবে সস্তা। তা ছাড়া উট, ঘোড়া আর খচ্চর বাঁধবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। এই সব জানোয়ারের মলমূত্রের গন্ধে কষ্ট হয় সুভাষের। তাই খোলা হাওয়ায় বেরোতে পেরে ভালই লাগল তাঁর।

কাবুল শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে কাবুল নদী। শহরের ব্যাঙ্ক, বাজার, দোকান বেশির ভাগই নদীর ধারে। তুষারপাত বন্ধ হয়ে রোদে ঝলমল করছে শহর। শহরের তিন দিক ঘিরে থাকা পাহাড় আর বুরুজগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

রাস্তায় জমা বরফের ঢিবিগুলো গলে জল হচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়াটা ভাল লাগছে এখন। একটা দোকানে সুভাষ আর ভগৎরাম কিছু গরম কাপড় কিনতে ঢুকেছেন। হঠাৎ কানে এল রেডিয়োতে খবর পড়া হচ্ছে। 'ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা এবং কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর কলকাতার বাসস্থান থেকে গতকাল হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার বিশেষ সতর্কতার আদেশ জারি করেছেন। সমস্ত বিমানবন্দর, বন্দর এবং রেলপথের ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। ইদানীং সুভাষচন্দ্র আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশেষরকম আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তাই অনেকে মনে করছেন যে তিনি হয়তো সন্ন্যাস অবলম্বন করেছেন।'

রাশিয়ার দূতাবাসটা কোথায় সেটা জানার চেষ্টা করছেন সুভাষ। কোনওরকমে তাদের সঙ্গে যোগযোগ করে আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা একান্ত দরকার।

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলাই আমার স্বপ্ন। গাঁধীজি যতই বলুন, যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতার সূর্যোদয় সম্ভব নয়। যে করেই হোক রাশিয়ার দূতাবাসে যোগাযোগ করতেই হবে।' ভগৎরামকে বললেন সুভাষ।

ভগৎরাম কথাটা শুনে বিষণ্ণ হলেন। কীর্তি কিষান পার্টির সদস্যরা আগেই রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বেশি এগোবার আগেই তাঁদের সবাইকে গ্রেফতার হতে হয়েছে। রাশিয়ার দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের সামান্যতম কোনও সূত্র-ও এখন আর নজরে আসছে না।

'বাবুজি। এই যুদ্ধের সময় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগটা হবে কী করে?'

'ভগৎরাম, মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গেই তাল মিলিয়ে চলে তার ভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য। দেখি ভাগ্যে কী আছে।' সুভাষ বললেন।

জুতোজোড়া ভিজে ঢোল। তার পরেই দুজনে দূতাবাস এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাড়িগুলোর ওপর এক একটা দেশের নিশানা উড়ছে। দেখেই ক্ষিপ্রতা এল পায়ে। কাবুল

নদীর ধার দিয়ে চলেছেন দুজনে। হঠাৎ নজরে এল একটা কেল্লার মতো দেখতে ইমারতের ওপর উড়ছে রাশিয়ার লাল নিশান। দুজনেই কাছে গিয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে দেখতে লাগলেন বাড়িটা। বাড়িটার ঘেরা দেওয়ালের ওপর কাঁটা লাগানো। সামনের আঙিনা ছাড়াও বাড়িটার চারদিকে সঙিনধারী প্রহরীরা দাঁড়িয়ে।

সারারাত ধরে সুভাষ রাশিয়ান দূতের নামে একটা চিঠি লিখলেন। ভগৎরাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'মনে হচ্ছে সোজা গিয়ে চিঠিটা দিয়ে দিই।'

কথা বলতে বলতেই দুজনে পোশাক পালটে বেরিয়ে পড়লেন দূতাবাসের উদ্দেশ্যে। দুটি দীর্ঘাঙ্গি মেয়ে বেরোল দূতাবাস থেকে। তাদের পেছন পেছন এরা দুজনও বাজার পর্যন্ত চলে এলেন। ভগৎরাম হঠাৎ তাদের সামনে গিয়ে ফারসিতে বললেন, 'ম্যাডাম, এক মিনিট। দয়া করে আমাদের একটা কাজ করে দেবেন?'

হাঁটু ছাড়ানো চামড়ার কোট, উদ্ভট পোশাকের এই আজব প্রাণীটিকে দেখতে থাকে মেয়ে দুটি। কিন্তু তাদের নজরের পরোয়া না করে ভগৎরাম অনুনয়ের সুরে বললেন, 'আমরা রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' দয়া করে যদি এই চিঠিটা তাঁর কাছে পৌঁছে দেন উপকার হয়।

কঠিন দৃষ্টিতে ভগৎরামের দিকে তাকিয়ে মেয়ে দুটি পা চালিয়ে এগিয়ে গেল।

পরপর তিন দিন এই ধরনের চেষ্টায় ঘুরতে লাগলেন দুজনে। সন্ধ্যায় ক্লান্ত পায়ে সরাইয়ে ফেরেন তাঁরা। একটা করে দিন যায় আর সুভাষের অধীরতা আরও বাড়ে।

এবার চেষ্টা চলল বাজারের রাশিয়ান দোকানদারের সাহায্য পাওয়ার। সবাই এক কথাই বললেন। 'দূতাবাসের কোনও কর্মচারীই তোমাদের চিঠি নেবে না। আর আমাদের পক্ষে এ ধরনের চেষ্টা তো একেবারেই আইনবিরুদ্ধ ব্যাপার। বরং আপনারা সরাসরি দেখা করার চেষ্টা করে দেখুন।' সব চেষ্টাই দেওয়ালে মাথা ঠোকার মতো হয়ে দাঁড়াল। কোথাও কোনও সুরাহা দেখা যাচ্ছে না। অতি দুঃখে হাসি পেল সুভাষের।

'রহমত খান।'

'জি মৌলবি জিয়াউদ্দিন সাহেব?'

'এ মৌলবি মক্কা যাবে কী করে বলো তো? ঠিক আছে। রাশিয়া না হয় নাই হল— ইতালি, জার্মানি— ব্রিটিশের শত্রু এমন যে-কোনও দেশ হলেই চলবে। কাল থেকে এদের দরজাতেই খটখট করব।'

পরের দিন জার্মান দূতাবাসের রাস্তা ধরলেন। হঠাৎ ভগৎরামের নজর পড়ল দূরে বরফে আটকে যাওয়া একটা গাড়ি। গাড়িটার বনেটের ওপর রাশিয়ান ঝান্ডা লাগানো।

'বাবুজি, রাশিয়ান অ্যাম্বাসাডারের গাড়ি'— বলেই ছুট লাগালেন ভগৎরাম। ততক্ষণে বরফের মধ্যে থেকে গাড়িটা বার করে ফেলেছে ড্রাইভার। ভগৎরাম আর সুভাষ প্রাণপণে ছুটে গিয়ে গাড়িটাকে থামার ইশারা করলেন। ভাগ্যক্রমে গাড়িটা থামল। পেছনের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ভগৎরাম হড়বড় করে বললেন, 'স্যার, মাফ করবেন। আপনার সঙ্গে খুব জরুরি দরকার। আমি একজন ইন্ডিয়ান।'

এইবার জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকালেন অ্যাম্বাসাডার। ভগৎরাম বললেন, 'স্যার আপনি হয়তো সুভাষ বোসের পালানোর খবর শুনেছেন?'

রাষ্ট্রদূত মহোদয় সম্মতিসূচক মাথা হেলালেন। সঙ্গে সঙ্গেই একটু দূরে দাঁড়ানো সুভাষের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে ভগৎরাম তাড়াতাড়ি বললেন, 'উনিই হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বোস।'

ভগৎরামের অসহায়তা আর বিনীত ভাব লক্ষ করলেন অ্যাম্বাসাডার সাহেব। তবু বললেন, 'উনি যে সত্যিই সুভাষ বোস সেটা আমি কী করে বুঝব?'

'ওঁর অনেক ছবি আছে। আমি আপনার সমস্ত সংশয় দূর করে দেব। শুধু একটু সুযোগ দিন— প্লিজ স্যার।'

একবার মুহূর্তের জন্য অ্যাম্বাসাডার সাহেব সুভাষের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। মনে হচ্ছে সেই লোকই বটে— তবে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালাবার নির্দেশ দিলেন তিনি। দ্রুত চলে গেল মোটরগাড়ি।

দুজনেই হতাশ হয়ে অপসৃয়মাণ গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

মনের আগুন তবু স্থির থাকতে দেয় না।

আরও দুদিন পথে পথে ঘোরার পর মনস্থির করে ফেললেন সুভাষ। সোজা চলে গেলেন জার্মানির দূতাবাসে। ভাগ্য ভাল ফটকের আফগান সান্ত্রি তেমন কিছু ঝঞ্ঝাট করল না। অফিসের মধ্যে প্রথম তেমন কেউ নজর করেনি তাঁকে। কিন্তু চশমাটা চোখে দিতে অনেকেই ফিরে ফিরে দেখতে লাগল তাঁকে। এক তরুণ অফিসার এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে তাড়াতাড়ি রাষ্ট্রদূতের ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটু পরে বেরিয়ে এসে বলল, 'আপনি ভেতরে যেতে পারেন।' সুভাষ তাড়াতাড়ি ভেতরে গেলেন। ভেতরে বসে আছেন জার্মনির রাষ্ট্রদূত হান্স পিলগের। সুভাষ বললেন, 'ইয়োর একসেলেন্সি। আমি—'

'সুভাষচন্দ্র বোস।' স্মিতহাস্যে বললেন পিলগের। হাতের খবরের কাগজটা পাশে রেখে দিলেন তিনি।

'সত্যি বলতে কী আমি আপনার খবরটাই পড়ছিলাম। আপনার ভারত থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াটা এখন সারা এশিয়ার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর। অবশ্য আমি আগে থেকেই আপনাকে চিনি। বছর পাঁচেক আগে আপনি বার্লিনে আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তরে আসতেন মাঝে মাঝে। আর বিশদ বলেন না রাষ্ট্রদূত মহোদয়।

'থ্যাঙ্ক গড।' সুভাষ এবার একটু সুস্থির হয়ে বসলেন।

'কিন্তু মিস্টার বোস। আপনি এরকম দুঃসাহস করলেন কী করে? কাবুলে প্রচুর গুপ্তচর আর এজেন্ট চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামান্য কিছু বকশিশের লোভে আপনাকে খতম করে দেওয়ার মতো লোকেরও অভাব হবে না।'

অনেক দিন কেউ এত আগ্রহ নিয়ে কেউ তাঁর খবর নেয়নি। দারুণ ভাল লাগছে সুভাষের। তাঁর খুশি-খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে এবার হের পিলগের জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন মিস্টার বোস, আপনার জন্য কী করতে পারি আমি?'

'আমি জার্মানিতে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে চাই। আপনি যদি আমার এখান থেকে জার্মানি যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন তো কৃতজ্ঞ থাকব।'

'নিশ্চয়। আজই আমি বার্লিনে সব কথা জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

এরপর পিলগের সাহেব সুভাষের কাছে কিছু খুঁটিনাটি জেনে নিলেন। তারপরে বললেন, 'এরপর আপনি আর আমার কাছে আসবেন না। এখানে জার্মান কোম্পানি সিমেন্সের সর্বোচ্চ কর্তা হের থমাস আছেন। এর পর তাঁর মারফতেই আপনার আমার যোগাযোগ হবে। বার্লিন থেকে জবাব এলেই আমি তাঁকে জানিয়ে দেব। আপনি চারদিন পরে হের থমাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

আজ একটা বিরাট কাজ হয়েছে। খুশি মনেই সুভাষ দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এলেন। হান্স

পিলগের জার্মানিতে খবর পাঠালেন, 'ভারতের প্রখ্যাত নেতা সুভাষচন্দ্র বোস আজ অদ্ভুতভাবে আমাদের দূতাবাসে এসে হাজির হয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্বপ্ন সাকার করার জন্য জার্মানির সাহায্যপ্রার্থী।'

এরপর কীভাবে ব্যাপারটার সুষ্ঠু সমাধান করা যায় সেই চেষ্টায় লেগে পড়লেন পিলগের। ইতালির দূতাবাসের প্রধান সিনর ক্যারোনির সঙ্গে পিলগেরের সম্পর্ক ভাল। ক্যারোনি সাধ্যমতো সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাশিয়া এখন জার্মানির মিত্র রাষ্ট্র। তা ছাড়া রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে পিলগেরের সম্পর্ক বেশ ভাল।

রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত কাউন্ট ভন ডের স্কুলেনবার্গকে ফোন করলেন পিলগের। 'আপনি কখনও সুভাষচন্দ্র বোসের নাম শুনেছেন?'

'নিশ্চয়ই। দু-তিনদিন আগে রাস্তায় আমার গাড়িটা থামিয়েছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি তাঁর খুব একটা কিছু সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না।'

'কারণ?'

'কে বলতে পারে যে, ব্রিটিশরা ইচ্ছে করেই তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে কিনা?'

'আমার সেটা মনে হয় না।'

'আপনি তা হলে কী করতে চান?' রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত প্রশ্ন করেন।

'যে সাহস আর ধৈর্যের সঙ্গে এই মানুষটা প্রায় একলা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি সামর্থ্যের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে তাতে আমি মুগ্ধ। আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব ততটা সাহায্য আমি করব।'

জার্মানির রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও সুভাষের চিন্তা যাচ্ছে না। তাঁর কেমন যেন মনে হচ্ছে যে কেউ তাঁর ওপরে লক্ষ রাখছে। ভগৎরাম আর সুভাষ অনেক সময় দেরি করে সরাইয়ে ফেরেন, অসময়ে বেরিয়ে যান এসব অন্তত একজনকে লক্ষ করতে দেখছেন তিনি। সাদা রঙের পোশাক পরা একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট আফগান। আরও কয়েকজনও মনে হয় নজর রাখছে।

বাইরে থেকে ফিরে একদিন দুজনে সবে চারপাইয়ে বসেছেন কি না বসেছেন সেই হৃষ্টপুষ্ট আফগানটি দরজায় এসে দাঁড়াল।

'তোমরা কে?' জিজ্ঞেস করে লোকটা।

'মুসাফির।' ভগৎরাম বললেন।

'কোথা থেকে আসছ? যাবেই বা কোথায়? কতদিন থাকবে? কেন এসেছ এখানে।' প্রশ্নের বাণে ভগৎরাম একটু বিরক্তি দেখাতেই লোকটি নিজমূর্তি ধরল।

'আমি কে বুঝতে পারছ না কথা শুনে? চলো, ওঠো, বিছানাপত্র গুটিয়ে তৈরি হয়ে নাও। কোতোয়ালিতে যেতে হবে তোমাদের।'

'মাফ করুন হাবিলদার সাহেব। আমরা গরিব যাত্রী। সাকি সাহেব যাব। বরফে রাস্তা ঢেকে গেছে, তাই আটকে পড়েছি এখানে।' ভগৎরাম প্রায় নুয়ে পড়ে বললেন।

'তোমার ওই সঙ্গীটি কে? কথা বলে না কেন?'

'আমার খুড়তুতো ভাই ওটি। অসুখে ওর জিভ অসাড় হয়ে গেছে। তাই তো সাকি সাহেবে ভেট দিতে চলেছি। সাকি সাহেবের দোয়াতে যদি কিছু সুরাহা হয়—'

'আ—আ— আ— আ।' হাবিলদারকে কুর্নিশ করে আকাশের দিকে হাত তুলে সুভাষ আপাতত হাবিলদারের দোয়া প্রার্থনা করলেন।

এবার গলাটা একটু নামিয়ে হাবিলদার বলল, 'ঠিক আছে। আমার চা-পানির কী ব্যবস্থা করছ।'

ভগৎরাম একটা দু-টাকার নোট হাবিলদারের হাতে গুঁজে দিলেন। হাবিলদার বললেন, 'ঠিক আছে, এখন যাচ্ছি। তবে তাড়াতাড়ি এখান থেকে পাততাড়ি গোটাও।'

জার্মান, রাষ্ট্রদূতের কথা অনুযায়ী একদিন ভগৎরাম গুরুমুখ এলাকায় হের থমাসের অফিসে উপস্থিত হলেন। থমাস বললেন, 'সুভাষচন্দ্র যে ব্রিটিশের কবল থেকে বাইরে আসতে পেরেছেন জার্মান সরকার তাতে খুবই আনন্দিত। আপনারা যাতে নির্বিঘ্নে জার্মানি যেতে পারেন তার চেষ্টা করছেন তাঁরা। দিন তিনেক পরে যোগাযোগ করবেন।'

আরও তিনদিন। একটা দিন কাটানোই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধীরপায়ে সরাইয়ে ফিরলেন ভগৎরাম। হঠাৎ নজর পড়ল বাজারের দিক থেকে সেই খোদার খাসি হাবিলদার আসছে। সরাই আর মোটেই নিরাপদ নয়। তার ওপরে সুভাষের অন্তর্ধানের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ ভগৎরামের পুরনো সহকর্মী উত্তমচাঁদের কথা মনে পড়ল। উত্তমচাঁদ আসলে পেশোয়ারের লোক। একসময় নওজওয়ান ভারতসভার উৎসাহী কর্মী ছিলেন। ১৯৩০-এর আন্দোলনের সময় জেল হয়েছিল তাঁর। ভগৎরাম শুনেছিলেন এখন উত্তমচাঁদ কাবুলের লাবে বাজারে একটা কাচের জিনিসের দোকান চালান। সঙ্গে রেডিয়ো মেরামতিও করেন। তবে তার সঙ্গে দেখা করারও বিপদ আছে। দশ-এগারো বছরে একজন লোকের অনেক পরিবর্তন হতে পারে। পরিবর্তন আসতে পারে নিষ্ঠা আর বিশ্বাসে। ভাবতে ভাবতে সেই খোদার খাসি দরজায় হাজির, 'তোমাদের কোতোয়ালিতে যেতেই হবে। চলো।' অবশেষে আটটি টাকা নিয়ে আইনের রক্ষকটি আপাতত বিদায় হল। তবে চোখমুখ দেখে বোঝা গেল ক্রমশ তার সন্দেহ বাড়ছে। মহাশয় ভেবে নিয়েছেন যে সুভাষ আর ভগৎরাম আফিং বা ওই ধরনের কিছুর চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। ভগৎরাম আর দেরি না করে দরজায় তালা লাগিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন।

উত্তমচাঁদের দোকানটা খুঁজে পাওয়া গেল। চিনতে পেরে উত্তমচাঁদ দারুণ খুশি হয়ে জড়িয়ে ধরলেন ভগৎরামকে। সমাদর করে নিয়ে গিয়ে ভেতরের কামরায় বসালেন তাঁকে। ভগৎরাম আস্তে আস্তে তাঁকে বললেন, 'ভাই সাব। বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। ভারতের একজন দেশভক্তকে সীমান্ত পার করে দেবার জন্য নিয়ে এসেছি আমি।'

'সুভাষচন্দ্র নন তো?' উত্তমচাঁদ কৌতুক করে বললেন।

'চুপ, চুপ, আস্তে কথা বলুন! তিনিই আমার সঙ্গে আছেন।'

এবার চমকে উঠলেন উত্তমচাঁদ। 'সুভাষবাবু কাবুলে? আরে সকালেই তো রেডিয়োতে বলল যে সাধুর বেশে ঘুরে বেড়াবার সময় হরিদ্বারে তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।'

ভগৎরাম অল্প কথায় সব ঘটনা বললেন এবার।

ভগৎরাম সরাইয়ে ফিরতে না ফিরতেই আবার সেই পুলিশপুঙ্গব হাজির। এবার এদের কোতোয়ালিতে নিয়েই যাবেন বলে জানিয়ে দিলেন হাবিলদার বাহাদুর।

'কেন, এই গরিব তীর্থযাত্রীদের হয়রান করছেন সাহেব। আপনিই তো আমাদের কাছে কোতোয়াল সাহেব। তার চাইতে বলুন, কি খিদমত করতে পারি আপনার?'

সুভাষ লক্ষ করলেন হাবিলদার সাহেবের নজর ভগৎরামের কবজিতে বাঁধা সুদৃশ্য

হাতঘড়িটির ওপর। তাড়াতাড়ি নিজের হাতঘড়িটা আস্তিন দিয়ে ঢাকলেন তিনি। তাঁর কাছে বাবার দেওয়া এ ঘড়ি অমূল্য। হাবিলদার ভগৎরামের ঘড়িটি হস্তগত করে তবে বিদায় নিল।

ঢের হয়েছে। এবার সরাই ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে।

উত্তমচাঁদ নিজের দোতলা বাড়িতে নিয়ে তুললেন তাঁদের। এবার একটু স্বস্তি বোধ করলেন দুজনে। অতিথিদের যে ঘরটিতে থাকতে দেওয়া হল সেটি বেশ বড়সড়। মেঝেতে কার্পেট পাতা। কাবুলি ঢঙে সাজানো। বাইরের প্রচণ্ড ঠান্ডা থেকে এসে ঘরের ভেতরকার উষ্ণতা বড় ভাল লাগল অতিথিদের। সুভাষ তাঁর ময়লা সালোয়ার শেরওয়ানি আর হিমঠান্ডা মোজা ছেড়ে ফেললেন। মাথাটাও একটু হালকা বোধ হচ্ছিল। এবার চশমাটা পরতে পেরে বেশ ঝরঝরে লাগছে। উত্তমচাঁদ একটা বড়সড় উনুন নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এই ধরনের উনুনগুলোকে এখানে সান্দোলি বলা হয়। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে আগুন — কী যে আরাম!

জানলা দিয়ে বাইরের তুষারপাত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উত্তমচাঁদ সুভাষের জন্য সব ব্যবস্থা করতে লেগে পড়লেন। দোতলার এই ঘরটা বেশ সুরক্ষিত, কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। নীচের তলায় অবশ্য রোশনলাল নামে একজন ভাড়াটে থাকে। স্বয়ং উত্তমচাঁদ সপরিবারে দোতলাতেই থাকেন।

ভগৎরাম আর সুভাষ বিশ্রাম নিচ্ছেন। উত্তমচাঁদ-পত্নী রামোদেবী বার দুই দরজা দিয়ে উঁকি মেরে গেলেন। রাত্রিটা বেশ আরামেই কাটল।

পরের দিন উত্তমচাঁদ দোকানে যাবার জন্য যখন বেরোতে যাচ্ছেন, রামোদেবী আটকালেন তাঁকে।

'কী ব্যাপার বল তো? এই দুজন লোক কারা?'

'এরা দুজন লাঘমন থেকে এসেছে।'

'খামোখা মিথ্যে কথা বোলো না। লাঘমনের আত্মীয়কুটুম্বের আমি চিনি না নাকি? তোমার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই!' দুজন মুসলমানকে সটান একেবারে দোতলায় এনে তুললে?' রামোদেবী ভীষণ ক্ষুব্ধ।

'চুপ চুপ।' উত্তমচাঁদ রামোদেবীর মুখ চেপে ধরে চুপ করালেন তাকে। খুব মুশকিল হল তো! তিনি যখন দোকানে থাকবেন তখন যদি রাগের মাথায় রামোদেবী কিছু করে বসেন? উপায়ান্তর না দেখে উত্তমচাঁদ ঝট করে আলমারি থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে একটা ফটো দেখিয়ে বললেন, 'চেনো এঁকে? আমাদের ঘরে কে এসেছেন জানো? স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বোস।' রামোদেবী স্তম্ভিত। নামটা শুনেই আলোড়ন তাঁর মনে। বিহ্বলতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'সুভাষবাবু আমাদের বাড়ি! এ তো সৌভাগ্য আমাদের! কিছু চিন্তা করতে হবে না তোমার। তুমি বাইরেটা সামলাও। অতিথিদের যত্ন-আত্তির সব ভার আমার।' রামোদেবীর মনে পড়ছে তাঁর বাবার কথা। করাচি অধিবেশনে সুভাষের বক্তৃতা শুনে সে কী মুগ্ধতা তাঁর! তাড়াতাড়ি কফি তৈরি করে সুভাষের কাছে নিয়ে এলেন তিনি, শুধু একটু ভাল করে দেখার জন্য।

একদিন উত্তমচাঁদের মেয়ের ভুলে সুভাষের ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। ঠিক সেই সময়ে রোশনলাল ছাদে গিয়েছিল। ছাদ থেকে নামার সময় ঘরের মধ্যে নজর পড়ায় দারুণ হকচকিয়ে গেল রোশনলাল। কী সাংঘাতিক কথা! স্বয়ং সুভাষ বোস এই বাড়িতে। ভয়ে জ্বর এসে গেল তার। দুপুর থেকে দাস্তও শুরু হল। সারারাত জ্বরের কাঁপুনি। সকালবেলাতেই রোশনলালের আত্মীয়রা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে একজন পরিচিতের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

ভাগ্য ভাল যে রোশনলাল আর কাউকে কিছু বলল না। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা রয়েই গেল। তাই আর ঝুঁকি না নিয়ে সুভাষকে সেই রাতেই ভাল একটা সরাইয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

হের থমাসের অফিসে অনেকবার গেলেন ভগৎরাম। বার্লিন থেকে কোনও খবর নেই। যত দিন যায় বিপদের আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। একদিন হের থমাস বললেন, 'আপনাদের নেতাকে ইতালি দূতাবাসের কর্তা সিনর ক্যারোনির সঙ্গে দেখা করতে বলুন। আপনাদের ব্যাপারে বার্লিনের চাইতে রোমের আগ্রহই বেশি। সেখান থেকেই সব ব্যবস্থা হবে।' সুভাষ গিয়ে ক্যারোনির সঙ্গে দেখা করলেন। প্রথম সাক্ষাতেই সিনর পিটার ক্যারোনি বেশ খোলাখুলি কথা বললেন। 'আমরা জানি যে দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আরও কিছুদিন কোনওমতে কাটিয়ে দিন। আপনার সম্বন্ধে আমাদের বেশকিছু লোকের কি ধারণা জানেন মিস্টার বোস? রাশিয়ার বিপ্লবের সময় লেনিন যেমন বাইরে থেকে ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন, আপনিও সেইরকম সফল হবেন।'

'থ্যাঙ্কস।' কৃতজ্ঞভাবে বললেন সুভাষ।

এক অনাগত বিপ্লবের নায়ক আজ পিটার ক্যারোনির সামনে দাঁড়িয়ে। আলোচনার শেষে ক্যারোনি বললেন, 'মিস্টার বোস, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন থেকে আপনি আর বাইরে বেরোবেন না। আপনার বন্ধুর ঠিকানাটা দিন। এখন থেকে আমার স্ত্রী নিজেই আপনাকে খবর পৌঁছে দেবেন। ডোন্ট ওরি।' সিনোরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সিনর ক্যারোনি। সুভাষ হ্যান্ডশেক করলেন সিনোরার সঙ্গে।

সরাইয়ের পাঠানি খাবার সহ্য হচ্ছে না সুভাষের। অজীর্ণ আর পেটখারাপ শুরু হয়ে গেল। আবার উত্তমচাঁদের বাড়িতেই বাধ্য হয়ে আসতে হল সুভাষ আর ভগৎরামকে।

সমস্যার কোনও সমাধান নজরে আসছে না। মার্চ মাস শুরু হয়ে গেল। প্রায় পঞ্চাশ দিন কাবুলে আটকে আছেন সুভাষ। মন অস্থির। ক্যারোনি আর পিলগের অবশ্য সমানে চেষ্টা করছেন।

সুভাষের ঘুম আসে না রাত্রে। সারারাত এপাশ ওপাশ করতে থাকেন তিনি। একদিন অধৈর্য হয়ে বললেন, 'যে করেই হোক, রাস্তা একটা বার করতেই হবে।'

হঠাৎ একদিন নিজেই গাড়ি চালিয়ে সিনোরা ক্যারোনি বেশ খুশি খুশি মুখে উত্তমচাঁদের দোকানে উপস্থিত হয়ে একটা সিল করা খাম দিলেন উত্তমচাঁদের হাতে। চিঠিটা খুলে সুভাষের মনে হল তাঁর দু' আঙুলের মধ্যে স্বর্গ এসে ধরা দিয়েছে। 'মিস্টার বোস, আপনাকে নিয়ে আসার জন্য আমাদের প্রতিনিধি এখান থেকে রওনা হয়ে গেছেন। আশা করা যায় কয়েকদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৩ মার্চ আপনাকে ভিসা দেবার সম্মতি জানিয়ে রাশিয়ার কাছ থেকে খবর এসেছে। পাশপোর্টের জন্য আপনার একটা ফটো প্রস্তুত রাখবেন। আমাদের গাড়িই আপনাকে নিয়ে আসবে। অভিনন্দন রইল।'

প্রতিনিধি যখন কাবুল পৌঁছলেন ততদিনে অরল্যান্ডো ম্যাজুটা-র পাশপোর্ট তৈরি। হাজিসাহেব নামে এক ইংরেজ বিদ্বেষী দেশপ্রেমিক থাকতেন। তিনিই তাঁর পরিচিত দরজি দিয়ে ইতালিয়ান ফ্যাশানের স্যুট তৈরি করিয়ে দিলেন। দাড়িও এবার ইতালিয়ান ঢঙে। জিয়াউদ্দিন খান থেকে এবার অরল্যান্ডো ম্যাজুটা।

১৬ মার্চ একটা মোটর এসে উত্তমচাঁদের দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে গেল।

১৭ মার্চ রাতে ক্যারোনি সাহেব একটা ডিনারের ব্যবস্থা করলেন। একেবারে বাছাই করা কয়েকজনই নিমন্ত্রিত। তাঁদের মধ্যে উত্তমচাঁদ অবশ্যই আছেন।

১৮ মার্চ খুব ভোরবেলা। ক্যারোনির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এক পেল্লায় মোটর। গাড়িতে রয়েছেন সুভাষ, একজন জার্মান— নাম ড. ভাগনার, ইতালীয় দূতাবাসের একজন কর্মী আর ড্রাইভার— এই চারজন। ভোরবেলা এখনও বেশ ঠান্ডা। গাড়ির বাইরে ভগৎরাম দাঁড়িয়ে। মাঝারি গোছের লম্বা ভগৎরামকে সুভাষের চোখে আজ অনেক বড় বলে মনে হচ্ছে। চোখ জলে ভরে আসে সুভাষের। উত্তমচাঁদ, রামোদেবী, ক্যারোনি, সিনোরা ক্যারোনি সবাই যেন দেবলোকের বাসিন্দা। সবাইকে ভারাক্রান্ত মনে নমস্কার করলেন সুভাষ। গাড়ি ছেড়ে দিল। পকেট থেকে পাশপোর্ট বার করে দেখলেন সুভাষ— 'অরল্যান্ডো ম্যাজুটা, পাশপোর্ট নম্বর ৬৪৯৩২। ইতালিয়ান নাগরিক।'

১০
শয়তানের রাজত্বে

১

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি ভারতবর্ষ। এই ভিত্তি যদি টলে যায় সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে।' বিমানে পাশে বসা জার্মান অ্যাটাশে-কে বলছিলেন সুভাষ।

'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বার্লিন বিমানবন্দরে পৌঁছব আমরা।' ইতালির প্রতিনিধিটি বললেন। সুভাষ উঠে টয়লেটে গেলেন। আরশিতে নিজের মুখ দেখে নিজেরই মজা লাগছে। আরশিতে সত্যই কি তাঁর নিজের মুখ? ইতালীয় ধরনের দাড়ি, ওই ধরনেরই চুলের সঙ্গে তাঁর চওড়া কপালটা বেশ খাপ খেয়ে গেছে। চোখে ওই ডিম্বাকৃতি চশমাটা পরার পরে তাঁকে কোনও অভিজাত ইতালিয়ান কাউন্টের মতোই লাগছিল।

দুপুরে বিমান নামল বার্লিন বিমানবন্দরে। সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত জানাবার জন্য ড. ধাওয়ান আর ড. মেলচারাস উপস্থিত ছিলেন সেখানে। ড. ধাওয়ানের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল সুভাষের। ড. ধাওয়ান জার্মানির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে ড. ধাওয়ান জার্মানির সিক্রেট সার্ভিসে আছেন জানতেন সুভাষ। এর আগে বার্লিন আর ভিয়েনায় অনেকবার তাঁদের দেখা হয়েছে। 'এই ইতালিয়ান ভদ্রলোকটি কে?' ভাবছিলেন ড. ধাওয়ান। সুভাষ যখন 'কী ডক্টর' বলে ডাক দিলেন তখন তাঁকে চিনলেন ড. ধাওয়ান। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন সুভাষকে।

গাড়ি ছুটল শহরের দিকে। ড. মেলচারাস মোটেই হিন্দি জানেন না। তাই সুভাষ আর ড. ধাওয়ান প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছিলেন।

অনেক বছর জার্মানিতে থেকে ড. ধাওয়ানের চালচলনে তো বটেই হিন্দি উচ্চারণেরও পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর আনুগত্য সম্পূর্ণভাবেই জার্মানির প্রতি। কিন্তু মনের কোনও কোণে ভারতের প্রতি একটা মমতা রয়েই গেছে। ড. ধাওয়ান একটু যেন খোঁচা মেরেই বললেন, 'সুভাষ, তুমি উগ্রপন্থী আমি জানি। কিন্তু নাৎসি কবে থেকে হলে?'

সুভাষ একটু হেসে বললেন, 'সত্যিকারের একজন হিন্দুস্থানি কি কখনও নাৎসি হতে পারে?'

'কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের গুহায় ঢুকছ। কী বলব এটাকে? দুর্জয় সাহস না সব আশা ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া?'

'অন্ধকারে নয়, ঝড়ের মধ্যে। আজ জার্মানির বোমারু বিমান লন্ডন বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। প্যারিসের মতো বৈভবশালী রাজধানী ছেড়ে ফরাসিরা পালিয়েছে। তার ওপর রাশিয়া আর জার্মানি একসঙ্গে হাত মিলিয়েছে। শিগগিরই ইংল্যান্ডের বাতি নিবে যাবে।'

'তুমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে?'

'ভবিষ্যৎ কে বলতে পারে? কী হবে তা ভবিষ্যতের ইতিহাসই বলে দেবে। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে এই যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। যখন বিজয়ী রাষ্ট্রগুলো আলোচনার জন্য বসবে তখন ভারতের কথা জোর দিয়ে বলার জন্য অন্তত একজন ভারতীয় নেতার ইউরোপে উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন হবে।' সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা।

বিস্ফারিত চোখে বার্লিন শহরকে দেখছেন সুভাষ। তাঁর আগের দেখা বার্লিন ছিল এক মন্দাপীড়িত, ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত শহর। আজ বার্লিনে এক অদম্য প্রাণোচ্ছলতা। যুদ্ধ এই প্রাণশক্তিকে আরও গতিময় করে তুলেছে। প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে তিন মানুষ উঁচু হিটলারের কাট আউট। কাট আউটগুলোর মুখের ভাবে একটা প্রচণ্ড উন্মাদনা। ক্ষমতায় আসার জন্য যে উন্মাদনা কোনও রীতি-নীতি, সভ্যতা-ভব্যতার ধার ধারেনি।

'এত কম সময়ে এরকম একটা শক্তিমান দেশ আর সামরিক শক্তি গড়ে তুলেছেন এমন আর কোনও নেতার নাম করতে পার বোস?'

'না। একেবারেই না।' সুভাষ বললেন।

কুড়ি বছর আগে ইউরোপের সমস্ত প্রধান রাষ্ট্রগুলো ভার্সাইতে মিলেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানিকে 'যুদ্ধবাজ' আখ্যা দিয়ে যুদ্ধের মূল্য চুকিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল বিজয়ী দেশগুলো। জার্মানির গর্বের ধন রাইনল্যান্ডের উর্বর ভূমি সোল্লাসে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার তীব্র বাসনা আর অদম্য সংকল্প জার্মানদের মনে জাগিয়ে তুললেন হিটলার।

হিটলারের প্রশস্তি করতে করতে উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন ড. ধাওয়ান। বললেন, 'আজ যে গোয়েবলস এমনকী স্বয়ং ফ্যুয়েরার নিজেকে ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট-এর সঙ্গে তুলনা করেন তাতে দোষের কী আছে? ভস্মস্তূপ থেকে আজকের এই জার্মানিকে আবার তুলে ধরেছেন ফ্যুয়েরার।'

হঠাৎ দূর থেকে হুটার আর হুইসেলের আওয়াজ শোনা গেল। সুভাষ জিজ্ঞেস করলেন, 'বার্লিনের ওপর বোমা ফেলার মতো হিম্মত কার?'

'এটা বিমান আক্রমণের সংকেত নয়। ফ্যুয়েরার কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, তাঁরই কনভয়।'

হঠাৎ, কী একটা মনে পড়ে ড. ধাওয়ান হাসি চাপতে চাপতে বললেন, 'মানুষের ভাগ্য আর তার স্বভাব যে কী ভাবে পালটে যায়। একসময় ফ্যুয়েরার এক বেকার চিত্রকর হিসেবে ভিয়েনার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন তখন স্টেফানি নামে এক স্বর্ণকেশী, নীলনয়না স্বপ্নসুন্দরীর প্রেমে পড়েছিলেন ফ্যুয়েরার। এক-আধদিন নয় পুরো চারটি বছর তার আশায় ঘুরেছেন তিনি।'

'তারপরে সেই পুরনো গল্প নিশ্চয়ই। প্রথমে মিলন তারপর কিছুদিনের মধ্যেই বিচ্ছেদ।' সুভাষচন্দ্র বললেন।

'আরে না না। আমাদের প্রেমিকপ্রবরটির প্রেম নেহাতই একতরফা।'

'চার বছর ধরে একতরফা প্রেম?'

'তবে? এই চার বছর ফ্যুয়েরার স্টেফানির ওপর কয়েক শো কবিতা লিখেছেন আর ছিঁড়েছেন। কিন্তু একটা চিরকুটও সাহস করে প্রিয়তমার কাছে পৌঁছে দিতে পারেননি।'

সুভাষ খুব মজা পেলেন শুনে। আজকে যার আস্ফালনে ইংলিশ চ্যানেল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত থরহরি কম্পমান, তিনি একদিন একটি তরুণীর চোখে চোখ রেখে কথাটিও বলতে পারেননি। দয়িতার পেছনে পেছনে চার বছর ধরে ঘুরে বেড়ানো সেই লোকটি আজ

বলদর্পী হিটলার। সারা জগৎকে তিনি তুচ্ছ করেন আত্মম্ভরী উন্নাসিকতায়। একপায়ে ফ্রান্সকে দাবিয়ে আর একটা পা যিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের দিকে। মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে কী অভাবনীয় পরিবর্তন। এই আশ্চর্য ছবিটা কোন বিধাতা এঁকেছেন?

হোটেল এসপ্ল্যানেডে সুভাষের জন্য রাজকীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাত্রে তাঁর সঙ্গে ডিনার করার জন্য সুভাষ ড. ধাওয়ানকে ধরে রেখে দিলেন। চার পেগ খাওয়ার পরে ডক্টর সাহেব বেশ মেজাজে এলেন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৌতাত আরও জমে ওঠে। তখন প্রায় মাঝরাত। ধাওয়ান বললেন, 'এই যে আমাদের হিটলার। সবাই ভাবে সর্বশক্তিমান। তুমি কি ভাব হিটলার সুখী? হিটলার নিরাপদ? তাঁকে খতম করার জন্য এই বার্লিনেই অনেক লোক মুখিয়ে আছে।'

শুনেই সুভাষ চমকে উঠলেন। ড. ধাওয়ান মুখটা একটু কাছে এনে বললেন, 'আর এসব লোক বাইরের নয়, ভেতরের। ক্রেইসু নামে এখানে একটা গোপন বিপ্লবী সংগঠন আছে। তাদের সদস্যরা ফৌজেও আছে আর সরকারেও আছে। সুযোগ পেলেই তারা আমাদের ফ্যুয়েরারকে পরপারে পাঠিয়ে দেবে।'

'তা হলে আপনাদের গেস্টাপোরা কি করছে?'

'ক্রেইসু গেস্টাপোদের ওপর নজর রাখে আর গেস্টাপোরা ক্রেইসুর ওপর।' ড. ধাওয়ান হেসে বললেন।

এই একনায়কতন্ত্রের মধ্যেও সত্যি সত্যিই ষড়যন্ত্রীরা অনুপ্রবেশ করেছে? সুভাষকে আনমনা দেখে ড. ধাওয়ান আর এক পেগ চড়িয়ে বললেন, 'লোকে বলে ক্রেইসুর এক নেতা সরকারের বেশ ওপরের দিকেই রয়েছেন। একবার একটা বৈঠকের ব্যাপারে তিনি যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তখন নাকি স্বয়ং রুজভেল্টকে হিটলারের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বাইরের চালচলনে তিনি ছিলেন কট্টর নাৎসি। তাই রুজভেল্ট তাঁকে আদৌ বিশ্বাস করেননি।'

ড. ধাওয়ান চলে যাওয়ার পর সুভাষ চিন্তায় পড়লেন। সত্যি সত্যি এরকম বিশ্বাসঘাতক কেউ আছে নাকি? হিটলারকে চ্যালেঞ্জ করাটা কি সোজা কথা! হিটলারের আশ্চর্য উত্থানের সম্পর্কে ভাবতে থাকেন সুভাষ।

একসময় লিনৎস কিংবা ভিয়েনার থিয়েটারগুলোর আশেপাশে ঘুরতে দেখা যেত বেকার হিটলারকে। কখনও রাস্তার বরফ বেলচা দিয়ে সাফ করে, কখনও ওয়েস্ট রেলরোডের স্টেশনে মোট বয়ে, কখনও বা রাজমিস্ত্রিদের জন্য বালি সিমেন্ট বয়ে দিন কেটেছে তার। সে হিটলার আর নেই! নেই সেই ভিয়েনার রাস্তায় রাস্তায় জল রং-এ আঁকা ছবি ফেরি করে বেড়ানো তরুণটি। এখনকার হিটলার তাঁর ওজস্বিনী ভাষণে লক্ষ লক্ষ লোককে পাগল করে দেন। তাঁর পেছনে শুধু গোয়েবলস, হিমলার, রুডলফ হেস, গোয়েরিং এরাই দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে জার্মানির কোটি কোটি মানুষ। উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশায় তিনি তাদের আচ্ছন্ন করে দিতে পুরোপুরি সফল। তাঁর চোখের নীল এখন আরও ঘন, দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ। আকাশচুম্বী স্পর্ধা আর দম্ভে তিনি দিকে দিকে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর উদগ্র প্রতিশোধবাসনা আর উন্মত্ত ইহুদি-বিদ্বেষ সারা পশ্চিম থরথর করে কাঁপছে। এই হিটলারকে চ্যালেঞ্জ জানাবে কে? তাও আবার খোদ বার্লিনে? সুভাষ সমস্ত ব্যাপারটা ড. ধাওয়ানের মনগড়া কাহিনি বলে উড়িয়ে দিলেন।

ড. বুরমান খবর পাঠিয়েছেন যে পরের দিন সুভাষের সঙ্গে পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা

আলোচনায় বসবেন। যাওয়ার আগে ড. ধাওয়ান সুভাষকে রীতি রেওয়াজের আভাস দিয়ে গেছেন। সুভাষ লক্ষ করেছিলেন যে যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে সে হোটেলকর্মীই হোক আর কোনও কর্তাব্যক্তিই হোক, ড. ধাওয়ান 'হাই হিটলার' বলে তাদের সম্ভাষণ করছেন। সেই সঙ্গে অবিরত হিটলার প্রশস্তি। সুভাষের বিরক্তি লক্ষ করে ড. ধাওয়ান প্রায় ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি স্বরে হেসে বলেছিলেন, 'ব্রাদার, পছন্দ করো আর নাই করো, জার্মানিমে রহনা হোগা তো "হাই হিটলার" কহনা হি হোগা।'

হোটেলের কামরায় যাওয়ার পর সুটকেসের তলায় লুকোনো এমিলির ফটোটা বার করে দেখতে থাকেন সুভাষ। ইচ্ছে করে এমিলিকে কাছে পেতে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফটোটাকেই বললেন তিনি, 'কবে দেখব তোমাকে?'

কামরায় আলো বড়ই কম। নিজের জিনিসপত্র আর কিছু দরকারি কাগজপত্র ওয়ার্ডরোবে রেখে দিলেন। তারপর জানলার কাচের ওপরকার মোটা পরদা সরিয়ে দিলেন। সারা বার্লিন শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। বিমানযাত্রা, আফগানিস্তানের উদ্বেগভরা দিনগুলো, ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠা— সবকিছু জড়িয়ে শরীরে একটা ক্লান্তি জড়িয়ে ধরছে। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে। ঘুমের অতলে তলিয়ে যান সুভাষ।

২

ভরদুপুরে সাইরেন বেজে উঠল। ভয়ে ভিয়েনার লোকদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। ব্যালকনির রেলিংটা আঁকড়ে ধরে এমিলি নীচে বসে পড়লেন। সাইরেনের আওয়াজ বেড়ে চলেছে। ভয়ে কেঁদে ফেললেন এমিলি। কান্না শুনে ছোট বোন ছুটে এসে দিদিকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করে। পরিবারের সবাই আতঙ্কে কাঁপছে।

দেওয়ালে যিশুর ছবির পাশেই মা কালীর ছবি টাঙানো রয়েছে। মনে হচ্ছে সাইরেনের আওয়াজ বোধহয় ঠাকুরদেবতাদেরও কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তবু আশাভরা চোখে এমিলি তাকিয়ে থাকেন মা কালীর ছবিটারই দিকে।

ভাগ্য ভাল। শুধু সাইরেনই বাজল, বোমা পড়ল না। এক বছর আগে জার্মানির বিমান ভিয়েনার ওপর হামলা করেছিল। বোমার আওয়াজ, বারুদের গন্ধ, ধসে পড়া ছাদের স্মৃতি, আজও ভিয়েনার লোকদের স্মৃতিতে ভয়ংকরভাবেই রয়ে গেছে।

সেই বোমা পড়ার সময় দেওয়ালে যে ফাটল ধরেছিল তা আজও সারিয়ে উঠতে পারা যায়নি। সেই বোমা পড়া, এমিলির জীবনটাই বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। ভিয়েনার বাজারে সেই পরিচিতার কথাগুলো আজও কানে বাজে এমিলির। 'এমিলি রেডিয়োতে খবরটা শুনেছ? তোমার সেই ভারতীয় বন্ধুটি, কী যেন নাম! সে নাকি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছে।' অসাড় হয়ে আসা পা দুটো টেনে টেনে এমিলি কোনওমতে বাড়ি পৌঁছেছিলেন। বোমা পড়া বাড়িগুলোর মতো অবস্থা তাঁর। জীবনটাই বিস্বাদ হয়ে গেছে তাঁর। অবিরাম চোখের জল ঝরছে। এক বিদেশি বিপ্লবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতো বলদর্পী শক্তির সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে এগিয়েছিলেন। তারপর এই মহাযুদ্ধ। ক্রমশই হিংস্র আকার নিচ্ছে এই সর্বগ্রাসী আগুন। পারিবারিক জুতোর দোকানটা প্রায় বন্ধ। অর্থনৈতিক মন্দার দাপটে সবার নাভিশ্বাস উঠেছে। তার ওপরে এই রোজকার উদ্বেগ। যখন সুভাষকে বিয়ে করার ব্যাপারে এমিলি মনস্থির করে ফেললেন তখন বাবা শুধু একটাই প্রশ্ন করেছিলেন, 'মাই ডটার। জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার আগে সবদিক ভেবে নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।' ছোট্ট অথচ দৃঢ় উত্তর দিয়েছিলেন এমিলি।

জলভরা চোখে মেয়ের কপালে চুম্বন করে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টেনে দিয়েছিলেন বাবা। সুভাষের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর বজ্রের মতো যখন নেমে এসেছিল, তখনও নিজের জীর্ণ শরীরটাকে সোজা করে দাঁড়িয়েছিলেন বাবা।

ছোটবোন অবশ্য বারবার বলেছে যে এটা হতে পারে না। জামাইবাবু নিশ্চয় আসবেন। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বারবার বলেছে সে। সে এমিলির সামনে গরম স্যুপের বাটিটা এনে রাখল। রেশনে পাওয়া কালো পাউরুটি পাথরের মতো শক্ত। ছুরি দিয়ে কাটা যায় না। কামড় দিলে দাঁতের পাটি নড়ে যায়। স্যুপ খেয়েই পেট ভরাতে হয়। এমিলির জন্য ছোটবোনটা আপ্রাণ করে। শুধু হাতে করে খাইয়ে দেওয়াটা বাকি রাখে।

'বল তো বোন কেন আমার এই শাস্তি?' অস্ফুটে বলেন এমিলি।

হঠাৎ নীচে একটা মিলিটারি গাড়ি এসে থামার আওয়াজ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের বাড়িগুলোর দরজাগুলো পটাপট বন্ধ হয়ে গেল। জার্মান গেস্টাপোদের সবাই ভয় করে। যেখানে সেখানে গুলিবর্ষণ, ইহুদিদের জন্তু-জানোয়ারদের মতো বন্দি অবস্থায় কনসেন্ট্রেশন শিবিরগুলোর খোঁয়াড়ে ধরে নিয়ে যাওয়া, রাস্তাতেই তাদের শেষ করে দেওয়া, লেগেই আছে। এ আপদরা এখানে এল কেন?

ছোটবোন নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিল। এ শয়তানদের কী চাই? কোনওমতে নীচে এলেন এমিলি। পররাষ্ট্র দপ্তরের ছাপমারা একটা লেফাফা এমিলির সামনে তুলে ধরল। আগন্তুকদের একজন। শঙ্কাতুর মন। কোনওরকমে সিল ভেঙে খামটা খুললেন এমিলি। এ কি স্বপ্ন না সত্যি! অক্ষরগুলো যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। একটা মধুর আবেশ সারা শরীরে। সারা শরীরে আস্তে আস্তে চেতনা জাগছে। সবকিছু ছাপিয়ে একটাই কথা অনুরণন তুলছে চেতনায়। সে এসেছে!

বার্লিন থেকে আসা সেই খামটা, খামের মধ্যেকার চিঠিটা বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এমিলি। বাড়ির সবাই আনন্দে অধীর। গত কয়েকদিনের দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হয়ে হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

বার্লিনে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন এমিলি। মা আর বাবা আশীর্বাদ করলেন, 'গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড।'

ট্রেন ছুটছে বার্লিনের দিকে। স্বপ্নে বিভোর এমিলির মন। ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশ, সেই আকাশে কোথাও কোথাও সাদা রঙের ভেলা, পাহাড়, নদী, শীতের বরফ থেকে সদ্য ছাড়া পাওয়া ঝরনাগুলো বাঁধনহারা মুক্তধারা। সারা পৃথিবী যেন আজ আনন্দের ডালি তুলে ধরেছে চোখের সামনে।

'আচ্ছা আমার মধ্যে তুমি কি দেখলে বল তো?' অনেকবার সুভাষকে প্রশ্ন করেছেন এমিলি। স্মিতহাসিতে গালে টোল ফেলে সুভাষ জবাব দিয়েছেন, 'কোনও কোনও কথা না বললেই তার গভীরতা বাড়ে।' শুনে ঠোঁট ফুলিয়েছেন এমিলি। আবার হাসতে হাসতে বলেছেন, 'সুভাষ, এই জন্য! তোমার এই সহজ সারল্যই মন ভরে দেয় আমার। তাই তো বাঁধা পড়ে গেছি আমি।' কথাগুলো আজও এমিলির কানে ঝরনাধারার কলধ্বনির মতো গুঞ্জন তোলে।

একটা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াল। সেখানে সদ্য গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে এমন কিছু ছেলেকে জড়ো করা হয়েছে। তাদের আগে পিছে বন্দুকধারী নাৎসি সেপাই। ফৌজের জন্য, অস্ত্রকারখানার জন্য অনেক লোক দরকার। তাই জোর করে ভরতি করা হচ্ছে তরুণদের। তাদের মধ্যে অনেকেই নেহাতই ছোট। কেউ কলেজের গণ্ডি পেরোয়নি, কেউ বা

একেবারেই স্কুলের ছাত্র। কিন্তু যুদ্ধদেবতার খাঁই মেটাবার তাগিদে বাছবিচারের সময় নেই।

একসময় বার্লিনের সেই হোটেলে পৌঁছলেন এমিলি। কতদিন পর দুজনের সাক্ষাৎ। চোখের জল উপচে পড়ে দুজনেরই। বিচ্ছেদের গহন কালো মেঘের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে আলোর ঝরনা।

'জানো যখনই কোনও উঁচু পাহাড়ের শিখরের দিকে চোখ পড়ত, তোমাকে যেন দেখতে পেতাম। কিন্তু আজ আসতে আসতে ট্রেনের জানলা দিয়ে যখনই কোনও পাহাড়ের চূড়া নজরে আসছিল, মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আমার।'

'কেন?'

'কোনও হুকুমশাহি স্বৈরতন্ত্রী যেন আমার পর্বতশিখরে যদি সুড়ঙ্গ খোঁড়ে, এই চিন্তায়।'

এমিলির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুভাষ সিগারেট ধরাতে গেলেন। এ দৃশ্য এমিলির কাছে নতুন। হাত থেকে সিগারেট কেড়ে নিয়ে এমিলি রাগের সঙ্গে বললেন, 'এটা কি হচ্ছে?'

'তুমি এখন কার সঙ্গে কথা বলছ জানো।'

'তার মানে?' এমিলি ভ্যাবাচ্যাকা।

'দিস ইজ অরল্যান্ডো ম্যাজুটা অ্যাট ইয়োর কম্যান্ড— অ্যান ইটালিয়ান সিটিজেন। রাশিয়া থেকে জার্মানি পর্যন্ত আমাকে এই ভূমিকাতেই অভিনয় করতে হয়েছে। সুতরাং শুধু সিগারেট নয়— সুরাও আছে।'

এমিলি স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকেন সুভাষের বিচিত্র যাত্রাকাহিনি। সমরখন্দের কাছে নদী পেরোবার সময় একটা বরফের চাঙড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন সুভাষ। সেই সময়েই প্রথম সিগারেট সেবন। মস্কোতে রাষ্ট্রদূতদের এক পার্টিতে প্রথম সুরাপান। এমিলি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'সিনর ম্যাজুটা আপনার হাতেখড়িটা কী দিয়ে হয়েছিল?'

'ভডকা। দয়া করে এ প্রশ্ন করবেন না যে কেমন লেগেছিল সেই প্রথম মদ্যপান! ইট বার্নট মি। অনেকটা তোমার বিরহের জ্বালার মতো। তবে সত্যি কথা যদি বলি তবে মদে আমার কোনও দরকার নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধের নেশা আমার প্রত্যেক শিরায়, প্রত্যেক ধমনিতে। সে নেশাকে কাটিয়ে তোলার জন্য একটা ফৌজের দরকার— নতুন একটা ফৌজ— যা গড়ে তুলতে হবে আমাকেই।'

সুভাষের যাত্রাপথের বিবরণ এমিলিকে বিষণ্ণ করে তোলে। স্তব্ধ হয়ে তিনি শুনতে থাকেন সে পথের নানা সংকটের কথা। সুভাষ বলেন, 'স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই সুবর্ণক্ষণে গাঁধী-নেহরু যদি নিষ্ক্রিয় না থাকতেন তবে আমাকে এত ঝুঁকি নিয়ে দেশ ছাড়তে হত না।'

'কিন্তু জার্মানি এখন এক ভয়ানক স্বৈরতন্ত্রের শাসনে।'

'ইংল্যান্ড নিজের জন্য গণতন্ত্রের পূজারি। কিন্তু উপনিবেশগুলোকে গোলাম করেই রাখতে চায় সে। আমি জানি স্বৈরতন্ত্রের অন্ধকার গুহাতে বসে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা কত বিপজ্জনক। এখানে হয় সাফল্য নয় একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া।'

'তার চাইতে ভারতে থাকাটাই তো ভাল ছিল।'

'না এমিলি। ভারতে থাকলে মহাযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে কারাগারেই আটকে থাকতে হত। ইতিহাসচক্র যখন দুরন্ত বেগে ঘুরছে তখন জেলখানায় পচে মরা আমার সহ্য হত না। ইতিহাসও ক্ষমা করত না সেই নিষ্ক্রিয়তা। উপযুক্ত সময়ে উদ্যোগী হওয়াটাই পৌরুষ এমিলি। প্রথম মহাযুদ্ধের কথা মনে কর এমিলি। তখন রাশিয়ার জার আর জার্মনির কাইজার-এর মধ্যে ঘোর শত্রুতা। তা সত্ত্বেও রাশিয়ার জারের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য

কাইজারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন লেনিন। নাৎসিবাদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মতোই বিষাক্ত। কিন্তু আপাতত "শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র" এই নীতি মেনে চলা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর নেই।'

'কিন্তু তুমি বিবেকানন্দের অনুগামী, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ-ধন্য। তোমার মতো অসাধারণ কর্মক্ষম নেতাকে হিটলারের অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নিতে হল কেন, ইতিহাস কিন্তু আগামীদিনে এ প্রশ্ন তুলবেই সুভাষজি।'

'এমিলি যে দেশ, যে সংস্কৃতি শেকসপিয়রের মতো প্রতিভাকে সৃষ্টি করেছে, সেই দেশ, সেই সংস্কৃতি এক-আধ দিন নয়, দেড়-দুশো বছর ধরে আটত্রিশ কোটি জনতাকে পরাধীনতার দুঃসহ যন্ত্রণা দিচ্ছে কেন, এ প্রশ্নের উত্তরও কিন্তু তোমার ইতিহাস চাইবে একদিন। এমিলি আজকের জার্মানি আর আজকের ইংল্যান্ডের মধ্যে কোনও তফাত নেই। কৃষ্ণকায়দের চেয়ে শ্বেতকায়রা অনেক উন্নত এই বিশ্বাসে এরা বিশ্বাসী।'

'কিন্তু—'

'না এমিলি। এই মহাযুদ্ধের মন্থনের মধ্যে থেকে উঠে আসবে ভারতের স্বাধীনতার অমৃত-কলস। এ সুযোগ যদি হাতছাড়া হয় আগামী পঞ্চাশ বছরেও আমাদের গোলামি ঘুচবে না। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসই আমাকে দেশছাড়া করেছে। আমার এই বিশ্বাসের বেদিতে আমি উৎসর্গ করেছি আমার সমস্ত জীবন, আমার ভবিষ্যৎ। তাই ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি দেশ থেকে দেশান্তরে।'

এমিলির সংশয় দূর করা সহজ নয়। সুভাষের শিক্ষাতেই এমিলির রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ। সিগারেট ধরাতে ধরাতে হঠাৎ সুভাষের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মহানদী। এমিলিকে বলতে থাকেন তিনি। 'মহানদীর দু'পাশে অনেক গুহার মতো গর্ত ছিল। সেইসব গুহাতে সাপের আস্তানা। একটা সাপুড়েকে দেখতাম। লম্বা দাড়ি আর ভীষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। লোকটা ওই গুহার মতো গর্তগুলোতে বেপরোয়া ঢুকে পড়ত। তারপর সাপগুলোকে ধরে তাদের বিষ নিংড়ে শিশিতে ভরত। ওষুধ তৈরি করত সেই বিষে। ইতালি আর জার্মানির গুহাতেও বিষাক্ত সাপ কম নেই এমিলি। কিন্তু আজ গোলামির বিষে জর্জর আমার মাতৃভূমির ওষুধ আছে, এই সাপেদের কাছেই। বিষস্য বিষমৌধম্। তাই কিছুদিন এই সাপেদের খেলাতে হবে আমাকে। তোমার ভয় নেই এই সাপের বিষে আমার কিছু হবে না। যখন সময় আসবে ওই বিষের থলি নিয়ে চলে যাব অনেক দূরে, অরুণোদয়ের অপেক্ষায়, হয়তো অরুণোদয়ের দেশে।'

৩

সুভাষকে পররাষ্ট্র দপ্তরে যেতে হবে। তাই অনেক চিঠিপত্রের খসড়া তৈরি করে রেখেছেন তিনি। এমিলি সেগুলো টাইপ করবার জন্য স্টেশনারি আনতে রিসেপশন রুমে গিয়েছিলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন তিনি। ঘরে ঢুকেই পেট ধরে হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়েন আর কি।

'কী ব্যাপার? এত হাসি কীসের?' সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন।

'পৃথিবীর সবচেয়ে মজার কথা শুনবে তুমি?' হাসতে হাসতেই বলেন এমিলি। 'নীচে দুজন জার্মান গুপ্তচর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন যে ম্যাজুটার সঙ্গে যে অস্ট্রিয়ান মেয়েটি আছে, ম্যাজুটার ওপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য তাকে কাজে লাগাতে হবে।'

সুভাষও হো হো করে হেসে উঠলেন এবার। 'এ দেশটা দেখছি গুপ্তচরদেরই রাজত্ব। কে যে কোথায় কার ওপর নজর রাখছে বলা মুশকিল।'

'কিন্তু আমি এবার নজর রাখবই। নজরের বাইরে একদম যেতে দেব না।'

ড. মেলচারাসের সঙ্গে গাড়িতে সুভাষ উইলহেলমস্ট্রাসের পররাষ্ট্র দপ্তরের বিরাট বাড়িটাতে এসে ভারতের জন্য দপ্তরের যে বিশেষ বিভাগ রয়েছে সেখানে ঢুকলেন।

সাড়ে ছ' ফুট লম্বা, রোগা, টিয়াপাখির মতো নাকওয়ালা, কাটাকাটা মুখ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আলতো করে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'আমি ডক্টর আলেকজান্ডার রিথ। ড. রিথ যে খুব প্রোটোকল মেনে চলেন, সেটা বোঝা গেল।

ড. রিথ সুভাষকে নিয়ে বুরমানের কামরায় গেলেন। চা খাওয়ার পর আলোচনা শুরু হল।

'আপনারা যদি আমাকে সামরিক সাহায্য দেন তো ভারতে আমি বিপ্লব ঘটিয়ে দেব। কেবল ভারতের সাধারণ মানুষ নয়, ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যরাও আমার ডাকে সাড়া দিয়ে বিদ্রোহ করবে। তবে গোড়ার দিকে আপনাদের সাহায্য বিশেষ দরকার।'

সিগারেটে একটা টান দিয়ে বুরমান বললেন, 'একটা দুটো প্লেটুন বিদ্রোহ করলেই বিপ্লব হয় না মিস্টার বোস।'

'প্লেটুনের কথা কি বলছেন, ডিভিশনের পরে ডিভিশন বিদ্রোহ করবে। ব্রিটিশরা যে সামরিক শক্তির বড়াই করে সেটা অনেকটা জুজুর ভয় দেখানোর মতো। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে মোট তিন লাখের মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার ব্রিটিশ আছে। আধুনিক অস্ত্র সমেত মাত্র পঞ্চাশ হাজার লোকের একটা বাহিনী গড়ে তুলতে যদি আপনারা আমাকে সাহায্য করেন তা হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই ফোঁপরা প্রাসাদ আমি বিধ্বস্ত করে দেব। তবে আপনাদের একটা কথা আমি স্পষ্টই বলে রাখি। আমাদের কোনও দয়ার দান চাই না। আপনাদের যা কিছু খরচ হবে, স্বাধীনতা লাভের পরে তার প্রতিটি পাই আমরা ফিরিয়ে দেব। আপনারা শুধু আমাদের একটা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গড়ে তোলার জন্য অনুমতি দিন।'

এ বৈঠক নিতান্তই প্রাথমিক স্তরেই ছিল। তাই কোনও সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা ছিল না। শুধু যতদিন না ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক হচ্ছে ততদিন সুভাষ অরল্যান্ডো ম্যাজুটার বেশেই থাকবেন বলে স্থির হল। তা ছাড়া সুভাষের খরচপত্রের জন্য সরকারি মঞ্জুরি পাওয়া গেল। জার্মানির প্রত্যক্ষ সহায়তা পাওয়ার জন্য সুভাষ উঠে পড়ে লেগে গেলেন। জার্মানিতে মাত্র ঊনচল্লিশজন ভারতীয় নাগরিক। তাদের নিয়ে ফৌজ গড়ার কথা ওঠে না। তাই রাতের পর রাত জেগে জার্মানি, ইতালি আর ভারতের সম্ভাব্য সম্পর্ক সম্পর্কে একটা খসড়া তৈরি করলেন তিনি। জার্মানির বাইরে ব্রিটিশবিরোধী প্রচার চালানো, কাবুলে একটা গোপন কেন্দ্র, আফগানিস্তানের পাহাড় এলাকায় একটা ছাপাখানা স্থাপন করা আর বিভিন্ন জায়গায় বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব সুভাষ পাঠিয়ে দিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরে।

ভারতীয় দপ্তর চালু হলেও তাদের কাজকর্ম এখনও স্পষ্ট নয়। ইংল্যান্ড, আফ্রিকা আর অন্যান্য সীমান্তে একসঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছে জার্মানি। সৈন্যদলে ভরতি, অস্ত্রনির্মাণ জোরকদমে চলছে জার্মানির প্রতিটি জায়গায়। ফ্রান্সের পতন হয়েছে কিন্তু ব্রিটেন দমেনি। রোমেলের ঝটিকা বাহিনী দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে আফ্রিকায়। শুধু হিটলার নন, রিবেনট্রপ, গোয়েরিং প্রমুখ প্রধান প্রধান নাৎসি নেতাদের দম ফেলার সময় নেই।

যুদ্ধের ঘনঘটার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষের অস্থিরতাও বেড়েই চলে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে বলেন,

'এমিলি, এভাবে শুয়ে বসে আমি আর দিন কাটাতে পারছি না। কিছু একটা করতেই হবে।'

'তুমি সোজা হিটলারের সঙ্গে দেখা করছ না কেন?'

সুভাষ হেসে বললেন, 'কি সোজা রাস্তাই না দেখালে! হিটলারের সঙ্গে দেখা করো!' তারপর একটু থেমে বললেন, 'তবে এটাও ঠিক। একটিবার যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি তো তাঁকে আমি বোঝাতে পারবই। কিন্তু কী করে পৌঁছই তাঁর কাছে?'

সুভাষচন্দ্রের মতিগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার ভার অ্যাডাম ট্রটকে দিয়েছে জার্মানির পররাষ্ট্র দপ্তর। ট্রটের সঙ্গে সরাসরি দেখা করার জন্য ড. রিথের মাধ্যমে খবর পাঠালেন সুভাষ। কিন্তু নানা বাহানা করে ট্রট দেখা করছেন না তাঁর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত একদিন প্রোটোকলের তোয়াক্কা না রেখে সোজা ট্রটের কামরার দরজায় হাজির হয়ে ভেতরে স্লিপ পাঠালেন সুভাষ। সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে ডাকা হল সুভাষকে।

প্রথম দৃষ্টিতেই অ্যাডাম ট্রটকে কেমন একটা রহস্যময় মনে হয়। বয়স তিরিশের আশেপাশে। চওড়া কপাল, টিকোলো নাক, মোটাসোটা শরীর। নীল চোখে কী যেন একটা রহস্য। অ্যাডাম ট্রটের পেছনে একটা এশিয়ার মানচিত্র টাঙানো রয়েছে।

এভাবে এসে পড়ার জন্য কোনও অসন্তুষ্টি দেখালেন না হের ট্রট। হেসে বললেন, 'তা হলে মোট ঊনচল্লিশজন ভারতীয়কে সঙ্গে করে আপনি সরকার স্থাপনের কথা ভাবছেন। অবশ্য আপনাদের কথা কিছুই বলা যায় না। মাত্র আটাত্তরজন লোক নিয়ে গাঁধীজির ডান্ডি অভিযানের ফল পরে কী হয়েছিল সেটা সবাই জানে।' বলতে বলতেই গম্ভীর হয়ে গেলেন ট্রট। 'আচ্ছা ভারতের এক প্রথম সারির নেতা হওয়া সত্ত্বেও আপনি এই হিটলারের মতো একজন স্বৈরতন্ত্রীর দেশে এলেন কেন?' চারপাশে একটু দেখে নিয়ে বললেন তিনি। 'আপনার দেশে বহু তরুণই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। দু-দুবার আপনি কংগ্রেস সভাপতি হয়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সপক্ষেই বক্তব্য রেখেছেন। আপনার কি মনে হয় না এইভাবে স্বৈরতন্ত্রের দ্বারস্থ হওয়া আপনার জীবনে একটা কলঙ্ক হয়ে থাকবে?'

'বর্তমান পরিস্থিতিতে বদনাম নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু আমি তার পরোয়া করি না।'

দুজনেই দুজনকে পরখ করে নিচ্ছেন। আলোচনার মূল বিষয় ব্রিটিশ জনসাধারণ আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। অ্যাডাম ট্রট বললেন, 'ইংল্যান্ডে আমার অনেক শুভানুধ্যায়ী আছেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে গুরু বলে মানি আমি।'

'ব্রিটিশ জনসাধারণকে যতটা শ্রদ্ধা করি আমি, ততটাই ঘেন্না করি ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদকে।' সুভাষ বললেন।

'সারা পৃথিবীকে শেকসপিয়র ব্রিটিশই দিয়েছে।' ট্রট বললেন।

'কিন্তু আজ পৃথিবীতে তাদের আচরণ শাইলকের মতো।' সুভাষের চটজলদি জবাব।

কথা প্রসঙ্গে পুরনো দিনের কথা এসে পড়ল। ট্রট যখন অক্সফোর্ডে পড়তেন তখন গাঁধীজি এসেছিলেন সেখানে। নানা দেশের ছাত্রছাত্রীরা ঘিরে ধরেছিল তাঁকে। তারা যেসব প্রশ্ন করেছিল তাঁকে তা আজও মনে আছে ট্রটের। ভারতের প্রসঙ্গ আসলেই ট্রটের চোখে কেমন একটা চমক দেখা যায়। একসময় ট্রট একটু সুর পালটালেন। বললেন, 'মিস্টার বোস, আপনার সত্যিকারের মনোভাব একটু বুঝতে দেবেন আমাকে?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনার এ প্রশ্নের কারণ?'

'কারণ আপনার সম্পর্কে একটা কথা জানি আমি।'

'কী কথা?'

'আপনার নাৎসি-প্রেম একেবারেই লোক দেখানো। ফ্যুয়েরারের চালচলনের ওপর আপনি অবশ্য সন্দিহান নন। কিন্তু জার্মানির ওপর আপনার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই।'

ড. ট্রট প্রত্যেকটা কথা মেপে মেপে বলছেন। তাঁর গলার স্বরে এমন একটা প্রত্যয় আর বিশ্বাস যে চট করে সুভাষ কিছু বলতে পারলেন না। খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন সুভাষ। শুরুতেই গোলমাল হয়ে গেল নাকি সব? কোনওমতে নিজেকে সামলে সুভাষ বললেন, 'আপনার এরকম ধারণার কারণ?'

'আমি একবারে অভ্রান্ত এ দাবি করছি না। তবু মুখ দেখে লোক বোঝার আমার একটা ক্ষমতা আছে। তারই ভিত্তিতে আমি বলছি যে আপনি কখনওই হিটলার বা নাৎসিদের বন্ধু হতে পারবেন না। একমাত্র স্বার্থের খাতিরে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যই আপনি নাৎসিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চাইছেন।'

'কীসের স্বার্থ, কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ডক্টর? নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্য ইংল্যান্ডের মতো শক্তিমান দেশ আজ ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে পৃথিবীর দরজায় দরজায় ফিরছে। অর্ধেক পৃথিবীর মালিক বলে যারা গর্ব করে, মাথা নিচু করতে বাধছে না তাদের। তা হলে গোলামির শিকল ছেঁড়ার জন্য সাহায্য চাওয়াটা আমাদের পক্ষে অন্যায় কেন হবে?'

শেষ পর্যন্ত, 'যথাযোগ্য সুপারিশ করব', এইরকম মাপা কথা ডিপ্লোম্যাটিক ভঙ্গিতে বললেন ডক্টর ট্রট।

চিন্তান্বিত সুভাষ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাজার চিন্তা তাঁর মনে পাক খাচ্ছে। ডক্টর ট্রটের স্বরূপটা আসলে কী? এমিলির সঙ্গেও আলোচনা হল। ভারতের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ট্রটের আচরণে খুবই স্পষ্ট। এদিকে নাৎসি রাজনীতির প্রতি তাঁর বিদ্বেষও পুরোপুরি লুকোতে পারেননি ট্রট। তা সত্ত্বেও কেন তিনি নাৎসি প্রশাসনের মধ্যে রয়েছেন? জার্মানির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কীসের উদ্বেগ তাঁর? কেন একই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা আর ব্রিটিশ ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন তিনি? কোন রহস্যময় ধাতুতে গড়া এই লোকটি?

দিন চারেক পরে ড. রিথ সুভাষকে বললেন, 'ডক্টর ট্রট তাঁর সুপারিশ বড় কর্তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমার ধারণা তাঁর রিপোর্ট আপনার অনুকূলেই যাবে।'

'ওফ্ একটা ঝামেলা চুকল।' সুভাষ বলে উঠলেন। তাঁর উচ্ছ্বাসে ড. রিথ একটু অবাক হলেন।

'ড. ট্রট গাঁধীজির মহাভক্ত। হিটলারের ডেরায় সাহায্য চাইতে আসা একজন লোককে কী চোখে দেখবেন তিনি সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল?'

'তার মানে ডক্টর ট্রটকে ঠিকমতো বুঝতে পারেননি আপনি।' ডক্টর রিথ বললেন।

'এ কথা কেন বলছেন?'

'যে-কোনও ভারতীয় দেশপ্রেমিকের মতোই ভারতকে ভালবাসেন ডক্টর ট্রট। হি ইজ মোর ইন্ডিয়ান দ্যান এ জার্মান।'

ডক্টর ট্রট সম্পর্কে সুভাষের ঔৎসুক্য বেড়ে গেল। ডক্টর রিথ, লোথার ফ্রাঙ্ক সবার কাছ থেকে ডক্টর ট্রটের কথা খুঁটিয়ে জানতে শুরু করলেন তিনি।

হেস-এর এক সিভিল সার্ভেন্টের ঘরে ট্রটের জন্ম। রোডস স্কলারশিপ পেয়ে অক্সফোর্ডে পড়তে গিয়েছিলেন তিনি। মহাযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করছেন তিনি। চিনসহ এশিয়ার অনেক দেশেই তিনি গেছেন। ইংল্যান্ডে পড়ার সময় হুমায়ুন কবীর ছিলেন তাঁর সতীর্থ। তরুণ বয়সে তিনি শীলা গ্র্যান্টওফের সংস্পর্শে এসে ভারত সম্পর্কে যথেষ্ট

ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠেন। ট্রটের মামারাও খুবই শিক্ষিত। তাঁর মা-ও ছিলেন গাঁধীজির পরম ভক্ত। ছাত্রাবস্থায় ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট মহলেও ট্রটের খুবই আনাগোনা ছিল।

দেড়বছর হল মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। হিটলারের বোমারু বিমান ইংল্যান্ডের ওপর অগ্নিবর্ষণ করছে। প্রত্যেক বাড়িতে তৈরি হয়েছে মাটির নীচের আশ্রয়ঘর। সেখানে বসে চার্চিলের ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনে বুক বাঁধছে ইংল্যান্ডের মানুষ। অনেক বেশি শক্তি থাকা সত্ত্বেও হিটলার যে কেন ইংল্যান্ডকে শায়েস্তা করতে পারছেন না সেটা বার্লিনেও অনেকের কাছেই রহস্য। নানান ধরনের কথাবার্তা সুভাষের কানেও আসছে। পনেরো দিনের মধ্যেই সুভাষের সঙ্গে বার চারেক দেখা হল ট্রটের। একদিন দুপুরে সুভাষ সোজা হাজির হলেন ট্রটের কাছে। আশেপাশে কেউ নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সুভাষ গলা নামিয়ে ট্রটকে বললেন, 'ডক্টর, একটা গোপন খবর জানেন?'

'কী খবর?'

'ক্রেইসু নামে একটা গুপ্ত সংগঠন হিটলারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে।'

শুনে ট্রট ভুরু কুঁচকোলেন। 'হ্যাঁ এ ধরনের উড়ো খবর আমার কানেও এসেছে। কিন্তু ফ্যুয়েরারের ওপর হামলা করার সাহস কে করবে আর কেনই বা করবে?'

'জার্মানির যদি যুদ্ধে পরাজয় হয় তবে বিজয়ীপক্ষ যেন প্রথম মহাযুদ্ধের মতো দুর্দশা না করে জার্মানির তার জন্য কেউ কেউ আগে থেকেই সচেষ্ট হতে চাইছেন। গোপনে ব্রিটেনের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাঁরা।

'কী বলছেন আপনি?' এবার ট্রটের স্বরে বিস্ময়, বোধকরি একটু ভয়ও।

'শুধু তাই নয়। এঁদেরই একজন নেতা একটা সম্মেলনের জন্য আমেরিকায় গিয়ে সেখানে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর সঙ্গেও দেখা করে এসেছেন।' সুভাষ বলতে থাকেন।

'কী সাংঘাতিক সব লোক? সুভাষ আপনি এসব লোকের কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে চলবেন।' ডক্টর ট্রট পরামর্শ দিলেন।

'অন্য পরে কা কথা, এই পররাষ্ট্র দপ্তরও ক্রেইসু গোষ্ঠীর চাঁইরা বেমালুম ঘুরে বেড়াচ্ছে।' সুভাষ জানালেন।

'কী ভয়ানক!' ডক্টর ট্রটের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে।

'সত্যি কথা বলতে কি এই বিভাগেও ক্রেইসুর এক চাঁই রয়েছে।' সুভাষ থামছেন না।

'কী সব বলছেন!' শরীরে যেন একটা বিছে উঠেছে এমনভাবে ধড়মড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর।

তাড়াতাড়ি দ্বাররক্ষীকে দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন তিনি। তাঁর শরীরে ঘাম হচ্ছে। ডক্টর ট্রটের অবস্থা দেখে হাসলেন সুভাষ। আর ঢাক ঢাক গুড়গুড় না রেখে এবার সোজা ট্রটের দিকে আঙুল তুলে তিনি বললেন, 'আপনিই সেই লোক ডক্টর। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপনিই দেখা করেছিলেন। ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও আপনিই করছেন ডক্টর ট্রট।'

'প্লিজ। এনাফ ইজ এনাফ।' চাপা গলায় বললেন, ট্রট। 'আশ্চর্য! বেশ কয়েক মাস ধরে চেষ্টা চালিয়ে জার্মান গেস্টাপো পর্যন্ত যে কথা আজও জানতে পারেনি, সেটা এখানে আসার এক মাসের মধ্যে আপনি জানলেন কী করে?'

ট্রটকে এবার সত্যি সত্যি হতভম্ব দেখাচ্ছে। উত্তেজিত স্বরে তিনি বললেন, 'আপনি এর পর আর মোটেই আমার সঙ্গে দেখা করবেন না।'

'কেন? বিশ্বাস করে আপনাকে বলাটা আমার দোষ হয়ে গেল!'

'না। দেখা আমাদের হবে। তবে এত খোলাখুলি না। সেটা আপনার আমার দুজনের পক্ষেই খারাপ হবে। আজ রাতে কোথায় থাকবেন আপনি?'

'যেখানে আছি, সেখানেই।'

'রাত্রি ঠিক দশটার সময় আমার এক বন্ধুর গাড়ি আসবে আপনার কাছে। শহরের বাইরে এক জায়গায় দেখা হবে আমাদের দুজনের।'

সেই রাতে একটা নির্জন জায়গার ফার্ম হাউসে দুজনের দেখা হল। দুজনেই দুজনকে বুঝে গেছেন। তাই আর কথা কাটাকাটি হল না কিছু। চুরুটে টান দিয়ে অ্যাডাম ট্রট স্বীকার করলেন তাঁর মনের কথা। 'ইয়েস মিস্টার বোস। আমাকেও একটা স্বপ্ন, একটা আদর্শ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। হিটলালের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু প্রচণ্ড বর্ণবিদ্বেষ, ইহুদিদের একেবারে সমূলে শেষ করে দেবার জন্য তাঁর এই উন্মাদ আক্রোশ, গেস্টাপোরাজের শয়তানি শাসন এই সবকিছু দিয়ে হিটলার জার্মানির সর্বনাশ ডেকে আনছে। আমি স্থির জানি হিটলারকে সরাতে না পারলে জার্মানির সর্বনাশ কিছুতেই রোখা যাবে না। সুভাষ, আপনিও ভুল করছেন। একমাত্র খোশামোদি ছাড়া হিটলার আর কিছুই বোঝেন না। এই হুকুমশাহির কাছ থেকে আপনার মতো লোক কিছুই পাবে না।'

অবাক হয়ে ডক্টর ট্রটের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুভাষ। আঁস্তাকুড়ে তুলসীগাছের মতো লাগে ট্রটকে এই জার্মানিতে। দুজনেই মন খুলে হাসতে পারছেন এখন।

'বর্তমান পরিস্থিতিতে হিটলারের সাহায্য চাই আমার।' সুভাষ বললেন।

'আর আমি চাই হিটলারের সংহার।'

'আপনার চাই ব্রিটিশের সহায়তা।'

'আর আপনার কাম্য ব্রিটিশের সংহার।'

দুজনের রাস্তা আলাদা। অথচ দুজনেরই স্বপ্ন নিজের নিজের দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা, সাম্য আর মৈত্রী। মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। জীবনের এক আশ্চর্য মোড়ে বিচিত্র এই সাক্ষাৎ।

৪

এসপ্ল্যানেড হোটেল অনেকক্ষণ হল ঝিমিয়ে পড়েছে। সারাদিন ছুটোছুটি গেছে। ক্লান্ত সুভাষ বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছেন। হোটেলের ওপর যেসব গোয়েন্দাদের নজর রাখতে হয় তারাও এখন ঘুমে তলিয়ে। এমন সময় দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। একটু উদ্বেগের সঙ্গেই দরজা খুললেন সুভাষ। সামনেই লম্বা ওভারকোট আর হ্যাট মাথায় অ্যাডাম ফন ট্রট দাঁড়িয়ে। সুভাষ হতচকিত। ভেতরে এসে বসার পর ট্রট বললেন, 'বন্ধু, শুনেছি তোমার ইংরেজি নাকি অসাধারণ। আই সি এস পরীক্ষায় ইংলিশ কম্পোজিশন পেপারে তুমিই ফার্স্ট হয়েছিলে। আমার একটা চিঠির ইংরিজি অনুবাদ করে দিতে হবে তোমাকে। আমার পরিচিতদের মধ্যে জার্মানিতে এক তুমিই আছ যার ইংরেজি চার্চিলকেও খুশি করতে পারবে।'

'অর্থাৎ রুজভেল্টের কাছ থেকে যেটা পাওয়া যায়নি, এবার চার্চিলের কাছে সেটা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।'

'কী করব বলো? তুমিই তো শিখিয়েছ! দেশকে বাঁচাতে চাইলে—লিভ লাইফ ডেঞ্জারাসলি।'

ট্রট চিঠির মূল বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিলেন সুভাষকে। সুভাষ নিজেও একবার মূল চিঠিটা ভাল করে পড়ে নিয়ে ইংরেজিতে চিঠিটা লিখে ফেললেন। চিঠি পড়ে ট্রট দারুণ খুশি। তারপরে গল্প শুরু হল দুজনের। সুভাষ মিনতির সুরে বললেন, 'ট্রট কিছু একটা করো। জার্মান গভর্নমেন্টকে একটু নাড়াচাড়া দাও। কিছু না করে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে দম আটকে আসছে আমার। এইভাবে নিষ্কর্মা হয়ে থাকার চাইতে কিছু একটা করে মরাও ভাল।'

সুভাষের অস্থিরতা দেখে ট্রট বললেন, 'তোমার জন্য কষ্ট হচ্ছে আমার। কত কাণ্ড করে, কত আশা নিয়ে এখানে এসেছ তুমি। কিন্তু হিটলারের ভারতের ওপর বিন্দুমাত্র মমতা নেই। তোমার দুর্ভাগ্য যে ভারতবর্ষকে ফ্যুয়েরার দেখেন ব্রিটিশেরই চোখ দিয়ে।'

'হিটলার তাঁর আত্মজীবনী *মাইন কাম্প*-এ ভারত সম্বন্ধে যে কটূক্তি করেছেন তার ভিত্তিতেই নিশ্চয়ই তুমি একথা বলছ?'

'হ্যাঁ। সেখানে তো তিনি ভারতের দেশপ্রেমিকদের এশিয়ান জাগলার্স বলেছেন। কিন্তু তা ছাড়া গত মে মাসে ডানকার্কের ব্যাপারটা জানা আছে কি তোমার? ফ্রান্সের ডানকার্ক বন্দরে তিন লাখ ব্রিটিশ সৈন্য আটকে পড়েছিল। যদি জার্মান ফৌজ চাইত তবে ওই তিন লাখ ব্রিটিশ সৈন্যর মধ্যে একজনও লন্ডনে পৌঁছতে পারত না। কিন্তু তাদের সবাইকে নির্বিঘ্নে লন্ডন পৌঁছতে দেওয়া হয়েছিল।'

'এত দয়া কে দেখালেন?'

'স্বয়ং ফ্যুয়েরার, হিটলার।'

'এর কারণ?' বিস্মিত সুভাষ প্রশ্ন করলেন।

'জার্মানি বড় বড় সামরিক কর্তারাও আজ এই প্রশ্নই করছেন। তোমাকে কি বলব সুভাষ! মাঝখানে শুধু "আ" নামে একটা নদী পেরোনোর প্রয়োজন ছিল। মাইল দশেক দূরে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের অবস্থা ব্রিটিশ বাহিনীর। কিন্তু নদী পেরোবার আগেই ফ্যুয়েরারের আদেশ পৌঁছল, চুপ করে বসে থাকো। "আ" নদীর ধারে হাঁ করে বসে রইল জার্মান সৈন্যবাহিনী। তিনদিন নড়াচড়া বন্ধ। বহুবার হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। কিন্তু আক্রমণের অনুমতি মিলল না। সাধারণত শত্রুর মাথার খুলিকে পানপাত্র হিসাবে ব্যবহারে যার খুশি উপচে পড়ে, বিজয়লালসায় রাতের পর রাত যার বিনিদ্র কাটে, সেনাবাহিনীর কর্তাদের সমস্ত উপদেশ উপেক্ষা করে যিনি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেন—এই মোক্ষম সময়ে তিনি এরকম বরফশীতল হয়ে গেলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তোমাকে তার অত্যন্ত জটিল মনটাকে ভাল করে বুঝতে হবে। আসলে তিনিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকে থাকুক সেটাই চান। নয়তো ওই তিন লাখ লোক যুদ্ধবন্দি হত। হয়তো ডানকার্কের সমুদ্রের তীরেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত। আমাদের ফ্যুয়েরার-এর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাধান্যের ওপর রাগ যতখানি সত্যি, ব্রিটিশ জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক টানও ততটাই সত্যি।' ট্রট বললেন।

অনেক পরে, যাবার জন্য উঠলেন ট্রট। সুভাষকে বললেন, 'তোমার জন্য একটা ভাল খবর আছে। আফ্রিকার যুদ্ধে রোমেলের হাতে পঞ্চাশ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য বন্দি হয়েছে। তার মধ্যে পনেরো হাজার ভারতীয় সৈন্য রয়েছে। তোমার স্বপ্নপূরণে এরা নিশ্চয়ই কাজে আসবে।'

নাৎসি প্রশাসনের অনেক ডালপালা। তাদের মধ্যে অনেক সময়ই রেষারেষি ছিল। এইরকম দ্বন্দ্ব ছিল রিবেনট্রপের অধীনে পররাষ্ট্র বিভাগ আর গোয়েবলসের অধীনে প্রচার বিভাগের মাঝে। পররাষ্ট্র দপ্তরে ছিলেন অনেক প্রবীণ অফিসার, যাঁদের অনেকে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও ছিলেন। অভিজ্ঞতায়, বয়সে এঁরা বড়। গোয়েবলসের অধীনে যারা, তাদের মধ্যে

সাম্প্রতিককালে উঠে আসা রাজনৈতিক কর্মীদের সংখ্যাধিক্য। সরকারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র আর অবিশ্বাসের বাতাবরণ। একটা দমবন্ধ করা আবহাওয়া। মন খুলে কথা বলে না কেউ। এর সবই জানতেন সুভাষ। সবসময় কেউ না কেউ নজর রাখছে অন্যের ওপরে। আবার নজরদারি যে করছে তার ওপরে নজর রাখছে অন্য কেউ। এ এক ভীষণ জটিল পরিস্থিতি।

একদিন রাত ন'টার সময় ঝনঝনিয়ে ফোন বাজল। এমিলি ফোন তুললেন। খাঁটি জার্মান ভাষায় শোনা গেল, 'ওটাকে ছেড়ে দাও।'

'হ্যালো। কে কথা বলছেন? রং নাম্বার।'

'আজ্ঞে না। রাইট নাম্বার। এক আর্য মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও একটা কালা আদমিকে বিয়ে করে পবিত্র আর্যরক্তের অপমান সইব না আমরা।'

'হ্যালো। কে বলছেন? নামটা বলুন।'

'নাম দিয়ে কী হবে। এখন ভালয় ভালয় যা বলছি না করলে টের পাইয়ে দেব।'

কাঁপা কাঁপা হাতে ফোন নামিয়ে রাখলেন এমিলি। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকা এমিলিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন সুভাষ।

'এমিলি আমি জানি, তোমার জীবনে কী বিরাট বিপদ ডেকে এনেছি আমি। জীবনে দুঃখ ছাড়া তোমাকে আর কি-ই বা দিলাম।' সুভাষ বললেন।

'আমার কথা ভাবছি না আমি। কিন্তু তোমার কিছু হলে পাগল হয়ে যাব আমি।' চোখের জল মুছে এমিলি বলেন।

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। খাবার দিয়ে গেছে। পড়ে পড়ে ঠান্ডা হচ্ছে সে খাবার। উদাস স্বরে বললেন সুভাষ, 'এতদিন পর্যন্ত বিয়ে না করার পেছনে একটাই কারণ ছিল এমিলি। জীবনে যারা কোনও একটা লক্ষ্য, কোনও একটা উদ্দেশ্যকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসে তাদের বিয়ে করা উচিত নয়।'

'কেন?'

'কারণ বিয়ের আগেই স্ত্রীর জন্য তারা একটা সতিন নিয়ে আসে। বিয়ের পর সবারই অসহায় লাগে নিজেদের।'

প্রত্যেক দিন রাত্রে ফোনে এই ধরনের হুমকি চলছেই। অভিযোগ করার পরে টেলিফোন বিভাগ থেকে জাল বিছানো হল। বোধহয় তার আন্দাজ পেয়েই থামল এই ফোনের হুমকি। কিন্তু জার্মানিতে বর্ণবিদ্বেষ কীভাবে বাড়ছে তার একটা আন্দাজ পেলেন সুভাষ। ইহুদি আর গরিব শ্লাভদের অনেক বেশি আপন বলে মনে হতে লাগল তাঁর।

দুদিন পর আবার রাত বারোটার পরে ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠল। একটু দেরি করে খুব সন্তর্পণে রিসিভার তুললেন সুভাষ।

'সরি মিস্টার বোস। এত রাতে কষ্ট দিলাম। আমি আলেকজান্ডার রিথ বলছি।'

'কী ব্যাপার ডক্টর রিথ? এত রাতে?'

'আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরশু ২৯ এপ্রিল পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকার স্থির হয়েছে।'

'কোথায়? কখন?'

'এখানে নয়। ভিয়েনা যেতে হবে আপনাকে। হের রিবেনট্রপ এখন সেখানেই আছেন।'

ফোন রেখে খুশিতে উচ্ছল সুভাষ। চোখেমুখে জলের ছিটে দিয়ে সজাগ হয়ে উঠলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে যে-সব আলোচনা করতে হবে তার একটা খসড়া করতে বসলেন তিনি।

৫

এসপ্ল্যানেড হোটেলের এই স্যুটে রাতে কয়েক ঘণ্টা বাদ দিয়ে সবসময় রেডিয়ো চলে। অনেক সময় এমিলি রেডিয়োর খবর মনিটরিং করেন। আজ খুব ভোরেই সুভাষকে ট্রেন ধরতে হবে। এমিলি সুভাষের ব্যাগ গুছিয়ে খবর শুনে নোটস তৈরি করতে বসলেন। স্টেশন বদলাতে বদলাতে হঠাৎ কানে এল, 'হিমালয় বেতার কেন্দ্র থেকে ইকবাল সিদেই বলছি। আমাদের প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বোস সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার নানারকম উলটো পালটা খবর ছড়াচ্ছে। কখনও বলছে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কখনও বলছে সুভাষ বার্লিনে হিটলারের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। জানি না এই শয়তানরা তাঁকে খতম করে দিয়েছে কিনা। ভাই সুভাষ। আপনি কোথায়? নিজেকে প্রকাশ করুন। সারা পৃথিবীতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত দেশপ্রেমিকরা আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন। আমরা অধীর আগ্রহে আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছি।'

যে ফৌজি অফিসারের সঙ্গে সুভাষ যাবেন তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ট্রেন ফেল করার সম্ভাবনা। তাড়াতাড়ি অ্যানহাল্টার বানহফ স্টেশনে পৌঁছলেন সুভাষ। গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। অ্যাডাম ট্রট আর ডক্টর রিথ আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। ট্রেনে বসে সুভাষ প্রশ্ন করলেন, 'এই ইকবাল সিদেই কে?'

'আপনারই এক বন্ধু ভারতীয় বিপ্লবী।'

'তাঁর নিজের রেডিয়ো?' বিস্মিত সুভাষ প্রশ্ন করলেন।

'নিজের নয়। মুসোলিনির সরকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা প্রচারের জন্য তাঁকে এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

২৯ এপ্রিল, ১৯৪১ ভিয়েনার মনার্ক হোটেলে এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের আয়োজন হয়েছে। রিবেনট্রপ রাইখ-এর একজন প্রধান ব্যক্তি। হিটলারের একান্ত বিশ্বাসী সহকারী। তাঁরই পরামর্শে হিটলার সমস্ত ইউরোপের পররাষ্ট্র নীতির মঞ্চে অনেক ভেলকি দেখিয়েছেন। মাত্র ছাব্বিশ দিন হল সুভাষ পৌঁছেছেন বার্লিনে। এত অল্পসময়ে তাঁর মতো একজন সহায়সম্বলহীন নেতার রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করতে পারাটা সোজা ব্যাপার নয়।

আলোচনা নিতান্তই গোপনীয়। কনফারেন্স রুমে একলা সুভাষ বসে আছেন। বাইরে খটাখট বুটের আওয়াজ হল। ঘরে ঢুকলেন রিবেনট্রপ। লম্বা চওড়া ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। হ্যান্ডশেক করার পর সুভাষ তাঁর বক্তব্য লেখা কাগজটা রিবেনট্রপের সামনে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'ভারতের জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ বিরোধিতা আমূলপ্রোথিত। জার্মানির মতো রাষ্ট্র যদি সহায়তা করে তবে মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ সৈন্যকে আমরা সাগর পার করে ছেড়ে দেব।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুভাষকে লক্ষ করে রিবেনট্রপ বললেন, 'এই যুদ্ধ সম্পর্কে মিস্টার গাঁধীর কী মত?'

'সত্যি কথা যদি বলি, তিনি আপস মীমাংসার পথেই চলতে চান। তবে অহিংস পথে হলেও তিনি আজীবন ব্রিটিশের বিরুদ্ধাচরণই করেছেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে একটু নরম হয়েছেন। ব্রিটিশের এই দুঃসময়ের সুযোগ নিতে তিনি অনিচ্ছুক। কিন্তু তাঁর এই নরমপন্থী মনোভাবের জন্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে।'

'সাহায্যের জন্য আপনি জার্মানিকেই বেছে নিলেন কেন?'

'জার্মানি আর রাশিয়ার মৈত্রীতে ভারতীয় জনসাধারণ অত্যন্ত খুশি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন

ঘটানোর জন্য এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। আমাদের মতো দেশপ্রেমিকদের এটাই ধারণা।'

'জার্মানির কাছ থেকে আপনি কী ধরনের সাহায্য প্রত্যাশা করেন?'

'প্রচারের জন্য একটা বেতার কেন্দ্র। আমাদের অস্থায়ী সরকারের প্রতি জার্মান সরকারের স্বীকৃতি। তা ছাড়া একটা ফৌজ গড়ে যুদ্ধে নামতে চাই আমরা। কিন্তু সবার আগে আমাদের একটা জিনিস চাই।'

'কী সেটা?'

'মহাযুদ্ধে জয়ের পর জার্মানি ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকার করবে। এই ঘোষণা এখনই করতে হবে।'

'মিস্টার বোস। জার্মানি এখন প্রচণ্ড সংকটের মধ্যে রয়েছে। তবু আপনার কথাগুলো আমরা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করব।'

রাজকীয় প্রাতরাশ এল। কফি এল। হঠাৎ একটা সংশয় এল রিবেনট্রপের মনে। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'মিস্টার বোস মনে করুন ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সরকার আপনার বিরুদ্ধে মিস্টার গাঁধীকে দাঁড় করালেন এবং তিনি ব্রিটিশের পক্ষে প্রচার শুরু করলেন। তখন আপনি কি করবেন?'

'আমাদের ব্যক্তিগত মতাদর্শ যতই আলাদা হোক না কেন, ব্রিটিশের পক্ষে আমার বিরুদ্ধে গাঁধীজি প্রচার করবেন একথা আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না।'

'আপনি কী আপাতত সুবিধে পাবার জন্য একথা বলছেন?'

'না, গাঁধীজি সম্বন্ধে ভাল করে জানি বলেই বলছি। মতাদর্শের বিরোধ সত্ত্বেও গাঁধীজি সুভাষকে ভালই চেনেন। সেই সঙ্গে ব্রিটিশের স্বরূপও ভালই জানা আছে তাঁর।'

এরপর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করলেন সুভাষ। বললেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ বাহিনীর কয়েক হাজার ভারতীয় সৈন্য জেনারেল রোমেলের হাতে বন্দি হয়েছে। সেই ভারতীয় সৈন্যদের আমার হেফাজতে দিন আপনারা। আমি তাদের মত পরিবর্তন করে তাদের দিয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী সৈন্যদল গড়ে তুলব।'

একসঙ্গে অনেকগুলো ফ্রন্টে যুদ্ধ চলছে। রিবেনট্রপ খুবই ব্যস্ত। আলোচনার মধ্যেই অনেক টেলিগ্রাম, নোটস আর অন্য খবর আসছিল। এ ডি সি, সেক্রেটারিদের দৌড়োদৌড়ি সমানে চলছিল। রিবেনট্রপকে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

'আপনার জন্য আমরা একটা গোপন বেতারকেন্দ্রের ব্যবস্থা শিগগির করছি। আপনি যতদিন চান ততদিন পর্যন্ত অরল্যান্ডো ম্যাজুটার ছদ্মবেশেই থাকতে পারেন। তবে মনে রাখবেন ব্রিটেনের সম্পূর্ণ পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত...'

'সম্পূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আমিও ক্ষান্ত হব না। তবে হের হিটলারের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে দিন।'

'দেখি কী করতে পারি। ফ্যুয়েরার খুবই ব্যস্ত। সময় হলেই তিনি নিশ্চয় আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। তা ছাড়া আমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ তো হবেই।'

প্রথম সাক্ষাতের এই সাফল্যে সুভাষ খুশি হয়ে ট্রট আর রিথকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন। চলার রাস্তার রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাঁর কাছে। অ্যাডাম ট্রট বললেন, 'ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি কেমব্রিজে পড়ার সময় থেকেই আমার প্রিয় প্রসঙ্গ। ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা পর্যন্ত অনেক ভারতীয় দেশপ্রেমিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। কিন্তু তুমি অপ্রতিম।'

'থ্যাঙ্কস। কিন্তু বন্ধু, যেমন করেই হোক একটা কিছু করো যাতে জার্মানি, ভারত সম্পর্কে

তাদের নীতি স্পষ্ট করে ঘোষণা করে। তা হলে আমিও এই ম্যাজুটার ছদ্মবেশ ছেড়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারি। এই লুকোচুরি অসহ্য হয়ে উঠেছে।' সুভাষ বলে ওঠেন।

তিনজনেই পরস্পরের সম্বন্ধে, তাঁদের আসল স্বপ্ন সম্পর্কে জানেন। ট্রট বললেন, 'আলেকজান্ডার, ইদানীং রুডলফ হেসকে কোথাও দেখেছ?'

'না তো। কেন?'

'ইদানীং তাঁকে ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে। একসময় ফ্যুয়েরারের প্রাণের বন্ধু ছিলেন হেস। কিন্তু আজ ক্যাবিনেটে মন্ত্রী থাকলেও তাঁর অস্তিত্ব না থাকার শামিল হয়ে উঠেছে।'

রুডলফের মতো প্রকৃত বন্ধুকে এভাবে দূরে সরিয়ে দেওয়া আলেকজান্ডার রিথকেও ব্যথিত করে। তিনি বললেন, 'আজ ফ্যুয়েরারের আশেপাশে অনেকেই নিজের নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য ঘুরঘুর করছে। কিন্তু রুডলফ ফ্যুয়েরারকে নিঃস্বার্থভাবেই ভালবাসতেন। ফ্যুয়েরারের জন্য তিনি কী করেননি? জেলে গেছেন, অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। কিন্তু আজ তিনি একা।'

'অন্তত হিটলারের রুডলফকে ভুলে যাওয়াটা উচিত হয়নি। ল্যান্ডসবার্গ-এর কেল্লায় জেলে থাকার সময় এই রুডলফই *মাইন কাম্প*-এর ডিকটেশন নিতেন। আসলে সীমাহীন ক্ষমতা পেলে ভাল মানুষও বদলে যায়। স্বৈরতন্ত্রের তো কথাই নেই। পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম, ফ্রান্স—একটার পর একটা শিকার পেয়ে হিটলার আজ রক্তলোভী হায়েনার মতো ছুটছেন। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, বিচারবুদ্ধি কোনও কিছুরই ধার ধারেন না তিনি। জার্মানির বুকের ওপর থেকে এই পাপ যেদিন বিদায় হবে, সেদিনই আসবে জার্মানির সুদিন।'

'যুদ্ধের গতি পরিবর্তন হওয়ার আগেই আমাদের এই ভারতীয় বন্ধুটির কার্যোদ্ধার হওয়া দরকার ট্রট।' ডক্টর রিথ বললেন।

ট্রট হাসলেন। সুরা পান ভালরকমই হয়েছে, তবে মাথা এখনও ঠিক আছে। চোখ বড় বড় করে সুভাষের দিকে তাকিয়ে অ্যাডাম ট্রট বললেন, 'সুভাষ তোমার দেশভক্তি আর নিষ্ঠায় আমরা সত্যিই মুগ্ধ। তোমার লড়াই এখন আমাদেরও লড়াই হয়ে গেছে দোস্ত। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

৬

রিসেপশন কাউন্টার থেকে ফোনে জানাল যে মিসেস তেন্ডুলকর নামে এক মহিলা দেখা করতে চান। তাঁকে ওপরে পাঠিয়ে দিতে বললেন সুভাষ। বেল বাজালে এমিলি দরজা খুলে দিলেন। বসার ঘরে মহিলাটিকে বসিয়ে ভেতরে এলেন এমিলি। কে তেন্ডুলকর? মরাঠি মহিলা এই বার্লিনে! সুভাষ উঠে এসে কাচের মধ্যে দিয়ে দেখলেন। বছর পঞ্চাশ বয়সের এক প্রৌঢ়া জার্মান মহিলা কৌচে বসে রয়েছেন। বব করা চুল ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক, পোশাক পুরোদস্তুর জার্মান। সুভাষকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন মহিলাটি।

'আমি মিসেস তেন্ডুলকর।'

'তেন্ডুলকর?' সুভাষ অবাক।

'আগে আমি ছিলাম ফ্রাউ ফন হারুবাউ। জন্মসূত্রে আমি জার্মান।'

'আর আপনার স্বামী?'

'ডক্টর তেন্ডুলকর। আপনাদের বেলগাঁও-এর তিলকওয়াড়ির লোক। আমার পরিচয় অবশ্য একটু জটিল। আমি একজন লেখিকা। জার্মান ভাষায় কয়েকটি উপন্যাস লিখেছি আমি। অল্পবয়সেই বিধবা হয়েছিলাম। এই যুদ্ধ শুরুর আগেই ড. তেন্ডুলকরের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। পরিচয় আস্তে আস্তে প্রেম হয়ে উঠল। আমরা বিয়ে করলাম। ডক্টর চাইছিলেন আমাকে বেলগাঁওয়ে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে সামাজিক বিয়ের অনুষ্ঠান করতে। বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি বেলগাঁও যাওয়ার পরই যুদ্ধ বাধে। খবর নিয়ে জানতে পারলাম বার্লিনে আসার জন্য বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দু' বছর হয়ে গেলেও আজও এসে পৌঁছননি। প্রভু যিশুর কাছে সবসময় প্রার্থনা করি যেখানেই থাকুন, তিনি যেন ভাল থাকেন।'

হঠাৎ হেসে উঠলেন সুভাষ। ভদ্রমহিলাকে চেনাচেনা লাগছিল। এখন মনে পড়ে গেছে। হেসে বললেন, 'আপনি থাইজি? ঠিক কিনা?' ভদ্রমহিলা হাসলেন এবার। বার্লিনের অনেক ভারতীয় ছাত্র বিশেষ করে মরাঠি ছাত্র তাইজির কাছে খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। প্রয়োজনে তাদের নানারকম সাহায্য করতেন তাইজি। মরাঠি ছাত্ররা তাকে তাইজি অর্থাৎ দিদি বলত। এই তাইজি-ই অন্যদের উচ্চারণে 'থাইজি' হয়ে গিয়েছিল। নিজের আত্মীয়ের মতোই এমিলির সঙ্গে তাইজির পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'সুভাষ, নাম্বিয়ার তোমার খুব কাজে লাগবে।'

'কে? এ. সি. এন. নাম্বিয়ার? কিন্তু তিনি তো বার্লিনে নেই বলেই শুনেছি।'

'যতদূর জানি তিনি এখন প্যারিসে আছেন। ঠিক বলতে পারব না। তবে শুনেছি হিটলারের গেস্টাপোরা নাম্বিয়ারকে সন্দেহ করছিল। এক কাপড়ে বার্লিন ছাড়েন নাম্বিয়ার। এখন অবশ্য তাঁর মন ঘোরানো একটু কঠিন হবে।'

কথা বলতে বলতে সুভাষ বুঝলেন তাইজি বার্লিনে বেশ ভালরকম পরিচিতা। জার্মান রেডক্রশের তিনি একজন কর্ত্রী। তা ছাড়া একসময়ে অনেক নাৎসি নেতাই আসতেন তাঁর কাছে। একবার স্বয়ং অ্যাডলফ হিটলারও তাঁর বাড়িতে খেয়ে গেছেন। বিশেষ করে হেসকে ভাল করেই চিনতেন তিনি। বললেন, 'রুডলফ হেস বলতে গেলে পাগলই একরকম। আদর্শের জন্য সবকিছু করতে পারে সে।'

তাইজি বললেন, 'ডক্টর তেন্ডুলকরের তোমার ওপর খুব শ্রদ্ধা ছিল সুভাষ। আজ যদি তিনি এখানে থাকতেন তো নিশ্চয়ই তোমার পাশে এসে দাঁড়াতেন। তাই তাঁর জায়গায় আমি তোমার কাজে লাগতে চাই। তোমার যে-কোনও অসুবিধের কথা আমাকে বোলো সুভাষ। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব সাহায্য করতে।'

'নিশ্চয় বলব।' সুভাষ বললেন।

স্যুটের দরজায় দাঁড়িয়ে তাইজি বললেন, 'আর একটা কথা মনে রেখো। তোমার এক মা কলকাতায় আছেন। কিন্তু ভুলো না যে তোমার আর এক মা এই বার্লিনেই আছেন।' তাইজির নির্মল হাসিতে সুভাষের চোখ জলে ভরে। সেই চোখের জলের মধ্যে দিয়ে এই জার্মান মায়ের মুখের সঙ্গে মা আর বাসন্তী মায়ের মুখ যেন মিলে যায়।

৭

একদিন মাঝরাতে ট্রট দরজায় ঠকঠক শুনে দরজা খুললেন। সামনে দাঁড়িয়ে সুভাষ। চোখমুখের ভাব ভীষণ খারাপ। গলাও ভেঙে গেছে।

'কী হয়েছে দোস্ত? নিশ্চয়ই সাংঘাতিক একটা কিছু।'

'"বারবোসা" সম্বন্ধে নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার?'

'ও "বারবোসা" মানে রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা। যেতে দাও ইয়ার। ফ্যুয়েরারের অনেক স্বপ্নবিলাসের মধ্যে ওটা একটা। আমি নিশ্চিত যে বাস্তবে এ ধরনের মূর্খামি উনি কখনই করবেন না। যে মাটিতে নেপোলিয়নের মতো বীরকে নাকখত দিতে হয়েছে সেখানে আমাদের এই ক্লাউনটি কি কলকে পাবেন?'

'অ্যাডাম, হামলার দিন তারিখসুদ্ধু ঠিক হয়ে গেছে সেটা জানো?'

'কোন তারিখ?'

'২২ জুন, ১৯৪১।'

ট্রট স্তম্ভিত। একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথা থেকে পেলে এ খবর?'

'জাপানি দূতাবাস থেকে। কলকাতার জাপানি দূতাবাসের সঙ্গে আমার বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল। তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে জাপানের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আমার একটু একটু পরিচয় আছে। সার্জ নামে একজন রাশিয়ান গুপ্তচর এ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে।'

'ঠিক আছে যদি হামলা হয় তো হবে। তোমার তাতে কী?'

'অ্যাডাম, প্লিজ, একথা মুখেও এনো না।' সুভাষচন্দ্রের গলা আরও ভেঙে যায়। 'জার্মানি যদি সত্যিই রাশিয়া আক্রমণ করে তবে আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সত্যি কথা যদি বলি, আমার সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন জার্মানি-রাশিয়ার মৈত্রীকেই ভিত্তি করে।' রাশিয়ার সীমান্ত থেকে ভারত বেশি দূরে নয়। যখন সময় আসবে তখন রাশিয়ার সীমান্ত থেকে ভারত-অভিযান করে ব্রিটিশদের পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য করব, ভেবেছিলাম আমি। তা ছাড়া জার্মানি-রাশিয়ার যুদ্ধ হলে আমাদের দেশের ভেতরেও তার প্রচণ্ড প্রভাব পড়বে। যে মুহূর্তে জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করবে আমাদের দেশের রাশিয়ার অনুগামীরা, আমার মার্কসবাদী বন্ধুরা আমাকে জার্মানির অর্থাৎ শত্রুর এজেন্ট বলে ছাপ মেরে দেবে।'

'কিন্তু উপায় কী?' ট্রট বললেন।

'একটা উপায় আছে। জার্মানি যদি অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ঘোষণা করে।'

'একটার পর একটা জয়ে ফ্যুয়েরারের মাথা বিগড়ে গেছে।' ট্রট বললেন, 'একসঙ্গে দুজন শত্রুর মোকাবিলা কোরো না, বিসমার্কের এই নীতিটা একদম ভুলে গেছেন ফ্যুয়েরার।' একটা করে দিন কাটে আর সুভাষের অস্থিরতা বাড়ে। প্রত্যেকটি দিন, প্রত্যেকটি ঘণ্টা, প্রত্যেকটি মুহূর্ত মহামূল্য। জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করার আগে যেভাবেই হোক ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে জার্মানি সরকারের ঘোষণা পেতেই হবে। বারবার পররাষ্ট্র দপ্তরে যেতে থাকেন সুভাষ।

১৩ মে-র সকাল। হোটেলের দরজার ফাঁক দিয়ে দুটো খবরের কাগজ রোজকার মতোই ঘরের মধ্যেই এসে পড়ল। হেডিং-এ চোখ পড়তেই এমিলি চিৎকার করে উঠলেন, 'সুভাষজি, সুভাষজি।'

সুভাষ তাড়াতাড়ি এসে খবরের কাগজটা হাতে নিলেন। হেডিং পড়ে নিজের চোখকেই যেন

বিশ্বাস হয় না তাঁর। বারবার সেই ভয়ংকর খবরটা পড়তে থাকেন তিনি। খবরটাতে স্তম্ভিত হয়ে যান সুভাষ।

'এমিলি। এর পেছনে কারও একটা শয়তানি চাল আছে।'

'কী চাল?'

'রুডলফ হেসের দেশপ্রেম আর ফ্যুয়েরারের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা সবাই জানে। এই মহাযুদ্ধের ডামাডোলের সময়ে তাঁর মতো লোক স্কটল্যান্ডে উড়ে গেলেন কেন?'

খবরের কাগজটাতে হেসের ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন সুভাষ। চেহারায় দৃঢ়তা ছবিতেও স্পষ্ট। সুভাষ বিড়বিড় করতে থাকেন, 'সত্যি সত্যি হেসের ব্যাপারটা কী? হেস কি নিজে থেকেই গিয়েছেন না হিটলারই পাঠিয়েছেন তাঁকে? ইংল্যান্ড কি হেসকে আশ্রয় দেবে? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

এমিলি বললেন, 'গত কয়েক বছর ধরেই হেসের সম্বন্ধে শুনে আসছি আমি। হিটলারের প্রাণের বন্ধু তিনি। মনে হয় না হিটলার এমনি এমনি ছেড়ে দেবেন তাঁকে। হয়তো ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবার আরও তীব্র করে তুলবেন তিনি। কিন্তু হেসের মতো বিশ্বাসী বন্ধুকে কিছুতেই ত্যাগ করবেন বলে মনে হয় না আমার।'

সেদিন উইলহেলমস্ট্রাসের অফিসে যাওয়ার কথা নয় সুভাষের। তবু হেসের খবর পাওয়ার পরে স্থির থাকতে না পেরে তিনি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। সমস্ত পররাষ্ট্র দপ্তরে একই আলোচনা।

অ্যাডাম বললেন, 'যতটা সোজা মনে হচ্ছে তত সোজা নয় ব্যাপারটা। ঘটনাটা তিনদিন আগেই ঘটেছে।'

'তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ খবরটা তিনদিন চেপে রেখেছিলেন কেন?' সুভাষ প্রশ্ন করলেন। 'অ্যাডাম, হিটলার হেসকে বলির পাঁঠা হিসাবে ব্যবহার করছেন না তো?'

'মনে হয় না।' অ্যাডাম গম্ভীরভাবে বলেন। 'যতই ক্ষমতাপ্রিয়, স্বৈরতন্ত্রী হোক না কেন, প্রত্যেকের মনে কোথাও না কোথাও একটা নরম জায়গা থাকে। রুডলফ হেসের অতীতের সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বেইমানি হিটলার নিশ্চয়ই করবেন না। হেস, হিটলারের বড় কাছের মানুষ।'

'কিন্তু হেসকে ইংল্যান্ডে কে পাঠাল?'

'নিশ্চয় ফ্যুয়েরার। এটা আমার স্থির বিশ্বাস। কিন্তু বেচারির ভাগ্য বিরূপ। হিটলারের পাঠানো প্রস্তাব বিশ্বাস করলেন না চার্চিল। তাই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন তিনি।'

ঠিক তখনই রেডিয়োতে ফ্যুয়েরার-এর গলা ভেসে এল। সুভাষ আওয়াজটা একটু বাড়ালেন। হিটলার বলছিলেন, 'হ্যাঁ। রুডলফ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। অসাধারণ দেশভক্ত তিনি তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু হয়তো যুদ্ধের সময় ক্রমবর্ধমান উদ্বেগে বা অন্য কোনও কারণে তার মাথার ঠিক ছিল না। তাই হয়তো উন্মাদের মতো স্কটল্যান্ডে গিয়ে নির্বোধের মতো শত্রুর ফাঁদে পড়ে গেল। যা হয়েছে, খুবই খারাপ হয়েছে।'

ট্রট আর সুভাষ অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে থাকেন। টেবিলে ঘুসি মেরে সুভাষ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'দেখেছ ট্রট। ব্রিটিশ বোঝাপড়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ায় হিটলার কীভাবে নিজের বিশ্বস্ত সাথিকে জগতের কাছে উন্মাদ বলে ঘোষণা করে হাত ধুয়ে ফেললেন? নিজের স্বার্থের চেয়ে হিটলারের কাছে আর কিছুই বড় নয়।'

অ্যাডামও দারুণ একটা ধাক্কা খেয়েছেন। তিনি বললেন, 'কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে

পারছি না সুভাষ। ডানকার্কে তিন লাখ ব্রিটিশ সৈন্যকে বাঁচিয়ে দিয়েও যে ইংল্যান্ডের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেননি হিটলার, তাকেই বোঝাবার এই খামোখা চেষ্টার মতো মূর্খামি তার মতো একজন দাম্ভিক স্বৈরতন্ত্রী করতে গেল কেন? আর করলই যদি, তার জন্য হেসের মতো বন্ধুকে হাড়িকাঠে ফেলল কেন?'

'কেন তা আমি এখন একটু একটু বুঝতে পারছি।' সুভাষ বললেন।

'কী বুঝতে পারছ?'

'বারবোসা—রাশিয়া অভিযান।'

'তার সঙ্গে হেস-এর ব্যাপারের কী সম্বন্ধ?'

'রাশিয়া অভিযান যে ছেলেখেলা নয়, সেটা ভালই জানেন ফ্যুয়েরার। তাই অভিযান শুরুর আগেই ব্রিটেনের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসতে চেয়েছিলেন তিনি। ব্রিটেনকে হাতে রেখে রাশিয়াকে খতম করার কথা ভেবেছিলেন তিনি।'

সুভাষের বিশ্লেষণ আর সিদ্ধান্ত শুনে অ্যাডাম বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

সারারাত ছটফট করছেন সুভাষ। জার্মানিতে পৌঁছবার পর এমন ভীষণ রাত্রি আর আসেনি। হিটলারের উন্মাদ ইংল্যান্ডপ্রেম, ডানকার্কের দাক্ষিণ্য আর এখন হেসকে বলি দেওয়া—সমস্ত কিছুই কল্পনার বাইরে ছিল তাঁর। কোনও কিছুরই যেন খেই পাওয়া যাচ্ছে না। বারবার মনে হচ্ছে, ব্রিটিশের জেল আর জার্মানির এই গুহা—কোনটা বেশি ভয়ানক। একটা ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো লাগছে নিজেকে।

৮

হিমালয় বেতারকেন্দ্রের সেই আকুল আহ্বান সুভাষ আর এমিলির মনে গুনগুনিয়ে ওঠে। 'প্রিয় সুভাষবাবু! কোথায় আছেন আপনি? আপনার কাছে আমাদের আকুল ডাক পৌঁছচ্ছে কি? বন্ধু, আর আপনি আত্মগোপন করে থাকবেন না। যেখানেই থাকুন, আত্মপ্রকাশ করুন। অনবরত নির্জীব শান্তির মন্ত্রে হাঁপ ধরে গেছে আমাদের। হে দেশগৌরব আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি আপনার দীপ্ত প্রকাশের। তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো। তুমি এসো।'

রাত তখন দশটা। সুভাষ বললেন, 'এমিলি, স্বাধীনতাপ্রেমী এমন কত ইকবাল সিদেই পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের নিষ্ঠা ব্যর্থ হতে পারে না। স্বাধীনতার সূর্যোদয় হবেই হবে। তার আর বেশি দেরি নেই।'

জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় ইকবাল সিদেই-এর সম্বন্ধে জানতে পারা গেছে। ইরানিদের মতো বড়বড় চোখ, ঘন চুল, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। মুগ্ধ করার মতো ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন খুবই নাটকীয়। ইকবাল সিদেই-এর জন্ম শিয়ালকোটে। কলেজে পড়ার সময়েই গদর পার্টিতে যোগ দিয়ে তিনি দেশের বাইরে পালাতে বাধ্য হন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরেছিলেন তিনি। ব্রিটিশ গুপ্তচরদের উৎপাতে তিনি গিয়ে আস্তানা গাড়েন কাবুলে। আমানুল্লা খান যখন কাবুল থেকে বিতাড়িত হন তখন তাঁর সঙ্গে ইতালিতে পালিয়ে যান সিদেই। ইতালি সরকার যাতে আমানুল্লাকে আশ্রয় দেন তাঁর জন্য অনেক কিছু করেন সিদেই। আমানুল্লার আগ্রহে সিদেই আর অজিত সিংকে মুসোলিনি আট বছর আগে রোমে আশ্রয় দেন। এই 'হিমালয়' বেতার কেন্দ্রও ইতালিই সিদেইকে দিয়েছে।

রিবেনট্রপের সঙ্গে বৈঠকের পর বেশ ক'টা দিন কেটে গেলেও কোনও সুরাহা দেখা যাচ্ছে

না। হঠাৎ একদিন অনেক রাতে পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একজন এসে হাজির। ইন্টারকমের মাধ্যমে সুভাষ শুনতে পেলেন, 'উইলহেলমস্ট্রাসেতে ড. রিথ, ড. ট্রট এবং হের ফুর্ট ভাঙ্গলার রয়েছেন। কোনও একটা জরুরি ব্যাপারে এখুনি আপনাকে সেখানে যেতে বলেছেন।'

'এখন? এত রাত্রে। ঠিক আছে। আমি এখুনি তৈরি হয়ে আসছি।' ঘড়িতে তখন এগারোটা বেজে গেছে। এমিলিকে সাবধানে থাকতে বলে সুভাষ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারতীয় বিভাগে দেখা হল তিনজনের সঙ্গে। 'কি ব্যাপার ডক্টর ট্রট? এত রাতে?'

'ঘোষণাপত্র! ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ফ্যুয়েরার অবিলম্বে চেয়ে পাঠিয়েছেন।'

বিস্মিত আনন্দে সুভাষ দেখতে থাকেন। অবশেষে এল সেদিন! অবশ্য খুব যে দেরি হয়েছে তা বলা যায় না। আসার পরে মাত্র দু'টি মাস কেটেছে। কিন্তু এর প্রতিটি মুহূর্ত যেন কাটতে চাইছিল না সুভাষের।

ডক্টর ট্রটের পৃথিবীর নানা দেশের সংবিধান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। তিনিই খসড়া রচনা করছেন। খুঁটিয়ে পড়তে পড়তে সুভাষ উদ্ভাসিত। 'ভারতের স্বাধীনতাকে জার্মানি এবং ইতালি অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। ভারতকে এক শক্তিশালী সংঘরাষ্ট্র হয়ে ওঠার জন্য জার্মানি ও ইতালি সহায়তা করবে। সে রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের উন্নতির অধিকার, জন্মসিদ্ধ অধিকার বলে গণ্য হবে। কী ধরনের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করবেন তা স্থির করার অধিকার থাকবে একমাত্র ভারতের জনসাধারণের। কোনও বৈদেশিক শক্তি তাতে হস্তক্ষেপ করবে না।'

'ডক্টর, ফ্যুয়েরার কবে এ ঘোষণা করবেন?'

'২৪ মে।'

গাড়ি চলেছে এসপ্ল্যানেড হোটেলের পথে। কিন্তু সুভাষের মন উড়ছে নিঃসীম আকাশে। ঘরে ঢুকতেই উদ্বিগ্ন এমিলি প্রশ্ন করলেন, 'কী হল?'

উচ্ছ্বসিত সুভাষ মজা করে বললেন, 'ভোর হলো দোর খোলো, খুকুমণি ওঠো রে। ওঠো খুকুমণি; তাড়াতাড়ি ডিকটেশন নাও।'

ওভারকোটটা খুলেই সুভাষ ভগৎরাম তলোয়ার, শার্দূল সিং কবীশ্বর আর আফগান সীমান্তে অন্যান্য সাথিদের চিঠি ডিকটেশন দিতে থাকেন।

'সীমান্তে সমস্ত পাঠান সহযোগীদের সংগঠিত করে তুলুন। ব্রিটিশদের কোন আস্তানায় কত সৈন্য আছে তার সম্পর্কে ভাল করে খোঁজখবর নিন। আগের চিঠিতে কাবুল আর কান্দাহারের পাহাড়ি এলাকায় বিমান ওঠা-নামার মতো জায়গা চিহ্নিত করতে লিখেছিলাম। সে ব্যাপারে কতদূর কী হল? সেখানে জ্বালানি পেট্রলের ব্যবস্থা করা যাবে কিনা জানাবেন। যোগাযোগের রাস্তাঘাট সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করতে হবে। যত শিগগির সম্ভব এ-সব কাজ করে ফেলতে হবে। পনেরোদিনের মধ্যেই অক্ষশক্তির পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হবে। প্রস্তুত থাকুন।'

চব্বিশ তারিখ কেটে গেল। ভারতের ঈশান কোণে উড়ে বেড়াচ্ছিল সুভাষের মন। এবার সেটা বাস্তবের কঠিন মাটিতে নেমে এল। অ্যাডামের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেন তিনি। কী হল? ঘোষণাপত্রে কবে সই করবেন ফ্যুয়েরার। কোনও উত্তর পান না সুভাষ। অবশেষে একদিন সুভাষের কাছে এলেন অ্যাডাম। তাঁর চেহারা দেখে ভয় পেলেন সুভাষ। কোনও ভূমিকা না করে অ্যাডাম সোজা বললেন, 'সরি সুভাষ। কিছুই হয়নি।'

'এরকম কেন হল?' সুভাষ হতভম্ব।

এমিলি জেগে উঠেছেন। সুভাষের হাতটা ধরলেন তিনি। গত কয়েকদিন সুভাষ যে অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, এমিলির চেয়ে কেউ ভাল জানে না সেটা।

অসহিষ্ণু সুভাষ আবার প্রশ্ন করলেন, 'কী বলেছেন ফ্যুয়েরার?'

'ঘোষণাপত্র ভালই হয়েছে। তবে আপাতত স্থগিত থাক। ভবিষ্যতে দেখা যাবে। এত তাড়াহুড়োর কী আছে?'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সুভাষ। 'পরাশ্রয়ে আরামে দিন কাটানোর মতো ধাত নয় আমার। আমার লক্ষ লক্ষ সহকর্মীরা আমার মুখ চেয়ে আছেন। স্বাধীনতার চিন্তায় অস্থির হয়ে রয়েছেন তাঁরা। কিছু একটা করতেই হবে।'

জেলখানা আর এই হোটেলের মধ্যে তফাতটা কী? প্রত্যেক মুহূর্ত অসহ্য লাগছে সুভাষের। এমিলি শান্ত রাখতে পারছেন না তাঁকে। তিনি নিজেও ভীষণ দমে গেছেন। নাৎসিদের প্যাঁচের গাড্ডায় হাবুডুবু খাচ্ছেন সুভাষ।

যে সমস্ত জার্মান সহযোগী সুভাষের লড়াইকে নিজেদের লড়াই বলে মনে করেন তাঁরাও দারুণ অসন্তুষ্ট। সুভাষ আবার রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁকে বেলজিয়ামে যেতে হবে বলে তিনি সুভাষকে ফুর্টভাঙ্গলারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। ফুর্টভাঙ্গলার একেবারে ষোলোআনা আমলা। উপরওয়ালার তোষামোদ আর নীচের লোকদের দাবড়ে নিজের চাকরি বাঁচিয়ে চলাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

'এইসব দিবাস্বপ্ন দেখে কী লাভ? দেশ সেবাই যদি করতে চান তা হলে রেডিয়োতে প্রচারমাধ্যমেই করতে পারেন সেটা। তার ব্যবস্থা শিগগিরই করা হচ্ছে।' ঠান্ডা গলায় ফুর্টভাঙ্গলার বললেন।

সারাদিন ফুর্টভাঙ্গলারের কথাগুলো জ্বালা ধরাচ্ছে সুভাষের গায়ে। রাতে ছটফট করতে করতে এমিলিকে বলেন তিনি, 'ফুর্টভাঙ্গলারের কথাগুলো কান জ্বালিয়ে দিয়েছে আমার। বলে কিনা আমার কাজ প্রচার আর আবেদন নিবেদন। সুভাষ বোসকে দেওয়ালে পোস্টার লাগাবার ছোকরা ঠাউরেছে। আমিও দেখিয়ে দেব এমিলি। ১৮৫৭-র শহিদদের রক্তে রাঙানো লালকেল্লা আমাকে ডাকছে। সে ডাকে সাড়া আমাকে দিতেই হবে।'

৯

'আমি নিশ্চিত যে ইতালিতে জার্মানির মতো তিক্ত অভিজ্ঞতা হবে না আমার।'

ইতালিতে রোমের একসেলসিয়র হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সুভাষের। মাঝে মাঝে জার্মান রাষ্ট্রদূতও এসে সুভাষের খোঁজখবর নিচ্ছেন। রোম থেকেই সুভাষকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল।

রোমে পৌঁছেই সুভাষ মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে মুসোলিনির সঙ্গে দেখা হওয়াটা দুরূহ ব্যাপার। রোমের জাপানি দূতাবাসের মাধ্যমেও মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করছেন সুভাষ। খাওয়া-দাওয়া, আয়েশ আরাম, সবই ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা না হওয়াতে স্বস্তি পাচ্ছেন না সুভাষ। মুসোলিনির একান্ত সচিবের কাছে বেশ কয়েকবার অনুরোধ পাঠালেন তিনি।

একদিন যুদ্ধ দপ্তর থেকে ফোন এল। 'মিস্টার বোস। আপনি ডিউস-এর জামাই কাউন্ট সিয়ানোর সঙ্গে দেখা করুন।'

'আমি একমাত্র ডিউস-এর সঙ্গেই দেখা করতে চাই।'

'কাউন্ট সিয়ানো ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রী। আজকাল এসব কাজকর্ম তিনিই দেখেন।'

'কিন্তু সিয়ানোকে কি পাওয়া যাবে?'

'এই মুহূর্তে তিনি ভেনিসে আছেন। আজ রাতেই রোমে ফিরবেন।'

সুভাষ একটু চমকে উঠলেন। ফোন নামিয়ে তিনি বললেন, 'কিছু একটা গন্ডগোল হচ্ছে। জার্মানি থেকে রওনা হবার আগে লোথার ফ্র্যাঙ্ক নামে আমার এক বন্ধুর মারফৎ আমি মুসোলিনির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলাম।'

'তা হলে এরকম হচ্ছে কেন?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। আমার বন্ধুটিকে মুসোলিনি বলেছিলেন, সুভাষকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। এখানে এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি।'

সিয়ানোর সঙ্গে দেখা করার আদপেই ইচ্ছে নেই সুভাষের। কিন্তু উপায় নেই। এই ধাপটা না পেরোলে ওপরের ধাপে পৌঁছনো যাবে না। সিয়ানোকে সামনা-সামনি সাক্ষাতে কেমন যেন অনভিজ্ঞ লাগে সুভাষের।

সিয়ানো প্রশ্ন করেন, 'সিদেই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?'

'না তো। কোথায় তিনি? তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি কবে থেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।'

'কয়েকদিন ছুটি নিয়ে বাইরে বেড়াতে গেছেন তিনি। তিনি ফিরে এলে আপনারা দুজনে আলোচনা করে নিন। তারপর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করা যাবে।' সিয়ানো বললেন।

কয়েকদিন পরে সিদেই রোমে ফিরে এসেছেন বলে খবর পাওয়া গেল। পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় একটা ভোজের আয়োজন করেছে। সুভাষ এবং এমিলিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিয়ানোকে স্তাবকরা ঘিরে রয়েছেন। সুভাষ আর এমিলি যখন পৌঁছলেন পার্টি তখন শুরু হয়ে গেছে। সিয়ানো 'ওয়েলকাম ইন্ডিয়ান টাইগার' বলে সুভাষকে স্বাগত জানালেন। পার্টিতেই সুভাষের সঙ্গে ইকবাল সিদেই-র প্রথম দেখা হলেও কথাবার্তা বিশেষ কিছু হল না। সিয়ানোর পরামর্শ অনুযায়ী পরের দিন দুজনের সাক্ষাৎ হবে স্থির হল।

পরের দিন ইকবাল সিদেই দেখা করলেন সুভাষের সঙ্গে। ইতালিতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে এত বছর ধরে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য সুভাষ সিদেইকে অভিনন্দন জানালেন।

আলোচনা চলার সময়ে সিদেই সমানে এমিলির দিকে সন্দেহভরা দৃষ্টিতে দেখছিলেন। শেষ পর্যন্ত সাহস করে এমিলিকে বলেই ফেললেন, 'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। দু' মিনিটের জন্য আপনি যদি একটু অন্য ঘরে যান।'

'ইয়েস অফ কোর্স।' এমিলি উঠে বাইরে গেলেন।

সুভাষকে কিছু বলতে না দিয়ে সিদেই বললেন, 'আমাদের এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় ওই ইউরোপিয়ান মহিলা কেন রয়েছেন?'

'চিন্তা করবেন না মিস্টার সিদেই। ভদ্রমহিলা আমার অন্তরঙ্গ বান্ধবী।'

'কিন্তু ভদ্রমহিলা জার্মান!'

'নেভার মাইন্ড। বললাম তো উনি আমার দীর্ঘদিনের বান্ধবী। ভারতবর্ষকে উনি আমার আপনার মতোই ভালবাসেন। তা ছাড়া ওঁর স্বামী ভারতীয়।'

'স্বামী? কে ওঁর স্বামী?' ইকবাল এবার আরও সন্দেহের দৃষ্টিতে সুভাষের দিকে তাকালেন।

'আমি আপাতত আপনাকে এর বেশি কিছু বলতে পারছি না। আজ শুধু আপনাকে এইটুকুই বলতে পারি যে শি ইজ অ্যাবসলিউটলি রিলায়েব্‌ল।'

সুভাষ এরপরে সিদেইর প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা না করে এমিলিকে আবার আলোচনার

মধ্যে ডেকে নিলেন। সিদেই-এর চোখে অসন্তোষ স্পষ্ট। নিজের মোটা কালো গোঁফে হাত বোলাতে বোলাতে সিদেই বললেন, 'সুভাষবাবু, ভাগাভাগি হবেই।'

'ভাগাভাগি?' কীসের ভাগাভাগি?'

'আমি মুসলমান, আপনি হিন্দু। আমার পাকিস্তান চাই আপনি হিন্দুস্থান নেবেন।'

সুভাষ স্তম্ভিত। অবাক হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মতো দেশভক্তের পক্ষে কি এটা বলা সম্ভব? আপনার কাছ থেকে আমি এটা স্বপ্নেও প্রত্যাশা করিনি। অখণ্ড, স্বাধীন ভারতই আমার স্বপ্ন। এরপর আমাদের সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। আর একটা কথা মনে রাখবেন, ভবিষ্যতে সুভাষ বোসের সামনে পাকিস্তান শব্দটা উচ্চারণ করার দুঃসাহস দেখাবেন না।' সুভাষের গলা রীতিমতো কঠিন।

সিদেই-এর মুখও লাল হয়ে উঠেছে। তিনিও গলা চড়িয়ে বললেন, 'তাই যদি হয় তবে আপনার আর আমার একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। পাকিস্তানের জন্য লড়াইতে আমি মিস্টার জিন্নার সঙ্গেই থাকব।'

'আর আমি লড়াই করব অখণ্ড ভারতের জন্য।' বলতে বলতে সুভাষের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরোয়। হাত মুঠি পাকিয়ে ওঠে। দৃঢ়স্বরে বলেন তিনি, 'ভারতের অখণ্ডতার জন্য প্রয়োজন হলে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হব আমি। যে পর্যন্ত আমার শরীরে প্রাণ আছে, আমার মাতৃভূমিকে ভাগ হতে দেব না আমি।'

আলোচনা ব্যর্থ হল। ইকবাল সিদেই আর তাঁর সচিব ফারুখ খান চলে গেলেন। আজকের এই আলোচনার জন্য কী দারুণ উৎসুক ছিলেন সুভাষ। সমস্ত আশায় ছাই পড়েছে। তিক্ত কণ্ঠে এমিলিকে বললেন, 'ইকবাল সিদেই-এর সম্বন্ধে কী ভেবেছিলাম, আমি আর কী দেখলাম! আমার কল্পনার ছবিটা টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেল।'

নিজের ডেরায় ফিরে সিদেই তাঁর সচিবকে সিয়ানোর জন্য একটা চিঠি ডিকটেশন দিতে লাগলেন। 'মহাশয়ের কথা অনুসারে আমি আজ সুভাষ বোসের সঙ্গে দেখা করে দীর্ঘসময় ধরে আলোচনা করেছি। এই আলোচনায় আমার অনেক ভুল ভেঙে গেছে। আমার মতে তিনি একজন অতি সাধারণ নেতা। এই লোকটি জার্মানি আর ইতালির সঙ্গে চুক্তির কথা বলছে। এখানে ডিউসের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। আমার মনে হয় তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য এখানে ডিউস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার ভিত্তিতে জার্মানির ফ্যুয়েরারের সঙ্গে দেখা করা। আজ পর্যন্ত ফ্যুয়েরার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি। এতে যা বোঝার বুঝে নিন। ওদিকে ভারতে মিস্টার গাঁধী এবং তাঁর কংগ্রেস এই লোকটিকে দল থেকে বার করে দিয়েছে। আমি আবার বলছি, যে আমার ধারণা লোকটি একটি অসফল কিন্তু দুঃসাহসী লোক।'

ডিকটেশন শেষ করে সিদেই এবার সচিব ফারুখ খানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী? চিঠিটা কেমন লাগল?'

'দারুণ' ফারুখ হেসে উত্তর দিলেন। 'পাকিস্তানের বিরোধিতা করার ভাল জবাব দিয়েছেন আপনি।'

'প্রশ্ন শুধু পাকিস্তানের নয় ফারুক। হয়তো কোনওদিন সুভাষ বোসের অখণ্ড ভারতের দাবি আমি মেনে নিতাম। কিন্তু—'

'তা ছাড়াও আর কিছু কিন্তু আছে নাকি স্যার?'

'কাল রাত্রে পার্টির কথা মনে আছে তোমার?' চোখ কুঁচকে সিদেই বললেন। 'ওই পার্টিতে সুভাষকে অভ্যর্থনা করার উৎসাহে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিয়ানো আমাকে সরিয়ে তার পাশের চেয়ারটিতে

ওই ভুঁইফোড় সুভাষকে বসতে দিয়েছিলেন। এত নিঃশব্দে ব্যাপারটা ঘটেছিল যে হয়তো কেউই সেটা খেয়াল করেনি। কিন্তু এর অর্থ অত্যন্ত গভীর। তা হলে গত কুড়ি বছর ধরে যে আমি ইতালিতে আছি সেটা কীসের জন্য?'

১০

রোম নিরাশ করেছে। প্রত্যেকটা দিন যেন গিলে খেতে আসছে। বার্লিন থেকে অ্যাডাম ট্রট খবর পাঠিয়েছেন। জার্মান সরকারের সাহায্যে 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার' খোলা হয়েছে। জার্মান সরকার বাড়তি ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করেছে। কিন্তু এসবই কাটা ঘায়ে মলম লাগানোর চেষ্টা। মন ক্ষতবিক্ষত।

ভারাক্রান্ত মনে সুভাষ আর এমিলি বার্লিনে ফিরলেন। আবার সেই নিরাশা। বন্ধু লোথার ফ্র্যাঙ্ক দেখা করতে এলে মনে হল যা হয়েছে সবকিছু জানেন তিনি।

'এত কাণ্ড করে কি লাভ হল? ডিউস-এর সঙ্গে দেখাটাও হল না।'

'সে বেচারাই বা কী করে বলো?' লোথার মুখে হাসি টেনে এনে বললেন।

'মুসোলিনি বেচারা?'

'বোসো। তুমি রোমে যাওয়ার আগেই রিবেনট্রপের টেলিগ্রাম পৌঁছেছিল সেখানে। সেই তারবার্তায় বলা হয়েছিল এই জটিল ব্যাপারে খমোখা বেশি উৎসাহ ইতালি যেন না দেখায়। এ বিষয়ে ধীরেসুস্থে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

সুভাষ নিস্তব্ধ। ভেতরে ভেতরে কত খেলাই চলছে। চুপ করে শুনে যান সুভাষ। লোথার বলতে থাকেন, 'রোমের পররাষ্ট্র দপ্তরে আমার কিছু পরিচিতদের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি। মুসোলিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তোমার সঙ্গে আলোচনা করে অকারণে তোমাকে গুরুত্ব না দেওয়ার পরামর্শ তাকে দিয়েছে একজন ভারতীয় "দেশভক্ত"।'

'ইকবাল সিদেই।' বিড়বিড় করে বলেন সুভাষ।

'হ্যাঁ তিনি। মুসোলিনির জামাই সিয়ানোর সঙ্গে দারুণ দোস্তি তার। অনেক সময়ই দুজনে একসঙ্গে গোপনে রোমের কিছু কল গার্লের কাছে যান।'

জার্মানির ওপরে মোহ কেটে গেছে সুভাষের। রাশিয়া অভিযান তাঁর স্বপ্নের ওপর রোলার চালিয়ে দিয়েছে। রাগে অধীর হয়ে জার্মান নীতির তীব্র সমালোচনা করে একটা চিঠি সোজা রিবেনট্রপের কাছে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। বুরম্যানের কাছে গিয়েও খুব চেঁচামেচি করলেন। খামোখা এ ঝামেলা ঘাড়ে না নিয়ে সুভাষকে পররাষ্ট্র সচিব কেপলারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন বুরম্যান।

কেপলারের কাছে সুভাষ পৌঁছনোর আগেই রিবেনট্রপকে লেখা তাঁর চিঠি পৌঁছে গেছে কেপলারের কাছে। লাল কালিতে নোট রয়েছে চিঠির ওপর, 'এই উদ্দাম ভারতীয় নেতাটিকে রাস্তায় আনো।' কেপলারের ইংরেজি একেবারেই বিচিত্র ধরনের। সুভাষের জার্মান জ্ঞান কাজ চালানোর মতো হলেও তেমন ভাল নয়। অ্যাডাম ট্রট দোভাষীর কাজ করছেন। দুজনেই আগে থেকেই গরম হয়ে রয়েছেন।

হাতমুঠো করে চড়া গলায় সুভাষ বললেন, 'রাশিয়া আক্রমণের ফলে সারা পৃথিবী জার্মানিকে এক যুদ্ধবাজ দেশ বলে অভিহিত করছে। কোনওরকম নীতির তোয়াক্কা না রেখে এই আক্রমণ করে হিটলার একটা প্রকাণ্ড ভুল করলেন।'

'স্টপ ইট।' কেপলার কড়কে উঠলেন। 'ফ্যুয়েরারের রাজধানীতে বসে তাঁর সিদ্ধান্তকে ভুল বলার দুঃসাহস আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।'

'ঠিক আছে। শুধু একটা কাজ করে দিন। ভারত সম্পর্কে আপনাদের নীতিটা খোলসা করে বলুন। নয়তো "হুকুমশাহির খিদমদগার" বলে মনে হবে নিজেকে। লোকেও চিরকাল সে কথাই ভাববে।'

সুভাষবাবুর চড়া আওয়াজ বাইরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। কেপলারের চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে। একটু সামলে চলার জন্য টেবিলের নীচ দিয়ে সুভাষের পা টিপছেন অ্যাডাম ট্রট।

কেপলার এবার ফেটে পড়লেন। 'বোস আপনি নিজেকে কী ভাবেন? জাপান, ইতালির সমপর্যায়ে অক্ষশক্তির এক অংশ? ভুলে যাবেন না আপনি শুধু একজন ব্যক্তি মাত্র। এমন ভাব দেখাচ্ছেন যে আপনি যেন গোটা একটা বিশাল দেশ।'

'হের কেপলার। আটত্রিশ কোটি পরাধীন মানুষের আক্রোশই রূপ পাচ্ছে আমার কথায়।'

'রাশিয়া অভিযানে তো আপনার আনন্দিত হওয়া উচিত। ক্রেমলিনের পতনের পর আপনি সহজেই দিল্লি পৌঁছতে পারবেন।'

'আকাশকুসুম কল্পনা করছেন আপনি। আমি আপনাদের স্পষ্টই বলছি। এই রাশিয়া আক্রমণই জার্মানির পতনের সূচনা করবে।'

'দ্যাটস এনাফ। স্টপ অ্যান্ড গেট আউট। সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ।' কেপলার রেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

আর সৌজন্যের কোনও অবকাশ নেই। ফাইল হাতে সুভাষ কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন।

ভেতরে কেপলার টেবিলে চাপড় মেরে বললেন, 'ফ্যুয়েরারের সিদ্ধান্তকে ভুল বলে এত বড় সাহস? এক্ষুনি এসপ্ল্যানেড হোটেলে গেস্টাপো পাঠিয়ে কয়েদ করো লোকটাকে।'

'কিন্তু...?'

'কে? কে কিন্তু বলল?' কেপলার চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কে? আলেকজান্ডার তুমি? আহাম্মকের মতো তুমি ফ্যুয়েরারকে ভুল বলার যে দুঃসাহস করে তার পক্ষ নিতে চাইছ?'

'সরি স্যার। কিন্তু বোসের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করা, তাঁকে একজন রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা দেওয়ার আদেশ তো ফ্যুয়েরার নিজেই দিয়েছিলেন। তাই নয় কি? সেইসব আদেশপত্রে আপনি নিজেই স্বাক্ষর করেছেন। আমি তো বলি শুধু আটক কেন? সুভাষকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু স্যার ফ্যুয়েরারের আদেশ পরিবর্তনের আগে তাঁর অনুমতি নেওয়াটা প্রয়োজন নয় কি?'

'বোধহয়, ঠিকই বলছ তুমি।' চুপসে গিয়ে বলেন কেপলার।

এসপ্ল্যানেড হোটেলের সেই সুসজ্জিত স্যুটটা একটা খাঁচা, একটা গুহার মতো মনে হচ্ছে। হিটলারের আসল স্বরূপ মর্মে মর্মে বুঝছেন সুভাষ। রুডলফ হেসের মতো বিশ্বাসী বন্ধুকে উন্মাদ আখ্যা দিয়ে ত্যাগ করতে পারেন যিনি, তিনি সুভাষের প্রতি কতটা ন্যায় বিচার করবেন? ভাবতে ভাবতে চিৎকার করে ওঠেন সুভাষ 'এমিলি এই শয়তানশাহির ওপর আর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই আমার।'

ধীর স্বরে এমিলি বলেন, 'শয়তানশাহির ওপর বিশ্বাস নাই বা থাকল। নিজের ওপর বিশ্বাসের কী হল তোমার?'

'সেটা শতগুণ বেড়ে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতেই হবে। এখানে না হয় অন্য কোনওখান থেকে। আমি করবই এমিলি, লড়াই আমার থামেনি।'

১১
দামামা ওই বাজে

১

'সুভাষজি বাড়িকেই ভালবাসা যায়। যত ভালই হোক হোটেলকে নয়।'

'সেটা সত্যি এমিলি। কিন্তু সমস্যা একটা একটা করেই মেটাতে হবে।' সুভাষ বলছিলেন।

হঠাৎ একদিন 'তাইজি' অর্থাৎ ফ্রাউ হারুবাউ এসপ্ল্যানেড হোটেলে এসেই উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, 'ওঠো ওঠো। তোমাদের বাড়ি সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সেই খবর নিয়েই উইলহেলমস্ট্রাসে থেকে সোজা আসছি আমি।'

'কোথায় পাওয়া গেল?'

'সোফিয়নস্ট্রাসে রাস্তায়। বিরাট বাড়ি।'

'বিরাট তো বুঝলাম, ভাল তো।'

'ভাল মানে? ওরে বাবা ওই বাড়িতে আগে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত থাকতেন।'

ওইদিনই তাইজি আর এমিলিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি দেখতে গেলেন সুভাষ। বাড়ি দেখে সবাই খুশি। একটা দুটো নয়, ত্রিশটি ঘর রয়েছে বাড়িতে। সোফিয়নস্ট্রাসেতে দূতাবাস এলাকার বিশাল বিশাল বাড়ির মধ্যেও এই লাল রং-এর ইমারত নজর কাড়ে সবার। পেছন দিকে সবুজ লন আর বাগান।

আমেরিকা দূতাবাস বন্ধ করে দেবার পর বাড়িটা খালি পড়েছিল। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকেই দেখাশোনা করা হয় এখন। বছর ষাটেকের এক বৃদ্ধা তিনগুচ্ছ ফুল নিয়ে এসে তিনজনকে দিলেন। সুভাষ হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আন্টি, আপনার নামটা কী?'

'অ্যানা। মিস্টার বোস আপনারা কবে থেকে থাকতে আসবেন?' সাগ্রহে জানতে চান বৃদ্ধা।

'খুব শিগগির।'

মিষ্টি করে হাসলেন অ্যানা। মুখে বলিরেখার জাল। তবুও অ্যানার হাসিটি খুব মিষ্টি।

হোটেলে ফিরে আসার পর তাইজিকে খুব গম্ভীর দেখাল। খবরটা অনেক কষ্টে এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন তিনি। আর পারছেন না।

'সুভাষ। ডক্টর তেন্ডুলকরের খোঁজ পাওয়া গেছে।'

'কোথায়?'

'যুদ্ধের মধ্যেই আমার কাছে বার্লিনে আসার জন্য বেরিয়েছিলেন তিনি।'

'তারপর?'

'রাস্তাতেই ব্রিটিশ এজেন্ট জার্মানির গুপ্তচর বলে আটকেছে তাঁকে।'

তাইজির চোখ জলে ভরা। তবু কী বিপুল সংযমে নিজেকে স্থির রেখেছেন তিনি।

তাইজিকে সান্ত্বনা দিয়ে সুভাষ বললেন, 'ভাববেন না তাইজি। একদিন সব কিছু বদলাবে।'

'তাতে আমারও সন্দেহ নেই, সুভাষ। যখন তোমরা ভারতকে স্বাধীন করবে, আমি ডক্টর তেন্ডুলকরের সঙ্গে বেলগাঁও-এর তিলকওয়াড়িতে। তাই তো আজ তোমাদের স্বাধীনতার লড়াই আমারও লড়াই হয়ে উঠেছে।'

সোফিয়নস্ট্রাসেতে এই নতুন বাসায় আসার আনন্দ বেশিদিন টিকল না। আবার অস্থির সুভাষ। এমিলিকে বললেন, 'জার্মানির এই ব্যবহার অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। আমি কি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি নাকি?'

'তা সোজা গিয়ে হিটলারের সঙ্গে দেখা করছ না কেন?'

'আর কত চিঠি দেব? উলটো ঘড়ায় জল ঢালার মতো ব্যাপার এটা।'

'আচ্ছা। তুমি যে এখানে এসেছ সেটা জানেন তো তিনি?' বিষণ্ণস্বরে এমিলি বললেন।

'কী পাগলের মতো বলছ? ফ্যুয়েরারের বিনা অনুমতিতে বার্লিনে মোরগও ডাকে না। যেদিন আমি এখানে পৌঁছেছি, সেইদিনই আমার সব বিবরণ তাঁর টেবিলে পৌঁছেছে। আমার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গেই পররাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। তার পরেই কারা যেন কী সব কলকাঠি নাড়তে শুরু করেছে।'

বার্লিনের টিয়ারগার্টেন এলাকায় লিকটেনস্টাইনআলে রাস্তায় 'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ' 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার' খোলা হয়েছে। জার্মান সরকারের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ সুভাষ ঋণ হিসাবেই নিচ্ছেন। তাঁর নিজের জন্য প্রতি মাসে আটশো মার্ক আর 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার'-এর জন্য বারোশো মার্ক দেওয়া হয়। কয়েক মাস পরে এই অর্থ আরও বাড়ানো হল। 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার'-কে একটা স্বাধীন দেশের দূতাবাসের মর্যাদা দেওয়া হল। যুদ্ধের সময় বার্লিনে কড়া রেশনিং। বড় বড় অফিসাররা এমনকী মন্ত্রীদেরও রেশনের বাঁধা বরাদ্দেই চালাতে হয়। কিন্তু দূতাবাসের মর্যাদা থাকায় সুভাষচন্দ্রের প্রয়োজনমতো রুটি, মাখন বা আর সব জিনিস পেতে অসুবিধে হয় না।

একদিন দুপুরে সুভাষ খেতে বসেছেন। এমিলি পাশে বসে। হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন এমিলি। খাবার ফেলে রেখে সুভাষও তাঁর পেছনে পেছনে এলেন।

'কী হয়েছে? বলো আমাকে।' আদর করে এমিলির মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে সুভাষ বললেন।

'আমাদের বিয়ের কথা একেবারে কাছের তিন-চারজন ছাড়া কেউই তো জানে না। বাকি সবাই কী ভাবছে? তারা ভাববে এই মেয়েটা রাজার হালে থাকার জন্যই এই বিদেশিটার কাছে থাকে। তাদের সেই বিষাক্ত দৃষ্টির কী জবাব দেব আমি?'

'আমরা নিজেরা তো জানি। অন্যে কি ভাবল, তাতে কী আসে যায়?'

'এখানে সমস্ত জার্মান অফিসার ভাবে যে খাবার পাওয়ার লোভেই আমি এখানে পড়ে আছি।'

সুভাষের রোমের কথা মনে পড়ল। ইকবাল সিদেই-এর সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চোখের সামনে ভেসে উঠল আবার। তা ছাড়া এমিলিকে সেইসব উড়ো ফোন।

'উপায় নেই এমিলি। এ যুদ্ধের ফল কী হবে কিছু বলা যাচ্ছে না। কখন কোথায় থাকব আমি নিজেই জানি না। এইটুকু শুধু জানি যে একদিন এই আঁধার রাত কেটে যাবেই। তারপর আমার এই ছোট্ট রানিটাকে হাওড়া স্টেশন থেকে বাজনা বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রা করে বাড়ি নিয়ে যাব আমি।'

সে রাত্রে এমিলির মন ভাল করার জন্য নানান চেষ্টা করতে থাকেন সুভাষ। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করেন সুভাষ। মোটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন এমিলি। হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলেন এমিলি। সুভাষ হকচকিয়ে গেলেন।

'হঠাৎ এরকম পাগলের মতো হাসি কীসের?'

'একটা কথা বলব? যেসব পুরুষের ব্যক্তিত্ব প্রবল, সহজে প্রেমে পড়ে না তারা।'

'আর যদি পড়ে?'

'ওদের মতো পাগল আর কেউ হয় না।'

শুনেই একটা চাপড় মারার জন্য হাত তুললেন। কিন্তু তার আগে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়েছেন এমিলি।

২

'কে এই অরল্যান্ডো ম্যাজুটা?'

'কোনও ইতালিয়ান হবে।'

'ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

জার্মানিবাসী সমস্ত ভারতীয় ছাত্র ছাড়াও যাঁরা সেখানে বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন সবাই একটা হলে জড়ো হয়েছেন। নিমন্ত্রণকর্তা কোনও এক অরল্যান্ডো ম্যাজুটা। উদ্‌গ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করছেন মরাঠি তরুণ নরহরি গণপুলে। দেশে থাকতে তিনি কংগ্রেসের এক কর্মকর্তা ছিলেন। জার্মানিতে ছোট একটা কারখানা আছে তাঁর। উপস্থিত হয়েছেন হবিবুর রহমান, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এন. জি. স্বামী, কেমিস্ট্রিতে ডিগ্রিধারী বালকৃষ্ণ শর্মা এবং আরও অনেক তরুণ। হায়দরাবাদের নবাবের পরিবারের আবিদ হাসান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বার্লিনে এসেছিলেন। তিনিও উদ্‌গ্রীব ম্যাজুটাকে দেখতে।

'যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ভারতে চলে যাওয়া উচিত ছিল।'

'সে তো বটেই। কিন্তু যেতেন কী করে? জাহাজ-টাহাজ সবই তো বন্ধ।'

ফ্রাউ হারুবাউ হলে ঢুকতেই 'তাইজি, তাইজি' রোল উঠল। সবার দিকে মিষ্টি হেসে তাকালেন তাইজি। জার্মানির সব ভারতীয় ছাত্রদের কাছে তাইজি মাতৃসমা। তাইজি অবশ্য খালি আমন্ত্রিত হিসেবে আসেননি। এই সভা যাতে সফল হয় তার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তাইজি এখানে কেন? অরল্যান্ডো ম্যাজুটার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক। রহস্য আরও বাড়ে।

এই সময় গুজরাতি তরুণ এম. আর. ব্যাস বাইরে এলেন। আগে থেকেই তিনি সুভাষচন্দ্রের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছিলেন। ব্যাসের পেছনেই ডিম্বাকৃতি রোল্ডগোল্ডের চশমা পরা, থুতনিতে একটুখানি দাড়ি এক ইতালিয়ান। ব্যাস বললেন, 'ইনিই সিনর অরল্যান্ডো ম্যাজুটা।'

সবাই তাকালেন লোকটির দিকে। সেই মিষ্টি হাসি, মোহিত করা চোখ—একসঙ্গে পাঁচ-ছয়জন চিৎকার করে উঠলেন, 'সুভাষবাবু, সুভাষবাবু!'

আবিদ হাসান দৌড়ে গিয়ে সুভাষের সঙ্গে হাত মেলালেন। সবাইয়ের শরীরে যেন শিহরন খেলে গেল।

'আরে আবিদ? তুমি এখানে?'

'আমি এখন বার্লিনেই আছি, সুভাষবাবু।'

'কী আশ্চর্য! তুমি তো গাঁধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে কলেজ ছেড়ে দিয়ে সবরমতী আশ্রমে থাকতে শুরু করেছিলে?'

'ভেবেছিলাম গাঁধীজি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। গাঁধী-আরউইন চুক্তির পর চোখের জল মুছতে মুছতে আমি জেলের বাইরে এলাম। সেইদিনই রাজনীতি করা ছেড়ে দিলাম। তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য জার্মানিতে চলে আসি আমি।'

এমিলি আর তাইজি সবাইকে কফি দিলেন। সভার কাজ শুরু হল, সুভাষের সঙ্গে আর একজন রয়েছেন। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। গণপুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুভাষবাবু, নাম্বিয়ারকে কোথায় পেলেন আপনি?'

'আমাদের দেশের সমস্যাই টেনে এনেছে ওঁকে।' একটু হেসে বললেন সুভাষ।

সাত-আট বছর আগে নাম্বিয়ার জার্মানিতেই থাকতেন। সাংবাদিক হিসাবে পরিচিতি ছিল তাঁর। পণ্ডিত নেহরু থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় নেতার সঙ্গেই তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। বছর কয়েক আগে গেস্টাপোদের নজর পড়ে তাঁর ওপরে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বার্লিন ত্যাগ করতে হয় নাম্বিয়ারকে।

সবাইকে উদ্দেশ্য করে সুভাষ বলতে লাগলেন, 'এখানে আসার পর শুধু নাম্বিয়ারের সঙ্গে দেখা করার জন্যই প্যারিস যাই আমি। হিটলারের জার্মানিতে আবার পা রাখার কথা কল্পনাও করতে পারছিলেন না তিনি। আমি তাঁকে বোঝালাম যে ভারতকে ভাগ করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবার একমাত্র উপায়, বাইরে থেকে আক্রমণ।'

তৎক্ষণাৎ নাম্বিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কেবল সুভাষবাবুর কথার ওপর ভরসা আছে বলেই এখানে এসেছি আমি।'

তুমুল হাততালি দিয়ে সবাই নাম্বিয়ারকে স্বাগত জানালেন।

সুভাষ বলতে লাগলেন। 'ব্রিটিশের জেলে আটক থাকার সময় থেকেই এক স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী তৈরি করার স্বপ্ন দেখি। এই বাহিনী শুধু স্বাধীনতার জন্যই লড়বে না। আগামী দিনে স্বাধীনতা লাভের পরে এক শক্তিমান, মহান ভারত গড়ে তুলতে আমাদের প্রয়োজন হবে অসংখ্য নির্ভীক, সুদক্ষ কর্মীর। বন্ধুগণ, স্বাধীনতা আসবেই। বিশ্বাস করুন, ভোর হবেই। সেই প্রভাতকে এগিয়ে আনতে হবে আমাদের।'

ভারত থেকে সুভাষের অন্তর্ধানের কথা জার্মানি সব ভারতীয় ছাত্রই জানতেন। কিন্তু তিনি যে এভাবে বার্লিনে হাজির হবেন তা কল্পনাও করতে পারেননি তাঁরা। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন তাঁরা।

সভায় উপস্থিত চৌত্রিশ জনের প্রত্যেকেই এই কর্মযজ্ঞে শামিল হওয়ার অঙ্গীকার করলেন। জার্মান সরকার তাঁদের বেতার সম্প্রচারের একটি বিশেষ চ্যানেল 'ফ্রি ইন্ডিয়া রেডিয়ো'র জন্য বরাদ্দ করেছেন। ভারতের চোদ্দোটি প্রধান ভাষাতেই খবর প্রচারের ব্যবস্থা হল। ব্যাস-গুজরাতি, গণপুলে-মরাঠির—এইভাবে ভাষাগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হল। প্রায় সকলের বয়সই চল্লিশের নীচে। উৎসাহে টগবগ করছেন সবাই।

'আমি সুভাষ বলছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে ধুলো দিয়ে আমি দেশ থেকে চলে এসেছি। কিন্তু বন্ধুগণ। অবিলম্বে ভারতের সীমান্তে হাজির হব আমি। মাতৃভূমির ওপর, আমাদের ঐতিহ্যময় অতীতের ওপর শ্রদ্ধা রাখুন। আস্থা রাখুন নিজেদের ওপর। স্বাধীনতার সূর্য উঠবেই। বিশ্বাস করুন, সেদিনের আর বেশি দেরি নেই।' মধ্যে মধ্যেই সুভাষের এইরকম ছোট ছোট বক্তৃতা প্রচারিত হয়। এই কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচার চলে। ওদিকে ব্রিটিশ গুপ্তচররা

হয়রান। এই কেন্দ্র যে ঠিক কোথায় বুঝে উঠতে পারে না তারা। আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে নির্ভুল আর গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রচারিত হয়।

একদিন বেতার কেন্দ্রে চারজন যুদ্ধবন্দি তাদের বয়ান দেবার জন্য এল। কোনও একটা ক্যাম্প থেকে আনা হয়েছে তাদের। তাদের জিজ্ঞেস করে অনেক খবর জানলেন সুভাষ। জেনারেল রোমেলের ঝটিকা আক্রমণে ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীর তিন নম্বর সাঁজোয়া বাহিনী পর্যুদস্ত। এ ছাড়াও অনেকে বন্দি হয়েছে জার্মান সৈন্যদের হাতে। তাদের মধ্যে থেকে বিশ-পঁচিশজনকে ডক্টর রিথ আর ডক্টর ধাওয়ান ত্রিপোলি থেকে নিয়ে এসেছেন। আরও প্রায় পনেরো হাজার কয়েদি অ্যানাবার্গে আটক রয়েছে। এদের সবাইকে নিজের সঙ্গে পাওয়ার জন্য সুভাষ পররাষ্ট্র দপ্তরে ছুটোছুটি করছেন।

অবিলম্বে সবাই বুঝতে পারল যে সুভাষ জার্মানিতে রয়েছেন। 'ডেলি মেল' আর 'এম্পায়ার নিউজ'-এ বড় বড় হেডিং দিয়ে খবর বেরোল, 'ভারতের কুইসলিং সুভাষচন্দ্র বোস হিটলারের আশ্রয়ে।' খবরে বলা হয়েছে, সুভাষ যে জার্মানির এজেন্ট সে কথাটা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে। আগে থেকেই জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। এই কথা জানতে পেরেই গাঁধীজি সুভাষকে কংগ্রেস থেকে বের করে দিয়েছিলেন। আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলোর বিষোদ্‌গিরণ চলছে পুরোদমে।

সুভাষ খুবই বিষণ্ণ। খবরের কাগজগুলো নিয়ে অ্যাডাম ট্রটের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি।

'এইসব প্রচারের জবাব দিতেই হবে। অ্যাডাম, বন্ধু, কিছু একটা করো।'

'আর কিছুদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই সুভাষ।'

'কতদিন অ্যাডাম? আমার মৃত্যু পর্যন্ত?' একবার শুধু একবার তোমাদের ফ্যুয়েরারের সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করে দাও অ্যাডাম।'

সুভাষের সঙ্গীরা এখন সুভাষকে 'নেতাজি' বলে সম্বোধন করেন। 'আজাদ হিন্দ' নামে একটি সাময়িক পত্র-ও প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। তা ছাড়া স্বাধীন ভারতের কর্মসূচি ঠিক করার জন্য একটা 'যোজনা' কমিটিও তৈরি হয়েছে। একসময় সুভাষের 'ইন্ডিয়ান লিজিয়ন'-কেও স্বীকৃতি দিলেন জার্মান সরকার। এইবার সুভাষ ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের দায়িত্ব নিতে পারবেন। ত্রিশজন যুদ্ধবন্দির একটি ছোট দল ক্যাম্প সিচিলিফেন-উফের-এ এসে পৌঁছেছে বলে খবর পেলেন সুভাষ। তাদের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন সুভাষ। সঙ্গে চললেন এমিলি, আবিদ হাসান আর এন. জি. স্বামী।

সিচিলিফেনের এই ছোট্ট ক্যাম্পটা একটা ব্যারাকের মতো। সেখানে যে জন ত্রিশ যুদ্ধবন্দি আছে তাদের কেউ আজাদ হিন্দের নামও শোনেনি। এদের সামনে বলতে উঠলেন সুভাষ। সেদিন মাত্র তিনজন সৈনিক যোগ দিলেন সুভাষের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন গুরুবচন সিং ম্যাগনেট।

এবার সুভাষের নজর পড়ল অ্যানাবার্গের যুদ্ধবন্দিদের ক্যাম্পের ওপর। ইতিমধ্যে সিচিলিফেনের বাকি সৈনিকরাও তাঁর বাড়িতে আসতে শুরু করেছেন। প্রাথমিক কাজকর্মের জন্য আবিদ, স্বামী আর গুরুবচনকে অ্যানাবার্গ পাঠানো হল। দু'দিনের মধ্যেই সেখান থেকে তাড়াতাড়ি যাবার ডাক এল।

৩

ডিসেম্বর, ১৯৪১। স্থান অ্যানাবার্গ। বার্লিন থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে এই বন্দিশিবির। কনকনে ঠান্ডা। পেঁজা তুলোর মতো তুষার পড়ছে যখন তখন।

আজ দুপুরেই একটা অদ্ভুত খবর এসে পৌঁছেছে। যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সুভাষবাবুর দুই সহযোগী নাকি এখানে আসছেন। সমস্ত শিবিরে চাঞ্চল্য। সর্বত্র ফিসফিস, গুজগুজ। গুজবের সীমাসংখ্যা নেই। সুভাষ কী করে এতদূরে আসবেন? এটা নিশ্চয় জার্মানদের কোনও একটা কারসাজি। কোনও একটা জাল সুভাষকে খাড়া করেছে তারা।

অনেক আশা নিয়ে আবিদ আর স্বামী এসেছেন অ্যানাবার্গে। ব্যারাকের মধ্যে এলেন তাঁরা। সঙ্গে সশস্ত্র জার্মান প্রহরী। ব্যারাকের বন্দিরা ধিক্কারধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাল তাঁদের।

বিরূপ দৃষ্টিতে ঘেন্না উপচে পড়ছে। আবার শ্লোগান উঠল, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। শয়তানের দালালরা বেরিয়ে যাও।' গালিগালাজের তুবড়ি ছুটছে।

'ভাড়াটে দালাল' তো আছেই তা ছাড়াও অকথ্য সব গালিগালাজ। অবশ্য আবিদ আর স্বামী দমে যাচ্ছেন না। সব সহ্য করে ঘুরছেন তাঁরা। এবার আর কথা নয়। ধাক্কাধাক্কি শুরু হল। ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ভয় পেয়ে সশস্ত্র সৈন্যদের দিয়ে চারপাশ ঘিরে রাখলেন তাঁদের। তাতে হল্লা আরও বাড়ল। নিশ্চয় দালাল, তাই তো সশস্ত্র প্রহরীদের দরকার হচ্ছে এদের। এই সন্দেহে অস্থির হয়ে এঁরা দেহরক্ষীদের সরে যেতে বললেন। দুদিন কোনওরকমে সবকিছু সহ্য করে চেষ্টা চালিয়ে গেলেন দুজন। শেষে রাত্রে আলোচনা করলেন দুজনে। নেতাজি না এলে পরিস্থিতি সামলানো যাবে না। নেতাজির কাছে বার্লিনে খবর পাঠানো হল। নেতাজি এলে তাঁকে স্বাগত না হয় নাই জানানো হল অন্তত আর কিছু যাতে না হয় সেটা সুনিশ্চিত করতে আবিদ হাসান, এন. জি. স্বামী আর গুরুবচন সিং ম্যাগনেট রাত্রির প্রচণ্ড ঠান্ডার পরোয়া না করে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরতে লাগলেন। ফল বিপরীত হল। রাত্রেই প্রতিটি ক্যাম্পে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। 'জাল সুভাষ কাল এখানে আসছে। হুঁশিয়ার থাকো। তার ফাঁদে পোড়ো না।' ক্যাম্পে ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে কিছু ব্রিটিশ সার্জেন্ট, কর্পোরাল-ও আছে। তারাও ঘুরছে ক্যাম্পে ক্যাম্পে। ভয় দেখাচ্ছে। 'বেইমানি করলে ঠিক খবর পৌঁছে যাবে দিল্লিতে। দেশে তোমাদের পরিবার উপোস করে মরবে। আর যখন তোমরা দেশে ফিরবে, ফাঁসি দেওয়া হবে তোমাদের। অতএব বেইমানি কোরো না। নিমকের ইমান রাখো।' সমস্ত অ্যানাবার্গ শিবিরে আগামীকাল কী হয় তার প্রতীক্ষা। ঘুম আসছে না বেশির ভাগ লোকের।

১১ ডিসেম্বর, ১৯৪১। সকাল হল। তুষার পড়া বন্ধ হয়েছে। তবে ঠান্ডা আর কুয়াশা জমাট বেঁধে রয়েছে। ক্যাম্পের মধ্যে একটা ছোট মতো সিনেমা হলে আয়োজন হয়েছে নেতাজির সভার। সেখানে যুদ্ধবন্দিদের অনেকেই জমায়েত হয়েছেন। জার্মান মেজর কুর্ট ক্রেপে দশ-বারোজন সান্ত্রি নিয়ে গার্ড অফ অনার দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।

একসময় মোটর এসে থামল। গাড়ি থেকে নেতাজি নেমে এলেন। সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছেন তাঁকে। সভাস্থলে এলেন সুভাষ। হলটা কাঠের তৈরি। কাঠের বাড়িতে ঠান্ডাটা কম লাগে। তাই মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সবই কাঠের। সত্যিই বাইরের তুলনায় ভেতরটা বেশ আরামের। সামনে এত ভারতীয় দেখে খুশি হয়ে ওঠেন নেতাজি। কিন্তু যারা হাজির হয়েছে তারা এসেছে জার্মানির দালাল 'জাল সুভাষ'-কে একটা উচিত শিক্ষা দিতে। সামনে বসা কয়েকজন গলা খাঁকারি দিলেন। সংকেত পেয়েই গলা খাঁকারির ধুম পড়ে গেল। একটুও না

দমে নেতাজি আরও জোরে জোরে বলতে শুরু করলেন। এবার শুরু হল কাঠের ওপর বুটের ঘা। নেতাজির স্বর এবার পঞ্চমে। তিনি বলে চললেন, 'আপনারা শুনুন। আমি জানি আপনারা সবাই দেশকে ভালবাসেন। কোনও বিশেষ কারণে এতদিন জার্মানিতে আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এখন থেকে আমি আর লুকিয়ে থাকব না। অনেক ঝড় সহ্য করে আপনাদের সামনে এসে আমি আজ দাঁড়াতে পেরেছি। অতীতকে ভুলে আজ আপনাদের সবাইকে নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই আমি। আসুন বন্ধুরা শত্রুর দুর্গ আমরা নিষ্প্রদীপ করে দিই।'

নেতাজির কণ্ঠস্বর এখন সপ্তমে। গলা খাঁকারি, বুটের শব্দ সবকিছু ছাড়িয়ে বাজের মতো ফেটে পড়ছে তাঁর গলা। 'বন্ধুগণ, বিনা সংগ্রামে স্বাধীনতা আসবে না। কেউ আমাদের ইচ্ছে করে স্বাধীনতা দেবে না। দয়ার দান হিসাবে স্বাধীনতা আমরাও পেতে চাই না। স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতে হবে আর সেই মূল্য দিতে হবে বীর শহিদদের তপ্ত রক্তে।'

নেতাজির কথার আন্তরিকতায় প্রতিরোধ খানিকটা মিইয়ে এসেছে। বেশ কয়েকজন ভাবতে শুরু করেছেন, 'ইনি সত্যিই সুভাষবাবু নন তো?'

একসময় ভাষণ শেষ হল। অনেক আশা নিয়ে নেতাজি সবার দিকে তাকিয়ে আছেন। এক, দুই করে মাত্র ছ'জন এগিয়ে এলেন। অ্যানাবার্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে ফিরবেন না বলে সংকল্প করেছেন নেতাজি। সে রাত্রে মেজর কূর্ট ক্রেপের বাসস্থানেই থেকে গেলেন তিনি। আবিদ, স্বামী আর গুরবচন খুব লজ্জিত বোধ করছেন। আবিদ তো ক্ষমাই চেয়ে বসলেন। তাঁকে বুঝিয়ে বলেন নেতাজি।

'তুমি ভুল করছ আবিদ। এদের মধ্যে অনেকেই পুরুষানুক্রমে ইংরেজের গোলামি করছে। এই প্রথম আমরা এসেছি তাদের কাছে একটা নতুন ধরনের খবর নিয়ে। মনে রেখো এদের বিশ্বাস যেদিন আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে যাবে সেদিন কোনও শক্তিই আর এদের দমাতে পারবে না। তখন বন্যার মতো তারা শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে দুর্বার বিক্রমে।'

ক্যাম্পে আজ বাজি ধরাধরি চলছে। যিনি এসেছেন তিনি জাল না আসল সুভাষ। একাদশ অশ্বারোহী বাহিনীর মনজিৎ সিংয়ের দুপুর থেকেই জ্বর এসেছে। হঠাৎ রাতে সে ব্যারাকের সামনে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। নিজের সঙ্গীদের গালাগালি দিতে দিতে চেঁচাতে লাগল, 'ওরে, যাঁকে তোরা হিটলারের দালাল বলে ভাবছিস, তিনি সত্যিই সুভাষ।'

'কীসের ভিত্তিতে একথা বলছিস তুই?' এক সহযোগী জিজ্ঞেস করলেন তাকে।

'গুরুর নামে শপথ নিয়ে বলছি আমি। হরিপুরায় তিন ঘণ্টা ধরে আমি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। মঞ্চের একেবারে কাছেই ছিলাম আমি।'

'আর এ লোকটা যদি সুভাষ না হয় তো?'

'তা হলে আমার মাথা নেড়া করে ব্যারাক থেকে তাড়িয়ে দিস।'

মনজিতের কম্পমান স্বর অনেকের মুখ বন্ধ করল। ভুপেন দাস নামে এক বাঙালি সঙ্গীও মনজিৎকে সমর্থন করল। সে বলল, 'তোমরা দেখনি, দুপুরে বলতে বলতে কেঁদে ফেলছিলেন তিনি? আর সত্যিই যদি জাল সুভাষ হতেন, তবে এত গোলমালে কখন পালিয়ে বাঁচতেন। উনি সত্যিই সুভাষ বলেই আজ এখানেই থেকে গেছেন।'

এইবার ব্রিটিশদের ধামাধরারা চাপা গলায় বলাবলি শুরু করল, 'নিমকের ইমান রেখো। রোজ রোজ এইসব নয়া ভড়কিতে ভুলো না।'

নেতাজির চোখে ঘুম নেই আজ। সমানে সিগারেট খাচ্ছেন। সভার ঘটনা গভীর ছায়াপাত

করেছে তাঁর মনে। হঠাৎ একজন আস্তে আস্তে বললেন, 'অ্যানাবার্গ ক্যাম্পে একটা মরাঠা রেজিমেন্ট আছে।' কথাটা কানে যেতেই তড়াক করে উঠে পড়লেন সুভাষ। আবিদ হাসান আর স্বামীকেও ডেকে ওঠালেন। 'আমাকে এক্ষুনি মরাঠা রেজিমেন্টের শিবিরে যেতে হবে।'

প্রধান ব্যারাক থেকে মরাঠা রেজিমেন্টের ব্যারাকটা একটু দূরে। এত রাতে সুভাষ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কথাটা ছড়িয়ে পড়ল ব্যারাকে। সুভাষকে ঘিরে জড়ো হতে লাগলেন তাঁরা। আশাভরা চোখে তাঁদের দিকে তাকিয়ে সুভাষ বলতে শুরু করলেন।

'সর্বস্ব পণ করে নিজের দেশকে কীভাবে ভালবাসতে হয় শিবাজির উত্তরসূরিদের তা শেখাবার দরকার নেই। আমি যখন ভারত থেকে পালিয়ে এলাম তখন কে আমাকে প্রেরণা দিয়েছিল তা কি জানেন আপনারা? ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ। তাঁর আগ্রা থেকে পালানোর বিবরণ বারবার পড়েছি আমি। ১৮৫৭-র বিদ্রোহে যাঁরা লড়াই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই, নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি মরাঠা বীরত্বের উজ্জ্বল সাক্ষ্য রেখে গেছেন। আজ আবার দিন এসেছে, অর্ধেক পৃথিবীর অধীশ্বর ইংরেজদের বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলে ধরার। আসুন বন্ধুরা, উঠুন— আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে মাতৃভূমির হয়ে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে চলুন।'

নেতাজি অনেক বোঝালেন তাঁদের। বলতে বলতে রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। কিন্তু নেতাজির ডাকে একজন মরাঠিও এগিয়ে এল না। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ডেরায় ফিরে চললেন তিনি। মুখে হাসিটুকু লেগে থাকলেও মনের হতাশা চাপা থাকছে না।

সকালে স্নান-পুজো শেষ করে পোশাক পরছিলেন সুভাষ। এমন সময় আবিদ ভেতরে এসে বললেন, 'মরাঠা রেজিমেন্টের কম্যান্ডার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে নেতাজি দেখলেন পুরো মরাঠা রেজিমেন্ট উর্দি পরে, লাইন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নেতাজি আসতেই আকাশ ভরে উঠল তাদের জয়ধ্বনিতে।

'ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ কী জয়।'

'নেতাজি সুভাষচন্দ্র কী জয়।'

'হর হর মহাদেব।'

হঠাৎ এই সমর্থনে নেতাজির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কম্যান্ডার সুভানজি ঘোরপড়ের পিঠে চাপড় মেরে বাহবা জানিয়ে সুভাষ বললেন, 'এত সকালে সবাই তৈরি হয়ে বুক ফুলিয়ে হাজির হয়েছ তোমরা! অথচ কাল রাতে একটা লোকও হ্যাঁ-হুঁ কিছুই বললে না!'

সুভানজির গোঁফের আড়ালে হাসি ফুটল। 'সুভাষজি এটাই আমাদের মরাঠি রীতি। বাঁচি-মরি, যাই করি, একসঙ্গে থাকব। তাই যতক্ষণ না সবাই একমত হচ্ছি ততক্ষণ কিছুই বলিনি আমরা।'

নেতাজি স্থির করেছেন, ব্যারাকে ব্যারাকে গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলবেন। বাইরে বেরোতে যাবেন, এমন সময় খবর এল যে সামনের একটা ব্যারাকে প্রচণ্ড বিরোধিতা হবে। আবিদ হাসান বললেন, 'এইভাবে একলা গেলে বিপদ হতে পারে। শুনছি আপনার ওপর হামলাও হতে পারে।'

গুরবচন বললেন, 'জার্মান সৈন্যরা সঙ্গে থাকুক।'

'আমার দেশের ভাইদের সঙ্গে কথা বলার সময় জার্মানদের উপস্থিতির কোনও দরকার নেই আমার।' সহযোগীদের নিয়ে কাঁটা তারে ঘেরা ব্যারাকের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছেন এমন সময় ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'হিটলারের দালালরা, প্রাণের মায়া থাকলে ভেতরে এস না।'

একটুও বিচলিত না হয়ে নেতাজি এগিয়ে চললেন ভেতরে। গেটে আওয়াজ উঠছে, 'মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ।' তাদের উত্তেজিত করছে ব্রিটিশের ধামাধরা কয়েকজন অফিসার।

সুভাষ হনহন করে এগোচ্ছেন। কয়েক গজ এগোতেই কিন্তু উলটোরকম ধ্বনি শুরু হল।

'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, সুভাষবাবু জিন্দাবাদ।'

'মহাত্মা গাঁধী কী জয়।'

অলক্ষণে কালো বেড়ালটা উধাও। ভেতরে সমস্ত ব্যারাক নেতাজিকে স্বাগত জানাতে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। কাল সিনেমা হলের মিটিংয়ে যারা গলা খাঁকারি দিয়ে বুটের আওয়াজ করেছিল তারাই আজ নেতাজির জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ফুল নেই ক্যাম্পে, তাই গাছের পাতা নিয়ে মালা তৈরি করেছে তারা। মনজিতের ঘটনা আর মরাঠা রেজিমেন্টের খবর ক্যাম্পের পরিস্থিতি আমূল বদলে দিয়েছে। প্রত্যেকটা ব্যারাকে যাচ্ছেন নেতাজি। কথা বলছেন সবার সঙ্গে। সব ক্যাম্পেই চা খেতে হচ্ছে তাঁকে। সাগ্রহে এগিয়ে আসছে তারা। তাদের সেই ভালবাসার ডাক উপেক্ষা করতে পারেন না নেতাজি। সবাই চায় নেতাজির কাছে আসতে। তাদের মধ্যে কেউ চাইছে বন্দিশালা থেকে মুক্তি, কেউ চায় দেশে ফিরতে। কেউ প্রশ্ন করে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিলে দেশে তাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবারের কী হবে। সবার কথা শোনেন নেতাজি।

তিন ঘণ্টা লাগল সম্পূর্ণ ক্যাম্প ঘুরতে। ততক্ষণে আঠেরো মগ চা খাওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ বিনা প্রস্তুতিতে একটা ব্যারাকের সামনে সভা শুরু হয়ে গেল। নেতাজি এবার বলতে শুরু করলেন।

'আমার দেশের ভাইয়েরা। কীসের ভয় করছেন আপনারা। দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন দেশের মাটি আমাদের হবে। স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস শুধু আমরা নেব না, নেবে আমাদের উত্তরসূরিরা। আমাদের, আমাদের সারা জন্ম কেটেছে গোলাম হয়ে। আমাদের পরে যারা আসছে তাদের যাতে জন্ম থেকে এই গোলামির শেকল না পরতে হয়, তার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।'

'নেতাজি ইংল্যান্ডের রাজার নিমক খেয়েছি আমরা। আপনিই বলুন নিমকহারামি করাটা কি ভাল?' একদল প্রশ্ন করে।

'কার নিমক খেয়েছেন বললেন?' পালটা প্রশ্ন করেন নেতাজি।

'ইংল্যান্ডের।'

হো হো করে হেসে উঠলেন নেতাজি।

'বন্ধুগণ। আমার প্রশ্নটা কিন্তু অন্য ছিল। আমি জানতে চাইছিলাম যে নিমকের কথা আপনারা বলছেন সেটা কোথায় তৈরি হয়েছিল? ইংল্যান্ডে না ভারতের মাটিতে? আমাদেরই পুরুষানুক্রমে বাস করা মাটির নুন খাই আমরা। তা হলে এই শয়তানদের কোন নিমকের ইমান রাখব আমরা?'

অ্যানাবার্গ ছাউনির চেহারাই বদলে গেল। ভারতীয় সৈন্যরা দলে দলে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার শপথ নিতে লাগলেন।

সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আবিদ আর স্বামী গাইতে লাগলেন,

হমে সব সুখোঁ কো ভুল জানা পড়ে গা,
ওয়তনকে লিয়ে দুখ উঠানা পড়ে গা,
অয় আজাদ হিন্দি! উঠো

কমর বাঁধো!
ওয়তন লুঠ রহা হ্যায়, বচানা পড়ে গা,
হুক্‌ম নেতাজি কা বজানা পড়ে গা।

৪

'এই মহাযুদ্ধের যজ্ঞ থেকেই স্বাধীনতার যাজ্ঞসেনীকে আবির্ভূতা হতে হবে।' নেতাজি বলছিলেন।

'কিন্তু তার জন্য কিছু একটা করতে তো হবে।' এমিলি বললেন।

'কতদিন হয়ে গেল আমি সমানে বার্লিন আর রোমের কর্তাদের কাছে আমাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা করতে বলছি।'

ফোনটা বেজে উঠল। অ্যাডাম ফোন করছেন। 'অভিনন্দন সুভাষ। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা তোমাকে শিগগির ওখানে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য জাপান সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।'

সে রাত্রেই কেপলারের কাছ থেকে খবর এল যে জাপানের রাজদূত ওশিমা অবিলম্বে সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে চান।

পরদিন সকাল এগারোটায় জাপানি দূতাবাসে গেলেন সুভাষ। বেশির ভাগ জাপানির মতো ওশিমাও খুবই করিতকর্মা লোক। মনে হল তিনি সুভাষের প্রতীক্ষায় ছিলেন। একজন মোটাসোটা জাপানি ভদ্রলোককে দেখিয়ে ওশিমা বললেন, 'ইনি হচ্ছেন কর্নেল ইয়ামামোতো— আমাদের সামরিক অ্যাটাশে।'

সুভাষের সম্ভাষণের উত্তরে, ইয়ামামোতো পরিষ্কার হিন্দিতে বললেন, 'নমস্তে।'

কফি খেতে খেতে এটা ওটা আলোচনার পর ওশিমা আসল প্রসঙ্গে এলেন।

'টোকিয়োর নাকামুরা এলাকায় আর একজন বোস আছেন।'

'তাঁর নাম রাসবিহারী বোস।' নেতাজি হেসে বললেন।

'ঠিক বলেছেন। তিনি কি আপনার আত্মীয়।'

'বিপ্লবী হিসাবে আত্মার আত্মীয় তো বটেই। তবে রক্তের সম্পর্ক নেই।'

ওশিমা আর ইয়ামামোতো হেসে উঠলেন তাঁর কথা শুনে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জাপান সফর, বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ আর রাসবিহারী বোসের দীর্ঘদিন জাপান বাস ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে কথা হল। কর্নেল ইয়ামামোতো জানালেন যে জাপানের কোবে, নাগাসাকি থেকে শুরু করে মালয়েশিয়ার ইপো, পেনাং, সিঙ্গাপুর এমনকী থাইল্যান্ডের ব্যাংককেও 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের' নেতৃত্বে সেখানকার ভারতীয়রা ক্রমশই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আরও সংগঠিত হচ্ছেন। কর্নেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে কথা বলে সুভাষ বুঝলেন ভদ্রলোক শুধু করিতকর্মাই নয়, প্রচুর খোঁজখবরও রাখেন।

'মিস্টার বোস। মনে করুন ভবিষ্যতে জার্মান সরকার যদি রাসবিহারী বোসকে এখানে নিয়ে আসেন তা হলে আপনি কি তাঁর নেতৃত্বাধীনে কাজ করতে রাজি হবেন?'

'নিশ্চয়। রাসবিহারীবাবু সবদিক থেকেই আমার চেয়ে বড়। প্রবীণ বিপ্লবী হিসাবে নেতৃত্ব তাঁর হাতেই থাকা উচিত।' সুভাষ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন।

জাপানিরা সাধারণত প্রথম বৈঠকেই কোনও ব্যাপারের ফয়সালা করে না। প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে

আলোচনা চলল। তিনবার কফি খাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু দুই জাপানির কেউই সুভাষকে ডাকার আসল কারণ সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করছেন না। তাই সুভাষ বৈঠক থেকে বেরোবার সময় নিজেই বললেন, 'মনে করুন, রাসবিহারীকে এখানে না পাঠিয়ে আমাকেই যদি সেখানে ডেকে পাঠানো হয়।'

'আরে হ্যাঁ'— ওশিমা একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন। 'আসলে আমরা আপনাকে এই প্রশ্নটা করার কথাই ভাবছিলাম।'

'আমার উত্তর একই। এক, অভিজ্ঞ বিপ্লবী, বিশেষ করে রাসবিহারীবাবুর নেতৃত্বে কাজ করতে আমার কোনও অসুবিধে নেই।' সুভাষ স্পষ্টই বলে দিলেন।

৫

৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১। মালয়ের আলোরস্টার রেলস্টেশনে ব্রিটিশের পঞ্চদশ রেজিমেন্ট প্রায় কুড়ি ঘণ্টা ওপরওয়ালার আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফিট্‌জপ্যাট্রিক চুরুট টানতে টানতে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গেছে জাপানি ফৌজ শিগগিরই থাইল্যান্ডে ঢুকে পড়তে পারে। তবে কথাটা ঠিক বিশ্বাস হয়নি ফিট্‌জপ্যাট্রিকের। ব্রিটিশবাহিনী জাপানি ফৌজকে একটা মাছির মতোই খতম করে দেবে— বলেই তাঁর বিশ্বাস। সহকারী ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে সে কথাই বলেছেন তিনি।

আলোরস্টার স্টেশন থেকে একটু নীচে পাহাড়ের তলায় বিমানবন্দর। সশস্ত্র বিমানগুলো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। সকালের রোদে তাদের রুপোলি পাখাগুলো চকচক করছে। হঠাৎ মেঘের বুক চিরে গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা গেল। পুরো পঞ্চদশ রেজিমেন্ট হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে। এক ঝাঁক জাপানি 'জিরো' বিমান চিলের মতো ছোঁ মেরে নেমে এল। চোখের পাতা ফেলার আগেই শুরু হল রানওয়ের ওপর বোমাবর্ষণ। মুহূর্তে বিমানগুলোর পেট্রল ট্যাঙ্ক ফেটে আগুনের গোলা ছড়িয়ে পড়ল। আগুন, ধোঁয়া, আওয়াজ— এক মুহূর্তে প্রলয়কাণ্ড। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফিট্‌জপ্যাট্রিক আর মোহন সিংয়ের আদেশে সৈন্যরা পাশের একটা জলায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার কয়েকটা বোমারু ফিরে এল। এবার লক্ষ্য রেলস্টেশন। কিছুক্ষণের মধ্যে রেলস্টেশন ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু তার চেয়ে অনেক ভয়ানক খবর পাওয়া গেল রেডিয়ো সেটে। শুধু আলোরস্টার নয়, একসঙ্গে হামলা হয়েছে জিত্রা, পেনাং, সিঙ্গাপুর, শিংগোরা— অর্থাৎ মালয়ের প্রায় প্রতিটি বন্দরের ওপর। তা ছাড়া জাপানি ফৌজ ফিলিপাইনস, শ্যাম, হংকং, ওয়েক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপেই নেমে পড়েছে।

রেডিয়োতে একটা খবর পেয়ে মেজর মোহন সিং দৌড়ে এলেন কর্নেলের কাছে।

'স্যার, স্যার, পার্ল হারবার...'

'হোয়াট?' লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফিট্‌জপ্যাট্রিককে কেমন যেন অসহায় দেখায়। জলার কাদামাটিই আঁকড়ে ধরেন তিনি। জাপানের এই অতর্কিত অথচ দক্ষ হামলায় সমস্ত পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশবাহিনী পর্যুদস্ত।

আবহাওয়াতেও হঠাৎ পরিবর্তন এল। অঝোরে নামল বর্ষা। একদিকে বর্ষার ঠান্ডা অন্যদিকে জাপানি হামলার ভয়। দুরু দুরু বুকে মালয় আর থাইল্যান্ডের সীমান্ত ধরে জলাজমি আর নদীনালার পথ ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে বিধ্বস্ত সৈন্যেরা। ভয়ে ফিট্‌জপ্যাট্রিকের মোটা

মোটা অসাড় পা যেন চলতে চায় না। মনে হয় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে এই বুঝি জাপানি বোমারু বিমানগুলো মাথার ওপর নেমে আসবে। কিছু পথ চলার পর সত্যি সত্যিই চারটে জাপানি ফাইটার বিমান মেশিনগান থেকে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে ছোঁ মেরে নেমে এল। প্রাণ বাঁচাতে যেখানে সেখানে পালাচ্ছে সৈন্যরা। তাদের সামলে রাখা ফিট্‌জপ্যাট্রিকের ক্ষমতার বাইরে। হঠাৎ বারুদভরতি কয়েকটা লরিতে আগুন লেগে গেল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জঙ্গলের গাছগুলো জ্বলছে। অনেক সৈনিকের পোশাকে আগুন লেগে গেল। করুণ আর্তনাদ করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে তারা।

ধোঁয়াতে কর্নেল সাহেব কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। দিশেহারা হয়ে দৌড়বার সময় একটা বোমার টুকরো খানিকটা চামড়া ছাড়িয়ে নিল তাঁর। আর্তনাদ শুনে মোহন সিং লাফিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। কোনওরকমে খাপ থেকে রিভলবার বার করে মোহন সিংয়ের হাতে দিয়ে কর্নেল বললেন, 'প্লিজ। শুট মি। এ যমযন্ত্রণা আর সইতে পারছি না আমি।' কর্নেলের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে মোহন সিং ব্যাকপ্যাক থেকে ব্যান্ডেজ বার করে ক্ষতস্থানগুলো সাধ্যমতো বাঁধতে লাগলেন। তারপরে তাকে শুইয়ে দিলেন একটা গাছের নীচে। রাত যেন আর কাটতে চায় না।

রেডিয়োতে একটার পর একটা দুঃসংবাদ। মাঝরাতে চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন আক্রাম খাঁ, 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' আর 'রিপলস'— দুটো জাহাজই ডুবিয়ে দিয়েছে জাপানিরা।

জলের বোতলটা মুখের কাছে ধরে ফিট্‌জপ্যাট্রিক বললেন, 'নৌশক্তির বলেই আমরা এতদিন অর্ধেক পৃথিবীতে রাজত্ব করেছি। জলযুদ্ধে কখনও হারিনি আমরা। সব শেষ হতে চলল এবার।'

দু'দিন বিশ্রামের পর আবার শুরু হল যাত্রা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। কাদায় বুট বসে যাচ্ছে, শিরশিরে ঠান্ডায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তারই মধ্যে জাপানি প্লেনের নজর এড়িয়ে চলেছে ক্লান্ত সৈন্যরা। হঠাৎ একটা ডোবার ধারে কয়েকটা লিফলেট দেখতে পেলেন মোহন সিং। হেডিংগুলো পড়ে তার কাদামাখা মুখে অনির্বচনীয় হাসি ফুটে উঠল। 'এশিয়া শুধু এশীয়দের', 'ভারতবর্ষ শুধু ভারতীয়দেরই জন্য' ক্লান্ত শরীরেও উদ্দীপনা লিফলেটের কথাগুলো। কিন্তু কোথা থেকে এগুলো এল এখানে?

ফিট্‌জপ্যাট্রিক তারিফের চোখে মোহন সিংকে দেখছেন। দেরাদুনের সামরিক বিদ্যালয়ে থাকার সময় শাহনওয়াজ বা কিয়ানির মতো ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়নি মোহন সিংয়ের মধ্যে। অন্য সর্দারজিদের মতো লম্বা চওড়া শরীরও নয় তাঁর। শরীরের মধ্যে নজর পড়ে শুধু তাঁর চোখ দুটো। কীরকম একটা মর্মভেদী দৃষ্টি রয়েছে সেই চোখদুটোয়। সযত্নে বাঁধা দাড়ি আর গোঁফের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মুক্তোর মতো দাঁতগুলো। সবসময় হাসি হাসি মুখ তাঁর। কিন্তু ইদানীং তাঁর স্বভাবের পরিবর্তনটা নজরে পড়ে।

কর্নেল ফিট্‌জপ্যাট্রিক বললেন, 'আক্রাম। মোহন সিমস টু বি চেঞ্জড এ লট।'

'কিছুদিন যাবৎ মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। হই হুল্লোড় একদম বন্ধ। ব্রিটিশ অফিসারদের ব্যবহার সম্পর্কে ইদানীং তাকে খুব উত্তেজিত হতে দেখা যায়।'

'আই টু হ্যাভ অবজারভড দ্য সেম।'

মোহন সিংয়ের জন্ম শিয়ালকোট জেলাতে হলেও পাতিয়ালায় মামার বাড়িতেই বড় হয়েছেন তিনি। খুব ছোট বয়সেই তাঁর বাবা মারা যান। মা আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। একদিন তিনিও চলে গেলেন।

প্রায় দশ বছর আগে দেরাদুনের সৈনিক বিদ্যালয় থেকে কমিশনড অফিসার হয়ে বেরোন মোহন। গুরুবক্স সিং ধিল্লোঁ, শঙ্কর রাও থোরাট, আয়ুব খান, এম. জে. কিয়ানি, শাহনওয়াজ খান— এঁরা সবাই মোটামুটি তাঁর সমসাময়িক। মোহন চিরদিনই অন্যদের থেকে একটু আলাদা। অন্যদের চেয়ে বুদ্ধিতে একটু খাটোই মনে হত তাঁকে। তা ছাড়া ওপরওয়ালা অফিসাররা তাকে উদ্ধত বেপরোয়া বলেই জানতেন। অনেক সময়ই তাঁর উলটোপালটা প্রশ্নে বিব্রত হতে হত এইসব অফিসারদের।

জঙ্গলের সঙ্গে জাপানিদের যেন দোস্তি রয়েছে মনে হয়। তাদের মোটা সবুজ রংয়ের উর্দি জঙ্গলে চট করে নজর আসে না। জঙ্গলের সঙ্গে যেন মিশে থাকে তারা। নিতান্ত সাদামাঠা তাদের খাওয়া। সেঁকে নেওয়া শুয়োরের মাংস সঙ্গেই থাকে তাদের। খিদে পেলে তাই খানিকটা ছিঁড়ে খেয়ে নিয়ে আর ঝরনার জল খেয়ে নিয়ে আবার সোৎসাহে চলতে থাকে। কখনও কখনও খরগোশের মাংস পেলে তো আর কথাই নেই। কিছুই আটকাতে পারে না তাদের গতি। দরকার হলে জলের ওপর অস্থায়ী সেতু বানাতে অসাধারণ দক্ষতা তাদের।

তিন দিন তিন রাত চলার পর মোহন সিংদের সঙ্গে তাদের ছত্রভঙ্গ বাহিনীর কিছু সাথির সঙ্গে দেখা হল। তারাই খবর দিল বাহিনীর দুটি প্ল্যাটুনের লোকেরা বন্দি হয়েছে জাপানিদের হাতে।

একটা গাছের নীচে বিশ্রাম নিতে বসেছিলেন মোহন সিং আর আক্রাম খান। ক্ষুব্ধ মোহন সিং বলেন, 'দেখেছ আক্রাম, আমাদের বাঁচবার জন্য একটা ব্রিটিশ বিমানেরও টিকি দেখা যাচ্ছে না।'

'আমরা আর কী করতে পারি মোহন? হেডকোয়ার্টারে বসে সাদাচামড়ার বড় কর্তারা হুকুম দিচ্ছেন আর আমরা লড়াই করে মরছি এখানে।'

'এ রকম ব্যবহার আমার আর সহ্য হচ্ছে না আক্রাম। ব্রিটিশের পক্ষে আমি আর কোনওদিন বোধহয় শামিল হতে পারব না।'

'তার মানে? বিদ্রোহ করবে নাকি?' শঙ্কিত আক্রাম প্রশ্ন করেন।

'বিদ্রোহ তো বটেই। কে জানে এই গোলামির ফাঁস ছিঁড়ে দেশের স্বাধীনতা আমার হাতেই একদিন আসবে কি না?' স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলেন মোহন সিং।

সামনের একটা পাহাড় পেরোবার পর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ চোখে পড়ল। রাস্তাটা একদম নির্জন। দু'পাশের গাছগুলো অনেক জায়গায় রাস্তাটার ওপরে যেন ছাউনি করে রেখেছে। রাস্তাটায় কেমন একটা থমথমে ভাব। হঠাৎ মোহন সিংয়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'সাবধান।' সামনে জাপানিরা লুকিয়ে নেই তো? সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র তো বটেই, খাবারদাবারও ফুরিয়ে এসেছে। জঙ্গলে উপোস করে মরার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করাই ভাল। সবাইকে সতর্ক থাকতে বলে মোহন সিং একা এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আক্রাম আসতে চাইলে তাঁকে নিষেধ করলেন মোহন সিং। মরতে হলে একজন মরাই ভাল। এই বলে এগোলেন মোহন সিং।

পায়ে পায়ে সরু রাস্তাটায় এগোতে এগোতে হঠাৎ সোঁ করে পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। মাটিতে শুয়ে পড়ে স্টেনগানটা বাগিয়ে ধরে চারদিক ভাল করে দেখার আগেই সাত-আটজন জাপানি সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। চারজন মিলে চ্যাংদোলা করে খানিকদূর নিয়ে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল তাকে।

বুকের ওপর স্টেনগান ধরে এক জাপানি সৈন্য হঠাৎ সৈন্যটার মনে কী একটা সন্দেহ হয়। মোহন সিংয়ের ফরসা মুখটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে ওঠে, 'অস্ট্রেলিয়ান?'

জাপানি ভাষা এক বর্ণও বোঝেন না মোহন সিং। হঠাৎ মোহন সিংয়ের মাথা থেকে লোহার হেলমেটটা পড়ে যায়। জাপানিটির নজর পড়ে মোহনের ঝুঁটি বাধা লম্বা চুলের ওপর। হাতের স্টেনগানটা এক সঙ্গীর হাতে দিয়ে পায়ে পায়ে মোহনের একেবারে কাছে চলে আসে সে। হাসিমুখে বুকে একটা খোঁচা মেরে লম্বা চুলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'ইন্ডো-কা? ইন্ডো-কা?'

মোহন সিং হতভম্ব। কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি।

'গাঁধী-কা? গাঁধী-কা?'

হঠাৎ মোহন সিং বুঝতে পারেন। মাথা হেলিয়ে জানালেন তিনি ভারতীয়ই বটে। তাড়াতাড়ি মোহন সিংয়ের বাঁধন খুলে দিয়ে অনেক দিনের হারানো বন্ধুর মতো তাকে জড়িয়ে ধরল জাপানিটি। বাকি জাপানিরাও দারুণ খুশি। মোহন সিং অভিভূত। এবার তিনি তাঁর রেজিমেন্টের সঙ্গীদের ডাক দিলেন। সঙ্গীরা সেখানে এলে জাপানিরা তাদের মাথায় নিজেদের টুপি পরিয়ে দিল। দারুণ খুশি তারা। আহত ফিট্‌জপ্যাট্রিক পাশ থেকে অবাক হয়ে এই অদ্ভুত স্বাগত সমারোহ দেখতে থাকেন।

দুটি জাপানি সৈনিক ভাঙা ভাঙা হিন্দি জানে। তারা মোহন সিংকে অনেক করে বোঝাল যে পূর্ব এশিয়ার মেজর ফুজিয়ারা নামে এক জাপানি অফিসারের উদ্যোগে 'এফ্ কিকন' নামে এক সংগঠন গড়ে উঠেছে। উদ্দেশ্য ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা। মালয় আর থাইল্যান্ডের অনেক দেশপ্রেমিক ভারতীয় যোগ দিয়েছেন এই সংগঠনে। জাপানিরা মোহন সিংকেও যোগ দিতে বলল এই সংগঠনে।

ফুজিয়ারার কাছে খবর গেলে দুজন সঙ্গীকে নিয়ে পরের দিন তিনি এসে হাজির হলেন। আর পাঁচজন জাপানিদের মতোই বেঁটেখাটো, ছোট ছোট চোখ, চ্যাপটা নাক ফুজিয়ারার। তফাত সাহসের। প্রথম সাক্ষাতেই মোহন সিং বুঝে ফেললেন, দুর্জয় সাহস ফুজিয়ারার। তাই চারদিকে যখন যুদ্ধের আগুন জ্বলছে তখন এভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসা কম সাহসের পরিচয় নয়। সামুরাই ঐতিহ্যের ধারক ফুজিয়ারা 'এফ্ কিকন' সংগঠিত করার জন্য দারুণ নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করছেন। একটু পরেই সাদা পাগড়ি মাথায় এক সর্দারজি এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। ফুজিয়ারা পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি প্রীতম সিং।'

'কী করেন ইনি?'

'থাইল্যান্ডের ব্যাংককে থাকেন ইনি। পূর্ব এশিয়ায় বহু শহরেই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস লিগ প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রীতম সিং।'

মালয়ের অনেকগুলো রবার বাগানের মালিক শিখেরা। তাঁরাও এসে পড়লেন এক সময়। বৈঠক শুরু হল। যেখানে বৈঠক হচ্ছে তার আশেপাশের কুটিরগুলিতে উড়ছে লাল সূর্য আঁকা জাপানের পতাকার সঙ্গে ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা। ফুজিয়ারা যখন তার সমস্ত আবেগের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার সম্বন্ধ বলছিলেন, তখন মোহন সিংয়ের মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। একজন ছাড়া সবাই খুশি। খুশি নন শুধু কর্নেল ফিট্‌জপ্যাট্রিক। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে শেলের মতো বিঁধছে।

ফুজিয়ারা বললেন, 'মোহন। আপনাদের আর আমাদের একই শত্রু। আপনাদের দেশ সম্বন্ধে আমি অনেক পড়েছি। ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি আপনাদের দেশ। সংস্কৃতির পীঠস্থান। আজকের জাপানের নবীন উদ্দীপনা আর আপনাদের মহান দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যদি এক হয় তবে সারা পৃথিবীতে আমরা এক নতুন আলো জ্বালব, নতুন পথ দেখাব। এই অল্পসময়ের মধ্যেই

আপনার দেশপ্রেম অনুভব করেছি আমি। আপনি এগিয়ে এসে ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি বাহিনী গড়ে তুলুন।'

'সে কাজ আমার সাধ্যের বাইরে।' মোহন সিং বললেন, 'পূর্ব এশিয়ার সমস্ত অধিবাসীকে এক করে উদ্দীপিত করে তুলতে পারেন একটিমাত্র লোক। নিজের আদর্শের জন্য, অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতার জন্য মহাত্মা গাঁধীর সঙ্গে টক্কর দিতেও পেছপা হননি তিনি। শুনেছি ব্রিটেশের বেড়াজালকেও ফাঁকি দিয়ে তিনি এখন জার্মানিতে রয়েছেন।'

'আপনি কি চন্দ্রা বোস সম্বন্ধে বলছেন। আমরাও তো কবে থেকেই চাইছি যে তিনি এখানে আসুন। এ জন্য জার্মানিতে আমাদের রাষ্ট্রদূত স্বয়ং হিটলারের কাছে অনুরোধ করেছেন।'

কথাটা শুনে মোহন সিংয়ের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

৬

'মনে রাখবেন, সমস্ত পূর্ব গোলার্ধের মধ্যে সিঙ্গাপুর আমাদের দুর্ভেদ্যতম দুর্গ বলে থাকি আমরা।' ফোনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের গলার আওয়াজেই তাঁর মেজাজের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

'ইয়েস স্যার।' জেনারেল ওয়াভেল উত্তর দিলেন।

'মাত্র পনেরো দিন আগে আপনি নিজেই যে কথাগুলো বলেছিলেন, আশা করি সেগুলো মনে আছে আপনার। একবার সেগুলো আবার বলবেন কি?

প্রধানমন্ত্রীর আদেশ। গত্যন্তর নেই। ওয়াভেল মিনমিন করে বলতে থাকেন, 'সিঙ্গাপুর জয় করতে হলে পৃথিবীর যে-কোনও প্রধান শক্তিকে অন্তত ছ'মাস লড়াই করতে হবে।'

আলোরস্টার, কোটাবারুর মতো মালয়ের এক একটি জায়গায় পতন ব্রিটিশের মুখে এক এক পোঁচ কালি লাগিয়েছে। পার্লামেন্টে চার্চিল সাহেব প্রশ্নের বর্ষণে দিশেহারা। স্পষ্টই বুঝছেন তিনি যে এসব জায়গায় বড় রকমের কিছু ভুল হয়েছে। তাই সিঙ্গাপুর সম্বন্ধে সতর্কতায় ফাঁক রাখতে চান না তিনি। শুধু লিখিত আদেশই নয়, রাত্রেই ওয়াভেলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছেন তিনি। তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ, 'সিঙ্গাপুরের প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই চালাতে হবে। দরকার হলে প্রতিটি সেনাপতি সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বেন।'

মালয় প্রায় সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়ে যাবার পর ওয়াভেল সিঙ্গাপুরে ডেরা গেড়েছেন। জাপানের হাতে বেধড়ক মার ভুলতে পারেন না তিনি। দেওয়ালে টাঙানো মানচিত্রটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি।

সিঙ্গাপুর প্রচণ্ড আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। চারদিন আগেই জাপানি নৌবাহিনীর কিছু বোট রাতের অন্ধকারে শহরের একেবারে কাছে এসে পড়েছিল। কখন বোমাবর্ষণ শুরু হয় এই ভয়েই কাঁটা সবাই। বিশেষ করে চীনা, ভারতীয় আর বর্মী নাগরিকরা বেশি সন্ত্রস্ত। বেপরোয়া জীবনে অভ্যস্ত ইউরোপীয়রা অবশ্য এখনও মৌজমস্তি চালিয়ে যাচ্ছেন। রাতে ক্যাবারেগুলোতে রঙিন মাইফেল এখনও চলছে। চলছে সেইসব গরিব চিনে মেয়েদের দেহ ব্যাবসা, সিঙ্গাপুরের লোকেরা যাদের 'ট্যাক্সিগার্ল' বলে।

একটা জাপানি পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে মোহন সিং আর আক্রাম খাঁও ছিলেন। ভোরে আলো ফোটার আগেই আক্রমণ শুরু হল। ইউরোপীয়রা সাগরপাড়ি দিয়ে পালাতে চেষ্টা করছেন। তাদের অনেকের সলিলসমাধি হল জাপানিদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে। সারাদিন সিঙ্গাপুরের

রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলছে। হঠাৎ এক সময় উড়ে এল এক ঝাঁক জাপানি বিমান। বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত করে দিল তারা সিঙ্গাপুরকে। বড় বড় ইংরেজ অফিসাররা পরস্পরকে ভরসা দিচ্ছেন। 'আমেরিকা আজকালের মধ্যেই দুশো বিমান পাঠাচ্ছে।' সে বিমান কোনওদিনই এসে পৌঁছল না। বিমানের অভাবে সিঙ্গাপুরের পতন হল।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২। রবিবার, কিন্তু কোনও চার্চে প্রার্থনার ঘণ্টা বাজেনি। সারা শহরে আগুন আর ধোঁয়া। মানুষ মরেছে পোকামাকড়ের মতো। সারা শহর নেতিয়ে পড়েছে। যুদ্ধ না থামলে শহরের একটা ইটও আস্ত থাকবে না। দীর্ঘদেহী ব্রিটিশ সেনাপতি পার্সিভাল জাপানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

সিঙ্গাপুরে তখনও ব্রিটিশ সৈন্যদের সংখ্যা এক লক্ষের বেশি আর জাপানিদের ত্রিশ হাজার তা সত্ত্বেও 'অজেয়' সিঙ্গাপুরের পতন হল।

৭

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২। সকাল থেকেই ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের দলে দলে সিঙ্গাপুরের ফারের পার্ক ময়দানে নিয়ে আসা হচ্ছে। দুপুর পর্যন্ত প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার যুদ্ধবন্দি ময়দানে এসে গেছে। তাদের মধ্যে পঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ খান আর ক্যাপ্টেন গুরুবক্স সিং ধিল্লোঁও আছেন।

রোদের তেজ বেড়ে চলেছে। যুদ্ধবন্দিরা বুঝতে পারছেন না কেন তাদের এখানে আনা হয়েছে। বিশেষ করে অফিসাররা খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এমন সময় দূর থেকে দৃপ্তভঙ্গিতে মোহন সিংকে আসতে দেখা গেল। প্রসন্ন মুখে প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করতে করতে এগিয়ে আসছেন তিনি। তাঁর দু'পাশে রয়েছে কয়েকজন ভারতীয় আর জাপানি সৈন্য। বা হাঁতে মোটা অক্ষরে ইংরেজজিতে এফ লেখা আর্মব্যাজ। এমন সময় একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'মোহন সিং দুশমনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।' শাহনওয়াজের চোখে আগুন। মোহন সিংয়ের দিকে থুথু ফেলে বললেন, 'বংশের নাম ডোবাল ছেলেটা!'

ময়দানের মাঝখানে হলদে রংয়ের একটি দোতলা বাড়ি। সেখানে কোনও একটা সভার আয়োজন হচ্ছে। মঞ্চের ওপর জাপানের পতাকা উড়ছে। হঠাৎ একজন এসে তার পাশে ভারতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা লাগিয়ে দিল। মঞ্চের সামনে যে সব সৈনিকরা জটলা করছেন তাদের সবারই বাহুতে এফ চিহ্ন দেওয়া ব্যাজ।

দুপুর প্রায় দুটো বাজে। হঠাৎ হর্ন বাজিয়ে অনেকগুলো সামরিক গাড়ি ময়দানে এসে হাজির হল। জাপানি সামরিক পোশাক পরা এক অফিসার গাড়ি থেকে চটপট নেমে মঞ্চের দিকে হেঁটে চললেন। ব্রিটিশ সামরিক অধিকর্তা কর্নেল হান্টও এসে মঞ্চে বসলেন। একসঙ্গে জাপানি আর ব্রিটিশ অফিসারদের মঞ্চে দেখে সবাই বিস্মিত। ব্যাপারটা কী? প্রশ্ন সবার মনে।

মঞ্চে এবার উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল হান্ট। সৈন্যদের নাম লেখা কাগজপত্রের একটা তাড়া তিনি জাপানি মেজর ফুজিয়ারার হাতে দিলেন। তারপর মাইকের কাছে এসে বললেন, 'ব্রিটিশ সম্রাটের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর এইসব ভারতীয় সৈন্যদের আমি জাপান সরকারের কর্তৃত্বে তুলে দিচ্ছি।' শোনামাত্র সভায় কোলাহল শুরু হল। হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বলে হান্ট আবার বললেন, 'আজ পর্যন্ত আপনারা যেভাবে আমাদের আদেশ মেনে এসেছেন, এখন থেকে সেভাবেই জাপানি কর্তৃপক্ষের আদেশ মান্য করবেন।' এইটুকু

বলেই কর্নেল হান্ট বসে পড়লেন তাঁর জায়গায় গিয়ে। ঘোষণা শুনে সমস্ত যুদ্ধবন্দি স্তম্ভিত। গুঞ্জন উঠল চারদিকে।

এইবার মাইকের সামনে এলেন 'এফ্ কিকনের' ভারপ্রাপ্ত জাপানি অফিসার মেজর ফুজিয়ারা। তাঁর দু'পাশে হিন্দি আর ইংরিজির জন্য দুজন দোভাষী কর্নেল গিল আর জাপানি কুনিঝুকা। ফুজিয়ারা বলতে শুরু করলেন। এক এক লাইন বলার পর দোভাষী দুজন ক্রমান্বয়ে তাঁর বক্তব্য তর্জমা করে শোনাচ্ছেন।

'আমার প্রিয় ভারতীয় বন্ধুরা। আপনারা মনে করবেন না যে আমরা আপনাদের যুদ্ধবন্দি হিসাবে গ্রহণ করছি। আমরা এবং আপনারা সবাই এশিয়ার অধিবাসী। আমরা চাই ভারতবর্ষ গোলামির শিকল ছিড়ে ফেলে স্বাধীনতা অর্জন করুক। আমরা মনে করি আপনারা আমাদের ভাই।'

ফুজিয়ারার কথায় ভারতীয় সৈন্যরা হতবাক। সত্যিই কি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবে তারা? ফুজিয়ারা এবার বললেন, 'আমি জাপান সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের ভার তুলে দিচ্ছি জেনারেল অফিসার-ইন-কম্যান্ড মোহন সিংয়ের হাতে।'

এইবার ক্যাপ্টেন মোহন সিং উঠে দাঁড়ালেন। কালো দাড়ির মধ্যে থেকে তাঁর সাদা দাঁতগুলো তাঁর হাসিকে একটা বিশেষ মাধুর্য দিয়েছে। মোহন সিংয়ের আওয়াজ সাধারণভাবেই বেশ ব্যক্তিত্বময়। আজ তাঁর কণ্ঠে আরও বেশি আত্মপ্রত্যয় ঝরে পড়ছে। তিনি বলতে শুরু করলেন এবার।

'বন্ধুগণ। মালয়ের মাটিতে আজ পর্যন্ত আমরা কার জন্য রক্ত ঝরিয়েছি? আমাদের বন্ধুরা প্রাণ দিয়েছেন, পরাজয়ের কালিমা আমাদের কলঙ্কিত করেছে। এ সব কাদের জন্য? ব্রিটিশরা যদি সময়মতো বিমান পাঠাত তা হলে এই হত্যাকাণ্ড কখনওই হত না। আজ থেকে আমরা আমাদের মাতৃভূমির জন্যই রক্ত দেব। আমরা কি আমাদের দেশ গড়ে তুলতে পারি না? কেন আমরা আজও গোলাম। এ সব প্রশ্নের একই উত্তর। এই সবের মূলে একটিই কথা। আমাদের নিজস্ব কোনও সৈন্যবাহিনী নেই। আজ জাপানের মতো শক্তিশালী দেশ আমাদের এই অভাব দূর করার জন্য এগিয়ে এসেছে। আসুন বন্ধুগণ। আমরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেদের ফৌজ গড়ে তুলি।'

বলতে বলতে আবেগে কাঁপতে থাকে মোহন সিংয়ের কণ্ঠ। তাঁর সেই আবেগ সঞ্চারিত হয় উপস্থিত অনেক সৈনিকেরই মনে। তারা মোহন সিংয়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে এক সক্ষম, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ইমানদার দেশভক্তকে। দেশের মুক্তির জন্য কিছু করতে পারার সুযোগের সম্ভাবনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছে তারা।

একসময় সভা শেষ হল। মাইকে ঘোষণা করা হল 'ভারতীয় বাহিনীর সমস্ত মেজর বা আরও উচ্চপদস্থ অফিসারদের মঞ্চে আসতে অনুরোধ করা হচ্ছে।'

শাহনওয়াজের জন্ম ব্রিটিশের প্রতি নিষ্ঠাবান এক ফৌজি পরিবারে। মোহন সিংয়ের ভাষণ তাই তাঁর মনে বিশেষ কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। এইসবই জাপানিদের চাল বলেই মনে হচ্ছে তাঁর। কিন্তু গুরুবক্সের মন খুবই আলোড়িত হয়ে উঠেছে মোহন সিংয়ের কথায়। লেফটেন্যান্ট গুরুবক্স সিং ধিল্লোঁ দশ বছর আগে ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন এক সিপাহি হিসাবে। তাঁর মনে পড়ছে দেরাদুনের সৈনিক বিদ্যালয়ের দেওয়ালে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা বাণীটি—

'সবার ওপরে তোমার জন্মভূমির সম্মান, শান্তি আর সুরক্ষার স্থান। তারপরেই তোমার

অধীনের সৈনিকদের সুরক্ষার গুরুত্ব। সবার শেষে তোমার নিজের সুরক্ষার প্রশ্ন। সবার আগে দেশ, তারপরে তোমার অধীনস্থরা, তার পরে তুমি— গুরুত্বের এই ক্রম কখনও ভুলবে না।' ফৌজে থেকেও গুরুবক্স গাঁধীজি আর কংগ্রেসের চিন্তাধারায় যথেষ্ট প্রভাবিত। আন্তরিকভাবে তিনি চান গাঁধীজি আর জিন্না সাহেব একসঙ্গে বসে নিজেদের মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলুন।

গুরুবক্স শাহনওয়াজকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকম লাগল তোমার শানো?'

'কীসের ব্যাপারে? মোহন সিংয়ের ব্যাপারে না আইএনএ-র ব্যাপারে?' শাহনওয়াজ পালটা প্রশ্ন করেন।

'দুই ব্যাপারেই।'

'এটা কীসের আজাদ হিন্দ ফৌজ? এ তো জাপানের হাতের সুতোবাঁধা পুতুল। এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমরা কি যাদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক, তাদের ওপরে হামলা করব?'

'আরে শানো। বদলে যাওয়া পরিস্থিতির কথা একবার ভাবো। মোহন সিং— আমাদেরই ইউনিটের। দশ বছর ধরে চিনি তাঁকে আমরা। অত্যন্ত কর্মক্ষম লোক।'

'বাট হি ইজ নট একস্ট্রা-অর্ডিনারি।'

'শানো। অনেক সময় পরিস্থিতিই বিশেষ বিশেষ মানুষের হাতে কর্তৃত্ব তুলে দেয়।'

'তোমার কথা যদি মেনেও নিই তবু প্রশ্ন থাকে। ক্যান মোহন সিং বি এবল টু কম্যান্ড ফর্টি ফাইভ থাউজ্যান্ড পিপল?'

'শানো। আমাদের মধ্যে যতই মতবিরোধ থাক, আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতেই হবে।'

'কেন?'

'একবার ভেবে দেখ। স্বাধীনতা যদি নাও পাই, যুদ্ধবন্দি হিসাবে পাথর ভাঙা, রেললাইন বসানোর কাজে বেগার খাটা এসবের চেয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের হয়ে যুদ্ধ করাটা কি ভাল নয়? আমাদের সৈনিকরাও ফুর্তিতে থাকবে।'

মোহন সিং আর ফুজিয়ারার সঙ্গে অফিসারদের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হল। কী যেন এক দৈবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ দেখাচ্ছে মোহন সিংকে। তাঁর প্রতিটি কথায় আজ এক আলাদা ওজন রয়েছে। অফিসাররা চলে যাওয়ার পর মোহন সিং ফুজিয়ারাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা জবরদস্তি আমাকে এই দায়িত্ব দিচ্ছেন না তো? আমি বয়সে, অভিজ্ঞতায়— সব দিক থেকেই অনেকের চেয়েই ছোট। আমি এই পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্যের ভার বহন করতে পারব বলে সত্যিই কী মনে করেন আপনারা?'

মোহন সিংয়ের হাতে একটু চাপ দিয়ে ফুজিয়ারা বললেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে যে সব বিপ্লবীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা কি জন্ম থেকেই অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন? তাঁরাও ছিলেন রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানুষ। কিন্তু দেশের প্রতি অগাধ ভালবাসা, নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা তাঁদের গড়ে তুলেছে। আমি নিশ্চিত যে আপনিও ইতিহাস সৃষ্টি করবেন।'

রাতে অনেক মুসলমান অফিসার এলেন শাহনওয়াজের আস্তানায়। নিসুন ক্যাম্পের বিশ হাজার সৈন্যের ভারপ্রাপ্ত অফিসার জামান কিয়ানি প্রশ্ন করলেন, 'শাহনওয়াজ। জাপানের আশ্বাস কতটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় তোমার?'

'চারপুরুষ ধরে আমরা ব্রিটিশ সরকারের নিমক খেয়েছি। কাজেই জাপানিদের কাছ থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'

'কিন্তু আমাদের কী করা উচিত?'

'যে জাপানিরা আপনাদের নিমকহারামি করতে বলছে, তাদের দিকে বন্দুক উলটে ধরুন। দেখি জাপানিরা এই কাঠপুতলি আজাদ হিন্দ ফৌজ কী করে গড়ে তোলে।'

রাগে শাহনওয়াজ লাল হয়ে উঠেছেন। মুঠো পাকিয়ে উঠেছে তাঁর হাত।

৮

'ইতিহাসকে যদি আমরা সামগ্রিকভাবে দেখি তা হলে প্রথমেই আমাদের যা চোখে পড়ে তা হল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সাম্রাজ্যগুলো সম্প্রসারিত হয়েছে, ক্রমশ সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছেছে তারপর আস্তে আস্তে ধ্বংস হতে শুরু করে একদিন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্যও একই নিয়তি অপেক্ষা করে আছে।'

হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন সুভাষ। তার পরেও বারবার তিনি বলেছেন, 'এই মহাযুদ্ধের আগুন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেবে। টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।' সুভাষের ভবিষ্যদ্বাণী ক্রমশ বাস্তব হয়ে উঠছে। পূর্বপ্রান্তের ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির একের পর এক পতন ঘটছে। সোফিয়নস্ট্রাসেতে আনন্দের হিল্লোল।

পূর্বপ্রান্তের এই বিপর্যয়ে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মধ্যে ছুটোছুটি পড়ে গেছে। জাপানি আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে চলেছে। সুভাষ বোস কোথায় ঠিক বুঝতে পারছেন না তারা। যদি সুভাষ জাপানি ফৌজের সঙ্গে ভারতে এসে পৌঁছন তা হলে অনর্থ হবে। ব্রিটিশ বিরোধীরা প্রচণ্ড শক্তি পাবে। তাই ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাদের ব্যাপক ধরপাকড় চলছে। রোজ রোজ নতুন নতুন খবর পৌঁছচ্ছে নেতাজির কাছে। তাঁর আত্মীয়স্বজনের পেছনে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা লেগে রয়েছে। মেজদাকে গ্রেফতার করে দক্ষিণ ভারতে আটক রাখা হয়েছে। শার্দূল সিং কবীশ্বরকে পঞ্জাবে আটকের কেল্লায় কয়েদ করা হয়েছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি যেদিন সিঙ্গাপুরের পতন ঘটল সারারাত ঘুমোননি নেতাজি। ভারাক্রান্ত স্বরে এমিলিকে বললেন তিনি, 'এই সময় যদি আমি পূর্বপ্রান্তে থাকতাম কী ভালই না হত? জাপানি আক্রমণ যাতে ভারতের জনতার সমর্থন না পায় তাই ব্রিটেন, চিনের রাষ্ট্রপ্রধান চিয়াং কাই শেক-এর ভারতসফরের ব্যবস্থা করেছে।

জার্মানিতে আর মন বসছে না নেতাজির। পূর্ব রণাঙ্গনে পৌঁছনোর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন তিনি। 'যথেষ্ট হয়েছে এই ইতালিয়ান ম্যাজুটার ছদ্মবেশ। আত্মপ্রকাশ করার শুভ মুহূর্ত এসে গেছে সিঙ্গাপুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে।' সহযোগীদের বললেন তিনি। সেই রাত্রেই আজাদ হিন্দ রেডিয়োর বার্লিন কেন্দ্রে গিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য আহ্বান জানালেন, 'বন্ধুগণ। এই মহাযুদ্ধে আপনাদের হারাবার মতো শুধু একটা জিনিসই আছে। সেটা হচ্ছে দাসত্বের শৃঙ্খল। আজকের পরিস্থিতির সুষ্ঠু বিশ্লেষণ করলে যে জিনিসটা আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা হল পরাধীনতা থেকে মাতৃভূমির অবশ্যম্ভাবী মুক্তি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই এবং সেটা হবে অবিলম্বে।'

টোকিয়ো থেকে কোনও খবর আসছে না বলে নেতাজি ক্রমশই আরও অস্থির হয়ে উঠছেন। হিটলারের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। কিন্তু সুভাষের প্রতিটি দাবি জার্মান সরকার মেনে নিচ্ছে। বিশেষ ভারতীয় বিভাগ খোলা হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের দপ্তর বিশেষ দূতাবাসের মর্যাদা পেয়েছে। প্রাসাদোপম বাসস্থান দেওয়া হয়েছে সুভাষচন্দ্রকে। যখন তখন প্যারিস, রোম বা ইউরোপের

অন্য কোথাও যাবার সুবিধের জন্য খাস বিমানের ব্যবস্থা রয়েছে। হিটলারের প্রত্যক্ষ সম্মতি ছাড়া এ সব সম্ভব নয়। কিন্তু এত সুযোগ সুবিধে সত্ত্বেও পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে সুভাষেরও অস্থিরতা বাড়ছে। এমিলিকে কতবার বলেছেন তিনি, 'এমিলি, শিগগিরই যদি আমার জায়গায় না যেতে পারি, পাগল হয়ে যাব আমি।'

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ক্রিপসের নেতৃত্বে একটি দল ভারতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই খবরের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে এম. আর. ব্যাস হাজির হলেন নেতাজির কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'ভারতকে সত্যিই কি স্বাধীনতা দিতে চায় ব্রিটিশ?'

'সত্যি যদি সে ইচ্ছে থাকে তবে দিল্লি যাওয়ার প্রয়োজন কী? একমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টেই এই প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে। ক্রিপস মিশনের আসল মিশন যদি কিছু থাকে তা হলে সেটা হল ভারতীয় নেতাদের আর ভারতীয় জনতার চোখে ধুলো দেওয়া।' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন নেতাজি। তারপরেই আজাদ হিন্দ রেডিয়োর জন্য বিবৃতি তৈরি করতে বসে গেলেন। 'পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছে নিজের ভাবমূর্তি অমলিন রাখার জন্য আমার বন্ধু জওহর এই সমঝোতার প্রস্তাবে হয়তো সম্মতি দেবেন। গাঁধীজির অহিংসবাদী কোমল মন হয়তো ব্রিটিশকে দুঃখ দিতে চাইবে না। কিন্তু প্রকৃতই যেটা প্রয়োজন সেটা হল সাইমন কমিশনের মতো ক্রিপস মিশনকে "ক্রিপস গো ব্যাক" বলে ফিরিয়ে দেওয়া।' শুধু একদিন নয়— ক্রিপস মিশনের উদ্দেশ্য, কৌশল সব কিছু বিশ্লেষণ করার জন্য একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান শুরু হল আজাদ হিন্দ বেতারে।

২৫ মার্চ, ১৯৪২। রাত তখন প্রায় দেড়টা। সেক্রেটারি ব্যাস তাঁর কাজ সেরে কখন চলে গেছেন। পাচক রুডলফও শেষবারের মতো কফি তৈরি করে রেখে চলে গেছে। এমিলি ঘুমিয়ে পড়েছেন। সুভাষ তখনও কাজ করে চলেছেন। হাতের কাজটা শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে দেবার আগে শেষবারের মতো একবার রেডিয়োটা খুলে বি বি সি ধরলেন। খবর পড়া হচ্ছে। হঠাৎ নিজের নাম শুনে সজাগ হয়ে উঠলেন নেতাজি। তিনি ব্যাংকক থেকে টোকিয়ো যাচ্ছিলেন। 'ভারতের বিপ্লবী নেতা সুভাষ বোস আজ দুপুরে একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।' শুনেই অস্থির হয়ে উঠলেন নেতাজি। এমিলিও জেগে উঠলেন এই সময়। নেতাজির অস্থির মুখের দিকে তাকিয়ে এমিলি প্রশ্ন করলেন, 'হঠাৎ কী হল তোমার?'

'এইমাত্র আমার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়েছে বি বি সি-তে।'

'যেতে দাও না। এই সব গুজব ছড়ানো ছাড়া আর কী করতে পারে ওরা?'

'এমিলি, আমি ভয় পাচ্ছি অন্য কারণে।'

'কারণটা কী?'

'এই খবর শুনে আমার মা'র মনের অবস্থাটা কী হবে? তিনি কি এ খবর সহ্য করতে পারবেন?'

এবার এমিলিও চিন্তায় পড়লেন। মা এমনিতেই ভাল নেই। শরৎবাবুও সেখানে নেই। নেতাজি ড্রাইভার স্পাইরককে ডেকে ব্যাসের কাছে পাঠালেন। নেতাজির চোখ দিয়ে জল পড়ছে। নিজেকে সামলাতে পারছেন না তিনি। এ রকম কেন করছে ব্রিটিশ? এমিলি বললেন, 'এটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এইসব খবর ছড়িয়ে তুমি সত্যি কোথায় আছ তার হদিশ করাই এদের উদ্দেশ্য।'

একটু পরেই ব্যাস এসে পড়লেন। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান ডি এন বি রেডিয়ো আর জাপানের ডোমেই সংবাদ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনি। সকাল সাড়ে

ছ'টার সময় সারা পৃথিবীতে খবর ছড়িয়ে পড়ল। 'বিখ্যাত ভারতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র বোস জার্মানিতে নিরাপদে আছেন। বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলছেন। দিশেহারা শত্রুপক্ষ তাঁর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করছে। ভারতবর্ষের জনতা এ সব সংবাদে বিচলিত হবেন না। যথাসময়ে সুভাষচন্দ্র বোস তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করবেন। আজ মধ্যরাত্রে সুভাষচন্দ্রের সহযোগী নাম্বিয়ার এই সংবাদ জানিয়েছেন।'

রেডিয়োতে এইটুকু শোনার পরেই সুভাষ বিছানায় শুতে গেলেন। এমিলি শুনতে থাকেন বাকি খবরটুকু। এই মিথ্যে খবর ভারতে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। গভীর দুঃখের সঙ্গে গাঁধীজি সুভাষের মায়ের কাছে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এ খবর যে মিথ্যে তাও স্পষ্ট হয়ে গেছে। একটি সংবাদ সংস্থা সুভাষচন্দ্র যে জীবিত রয়েছে সে খবর পাওয়ার পরে তাঁর মায়ের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারও প্রচারিত করেছেন। সুভাষকে ঘুম থেকে তুলে এমিলি এই খবরটা সঙ্গে সঙ্গেই দিলেন তাঁকে।

সুভাষের মনে এখন নতুন উদ্দীপনা। সেই রাত্রেই আজাদ হিন্দ রেডিয়ো কেন্দ্রে গিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। চোখের সামনে আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত দেশজননীর বিষণ্ণ মূর্তি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি। পরাধীনতার শৃঙ্খলে নিপীড়িত কোটি কোটি দেশবাসীর মনে আশ্বাস জাগানোর জন্য বলতে থাকেন তিনি।

'আমি সুভাষচন্দ্র বোস। হ্যাঁ বন্ধুগণ, আমি জীবিতই আছি। এই মুহূর্তে আজাদ হিন্দ রেডিয়োর বার্লিন কেন্দ্র থেকে কথা বলছি আমি।'

'গতকাল রাত থেকে শত্রুরা রেডিয়োতে আমার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করে চলেছে। এই মিথ্যে প্রচার তাদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছে। আমি আপনাদের স্পষ্ট করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। ব্রিটিশের একমাত্র উদ্দেশ্য নিজেদের সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পদের নির্বিচার এবং নির্বিবাদ ব্যবহার। এ জন্য তাদের প্রয়োজন আমাদের এই বিশাল দেশকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলা। ব্রিটিশ কোনওদিনই নিজে থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে না। ডিভাইড অ্যান্ড রুল-নীতি তাদের হাতিয়ার। এই নীতির প্রয়োগে শয়তানও তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই ব্রিটেনেরই অংশ আয়ারল্যান্ডকে তারা টুকরো করেছে। টুকরো করেছে প্যালেস্তাইনকে। এই শাসকের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার আশা পাগলামি মাত্র।'

'তাদের এই বিষাক্ত নীতির বাস্তবায়নের জন্যই ক্রিপস মিশনের ভারতে আসা। কাল ক্রিপস প্রশ্ন করবেন, "মুসলিম লিগ কী ভাববে? অনুন্নত সম্প্রদায়ের কথা তো ভুললে চলবে না।" কিন্তু এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ক্রিপসের কী অধিকার? আমরা ঐক্যবদ্ধ নেই এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করবার আগে ব্রিটিশ বিদ্বজ্জনরা যদি নিজেদের ইতিহাসের পাতা উলটে দেখেন তো ভাল করবেন। আপনাদের খ্রিস্টীয় সালতারিখ গোনা শুরু হওয়ার তিনশো বছর আগে মহান সম্রাট অশোকের অধীন ভারত ছিল ঐক্যবদ্ধ। তখন অখণ্ড গ্রেট ব্রিটেনের জন্মও হয়নি। আমাদের দেশকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা করবেন না। বিভেদের বিষবৃক্ষ রোপণ করবেন না। আমাদের প্রাণ থাকতে আপনাদের এই ভয়ংকর খেলা সফল হতে দেব না আমরা।'

৯

২০ মার্চ, ১৯৪২। আকাশ ভেঙে পড়ছে। প্রচণ্ড বর্ষণে টোকিয়ো বিপর্যস্ত। পেনাং, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর আর ইপো থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অনেক প্রতিনিধি এসে জড়ো হয়েছেন টোকিয়োতে। চিন্তাক্লিষ্ট মোহন সিং ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। স্বাগত কক্ষের অপারেটরের ওপর খিঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'জলদি এয়ারপোর্টে ফোন করে জিজ্ঞেস কর—'

'স্যার প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর যোগাযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু আজ কোনও বিমানই এসে পৌঁছয়নি।' অপারেটরের গলায় চাপা বিরক্তি।

'মোহন আর কতক্ষণ এভাবে পথ চেয়ে থাকতে হবে?' ব্যারিস্টার রাঘবন প্রশ্ন করেন।

'আর কী করার আছে? জ্ঞানী প্রীতম সিং, আর ক্যাপ্টেন আক্রাম খান— আমাদের এই দুজন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ওই বিমানে আছেন।'

রাতেও সমানে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। বিমানের কোনও খবর নেই। হয়তো খারাপ আবহাওয়ার জন্য বিমান অন্য কোথাও নেমে পড়েছে।

পরের দিন টোকিয়ো পরিষদের অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল। রাঘবন, মেনন, এস. সি. গোহো-র মতো নেতারা রয়েছেন উপস্থিত দেড় হাজার প্রতিনিধির মধ্যে। সভাপতি রাসবিহারী বসু। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আনন্দমোহন সহায়, এ. এম. নায়ার, নিরঞ্জন সিং গিল প্রমুখ টোকিয়োবাসী গণ্যমান্য ভারতীয়রা।

হনসুদ্বীপে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের খবর এসে পৌঁছনোর পর থেকে মোহন সিংয়ের চিন্তা আরও বেড়েছে। তারপর এল সেই দুঃসংবাদ। ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে বিমানটি ধ্বংস হয়ে গেছে। শহিদ হয়েছেন আক্রাম খান আর প্রীতম সিং। সভা শোকাচ্ছন্ন। রাসবিহারীর চোখের জল আর থামছে না। ন'দিন ধরে পরিষদের অধিবেশন চলল। তবে এ মৃত্যুর ছায়া এক মুহূর্তের জন্যও সরল না কারও মন থেকে।

মোহন সিং আর রাসবিহারী দুজনেই নেতাজির পূর্ব রণাঙ্গনে আসার প্রয়োজনের ওপর জোর দিলেন তাঁদের ভাষণে। এ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব গৃহীত হলে হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল অধিবেশন।

রাসবিহারীর উদ্দীপনা তরুণদের লজ্জা দেয়। মোহন সিং যদিও ক্যাপ্টেন ছিলেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে, পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সৈনিকেরা তাঁকে 'জেনারেল' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ফুজিয়ারা সমেত পূর্ব এশিয়ার সবাই তাঁকে 'সুপ্রিম কম্যান্ডার জেনারেল মোহন সিং' বলেই সম্বোধন করে। সিঙ্গাপুরের উত্তর অংশ একটা টিলার ওপর একটি সুরক্ষিত বাড়ি তাঁকে থাকার জন্য দেওয়া হয়েছে। সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত মোহন সিং। পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র ব্রিটিশ বাহিনীর বিপর্যয় ঘটেছে। রেঙ্গুন আক্রমণকারী জাপানি সৈন্যরা সংখ্যায় সীমিত হলেও ব্রিটিশ সৈন্যরা তাদের প্রতিরোধ না করে শহর ছেড়ে পালিয়েছে।

ভারতীয়দের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ ছোটাছুটি করছেন মোহন সিং। জাপানিদের কাছ থেকে সাধ্যমতো সহায়তার ব্যবস্থা করছেন।

পঁয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় সৈন্যের দায়িত্ব জাপান মোহন সিংয়ের হাতেই তুলে দিয়েছে। মোহন চেষ্টা করছেন আরও কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে অন্তত তিনটি ডিভিশন গড়ে তোলা। তারপর এইসব সৈন্যদের নিয়ে ভারত সীমান্তে ব্রিটিশের মোকাবিলা করতে হবে। মাতৃভূমির মুক্তির স্বপ্নে বিভোর মোহন সিং আত্মহারা হয়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করছেন। নিজের সুখ,

স্বাচ্ছন্দ্য কোনও কিছুরই খেয়াল করছেন না তিনি। একদিন মাঝরাতে মোহন সিং বসে কাজ করছেন এমন সময় বন্ধু গুরুবক্স সিং ধিল্লোঁ এলেন তাঁর কাছে। টেবিলের ওপর অনেকগুলো ভারত থেকে আসা চিঠির খাম বন্ধ অবস্থাতেই পড়ে আছে। খামের ওপরকার হাতের লেখা দেখেই বোঝা যাচ্ছে চিঠিগুলো মোহনের স্ত্রী জসবন্তের কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু মায়ায় জড়িয়ে পড়ার ভয়ে মোহন সেগুলো খুলেও দেখেননি। ব্যাপার দেখে ঝাঁজিয়ে উঠলেন গুরুবক্স, 'ভাবিজির চিঠিগুলো এভাবে ফেলে রেখেছ কেন?'

'বক্সি। সংসারের কথা ভাবার সময় নেই আমার। আজ আমার সংসার শুধু আমার সহকারী, আমার সৈনিকদের নিয়ে।'

ইতিমধ্যে গুরুবক্স নিজেই দু-একটা চিঠি খুলে ফেলছেন। হঠাৎ একটা চিঠি পড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। 'মোহন ভাবিজির একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছিল।' তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'সে চলে গেছে মোহন।' মোহনের চোখে রাগ, দুঃখ, হতাশা বিদ্যুতের মতো ঝলকে ঝলকে উঠছে। তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে গুরুবক্স বললেন, 'মোহন, আমিও তোমার সমব্যথী। খবর পেয়েছি আমার বাড়িতেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে কিছুদিন আগে।'

অনেকদিন বাদে মদের গেলাস নিয়ে বসলেন দুজনে। ভুলে থাকাটা যে একান্ত দরকার। দুজনেই দুজনকে সান্ত্বনা দেন, 'ভালই হল। মায়া বাড়াল না।'

১০

সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে উঁচু টিলার ওপরে মাউন্ট প্লেজান্ট বাড়িটিতে থাকেন জেনারেল মোহন সিং। বাড়ির ছাদে বসে রয়েছেন জেনারেল ভোঁসলে আর জেনারেল মোহন সিং। সামনে গেলাসে পানীয়। মোহন সিং আজ ঠিক নিজের মধ্যে নেই। দূরে সিঙ্গাপুর শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। আবহাওয়াও চমৎকার। শুধু মোহন সিংয়ের মন অশান্ত।

জেনারেল ভোঁসলে বললেন, 'মোহন আমাদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে জুনিয়র। তোমার অভিজ্ঞতাও কম। তোমার আরও ধৈর্য ধরা উচিত।'

'না ভোঁসলে সাহেব। এই জাপানিদের ওপর আমার আর এতটুকু বিশ্বাস নেই। টোকিয়ো পরিষদের অধিবেশনের সময় আমাদের দুজন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগীদের বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার কথাটা মনে আছে আপনার? সেই দুর্ঘটনা ঘটেনি, ঘটানো হয়েছিল। জাপানিদের কাজ সেটা।'

'কী বলছ মোহন?'

'ভগবানের শপথ। খবরটা সত্যি।'

এবার বাচ্চাছেলের মতো কেঁদে ফেলেন মোহন। জেনারেল ভোঁসলে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁর হাত দূরে সরিয়ে দিলেন মোহন। বললেন, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলার জন্য কী করিনি আমি? ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়েও বিচলিত হইনি। ফিরে তাকাইনি। কিন্তু কী লাভ হল? ভারতীয়দের ওপর কোন সুবিচারটা করছে জাপানিরা? কোয়াই নদীর ওপরে পুল বাঁধার কাজে হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিককে লাগিয়েছে তারা।'

'তুমি ভুল করছ মোহন। শুধু ভারতীয় নয়, বর্মী, থাই সব রকম মজুরই কাজ করছে সেখানে। তা ছাড়া জাপানি সামরিক অফিসাররা পর্যন্ত মজুরদের সঙ্গে কাজ করছেন সেখানে। আর একটা কথাও মনে রেখ। এই পুলের কাজ শুরু হয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজ সৃষ্টি হওয়ার আগে।' মোহন

সিংকে নিরুত্তর দেখে জেনারেল ভোঁসলে আবার বলতে থাকেন, 'মোহন, সত্যিই অনেক বেশি ধৈর্য ধরতে হবে তোমাকে। আমি শিগগিরই রাসবিহারী বোসকে আনার ব্যবস্থা করছি।'

'ওই ভণ্ড লোকটার নাম করবেন না আমার সামনে।'

'মোহন তোমার মাথার ঠিক আছে তো?'

'কাল পর্যন্ত ঠিক ছিল না। আজ ঠিক হয়েছে।'

'কী সব পাগলের মতো বলছ মোহন? রাসবিহারীর মতো মহান বিপ্লবী—আরে, তোমার জন্মের অনেক আগে থেকে তিনি বিপ্লবের জন্য প্রাণপাত করছেন।'

'জানি, জানি। অনেক শুনেছি। ভাইসরয়ের ওপর বোমা মেরেছিলেন, আরও হ্যানো ত্যানো, সব জানি আমি। কিন্তু তার পরে? যে লোক গত প্রায় সাতাশ বছর জাপানে আছেন, জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, জাপানি মেয়ে বিয়ে করেছেন, তিনি যদি আজ আমাদের কাছে স্বাধীনতার ওপর বাত মারতে আসেন কেন শুনব আমরা? ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি পদ থেকে সরাতেই হবে ওকে।' চোখ লাল হয়ে উঠেছে মোহন সিংয়ের।

'পরিষদের ব্যাংকক অধিবেশনের পরে আমি একের পর এক চিঠি পাঠিয়েছি জাপান সরকারের কাছে। নতুন ব্যাটেলিয়ন গড়ে তুলে অন্তত তিনটে ডিভিশন গড়ে তোলার জন্য আমি সমানে দাবি জানিয়ে চলেছি। একটারও উত্তর নেই। ২২ জুন তারিখের চিঠিতে আমি সাতদিনের মধ্যে উত্তর দেওয়ার জন্য লিখেছিলাম। গত চার মাসেও তার উত্তর আসেনি।' বলতে বলতে আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন মোহন সিং।

জেনারেল ভোঁসলে বুঝলেন মোহন সিংয়ের এত রাগের পেছনে নিশ্চয় অন্য কোনও কারণ আছে। শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কী হয়েছে আমাকে খুলে বল তো মোহন।'

'পেনাং-এ স্বরাজ ইনস্টিটিউটে আমাদের কম্যান্ডোদের ট্রেনিং চলছিল। কাজকর্ম দেখছিলেন ব্যারিস্টার রাঘবন। একদিন হঠাৎ কয়েকজন জাপানি অফিসার সেখানে গিয়ে হাজির হল আর আমাদের কয়েকজন ভাল ক্যাডেটকে নিয়ে চলে গেল।'

'কোথায়?'

'ফ্রন্টে। তাই তো বলছি যে জাপানিদের একটুও বিশ্বাস করি না আমি। সে রকম অবস্থা হলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেব আমি— আগে পিছে তাকাব না।'

'এ রকম কোনও হঠকারিতা করে বোসো না মোহন। আমাদের তরফ থেকেও অন্যায় ঘটেছে।'

'কী অন্যায়?'

'কর্নেল নিরঞ্জন গিলের নির্দেশে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করার জন্য মহাবীর সিং ধিল্লোর অধীনে একটি দল ব্রহ্মদেশ থেকে বেরিয়েছিল। তারা সোজা গিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এর কী অর্থ করবে তুমি?'

'মহাবীর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেটা সত্যি।' মোহন সিংয়ের গলা এবার একটু নরম শোনাল।

'তাই বলছি। জাপানিদের ধারণা হয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক অফিসারদের মনে আজও ব্রিটিশের প্রতি দুর্বলতা আছে। তাই আপাতত ঝামেলা না বাড়িয়ে চুপচাপ থাক।'

'কতদিন চুপচাপ থাকব?'

'সুভাষবাবু পূর্ব এশিয়ায় না আসা পর্যন্ত।' জেনারেল ভোঁসলে বললেন।

কর্নেল নিরঞ্জন সিং গিল, মোহন সিংয়ের সঙ্গেই থাকেন। জেনারেল ভোঁসলে বেরিয়ে যাবার

পর তিনি মোহন সিংয়ের কাছে এলেন। দুজনের খুব ভাব। মোহন সিং আবার ওই একই বিষয়ের অবতারণা করে বললেন, 'নিরঞ্জন, আমি যদি তোমার কথা শুনে চলতাম তো ভাল হত। টোকিয়ো পরিষদের সময় থেকে তুমি আমাকে রাসবিহারী বোস সম্পর্কে সাবধান থাকতে বলেছিলে। আজ বুঝছি তুমি ঠিকই বুঝেছিলে।'

অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনার পর দুজনে ঘুমোতে গেলেন। পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় গা এলিয়ে রয়েছেন মোহন সিং। উঠতে ইচ্ছে করছে না। দরজায় ঠকঠক আওয়াজ শুনে উঠে দেখলেন আরদালি দরজায় দাঁড়িয়ে। আরদালি জানাল যে জাপানি ক্যাম্পেকাই পুলিশ দেখা করতে চায়।

'বুঝেছি। ওরা আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে।'

'না সাহেব। গিল সাহেবকে চায় ওরা।'

অবাক মোহন সিং বাইরে বাগানে এলেন। সম্পূর্ণ বাড়ি ক্যাম্পেকাই ঘিরে ফেলেছে। খুদে খুদে চোখে কটমট করে মোহন সিংয়ের দিকে দেখছে তারা। কর্নেল নিরঞ্জন গিল আগেই গ্রেফতার হয়েছেন তাদের হাতে। তার আশেপাশে পুলিশ। এই গ্রেফতার করবার জন্য জাপানি জেনারেল ইয়াকুরো স্বয়ং এসেছেন।

'জেনারেল ইয়াকুরো, এ কাজটা ভাল করলেন না আপনারা। কর্নেল গিল আমার বন্ধু। তাঁকে গ্রেফতার করার আগে আপনাদের দশ বার ভাবা উচিত ছিল। কী অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে।'

'বার্মার পেগুর কাছে ব্রিটিশ বাহিনীর এগারোজন প্যারাট্রুপার সৈন্য ধরা পড়েছে। তাদের কাছে মহাবীর সিং ধিল্লোঁর দেওয়া ম্যাপ, নির্দেশ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। আর, মহাবীর সিং ধিল্লোঁকে পাঠানোর জন্য কর্নেল গিলই দায়ী। এটা নিশ্চয় মানেন আপনি?' ভাবলেশহীন মুখে বললেন ইয়াকুরো।

দশাসই চেহারা কর্নেল গিলের। কিন্তু আপাতত থরথর করে কাঁপছেন তিনি। জাপানিদের সামনে মোহন সিংয়ের কোনও কথাই চলবে না। জাপানিদের গাড়ি চলে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে মোহন সিং শুধু বিড়বিড় করে বললেন, 'এর জন্য ফলভোগ করতে হবে তোমাদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের দপ্তরে এলেন মোহন সিং। স্টেনোকে ডেকে পাঠিয়ে ডিকটেশন দিতে শুরু করলেন,

'আমি জেনারেল মোহন সিং, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক, আমার বিশেষ অধিকারবলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি।...'

১১

জাপানি বিমানটি উড়ে চলেছে সিঙ্গাপুরের দিকে। বিমানে রয়েছে রাসবিহারী বসু এবং তাঁর সঙ্গী এ. এম. নায়ার। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেবার খবরে রাসবিহারী বসু প্রচণ্ড মর্মাহত।

'আই এন এ-কে ডিসব্যান্ড করার অধিকার মোহন সিংকে কে দিয়েছে? ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি আমি। তার দায়িত্ব শুধু সামরিক দিকটা দেখাশুনা করার।'

ত্রিশ বছর ধরে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপানে, পূর্ব এশিয়ায় কাজ করে চলেছেন রাসবিহারী বসু। ভারতের মুক্তিই তাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান।

৫ জুন, ১৯১৫ সালে সানুকি মারু জাহাজে জাপানের কোবে বন্দরে পৌঁছেছিলেন রাসবিহারী। সহায় নেই, সম্বল নেই। জাপানি ভাষা না জেনে এই অবস্থায় জাপানে ঘুরে

বেড়ানো নিশ্বাস না নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টার মতো। পকেটে থাকবার মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি হিসাবে একটা মিথ্যে পরিচয়পত্র। ভাগ্য সহায়, তাই যোগাযোগ ঘটল চিনের বিপ্লবী ড. সান ইয়াৎ সেনের সঙ্গে।

ডাক্তার সাহেব রাসবিহারীকে নিয়ে গেলেন টোয়ামো মিৎসুরুর কাছে। টোয়ামো জাপানের 'ব্ল্যাক ড্রাগন' নামে বিপ্লবী সংগঠনের অধ্যক্ষই শুধু নয়—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিপ্লবীদের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। দেশবিদেশের বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে গভীরভাবেই খবর রাখেন তিনি। বিশেষ করে এশিয়ার বিপ্লবীদের আত্মার আত্মীয় তিনি।

কয়েক হাজার মাইল দূরে গিয়েও ব্রিটিশ গুপ্তচরদের হাত থেকে নিস্তার পাননি রাসবিহারী। সে সময় ব্রিটিশ আর জাপানি সরকারের মধ্যে খুবই ভাল সম্পর্ক। ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে জাপান সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে রাসবিহারীকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। রাসবিহারীর জাপানে আসার খবর শুধু কাগজেই বেরোয়নি— ইস্তাহারের মাধ্যমেও প্রচার করা হয়েছে। একবার হাতে পেলে ব্রিটিশ নিশ্চিত ফাঁসি দেবে তাকে।

শেষ পর্যন্ত টোয়ামোর বাড়িতে আশ্রয় নিতে হল রাসবিহারীকে। তাঁর বাড়িতে ঢোকার সাহস জাপানি পুলিশের কেন, সৈন্যবাহিনীরও নেই। জাপানের জনসাধারণের ওপর টোয়ামোর অসামান্য প্রভাব রয়েছে। লোকে বলে জাপানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সময়ও টোয়ামোর পছন্দ-অপছন্দ বিচার করা হয়। টোয়ামোর উদ্যোগে রাসবিহারীর কীর্তিকাহিনি নিয়ে কাগজে লেখা বেরোল। সেই সঙ্গে জাপানের লোক জানল যে কীভাবে ব্রিটিশের গুপ্তচর তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। অবশ্য রাসবিহারী যে টোয়ামোর বাড়িতে তাঁরই পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেটা প্রকাশ পেল না। তবে টোয়ামোর ওপর সন্দেহটা ক্রমশই বাড়ছে।

একদিন দুপুরে ককোহ সোমা নামে এক মাঝবয়সি, চটপটে মহিলা এলেন টোয়ামোর কাছে। বললেন, 'কোথায় সেই ভারতীয় বিপ্লবী। আমি তাকে আশ্রয় দেব। আমাকে তার ভার দিন।'

'খামোখা নিজের ওপর বিপদ কেন ডেকে আনতে চাইছেন আপনি?'

ককোহ সোমা বললেন, 'ব্রিটিশের হাতে ছেলেটিকে দেওয়া মানেই ছেলেটিকে যমের হাতে তুলে দেওয়া। সেটা হবে জাপানের আতিথেয়তার চূড়ান্ত অপমান।'

ককোহর আগ্রহে রাসবিহারী নাকামুরা অঞ্চলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ককোহর বেকারির ব্যাবসা। বেকারির নীচে একটা ঘরে পাউরুটির গুদামে থাকেন রাসবিহারী। চার মাস কাটল এইভাবে। বেকারির চারপাশে গুপ্তচর সবসময়ই ঘুরছে। কিন্তু ককোহ কাউকে রাসবিহারী যে ওইখানে আছেন তার আন্দাজটুকুও পেতে দিলেন না। নিজের ছেলের মতোই সামলে রাখেন রাসবিহারীকে। তবে ওপরে ওপরে যতই সাহস দেখান ভেতরে ভেতরে ভয় তাঁর ছিলই। রাতের পর পাত না ঘুমিয়ে, দিনরাত দুশ্চিন্তায় অসুখে পড়ে গেলেন ককোহ সোমা। তাঁর জন্যই ককোহর এই অবস্থা জেনে কষ্ট হয় রাসবিহারীর। ককোহর বিছানার পাশে বসে কেঁদে ফেলেন তিনি।

আস্তে আস্তে পুলিশের চাপটা কমে আসে। ককোহ অসুস্থ। রাসবিহারীর দেখাশোনা করেন ককোহর কলেজ ছাত্রী মেয়ে তোসিকো। এতদিনে রাসবিহারী ককোহর বাড়িরই একজন হয়ে গেছেন। একদিন টোয়ামো এলেন সেখানে। হঠাৎ কী ভেবে বললেন, 'তুমি তো কোটি কোটি ভারতবাসীর কথা ভাবছ। কিন্তু তোমার কথা ভাবার জন্যও তো কারও থাকা উচিত।'

রাসবিহারীকে জিজ্ঞেস না করেই টোয়ামো সোজা ককোহর কাছে গিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে তোসিকোর বিয়ের কথা উত্থাপন করলেন। এইরকম হঠাৎ প্রস্তাবে ককোহ হতচকিত। রাসবিহারীকে তিনি ছেলের মতো ভালবাসেন। কিন্তু তার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, মাথার উপর বিপদ, সবচেয়ে বড় কথা তোসিকো আর রাসবিহারীর বয়সের অনেক তফাত। মনস্থির করতে না পেরে তোসিকোকেই তার মত জিজ্ঞেস করলেন ককোহ। হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্নে তোসিকোও অবাক। কোনও উত্তর না দিয়েই সেখান থেকে চলে গেল।

পনেরো দিন পরে তোসিকো মাকে তার সাগ্রহ সম্মতি জানাল। শুধু রাসবিহারী নয়, রাসবিহারীর স্বপ্নকেও নিজের স্বপ্ন করে নেওয়ার সংকল্প নিয়েছে তোসিকো।

সেটা ১৯১৯ সাল। রক্ষণশীল জাপানি সমাজ কোনও জাপানির সঙ্গে কোনও বিদেশির বিয়ে সুনজরে দেখে না। এদিকে রাসবিহারীও কখনও বিয়ের কথা ভাবেননি। তাঁর একমাত্র ধ্যান কবে তিনি জননী জন্মভূমিতে আবার ফিরে যেতে পারবেন সগর্বে, মাথা উঁচু করে। পেছনে পুলিশ ফেউয়ের মতো লেগে আছে। অনিশ্চিত জীবন। তাঁর সঙ্গে তোসিকোর মতো এক সম্ভাবনাময়ী তরুণীর জীবন জড়িয়ে ফেলাতে তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি। কিন্তু মাতৃসমা ককোহর মায়া, গুরুস্থানীয় টোয়ামোর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই তাঁর। এরই মধ্যে আবার ককোহ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত একদিন ককোহর আশীর্বাদ নিয়ে তোসিকোকে গ্রহণ করলেন তিনি। বিয়েটা হল খুবই গোপনে।

গভর্নর জেনারেলের ওপর বোমা ফেলার স্পর্ধা দেখিয়েছে এই লোকটা। উচিত শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা ছাড়েনি তাই ব্রিটিশের চরেরা। আট বছরে সতেরো বার জায়গা বদলালেন রাসবিহারী। ইতিমধ্যে তাঁর পুত্র মাসিহিডে আর মেয়ে টেটিকোর জন্ম হয়েছে। তোসিকো তাঁর জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রুগ্‌ণা মা'র সেবা করা, ছেলেমেয়েদের সামলানো, পুলিশের ঝামেলা সহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীকে জাপানি ভাষা শেখান তোসিকো। এত পরিশ্রমে ভেঙে পড়ল তাঁর শরীর। তারপর একদিন, ৪ মার্চ, ১৯২৫ রাসবিহারীকে একলা ফেলে চলে গেলেন তোসিকো—পরম অচিনের কাছে। একমাত্র দেশের প্রতি তাঁর কর্তব্যই রাসবিহারীকে বাধ্য করল নিজেকে সামলাতে। নইলে হয়তো পাগলই হয়ে যেতেন তিনি।

রাসবিহারীর দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রিটিশকে তাড়াতে হলে লড়াই করেই তাড়াতে হবে। এই নিয়ে অনেকবার গাঁধীজিকে লিখেছেন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন ঘনিয়ে আসতে লাগল রাসবিহারীর অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। গণেশ পিঙ্গলে, বালমুকুন্দ—আরও অনেক সহযোগীদের কথা বারবার মনে পড়ে তাঁর। দেশের জন্যে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের স্বপ্ন, তাঁদের সাধনার সিদ্ধি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আসেনি। এবারকার মহাযুদ্ধ আবার সুযোগ এনে দিয়েছে। ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি ভারত অনেক জাপানির কাছেই পবিত্র তীর্থ। ভারতপ্রেমিক বন্ধুদের এক জায়গায় সংগঠিত করে তোলার জন্য বহুবছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। পেছনে আছেন বিপ্লবীদের ভীষ্ম-পিতামহ—টোয়ামো। রোগশয্যায় শুয়েও রাসবিহারীকে বলেছেন তিনি, 'অষ্টআশি বছর বয়স হল। ওপারের ডাক পৌঁছচ্ছে কানে। শুধু একটাই ইচ্ছে আছে এখনও। শেষবারের মতো চোখ বোজার আগে তথাগতের দেশকে যদি স্বাধীন দেখে যেতে পারতাম।'

রোগশয্যা থেকেই টোয়ামো প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। জাপানের সামরিক অধিকর্তার সঙ্গেও কথা বললেন তিনি। উপরতলায় নড়াচড়া শুরু হল।

৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১। জাপান পুরোপুরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। পরের দিনই একটা সামরিক

গাড়ি এসে দাঁড়াল রাসবিহারীর দরজায়। ডাক এসেছে সামরিক দপ্তরে। সেই সঙ্গে মেজর আজুকির ফোনও এল। কুদান টিলার ওপরের ফিকে রঙের সবচেয়ে উঁচু বাড়িটা জাপানের প্রধান সামরিক কার্যালয়। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে সিদ্ধি কি সমাগত?

সিঙ্গাপুরের দিকে উড়ে চলা বিমানে বসে রাসবিহারীর মানসচক্ষে গত তিরিশ বছরের ঘটনাগুলো চলচ্চিত্রের মতো ভেসে চলেছে। সিঙ্গাপুরে বিমান নামল। জেনারেল ইয়াকুরোকে বললেন যে তিনি নিজেই মোহন সিংয়ের মত পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। তবে আপাতত ইয়াকুরো যেন কিছু না করেন। রাসবিহারী স্বয়ং পাঁচ-ছয়বার মোহন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। বারবার তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্যে মিনতি করলেন। কিন্তু কোনও ফল হল না। শেষ পর্যন্ত জেনারেল ভোঁসলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন।

'ভোঁসলে সাহেব। আপনিই বলুন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেবার মোহন সিংয়ের কী অধিকার? এ ধরনের ফৌজ কারও একার চেষ্টায় গড়ে ওঠে না। কাজেই তাকে ভাঙবার অধিকারও কোনও একজন লোকের থাকতে পারে না।'

জগন্নাথরাও ভোঁসলে বললেন, 'মনে হচ্ছে মোহন সিং জাপান সরকারের ওপর প্রচণ্ড চটে রয়েছেন।'

'কিন্তু জেনারেল সাহেব, দুটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপক ক্ষেত্রে দু-একজনের মতানৈক্য ঘটতেই পারে। রাজনীতি অনেক সময়ই নানান বিচিত্র মোড় নেয়। ব্যক্তিবিশেষের মত বা স্বভাব অনেক সময়ই রাজনীতির গতিপ্রকৃতিতে বা পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে।'

রাসবিহারীর শরীর ভাল নয়। তবু মনের জোরে তিনি শিবিরে শিবিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অফিসারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। তাদের সবাইকার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করছেন। মুখ্যত জেনারেল ভোঁসলে তাঁকে এ ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করছেন। ইংল্যান্ডের স্যান্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত জেনারেল ভোঁসলে যেন রাসবিহারীর ক্লান্ত শরীরের সহায় হয়ে উঠেছেন। এ ছাড়াও গুরুবক্স সিং ধিল্লোঁ, সেহগল আর শাহনওয়াজ— এ সাহায্য করছেন তাঁকে। রাসবিহারী সবার কাছ থেকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি চাইছেন।

২৯ ডিসেম্বর মোহন সিংকে ইয়াকুরোর বাসায় ডেকে পাঠানো হল। সেখানে রয়েছেন ভোঁসলে এবং রাসবিহারী। রাসবিহারী বললেন, 'মোহন সিং, প্রাথমিক পর্যায়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলার জন্য আপনি যা করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু আপনার পরিশ্রমে যে মন্দির গড়ে উঠেছে তাকে আজ কেন ভাঙতে চলেছেন আপনি? আমি আবার আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন।'

'সেটা আর সম্ভব নয়। আমার সহকারীদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছেন আপনারা। জাপানিরা কেন গ্রেফতার করেছে কর্নেল গিলকে?' মোহন সিং চিড়বিড়িয়ে ওঠেন।

'দেখুন আমি মহাবীর ধিল্লোঁকেও চিনি আর গিলকেও জানি। কে কী করছেন তাও জানি আমি। আজ শুধু আপনাকে একটা কথাই বলতে চাই আমি। অন্তত সুভাষচন্দ্র বোস পূর্ব এশিয়ায় আসা পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজকে আমাদের সবাই মিলে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।' রাসবিহারী বললেন।

'সে পর্যন্ত বর্তমান পরিস্থিতিই চলুক না।' মোহন সিং বললেন।

'এই পরিস্থিতিতে আমরা জাপানের কাছ থেকে কানাকড়িও সাহায্য পাব না। তাই বলছি,

আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন।' এবার রাসবিহারীর স্থৈর্যে চিড় ধরেছে। 'দেখুন, কোনও মহান সৃষ্টি করতে অনেক দিন লেগে যায়, হয়তো কয়েক পুরুষ। কিন্তু এক মুহূর্তে ধ্বংস করা যায় তাকে।' বলতে বলতে রাসবিহারীর চোখে জল এসে গেছে।

'ইউ আর সিম্পলি এ জাপানিজ এজেন্ট।' ফেটে পড়লেন মোহন সিং।

পাশের ঘরে রাসবিহারী, জেনারেল ভোঁসলে, ইয়াকুরো আর সেন্ডারের মধ্যে এবার বৈঠক শুরু হল। মোহন সিংকে আজাদ হিন্দের কর্তৃত্ব থেকে বরখাস্ত করলেন রাসবিহারী। এখন থেকে ভার নেবেন জেনারেল জগন্নাথরাও ভোঁসলে।

জাপানি অফিসাররা গ্রেফতার করলেন মোহন সিংকে। বাইরে অপেক্ষমাণ সামরিক গাড়ি। মোহন সিংকে তাতে তোলা হল। সজলচোখে সেদিকে তাকিয়ে রাসবিহারী ইয়াকুরোকে বললেন, 'দেখবেন, কয়েদখানায় মোহন যেন ভাল ব্যবহার পান। আজ তিনি যাই করুন, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে মাতৃভূমিকে ভালবাসেন তিনি। একজন সত্যিকারের দেশভক্ত।' দণ্ডিত মোহন সিংয়ের সঙ্গে দণ্ডদাতা রাসবিহারী সমান বিষণ্ণ।

একটা পর্ব চুকল। কিন্তু রাসবিহারী খুশি নন। মেরুদণ্ড যেন আরও বেঁকে গেছে তাঁর। সবাইকে সম্বোধন করে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'মোহন সিংয়ের সমস্যা হচ্ছে তাঁর ফৌজি একরোখামি। তাঁর সাধ্যানুসারে যথেষ্ট করেছেন তিনি। কিন্তু এ ধরনের বিপ্লবী সংগঠনের জন্যে শুধু একগুঁয়েমি নয় রাজনৈতিক কৌশলও একান্ত দরকার। সেটা মোহন সিংয়ের ধাতে ছিল না। মোহন সিং যেমন পারেননি, রাসবিহারী বোসও তেমনি এ কাজ সামলাতে পারবে না। তার ওপরে বয়স এই শরীরটাকে কাবু করে ফেলেছে। পূর্ব এশিয়ার পঁয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দিকে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতার সিংহদ্বারে আমাদের পৌঁছে দিতে আজ একজনকে বড় দরকার— নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস।' সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে রাসবিহারী প্রার্থনা করছেন, তুমি এসো, তুমি এসো সুভাষ। ঘন অন্ধকারের বুক চিরে সূর্যের মতো এসে দাঁড়াও তুমি। 'তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো।'

১২

বাড়ির সদর দরজাতেই ইয়ামামোতোকে স্বাগত জানালেন সুভাষ আর এমিলি। ভেতরে এলেন ইয়ামামোতো। ঘরের সাজসজ্জা পুরোপুরি ভারতীয় ঢঙের। দেওয়ালে দেবদেবীর ছবির সঙ্গে টাঙানো রয়েছে ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কয়েকটা ছবি। দেখে খুব ভাল লাগছে ইয়ামামোতোর। টেবিলে খাবার সাজানো থেকে সবকিছুতেই এমিলিকে অ্যানা খুব সাহায্য করছে। অ্যানার চটপটে ভাব তারিফের দৃষ্টিতে দেখছেন ইয়ামামোতো।

'আপনার ভাগ্যটা ভাল। এ রকম কাজের লোক পাওয়াটা ভাগ্যের কথা।'

'অ্যানার কথা বলছেন? সত্যিই অসাধারণ মহিলা। নিজের সমস্ত দুঃখ চেপে রেখে এভাবে হাসিমুখে থাকাটা খুব কম লোকেই পারে।'

'তার মানে?'

'অ্যানার স্বামী রোমেলের ফৌজের সঙ্গে আফ্রিকায় গিয়েছিল। মারা গেছে না যুদ্ধবন্দি হয়েছে কেউ জানে না। সামরিক কর্তৃপক্ষ "মিসিং" বলে ছাপ মেরে দিয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। ওর বড়ছেলেটি গিয়েছিল রাশিয়ান ফ্রন্টে। প্রথম দিনেই ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেছে কামানের গোলায়।'

দুজনেই ইংরেজিতে কথা বলছিলেন। তবু অ্যানা বুঝে ফেললেন যে তাঁর সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে। কিন্তু কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না তাঁর মুখে।

ইয়ামামোতো বললেন, 'রাশিয়ান ফ্রন্টে জার্মানির অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ফ্যুয়েরার এ ক্ষেত্রে ভুলই করে বসেছেন।'

'ভুল? ইট ইজ এ হিমালয়ান ব্লান্ডার। ফ্যুয়েরার ভেবেছিলেন অক্টোবরের মধ্যেই ক্রেমলিন পৌঁছে যাবে জার্মান বাহিনী। এখন ডিসেম্বর। আমার মনে হচ্ছে মস্কোর বরফ ফ্যুয়েরারের সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর জেদ ঠান্ডা করে দেবে।' সুভাষ তাঁর মনোভাব খোলাখুলিই বললেন।

'বোস, আপনাদের যুদ্ধে নামার কতদূর কী হল?' ইয়ামামোতো জিজ্ঞেস করলেন।

'সেই জন্যই তো আপনাদের পেছনে লেগে আছি।' হেসে বললেন নেতাজি। তারপরে গলা নামিয়ে বললেন, 'মিস্টার ইয়ামামোতো, একটু সময়ের জন্য রাজনীতির প্যাঁচঘোচ বাদ দিয়ে বন্ধু হিসাবে একটা কথা বলুন না আমাকে। জাপান সরকার আমাকে কী সত্যিই সাহায্য করতে আগ্রহী?'

'কতটা আগ্রহী?' ইয়ামামোতোর মুখে একটা ক্ষীণ দুর্বোধ্য হাসি ফুটে ওঠে। তারপরেই হঠাৎ বলে ফেলেন, 'গত ছয় মাস যাবৎ জাপান সরকার আপনার প্রতিটি চালচলনের ওপর আমাদের নজর রাখতে বলেছেন এবং খোঁজ নিচ্ছেন। আমরাও আমাদের রিপোর্ট নিয়মিত পাঠাচ্ছি। আমরা জানিয়েছি যে মিস্টার বোস স্বাধীনতার প্রজ্বলন্ত মশাল।'

'তারপর?'

'আপনার চিন্তিত হবার কোনও কারণ নেই। গোপন সূত্র থেকে যা জানতে পারছি তাতে মনে হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তোজো স্বয়ং আপনাকে পূর্বপ্রান্তে নিয়ে যাবার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব। আপনাদের প্রবীণ বিপ্লবী রাসবিহারী বোসও এই ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করছেন। যেমন করেই হোক আপনাকে পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলছেন তিনি। শিগগিরই একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।'

পাশে দাঁড়ানো এমিলি বললেন, 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

ইয়ামামোতো চলে গেলেন। একটু পরে নেতাজির গাড়িও 'ইন্ডিয়ান লিজিয়ন'-এর কার্যালয়ের দিকে রওনা হল। আজকের আবহাওয়া খুবই খারাপ। আকাশ অন্ধকার। সমানে বরফ পড়ছে। আকাশের কালো মেঘ মনেও প্রভাব ফেলছে।

নেতাজি অফিসে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ শব্দে সাইরেন বেজে উঠল। মনে হচ্ছে আওয়াজটা ছুরির মতো কানের মধ্যে দিয়ে কলজে পর্যন্ত ফুঁড়ে দিচ্ছে। একটু পরেই শুরু হল ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সের বিমান আক্রমণ। বোমা ফেলার প্রচণ্ড আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। যত্রতত্র বোমা ফেলে বিমানগুলো ফিরে চলে গেল এক সময়।

গোয়েরিংসহ সামরিক আধিকারিকরা বারবার সদম্ভে ঘোষণা করেছেন যে বিপদ বার্লিনকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাদের সেই বড় বড় কথার ফানুস ফাঁসিয়ে দিয়েছে এই বিমান হামলা। বার্লিন ঘিরে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গানের সারি, হাজার হাজার সার্চলাইট। এত করেও এই বিমান হামলা ঠেকানো যায়নি।

আলেকজান্ডার রিথ এসে বসলেন নেতাজির কাছে। গলা নামিয়ে কথা বলছেন দুজনে। যুদ্ধ তা হলে বার্লিনের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছল। এমন সময় দড়াম করে দরজা খুলে এমিলি এসে ঢুকলেন ঘরে। তার বিবর্ণ মুখ দেখে নেতাজি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, 'কী হয়েছে এমিলি?'

'সাংঘাতিক ব্যাপার। অ্যানা আন্টির ভয়ানক বিপদ।'

'ওর বাড়িতে বোমা পড়েছে নাকি?'

'না না। যে বাড়িতে অ্যানা থাকেন তারই ওপরের তলায় নাৎসিদের একটা ছোট্ট শাখা অফিস আছে। সেই অফিসের কর্তা অ্যানার ছোট ছেলেকে হুকুম দিয়েছে রোজ সকালে ব্যালকনিতে নাৎসি ঝান্ডা টাঙাতে হবে।'

'তারপর।'

'দশ-এগারো বছরের ছেলেটা আজ একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। নাৎসি সদস্যেরা সকালে এসে ঝান্ডা না দেখে ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে বেধড়ক মেরে ছেলেটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।'

'ও·গড।'

'অ্যানা আন্টি কোনওরকমে প্রতিবেশীদের সাহায্যে ছেলেটাকে হাসপাতালে ভরতি করতে পেরেছেন। ছেলেটা বাঁচবে কি না বলা যাচ্ছে না। আমি হাসপাতালে চললাম।'

'দাঁড়াও। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।' নেতাজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আলেকজান্ডার রিথ বাধা দিলেন তাঁকে। 'মিস্টার বোস। আপনার সেখানে গেলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হবে। প্রোটোকলের ব্যাপার আছে।'

'মানুষের জীবনের চেয়ে প্রোটোকল বড় নয়।'

'মিস্টার বোস। ওই ছেলেটির সুচিকিৎসার ব্যবস্থার কথা ভাবছেন তো? আমি এমিলির সঙ্গে যাচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

এমিলি আর ড. রিথ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। সুভাষ অস্থির। তাইজিকে ফোন করলেন তিনি। জার্মান রেডক্রশের সদস্য হিসাবে তাইজি অনেক কিছুই করতে পারেন। তিনিও হাসপাতালে রওনা হলেন।

আজকের বোমাবর্ষণে উইলহেলমস্ট্রাসের আবাসিক এলাকাও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটা কাজের বাহানায় অ্যাডাম ট্রট চলে এলেন নেতাজির কাছে। তাঁর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেতাজি বললেন, 'অ্যাডাম, তোমাদের এই দেশে এখন আর কোনও কিছুরই মূল্য নেই মনে হচ্ছে। অ্যানার মতো একজন প্রৌঢ়া যিনি দেশের জন্য স্বামী হারিয়েছেন, এক পুত্র হারিয়েছেন, একমাত্র ছেলের ওপর এ ধরনের অমানুষিক আচরণ! কী, না ঝান্ডা টাঙাতে একটু দেরি হয়েছে! এটা কী জাতীয়তাবাদ না পৈশাচিকতা?'

বাইরের আকাশ অন্ধকার। বরফ পড়ছে সমানে। একটু পরে বিষণ্ণ অ্যাডাম বললেন, 'কবে ছোটবেলায় হিটলার চারজন ইহুদিকে অত্যাচার করতে দেখেছিলেন। কিন্তু তার জন্য আজ কোটি কোটি ইহুদিকে শাস্তি পেতে হবে! এ কোথাকার বিচার? আমাদের ক্ষমতাগর্বী শাসকেরা আজ রক্তের নেশায় উন্মাদ। এইসব মানুষরূপী জানোয়ারটা লাখো লাখো ইহুদির রক্তমাংস গিলে খাচ্ছে। হিটলার মানবতার শত্রু।'

'এইভাবে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে হিটলার কোনওদিন সফল হতে পারবেন না।' নেতাজি বললেন। 'অ্যাডাম এদের ব্যাপার দেখে দেখে আমি বীতশ্রদ্ধই শুধু নই, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই উন্মাদ স্বৈরাচারী নিজেকে কী ভাবে? গত দশ-এগারো মাসে, আমাকে একটুখানি সময় দিতে পারল না? এখন আর এই গর্বান্ধ, খুনে জানোয়ারটার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেও আমার নেই। দোস্ত, তুমি জাপানি দূতাবাসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে কিছু একটা কর। এই নরপশুটাকে কোনও অনুরোধ করার ইচ্ছে আর আমার নেই।'

'সেটা সম্ভব নয় সুভাষ। পূর্বদিকে যাবার পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। সমুদ্রপথে ব্রিটিশ আর আমেরিকার কড়া পাহারা। এই পথে পাড়ি দিতে হলে জার্মানির মতো অগ্রসর রাষ্ট্রের সাহায্য

একান্ত দরকার হবে। একমাত্র এদের সাহায্যেই জাপানে পৌঁছনো সম্ভব। আপাতত আর কোনও উপায় নেই।'

'অর্থাৎ ভাল লাগুক না লাগুক হিটলারের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।'

'ঠিক। এ ছাড়া পূর্বদিকে যাবার আর কোনও উপায় নেই সুভাষ।'

রাতে নেতাজি সোফিয়নস্ট্রাসেতে ফিরে এলেন। জার্মান রেডিয়োতে হিটলারের হুংকার শোনা যাচ্ছে। তাঁর বক্তৃতায় ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। চার্চিলকে 'ফ্রোজেন ওল্ড টার্কি' আখ্যা দিয়েছেন হিটলার।

অ্যানার ছেলের কী হল সেজন্য চিন্তিত নেতাজি। খানিকক্ষণ পর এমিলি আর তাইজি এলেন। দুজনকেই দারুণ বিষন্ন দেখে নেতাজির বুকটা ধক করে উঠল।

'বাচ্চাটা?'

'এর চেয়ে বোধহয় মৃত্যুই ভাল ছিল বেচারির।'

'মানে?'

'পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে ছেলেটার। জন্মের মতো পঙ্গু হয়ে গেছে।'

তাইজির মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর পরিচিত ভাল ভাল ডাক্তাররা আপ্রাণ করেছেন। সব বিফল। মাঝরাতে চলে গেলেন তাইজি। এমিলি আর নেতাজিই শুধু নয়, সে রাতে সোফিয়নস্ট্রাসের কোনও কর্মচারীরও খাবার মুখে তোলার ইচ্ছে হল না।

রাত গভীর। চোখে ঘুম নেই নেতাজির। সমস্ত জার্মানিটাই নাৎসিদের একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বলে মনে হচ্ছে তাঁর। নিজের দেশের লোকের ওপর এই ধরনের অত্যাচার করে, তাদের বিরাট একটা অংশের ঘৃণার পাত্র হয়ে হিটলার কী করতে চাইছেন বুঝতে পারেন না নেতাজি। নাৎসি প্রতীক স্বস্তিকা চিহ্ন আজ তাঁর চোখের সামনে রক্তাক্ত হয়ে বারবার ভেসে উঠছে। হঠাৎ এক সময় রাগে, দুঃখে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'এমন ঝান্ডা কোন কাজের? যে ঝান্ডার ডান্ডা নিজেদেরই বাচ্চাদের পেটে বল্লমের মতো বেঁধে সে ঝান্ডা দিয়ে কী হবে। যে রাষ্ট্র নিজেদের লোকেদের জন্য ক্রমাগত কবর খুঁড়ছে সে রাষ্ট্র কার ভাল করবে? এমিলি, আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলছি, হিটলারের পতন, হিটলারের সমাপ্তি চার্চিলের বোমায় হবে না, হবে অসংখ্য মানুষের ইহুদির বুকফাটা অভিশাপে।'

১২
পুবালি সফর

১

নেতাজি আর এমিলি কয়েকদিনের জন্য অস্ট্রিয়ার বাডগেস্টাইনে বেড়াতে এসেছেন। হঠাৎ একদিন অ্যাডাম ট্রট এসে উপস্থিত সেখানে। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনও একটা বিশেষ খবর নিয়ে এসেছেন তিনি। বার্লিনে দুই বন্ধুর খোলাখুলি আলোচনা সম্ভব হয় না। এখানে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন দুজনে।

অ্যাডামের প্রশস্ত কপালে চিন্তার রেখা। এটা ওটা কথার পর আসল কথায় এলেন অ্যাডাম।

'নেপোলিয়নের মতো হিটলারেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমাধি মস্কোর রাস্তাতেই হবে এ বিষয়ে আমি এখন নিশ্চিত। জার্মানির পতনের সময় তুমি যদি ওখানে থাক তবে সেটা তোমার পক্ষে খুব খারাপ হবে।' অ্যাডাম বললেন।

'কেন?'

'তোমাকে বলি দিতে কারও বাঁধবে না। কাল যদি ইংল্যান্ড বিজয়ী হয় তো জার্মানিতে এসেই তারা প্রথম চাইবে সুভাষ বোসকে। পরাজিত জার্মানির সে দাবি অস্বীকার করার হিম্মত থাকবে না। তোমাকে কেউ রাজনীতির দাবা খেলায় বোড়ের মতো ব্যবহার করবে, এ কথা ভাবতেই আমার দম আটকে আসছে।'

এমিলিও শুনছেন দুজনের কথা। এবার তিনি বললেন, 'যে করেই হোক তোমাকে জার্মানি থেকে বেরোতেই হবে।' বেশ বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো বলতে এমিলির বুক ফেটে যাচ্ছে।

নেতাজি গভীরভাবে চিন্তা করছেন। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে বন্দি হয়ে দিন কাটানোর কল্পনাতেও শিউরে উঠছেন তিনি। অ্যাডাম বললেন, 'সুভাষ ভূমিকম্পের বড় ঝটকা আসার আগেই মাটিতে একটা কাঁপুনি টের পাওয়া যায়। ব্রিটেনের সঙ্গে একটা আপসে আসার মিথ্যে আশায় হিটলার মস্কোর রাস্তায় শক্তি ক্ষয় করছে। জার্মানির পতনের আগেই তোমাকে পাড়ি দিতে হবে— লম্বা পাড়ি! সেই পূর্ব এশিয়ায়।'

ট্রট ঠিক কথাই বলেছেন। যে কোনও উপায়ে পূর্বদিকে যেতেই হবে। আশ্বাসের আলো পূর্বদিকেই দেখা যাচ্ছে। আলোচনার পর ঠিক হল সুভাষ রোমে যাবেন।

ট্রট, মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। এমিলি আর ট্রটের সঙ্গে বার্লিনের সামরিক বিমান বন্দরে রোমে যাওয়ার বিমানের অপেক্ষা করছেন সুভাষ। সকাল থেকেই এমিলির শরীরটা ভাল নেই। বার বার তেষ্টা পাচ্ছে তার। যুদ্ধের সময় সামরিক বিমান বন্দরে সবসময়েই একটা উদ্বেগ। বিকট আওয়াজে একটা বোমারু বিমান রানওয়েতে এসে নামল। সঙ্গে সঙ্গেই এমিলির সারা শরীর ঘেমে উঠল। বমি শুরু হল তার। শক্ত করে ধরে নেতাজি ভি

আই পি লাউঞ্জে নিয়ে গেলেন তাকে। অবস্থা দেখে অন্যেরা তাড়াতাড়ি লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেলেন। নেতাজি রুমাল দিয়ে এমিলিকে হাওয়া করতে লাগলেন। হঠাৎ এমিলির শরীরটা এত খারাপ হল কেন, ভেবে পাচ্ছেন না তিনি। এর মধ্যেই এমিলি সুভাষের দিকে তাকিয়ে দুষ্টু দুষ্টু ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বললেন, 'এত চিন্তা করছ কেন? এ সময়ে এরকম হয়। নতুন অতিথি আসছে যে।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান নেতাজি। স্থানকাল ভুলে জড়িয়ে ধরেন এমিলিকে। তারপরেই আলিঙ্গন শিথিল হয়ে আসে তাঁর। কী পরিস্থিতিতে কী খবর! বিদেশ বিভুঁইয়ের ফৌজি বিমানবন্দরে! চোখে জল এসে যায় তাঁর।

সুভাষের এমিলিকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু রূঢ় বাস্তব লাউঞ্জের দরজায় করাঘাত করছে। বাইরে থেকে সান্ত্রি চিৎকার করে বলল, 'স্যার। আপনার বিমান তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি করুন স্যার।'

'এমিলি, এ অবস্থায় তোমাকে একলা রেখে আমি যেতে পারব না।'

'কিছুতেই হবে না সেটা। তুমিই তো আমাকে শিখিয়েছ যে সেন্টিমেন্টের চেয়ে কর্তব্য বড়।' নিজেই দরজা খুললেন এমিলি। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রোমের পথে রওনা হলেন সুভাষ।

রোমে ডিউস-এর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল। জানা গেল যে সাক্ষাতের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিয়ানো আর ইকবাল সিদেইকেও তাঁর অফিসেই উপস্থিত থাকতে বলেছেন ডিউস। নেতাজিকে এরকম গুরুত্ব দেওয়াতে সিদেই বেশ ক্ষুব্ধ। তবে ডিউসের উৎসাহ দেখে সিয়ানো ভোল বদলে ফেলেছেন।

'সিদেই-এর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোনও বোঝাপড়া হওয়া সম্ভব নয়। সেটা হল, ভারতবর্ষের অখণ্ডতা। এ ব্যাপারে কোনও আপসের মধ্যে নেই আমি। দরকার হলে আমি আমার নিজের মাথাও কেটে দিতে পারি, কিন্তু আমার মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ হতে দেব না। এ ব্যাপারে কোনও আপস আমি করতে পারব না। তা ছাড়া, ক্ষমা করবেন ডিউস, এই আপস, সমঝোতা, কম্প্রোমাইজ কথাগুলোকেই মন থেকে ঘেন্না করি আমি। আপসের পথে একবার চলতে শুরু করলে আর নিস্তার নেই।'

সিদেই-এর আসার সময় হল। তাই ডিউস নেতাজিকে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বললেন। একটু পরেই সিদেই আর সিয়ানো এসে ঢুকলেন।

সুভাষের প্রসঙ্গ উঠতে সিদেই বলে উঠলেন, 'ডিউস, আপনি এই ফালতু লোকটিকে কেন পাত্তা দিচ্ছেন! কংগ্রেস, কমিউনিস্ট— সবাই তাকে ত্যাগ করেছে। গাঁধীজি তো তাকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়েই দিয়েছেন। গত এগারো মাস ধরে এই লোকটা হিটলারের দরজায় অপেক্ষা করে কিন্তু পাত্তা পায়নি।'

এবার ভেতরের ঘর থেকে নেতাজিকে ডাকতে পাঠালেন মুসোলিনি। সুভাষ, পাশের ঘরেই আছেন জেনে সিদেই একটু হকচকিয়ে গেলেন। তবু বললেন, 'আপনি বোসকে কাজে লাগাতে চাইলে লাগান। তবে তার আগে তাকে একটা বাজিয়ে নেবেন।'

নেতাজি এসে সিদেইকে সোজা জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস্টার ইকবাল সিদেই। আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি? দয়া করে বলুন, দিল্লির তখতে আজ পর্যন্ত একজনও মুসলমান শাসক বসেছেন, না বসেননি?'

প্রশ্ন শুনে সিদেই চোখ নামিয়ে নিলেন।

'ডিউস, ইতিহাসে আপনার জ্ঞানের কথা সবাই জানে। দিল্লির মসনদে শেরশাহ, আকবর, জাহাঙ্গীরের মতো বাদশাহরাই শুধু নয় আওরঙজেবের মতো গোঁড়া মুসলমান বাদশাও রাজত্ব করেছেন। এ কথা ঠিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সে সময়েও ছিল। কিন্তু তবু ভারতের হিন্দু মুসলমান দিল্লির অধীনে বাস করত। তারা দিল্লির বাদশাহকে মানতো নিজেদের শাসনকর্তা হিসাবে, মুসলমান হিসাবে নয়। আমি নিজে ভারত ছাড়ার আগেই জিন্না সাহেবকে বলেছিলাম যে আপনিই স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হোন, কিন্তু ভারতবর্ষকে টুকরো করবেন না। মিস্টার সিদেই, গৌরবময় ইতিহাস আর সংস্কৃতিকে দয়া করে ভুলে যাবেন না। দ্বিজাতি-তত্ত্বের এই বিষবৃক্ষ আর বাড়তে দেবেন না।'

মুসোলিনির ইচ্ছে সত্ত্বেও সিদেই কোনও কথাই মানলেন না। একসময় চলে গেলেন তিনি। ডিউস নেতাজিকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার জন্য আর কী করতে পারি আমি?'

'আমার পূর্ব এশিয়ায় যাবার ব্যবস্থা করে দিন।'

'এই যুদ্ধের সময় এতদূর যেতে হলে জার্মানি আর ইতালি দুই দেশেরই সহযোগিতা প্রয়োজন। তা ছাড়া অক্ষশক্তির দুটি দেশ একসঙ্গে আপনাকে পাঠালে রাজনৈতিক দিক থেকে সেটা অন্যরকম গুরুত্ব পাবে।'

নেতাজিও বুঝলেন। সত্যিই তো! এতদিন জার্মানির সাহায্য নিয়ে, যাওয়ার সময় এইভাবে যাওয়া কেন? তার চেয়ে খোশামোদপ্রিয় হিটলারকে একটু খুশি করে পূর্বদিকে গিয়ে নিজের স্বপ্নকে সাকার করে তোলাই ভাল। তিনি বললেন, 'কিন্তু হিটলারের চারপাশে যে কঠিন বর্ম রয়েছে, তাকে ভেদ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা দারুণ মুশকিল।'

'সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাকে পূর্ব এশিয়ায় পাঠানোর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আমি নিজে তাঁকে খবর পাঠাচ্ছি।' মুসোলিনি কথা দিলেন।

নেতাজি উঠে দাঁড়ালে, মুসোলিনিও উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন তাঁর সঙ্গে। 'দেখুন ফ্যুয়েরারের সঙ্গে দেখা করে কী হয়! যদি সুরাহা কিছু না হয়, আমার কাছেও এমন পাইলট আছে যে আপনাকে বার্মার রেঙ্গুন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবে। অবশ্য ওইরকমভাবে যাওয়ার বিপদ অনেক। তবে উপায়ান্তর না থাকলে তাই করতে হবে।'

২

'আমার চাঁদে যেন কলঙ্ক না লাগে।'

'মানে?'

'না। তুমি হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ তো! তাই বললাম।' এমিলি বললেন।

নেতাজি হাসলেন। প্রিয়তমের ভাবমূর্তি যেন একটুও মলিন না হয় সেজন্যই এমিলির চিন্তা। নেতাজিও এমিলির এই ভাবনাকে মর্যাদা দেন।

হিটলারের সঙ্গে নেতাজির সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবার জন্য জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও দু'বার সাক্ষাতের দিন বদলেছে। শেষ পর্যন্ত ২৯ মে, ১৯৪২ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছে। হিটলারের সহায়তা চাই নেতাজির। অন্যদিকে হিটলারের পতন ঘটানোর জন্য অ্যাডাম ট্রট আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই সাক্ষাৎকারে অনেক পরস্পরবিরোধী লোক মিলিত হতে চলেছেন। ফ্যুয়েরার

এখন আছেন পূর্ব প্রুশিয়ার রাস্তেনবার্গের 'কলফসচেজ নেজ'-এর সামরিক ঘাঁটিতে।

২৮ মে তারিখে একটা বিশেষ বিমানে নেতাজি বার্লিন থেকে প্রুশিয়ার দিকে রওনা হলেন। সঙ্গে আছেন কেপলার আর অ্যাডাম ট্রট। দুপুরে রাস্তেনবার্গের বিমানঘাঁটিতে চিলের ছোঁ মারার মতো বিমানটা নামল। ঝলমলে রোদ্দুরে চকচক করছে বিমানটা। জঙ্গলে ঘেরা এই গোপন বিমানঘাঁটিতে নেতাজিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী হের ফন রিবেনট্রপ স্বয়ং উপস্থিত। সঙ্গে আছেন হিটলারের ব্যক্তিগত অনেকে। রিবেনট্রপ নেতাজির সঙ্গে অধ্যাপক ওয়েইস্টের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এ ছাড়াও রয়েছেন ফ্যুয়েরারের বিশেষ প্রতিনিধি মার্টিন বোরমান।

'মিস্টার বোস, আপনার কাছে টিলক-এর *গীতারহস্য*-এর নতুন সংস্করণটা আছে কি?'

অধ্যাপক ওয়েইস্টের আকস্মিক প্রশ্নে সুভাষ যারপরনাই অবাক। তাঁর হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক ওয়েইস্ট হেসে বললেন, 'মিস্টার বোস আমি মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। আপনাদের কালিদাস, ভবভূতি— সকলকেই আমার বাড়িতে পাবেন আপনি। তবে লোকমান্য টিলক আমাকে দারুণভাবে অভিভূত করেছেন।'

এরকম একজন লোক এখানে কেন? থাকতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেললেন নেতাজি।

'হের হিমলার আমার বিশেষ বন্ধু। তাই ফ্যুয়েরার-এর সঙ্গে অনেকবারই সাক্ষাৎ হয়েছে আমার।' স্মিত হেসে অধ্যাপক ওয়েইস্ট বললেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর এমন শ্রদ্ধাশীল একজনকে হিটলারের খাস ডেরায় দেখে নেতাজি উৎফুল্ল।

হিটলারের সাক্ষাৎ পেতে সময় লাগলেও এখন প্রস্তুতিটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। এই বৈঠকের জন্য হিটলার, হিমলার আর বোয়েরিং-এর মতো নিকটতম সহযোগীদের ডেকে পাঠিয়েছেন। রাতে রিবেনট্রপ একটা ডিনারের আয়োজন করেছেন। নেতাজি বুঝলেন জার্মানির কাছে তাঁর প্রত্যাশা কী সেটা জানতেই মূল সাক্ষাৎকারের আগে এই ডিনারের আসর। অধ্যাপক ওয়েইস্টকে সঙ্গে নিয়ে হিমলার এসে পৌঁছলেন সেখানে। ভারতীয় নেতাকে ভাল করে খাতির-যত্ন করার জন্য হিটলারের নির্দেশ মানতে সবাই উঠে পড়ে লেগেছেন।

পরের দিন বেলা চারটের সময় হিটলারের ব্যক্তিগত স্টাডিরুমে বৈঠক। কামরাতে গোনা গুনতি কয়েকজন। রিবেনট্রপ, কেপলার, রাষ্ট্রদূত হাভেল, আর হিটলারের ব্যক্তিগত দোভাষী ড. স্মিডত্ আগে থেকেই উপস্থিত রয়েছেন সেখানে। নেতাজি এলেন অ্যাডাম ট্রটের সঙ্গে। সামনের দেওয়ালে ইউরোপ আর এশিয়ার সংযুক্ত ভুখণ্ডের একটা বড় মানচিত্র টাঙানো রয়েছে। তা ছাড়াও জার্মানির বিভিন্ন ঘাঁটির স্থান নির্দেশ করা রয়েছে অন্য একটা মানচিত্রে।

নেতাজি ঘরে ঢুকতেই হিটলার তাঁকে 'ফ্রাইজ ইন্ডিশে ফ্যুয়েরার— স্বাধীন ভারতের নেতা।' সম্বোধন করে হ্যান্ডশেক করলেন।

নেতাজি উপহারের বাক্সটা দিলেন হিটলারের হাতে। বাক্সটা খুলে হিটলার দেখলেন জিনিসটা একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি। অ্যাডাম ট্রট মূর্তিটা দেখে হতবাক। হিটলারের হাতে পদ্মাসনে বসা বুদ্ধের মূর্তি! কার মূর্তি বুঝতে না পেরে মূর্তিটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হিটলার প্রশ্ন করলেন, 'এটা কি কোনও মুষ্টিযোদ্ধার মূর্তি?'

'এটা বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান বুদ্ধের মূর্তি। শান্তি, অহিংসা আর দয়াধর্মের প্রতীক।'

'শান্তি? অহিংসা? তা এই লোকটি কি মিস্টার গাঁধীর সিনিয়র না জুনিয়র?' হিটলার প্রশ্ন করলেন।

এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে হেসে ওঠার সাহস নেই কারও। অথচ হাসি চেপে রাখতে প্রাণ বেরোচ্ছে সবার। অ্যাডাম ট্রটের অবস্থা সবচেয়ে কাহিল।

শুরুতে সবাই চুপ। কী দিয়ে শুরু করা যায় বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। হিটলার জার্মান ভাষায় বলতে শুরু করলে অ্যাডাম ট্রট তাঁর দোভাষী হিসাবে তর্জমা করতে লাগলেন। হিটলারের খাস দোভাষী স্মিডত্ তরতর করে নোট নিয়ে চলেছেন। হিটলারকে খুব প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

'বার্লিনে আপনার দিনগুলো কেমন কাটছে? "ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার" আর "ইন্ডিয়ান লিজিয়ন"-এর কাজকর্ম কেমন চলছে?' প্রশ্ন করলেন হিটলার।

আজ পর্যন্ত জার্মানি তাঁর সঙ্গে যে সহযোগিতা করেছে প্রথমেই তার জন্য হিলটারকে ধন্যবাদ জানালেন নেতাজি। তারপর বললেন, 'ইওর একসেলেন্সি। স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষাই আমাকে জার্মানিতে টেনে এনেছে। প্রথম থেকেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে পারবে না। দেশের জন্য রক্ত ঝরাতে আমরা প্রস্তুত কিন্তু জার্মানি, ইতালি আর জাপান— অক্ষশক্তির এই ত্রয়ীর সাহায্য আমাদের খুবই প্রয়োজন। সে সাহায্য যদি আমরা পাই তবে ব্রিটিশের বারোটা বাজাতে আমরা নিশ্চয় পারব।'

হিটলার হেসে বললেন, 'ইতালি আর জাপানকে তো আপনি ইতিমধ্যেই বশ করে ফেলেছেন। অবশ্য তাতে খুশিই হয়েছি আমি।'

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আলোচনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ করছেন। স্তুতিতে দেবতারাও বশ হন! এ তো খোশামোদপ্রিয় হিটলার! কাজ উদ্ধার করার জন্য আপাতত এই সহজ রাস্তাটাই শ্রেয় মনে হচ্ছে নেতাজির। হিটলারকে 'রেভোলিউশনারি' বলে সম্বোধন করায় হিটলার খুশি।

নেতাজি তারপর বললেন, 'আজকের দিনটা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয় থাকবে।' হঠাৎ হিটলারের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। কপালটাও একটি কুঁচকে গেল। তাঁর ভাবান্তরে বৈঠকেও নীরবতা। হাতটা মুঠো পাকিয়ে হিটলার বললেন, 'ভারতবর্ষে শৌর্য বীর্যের অভাব আছে বলে মনে হয় আমার। আটত্রিশ কোটি লোকের এই বিরাট দেশটাকে লাখখানেক ব্রিটিশ বাইরে থেকে এসে মুখে ঠুলি পরিয়ে দুশো বছর ধরে শাসন করে কী করে? ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যা যদি আমার থাকত তা হলে আমি কবে সারা পৃথিবী দখল করে ফেলতাম।'

সুভাষ এ কথার কী উত্তর দেন শোনার জন্য অ্যাডাম ট্রটসহ সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছেন। আলোচনা এরকম একটা মোড় নেওয়ায় সুভাষও প্রথমে একটু বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তারপর শান্ত দৃঢ়স্বরে বললেন , 'ইয়োর একসেলেন্সি, পরাধীনতার এই শিকল ছিঁড়বেই এ কথা খুব নিশ্চিত হয়েই বলছি আমি।'

কথাটা হিটলারের মনে যে বিশেষ দাগ কাটেনি বুঝলেন সুভাষ। তিনি বলতে লাগলেন, 'ব্রিটিশ শাসনে বিশেষ করে এই যুদ্ধের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ আজ একটা ইস্পাতে তৈরি কারাগারের রূপ নিয়েছে। সেই ইস্পাত কারা ভেঙে, একা এক তরুণ নেতা সহায়হীন সম্বলহীন অবস্থায় দেশের বাইরে এসে স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছে। বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান দেশের নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করছে। এ দৃষ্টান্তের পরেও কি আপনি বলবেন যে ভারতে বীরত্বের অভাব আছে?'

নেতাজির কথায় এবার হেসে উঠলেন হিটলার। কিন্তু আবার নেতাজিকে খোঁচা মেরে বললেন, 'সে যাই হোক, আমার ধারণা যে আগামী দেড়শো বছরেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না।'

'না, ইয়োর একসেলেন্সি। আপনি দেখে নেবেন এই মহাযুদ্ধেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটবে। আগামী পাঁচ-দশ বছরের মধ্যেই ভারত স্বাধীন হবেই। আমাদের বীরত্ব আছে কী না ভবিষ্যৎই সাক্ষী দেবে তার।'

নেতাজির কথা বলার ধরনে, তাঁর বিশ্লেষণে হিটলার এবার একটু সাবধান হলেন। জ্ঞানবুদ্ধিতে একজন এশীয় নেতার কাছে খাটো বলে প্রতিপন্ন হতে চান না তিনি। তাই বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির ওপর লম্বা চওড়া ভাষণ দিতে শুরু করলেন তিনি। টেবিলের ওপর রাখা ম্যাপ পয়েন্টারটা হাতে নিয়ে দেওয়ালের ম্যাপের কাছে গেলেন। ভারতবর্ষের সীমান্তর দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'দেখুন। জার্মানির সীমান্ত থেকে ভারতবর্ষের সীমান্ত কত দূরে। এত দূরে ফৌজ পৌঁছনো খুব একটা বাস্তববুদ্ধির ব্যাপার হবে না। একমাত্র উপায় বিমান আক্রমণ। আজকের পরিস্থিতিতে সেটাও সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। তবে একবার মস্কোর পতন ঘটলে রাশিয়ার সীমান্ত থেকে ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হওয়া অনেক সহজ হবে।'

'জাপানের যুদ্ধে যোগ দেওয়া সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?' নেতাজি প্রশ্ন করলেন।

'জাপানের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমি এখনও ঠিক জানি না। পূর্ব এশিয়ায় জাপান যদি সফল হয় তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমাদের ওপরেও চাপ অনেক কমবে।'

'জার্মানি ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে কি সাহায্য করতে পারবে?' নেতাজির প্রশ্ন।

'আমরা এখন ভারতের সীমান্ত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেও সেখানে পৌঁছতে আমাদের অন্তত দু' বছর লাগবে। তার চাইতে জাপানের যুদ্ধে নামার পরে পূর্ব এশিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়াটাই আপনার পক্ষে ভাল হবে। আপনাদের গাঁধী আর নেহরু ফ্যাসিজম আর নাৎসিজমের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেলছেন। কিন্তু খালি অসহযোগ আর অনশন করে খুব একটা লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না।'

হিটলারের হাতের ছড়ি এবার ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্তে নির্দেশ করল। 'আপনার এমন কোনও জায়গা বেছে নেওয়া উচিত যেখান থেকে ভারতের সীমান্তে পৌঁছে ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করার সুবিধে হবে।'

'আমিও চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূর্ব এশিয়ায় গিয়ে সেখান থেকে ভারতের সীমান্ত যাওয়ার চেষ্টা করতে।'

অনেক বছর ধরে নেতাজির মনে একটা বিশেষ বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। বলবেন কি বলবেন না স্থির করতে পারছেন না তিনি। হিটলার তাঁর আত্মজীবনী *মাইন কাম্প*-এর একটা পরিচ্ছেদে ভারত সম্বন্ধে কটূক্তি করেছেন। সুভাষ চান সেই পরিচ্ছেদটা ভবিষ্যতে পরিত্যক্ত হোক। প্রসঙ্গটা যদি না তোলেন তবে দেশের প্রতি অন্যায় আর তুললে বর্তমান আলোচনা নিষ্ফল হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন তিনি।

'ইয়োর একসেলেন্সি। *মাইন কাম্প*-এর ওই পরিচ্ছেদটা যদি আপনি বাদ দেন তো খুব ভাল হয়। নয়তো ব্রিটিশের এজেন্টরা ওই পরিচ্ছেদটা দেখিয়ে ভারতবাসীদের উত্তেজিত করে তুলবে।'

হিটলার মনে করেন যে তাঁর প্রতিটি কথাই বেদবাক্য। সুতরাং সুভাষের কথা তাঁর কাছে আস্পর্ধা বলেই মনে হল। যে বই সারা জার্মানিতে পুজো পায় তাকে পালটাতে বলছে এই অর্বাচীন ভারতীয় নেতা। মনে মনে দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েও ওপরে ওপরে ভদ্রতার মুখোশ বজায় রাখলেন তিনি। অবশ্য গলার স্বরে ভেতরের রাগটা সম্পূর্ণ চাপা থাকল না। 'আপনাদের দেশের মতো পরাধীনতার মনোভাব জার্মানদের যেন গ্রাস করতে না পারে এই ভেবেই ওই পরিচ্ছেদটা লিখেছি আমি।'

মাইন কাম্প প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে হিটলার এবার জার্মানির সম্ভাব্য ভূমিকা স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। 'আপনাদের সীমান্ত পর্যন্ত যাবার কোনও ইচ্ছে আপাতত আমাদের নেই। তবে আপনি

পূর্ব এশিয়ায় যেতে চাইলে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করব। এ ব্যাপারে ডিউস-ও সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন।' কথাটা শুনেই নেতাজির মন থেকে একটা ভার নেমে গেল। ট্রটও খুশি হয়ে চোরা চাউনিতে দেখলেন সুভাষকে। পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে ডিউস উৎসাহ দেখিয়েছেন জেনে নেতাজির খুব ভাল লাগল। হিটলার অবশ্য বলে চলেছেন।

'তবে এ ব্যাপারে ইতালির পরামর্শটা ভাল লাগছে না আমার। ইতালিয়ান পাইলটরা যতই সাহসী আর দক্ষ হোক তাদের ভরসায় জাপান যাওয়ার সাহস না করাই ভাল। এ ধরনের ঝুঁকির পক্ষে আপনার জীবন বড় বেশি মূল্যবান। আসলে আকাশপথ এখন অনেক বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। বিমানকে যেতে হবে অনেকগুলো ব্রিটিশ প্রভাবিত দেশের ওপর দিয়ে। যে-কোনও মুহূর্তে তারা একটা কিছু করে ফেলতে পারে।'

টেবিলের ওপর রাখা একটা চিঠি হাতে নিয়ে হিটলার বললেন, 'জাপানি রাষ্ট্রদূত ওশিমা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আমি তাঁর কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। আমার মনে হয় জার্মান কিংবা জাপানি ডুবোজাহাজে পূর্বদিকে যাওয়াই আপনার পক্ষে ভাল।' বলতে বলতেই হিটলার আবার মানচিত্রের কাছে চলে গিয়ে ডুবোজাহাজের সম্ভাব্য পথ নির্দেশ করলেন। কেপ অফ গুডহোপ, নাতাল বন্দর ইত্যাদি ঘুরে রাস্তা। অন্তত সাত-আট সপ্তাহের সফর।

হিটলার আরও বললেন, 'পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্রের ধারে ধারে ব্রিটিশ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বহু জায়গায় সমুদ্রে মাইন পাতা হয়েছে। এইসব সম্ভাব্য বিপদগুলো মাথায় রেখেই এগোতে হবে আপনাকে।'

রাশিয়াতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে হিটলার যে সামরিক দিক দিয়ে কোনও সাহায্য করতে পারবেন না সেটা নেতাজির জানাই ছিল। তিনিও তো পূর্ব এশিয়ায় যাবার জন্যই উদ্‌গ্রীব। হিটলার নিজে থেকেই প্রস্তাব করায় ভীষণ খুশি তিনি। নেতাজিকে পূর্ব এশিয়া যাত্রার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে হিটলার বৈঠক শেষ করলেন।

বার্লিনে পৌঁছে সোফিয়নস্ট্রাসের বাড়িতে জাপানি রাষ্ট্রদূত ওশিমা, কর্নেল ইয়ামামোতো আর ট্রটের জন্য খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করলেন সুভাষ। ফ্যুয়েরার জাপানি রাষ্ট্রদূতের প্রসঙ্গে যা বলেছেন সেটা শুনে হেসে উঠলেন ওশিমা। 'আরে আমি তো আপনার এই ভারতীয় বন্ধুটিকে কীভাবে নিরাপদে জাপানে নিয়ে যাওয়া যায় সেই ব্যাপারে আলোচনা করতেই ফ্যুয়েরারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছিলাম।' সবাই খুশি। আবার একপ্রস্ত পানীয় পরিবেশিত হল।

অ্যাডাম ট্রট নেতাজিকে বললেন, 'হিটলারের চড়া চড়া কথার তুমি অত ভালভাবে আর শান্তভাবে জবাব দিতে পারবে বলে ভাবিনি আমি। সত্যি তোমার বন্ধু বলে গর্ব হচ্ছে আমার।'

নেতাজি হেসে বললেন, 'আসলে আমি তো বলছিলাম না। আমাদের গৌরবময় অতীত আর বর্তমান পরাধীনতার যন্ত্রণা আমাকে দিয়ে বলাচ্ছিল।'

ওশিমা যখন ভগবান বুদ্ধের মূর্তি দেখে হিটলারের 'মুষ্টিযোদ্ধা' বলার গল্প শুনলেন তখন অনেকক্ষণ ধরে তার হাসি আর থামতেই চায় না।

৩

মহাযুদ্ধ! মহাযুদ্ধ!

১৫ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশের 'অজেয় দুর্গ' সিঙ্গাপুরের পতন ঘটেছে। বার্লিন বেতার থেকে সুভাষচন্দ্র জানিয়েছেন 'সিঙ্গাপুরের পতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের আর ভারতের উত্থান শুরু হওয়ার লগ্ন।'

সিঙ্গাপুর থেকে এবার জাপানি ফৌজ এগিয়ে চলবে বর্মার ওপর দিয়ে। চিন আতঙ্কিত। ফেব্রুয়ারি মাসেই চিনের সর্বেসর্বা চিয়াং কাই শেক সস্ত্রীক ভারতে এসে গাঁধীজিকে মিনতি করলেন, 'ব্রিটিশকে দয়া করে সহায়তা করুন।'

মহাযুদ্ধ! মহাযুদ্ধ!

মহাযুদ্ধের গতিপ্রকৃতিতে শুধু চিন নয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও অস্থির হয়ে উঠেছেন। চার্চিলকে কড়া ভাষায় জানালেন, 'শিগগির যদি ভারত সম্পর্কে আপনাদের নীতির মৌলিক পরিবর্তন না করা হয় তবে ভারত ফ্যাসিস্টদের খপ্পরে চলে যাবে।' রেঙ্গুন থেকে চট্টগ্রাম আর কলকাতা বেশি দূরে নয়। চার্চিলের টনক নড়ল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখাই তাঁর গোঁ। ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কোনও ইচ্ছে নেই তাঁর। তড়িঘড়ি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে একটি মিশন ভারতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

মহাযুদ্ধ! মহাযুদ্ধ!

ভাইসরয় থেকে শুরু করে সমস্ত পর্যায়ের ব্রিটিশ অফিসারদের রাতে ঘুম হচ্ছে না। দেশের বিভিন্ন শহরে বার্লিন রেডিয়ো থেকে প্রচারিত সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা অনেকেই শুনতে পাচ্ছে। একদিকে জার্মানি অন্যদিকে জাপান— দু' দিক থেকেই ভেসে আসছে ব্রিটিশবিরোধী প্রচার। 'ইংল্যান্ড আমেরিকার মিত্র শক্তি কিছুতেই এ যুদ্ধে জিততে পারবে না।' ওয়ার্ধা আশ্রমের দেওয়ালগুলোও যেন এই কথাই বলছে।

ক্রিপস এসে পৌঁছেছেন দিল্লিতে। আলাদা আলাদা করে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। আলোচনা হয়েছে নেহরু, আজাদ ছাড়াও জিন্না সাহেব আর ডক্টর আম্বেডকরের সঙ্গে। অনেক ভারতীয় নেতার সঙ্গেই ক্রিপসের আগে থেকেই বন্ধুত্ব রয়েছে। তাই চার্চিল তাঁকেই পাঠিয়েছেন এই মিশনের নেতৃত্ব দিয়ে।

দীর্ঘদেহী ক্রিপস সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে বিশ্বাসী। আনুষ্ঠানিক আলোচনার চেয়ে ঘরোয়া আলোচনাই এই দীর্ঘদেহী হাস্যরসিক মানুষটির বেশি পছন্দ।

একদিন গাঁধীজির সঙ্গেও আলোচনা করতে বসলেন তিনি। মজা করে বললেন, 'শুনতে পাচ্ছি আজকাল আপনি বার্লিনের "আজাদ হিন্দ রেডিয়ো" খুব শুনছেন?'

'ঠিকই শুনছেন।' গাঁধীজির স্পষ্ট উত্তর পেয়ে ক্রিপস স্তম্ভিত।

'মিস্টার গাঁধী। সারা পৃথিবী আপনাকে মানে অহিংসার মূর্ত প্রতীক হিসাবে। আপনার কি ফ্যাসিজম আর নাজিজম-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত নয়।'

'মিস্টার ক্রিপস, ফ্যাসিবাদের সমর্থন আমি কখনও করিনি। কিন্তু মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হিটলারের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে সই কারা করেছিল?'

'সে তো চুকেবুকে গেছে। কিন্তু আপনার নাজি বিরোধিতায় ইদানীং ভাটা পড়েছে এটাও তো সত্যি।'

'যে ভাবে এবং যত অল্পসময়ের মধ্যে আপনারা সিঙ্গাপুর, মালয় আর রেঙ্গুন ছেড়ে দিয়েছেন তাতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের ওপর কতটা ভরসা করা যায়? আর তা ছাড়া জাপানের সঙ্গে তো আমাদের কোনও শত্রুতা নেই।'

ক্রিপস প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর পাকিস্তানের কথা রয়েছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে গাঁধীজি বললেন, 'আপনার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার অর্থ ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করার প্রস্তাব মেনে নেওয়া। তা ছাড়া এই মুহূর্তে আপনারা আমাদের কী দিচ্ছেন? কতকগুলো ফাঁকা প্রতিশ্রুতি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের এইসব প্রতিশ্রুতি "ফেল হওয়া ব্যাঙ্কের ওপর পোস্টডেটেড চেক" মনে হচ্ছে না কি?'

ফিরে গেলেন ক্রিপস। সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিপস প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ায় আজাদ হিন্দ রেডিয়ো থেকে প্রচারিত হল সুভাষচন্দ্রের আন্তরিক অভিনন্দন।

মহাযুদ্ধ! মহাযুদ্ধ!

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য ১৭ এপ্রিল এলাহাবাদের আনন্দ ভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। গাঁধীজি আসেননি, তবে তাঁর প্রস্তাব নিয়ে মীরা বেন এসেছেন। কয়েকদিন আগেই রাজাজি পাকিস্তান প্রস্তাবকে জোরদার সমর্থন জানিয়েছেন। এই প্রকাশ্য ঘোষণা বৈঠককে একটা নতুন মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। 'ব্রিটিশ আগে ভারত ছেড়ে চলে যাক। কোনও দেশের সঙ্গেই আমাদের শত্রুতা নেই। তা সত্ত্বেও যদি আমরা আক্রান্ত হই তো তার প্রতিরোধ অহিংসভাবেই আমরা করব।'— এটাই হল গাঁধীজির প্রস্তাবের মূল বক্তব্য।

এই প্রথম গাঁধীজির প্রধান শিষ্যদের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা সৃষ্টি করল এ প্রস্তাব। পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ এ প্রস্তাবে স্তম্ভিত। অন্যদিকে ডা. সীতারামাইয়া, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনি আর সর্দার পটেল গাঁধীজি যা বললেন তাই করতে প্রস্তুত।

মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরুকে বললেন, 'লোকটা বার্লিন চলে গিয়েও কংগ্রেসের মধ্যে কোঁদল তৈরি করছে।'

'কার কথা বলছেন? সুভাষের?' নেহরু বললেন।

'তবে আবার কে? ইদানীং গাঁধীজি যে কেন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সেটা আমি বুঝতে পারি না। ক্রিপসের মতো সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের মানুষেরা এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ।'

মৌলানা আজাদ এবং পণ্ডিত নেহরু গাঁধীজির প্রস্তাবের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে গাঁধীজির বিরোধিতা করার জন্য যে কতখানি সাহস লাগে সেটা মর্মে মর্মে বোঝেন নেহরুজি। বাবার সতর্কবাণী মনে পড়ে তাঁর। অবশেষে সময়ের গতি বুঝে একটা আপস প্রস্তাব রচনা করলেন তিনি।

মহাযুদ্ধ! মহাযুদ্ধ!

সারা পৃথিবীর আকাশছাওয়া যুদ্ধের মেঘ গাঁধীজির মনেও আলোড়ন তুলেছে। 'হরিজন' পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরোচ্ছে। 'স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা মানে কতদিন অপেক্ষা? এ অন্তহীন অপেক্ষা কি পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত করতে হবে?'

গাঁধীজির এই রকম মানসিক অবস্থার সময় আশ্রমে এলেন স্বনামধন্য মার্কিন সাহিত্যিক সাংবাদিক লুই ফিশার। আশ্রমের সুভাষবাদী পরিমণ্ডল দেখে রীতিমতো উত্তেজিত হয়েই তিনি

গাঁধীজিকে বললেন, 'যে লোক ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, তার জন্য আপনার কীসের এত মমতা?'

'বিকজ আই রিগার্ড সুভাষ বোস অ্যাজ এ পেট্রিয়ট অব দ্য পেট্রিয়টস। দেশভক্তদের মধ্যেও অনন্য সুভাষ। তার পথ হয়তো ভুল। হয়তো কেন? সত্যিই ভুল। আমি অনেকবার তার বিরোধিতা করেছি। নয়তো সে দু-দুবার পুরো সময়ের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি থাকত। আজ যদি সুভাষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা বা রাশিয়ার সহায়তা চাইত তবে কি ভাল হত?'

'নিশ্চয়ই। আপনি কাদের সঙ্গে রয়েছেন সে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

'আজকের দুনিয়ায় নাজি-ফ্যাসিস্ট আর ইংল্যান্ড আমেরিকার মধ্যে তফাতটা কোথায় মিস্টার ফিশার? সবারই একটাই প্রিয় বিষয়— সাম্রাজ্যের বিস্তার। আমেরিকা কখনওই সুভাষকে সাহায্য করত না। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য রুজভেল্ট সাহেব আটলান্টিক চার্টারের অমৃতকুম্ভ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু সে অমৃত যে ভারতের জন্য নয় সে কথা চার্চিল স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। এ ধরনের ভণিতা করার মানে কী?'

৬ জুলাই ওয়ার্ধাতে বৈঠকে গাঁধীজি মৌলানা আজাদকে বললেন, 'ব্রিটিশকে "ভারত ছাড়ো" বলাই আমার মত।' গাঁধীজিকে এভাবে জন-আন্দোলনের ডাক দেওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প দেখে ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্য বিস্মিত। মৌলানা আজাদ আর পণ্ডিত নেহরু যখন এই আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করলেন, গাঁধীজি তাঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়বেন না তিনি।

'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ আন্দোলনের জন্য একটুও প্রস্তুত নয়।'

'ওয়ার্কিং কমিটি মানে সমস্ত ভারতবর্ষ নয়। তোমরা তৈরি না থাকলেও আমি জনসাধারণের কাছে আন্দোলনের ডাক পৌঁছে দেব।' গাঁধীজি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তাঁদের।

রোজকার মতো গাঁধীজির পায়ের তলায় কস্তুরবা তেল মালিশ করে দিচ্ছিলেন। গাঁধীজি বললেন, 'বা, জন আন্দোলনের জন্য ডাক দেওয়ার মিনতি নিয়ে দু' বছর আগে সুভাষ এসেছিল এই আশ্রমে। প্রাণপণে বোঝাতে চেয়েছিল আমাকে। আজ যখন সেই আন্দোলনের ডাক দিতে চাই আমি, সে ডাক শোনার জন্য সে আর পাশে নেই।'

গাঁধীজির সংকল্প বজ্রকঠিন। সোজা বলে দিয়েছেন তিনি, 'আমার সিদ্ধান্ত যাঁর পছন্দ নয়, অনায়াসেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ছেড়ে দিতে পারেন তিনি।' রাজাজি তো আগেই বেরিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়। গাঁধীজিকে বিদ্রুপ করে তিনি বলেছেন, 'বাপুজি যে এখনও সুভাষের ফৌজের উর্দি পরেননি, সেটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।'

সর্দার পটেল গাঁধীজিকে একান্তে পেয়ে ত্রিপুরী কংগ্রেসের পুরনো কথা উত্থাপন করলেন। 'সে সময় ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্যের ইস্তফাপত্র এককাট্টা করার জন্য সুভাষ আর সারা বাংলার চক্ষুঃশূল হয়ে উঠেছিলাম আমি। কিন্তু বাপুজি আপনি নিশ্চয়ই ভোলেননি যে সে কাজটা করতে আপনিই বাধ্য করেছিলেন আমাকে। বাপু, ইউ কমপেলড মি!'

উত্তরে গাঁধীজি শুধু হাসলেন। বল্লভভাই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ আবার সুভাষের জন্য আপনার মন কাঁদছে কেন বাপুজি?'

এইবার গাঁধীজি মুখ খুললেন, 'সুভাষের সঙ্গে আমি সর্ব বিষয়ে একমত এটা কখন বলেছি আমি? আবার তার সঙ্গে কোনও বিষয়েই একমত নই তাই বা কখন বলেছি আমি? তবে এটা ঠিক যে সুভাষের মতো আমার কাছেও আজ ব্রিটিশের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি

আজ স্পষ্ট বুঝেছি যে গোলামির মতো অভিশাপ আর নেই। ব্রিটিশ সরকারকে সহ্য করা পাপ। এ পাপ আর সহ্য করতে পারছি না আমি।'

লুই ফিশারও গাঁধীজিকে প্রশ্ন করলেন, 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের জন্য আপনি এখন এত অধীর হয়ে উঠলেন কেন?'

'এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সুভাষের কাছে গেলেই ভাল করবেন আপনি।'

মহাযুদ্ধ! মহাযুদ্ধ!

৮ আগস্ট, ১৯৪২। বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক পার্কে সমস্ত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে গাঁধীজি ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিগত বাইশ বছরের অনেক কথাই মনে আসছে তাঁর। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তাঁর ধেয়ানের ধন। ভারাক্রান্ত স্বরে তিনি বলে চলেছেন। 'অহিংসার ওপর আমার আস্থা আজও অটুট। অহিংসার নীতি আমার কাছে ভগবানের নির্দেশ। আজ সেই অহিংসার নীতির পরীক্ষা। ব্রিটিশদের শুধু এইটুকু বলতে চাই আমি যে তোমরা ভারত ছেড়ে চলে যাও। আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ভারতবর্ষ অরাজক হয়ে পড়বে কী না তার বিচার করার জন্য তোমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের স্বাধীনতা চাই এবং সেটা এখনই চাই। আমি জানি এই দাবির জন্য আমার দেশবাসীকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আমার দেশবাসীকে জীবনপণ করে আন্দোলনে নামতে আহ্বান করছি। সমস্ত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আজ আমি একটাই মন্ত্র উৎসর্গ করছি। ডাক দিচ্ছি মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনের জন্য। আমাদের মন্ত্র হোক, "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"। এই মন্ত্র আজ থেকে আপনাদের রাতদিন জপের মন্ত্র হয়ে উঠুক। সারা ভারতের প্রতিটি জায়গা থেকে হুঙ্কার উঠুক "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"।'

গাঁধীজির মুখে এ ধরনের জ্বালাময়ী ভাষণ এর আগে কেউ শোনেনি।

৯ আগস্ট, ১৯৪২। রবিবার। সকালে স্নান সেরে প্রার্থনাসভার জন্য তৈরি হয়েছেন গাঁধীজি। বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে হাজির হলেন। গাঁধীজি, মহাদেব দেশাই, মীরা বেন-কে গ্রেফতার করলেন তিনি। স্মিত হেসে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বড় বড় পা ফেলে প্রার্থনাসভার জন্য জড়ো হওয়া জনতার মধ্যে দিয়ে পুলিশ ভ্যানে গিয়ে উঠলেন তিনি।

মহাযুদ্ধ! মহাযুদ্ধ!

গাঁধীজির 'ভারত ছাড়ো' ডাক দেওয়াতে সুভাষ অধীর উল্লাসে আত্মহারা। আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র তাঁর কথা বয়ে আনে। জনতার কাছে 'অহিংস গেরিলা যুদ্ধের' দ্বাদশসূত্রী কৌশল তুলে ধরেন তিনি। সমস্ত দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান, 'বন্ধুগণ। এই আন্দোলন আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যিকারের আরম্ভ। দেশের মধ্যে আর দেশের বাইরে, প্রত্যেকটি ভারতীয়কে আজ ঝাঁপ দিতে হবে এই উত্তাল তরঙ্গের মাঝে। এ আগুনের পরশমণিতে শুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে আমাদের। জার্মানিতে আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈনিক আজ এই সংগ্রামে অংশ নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্রস্তুত রয়েছি আমরা।'

আগস্ট বিপ্লবের আগুন ১৮৫৭-র প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের চেয়ে অনেক বেশি ছড়িয়ে

পড়ল। সারা দেশে স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে। ৩১৮টি থানা ভস্মীভূত, ৯৪৫টি ডাকঘর আক্রান্ত, ৫৯ জায়গায় রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলখানা উপচে পড়ছে। ষাট হাজারেরও বেশি কর্মী গ্রেফতার হয়েছে। অত্যাচারীর পেষণ যন্ত্র অবিশ্রান্ত ঘুরছে। নেতাজি অধীর। এ আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু একটা করতেই হবে। অ্যাডাম ট্রট, আলেকজান্ডার রিথ প্রমুখ প্রতিটি বন্ধুকে মিনতি করেন তিনি, 'যাহোক কিছু একটা কর। আমার পূর্ব এশিয়ায় যাবার ব্যবস্থা করে দাও।'

অরুণোদয়ের দিগন্ত হাতছানি দিচ্ছে তাঁকে। আরামের সুখশয্যা কণ্টকশয্যা হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে।

৪

দেরি মানে কত দেরি? হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেও একটা মাস কাটতে চলেছে। জার্মান সরকারের সামনেও প্রশাসনিক এবং পরিকল্পনাগত সমস্যা রয়েছে। এই সর্বব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে জার্মানি থেকে জাপান পর্যন্ত বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করা সহজ নয়। উপযুক্ত বাহনেরও অভাব।

এদিকে এমিলির প্রসবের দিন এগিয়ে আসছে। ভিয়েনা থেকে এমিলির মা সেখানে যাবার জন্য বারবার খবর পাঠাচ্ছেন। কিন্তু নেতাজি যে-কোনও দিন পূর্ব এশিয়ার পথে রওনা হতে পারেন বলে এমিলি যাচ্ছেন না।

এমিলির জন্য সুভাষও চিন্তিত। এমিলিকে বারবার তিনি মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন। এমিলি বলেছেন, 'শরীরটা সেখানে গেলেও মনটা তো এখানেই পড়ে থাকবে।' নেতাজি যতই বোঝান এমিলি বলেন, 'তোমাকে এত অশান্তির মধ্যে একলা ফেলে কোথাও যাব না আমি।'

নেতাজির ডাকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাড়ে তিন হাজার সৈনিক প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তাঁর জার্মান ও জাপানি বন্ধুরা তাঁর জন্য যথেষ্ট করেন। কিন্তু তবু তাঁর মনে শান্তি নেই। হঠাৎ হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসেন। কখনও বক্তৃতার নোটস তৈরি করেন, কখনও হয়তো রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের দেশাত্মবোধক গান গুনগুন করে গাইতে থাকেন। তাঁর এইসব একান্ত আপন মুহূর্তের একমাত্র সঙ্গী এমিলি। এমিলি জানেন সুভাষ কতখানি নির্ভর করেন তাঁর ওপর। তাই কোথাও যেতে রাজি নন তিনি।

অক্টোবরের শুরু। ইউরোপে আস্তে আস্তে শীত জাঁকিয়ে পড়ছে। তাইজি এমিলির জন্য গরম জামাকাপড় সেলাই করছেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন রোম থেকে খবর এল। ১৫ অক্টোবর, ১৯৪২ রোম থেকে রেঙ্গুনের পথে উড়ে যাবে এক বিমান। দুজন বৈমানিক রাজি হয়েছেন এই দুঃসাহসিক উড়ানের দায়িত্ব নিতে। সময় বেশ কম। বাঁধাছাঁদা শুরু হল। নেতাজির ব্যাগ ভরে গেছে। তাই এমিলি নিজের একটা ব্যাগ খালি করে নিলেন। ব্যাগের মধ্যে থেকে বেরোনো জিনিসপত্রের মধ্যে একটা বাক্সতে একটু হাত বুলিয়ে পাশে রাখতে দেখে নেতাজি বাক্সটা খুলে দেখলেন। বাক্সের মধ্যে সুন্দর একজোড়া নকশা করা মোজা।

'এটা ব্যবহার কর না কেন?' নেতাজি প্রশ্ন করলেন।

'এটা তুমি যখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলে তখন পাঠিয়েছিলে।' এমিলি সরাসরি উত্তরটা এড়িয়ে যেতে চান।

'কিন্তু ব্যবহার না করে তুলে রেখে দেবার কারণটা কী?' সুভাষ জানতে চান। এই মোজা

কেনার ব্যাপারটা মনে পড়ে যায় তাঁর। হরিপুরা কংগ্রেসের পর বোম্বাইয়ের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সঙ্গে অনেক ভক্ত, সমর্থক, কংগ্রেস কর্মী মিছিল করে চলছিলেন। হঠাৎ কলবাদেবীর রাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে এই মোজাজোড়া কিনেছিলেন সুভাষ এমিলির জন্য। আজও সে মোজা যত্ন করে রেখে দিয়েছেন এমিলি। নিজের ফরসা কোমল পা দুটির দিকে তাকিয়ে লাজুকভাবে হাসলেন এমিলি। তাঁর মনেও অনেক স্মৃতির ছবি চলমান। দুজনেই হেসে উঠলেন এবার।

পরের দিন দুজনেই রোমের পথে রওনা হলেন। সঙ্গে অ্যাডাম ট্রটও রয়েছেন। হঠাৎ ট্রট বললেন, 'ইতালিয়ান বৈমানিকেরা তোমাকে নিয়ে যাবেন সেটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু—'

'এখন আবার "কিন্তু" কেন বন্ধু?'

'না সুভাষ। ইতালিয়ানদের পেটে কথা থাকে না। কথাই আছে যে আজ যদি কোনও রোমান সর্দারের কানে অত্যন্ত গোপন কথা তুমি বল, কাল সেটা নাপিতের কাছে শুনতে পাবে।' হাসতে হাসতে বললেন অ্যাডাম।

সকালে মুসোলিনির প্রাসাদে প্রাতরাশ খাওয়া হল। দুপুরে তিনজনে এলেন রোমের সামরিক বিমানবন্দরে। পাশের খাঁড়ি থেকে ফুরফুরে হাওয়া আসছে। বিদায়ের সময় যত এগিয়ে আসছে তত ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছেন এমিলি। বাইরে অবশ্য প্রাণপণে সামলে রাখছেন নিজেকে। সামরিক বিমানটি তৈরি। সুভাষ বিদায় আলিঙ্গন করলেন অ্যাডাম ট্রটকে। একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, সুভাষ চোখের আড়াল হলে পেছন ফিরে দেখলেন একজন পরিচিত অফিসার একটা খবরের কাগজ হাতে দৌড়ে আসছেন তাঁর দিকে। খবরের কাগজটা হাতে নিয়েই বিবর্ণ হয়ে গেল অ্যাডামের মুখ। অ্যাডামকে দেখেই এমিলি বুঝলেন কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই এমিলির মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। কাগজটা লন্ডনের। চোরাপথে আসা কাগজটায় বড় হেডিং দিয়ে খবর বেরিয়েছে, 'ভারতীয় কুইসলিং বোস ইতালিয়ান বিমানে পূর্ব এশিয়ায় যাচ্ছেন।' এমিলির মনে হল চিৎকার করে ওঠেন। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরল না। অবশ্য বেরোলেও লাভ ছিল না। বোমারু বিমানটার ইঞ্জিনটা তখন প্রবল গর্জনে চালু হয়ে গেছে। জায়গায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে বিমানটা। পেটটা দুই হাতে ধরে বসে পড়লেন এমিলি। ঠিক তখনই বন্দুকের গুলির মতো ছুটে গেলেন অ্যাডাম ট্রট। 'স্টপ ইট, স্টপ ইট, স্টপ ইট।' সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করছেন ট্রট। বিমানটাকে সংকেত দিচ্ছেন এক কর্নেল। অ্যাডামকে চিৎকার করতে করতে আসতে দেখে তিনি বুঝলেন কিছু একটা হয়েছে। বুঝেই সংকেত দিলেন, বিমানটাকে। আস্তে আস্তে ইঞ্জিনটা থামল। সুভাষ নেমে এলেন।

৫

'পূর্ব এশিয়ায় যাবার জন্য আর তর সইছে না তোমার।' এমিলি হঠাৎ বলে ফেললেন। বলেই বোধহয় লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন এমিলি।

'হঠাৎ একথা বললে যে?' নেতাজি প্রশ্ন করেন।

সলজ্জ চোখ তুলে এমিলি বললেন, 'যেতে দাও ওকথা। একটা বাচ্চার মা হঠাৎ বলে ফেলেছে কথাটা।'

'আর এখন কে কথা বলছে?'

'দায়িত্ববান স্বামীর কর্তব্যপরায়ণা প্র্যাকটিক্যাল স্ত্রী। বাচ্চার মায়েদের মতো সেন্টিমেন্টাল নয়।'

'না। বাচ্চার মা কি বলছিল আমায় শুনতেই হবে।' সুভাষ পীড়াপীড়ি করেন।

'বাচ্চার মা বেচারি আর কী বলবে? এত দূর দেশে যাচ্ছ অন্তত বাচ্চাটার মুখটা দেখে গেলেই বাচ্চার মা শান্তি পেত।'

'ঠিক আছে। বাচ্চার মুখ দেখে তবে না হয় পূর্ব এশিয়ার রাস্তা ধরব।' হালকা হেসে বললেন সুভাষ।

এবার চমকে উঠলেন এমিলি। কোনও কিছুর মায়া সুভাষকে তাঁর সাধনা থেকে বিচ্যুত করুক, সেটা চান না এমিলি। কাছে এসে সুভাষের দুটি কাঁধ ধরে বললেন, 'না এমন কথা মনে আনতে পারবে না তুমি। আমার গিরিশৃঙ্গকে তাঁর উন্নত মহিমা থেকে একটুও অবনত হতে দেব না আমি। কর্তব্য সবার আগে। তুমিই তো বল যে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ চলে যাচ্ছে। এ সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত বড় বেশি দামি।'

বলতে বলতে এমিলির চোখে জল ভরে আসে। তাঁর চোখের জল মুছে দেন নেতাজি। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'শিশুর নিষ্পাপ হাসির সামনে পৃথিবীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের দাম্ভিক আস্ফালন কত তুচ্ছ! শিশুর কলধ্বনির কাছে সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মূল্যহীন। তেমনি মায়ের আকুতি, মায়ের করুণার সামনে মহাপরাক্রমী মানুষের সমস্ত পরাক্রম থমকে দাঁড়ায়।'

'আমার মধ্যেকার মা'টাকে এবার থেকে সামলে রাখব আমি। আমি তাকে বুঝিয়ে বলব, ওগো, তোমার তো একটি সন্তান নয়। ভারতের আটত্রিশ কোটি মানুষের ভাগ্য থেকে পরাধীনতার কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য তোমার স্বামী তাঁর প্রাণপাত করছেন। তুমি তাঁকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে রেখ না।'

এমিলির কথায় সুভাষ অভিভূত। আদর করে এমিলির নাকটা ধরে একটু নেড়ে দিলেন তিনি। একসময় সাধারণ এক স্টেনোগ্রাফার হিসেবে তাঁর কাছে এসেছিলেন এমিলি। আজ তাঁর জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর ধ্যানকে নিজের করে নিয়েছেন তিনি। ভারতবর্ষের আশা-আকাঙ্ক্ষাই তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা। এমিলি শাড়ি পরতেও শিখে নিয়েছেন। শাড়ি পরা এমিলিকে মুগ্ধচোখে দেখে সুভাষ বলেছিলেন, 'ভোরের আকাশের শুকতারার মতো দেখাচ্ছে তোমাকে।'

দুজনের মনে একটা চিন্তা। এই পূর্বদিকে যাওয়াটা হবে কী করে? তিন চারটে সাগর পেরোতে হবে। সমস্ত রাস্তায় ব্রিটেন, ফ্রান্স আর আমেরিকান নৌবহরের কড়া পাহারা। বহু জায়গায় মাইন পাতা রয়েছে। এদিকে নভেম্বর মাস শেষ হতে চলেছে। তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। বাড়ির ছাদ আর গাছগুলো অনেক সময়ই বরফে ঢেকে যায়।

এদিকে এমিলিরও ভরন্ত মাস। আসন্ন মাতৃত্ব তাঁর চেহারায় একটা আশ্চর্য কমনীয়তা এনে দিয়েছে। মনে হয় এমিলির চোখের মধ্যে দিয়ে আর একজন যেন তার ছোট্ট ছোট্ট চোখ দিয়ে বাইরেটা দেখতে চাইছে।

জাপানি দূতাবাসে নিষ্ফল যাতায়াত চলছেই। ট্রট আর আলেকজান্ডার রিথ সব কাজ ছেড়ে এই একটা ব্যাপারের পেছনে লেগে রয়েছেন। একদিন সোফিয়নস্ট্রাসের বাড়িতে বৈঠক বসল। জাপানি রাষ্ট্রদূত ওশিমা বললেন, 'একটা ডুবোজাহাজও যদি এসে পৌঁছতে পারে তবেই হয়তো আপনাকে পাঠাতে পারব।' ইয়ামামোতো বললেন, 'হয়তো নয়। নিশ্চয় আপনাকে তাতেই পাঠাব।' স্থির হল চারদিন পর আবার আলোচনা হবে।

এমন অবস্থার মধ্যেও এমিলির ওপর নজর রাখেন নেতাজি। তাঁকে সবসময় সাবধানে থাকতে বলেন। হঠাৎ যদি একটু আধটু চোট-টোট লাগে তো ব্যান্ডেজ-ট্যান্ডেজ নিয়ে নিজেই বসে যান।

চারদিন পরে আবার বৈঠক। কর্নেল ইয়ামোমোতা বললেন, 'রাশিয়ার ইউক্রেন অঞ্চল বর্তমানে জার্মানির দখলে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে বিমান পূর্বদিকে যায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই রাস্তাটা সুবিধেজনক বলেই মনে হচ্ছে।'

ওশিমা বললেন, 'কিন্তু ওইসব বিমান যায় রাত্রে। তা ছাড়া রাস্তাতে অনেক বিপদ।'

'বিপদ তো বিপদ,' নেতাজি বলে উঠলেন। 'বিপদের পরোয়া আমি করি না। আপনারা এই ব্যবস্থাই করে ফেলুন।'

নেতাজির কথায় ওশিমা আর ইয়ামামোতো দুজনেই একটু থতমত খেয়ে গেছেন। তারপর আস্তে আস্তে ওশিমা বললেন, 'এই রাস্তায় যাওয়া আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর অনুমোদন করবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। রাশিয়া সম্পর্কে জাপানের বর্তমান নীতির বিরোধী এটা।'

এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন নেতাজি। 'আসলে আপনাদের নীতিটা যে কী তাই বুঝতে পারছি না আমি। বারবার হাজার রকমের অসুবিধের কথা বলছেন। স্পষ্ট করে বলুন না পূর্ব এশিয়ায় সত্যিই আমাকে নিয়ে যেতে চান কিনা আপনারা?'

কোনও সিদ্ধান্তই আসা গেল না। রাতে বিছানায় শুয়েও ছটফট করছেন নেতাজি। বাইরের ঘরে এম. আর. ব্যাস জরুরি চিঠি টাইপ করছিলেন। হঠাৎ ঝনঝন করে ফোন বাজল। রিসিভার তুলেই ব্যাস চিৎকার উঠলেন, 'নেতাজি! ফোন! টোকিয়ো থেকে রাসবিহারী বোসের ফোন।'

ধড়মড় করে ছুটে এলেন নেতাজি। আশা-আশঙ্কায় বিচিত্র প্রকাশ তাঁর মুখে।

'কেমন আছ সুভাষ?' ফোনের মধ্যে দিয়েই রাসবিহারীর স্নেহ যেন ঝরে পড়ে।

'এই বনবাস অসহ্য লাগছে। কবে পূর্ব এশিয়ায় যেতে পারব তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

'আমরাও তোমার আসার পথ চেয়ে রয়েছি। সিঙ্গাপুরে ত্রিশ হাজার ভারতীয় সেনা দিন গুনছে কবে তুমি এসে তাদের কান্ডারি হবে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই উদ্‌গ্রীব তোমার জন্য।'

ফোনটা কেটে গেল। তবু যেটুকু শুনেছেন তাতেই অধীর সুভাষ। প্রায় দৌড়ে গিয়ে এমিলিকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'থাম থাম। আরে পেটের মধ্যে যে আছে তার কথাটা খেয়াল রাখ।'

এমিলিকে বসিয়ে এবার সস্নেহে তাঁর পেটে হাত বোলাতে থাকেন সুভাষ। কান পেতে শুনতে থাকেন পেটের মধ্যে আরেকটা জীবনের স্পন্দন।

'কী হবে গো? ছেলে না মেয়ে?'

'মেয়ে! নিশ্চয়ই মেয়ে হবে।'

'কেন?'

'মেয়েরা মায়ের জাত। আমার আরাধ্যা মা কালী, দেশজননী, আমার মায়েরা। আমাদের দেশে মেয়েদের বলা হয় শক্তিস্বরূপিণী। নিশ্চয়ই মেয়ে হবে আমার। আচ্ছা এমিলি, মেয়ের নাম কি রাখা যায় বলো তো?'

'আগে হোক, তবে ভাবা যাবে।'

সে কথায় কান না দিয়ে আপন মনেই বলেন সুভাষ, 'অনিতা— আমার মেয়ের নাম হবে অনিতা।'

'অনিতা কেন?'

'সব যদি এখনই বলে দিই, তা হলে আর মজাটা কোথায়? পরে বলব।' সারারাত শুধু ভাবী আগন্তুকের কথা। ভোররাত্রের দিকে দুই আড়াই ঘণ্টা শুয়ে নিলেন নেতাজি। তারপর উঠে বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার রাস্তা আমাকেই বার করতে হবে।'

কর্নেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে আবার দেখা হল তাঁর। ইয়ামামোতো জানালেন যে একজন ইতালিয়ান বৈমানিক সম্প্রতি দুঃসাহসিকভাবে পিকিং গিয়ে ফিরে এসেছে।

'এক্ষুনি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব আমি।' নেতাজি একপায়ে খাড়া।

'কিন্তু তার জন্য মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে।' ইয়ামামোতো বললেন।

'মুসোলিনির সঙ্গে খুব ভাল পরিচয় আছে আমার।' সুভাষ বললেন।

'কিন্তু এর মধ্যে অনেক রাজনৈতিক জটিলতা আছে। কাজেই এক্ষেত্রে আমাকেই দেখা করতে হবে।' ইয়ামামোতো বললেন।

অবিলম্বে রোমে গেলেন নেতাজি। যাবার সময় এমিলিকে বললেন তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে। হঠাৎ যদি রওনা হতে হয়।

চারদিন পর ফিরলেন নেতাজি। মুসোলিনি বলেছেন খুব জরুরি জিনিসপত্র নিয়ে আর একটি বিমান পিকিং যাবে। তাতে নেতাজির জন্যও একটা জায়গা রাখা আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ পরিকল্পনাও কার্যকরী হল না। এরপরে আবার খবর এল। রোডস দ্বীপ থেকে একটা বিমান রেঙ্গুনে যাবে। আবার প্রস্তুতি। কিন্তু... এই 'কিন্তু'টা পেছন ছাড়ছে না নেতাজির। হয়েও হচ্ছে না কিছু।

আলেকজান্ডার রিথ এলেন একদিন। বললেন, 'ইতালিয়ান বিমানে আপনার যাত্রা আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর অনুমোদন করছেন না। তাঁরা মনে করেন এটা বড্ড বেশি ঝুঁকির ব্যাপার।'

'যতই ঝুঁকি থাক তাতে আপনাদের কী?' এবার নেতাজি ফেটে পড়লেন। 'আপনারা কি যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখতে চান আমাকে? আমি এতদিন ভাবতাম আপনি আর অ্যাডাম আমার বন্ধু। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে আসলে আপনারা আমার জন্য কিছুই করতে চান না।'

ড. রিথ চলে গেলেন অত্যন্ত আহত মনে। কিছুক্ষণ পরে একটু রাগ পড়লে নেতাজি এমিলিকে বললেন, 'আমি বোধহয় রিথকে একটু বাড়াবাড়ি রকম বলে ফেলেছি। এভাবে বলা উচিত হয়নি আমার।'

সারারাত তুষারপাত হচ্ছে। তার সঙ্গে হাওয়া বইছে প্রবল বেগে। জানলার কাচগুলো ঝনঝন করে উঠছে। মাঝরাতে ঘুম ভাঙল এমিলির। তাকিয়ে দেখলেন দেওয়ালে একটা বালিশ ঠেসান দিয়ে নেতাজি চুপচাপ বসে রয়েছেন। সামনে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরোর স্তূপ। এমিলি উঠে তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন নেতাজি, 'জানো আজ হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। বিদেশের জন্য রওনা হওয়ার আগে আমি বোম্বাইয়ে নাথালালের কাছে গিয়েছিলাম। সে সময় নাথালালকে বলেছিলাম অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর মতো বিশ্রী মৃত্যু আর নেই। তার চেয়ে বিমানে যেতে যেতে যদি আকাশ থেকে নেমে আসে সে মৃত্যু কত সুন্দর।'

নেতাজির মুখ চেপে ধরেন এমিলি। আর সেই মুহূর্তে তাঁর পেটের মধ্যে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হল। দরদর করে ঘাম হতে লাগল। সমস্ত শরীর ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। নেতাজি তাঁকে জড়িয়ে ধরে সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। জল এনে দেন। জলটা খেয়ে এমিলি

বললেন, 'এমন কথা আর কখনও ভুলেও বোলো না। কত কাজ তোমার সামনে! আজাদ হিন্দ ফৌজকে দিল্লি নিয়ে যেতে হবে। লালকেল্লায় ওড়াতে হবে ত্রিবর্ণ পতাকা। গাঁধী, নেহরুর সঙ্গে তোমার লক্ষ লক্ষ অনুগামীরা তোমাকে অভিনন্দিত করবে। তার পরে দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। তুমিই তো বল দেশকে স্বাধীন করার চেয়ে স্বাধীনতার পরে দেশকে গড়ে তোলা অনেক বেশি কঠিন কাজ। ভারত শুধু স্বাধীন নয় সারা পৃথিবীতে এক গৌরবের আসন অর্জন করবে এই স্বপ্ন চিরকাল দেখে এসেছ তুমি। সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগেই লড়াই ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাও তুমি? মনে রেখ দেশের জন্য উৎসর্গ করা প্রাণের ওপর তোমার কোনও অধিকার নেই। আমার অনাগত সন্তানের দিব্যি রইল, আর কখনও এমন কথা উচ্চারণ করবে না তুমি।'

৬

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পিরেলাওল-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নেতাজি, অ্যাডাম ট্রট আর আলেকজান্ডার রিথ ফ্রান্সে এসেছেন। এমিলির প্রসবের সময় এগিয়ে এসেছে। তাইজি বারবার দেখতে আসেন তাঁকে। কিন্তু রেডক্রশের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে তাঁকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। নেতাজিরও দম ফেলার সময় নেই। ইন্ডিয়ান লিজিয়ন, অ্যানাবার্গের শিবির, জাপানি দূতাবাস— সব জায়গায় ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। তাই বন্ধুদের সহায়তায় ট্রেনে একটা বিশেষ কামরার ব্যবস্থা করে এমিলিকে ভিয়েনা পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

বিমানে পূর্ব এশিয়ায় যাবার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে হল। ডুবোজাহাজেই যাওয়া স্থির হয়েছে। তবে জাপানের নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ এ ব্যাপারে অনেকরকম নিয়ম কানুনের বাধা খাড়া করছেন। ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য নেতাজি আর অ্যাডাম ট্রট জাপানি দূতাবাসে গেলেন।

নেতাজি রাষ্ট্রদূত ওশিমাকে সোজা প্রশ্ন করলেন, 'জাপানের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সবুজ সংকেত দেওয়া সত্ত্বেও এ রকম দেরি হচ্ছে কেন?'

'আপনিই বরঞ্চ নিজে সেটা নিয়ে ওয়ারলেস টেলিফোনে কথা বলুন।' ওশিমা বললেন।

টোকিয়োতে নৌবাহিনীর অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ বললেন, 'সাবমেরিনে আপনার যাওয়া হবে না।'

'কেন?'

'সাবমেরিনে কোনও অসামরিক ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।' নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ জানিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি করে হ্যান্ডসেটটা অ্যাডাম ট্রটের হাতে দিলেন নেতাজি। আবার ঝগড়া। নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ একেবারে অনড়। তাঁর সাফ কথা, যত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই হোন না কেন সাবমেরিনে কোনও অসামরিক ব্যক্তিই সফর করতে পারেন না। এমনকী প্রধানমন্ত্রী বললেও নয়।

'হি ইজ নট জাস্ট এ সিভিলিয়ান জেন্টলম্যান।' অ্যাডাম ট্রট চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হি ইজ কম্যান্ডার-ইন-চিফ অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। তাঁকে সিভিলিয়ান জেন্টলম্যান বলছেন কোন হিসাবে?' সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্ত থেকে সম্মতি পাওয়া গেল। এইবার সব কিছুই গতিশীল হয়ে উঠল।

২৯ নভেম্বর, ১৯৪২ নেতাজির জীবনে আর একটি শুভক্ষণ নিয়ে এল। এমিলি একটি

কন্যারত্নের জন্ম দিলেন। বার্লিনে নেতাজির কাছে খবর পৌঁছল। মেয়ের মুখ দেখে এমিলি খুশিতে ডগমগ।

এদিকে নেতাজির পূর্ব এশিয়ায় যাত্রার ব্যাপারটা যেভাবে এগোচ্ছে তাতে তাঁর পক্ষে ভিয়েনা যাওয়ার জন্য সময় বের করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেই একফাঁকে নাম্বিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ভিয়েনা গেলেন তিনি। মেয়েকে দেখে আনন্দে আত্মহারা তিনি। দশ দিনের ছোট্ট শিশু। দেখে দেখে আশ মেটে না নেতাজির। কোলে নিয়ে বারবার চুমো খান। এমিলিকে বলেন, 'কী? বলেছিলাম না মেয়েই হবে আমার?'

মাঝরাতের পরও দু-তিন ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পাওয়া গেল না। নেতাজির ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে গেল।

'আর দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই পূর্ব এশিয়া রওনা হতে হবে আমাকে।'

'আমি আসব তোমাকে সি অফ করতে।'

'পাগল নাকি? অমন সাহস একদম করবে না।' নেতাজি সতর্ক করে দিলেন।

বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। যাবার আগে মেয়েকে আর একবার কোলে নিলেন নেতাজি। অপলকে মেয়েকে দেখতে থাকেন তিনি। এই ছোট্ট মানুষটার কী প্রচণ্ড আকর্ষণ! চোখের জল আর বাধা মানে না। এমিলির কোলে মেয়েকে দিয়ে দেবার সময় সারা শরীরে যেন বরফের স্রোত বয়ে যায়। একদিকে প্রচণ্ড মমতার হাতছানি অন্যদিকে কঠিন কর্তব্যের অলঙ্ঘনীয় আহ্বান।

৭

তুষারস্নাত রাত্রি। বাইরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে। কী একটা আওয়াজে নেতাজির ঘুম ভেঙে গেল। অনেকক্ষণ ধরেই বেল বাজছে ঘরের। বাইরের দরজাতে কে যেন ঠকঠক করছে। এত রাতে কে এল? ঘুমচোখে দরজা খুলে দেখলেন একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া মহিলাটিকে ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে আবছা আলোয়। চেনা যাচ্ছে না। পরনের ওভারকোটে, মাথায় কান ঢাকা চামড়ার টুপিতে, এমনকী জুতোতে পর্যন্ত বরফের আস্তরণ। সারা শরীর থেকে বরফ গলা জল ঝরছে। ঠান্ডায় কুঁকড়ে যাওয়া মহিলাটির নিশ্বাসের শব্দ থেকে সুভাষ বুঝলেন— এমিলি! সদ্য সন্তানের জন্ম দেওয়া জননী এইভাবে এত রাতে একা! সবিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন নেতাজি, 'এমিলি! তুমি এত রাতে?'

'ট্রেনটা লেট করল তাই দেরি হল।'

'একলা এলে? আমার মেয়ে কোথায়?' নেতাজির গলায় এবার আশঙ্কা।

'ভিয়েনাতে— আমার মায়ের কাছে।'

'কী সাংঘাতিক! ছ' সপ্তাহের মেয়েকে রেখে দিয়ে চলে এলে?' এত কীসের তাড়া ছিল?

'শুনলাম দু-চারদিনের মধ্যেই পূর্ব এশিয়ায় রওনা হতে হবে তোমাকে। এরপরে আবার কবে দেখা হবে কে জানে! তাই এলাম।' এমিলির প্রত্যেকটা কথাতে যেন আহত পাখির ডানা ঝাপটানির কাতরতা।

তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার ফায়ার প্লেসের আগুন উসকে দিলেন নেতাজি। মাথার টুপি খুলে চুল আঁচড়াতে লাগলেন এমিলি। তোয়ালে দিয়ে ভাল করে গা হাত পা মুছে আগুনের পাশে বসে হাত পা সেঁকে নিতে লাগলেন।

বার্লিনে এখন প্রতিটি দিন নেতাজির কাছে এক একটি যুগ বলে মনে হচ্ছে। যাত্রার

আয়োজন পুরোদমে চললেও নেতাজি কোথায়, কীভাবে, কী জন্য যাচ্ছেন সেকথা কাউকে বলেননি। একদিন তিনি নাম্বিয়ারকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'নাম্বিয়ার এখন থেকে ইন্ডিয়ান লিজিয়নের কাজকর্ম তোমাকে সামলাতে হবে।'

'যেমন আদেশ করবেন, তাই হবে।' নাম্বিয়ার সসম্ভ্রমে বললেন।

অ্যানা নিজেকে অনেকটা সামলে আবার কাজে আসতে শুরু করেছেন। ফুলদানিতে আবার রোজ টাটকা গোলাপ ফুল হেসে ওঠে নেতাজির টেবিলে। অবশ্য ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছেন অ্যানা। শিরদাঁড়া ভেঙে যাওয়ায় সারাজীবনের মতো অ্যানার ছেলে পঙ্গু হয়ে গেছে। শয্যাশায়ী ছেলেটির কাছে নাৎসিদের স্বস্তিকা আঁকা পতাকা আজ বিভীষিকা।

২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন। নিমন্ত্রণ না করা হলেও সোফিয়নস্ট্রাসের বাড়িতে পি. বি. শর্মা, নরহরি গনপুলে, বালকৃষ্ণ শর্মা, এন. জি. স্বামী, আবিদ হাসান, গুরুবচন ম্যাগনেট আর তাইজি— সবাই এসেছেন। সবাইকার উপস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত একটা ছোটখাটো সভার আকার নিল অনুষ্ঠান। অভিনন্দনের উত্তরে নেতাজি বললেন, 'খুব সম্ভবত শিগগিরই আমাকে প্যারিস অথবা ত্রিপোলিতে যেতে হবে। যুদ্ধের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হবে। অনেকদিন হয়তো আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না।'

অনুষ্ঠানের পরে তাইজি ভেতরে এলেন। তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টি নেতাজির চোখে কীসের যেন একটা অস্পষ্ট আভাস পাচ্ছে। স্পষ্ট বুঝছেন নেতাজির মনে একটা আলোড়ন চলছে। প্রায় আধ কিলো সোনা নেতাজির হাতে দিয়ে তিনি বললেন, 'ডক্টর তেন্ডুলকরের মাতৃভূমি স্বাধীন হোক।' মায়ের মতোই সস্নেহে নেতাজিকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তাঁর চোখ থেকে ঝরে পড়ে অজস্র আশীর্বাদ।

এমিলির চোখে ঘুম আসে না। তাঁর প্রিয়তম আর ক'দিন পরেই চলে যাবেন দূরে। শেষের রাত্রি এগিয়ে এল। 'কার কাছ থেকে আর কী ভাবে বিদায় নেব এমিলি? রাতে আমাদের সেই মধুর গুঞ্জন, উষ্ণ নিশ্বাস, দুজনে মিলে সেই ভবিষ্যতের স্বপ্নের জাল বোনা। সেই সব স্মৃতি তো সারাক্ষণ আমার সঙ্গী হয়েই থাকবে। একেকবার মনে হচ্ছে এ রাত যেন কখনও না শেষ হয়। কিন্তু উপায় নেই। ভবিষ্যতে সত্যিকারের উজ্জ্বল প্রভাতকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আজকে যেতেই হবে এই ঘন অন্ধকারের পথে।'

যাবার সময় এল। নেতাজির পা যেন আর সরে না। এমিলিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। আসন্ন বিরহের বার্তা বুঝি বাইরের প্রকৃতির কাছেও পৌঁছেছে। তুষারপাত বেশ কমে এসেছে, চুপ করে আছে পাখিরা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন দুজনে। দুজনে দুজনের শ্বাসপ্রশ্বাসের আলোড়ন টের পাচ্ছেন। এমিলির চিবুক সুভাষের দুই হাতের অঞ্জলিতে ধরা। হঠাৎ সারা শরীরে একটা ঝটকা দিয়ে এমিলি বললেন, 'চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'অত ভেব না। কিয়েল বন্দর পর্যন্ত অনেকেই যাচ্ছে আমার সঙ্গে।'

'আমি জার্মানির বন্দরের কথা বলছি না। আমি তোমার সঙ্গে জাপান পর্যন্ত যাব।'

'আর যে কলিটি আমাদের ঘরে ফুটেছে, তাকে কে দেখবে? নিজেকে সামলাও। তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।'

হঠাৎ একটা জরুরি কথা বলার জন্য থামলেন সুভাষ। 'রাশিয়া আক্রমণের মূর্খামির ভাল দাম দিতে হবে হিটলারকে। হয়তো এটাই জার্মানির পরাজয়ের মূল কারণ হয়ে উঠবে। সে রকম যদি হয় তবে?'

যুদ্ধে যদি জার্মানির পরাজয় হয় তো কী হবে। সুভাষের নিজের যদি কিছু হয় তবে এমিলির

কী হবে? মহাযুদ্ধের এই সর্বব্যাপী আগুনের মধ্যে কোথায় রেখে যাচ্ছি এদের? হঠাৎ একটা ঝটকা লাগে সুভাষের। এমিলির ঠান্ডা হাত দুটো ধরে তিনি বলেন, 'আমাদের বিয়ের কথা খুব কম লোকই জানে।'

'হ্যাঁ।' অস্ফুটে উত্তর দেন এমিলি।

'শক্তিমান ব্রিটিশরাই শুধু নয় আমার আরও অনেক শত্রু আছে। মহাযুদ্ধের এই টালমাটালের সময় আমার জন্য তোমার ওপর যেন কোনও বিপদ না নেমে আসে, তাই এ বিয়ের খবর এত গোপন রেখেছি আমি। কিন্তু আজ যাবার সময় মনে হচ্ছে এভাবে আর গোপন রাখা খুব অন্যায় হচ্ছে।'

এমিলি নিরুত্তর। বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে তাঁর শরীর। এক বিদেশি বিপ্লবীর সঙ্গে একসঙ্গে থাকায় অনেকের কুৎসিত ইঙ্গিত, আর বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় থরথর করে কেঁপে উঠল তাঁরা সারা শরীর। কী একটা অসহ্য যন্ত্রণায় চোখ বুজে ফেললেন তিনি। আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। হঠাৎ এরকম কান্না দেখে নেতাজি হতচকিত। দু' হাতে এমিলিকে শক্ত করে ধরে তিনি বললেন, 'এমিলি আজ আর মনের মধ্যে কিছু চেপে রেখ না। কাল যদি কিছু বলতেও চাও কাছে পাবে না আমাকে। আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের মধ্যে কিছু একটা হচ্ছে। আমাকে জানতেই হবে সেটা। আমার দিব্যি রইল, বল তুমি।'

এমিলি এবার নিজের ডায়েরিতে লুকিয়ে রাখা একটা কাগজ তুলে দিলেন নেতাজির হাতে। কাগজটাতে চোখ বুলিয়ে এমিলিকে জিজ্ঞেস করলেন 'এ কাগজ তোমার কাছে এল কী করে? কে দিল?'

'ডক্টর রিথ।'

কাগজটা কোনও ব্রিটিশ গুপ্তচরের পাঠান গোপন সংবাদের প্রতিলিপি। বার্লিনে তাঁর কাজকর্মের অনেক বিবরণ রয়েছে কাগজটাতে। কিন্তু তাঁর নজর আটকে গেল দুটি লাইনে। 'মিস্টার বোস এখন থাকেন বার্লিনের সোফিয়নস্ট্রাসের একটা বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে এমিলি শেঙ্কেল নামে তাঁর অস্ট্রিয়ান রক্ষিতাও থাকেন সেখানে।'

'Now Mr. Bose stays in the area of Sofiyanstrasse in Berlin. He is accompanied by an Austrian mistress Miss Emilie Schenkl.'

পৃথিবী যেন দুভাগ হয়ে গেছে, আকাশ ভেঙে পড়েছে নেতাজির ওপর। সমস্ত চেতনা যেন লোপ পেয়েছে। আস্তে আস্তে সামলে ওঠেন নেতাজি। এইবার চোখ দিয়ে অঝোরধারায় বর্ষণ নামে। থেমে থেমে কোনওরকমে বললেন, 'এমিলি আমার স্বপ্ন, আমার কাজ আমাকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তোমার ওপর যে কী ভীষণ অবিচার করেছি চোখেই পড়েনি আমার। এতদিন ধরে তুমি এই যন্ত্রণা সহ্য করেছ। কারো পরোয়া না করে, নাৎসি বর্ণবিদ্বেষীদের রাগের তোয়াক্কা না করে আমার জন্য যা তুমি করেছ তা কি এই কুৎসিত শব্দটা শোনার জন্য?'

অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন নেতাজি। হঠাৎ থেমে বলে উঠলেন, 'একদিন সবাইকে তোমার আমার পবিত্র সম্বন্ধের কথা বলতে হবে। কিন্তু আপাতত একটা কাজ আমাকে করতেই হবে।' টেবিলের কাছে গিয়ে একটা কাগজ নিলেন তিনি। তারপর ঝরঝর করে কিছু একটা লিখে এমিলির হাতে দিয়ে বললেন, 'প্রাণ গেলেও এই কাগজটা হাতছাড়া কোরো না।'

'কী এটা?' এমিলি জিজ্ঞাসা করেন।

'মেজদার কাছে লেখা একটা চিঠি।' চিঠিটায় লেখা,

শ্রীচরণেষু মেজদা,

আবার আমি একটা বিপজ্জনক পথে চলেছি। যদি আর না ফিরি বা যদি আমার একটা ভাল মন্দ কিছু হয়ে যায় তাই এই চিঠি লিখে যাচ্ছি। আমি এখানে বিবাহ করেছি। একটি কন্যাও হয়েছে আমার। আপনি চিরকাল আমাকে যেমন স্নেহ করেছেন, সামলেছেন, সেইরকম স্নেহ-মমতা আমার স্ত্রী ও কন্যাটিকে দেবেন এই মিনতি জানাচ্ছি। ইতি—

প্রণত সুভাষ

বাইরের তুষারপাত থেমে এসেছে। রাস্তায় অবশ্য অনেক জায়গায় স্তূপাকৃতি বরফ জমে রয়েছে। আকাশে চাঁদকে পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। বরফের ওপর চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে পড়ে আলোছায়ার এক অদ্ভুত রহস্যময়তা সৃষ্টি করেছে।

খুব ভোরেই স্নান সেরে পুজোয় বসলেন নেতাজি। গীতাপাঠ শেষ হল। বেরোতে যাবেন এমন সময় আবার ফিরে এলেন তিনি। তাড়াতাড়ি ভেতরের কামরায় গিয়ে ওয়ার্ডরোব থেকে একটা বাক্স টেনে বার করলেন। গয়নার বাক্স। সযত্নে বাক্সটা খুলে এমিলির সামনে তুলে ধরলেন। বাক্সের মধ্যে রয়েছে লাল ঠোঁট আর সবুজ পাখাওয়ালা একটা টিয়াপাখি, একটা লালমুখো বাঁদর। তা ছাড়া ট্রাম্পেট বাজাচ্ছে একটা সেপাই আর শুইয়ে দিলেই চোখ মিটমিট করছে এক রাজকুমারী। 'এগুলো আমার রাজকুমারীকে দিয়ো।' কোনওক্রমে বললেন তিনি। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন নিজেকে সামলাতে। তবু দু'চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ফুটন্ত আবেগ। 'ও যখন বড় হবে, জিজ্ঞেস করবে, বাবা কোথায়, ওকে বোলো, বাবা একটা খুব জরুরি কাজে বাইরে গেছে। কাজ শেষ হলেই তোমার কাছে ছুট্টে চলে এসে তোমাকে অনেক আদর করবে।' আর বলতে পারেন না নেতাজি।

যাবার জন্য পা বাড়ালেন নেতাজি। আবার তাঁর ওপরে আছড়ে পড়ে এমিলি জিজ্ঞেস করলেন, 'ফের কবে দেখা হবে?'

'লালকেল্লায়— দিল্লিতে।' দৃঢ় প্রত্যয় নেতাজির স্বরে। তারপর কেমন একটা স্বপ্নময় স্বরে বললেন, 'বিজয় দৃপ্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ ঢুকবে লালকেল্লায়, উত্তোলন করা হবে ত্রিবর্ণ পতাকা। পতাকাকে অভিবাদন করে আমি তাকাব জনতার দিকে। তুমি দেখো। লক্ষ লোকের ভিড় থেকেও ঠিক খুঁজে বার করে নেব তোমাকে।'

তুষারপাত একদম থেমে গেছে। এমিলি একভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় বরফের ঢিবি। প্রতীক্ষার তো সবে শুরু। কবে লালকেল্লায় তেরঙা পতাকা উড়বে, ফিরে আসবেন সুভাষজি।

৮

কিয়েল বন্দরে যাবার ট্রেন বার্লিন স্টেশনে দাঁড়িয়ে। ট্রেনের অনেকগুলো বগি সামরিক সাজসরঞ্জামে ভরা। ট্রেন ছাড়তে এখনও একটু দেরি আছে। ভি আই পি লাউঞ্জে নেতাজি অপেক্ষা করছেন। তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য কিয়েল পর্যন্ত সঙ্গে যাবেন ড. আলেকজান্ডার আর কেপলার। তা ছাড়াও বিদায় জানাতে এসেছেন নাম্বিয়ার। আরও একজন সঙ্গে আছেন— আবিদ হাসান। কোথায় যাওয়া হচ্ছে তার কোনও ধারণাই নেই তাঁর। শুধু যেতে হবে সেটুকু জানা আছে।

আগের রাত্রে ডক্টর ট্রট ফোন করে জানিয়েছেন তিনি আসতে পারবেন না। নেতাজির প্রতিটি কাজে অ্যাডাম অসাধারণ সহযোগিতা করেছেন।

হঠাৎ কী হল তাঁর? নেতাজি বুঝে উঠতে পারছেন না। কিন্তু খোঁজখবর নেওয়ার সময় নেই একটুও। ঠিক তখনই একটা থ্রিলারের দৃশ্যে কোনও রহস্যময় ব্যক্তির হঠাৎ আবির্ভাবের মতোই পা পর্যন্ত ওভারকোট পরা, কপাল ঢাকা ফেল্ট হ্যাট পরা এক ব্যক্তির উদয় হল সেখানে। অ্যাডাম ট্রট। পেছনের ঘরে অ্যাডামকে নিয়ে গেলেন নেতাজি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অ্যাডাম বললেন, 'সত্যি বলতে কী জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এখানে এসেছি আমি।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'ফ্যুয়েরারের প্রশাসনের মধ্যে থেকেও তাঁর বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট চালানোর ব্যাপারে এ পর্যন্ত আমি সাফল্যই পেয়েছি। এখন মনে হচ্ছে এ ব্যাপারটা শিগগিরই জানাজানি হয়ে যাবে।'

'মানে?'

'ইদানীং গেস্টাপোর নেকড়েরা আমার চারপাশে হন্যে হয়ে ঘোরাঘুরি করছে।' বলতে বলতে অ্যাডামের চোখ জ্বলে ওঠে। শক্ত করে নেতাজির দুটি হাত ধরে তিনি বললেন, 'যিশু যদি আর একটু কৃপা করেন, একবার যদি হিটলারের মতো নরাধমকে যমের বাড়ি পাঠাতে পারি তবে হাজারবার ফাঁসি যেতেও দুঃখ থাকবে না আমার।'

নেতাজি অ্যাডামকে আত্মসংবরণ করতে বললেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় অ্যাডামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাডাম, তুমি যে আমাকে দিয়ে চার্চিলকে একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিলে তার কী হল?'

অ্যাডাম এবার হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে চোখে জল এল তাঁর। বললেন, 'কী আর বলব দোস্ত। ইউ সিলড মাই ফেট।'

'তার মানে?'

'তোমার সেই অসাধারণ চিঠির বয়ানে আমার গুরু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আক্ষরিক অর্থেই একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। চিঠিটা তিনি স্বয়ং চার্চিলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'দারুণ চিঠি তো' মন্তব্য করে চার্চিল সেই চিঠির মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন। 'একজন জার্মান এত ভাল ইংরেজি লিখতে পারে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।' তিনি নাকি আরও বলেছিলেন যে এ চিঠি একদিন একটা ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে গণ্য হবে।

'আরে! এতে খারাপটা কী হল?' নেতাজি বললেন।

'আসলে মজাটা হল এর পরে।' এ হেন পরিস্থিতিতেও অ্যাডাম হেসে বললেন।

'ওই চিঠি সত্যিই কোনও হিটলার বিরোধীর না নাৎসিদেরই আর একটা চাল তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন চার্চিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ইডেনকে এই দায়িত্ব দিলেন তিনি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? উলটো দিকে ঘুরলো ভাগ্যচক্র। বার্লিনের গুপ্তচরেরা চার্চিলকে জানাল যে অ্যাডাম ট্রট-এর সঙ্গে সুভাষ বোসের দারুণ দোস্তি। ওই চিঠি অ্যাডামের নয়, স্বয়ং সুভাষ বোসের লেখা।'

'সে কী? তার পরে?'

'তার পরে যা হবার তাই হল। যে চিঠিটা দারুণ বলে মনে হচ্ছিল তাঁর, সেটাই চক্ষুঃশূল হয়ে উঠল তাঁর। আমাকে সাহায্য করার জন্য উদ্যত হাত মুঠি পাকিয়ে গেল। শুনলাম কয়েকজন

সহকর্মীকে স্পষ্ট বলেছেন তিনি যে, সুভাষ বোসের কোনও বন্ধু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধু কখনও হতে পারে না। অ্যাডাম ট্রট মাস্ট বি এ ডাইহার্ড নাজি।'

বিষণ্ণ হেসে অ্যাডাম ট্রট আবার বললেন, 'যেতে দাও বন্ধু। পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণদ্বার যে তোমার জন্য খুলে গেছে, তাতেই খুশি আমি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

বাইরে ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠল। প্ল্যাটফর্মে হইচই। যাবার জন্য পা বাড়ালেন সুভাষ। সজল চোখে অ্যাডাম বললেন, 'আমি ছাড়ব না দোস্ত। জার্মান জাতি যাতে আবার খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে পারে তার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ব। তোমার মাতৃভূমিও সগৌরবে নিজের সত্তা ফিরে পাক এই প্রার্থনাই করি।'

দৃঢ় আলিঙ্গনে পরস্পরকে বাঁধলেন দুজনে। দুজনেই প্রতিজ্ঞা করলেন, শুধু নিজের নিজের দেশ নয় যেখানে যেখানে গোলামির ফাঁসে সাধারণ মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে তাদের সবাইকার মুক্তির জন্য আমরণ সংগ্রাম করবেন তাঁরা। গাড়ির শেষ হুইসল শোনা গেল। দৌড়ে গিয়ে নিজের কামরায় উঠলেন নেতাজি।

৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। কিয়েল বন্দরে বেশ কয়েকটা ডুবোজাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। আলেকজান্ডার রিথ আর কেপলারের কাছে বিদায় নিয়ে ডুবোজাহাজের দিকে যখন মোড় নিলেন তখন আবিদ হাসান হতভম্ব। ফৌজি শিবির থেকে আবিদকে যখন ডেকে পাঠিয়েছিলেন তখন নেতাজি প্রশ্ন করেছিলেন, 'আবিদ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে পারবে?'

'প্রাণের ঝুঁকি না নিতে পারলে ইন্ডিয়ান লিজিয়নে কেন এসেছি?' আবিদ উত্তর দিয়েছিলেন।

তারপর দশ দিন আর কোনও কথা হয়নি এ বিষয়ে। স্বাধীনতার প্রচারের জন্য আবিদকে হজে পাঠানো স্থির হয়েছিল। তাঁর কাজ হবে হজ করতে আসা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করা। কেউ কেউ আবার বলছিল যে আসলে গ্রিসে ইন্ডিয়ান লিজিয়ন-এর একটা শাখা সংগঠনের জন্য আবিদকে পাঠানো হবে।

এখন ডুবোজাহাজে উঠতে হবে শুনে আবিদ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছেন। ডুবোজাহাজের সংকীর্ণ প্রবেশদ্বার দিয়ে নেতাজি আর আবিদ ভেতরে এলেন। বাইরে থেকে ডুবোজাহাজটিকে একটা বড়সড় মাছের মতো দেখাচ্ছিল। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ডিজেলের গন্ধ আর গুমট ভাবে দম আটকে আসার জোগাড়।

ভেতরে ওরই মধ্যে একটু বড় একটা কামরায় নেতাজির জন্য একটা কাঠের ফালি রাখা হয়েছে। সে কামরাটা একটা পাহাড়ি গুহার মতো। একটা দরজা ছাড়া আর কিছু নেই। আবিদকে যে কম্বলটা দেওয়া হয়েছে সেটা ডিজেল আর জলে ভেজা। গায়ে দেবার চাদরটা মনে হচ্ছে যেন ডিজেলে চুবিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। একটু পরে সকালের জলখাবার এল। পাউরুটিও ডিজেল-সুবাসিত। নেতাজি হেসে বললেন, 'আপাতত শিবরাত্রির উপোস করছি ভেবে নেওয়া যাক।'

জল কেটে ডুবোজাহাজ এগিয়ে চলেছে। এবার নেতাজি আবিদকে কাছে ডেকে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ বুঝতে পারছ কিছু?'

'হজ করতে যে নয় সেটা বুঝতে পারছি।' আবিদও হেসে জবাব দিলেন।

'আবিদ। যত শিগগির সম্ভব আমাদের জাপানে পৌঁছতে হবে।'

জাপানের নাম শুনে আবিদ উল্লসিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কতদিন লাগবে জাপান পৌঁছতে।'

'কমপক্ষে তিন মাস তো বটেই।'

এ কথা শুনে আবিদ চোখ বন্ধ করে ফেললেন। কিন্তু তাঁকে ফুরসত দিতে নেতাজি রাজি নন। তাঁর সঙ্গে আনা ছোট্ট টাইপরাইটারটা আবিদকে দিলেন তিনি। এই যাত্রার সময়টিতে 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইটার পরবর্তী সংস্করণের কাজ শেষ করতে চান তিনি।

নেতাজি-বাহক ডুবোজাহাজটি অবশ্য একা নয়। তার সঙ্গে আরও কয়েকটা ডুবোজাহাজও রয়েছে। একটু পরে ডুবোজাহাজের দীর্ঘদেহী ক্যাপ্টেন ওয়ার্নার ম্যুসেনবার্গ নেতাজির কাছে এলেন তখন আবিদ জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্য ডুবোজাহাজগুলোও কি শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাবে?'

'না। আগামী কয়েকদিন আমাদের পাহারা দেবার জন্য ওরা সঙ্গে থাকবে।' ক্যাপ্টেন ম্যুসেনবার্গ বললেন।

ক্যাপ্টেন এবার নেতাজির স্বাচ্ছন্দ্যের খবরাখবর নিতে শুরু করলেন। ঘড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাচের মধ্যে দিয়ে বাইরের জল এখন অন্ধকার। কথাবার্তা চলার সময় হঠাৎ ডুবোজাহাজটা যেন ঝটকা মেরে জলের ওপর উঠে এল। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে কেমন যেন গোলমাল লাগছে! টাইপরাইটার সামলে আবিদ জিজ্ঞাসু চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। এর পর প্রত্যেকদিন রাতে আমরা জলের ওপর দিয়ে চলব।' ক্যাপ্টেন জানালেন।

'এটা কি একান্ত জরুরি?' নেতাজি প্রশ্ন করল।

'ডুবোজাহাজের ব্যাটারি চার্জ করার জন্য জলের ওপর উঠে আসতে হয়।'

এই সময় দু-চারটে সামরিক বিমান উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। এমন অবস্থায় জলের ওপর দিয়ে চলা যথেষ্ট ঝুঁকির ব্যাপার। কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি জলে ডুবে থাকতে পারে না এই ডুবোজাহাজ। তাই রাতে ঝুঁকি নিতেই হয়।

একসময় নেতাজিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্যাপ্টেন নিজের কেবিনে চলে গেলেন! রাত্রির খাবারের জন্য কৌটোবন্দি বিফ এল। শুধু সুভাষ নয় আবিদ হাসানেরও কেমন কেমন লাগে এই মাংস। তবে তিন মাসের সফর— রোজ তো উপোস করা যায় না। কিন্তু এ মাংস মুখে তুললেও পেটে থাকবে না। আধপেটা খেয়ে সে রাতটা কাটল। পরদিন আবিদ গিয়ে কোয়ার্টার মাস্টারকে ধরলেন। ভাগ্য ভাল। ভাঁড়ারে চাল আর মুসুরডাল আছে। এবার আবিদ নিজে রান্নাঘরে গিয়ে ভাত, মুসুরডাল আর ডিমের ব্যবস্থা করে ফেললেন। নেতাজির মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগে দেশবন্ধুর সঙ্গে জেলে থাকার সময় তিনি দেশবন্ধুর রান্না করে দিতেন।

নরওয়ের ক্রিশ্চিয়ান স্যান্ডের ধার দিয়ে সাবমেরিনগুলো এবার চলল স্কটল্যান্ডের উত্তর দিক ঘেঁসে। এই পুরো রাস্তাটাই ভীষণ বিপজ্জনক। মাঝে মাঝে জলের মধ্যে জলবোমা ফাটার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। কিছু কিছু জলবোমা সমুদ্রের একেবারে তলায় গিয়ে ফাটে। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ডুবোজাহাজ চালাচ্ছেন ক্যাপ্টেন। পাঁচ-ছ'জন লোক বসে খেতে পারে এমন একটা পুরনো টেবিলে বসে টাইপ করেন আবিদ। নয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঙ্কে শুয়ে থাকতে হয়। কোনওরকম করে দিনগুলো কাটে, হাঁটাচলার অভাবে শরীরে যেন জং লেগে যাচ্ছে।

উত্তর সাগরে অনেক জায়গায় সমুদ্রের ওপর বরফ ভাসছে। দেখতে অবশ্য খুব সুন্দর সেগুলো। কিন্তু এই জায়গাটিতে শত্রুদের নজরদারি সবচেয়ে বেশি। তারপর একদিন ডুবোজাহাজ ফ্রান্সের চেরবুর্গ বন্দরে পৌঁছল। এখান থেকেই শুরু হবে আটলান্টিক মহাসাগর। এই বন্দর থেকে ডিজেল ভরা হল। এবার শুরু হবে আফ্রিকার দিকে চলা। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা পেরিস্কোপে দেখা গেল একটা ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজকে। ক্যাপ্টেন জলের ওপর নিয়ে এলেন ডুবোজাহাজকে। ব্রিটিশ জাহাজ আক্রমণ করার আগেই জাহাজটিকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন ক্যাপ্টেন। জাহাজটি ছিল তেলভরতি ট্যাঙ্কার। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল জাহাজ। জ্বলন্ত তেল ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রে। মনে হচ্ছে হাজার নাগিনীর আগুনের ফণা লকলক করে উঠছে। জলের ওপর আগুন। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য!

দক্ষিণ আফ্রিকার কিনারা দিয়ে যাওয়ার সময় আর একটি শত্রুপক্ষের জাহাজের সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু সে জাহাজটি বিশাল। ক্যাপ্টেন আর অফিসাররা প্রথমে জাহাজটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেও পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন।

উত্তর আটলান্টিক পার হয়ে দক্ষিণ আটলান্টিকে পড়ার পর শত্রুর ভয় অনেক কম। তাই দিনের বেলা জলের নীচ দিয়েই যেতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা বড় একটা রইল না। ডুবোজাহাজ এখন দিনের বেলাতেও অনেক সময়েই জলের ওপর দিয়েই চলে। জলের ওপর দিয়ে ডুবোজাহাজের গতি অনেক বেশি।

ডিজেলের গন্ধ এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। জায়গার সমস্যা অবশ্য আছেই। ওই দু' ফুট বাই পাঁচ ফুট জায়গার মধ্যেই নেতাজি তাঁর লেখা এবং পড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। এক মুহূর্ত সুস্থির থাকেন না তিনি। জাপানে পৌঁছবার পর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তাই নিয়ে সবসময় চিন্তাভাবনা চলছে তাঁর। প্রধানমন্ত্রী তোজো এবং সামরিক আধিকারিকদের সঙ্গে কী কথা হবে তার মহড়া দেন। অনেক সময় আবিদ হাসানকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর ভূমিকা নিতে হয়। নেতাজি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন বিভিন্ন বিষয়। রিহার্সালটা বেশ জমে ওঠে। এ ছাড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মানচিত্র দেখা শুরু হয়। বর্মা, চিন আর ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, তাদের অবস্থান, পরিবেশ সব কিছুই অভিনিবেশ নিয়ে অধিগত করতে থাকেন তিনি। কোথায়, কীভাবে সৈন্য সমাবেশ করা যাবে, কোন কোন রাস্তায় ফৌজ এগোবে সে সম্বন্ধেও একটা প্রাথমিক খসড়া করতে থাকেন তিনি।

২৬ এপ্রিল, ১৯৪৩। জাপানি আই-২৯ ডুবোজাহাজটি চুপচাপ মোজাম্বিকের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। ডুবোজাহাজের ক্যাপ্টেন মেসো তেরেকো খুব গভীরভাবে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করছেন। দুপুর থেকেই সাগর প্রচণ্ড উত্তাল। পাহাড়প্রমাণ ঢেউ উঠছে। কাছেই পোর্তুগালের এলাকা। কিন্তু জাপানি ডুবোজাহাজের অস্তিত্ব কেউ টের পায়নি। ছ'দিন আগে ডুবোজাহাজটা পেনাং থেকে রওনা হয়েছিল। ডুবোজাহাজের আসল উদ্দেশ্য জানতেন একেবারে বাছা বাছা কয়েকজন।

উত্তাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন তেরেকো সহকর্মী নেগিশিকে বললেন, 'বোসকে ভালয় ভালয় নিয়ে যেতে পারব কিনা ভেবে ভয় হচ্ছে আমার।'

কথা বলতে বলতেও ক্যাপ্টেন সতর্ক নজর রাখছেন পেরিস্কোপে। হঠাৎ প্রত্যাশিত দিকে জার্মান ডুবোজাহাজের পেরিস্কোপটা নজরে এল। জার্মান ডুবোজাহাজও জানত জাপানি ডুবোজাহাজের সম্ভাব্য অবস্থান। নিশ্চিত হবার পর ক্যাপ্টেন তেরেকো আস্তে আস্তে ওপরে ভেসে উঠতে উঠতে জল কেটে ডুবোজাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। একসময় ডুবোজাহাজ জলের ওপর ভেসে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ডুবোজাহাজটিও ভেসে উঠল।

সমুদ্র অশান্ত। রাতও নেমে এসেছে। এ অবস্থায় ঝুঁকি না নিয়ে সমুদ্র একটু শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ইতিমধ্যে আরও খানিকটা উত্তর-পূর্ব কোণে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

পরের দিন সমুদ্র কিন্তু আরও অশান্ত। সূর্যদেব উঠে এসে দেখলেন সমুদ্রের দামালপনা। অপেক্ষা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। দুটো ডুবোজাহাজই একে অপরের দিকে নজর রেখে পাক খেতে শুরু করল।

দিনটা বড় দীর্ঘ লাগছে নেতাজির কাছে। মনে হচ্ছে জীবনে এত লম্বা দিন আর কখনও আসেনি। ভাগ্য ভাল। সেদিন কোনও শত্রুবিমানের দেখা পাওয়া গেল না। একসময় রাত এল। দুটি ডুবোজাহাজের কর্মীরাই চিন্তায় পড়লেন।

'মিস্টার বোস, জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।' ক্যাপ্টেন ঢোক গিলে বললেন।

নেতাজির মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন বললেন, 'আরও দু-একদিন যদি এভাবে জলে ডুবে থাকতে হয় তবে খুব বিপদে পড়তে হবে আমাদের।'

মাঝরাতের পর সমুদ্র আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল। আশার আলো সবার মনে। সবার প্রতীক্ষা সূর্যোদয়ের।

ভোর হয়েছে। তেরেকোকে জাগিয়ে নেগিশি বললেন, 'ক্যাপ্টেন শিগগির এসে দেখুন।'

'কী হয়েছে?' ঘুম পালাল তেরেকোর চোখ থেকে।

'জার্মান ডুবোজাহাজ থেকে দুজন লোক ঝাঁপ দিয়েছে সমুদ্রে। সাঁতার কেটে আমাদের দিকে আসছে।' তেরেকো তাড়াতাড়ি ডেকে চলে এলেন।

একসময় ওই দুজন সাহসী নৌসেনা ডুবোজাহাজের রেলিং ধরে ডেকের ওপর উঠে এলেন। তেরেকো আর অন্য কর্মচারীরা অভিনন্দন জানালেন তাঁদের। তেরেকো তো তাদের ভিজে কাপড় সমেতই জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'সাবাস।'

'এ ছাড়া আর কী করার ছিল? আমরা খবর পেয়েছি শত্রুপক্ষের কয়েকটা বিমান টহল দিতে বেরিয়েছে। যত শিগগির সম্ভব ফিরতে হবে আমাদের।'

দুটি ডুবোজাহাজ এবার যতদূর সম্ভব কাছাকাছি এল। তার টানা হল দুটি ডুবোজাহাজের মধ্যে। সেই তারে ঝোলানো হল বিশাল এক রবারের বেলুনের মতো ভেলা। সমুদ্র অবশ্য এখনও পুরোপুরি শান্ত নয়। তাড়াতাড়ি কাজ সারা দরকার। রবারের ভেলাটা থরথর করে কাঁপছে সাগরের ঢেউয়ে।

জার্মান ক্যাপ্টেনের কাছে বিদায় নিয়ে রবারের ভেলায় নেমে গেলেন নেতাজি। তাঁর পেছনে আর একটা বেলুনাকৃতি ভেলায় নামলেন আবিদ হাসান। ঢেউ-এর আঘাত ছিটকে ফেলে দিতে চাইছে তাদের। ডুবোজাহাজ দুটিকেও একটু একটু সামনে পেছনে করতে হচ্ছে। নইলে হয়তো একটার সঙ্গে একটার ধাক্কা লেগে যাবে। এমন উত্তাল সমুদ্রে নোঙর ছাড়া জাহাজ ভাসিয়ে রাখা প্রচণ্ড কঠিন ব্যাপার।

নেতাজি আর আবিদ হাসান দুজনেই একবারে ভিজে গেছেন। নোনাজলের ঢেউ বারবার দুজনকে ধারাস্নান করিয়ে দিচ্ছে। কোনওমতে তার ধরে বেলুনের ভেলায় দুলতে দুলতে এগোচ্ছেন দুজনে। রীতিমতো সার্কাসের কসরত করতে হচ্ছে তাঁদের।

এইভাবে একটা ঘণ্টা কাটল। অবশেষে একসময় কাকভেজা হয়ে নেতাজি আর আবিদ লালচোখ নিয়ে জাপানি ডুবোজাহাজের কাছে পৌঁছলেন। রেলিং ধরে ডেকে এসে যখন পৌঁছলেন তাঁরা, সবাই হাততালি দিয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল।

নেতাজির কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে জার্মান ডুবোজাহাজ ফিরে চলল এবার। তাদের ভয় সঞ্চিত জ্বালানি হয়তো ফুরিয়ে যাবে।

জাপানি ডুবোজাহাজও এবার ফেরার পথ ধরল। আকারে জাপানি জাহাজটি জার্মান

ডুবোজাহাজের চেয়ে অনেকটা বড়। আড়াই মাস পরে নেতাজি আর আবিদের ভাত, তরকারি, আচার এমনকী মিষ্টিও জুটল। নেগিশি দোভাষীর কাজ সামলাচ্ছেন। যাত্রা শুরু হবার পর থেকে আর দাড়ি কামানো হয়নি নেতাজির। কিন্তু দাড়িতে বেশ ভালই লাগছে তাঁকে।

পরের দিন ২৯ এপ্রিল। জাপান সম্রাটের জন্মদিন। জাপানিরা সম্রাটকে সূর্যের বংশধর বলে মনে করেন। তাদের কাছে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। জাপানি মদ 'সাকে' খাওয়া হচ্ছে গেলাসের পর গেলাস। সবাই উৎসবের মেজাজে।

নেতাজি হঠাৎ লক্ষ করলেন ম্যাপের সঙ্গে ডুবোজাহাজের গতিপথের কম্পাস নির্দেশের মিল নেই। চমকে উঠলেন তিনি। নেগিশিকে বললেন, 'আমার আন্দাজ যদি ঠিক হয়, আমরা পেনাং-এর দিকে যাচ্ছি না।'

'হ্যাঁ আমরা সবং ঘুরে যাচ্ছি। আমাদের পেনাং-এ যাবার খবরটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় জাপানি নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার থেকে ওয়ারলেসে সতর্ক থাকার নির্দেশ এসেছে।' নেগিশি বললেন।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তোজোর নির্দেশ। যিনি আসছেন তাঁকে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দিতে হবে। সতর্কতায় কোনও শিথিলতা যেন না থাকে।

১৩
মহানায়কের আগমন

১

খাঁচায় বন্ধ সিংহের মতো অবস্থা নেতাজির। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসু। তাঁর ওপরেই রাগটা গিয়ে পড়ল নেতাজির। 'এইরকম কয়েদি হয়ে আর কতদিন আমাকে থাকতে হবে এই হোটেলে? বার্লিন থেকে এত কাণ্ড করে আমাকে কি নজরবন্দি করে রাখার জন্য এখানে আনা হয়েছে?'

আরসুর কাছে এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। প্রায় পনেরো-কুড়ি দিন হল নেতাজি টোকিয়োর সবচেয়ে অভিজাত ইম্পিরিয়াল হোটেলে রয়েছেন। তাঁর স্যুটের ঠিক সামনেই হাবিয়া পার্কের বিস্তীর্ণ ময়দান। তার সামনে শান টিলার বিস্তীর্ণ পরিসর। এই পরিসরেই জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সম্রাটের প্রাসাদ আর মুখ্য সামরিক কার্যালয়। যুদ্ধের সব নীতি আর পরিকল্পনার সবকটা কেন্দ্রই এত কাছে, তবু যেন কত দূরে!

বিশাল হোটেল, বাদশাহি বন্দোবস্ত, প্রোটোকল, সব কিছুই আছে। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও হাঁপিয়ে উঠেছেন নেতাজি। 'জেনারেল সাহেব। এখানে আসার পর এইভাবে সময় নষ্ট করা আমার কাছে শুধু অপরাধ নয়, পাপ বলে মনে হচ্ছে।'

কর্নেল ইয়ামামোতো সবাং-এ নেতাজিকে স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। বার্লিনে নেতাজির জন্য অনেক করেছেন তিনি। আরসুর সঙ্গে তিনিও রয়েছেন। এবার নেতাজি তাঁকে নিয়েই পড়লেন, 'জার্মানিতে আপনি আমাকে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেগুলো কি সবই ভুলে গেছেন আপনি?'

'দেখুন, একটু ভুল বুঝছেন আপনি...'

'একটুও ভুল বুঝছি না আমি। জাপানিরা ঠান্ডা মাথার মানুষ সেটা জানা আছে আমার। কিন্তু এই বরফের মতো শীতলতা অসহ্য।'

'আসলে প্রধানমন্ত্রী তোজো এখন এত ব্যস্ত যে একটুও সময় করে উঠতে পারছেন না তিনি।'

'তাই যদি হয় তবে আমাকে ফিরে যেতে দিন।'

আগামী সংগ্রামের জন্য নেতাজি অধীর। প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাচ্ছে আর আরও অস্থির হয়ে উঠছেন তিনি। কবে দেখা হবে তোজোর সঙ্গে আর তৈরি হবে আজাদি ফৌজ? দিল্লি ডাক দিচ্ছে তাঁকে। চোখে ভাসছে লালকেল্লা। লালকেল্লার ওপরে সগর্বে উড়ছে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা, সামনের বিস্তীর্ণ মাঠে বুক ফুলিয়ে কুচকাওয়াজ করছে আজাদি ফৌজের জওয়ানেরা।

জার্মানিতে হিটলার এইভাবেই তাঁকে আটকে রেখেছিলেন। এখানেও যদি জার্মানির পুনরাবৃত্তি হয় তবে তাঁর স্বপ্ন কোনওদিন সাকার হবে না। হতাশায়, রাগে, দুঃখে পাগলের মতো

হয়ে গেছেন তিনি। বেগতিক দেখে ইয়ামামোতো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সব জানালেন। ইয়ামামোতোর কাছে সব শুনে চিফ অব জেনারেল স্টাফ সুগিয়ামা আর জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শিগেমিৎসু ইম্পিরিয়াল হোটেলে নেতাজির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আলোচনা হল। তবে নেতাজি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে সর্বোচ্চ নীতি ঠিক হওয়ার পরেই বাস্তব কর্মসূচি তৈরি করা সম্ভব।

হতাশ নেতাজি বিছানায় শুয়ে আছেন। এমন সময় আবিদ হাসান উত্তেজিতভাবে এসে বললেন, 'নেতাজি, রাসবিহারী বোস দেখা করতে এসেছেন আপনার সঙ্গে।' শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন নেতাজি। সারা দেহে বিদ্যুৎ চমক। সকালে সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেই, একগোছা ফুল নিয়ে সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন রাসবিহারী।

দুজনে একদৃষ্টিতে দেখছেন দুজনকে। তেষট্টি বছর বয়স রাসবিহারীর শরীরে ছায়া ফেলেছে। শরীর সুস্থ নয়। চোখে অবশ্য এখনও সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি। তবু মনে হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য গত প্রায় চল্লিশ বছরের অক্লান্ত সংগ্রাম মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে ক্লান্ত করে ফেলেছে।

ফুলের তোড়াটি অঞ্জলি পেতে নিয়ে সুভাষ প্রণাম করলেন রাসবিহারীকে। উষ্ণ আবেগে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন রাসবিহারী। দুজনের চোখ দিয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা।

'সুভাষ, শুধু আমি নয়, পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় তোমার পথ চেয়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত উদিত সূর্যের দেশে তুমি এসে পৌঁছেছ, এজন্য ঈশ্বরকে অসংখ্য প্রণাম। পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয়ের হয়ে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি।'

দুজনেই একটু শান্ত হবার পরে কাজের কথা শুরু হল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘে আজ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে সেটা খুঁটিয়ে জেনে নিলেন সুভাষ। জাপানের রাজনীতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে রাসবিহারী অবহিত করলেন সুভাষকে।

'শুধু একটা বছর আগেও তুমি যদি পূর্ব এশিয়ায় আসতে তবে কী ভালই যে হত', রাসবিহারী বললেন। 'আজ বোধহয় একটু দেরি হয়ে গেছে সুভাষ। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানি, ইতালি আর জাপানের মিলিত অক্ষশক্তি যে প্রচণ্ড সাফল্য অর্জন করেছিল সেই পরিস্থিতি আজ বদলে গেছে। জার্মানি আর ইতালির ফৌজ আটকে গেছে আফ্রিকার বালির মধ্যে। স্তালিনগ্রাদে মার খেয়ে রাশিয়া অভিযান অসমাপ্ত রেখে, জার্মান ফৌজ পেছন ফিরে পালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তোজোর ওপর তাই ভয়ংকর চাপ পড়েছে।'

'মোহন সিংয়ের ব্যাপারেও তোজো নিশ্চয়ই খুবই অসন্তুষ্ট।' সুভাষ বললেন, 'মোহন সিং সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?'

'বক্তা হিসাবে মোহন সিং অসাধারণ। বক্তৃতার জোরেই ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের তিনি এক করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বক্তৃতায় যে আবেগ সেটা স্থায়ী হয় না। বক্তৃতা ছাড়া মোহন সিংয়ের মধ্যে খুব সামান্যই গুণ আছে। মোহন সিং প্রচণ্ড সেন্টিমেন্টাল। পদমর্যাদার দিক দিয়ে তিনি অনেকেরই নীচে ছিলেন। রাজনৈতিক জ্ঞান তাঁর একেবারেই নেই। বয়স এবং অভিজ্ঞতার বিচারে এত বড় একটা কাজের নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। তার ওপরে মহাবীর সিং আর গিলের মতো বন্ধুরা তাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে।'

রাসবিহারী ছাড়া আনন্দমোহন সহায়, মণিভাই দোশি, এ. এম. নায়ার, মূর্তি, সাংবাদিক নারায়ণ, বিনায়ক সুপনেকার এবং আরও অনেক ভারতীয় নেতা নেতাজিকে টোকিয়োতে চলা কাজকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করলেন। রাসবিহারী তাঁকে বৃদ্ধ টোয়ামোর কাছেও নিয়ে গেলেন।

নেতাজিকে আশীর্বাদ করে টোয়ামো বললেন, 'শেষবারের মতো চোখ বোজার আগে তোমার দেশ, তথাগতের পুণ্যভূমিকে যদি স্বাধীন দেখে যেতে পারি, তবে আর কিছু চাই না।'

রাসবিহারীর বাড়িতে যেদিন নেতাজি গেলেন সেদিন সে বাড়িতে যেন উৎসব শুরু হয়ে গেল। রাসবিহারী তনয়া টেটিকো নেতাজিকে পঞ্চপ্রদীপের আরতি করে স্বাগত জানালেন। রাসবিহারীর ছেলে মাসাহিডে সুদর্শন যুবক। রাসবিহারী তাকে আদর করে 'ভারতভূষণ' বলে ডাকেন। সম্প্রতি জাপানি নৌসেনায় অফিসার হিসাবে যোগ দিয়েছে মাসাহিডে। 'তোমার ইউনিফর্মে যেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাজ থাকবে, সেইদিনের প্রতীক্ষায় থাকলাম আমি।' নেতাজি বললেন তাকে।

'কাকা, আমিও সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছি।'

'একটু অপেক্ষা কর। সেদিন আর বেশি দূরে নয়। ততদিন পর্যন্ত জাপানি নৌদলে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে আরও যোগ্য করে তোলো।'

গোলাপফুল দিয়ে সাজানো রাসবিহারীর পরলোকগতা পত্নী তোসিকোর ছবিটা হাসছে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে ককোহ সোমা তার তোসিকো কেমনভাবে তাঁকে আগলে রেখেছিলেন সে বর্ণনা দিয়ে রাসবিহারী বললেন, 'শুধু এঁরাই নয়, আরও অনেক মা আর মেয়ে ভারতের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাই তো আমি ভারতের স্বাধীনতা সংঘ গড়ে তুলতে পেরেছি।' কথাটা শুনেই সুভাষের মনে পড়ল সুদূর ভিয়েনায় এমিলি আর সেই ছোট্টটির কথা। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করার সময় এখনও আসেনি। প্রাণপণ চেষ্টায় মনকে সামলালেন তিনি।

কুড়ি দিন কেটে গেল। প্রধানমন্ত্রী তোজোর সময় হল এবার। সসম্মানে নেতাজিকে নিজের দপ্তরে ডেকে পাঠালেন তিনি। তোজো জানতেন সুভাষ বোস ভারতের প্রথম সারির নেতাদের অন্যতম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁর উৎসাহ তেমন ছিল না। ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিশেষ করে রাসবিহারী-মোহন সিং সংঘর্ষ তাঁকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন সম্বন্ধেও বিতৃষ্ণ করে তুলেছে। তাঁর ধারণা একটা সত্যিকারের কর্মোপযোগী বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে ভারতীয়রা অক্ষম। তাই সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁর নিস্পৃহ ভাব।

বেশভূষায় পুরোপুরি ফৌজি তোজো। তলোয়ারের মতো ছুঁচলো করে কাটা গোঁফ। প্রথম দর্শনে একটু কড়া মেজাজের লোক বলে মনে হয় তাঁকে। জাপান সম্রাটের প্রতি তাঁর অবিচল ভক্তি। গত তিন বছর তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে যুদ্ধের সব দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। জার্মানি আর ইতালির সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করলেও তোজোর সঙ্গে হিটলার বা মুসোলিনির কোনওদিন সাক্ষাৎ হয়নি।

গোড়াতে সুভাষের কথা একটু একটু আটকে যাচ্ছিল। তারপর ভারতের স্বাধীনতার কথা উঠতেই বলার ভঙ্গি বদলে গেল। তাঁর দৃপ্ত ভঙ্গি, স্বচ্ছ চিন্তা, বলার আবেগ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করছিলেন তোজো।

'এর আগে ভারতবর্ষ আক্রমণের কোনও পরিকল্পনা জাপানের ছিল কি?' নেতাজি প্রশ্ন করলেন।

'কোনওদিনও না।'

'কিন্তু আমি এ কথা শুনেছি দু-এক বছর আগে। অন্তত জাপানি সৈন্যদের মধ্যে এ কথা বলাবলি হত।'

এবার একটু হেসে তোজো স্বীকার করলেন সে কথা।

'দেখুন এক গোলামি থেকে ছাড়া পেয়ে আর এক গোলামির ফাঁস পরা ভারতবর্ষের মানুষ

কখনওই মেনে নেবে না। তা ছাড়া তথাগত বুদ্ধর কল্যাণে আপনাদের আর আমাদের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে।'

'বর্মায় আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?' তোজো জিজ্ঞেস করলেন।

'কৌশলগত দিক দিয়ে সেটা ঠিকই হয়েছে। এর ফলে চিনকে, আমেরিকার সাহায্য করার রাস্তায় প্রতিবন্ধক গড়ে তুলতে পারছেন আপনারা।'

নেতাজির ইঙ্গিতে তোজো এবার চমকে উঠলেন। বর্মা দখল করার পেছনে এই নীতিগত ব্যাপারটি সামরিক মন্ত্রগুপ্তির আওতায় পড়ে। মাত্র দু-তিন সপ্তাহে সুভাষ কী করে জানতে পারলেন সেটা? একজন অসামরিক ব্যক্তির ভূগোল এবং সমরনীতির জ্ঞান বিস্মিত করল উপস্থিত সবাইকে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথা উঠতেই নেতাজির গলার স্বর চড়ে যায়।

'ব্রিটিশ একদিকে সভ্যতা আর মানবতা সম্পর্কে বড় বড় কথা বলে, অন্যদিকে চার্চিলসহ ব্রিটিশ কর্মকর্তারা আমাদের পরাধীনতার জাঁতাকলে পেষে। স্বাধীনতার জন্য আমাদের লড়তেই হবে।'

'কিন্তু বাইরের দেশের সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম মহাত্মা গাঁধীর নীতির সঙ্গে কি খাপ খাবে?' তোজো প্রশ্ন করেন।

'গাঁধীজি কী ভাববেন বা ভাববেন না এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। আমার প্রথম এবং প্রধান কাজ আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীকে শৃঙ্খলমুক্ত করা।'

'কিন্তু তাই বলে হিটলার আর মুসোলিনির মতো স্বৈরতন্ত্রীদের সাহায্য নেওয়াটা...'

'শুধু স্বৈরতন্ত্রীদের কেন, আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাকে যদি স্বয়ং শয়তানের দ্বারস্থ হতে হয় তাতেও ইতস্তত করব না আমি। আমার বিবেক বলে শয়তানও শয়তানিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।'

নেতাজির সঙ্গে কথা বলে তোজো খুবই প্রভাবিত। নেতাজির প্রতিটি কথায় উদ্বেল দেশপ্রেম, জাজ্বল্য নিষ্ঠা আর স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকুতি অনুভব করেছেন তিনি। গত কুড়ি দিন ধরে যে নেতাজিকে তোজো এড়িয়ে চলছিলেন, চারদিনের মধ্যেই নেতাজির সঙ্গে আবার সাক্ষাৎকার নির্ধারিত করলেন তিনি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী শিগেমিৎসুকে প্রশ্ন করলেন তোজো, 'কেমন লাগল লোকটিকে?'

'দেশের প্রতি আশ্চর্য ভালবাসা। সময় সময় আমার মনে হচ্ছিল, দেশের জন্য দরকার হলে ভগবানের সঙ্গেও বোধহয় লড়তে পারেন ইনি।'

২

২৬ জুন, ১৯৪৩। নেতাজির জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। জাপানি সংসদ 'ডায়েট'-এর ৮২তম বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। সম্রাট হিরোহিতো স্বয়ং বসে আছেন তাঁর রাজকীয় আসনে। সম্মানিত অতিথিদের গ্যালারিতে সসম্মানে বসানো হয়েছে নেতাজিকে। এই প্রথম জাপানে এ ভাবে প্রকাশ্যে এলেন নেতাজি।

প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁর ভাষণে বললেন, 'এখনও পর্যন্ত ব্রিটিশের নিষ্পেষণে ভারতবর্ষের দুর্দশায় আমরা প্রচণ্ড ব্যথিত। ভারতবাসী স্বাধীন হোক এটাই চাই আমরা। ভারতবর্ষ যাতে বৈভব আর সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে তার জন্য জাপান সাধ্যমতো সাহায্য করবে। জাপানের

প্রধানমন্ত্রীর অধিকার বলে আমি আজ এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় নেতা "চন্দ্রা বোস"কে জাপানের পক্ষ থেকে সাহায্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' সেই মুহূর্ত থেকে জাপানিদের কাছে সুভাষের পরিচয় হল চন্দ্রা বোস।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেই এই বিশেষ অধিবেশন সমাপ্ত হল। টোকিয়োর সমস্ত বড় বড় সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় শিরোনামা দিয়ে সুভাষ সম্বন্ধে খবর বেরোল। অনেক পত্রিকায় বেরোল তার সংক্ষিপ্ত জীবনীও। আই সি এস থেকে ইস্তফা, গাঁধীজির সঙ্গে সংঘর্ষ, ভারত পরিত্যাগ, হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এমনকী বিপদসংকুল সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে জানল সারা জাপান। পরের দিন থেকে ইম্পিরিয়াল হোটেলে মানুষের, বিশেষ করে ভারতীয়দের ভিড় উপচে পড়ল।

সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া বিবৃতিতে নেতাজি বললেন, 'দেশের স্বাধীনতার জন্য যে মুহূর্তের অপেক্ষায় আমরা ছিলাম তা এসে গেছে। এখন বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। যে শত্রু আমাদের অস্ত্রাঘাত করেছে অস্ত্রাঘাতই তার প্রত্যুত্তর। অগ্নিদীক্ষাতে আসবে ভারতের মুক্তি।'

টোকিয়ো থেকে প্রচারিত তাঁর বেতার বক্তৃতায় নেতাজি বললেন, 'আমরা আজ আর ভারতের সীমান্ত থেকে দূরে নেই। এবার আমাদের স্বপ্ন সফল হবে। আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ তার সমস্ত শক্তি দিয়েও আমার গতিরোধ করতে পারেনি। এবার শুরু হবে চূড়ান্ত সংগ্রাম। দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুরের পতনে ব্রিটিশ আজ স্তম্ভিত। বিশ বছর ধরে গড়ে তোলা সিঙ্গাপুরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে গেল মাত্র কয়েকদিনেই। আজ তারা ভারতের পূর্ব সীমান্তে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শুরু করেছে অচিরেই তা ভেঙে পড়বে। ব্রিটিশের কারাগারে বন্দি আমার বন্ধুরা, আমার দেশবাসী উন্মুখ প্রতীক্ষায় আমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছে। প্রাণপণে লড়তে হবে আমাদের। আমরা এগিয়ে যাবই। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ থামবে না।'

সিঙ্গাপুর থেকে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম অনবরত আসছে। যত শিগগির সম্ভব সিঙ্গাপুরে যেতে চান সুভাষ। সিঙ্গাপুরে রওনা হবার আগের দিন টোকিয়ো রেডিয়ো থেকে প্রচারিত তাঁর ভাষণে নেতাজি বললেন, 'আসুন আমরা সবাই মিলে শত্রুকে একটা চূড়ান্ত আঘাত হানি। অহিংসার পথে নয়, শক্তি দিয়েই মোকাবিলা করতে হবে শত্রুর। বিপ্লবের পথেই আসবে ভারতের স্বাধীনতা।'

রাসবিহারী, আবিদ হাসান আর কর্নেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে টোকিয়ো সামরিক বিমানবন্দর থেকে রওনা হবেন নেতাজি। তাঁর চলনে বলনে ফুটে উঠছে এক দৃপ্তভঙ্গি। সমস্ত পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর খ্যাতি। পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয়র কাছে তিনি এক দীপ্ত মহানায়ক। বিদেশি সাংবাদিকেরাও উপস্থিত রয়েছেন বিমান বন্দরে। একজন ইউরোপীয় সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'ভবিষ্যতে ভারতে কী ধরনের শাসনব্যবস্থা চান আপনি— গণতন্ত্র না স্বৈরতন্ত্র।'

'নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র।' নেতাজির উত্তর।

'স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব বলে মনে করেন আপনি?'

এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন নেতাজি। সাংবাদিকটিকে বললেন, 'আপনারা যাকে গণতন্ত্রের জনক বলে মনে করেন, সেই ব্রিটেনের কি অধিকার আছে পৃথিবীর শতকরা বিশ ভাগ লোককে শোষণ করে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াবার? কাল পর্যন্ত যিনি হিটলারের স্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই স্তালিন আজ জনযুদ্ধের কথা বলছেন কোন মুখে? কমিউনিজমের নামেই চার্চিলের নাক সিঁটকে ওঠে। তিনি আজ কোন নীতিতে স্তালিনের সঙ্গে গলাগলি করছেন। শুধু তাই নয়,

চার-পাঁচ বছর আগেও ব্রিটিশ হিটলারের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করেছিল। এ প্রশ্ন কি তাদের করেছেন আপনারা?'

সেই সাংবাদিকটি এবার নিরস্ত হলেন। কিন্তু আর একজন প্রশ্ন করলেন, 'চিনে জাপান যে অত্যাচার করেছে, আপনি কি সেটা ভুলে যাচ্ছেন?'

'জাপানের এই কাজের নিন্দা আমি আগেও করেছি, আজও করছি। কিন্তু তার জন্য জেনারেল তোজো আমাদের স্বাধীনতার জন্য যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেটা ধরতে কোনও দ্বিধা নেই আমার।'

সিঙ্গাপুর যাবার জন্য বিমান ছাড়ল। আনন্দে উদ্বেল সুভাষ। 'শিগগির অস্থায়ী ভারতীয় সরকার গঠন করতে হবে আমাদের।' একথা ইতিমধ্যে তোজোকে জানিয়েছেন তিনি। বিমানের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দিকচক্রবাল। রাসবিহারীর সঙ্গে মন খুলে বাংলায় কথা বলছেন নেতাজি।

'এ কথা কি সত্যি যে জাপানিরা এর আগেও একবার ইম্ফল অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল?' সুভাষ জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ। তার নাম দেওয়া হয়েছিল "অপারেশন ২১"। জাপানি ফৌজের কর্নেল হয়াসি, সেই পরিকল্পনার মূল রূপরেখা তৈরি করেছিলেন।'

'সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল কেন?'

'জাপানি সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল মুতাগুচি এ পরিকল্পনা কার্যকর হবে বলে মনে করেননি।' রাসবিহারী বললেন। 'তোমার আসার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানি সামরিক কর্তাব্যক্তিরা আবার ইম্ফল অভিযানের সম্ভাব্যতা নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। এটা অবশ্য খুবই গোপন খবর। সমর দপ্তরে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি আমি।'

'এ বিষয়ে তা হলে জেনারেল তোজোর সঙ্গে কথা বলব আমি।'

'অত তাড়াহুড়ো কোরো না। ইম্ফল অভিযানের বিরুদ্ধেও অনেক জাপানি অফিসার রয়েছেন, কাজেই সতর্কভাবে এগোতে হবে।' রাসবিহারী বললেন।

মুতাগুচি, কাওয়াবে, তেরাউচি প্রমুখ জাপানি সেনানায়কদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানালেন রাসবিহারী। দীর্ঘ সময়ের সফর। রাসবিহারীর শরীর হঠাৎ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। সুভাষ নিজের ব্যাগ থেকে ওষুধ বার করে দিলেন তাঁকে। খুব ঘাম হচ্ছে তাঁর। একটু ভাল বোধ করলে রাসবিহারী বললেন, 'সুভাষ চাঁদনি চকে সেই বোমা ছোড়ার পর থেকে এই শরীরটা তো আর বিশ্রাম পায়নি। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এবার সব ভার তুমি নাও।'

'দয়া করে এমন কথা আর বলবেন না।'

'না সুভাষ, সত্যি বড় ক্লান্ত আমি।'

'আপনার মতো আজন্ম বিপ্লবীকে কী বলব আমি? আমি শুধু বুঝি স্বপ্ন সাকার না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লবীদের ক্লান্তি থাকতে নেই। আজকের এই উত্তাল পরিস্থিতিতে আপনার আশীর্বাদের বড় প্রয়োজন আমার।'

৩

'যে জাপানিরা ব্যারিস্টার রাঘবন আর মোহন সিংয়ের মতো লোককে কয়েদ করেছে, তারা সুভাষ বোসকে আন্তরিক সহায়তা করবে বলে কি মনে হয় তোমার।' ব্যারিস্টার ইয়েলাপ্পা জিজ্ঞেস করলেন ড. লক্ষ্মী স্বামীনাথনকে।

উত্তরে লক্ষ্মী বললেন, 'ব্যারিস্টার সাহেব, আপনার মতো বিচক্ষণ লোকেরা নিশ্চয়ই সব দিক বিচার করেই কাজ করবেন।'

'লক্ষ্মী। জাপানের খাতিরে আসিনি আমি। আমি এসেছি সুভাষ বোসের জন্য। ভারতবর্ষে খুব কাছ থেকে সুভাষবাবুকে দেখেছি আমি। ত্রিপুরী কংগ্রেসে আক্ষরিকভাবেই প্রায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত সুভাষের শুধু অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে কংগ্রেস অধিবেশন পরিচালনা করার কথা ভুলতে পারি না আমি। তাই এসেছি আমি।' ইয়েলাপ্পা বললেন।

কুর্গ থেকে বিখ্যাত এই আইনজ্ঞ সিঙ্গাপুরে কাজে এসেছিলেন। হঠাৎ যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় আর ফিরতে পারেননি। তাঁর কথাতে অনেক ভারতীয় সুভাষকে অভ্যর্থনা করার জন্য কালাং বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত হয়েছেন। ত্রিশ বছর বয়সি ডাক্তার লক্ষ্মী সিঙ্গাপুরেই প্র্যাকটিস করতেন। সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে নামী লেডি ডাক্তার তিনি। তাঁর কথাতেও অনেকে এসেছেন বিমানবন্দরে।

কর্নেল জগন্নাথরাও ভোঁসলে আর আরও কয়েকজন আজাহ হিন্দ ফৌজের অফিসারও উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ খানও এসেছেন। একবার ঘড়ির দিকে একবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। জগন্নাথরাওকে বললেন, 'গত তিনদিন ধরেই শুনছি, সুভাষ আজ আসছেন, কাল আসছেন। সত্যি তিনি আসছেন তো?'

আশা-আশঙ্কায় দুলছে অনেকের মন। দুপুরের পর থেকে আকাশের রং বদলাল। সাদা মেঘের জায়গায় ঘনিয়ে এল কালো মেঘ। হঠাৎ মেঘের মধ্যে থেকে বোমারু বিমানের আওয়াজ ভেসে এল। বিমান বন্দর চঞ্চল হয়ে উঠল। ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে নিয়ে সাধারণ নাগরিকরা দাঁড়ালেন প্রস্তুত হয়ে। জাপানি আর ভারতীয় সৈনিকেরাও দাঁড়ালেন সজাগ ভঙ্গিতে। বিমানটা নেমে এল রানওয়েতে।

সবার নজর সুভাষের ওপর। দুধ সাদা সিল্কের স্যুট পরে দৃপ্তভঙ্গিতে নেমে আসছেন তিনি। বিউগল ধ্বনিত হচ্ছে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে। হাতে নস্যি রংয়ের ফেল্ট হ্যাটটা নামিয়ে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তিনি। একটা বিশাল ফুলের মালা পরানো হল তাঁকে। ব্যারিস্টার ইয়েলাপ্পা, জগন্নাথরাও ভোঁসলে, ড. লক্ষ্মী স্বামীনাথন প্রমুখদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'লম্বা চওড়া কোনও বক্তৃতা দিতে চাই না আমি। আমার ভারতীয় বন্ধুদের শুধু এইটুকুই বলতে চাই, আমি আজ আপনাদের মধ্যে আসতে পেরে দারুণ খুশি। এবার আমাদের আটত্রিশ কোটি দেশবাসীকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হবে। নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে আমাদের।'

পরের পরের দিন ক্যাথে বিল্ডিংয়ের দিকে প্রিয় নেতার দর্শন-অভিলাষী মানুষের ঢল। বিশাল সভাগৃহ উপচে পড়ে বাইরেও অসংখ্য মানুষের ভিড়। সকাল সাড়ে দশটায় মোটরগাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামলেন নেতাজি, রাসবিহারী আর কর্নেল ভোঁসলে। 'মহাত্মা গাঁধী কী জয়', 'সুভাষবাবু কী জয়' ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

সভাকক্ষে সুভাষ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার প্রতিনিধি উঠে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি আর

করতালিতে স্বাগত জানালেন তাঁকে। হাততালি যেন থামতেই চায় না। জাপানি পতাকা আর ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা দিয়ে মঞ্চ সুশোভিত। সবাই উদ্‌গ্রীব সুভাষ কী বলেন শোনার জন্য।

সভার শুরুতে জমাদার রামসিংয়ের বেহালা সঙ্গতের সঙ্গে মধুরকণ্ঠী কিশোরী সরস্বতী গান ধরলেন,

সুভাষজি, সুভাষজি,
জান-এ-হিন্দ আ গয়ে,
হ্যায় নাজ জিতকো হিন্দ পে
ও মান-এ হিন্দ আ গয়ে।'

সভা আর একবার জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল। প্রথমে পরিষদকে পাঠানো প্রধানমন্ত্রী তোজোর অভিনন্দন বাণী পড়া হল। সবার নজর তখন মঞ্চে উপস্থিত দুই 'বোস'-এর ওপর। প্রবীণ রাসবিহারীর চেহারায় বয়সের ছাপ বড় স্পষ্ট। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। তাঁর পাশে মাথা উঁচু করে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন সুভাষ।

রাসবিহারী বলতে শুরু করলেন, 'প্রায় চল্লিশ বছরের অনিয়মিত জীবনযাত্রার ফলে আমার শরীর আজ আর আমার মনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। আমি আজ ক্লান্ত। তাই এতদিন যে পতাকা আমি নানা দুর্যোগ আর দুর্বিপাকের মধ্যে দিয়ে বহন করেছি, উপযুক্ত হাতে সে পতাকা তুলে দিতে চাই আমি। আমার সৌভাগ্য যে, পতাকা তুলে দেবার জন্য যোগ্যতম হাতই পেয়েছি আমি। শুধু আমারই বা বলি কেন, এ সৌভাগ্য ভারতের স্বাধীনতাপ্রেমী প্রতিটি মানুষের, এ সৌভাগ্য ভারতের বিপ্লবী চেতনার। তাই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব আজ আমি আমার উত্তরসূরি হিসাবে শ্রীসুভাষচন্দ্র বোসের হাতে অর্পণ করছি। এখন থেকে তিনিই আমাদের নেতৃত্ব দেবেন, নিয়ে যাবেন বিজয়ের পথে। জয় হোক সুভাষের, জয় হোক আপনাদের। জয় হোক বিপ্লবের। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।'

রাসবিহারীর পরে উঠে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট কর্নেল জগন্নাথরাও ভোঁসলে। 'সমস্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ আপনার আদেশ সর্বান্তঃকরণে মেনে চলবে'— ফৌজের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। এইবার মাইকের সামনে দাঁড়ালেন নেতাজি।

'আমরা যখন স্কুলের ছাত্র, তখন সারা ভারত বহ্নিশিখার মতো দিকে দিকে বিপ্লবের প্রেরণা জাগিয়েছেন রাসবিহারী। আজকের নব্যযুবকেরা তাঁর সে দিনের কথা হয়তো জানে না। কিন্তু আমরা কী করে ভুলব তাঁর অবদান।' রাসবিহারীর দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'যতই বলুন আপনি ক্লান্ত, কিন্তু আমরা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি না।' সভায় এবার হাততালির সঙ্গে হাসির রোল উঠল সুভাষের বলার ভঙ্গিতে।

তারপরে সারা পূর্ব এশিয়া থেকে আসা তিন হাজার প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে নেতাজি বলতে লাগলেন, 'স্বাধীনতার জন্য অধীর আমার সহযাত্রীগণ। গত দু' বছরেরও বেশি সময় আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমি নিশ্চিত যে এ যুদ্ধ যতই দীর্ঘস্থায়ী হোক এর সমাপ্তি হবে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি আর ভারতবর্ষের মুক্তিতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। ঝুলি হাতে যত্রতত্র সাহায্য ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে তারা। ব্রিটিশের তাঁবেদার প্রচারকেরা গলা ফাটিয়ে

চিৎকার করছে। জাপান বা জার্মানির মতো রাষ্ট্র ভারতবর্ষকে কতদূর সাহায্য করবে সে সম্পর্কে বিষ ছড়াচ্ছে তারা। কিন্তু জাপান এশিয়া সম্পর্কে তাদের যে নীতি ঘোষণা করেছে তার প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা আছে। আমার সমস্ত জীবন, আমার নিষ্ঠা, আমার বিশ্বাস, আমার চেতনা, এককথায় আমার সবকিছু আমি উৎসর্গ করেছি আমার দেশজননীর উদ্দেশে। আমার দেশের প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব এ কথা বলার সাহস আমার অতি বড় শত্রুরও হবে না। ব্রিটিশ যখন তার সমস্ত কপটতা আর চাতুর্য দিয়ে আমাকে বাগ মানাতে পারেনি তখন অন্য কেউ কোনও প্রলোভন বা ভয় দেখিয়ে আমাকে বশ করবে, সে কথা কি বিশ্বাস করেন আপনারা?' নেতাজির গলার স্বর উত্তেজনায় রিনরিন করছে। তাঁর আবেগ, তাঁর অতুলনীয় দেশপ্রেম সভায় উপস্থিত প্রতিটি মানুষের মন স্পর্শ করছে।

নেতাজি বলে চলেছেন, 'বন্ধুগণ। আমরা সবাই আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই পর্যায়ে আপনাদের অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা দুর্গম পথে যাত্রা এমনকী অনেক সময় অমানুষিক অত্যাচারও হয়তো সহ্য করতে হবে। এই মৃত্যুর পথ পেরোতে পারলে তবেই আমরা পৌঁছতে পারব স্বাধীনতার অমৃতলোকে।'

হিকারি কিকনের প্রতিনিধি নেতাজির বক্তৃতার নোট নিচ্ছিলেন। জাপানের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে যদি কিছু নেতাজি বলেন সে বিষয়টি লক্ষ করাই তার কাজ। কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর নেতাজি কোনও কিছুরই পরোয়া না করে ঘোষণা করলেন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল করে তোলার জন্য সবার আগে আমাদের গড়ে তুলতে হবে একটি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার।' নেতাজির এই ঘোষণায় কিকনের প্রতিনিধি স্তম্ভিত।

রাত্রে খাওয়ার সময় কিকনের প্রতিনিধিটি নেতাজিকে বললেন, 'অস্থায়ী সরকার গঠনের ব্যাপারটা এত তড়িঘড়ি বলাটা ঠিক হয়নি আপনার।'

'কেন?'

'আমাদের নিহোন সরকার এ বিষয়ে এখনও কিছু ভাবেননি।'

খাওয়ার টেবিলে উপস্থিত কর্নেল ভোঁসলে, শাহনওয়াজও খাওয়া থামিয়ে তাকিয়ে আছেন নেতাজির দিকে। নেতাজি জলের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে কর্নেল ইয়ামামোতোকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি আশা করেন যে প্রতিটি গ্রাস মুখে তোলার আগে আপনাদের অনুমতি নেব আমি?'

'না তা নয়। তবে যেখানে মূলনীতি নির্ধারণের ব্যাপার—'

'যথেষ্ট হয়েছে। মিস্টার ইয়ামামোতো, আপনাদের কাজ শুধু প্রোটোকল আর লিয়াজোঁ। তবে বিষয়টি যখন আপনারাই উত্থাপন করেছেন, তাই জানাচ্ছি— টোকিয়ো থেকে বিমানে বসার আগেই আমি প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। অর্থাৎ এ বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি জাপান সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে আগেই জানিয়েছি। কাজেই আপনারা আপনাদের সীমার মধ্যেই থাকলেই ভাল হয়।'

জার্মানিতেই নেতাজির সঙ্গে ইয়ামামোতোর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তাঁকে এভাবে বলায় ইয়ামামোতো অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু নেতাজির এই দৃঢ়তায় শাহনওয়াজ মুগ্ধ। নেতাজিকে অপলকে দেখছেন তিনি।

পরে ধিল্লোঁকে বললেন তিনি, 'এখন আর কোনও সংশয় নেই। ব্রিটিশরা যাই করুক, জাপানিরা যতই প্যাঁচ কষুক, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ককে আমরা পেয়ে গেছি। এখন আমাদের কাজ শুধু তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে, তাঁরই নেতৃত্বে দেশের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করা।

আজ সিঙ্গাপুরের পাডাং ময়দানে নেতাজিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুতি চলছে।

এমন সময় ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠল। আরদালি দেবী সিং ফোনটা নিয়ে এল নেতাজির কাছে। 'স্যার, জাপানি হেডকোয়ার্টারের ফোন।'

রিসিভার তুলতেই আওয়াজ ভেসে এল, 'চন্দ্রা বোস? আমি স্টাফ অফিসার ইনিডা, জাপানি কম্যান্ড থেকে বলছি।'

'বলুন ইনিডা। কী খবর?'

'আমাদের প্রধানমন্ত্রী তোজো আজ বা আগামীকাল সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন।'

নেতাজি আশ্চর্য হলেন। তোজোর সঙ্গে দশ-বারো দিন আগেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। এর মধ্যে তোজোর সিঙ্গাপুরে আসার মতো কী হল? এ কি শুধু মৈত্রীকে আরও নিবিড় করা না আর কোনও কারণ আছে? যাই হোক দেখা যাবে। আপাতত পাডাং ময়দানে যাওয়াটা বেশি জরুরি।

সিঙ্গাপুরের রাস্তায় নেতাজির মোটর ছুটছে। বনেটের ওপর তেরঙা ঝান্ডা উড়ছে। পেছনের সিটে সামরিক বেশে নেতাজি বসে রয়েছেন। সঙ্গে আছেন রাসবিহারী, কর্নেল ভোঁসলে এবং তাঁর দুজন এ ডি সি। সামনে দশ-বারোজন মোটর সাইকেল আরোহী। পেছনে গাড়ির সারি। তাতে রয়েছেন আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক অফিসার।

টাউন হল রোমান স্থাপত্যরীতিতে তৈরি। ইমারতের সামনে উঁচু উঁচু স্তম্ভ, সুদৃশ্য খিলান আর পাথরে গাঁথা বেদি। পাডাং এই ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রধান কার্যালয়। ইমারতের পেছন দিকে পিচের রাস্তা আর তারপরে নীল সমুদ্র। সামনের সবুজ লনে দশ হাজারের বেশি সশস্ত্র সৈনিক কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। মঞ্চে ভারতমাতার বিশাল প্রতিমা। প্রায় ততটা উঁচু গাঁধীজির একটা অয়েল পেন্টিং আর তেরঙা ঝান্ডা দিয়ে মঞ্চ সাজানো।

গাড়ি থেকে নেতাজির সঙ্গে নামলেন কর্নেল ভোঁসলে, রাসবিহারী আর জাপানি অফিসার কুনিঝুকা। সবার নজর সামরিক পোশাক পরা নেতাজির দিকে।

আজ পর্যন্ত সৈনিকেরা অনেক ব্রিটিশ আর জাপানি জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার বা চিফ কম্যান্ডারকে দেখেছে। কিন্তু নেতাজির পোশাক আলাদা। তাঁর পোশাকে ঝকঝকে মেডেল বা রং-বেরঙের রিবনের সারি নেই। বাহুতে কিংবা কাঁধে নেই কোনও পদমর্যাদার প্রতীক। কোমরের বেল্টে তকমা নেই, নেই কোনও তলোয়ার। তাঁর পোশাক সামরিক ধাঁচের কিন্তু খদ্দরের। মাথায় ত্যারচা করে পরা গাঁধী টুপির ধাঁচের খদ্দরের টুপি। শুধু দুটো পেতলের বোতাম ঝকঝক করছে সেই টুপির সামনে। তেরচা টুপিতে তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার বুট। মাঝখানে ফুলে থাকা খাকি প্যান্ট হাঁটুর পর থেকে পায়ে চেপে রয়েছে। কোটের ডানদিকে দুটো ব্যাজ। একটা গোল তেরঙা আর একটা অখণ্ড ভারতের মানচিত্র আঁকা। ডুবোজাহাজ সফরের সময় নেতাজির অনেক ওজন কমে গেছে। মনে হচ্ছে অনেক বছর বয়স কমে গেছে তাঁর। ছিপছিপে অথচ দৃপ্ত চেহারা এই পোশাকে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মুগ্ধ চোখে দেখছে সকলে।

'বলুন, ভারতমাতাকে মুক্ত করার জন্য, তাঁকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য কে কে এগিয়ে যেতে চান আপনারা?'

প্রত্যুত্তরে সৈনিকেরা নিজের নিজের রাইফেল উঁচিয়ে ধরলেন আকাশের দিকে। 'চল দিল্লি' ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখর হয়ে উঠল। পাঁচ মিনিট পর্যন্ত সে গর্জন থামতে চায় না। তারপর নেতাজির ইঙ্গিতে নিস্তব্ধ হল ময়দান। নেতাজির বুক ভরে গেল গর্বে। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন তিনি।

'আমার বন্ধুরা। আজ গর্বের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে সমস্ত জগৎকে ডেকে আমরা বলতে পারি, দেখো ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে শামিল হতে আমাদের সৈনিকেরা আজ তৈরি। আমার সৌভাগ্য যে এই সংগ্রামে আমি আজ আপনাদের সহযাত্রী হবার গৌরবলাভ করেছি।'

'এক সময় ইংরেজরা গর্ব করে বলত যে তাদের সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। কিন্তু ইতিহাসের মতো শিক্ষাদাতা আর নেই। ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে প্রত্যেক সাম্রাজ্যের উত্থানের মধ্যেই তার পতনের বীজও থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও পতন আজ ঘনিয়ে এসেছে।'

নেতাজির হাতে কোনও নোটস বা কাটিং কিছুই নেই। তাঁর সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসছে তাঁর মুখ দিয়ে।

'জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকাকে স্বাধীন করতে পেরেছিলেন তাঁর সামরিক শক্তিতে। ইতালির মুক্তিসংগ্রামে গ্যারিবল্ডি সফল হয়েছিলেন তাঁর সৈন্যদলের সহায়তায়। আমাদের দেশ মহান। কিন্তু যেহেতু আমাদের নিজস্ব সেনাদল নেই তাই আমরা দুর্বল, আমরা পঙ্গু। অনেক বছর ধরেই এই দুঃখ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। আজ আপনাদের পেয়ে আমার সে দুঃখ আর নেই। স্বাধীনতার পথের শেষ প্রতিবন্ধক আপনারা দূর করে দিয়েছেন। আপনারা আজ ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছেন।'

প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে বলে চলেছেন নেতাজি। নেতাজির বক্তৃতা শুনে আবেগে বারবার চোখের জল মুছছেন রাসবিহারী। আগ্নেয়গিরির লাভার মতো বেরিয়ে আসছে নেতাজির মনের কথা। গ্যারিবল্ডির অমরবাণী আবার নবরূপ পাচ্ছে তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে।

'জয় আমাদের নিশ্চিত কিন্তু তাই বলে শত্রুপক্ষের ক্ষমতাকে আমরা যেন ছোট করে না দেখি। আমাদের শত্রু প্রবল, ক্রূর ও নৃশংস। অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আপনাদের। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রাহীনতা, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে আমাদের এই দুর্গম পথে। আজ আমি শুধু আপনাদের এই কথাই শুধু দিতে পারি, যে ঘনঘোর রাত্রেই হোক আর অরুণকিরণোজ্জ্বল প্রভাতেই হোক, সুখে-দুঃখে, জয়ে-পরাজয়ে আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব আর আশা করব জীবনের জয়োল্লাসে আর মৃত্যুর করাল গ্রাসের সামনে সবসময়ই আপনাদের আমি সঙ্গেই পাব। তবেই আমি পারব স্বাধীনতার সিংহদ্বারে আপনাদের পৌঁছে দিতে।'

মাঝখানে একটু থামলেন নেতাজি। রুমালে চোখ মুছলেন। গলার স্বর কাঁপছে তাঁর। বললেন, 'জানি না আমরা কতজন এই মুক্তি সংগ্রামের পর বেঁচে থাকব। কিন্তু এটা জানি যে যারা বেঁচে থাকবে তারা ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে পৌঁছবে লালকেল্লায়। ভাইসরয়ের প্রাসাদের ওপর থেকে ইউনিয়ন জ্যাক ছুড়ে ফেলে দিয়ে শহিদের রক্তে পূত তেরঙা ঝান্ডা ওড়াবে। আনন্দে, গর্বে, মাথা উঁচু করে অভিবাদন করবে সেই পতাকাকে। শুধু তখনই শুরু হবে আমাদের যাত্রা। ততদিন পর্যন্ত আমাদের শ্লোগান হবে দিল্লি চল, চল দিল্লি।

নেতাজির আহ্বানে সবাই যেন সম্মোহিত হয়ে গেছেন। তাঁর উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে উপস্থিত সৈনিকদের মধ্যে। অনেকে যেন অনুভব করছেন যে তাঁরা যেন ইতিমধ্যেই লালকেল্লা পৌঁছে গেছেন। ভাষণ শেষ হওয়ার পর সৈনিকদের এক একটি দল এগোতে লাগলেন সারি

বেঁধে। ব্যান্ডের তালে তালে মার্চপাস্ট করে নেতাজিকে অভিবাদন জানালেন তাঁরা। তাঁদের পেছনে সাঁজোয়া গাড়ি, কামানবাহী গাড়ি আর অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামের গাড়ির মিছিল।

কুচকাওয়াজ শেষ হওয়ার পরও সেখানেই রয়ে গেলেন নেতাজি। আজাদ হিন্দ ফৌজের দেড়শো মতো অফিসার তাঁকে ঘিরে বসলেন চেয়ার টেনে নিয়ে। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে আলাপ করলেন নেতাজি। তাঁদের নামধামই শুধু নয়, কে কোন ব্যাচের, বাড়ির পরিস্থিতি, আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা আর প্রতিশ্রুতি সমস্ত খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন তিনি। তারপর সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 'সম্ভবত দু-একদিনের মধ্যেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো এখানে আসবেন। তিনি যদি আসেন তো তাঁর সামনে আমাদের আবার একবার আজকের মতো কুচকাওয়াজ করতে হবে। আমি চাই তোজোর সামনে যেন আরও ভালভাবে সব হয়।'

৫

বিদাদরি ক্যাম্পে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে। রান্নাঘরে দারুণ ব্যস্ততা। হিন্দু, শিখ, মুসলমান সবার জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়। সকালের কুচকাওয়াজের পর শ্রান্ত সৈনিকরা থালা বাটি হাতে নিজের নিজের লঙ্গরের সামনে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ গার্ডরুমে জোরে বাঁশি বেজে উঠল। সান্ত্রিদের ছুটোছুটি শুরু হল। নেতাজির গাড়ি এসে ঢুকল ক্যাম্পে।

কর্নেল কিয়ানি আর কর্নেল ভোঁসলের সঙ্গে দ্রুত পদক্ষেপে নেতাজি ভেতরে এলেন। সৈন্যদের 'জয়হিন্দ' অভিবাদন গ্রহণ করে সোজা এলেন রান্নাঘরে। কোয়ার্টার মাস্টারকে ডেকে খাবারগুলো টাটকা আর পরিচ্ছন্ন কিনা জিজ্ঞেস করলেন। খাবার সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ দিলেন। তার সামনেই আলাদা আলাদা সারিতে বসলেন জওয়ানেরা। সবাই উৎসুক খাবার দেখে নেতাজি কী বলেন সেটা শোনার জন্য। সবাই যাতে শুনতে পায় এমন ভাবে জোরে নেতাজি বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেতে খুব ইচ্ছে করছে আমার।'

'নেতাজি, নেতাজি, আমাদের সারিতে বসুন।' তিন-চারটে সারি থেকে একসঙ্গে আওয়াজ উঠল। সবাই চেঁচাচ্ছে, 'এখানে নেতাজি, আমাদের এখানে।'

'আমার ইচ্ছে করছে সবার সঙ্গেই খেতে।'

'তা হলে সব সারিতেই বসে অল্প অল্প করে খান না কেন নেতাজি।'

'তা কেন খাব? ব্রিটিশের কাছে আমি জোর গলায় বলি যে আমরা ভারতবাসী সবাই এক আর এখানে খাওয়ার সময় একসঙ্গে বসি না আমরা! আগামীকাল একসঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি কী করে হব আমরা? প্রীতম সিং, কিয়ানি, শাহনওয়াজ আপনারাই বলুন। কী করে শত্রুর বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়ব আমরা?'

সবাই চুপ। কেউ কোনও নড়াচড়াও করছেন না। নেতাজির কথা মর্মে গিয়ে বিঁধেছে সকলের। নিজেদের অনৈক্য কখনও তাঁদের কাছে এত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। নেতাজির প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই অনৈক্যের কাঁটা কতখানি বিঁধছে তাঁকে।

'আপনি বলুন নেতাজি—কী করব আমরা', প্রীতম সিং বললেন।

'আপনি শুধু হুকুম দিন নেতাজি।' জামান কিয়ানি বললেন।

'তোমরা কি চাও যে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করি আমরা?'

'নিশ্চয়ই।'

'তবে আগে এই আলাদা হাঁড়িগুলো এক করো। হালাল হোক আর ঝটকা হোক, মাংস মাংসই। আমাদের মধ্যে যদি অনৈক্য থাকে তবে একসঙ্গে পা মিলিয়ে চলব কী করে আমরা? তাতে সুবিধে হবে একমাত্র ব্রিটিশের। ভারতের বুকের ওপর বসে ছুরি চালাবে তারা।'

'নেতাজি জিন্দাবাদ' 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ' আওয়াজে মুখরিত হল শিবির। এরপর থেকে সবার খাবার একসঙ্গে তৈরি হবে এই শপথ নিলেন সবাই।

খাওয়ার পর তৃপ্তির ঢেকুর তুলে নেতাজি বললেন, 'কতদিন যে এত সুস্বাদু খাবার খাইনি।' একদিনে সৈন্যদের মধ্যেকার জাতপাতের দেওয়াল ধসিয়ে দিলেন নেতাজি। 'চল দিল্লি'-র দৃপ্ত আহ্বান একসূত্রে বেঁধে দিল সমস্ত আজাদ হিন্দ ফৌজকে।

এরপর সহকর্মীদের নিয়ে নেতাজি গেলেন সামরিক হাসপাতালে। সেখানে সমস্ত রোগীদের স্নেহভরে খবরাখবর নিলেন তিনি।

চ্যান্সরি স্ট্রিটের ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অফিসে যখন গেলেন তিনি তখন ব্যারিস্টার ইয়েলাপ্পা আর দীননাথ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের সাহায্য করার জন্য জাপান এত উদ্‌গ্রীব কেন?'

'যতক্ষণ ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীনে রয়েছে, পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ততদিন নির্বিবাদে বজায় থাকবে। ব্রিটিশ যদি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যায় তো জাপানের প্রতিপত্তি পূর্ব এশিয়ায় অনেক বাড়বে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাই জাপান নিজেদের স্বার্থেই চায়। কিন্তু কারণ যাই হোক এশিয়ার যে-কোনও দেশ যদি আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে সে সাহায্য আমরা ফিরিয়ে দেব কেন?'

নেতাজির কথার যুক্তি বুঝলেন সকলে। হঠাৎ শাহনওয়াজ নেতাজিকে একদিন একান্তে বললেন, 'নেতাজি, আমি ক্ষমা চাইছি।'

'কীসের জন্য?'

'আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টাই এতদিন করেছি আমি।'

'আর আজ?'

'এখন থেকে শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজ নয়, ভারতের অখণ্ডতার জন্যে জীবনপণ করব আমি।'

নেতাজির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আনন্দে। তিনি জানতেন একসময় শাহনওয়াজ ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের কট্টর বিরোধীদের একজন। নেতাজির জাদুস্পর্শে পুরোপুরি বদলে গেছেন তিনি।

শুধু শাহনওয়াজ নয়, আরও অনেকে—যাঁরা আজ পর্যন্ত সংশয়ের দোলাচলে দুলছিলেন, দলবাজির শিকার হচ্ছিলেন, সবার মধ্যেই এখন এক নতুন আলো। এতদিন কেউ ছিলেন মোহন সিংয়ের জোটে, কেউ ছিলেন রাসবিহারীর সমর্থক। সব জোটের, সব জটের বাঁধন খুলে আজাদির স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠলেন সবাই।

নতুন চেতনার স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায় সকলকে।

৬

৬ জুলাই, ১৯৪৩। শুক্রবার। 'শোনান টাইম'-এ নেতাজির সভার কথা ঘোষিত হয়েছে। দুপুর থেকেই দলে দলে লোক আসছে। শুধু সিঙ্গাপুর নয়, ইপো, পেনাং, আলোরস্টার প্রভৃতি দূরের শহর থেকেও লোক আসছে। পাডাং ময়দান অনেক আগেই ভরে গেছে। তারপর কাছের বাড়িগুলোর ছাদ, গাছের ওপর—যেখানেই দেখা যাচ্ছে লোকে লোকারণ্য। ভারতীয়রা ছাড়াও উপস্থিত হয়েছেন দেশবিদেশের সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার আর অনেক কৌতূহলী বিদেশি নাগরিক। অনেক ভারতীয় মহিলার কোলে শিশুসন্তান। মালয়েশিয়ার ইতিহাসে কোনও একজন লোকের বক্তৃতা শোনার জন্য এত জনসমাগম এই প্রথম।

দেশভক্তিমূলক গানের পর নেতাজি উঠে দাঁড়ালেন ভাষণ দিতে। ফৌজি পোশাক এখন তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে গেছে। কেন তাঁকে দেশ ছাড়তে হল, কীভাবে এখানে এসে পৌঁছলেন তার কিছু কিছু বলে তিনি মূল বক্তব্যে এলেন।

'স্বাধীনতার এই মহাযজ্ঞ যদি সফল করতে হয় তবে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার আমাদের গড়ে তুলতেই হবে। বন্ধুগণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের এজন্যে মুক্তহস্তে দান করতে হবে। আজ থেকে ত্রিশ লক্ষ পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়দের শ্লোগান হোক—সর্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্যে সর্বস্ব পণ—Total mobilisation for a total War। এ যুদ্ধের জন্য আমাদের জনবল চাই, ধনবল চাই, চাই সমরোপকরণ।'

ঘণ্টাখানেক বক্তৃতার পরেই শুরু হল বৃষ্টি। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পাশেই সমুদ্র উত্তাল। হঠাৎ বৃষ্টি আসাতে একটু চাঞ্চল্য শুরু হল তবে নেতাজির বক্তৃতায় এমন এক মোহময়ী জাদু যে জায়গা থেকে বিশেষ কেউ নড়লেন না। বৃষ্টির গতি আরও বাড়ছে। নেতাজি ভিজে ভিজেই বক্তৃতা দিচ্ছেন। স্বেচ্ছাসেবকদের একজন একটা ছাতা মেলে ধরলেন নেতাজির মাথায়। সেটা সরিয়ে দিলেন নেতাজি। অঝোর ধারে বৃষ্টির মধ্যে বলে চলেছেন নেতাজি—অঝোর ঝরণ বৃষ্টির মধ্যে শুনছেন শ্রোতারা।

'বন্ধুগণ, এই জায়গাটিতেই মাত্র সেদিন আমার ফৌজি ভাইয়েরা শপথ নিয়েছেন, যতদিন দিল্লির লালকেল্লায় তাঁরা তেরঙা ঝান্ডা না তুলতে পারছেন, অবিরাম সংগ্রাম করবেন তাঁরা। তাঁদের মন্ত্র "চল দিল্লি"। সেই রকম পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লাখ ভারতীয়ের মন্ত্র হোক, "করো সব নিছাওর, বনো সব ফকির"।'

বলতে বলতে বৃষ্টিভেজা চশমা খুলে রুমাল দিয়ে একবার মুছে নেন নেতাজি। তারপর সভার দিকে তাকিয়ে গর্জে ওঠেন, 'বলুন, আজাদিকা ওয়াস্তে সবকুছ নিছাওর করেঙ্গে!'

'হাঁ হাঁ—কিঁও নেহি নেতাজি? ওয়তনপে জান দেঙ্গে।' সমস্ত সভা যেন একবাক্যে গর্জে ওঠে।

আড়াই ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা চলল। কোলে ছেলে নিয়ে মেয়েরাও শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে সভায়। এবার হলের মধ্যে নেতাজি আর অন্যান্য অফিসাররা গিয়ে বসলেন। বাইরে তখন বিশাল লাইন পড়েছে। নেতাজির 'করো সব নিছাওর' আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসেছে তারা। যে যা পারছে দিচ্ছে, মেয়েরা গায়ের গয়না পর্যন্ত খুলে দিচ্ছে। কৃতজ্ঞতায় নেতাজি মাথা নিচু করে অভিবাদন করছেন তাঁদের।

বাইরে লাইন বেড়ে চলেছে। সেই লাইনে মলিন কাপড়ে ভিজে চুপসে এক তামিল বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে। শাহনওয়াজ লক্ষ করছেন বৃদ্ধার হাতে তিনটি জীর্ণ এক টাকার নোট। তাঁর চেহারাই বলে দিচ্ছিল ওই তিনটি টাকাই তাঁর সর্বস্ব। আস্তে আস্তে লাইন এগিয়ে নেতাজির কাছে পৌঁছে

থরথর করে কাঁপা হাতে নেতাজির দিকে নোট তিনটি বাড়িয়ে দিয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'নাও, বাবা, শুধু এই আছে আমার।' শাহনওয়াজের সারা গায়ে শিহরন। মন থেকে চাইছেন তিনি যে নেতাজি যেন এ টাকা তিনটি না নেন। নেতাজির দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এল। তবু উঠে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি পেতে তিনি গ্রহণ করলেন সেই বৃদ্ধার আশীর্বাদপূত 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'।

রাতে খাওয়ার সময় শাহনওয়াজ বললেন, 'নেতাজি, ওই বৃদ্ধার শেষ সম্বল তিনটি টাকা আপনি কেন নিলেন? হয়তো...।' আর বলতে পারেন না শাহনওয়াজ।

নেতাজির খাওয়া থেমে গেল। বললেন, 'শাহনওয়াজ, তুমি ঠিক বলেছ। আমার সামনেও সেটা ছিল এক ধর্মসংকট। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আমার ওই মায়ের কাছে আর কিছুই নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি যদি তাঁর দান গ্রহণ না করতাম তবে অধর্ম হত। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সে দান করতে এসেছে। আমি যদি সেটা না নিতাম তবে আমার ওই মা-টি ভাবত আমি শুধু বড়লোকদের দান গ্রহণ করি। কিন্তু শাহনওয়াজ, আমার কাছে ওই বৃদ্ধার দান যে ধনীদের কোটি টাকা দানের চেয়ে অনেক বড়। আমার ভারতবর্ষ তো এদের নিয়েই শাহনওয়াজ, এই দরিদ্র, জীর্ণ, বুভুক্ষু জনসাধারণের। তাদের ঘামে আর রক্তে ভেজা আমার মাতৃভূমির জন্য তাঁর এই দান আমি কী করে ফিরিয়ে দেব বলো?'

৭

৯ জুলাই, ১৯৪৩। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সম্মানে পাডাং ময়দানে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে।

শুরুতে রাম সিং-এর বেহালা তার মোহিনী সুরে মুগ্ধ করল সবাইকে। এবার মঞ্চে এলেন দীর্ঘদেহী, সুদর্শন মেজর ভুরেওয়াল। ভুরেওয়াল আগে ছিলেন পেনাং-এ ব্যারিস্টার রাঘবনের স্বরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষক। সৈনিকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় তিনি। চলনে বলনে পাক্কা পঞ্জাবি। গায়ক হিসাবে খ্যাতি আছে তাঁর। ভুরেওয়াল মঞ্চে দাঁড়াতেই হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল চারদিক। ভুরেওয়াল তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে গাইতে লাগলেন,

সরপর তিরঙ্গা ঝান্ডা জলওয়া দিখ রহা হায়,
হো তেরি সর বুলন্দি জো চাঁদ আসমা হায়...

গাইতে গাইতে ভুরেওয়ালের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। গানের কথা কিছুই বুঝতে পারছেন না তোজো। কিন্তু ভুরেওয়ালের আবেগ, ভাষার পাঁচিল ভেদ করে স্পর্শ করছে তাঁর মনকে। নেতাজির কাছ থেকে ভুরেওয়াল সম্বন্ধে জানতে চাইলেন তিনি। নেতাজিও এর আগে দেখেননি তাঁকে। জামান কিয়ানির দিকে তাকালেন তিনি। কিয়ানি জানালেন 'ইনি পঞ্জাব রেজিমেন্টের এক সুদক্ষ অফিসার।'

কুচকাওয়াজের মুখ্য উদ্দেশ্য তোজোকে আজাদ হিন্দ ফৌজের নিষ্ঠা আর ক্ষমতা সম্পর্কে একটা আভাস দেওয়া। তেরঙা ঝান্ডা উড়িয়ে সাঁজোয়া গাড়ির সারি এগোচ্ছে। হঠাৎ পাশের একটা ইলেকট্রিকের তারে আটকে গেল একটা ঝান্ডা। গাড়ি থামাবার আগেই ঝান্ডা ছিঁড়ে পড়ল। নেতাজির মুখ লাল। উত্তেজিত নেতাজির হাতটি ধরে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন তোজো। 'ভাববেন না চন্দ্রা বোস। এরকম দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে। এটা জানবেন যে ঘটনা, দুর্ঘটনা যাই ঘটুক জাপান সবসময় আপনার পাশে থাকবে।'

সেই রাত্রে তোজো জাপানি সামরিক ছাউনিতে নেতাজির জন্য ডিনারের আয়োজন করেছেন। ডিনারে যাবার আগে নেতাজির সঙ্গে একান্তে কথা বলছিলেন তোজো। মন খুলেই কথা বলছেন দুজনে।

সুভাষচন্দ্র বললেন, 'মাঞ্চুরিয়া আর চিনে জাপানি সৈন্যদের অত্যাচার জাপানের ভাবমূর্তিকে অনেকটাই কলঙ্কিত করেছে, বিশেষ করে পশ্চিম দুনিয়ায়।'

'যুদ্ধের সময়ে এ ধরনের অত্যাচার একটা অভিশাপ। কিন্তু আপনি কি মনে করেন একমাত্র জাপানি সৈন্যরাই অমানুষ আর ব্রিটিশ বা আমেরিকান সৈন্যরা পূত-পবিত্র? ব্রিটিশ আর আমেরিকান সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়া, ফিলিপাইনস আর পুবদিকের অন্যান্য দ্বীপে যেখানেই গেছে পৈশাচিক অত্যাচার করেছে। একটি কিশোরীর ওপর হিংস্র নেকড়ের মতো দশ-বারোজন সৈনিক ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সৈন্যরা হাজার হাজার এশীয় মেয়েকে ট্যাক্সি গার্ল হতে বাধ্য করেছে। তাদের যদি ভাল করে দেখেন তো বুঝবেন কি ভয়ানক সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাদের। পশ্চিমি-রাষ্ট্রগুলো আমাদের বলে "স্বৈরতন্ত্রী"। হিটলার আর মুসোলিনি আমাদের বন্ধু। কাজেই তাদের সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা ঠিক হবে না। হয়তো তাদের মূল লক্ষ্য ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু প্রতিটি জাপানি কাজ করে তাদের সম্রাটের জন্য। সম্রাটকে তারা মনে করে ঈশ্বরের প্রতিভূ।'

নেতাজি লক্ষ করলেন তোজোর টেবিলে তোজোর হাতে লেখা কয়েকটা চিঠি পড়ে আছে। নেতাজিকে সেগুলোর দিকে তাকাতে দেখে তোজো বললেন, 'এগুলো আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের লেখা। যতই কাজ থাক, বাড়ি থেকে দূরে থাকলে প্রতি রাত্রেই ওদের চিঠি লিখি আমি। নইলে স্বস্তি পাই না।'

হিডেকো তোজোর দিকে তাকিয়ে আছেন নেতাজি। কুস্তিগিরদের মতো মাথা আর মুখ পরিষ্কার করে কামানো। গোঁফটা অবশ্য লম্বা আর ছুঁচোলো। জাপানিদের আন্দাজে বেশ লম্বা। সামরিক পোশাকে খুব মানিয়েছে তাঁকে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য তাঁর উদ্বেগ। জাপানি প্রভাবাধীন দেশগুলোর একটা কনফেডারেশন গড়ার কাজে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। পৃথিবীর কাছে তোজোর পরিচয় এক ক্ষমতান্ধ, যুদ্ধোন্মাদ হিসাবে। নিজের পরিবারের প্রতি তাঁর মমত্ব নেতাজির সামনে যেন তাঁর একটা নতুন পরিচয় তুলে ধরল।

খাবার ডাক এল। উঠে দাঁড়ালেন তোজো। পোশাক ঠিকঠাক করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের দেশে বুদ্ধগয়া ঠিক কোথায়?'

'বিহারে। হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন?' নেতাজির বিস্মিত প্রশ্ন।

'এই যুদ্ধের ঝামেলা মিটলে সপরিবারে একবার বুদ্ধগয়ায় যাবার ইচ্ছে আছে অনেকদিন থেকে।'

প্রধানমন্ত্রী তোজোর এই নৈশভোজের আসরে উপস্থিত আছেন পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জাপান অধিকৃত এলাকার সেনাধ্যক্ষরা। বর্মা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড সব জায়গা থেকে এসেছেন তাঁরা। বর্মা থেকে এসেছেন জেনারেল কাওয়াবে। উচ্ছল স্বভাব আর তাগড়া গোঁফ তাঁকে খুব আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তোজো একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—জেনারেল মুতাগুচি। নামটা শুনতেই চমকে উঠলেন নেতাজি। এই সেই জেনারেল মুতাগুচি, যিনি ইম্ফল অভিযান বানচাল করে দিয়েছিলেন? সুযোগ পেয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য, একটু পাশে নিয়ে গেলেন তাঁকে।

'জেনারেল, শুনেছি ইম্ফল অভিযান "অপারেশন-২১" আপনিই বাতিল করে দিয়েছিলেন?' নেতাজি প্রশ্ন করলেন।

মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে মুতাগুচি বললেন, 'ইয়োর একসেলেন্সি, যথেষ্ট কারণ ছিল তার। ইম্ফল-চিন্দুইন-কোহিমা—এই এলাকায় অভিযান চালানো অসম্ভব। চোরাবালি, জলাজমি আর ঘোর জঙ্গলভরা সে এলাকা দেখলেই ভয় লাগে—লড়াই তো দূরের কথা। গোরুর গাড়িও যদি সে অঞ্চলে যেতে পারত তা হলেও এই মুতাগুচি ভয় পেত না।'

নেতাজির মুখ দেখেই মুতাগুচি বুঝলেন যে কথাটা একেবারেই ভাল লাগেনি তাঁর। নিজের গেলাসে আর একটুকরো বরফ দিয়ে নেতাজিকে এবার প্রশ্ন করলেন, 'চন্দ্রা বোস, আপনি কি ব্রিগেডিয়ার উইনগেটের নাম শুনেছেন।'

'উইনগেট অর্থাৎ চিন্দ অভিযানের কম্যান্ডার সেই তরুণ অফিসারটি?'

'হ্যাঁ সেই ছোকরার কথাই বলছি। আচ্ছা, আপনি বলুন তো—জঙ্গলের যুদ্ধে কারা বেশি দক্ষ—জাপানিরা না ব্রিটিশেরা? পৃথিবীর ইতিহাস কী বলে?'

'অবশ্যই জাপানিদের সাফল্য এক্ষেত্রে অনেক বেশি।'

এবার বেশ নেশা হয়েছে মুতাগুচির। হাতের শূন্য গেলাসটা ছুড়ে ফেলে দিলেন তিনি। গেলাস ভাঙার শব্দে চমকে তাকালেন অনেকে। মুতাগুচির সেদিকে লক্ষ নেই। সুভাষকে পাশের একটা খালি ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি। নিরালায় মন খুলে কথা বলতে শুরু করলেন মুতাগুচি।

'প্ল্যান আমার তৈরিই আছে মিস্টার চন্দ্রা বোস। শত্রুপক্ষকে মুখের মতো জবাব দেওয়ার মতো পরিকল্পনা। আমার "ইম্পারু" অভিযানের পরিকল্পনা ব্রিটিশ-মার্কিন সমস্ত আয়োজনকে তছনছ করে দেবে।'

'ইম্পারু? মানে?'

'আপনারা যাকে ইম্ফল বলেন, জাপানি উচ্চারণে সেটাই ইম্পারু।'

এবার নেতাজি বিস্মিত। 'তার মানে যে জেনারেল মুতাগুচি ইম্ফল অভিযানের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন তিনিই আবার সেই অভিযানের সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছেন।'

'ঠিক বলেছেন। এবার চার্চিল আর উইনগেটকে শিক্ষা দিয়ে দেব আমি। গত এপ্রিল মাস থেকেই তৈরি আছে আমার প্ল্যান।'

'তবে বাধাটা কোথায়?'

'সেটা জিজ্ঞেস করুন আমাদের ফিল্ড মার্শাল তেরাউচিকে। শুধু সাদার্ন কম্যান্ডের কর্তাই নন তিনি, সম্রাটের নিকট আত্মীয়ও বটে।'

'তিনি কি আপত্তি করছেন এ পরিকল্পনার ব্যাপারে।'

'তিনি হ্যাঁ-ও বলছেন না, না-ও বলছেন না। মুখে কুলুপ এঁটে চুপ করে বসে আছেন টোকিয়োর প্রধান সামরিক দপ্তরে। আমাদের অফিসারদের একটা গোষ্ঠী মনে করেন আমার এই পরিকল্পনা অবাস্তব। আমি তাঁদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছি, একবার আমার হাতে ভার দিন। ইম্ফলের রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে দেব আমি।'

সমস্ত আবেগ দিয়ে এবার মুতাগুচির হাত চেপে ধরেন নেতাজি।

খাওয়ার টেবিলেই হঠাৎ রাসবিহারী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে 'মাউন্ট প্লেজান্ট' বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। পরদিন সকালেই টোকিয়ো রওনা হবেন তিনি। নেতাজি তাঁকে বললেন, 'আপনার খবর একদম ঠিক। কাগজপত্রে "অপারেশন-২১" পরিকল্পনা তৈরিই আছে।'

'চিন্তা কোরো না। টোকিয়োতে গিয়ে আমি এ ব্যাপারে তদ্বির করব। গত কয়েক বছর ধরেই শুধু প্রধান সামরিক দপ্তরেই নয় জাপসম্রাটের কাছেও এ ব্যাপারে চেষ্টা করেছি। তুমি এদিকটা সামলাও। ইম্ফল কেন দিল্লিও আর বেশি দূরে নেই সুভাষ।'

মুতাগুচির উৎসাহে সুভাষ উদ্দীপিত। রাতে বাড়ির ছাদে বসে সমুদ্র গর্জন শুনতে শুনতে ভারত আর ব্রহ্মদেশের সীমান্তের মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখেন রোজ। এই সীমান্ত শুধু দুর্গম নয় অগম্য বললেও চলে। প্রায় ছশো মাইল লম্বা আর দুশো মাইল চওড়া। এই পাহাড়ি এলাকা নিবিড় অরণ্যে ঢাকা। খরস্রোতা চিন্দুইন আর ইরাবতী ছাড়াও অনেক ছোট ছোট নদী বয়ে চলেছে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। জলা জমিতে জোঁক থিকথিক করছে। ম্যালেরিয়ার এত প্রকোপ পৃথিবীতে বোধহয় আর কোথাও নেই। এখানকার বর্ষা ভয়াবহ। রাস্তা যা আছে তা মানুষের তৈরি নয়, জন্তু জানোয়ারের পায়ে পায়ে তৈরি। আছে শকুনের পাল আর আরও অনেক হিংস্র পাখি। মানুষকে খুবলে খায় তারা। অথচ এই ভয়ংকর পথ ছাড়া যাবার রাস্তা নেই। আজাদ হিন্দ ফৌজকে এই রাস্তাতেই যেতে হবে। ওদিকে লালকেল্লা অবিরাম ডাকছে তাঁকে।

কাছে বসা জামান কিয়ানিকে বললেন, 'ট্রেনিং-এর গতি বাড়াও। ফৌজকে প্রস্তুত রাখো। অভিযান শুরু হতে আর বেশিদিন নেই।'

উত্তাল সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন আকাশ ছুঁতে চায়। সে ঢেউয়ের নীচে রয়েছে অতল গভীরতা।

৮

সিঙ্গাপুরের ম্যালকম রোড মেয়রের বাংলোর দিন ফিরে গেছে। কয়েকদিন আগেও খালি পড়ে থাকা বাড়িটা এখন প্রাণচঞ্চল। বাড়িটার একতলায় আট-দশটা বড় বড় হলঘর। বাড়ির ছাদটা কেল্লার ঢং-এ তৈরি। গোল সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলায় অনেকগুলো ঘর। নেতাজি ছাড়াও সেখানে থাকেন তাঁর প্রচার আধিকারিক এস. এ. আইয়ার, ব্যক্তিগত ডাক্তার কর্নেল রাজু, সচিব আবিদ হাসান আর স্টেনোগ্রাফার ই. ভাস্করন। পাঁচ-ছয় একর জুড়ে বাড়িটার পাশেই সমুদ্রের তট বাড়িটাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

বাড়ির সামনে সবসময় পাঁচজন সশস্ত্র প্রহরী থাকে। তিন ঘণ্টা অন্তর প্রহরী বদল হয়। তিনটে মোটরগাড়ি আর দুটি মোটর সাইকেল সবসময় তৈরি। কোনও বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের মতোই নেতাজি সম্মান পান। হিকারি কিকনের একটা প্লেটুন বিশেষভাবে তাঁর সুরক্ষার জন্য মোতায়েন করা আছে।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে সেদিন। ভাস্করন ছাড়াও জাপান সরকারের নেতাজির জন্য নিযুক্ত দোভাষী কাকিৎসুবো নোট নেওয়ার জন্য রয়েছেন। কাকিৎসুবোর বয়স বছর ত্রিশেক। কিন্তু বয়স আন্দাজে প্রচুর অভিজ্ঞতা তাঁর। পড়াশোনা করার জন্য ইংল্যান্ডেও ছিলেন অনেকদিন।

বৈঠকে উপস্থিত আছেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সিঙ্গাপুর মহিলা শাখার প্রমুখ শ্রীমতী চিদাম্বরম, ব্যারিস্টার ইয়েলাপ্পা, জন থিবি আর প্রসিদ্ধ মালয়ালি সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক কেশব মেনন। এ ছাড়া সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মঠের স্বামীজি বাল সুব্রামনিয়মও এসেছেন।

আজকের আলোচ্য বহু বিতর্কিত 'মহিলা সেনা' সংগঠনের বিষয়টি। কেশব মেনন বললেন,

'পরশুর সভায় মহিলা সেনা সংগঠনের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য জনসভাতে নিশ্চয়ই খাপ খায়। তাই বলে সত্যি সত্যি মহিলা বাহিনী গড়ে তোলা একটা পাগলামি।'

'শ্রীমতী চিদাম্বরম আপনি কি বলেন? মহিলাদের হাতে বন্দুক কি মানাবে?'

'মানাবে মানে—খুব মানাবে', শ্রীমতী চিদাম্বরম বললেন, 'তবে পুরুষদের অনেকেই যে ব্যাপারটা সহজভাবে হয়তো নেবেন না সেটাও ঠিক।'

'হয়তো মানে? নিশ্চয়ই মানবেন না। মেয়েদের কোমল হাতে এমব্রয়ডারি আর আলপনাই মানায়—বন্দুক পিস্তল নয়।' কেশব মেনন বলে উঠলেন।

'কিন্তু সুযোগ দিতে বাধা কোথায় মেনন সাহেব?' নেতাজি প্রশ্ন করলেন।

'আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দিন; পৃথিবীতে একটাও কি দেশ দেখাতে পারবেন যেখানে মেয়েদের ফৌজ রয়েছে?'

'গাঁধীজির লবণ আইনভঙ্গের সত্যাগ্রহে, খাদি প্রচার, পিকেটিং সব ব্যাপারেই তো মেয়েরা সমান তালে অংশ নিয়েছেন।'

'সুভাষবাবু, গাঁধীজির সঙ্গে তুলনা করবেন না। গাঁধীজি সাহায্যের জন্য জাপানের দ্বারস্থ হননি কোনওদিন।' কট্টর গাঁধীবাদী কেশব মেননের মনেপ্রাণে জাপানের প্রতি অবিশ্বাস।

'মেনন সাহেব। ব্রিটিশের শয়তানির মোকাবিলা করার জন্য আমি স্বয়ং শয়তানের সাহায্য নিতেও যে দ্বিধা করব না সে কথা আমি আগেও বলেছি আর এখনও বলছি।' এবার নেতাজির গলার স্বর বেশ চড়া।

'তবে আর আমার কিছু বলার নেই।' বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কেশব মেনন। সবাই তাকালেন নেতাজির দিকে। এর পরেও কি এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখাবেন তিনি।

সবাইকে উদ্দেশ করে নেতাজি বললেন, 'পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি বলে আমাদেরও হবে না! তবে তো কোনও প্রগতিই সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসই অন্য রকম সাক্ষ্য দেবে। মহাভারতের সুভদ্রার রথ চালানো, প্রমীলার নারী বাহিনীর কথা ছেড়ে দিলেও চাঁদ সুলতানা, সুলতানা রাজিয়া, দুর্গাবাই-এর মতো অনেক রানি যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৮৫৭ সালে ঝাঁসির রানি কী করেছিলেন সেটা কি ভুলে যাব আমরা? এই সেদিনও বীণা দাস, শান্তি দাস, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারকে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে দেখেছি আমরা।' আবেগভরে বলতে থাকেন নেতাজি।

নেতাজির উদ্দীপনা দেখে শ্রীমতী চিদাম্বরমের চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু উপচে পড়ে। বাকিরাও নেতাজির সঙ্গে সহমত। এখন শুধু প্রতীক্ষা জাপানের সম্মতির।

বৈঠক চলার মধ্যেই কর্নেল ইয়ামামোতো এসে নেতাজির হাতে একটা লেফাফা দিলেন। বললেন, 'কি করব নেতাজি! মেয়েরা বন্দুক হাতে যুদ্ধে যাবে এ প্রস্তাব আমাদের কর্তাব্যক্তিদের কাছেও অদ্ভুত আর হাস্যকর মনে হচ্ছে।'

'সেটাই স্বাভাবিক। কারণ জাপানে কোনও ঝাঁসির রানি জন্মাননি।'

রাত হল। অন্ধকারে সাগরের গর্জন শোনা যাচ্ছে। সাগরের মতোই উত্তাল নেতাজির মন। ভাবতে ভাবতে সংকল্প আরও দৃঢ় হয় তাঁর। তাঁর অস্থিরতা দেখে ইয়েলাপ্পা বললেন, 'একটা কাজ করা যাক। শুরুতে শুধু জনচারেক মহিলা নিয়ে আমরা আরম্ভ করি।'

'ইয়েলাপ্পা সাহেব চার কেন, একটা স্ফুলিঙ্গও বারুদের স্তূপে আগুন লাগাতে যথেষ্ট।' নেতাজি বললেন।

'আছে একজন। দৈবক্রমে তাঁর নামও লক্ষ্মী।'

'কে? ডাক্তার লক্ষ্মী স্বামীনাথন?'

'তিনিই। আমাদের আম্মু স্বামীনাথনের মেয়ে।'

সিঙ্গাপুরের একমাত্র মহিলা ডাক্তারকে চেনে না এমন লোক বিরল—সে ভারতীয়, মালয়ী, চিনে যেই হোক। দীনদুঃখীদের সেবায় তাঁর কাজ সমস্ত সিঙ্গাপুরবাসীর প্রশংসার বিষয়। সৌন্দর্যময়ী লক্ষ্মীর ব্যক্তিত্বও অসাধারণ। মালাবার কন্যা লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের সঙ্গে সেবার আগ্রহও বংশগত।

কেরলের ছেলে স্বামীনাথন অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসে মাদ্রাজে ফৌজদারি মামলার কাজে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বিয়ে করেছিলেন তেইশ বছরের ছোট সাদাসিধে আম্মুকে। কিন্তু বিয়ের পর আম্মুকে ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনেও পাঠিয়েছিলেন তিনি। আম্মুই মাদ্রাজের প্রথম মহিলা যিনি শুধু গাড়িই নয়, ঘোড়াও চড়তেন। আম্মুর দুই কন্যা—লক্ষ্মী আর মৃণালিনী। একজন ডাক্তার আর একজন স্বনামধন্যা নৃত্যশিল্পী। লক্ষ্মীর বিয়ে হয়েছিল টাটা এয়ারওয়েজের এক পাইলটের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই তাঁদের ছাড়াছাড়ি হবার পর লক্ষ্মী সিঙ্গাপুরে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেন। জটিল প্রসবের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর অসামান্য দক্ষতা। মালয়ের রবার বাগানের মালয়ালি, তেলুগু, বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা মজুর, গোয়ালারা জীবনদাত্রী দেবীর মতো শ্রদ্ধা করে তাঁকে। সিঙ্গাপুরের পতনের পর লক্ষ্মী যেন সবাইকার বোনের মতো হয়ে গেছেন। কেশব মেনন আর ইয়েলাপ্পার সাহচর্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কাজেও সোৎসাহে যোগ দেন তিনি। মেনন লক্ষ্মীর এভাবে সমাজসেবার কাজে জড়িয়ে পড়াটা খুব পছন্দ না করলেও লক্ষ্মী সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে উঠেছেন।

ইয়েলাপ্পা নিয়ে এলেন লক্ষ্মীকে। সারাদিন কাজ থেকে ফুরসত পান না নেতাজি। নানান কাজে সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে ফৌজি অফিসারদের ভিড় সবসময় লেগে আছে। প্রায় মাঝরাতে একটু সময় পেলেন নেতাজি। লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা কাজ করতে পারবে লক্ষ্মী?'

'আপনি শুধু হুকুম করেই দেখুন।'

'যে সম্প্রদায়ের মেয়েরা বোরখা দিয়ে চন্দ্রসূর্যের কাছেও মুখ দেখান না তাদের মধ্যেই রাজিয়া বলে একজন জন্মেছিলেন। তুমি কি তাঁর সম্বন্ধে জানো?'

'সুলতানা রাজিয়া? দিল্লির মসনদের প্রথম মহিলা সম্রাজ্ঞী?'

'পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন তিনি। আমাদের দেশে উনিশ কোটি মহিলা। এই স্ত্রীশক্তি যদি একবার জেগে ওঠে ব্রিটিশ পালাতে পথ পাবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতের পৃথিবীর হাল ধরবে মেয়েরা। আমি চাই তোমার মধ্যেই রাজিয়া সুলতানা আবার ফিরে আসুন। যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে যাওয়া ঝাঁসির রানির তলোয়ার আবার ঝলসে উঠুক তোমার হাতে। তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে গর্জে উঠুক পূর্ব এশিয়ার মেয়েরা। সে ডাক কি দিতে পারবে তুমি?'

লক্ষ্মী উঠে পিতৃপ্রতিম সুভাষকে প্রণাম করলেন। ইয়েলাপ্পা আর লক্ষ্মীকে নিয়ে এবার খেতে গেলেন নেতাজি।

এবার অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছেন লক্ষ্মী। জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েদের ওপর এই শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস আপনার কী করে এল নেতাজি।'

'আমার গুরু দেশবন্ধু সত্যাগ্রহের সময় তাঁর স্ত্রী আমার বাসন্তী মাকেও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন

রাস্তায় নামতে। তা ছাড়া বিবেকানন্দের বাণীও আমার প্রেরণা। আবেগভরে বললেন নেতাজি, একবার আমাদের মেয়েদের উঠে দাঁড়াতে দাও, দেখবে বিপ্লবের আগুন কীভাবে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।'

'নেতাজি, আপনি দেখবেন লক্ষ্মী কী করে?' ইয়েলাপ্পা বললেন।

'যতটা সহজ ভাবছেন ততটা সহজ নয়। এ শুধু লাঠিধারী পুলিশ আর কাঁদানে গ্যাসের মুখোমুখি হওয়া নয়। কামানের গোলার সামনে দাঁড়ানো। এ বাহিনী শুধু শোভা বাড়াবার জন্য নয়। এর জন্য দরকার হবে অত্যন্ত কঠিন ট্রেনিং। তারপর একদিন ফ্রন্টে গিয়ে লড়তে হবে তাদের।' এবার লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে নেতাজি প্রশ্ন করলেন, 'এবার বলো এরকম কাজের জন্য শ' খানেক মহিলাকে কি উদ্বুদ্ধ করতে পারবে তুমি?'

'আপনি দেখে নেবেন নেতাজি—অন্তত পাঁচ হাজার মেয়ের বাহিনী গড়ে তুলব আমি।' অসীম প্রত্যয় লক্ষ্মীর কণ্ঠে দৃপ্ত।

'কবে থেকে কাজ শুরু করতে পারবে?'

'কাল থেকে।'

ভোরের আর বেশি দেরি নেই। লক্ষ্মীকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য ইয়েলাপ্পাও চললেন সঙ্গে। গাড়িতে লক্ষ্মী বললেন, 'এত বড় নেতা অথচ কী অসম্ভব সাদাসিধে। কারও ওপর নিজের মত চাপিয়ে দেন না। ওঁর প্রত্যেকটি কথার পেছনে কী বিপুল প্রত্যয়।'

'এককথায় বলতে পারি নেতাজির ব্যক্তিত্ব লোককে সম্মোহিত করে ফেলে। আমাদেরই দেখ না। ব্যারিস্টার গুহ আর আমার দুজনেরই ব্যারিস্টারির আয় দু' লাখের কাছাকাছি। কিন্তু যেদিন থেকে নেতাজি এসেছেন কোর্টের মুখ দেখিনি আমরা।' ইয়েলাপ্পা বললেন।

'তা হলে আপনার মক্কেলদের কী হচ্ছে?'

'আমাদের মক্কেলরাও নেতাজির পাশে এসে কাজ করছেন। শুধু কি তাই, আমাদের বিপক্ষরাও নেতাজির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।' ইয়েলাপ্পার কথায় হেসে উঠলেন লক্ষ্মী। ইয়েলাপ্পাও হাসলেন।

এবার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে লক্ষ্মী বললেন, 'দেখে মনে হয় জীবনের কোনও দুর্বিপাকেই পা টলে না তাঁর। এবার থেকে আমার জীবনেও শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। এখন থেকে নেতাজির ডাকে সাড়া দিয়ে, তাঁর কাজেই আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করলাম আমি।'

গাড়ি এগিয়ে চলে। রাতের আঁধার হালকা হয়ে আসছে। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই।

৯

চারদিন পরেই নেতাজি আসবেন মহিলা বাহিনী পরিদর্শন করতে। ড. লক্ষ্মী, শ্রীমতী চিদাম্বরম আর ইয়েলাপ্পা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।

ইয়েলাপ্পা বললেন, 'আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য নেতাজির হাতে আমরা একটা টাকার থলি দেব।'

'সে তো দেবই। কিন্তু তাঁর চেয়ে বেশি ভাল হবে যদি আমরা ফৌজি রীতিতে তাঁকে বরণ করে নিতে পারি।' লক্ষ্মী বললেন।

লক্ষ্মীর কাজের প্রশংসা সবাই করেন। কিন্তু এত অল্প সময়ে একটা মহিলা প্লেটুন কী করে তৈরি হবে? আশেপাশের মেয়েদের প্রায় কেউই স্কুলের চৌকাঠ মাড়ায়নি। বেশির ভাগই

বোরখা পরা রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, যারা জানে শুধু রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা। কিন্তু হতাশ হবার পাত্রী লক্ষ্মী নন। কিছুদিন হল জার্মানি থেকে নেতাজির সহকর্মী এন. জি. স্বামী এসে পৌঁছেছেন। তাঁকে আর আবিদ হাসানকে নিয়ে কাজে লেগে পড়েন লক্ষ্মী।

মহিলা সৈনিকদের পোশাক কেমন হবে সেটা ঠিক হচ্ছে না। অবশেষে নেতাজির কাছে যাওয়া স্থির হল। এন. জি. স্বামী বললেন, শাড়িতেই মেয়েদের সবচেয়ে বেশি মানায়। লক্ষ্মী বললেন, 'কথাটা সুন্দর দেখাবার নয়, কুচকাওয়াজের, ট্রেনিংয়ের। আগামীদিনে ফ্রন্টেই বা শাড়ি পরে লড়ব কী করে?'

চুপচাপ শুনছিলেন নেতাজি। তারপর বললেন, 'আমি শুধু একটা উদাহরণ দিতে পারি। ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধে শহিদ হওয়ার সময় ঝাঁসির রানির অঙ্গে ছিল রক্তে ভেজা পুরুষের পোশাক।'

ফৌজের জন্য এক-একটি করে মহিলাকে রাজি করানো প্রচণ্ড কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াল। নেতাজির ডাকে গায়ের গয়না খুলে দিতে ইতস্তত করেননি মহিলারা। কিন্তু ঘরের মেয়েদের ময়দানে পুরুষদের মতো কুচকাওয়াজ করতে পাঠানো অন্য ব্যাপার। ডাক্তার হিসেবে সিঙ্গাপুরের বাড়িতে বাড়িতে লক্ষ্মীর অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তাও বহু কষ্টে পনেরোটি মেয়ে জোগাড় করতে পারলেন তিনি। আরও অন্তত পাঁচজন চাই। মেয়েদের অনেকেই রবার বাগানে বা রাস্তা তৈরির কাজ করে কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটায়। অনেকে দুধের বাচ্চাকে ময়দানের পাশে বসিয়ে রেখে কুচকাওয়াজে এল। মেজর চ্যাটার্জির কাছে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে থেকে ট্রেনার চাওয়া হল।

শ্রীমতী চিদাম্বরম আর লক্ষ্মী জাপানি শিবিরে যখন অস্ত্র চাইতে গেলেন, জাপানি মেজর হেসে ফেললেন। নিজের সহকারীদের জনান্তিকে বললেন, 'এর চাইতে চন্দ্রা বোস যদি একটা রাঁধুনি বাহিনী তৈরি করতেন তা হলে একটা কাজের কাজ হত।'

'যাকগে, তালিমের জন্যে অস্ত্র চাইছে যখন, দিয়ে দাও কয়েকটা।' বলে লক্ষ্মীকে কিছু পুরনো পোশাক আর বাতিল অস্ত্র দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেললেন তাঁরা।

সিঙ্গাপুরে মহিলা ফৌজের পত্তন হল। ইংরেজি কম্যান্ডের জায়গায় হিন্দি এল। 'আস্তে কদম', 'তেজ চল', 'ডাইনে মুড়', 'বাঁয়ে মুড়' ধ্বনিতে রোজ ময়দান সরগরম। রোজ চার-পাঁচ ঘণ্টা একনাগাড়ে কুচকাওয়াজের তালিম চলে। অনভ্যস্ত মেয়েদের পা টনটন করে।

কেশব মেননের আশীর্বাদ চাইতে গেলেন লক্ষ্মী। আশীর্বাদ তো করলেনই না তিনি, উলটে বললেন, 'এসব ছেলেখেলা বন্ধ কর। সুভাষ বুঝতেই পারছেন না যে তিনি কী করছেন। ব্রিটিশদের জায়গায় যখন জাপানিরা বসবে তখন তিনি বুঝবেন ব্যাপারটা। এখন ভারতের ফ্যুয়েরার হবার লালসায় কিছু বুঝছেন না তিনি।'

মেনন সাহেবের ঘর থেকে প্রায় কাঁদতে কাঁদতেই বেরোলেন লক্ষ্মী। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ইয়েলাপ্পা বললেন, 'গাঁধীজির এইসব অন্ধ ভক্তরা মনে করেন সুভাষ যা করেন সবই গাঁধীজিকে ছোট করার জন্য। আসলে এঁরা না বোঝেন সুভাষকে না বোঝেন গাঁধীকে।'

নেতাজির পরিদর্শনের আগের রাত শ্রীমতী চিদাম্বরম, ইয়েলাপ্পা আর লক্ষ্মী জেগে কাটালেন। রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী বাল সুব্রামনিয়ামও কয়েকজন শিষ্য নিয়ে তাদের সাহায্য করার জন্য এলেন।

ওয়াটার্লু স্ট্রিটের একটা মহিলা বিভাগের অনুষ্ঠান হবে। সকাল থেকেই মহিলারা দলে দলে আসছেন। অনেকে এসেছেন দশ-বারো মাইল দূরের রবার বাগান থেকে পায়ে হেঁটে।

একসময় নেতাজির গাড়ি এসে পৌঁছল। বিউগলের ধ্বনিতে স্বাগত জানান হল তাঁকে। মোটর থেকে নেমে সামনের দৃশ্য দেখে নেতাজি স্তম্ভিত। সামনে কুড়িটি মহিলা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। সবার পরনে বুশকোট আর শার্ট। সবার আগে খাকি কোট, হান্টিং ব্রিচেস, গোল সামরিক টুপি আর হাঁটু পর্যন্ত হান্টিং বুট পরা একটি তরুণী। নিজের অত সুন্দর চুলও ছোট ছোট করে কেটে ফেলেছেন লক্ষ্মী। বলতে গেলে একেবারে আপাদমস্তক আমূল পরিবর্তন। ছিপছিপে চেহারায় সামরিক পোশাক দারুণ মানিয়েছে। নেতাজিকে স্যালুট করলেন লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীর জন্য গর্বে নেতাজির বুক দশ হাত। ঝাঁসির রানি রেজিমেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে নেতাজি বললেন, 'ক'টা রাইফেল আপনারা ব্যবহার করবেন, ক'টা গুলি আপনারা ছুড়বেন সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে আপনাদের এই সাহসিকতা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আপনাদের দৃষ্টান্ত অন্যায়ের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে দুর্জয় সাহস। সৃষ্টি হবে এক নতুন যুগ।'

অনুষ্ঠানের ছবি তুলতে এসেছেন অনেক ফটোগ্রাফার। তাদের মধ্যে জাপানি আর অন্য বিদেশিরা আছেন। ইতিহাসের এই সূচনার ছবি ধরে রাখছেন তাঁরা ভবিষ্যতের জন্য।

ড. লক্ষ্মীর অপূর্ব কর্মক্ষমতায় নেতাজি রীতিমতো বিস্মিত। চার বছর আগে নিজের বিবাহিত জীবনে দুর্যোগ নেমে এসেছিল তাঁর। সেই স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজের শক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন তিনি। লক্ষ্মীও নেতাজির মধ্যে তিনি দেখেন যুগপুরুষকে।

ইয়েলাপ্পা লক্ষ্মীর কাহিনি সবিস্তারে জানিয়েছেন নেতাজিকে। ইয়েলাপ্পাকে লক্ষ্মী বলেছেন 'নেতাজির মতো ঈশ্বরের দূত এই পৃথিবীতে নেমে আসেন হয়তো একশো বছরে একজন। এবার থেকে তাঁর ডাকে দেশের জন্য কাজ করেই কাটাব আমার জীবন।'

পরদিন একটা ফুলের তোড়া হাতে লক্ষ্মী এলেন মেয়র বিল্ডিং-এ নেতাজির সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন নেতাজি। নিচু হয়ে নেতাজির পদস্পর্শ করার সময় লক্ষ্মীর মনে হয় তাঁর বাবাই যেন আশীর্বাদ করছেন তাঁকে।

১০

'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। ভাইসরয়ের প্রাসাদে ত্রিবর্ণ পতাকা না ওড়ানো পর্যন্ত, লালকেল্লায় আমাদের বিজয় উৎসব না হওয়া পর্যন্ত থামব না আমরা। চল দিল্লি।'

মালয়েশিয়ার দিক-দিগন্তে ঝড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন নেতাজি। আজ কুয়ালালামপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেছে। পূর্ব এশিয়ার মানুষ এর আগেও অনেক রাষ্ট্রপ্রধান আর প্রধানমন্ত্রীদের দেখেছেন। কিন্তু নেতাজির জন্য আয়োজিত শোভাযাত্রা অনেকটাই আলাদা। শোভাযাত্রায় ছিল কয়েকটা জাপানি সামরিক গাড়ি—মেশিনগান লাগানো। নেতাজির সঙ্গে আছেন তাঁর দেহরক্ষীরা, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, দোভাষী—অন্য কয়েকটা গাড়িতে। এ ছাড়া আছেন কয়েজন জাপানি অফিসার আর স্বাধীনতা সংঘের কয়েকজন কর্মকর্তা। এর আগে ইপো, আলোরস্টার প্রভৃতি শহরে ঘুরে কুয়ালালামপুরে এসেছেন তিনি। 'জয় হিন্দ' আর 'চল দিল্লি' ধ্বনিতে মুখর চারদিক। নেতাজিকে স্বাগত জানাবার জন্য লোকের উৎসাহ দেখে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব আবিদ হাসান আর সামরিক সচিব মেজর প্রেম সেহগল আশ্চর্য হয়ে গেছেন।

কিন্তু নেতাজির মন এই মুহূর্তে এই উল্লাসের মধ্যে নেই। তাঁর মনে পাক খাচ্ছে ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতি আর ভারতের পূর্ব সীমান্তের রূপরেখা। ইউরোপের যুদ্ধের গতি ঘুরে গেছে। রাশিয়ার তুষারাবৃত প্রান্তরে হিটলারের বলদর্পী ফৌজের গর্বোন্নত মাথা বরফে কাদায় মিশে গেছে। মিত্রপক্ষের ফৌজ ইতালির রোমের দিকে এগিয়ে চলেছে। মুসোলিনির দিন শেষ হয়ে আসছে। আমেরিকান আর ব্রিটিশ বিমানের ঝাঁক পশ্চিম রণাঙ্গনের আকাশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পূর্ব রণাঙ্গন তাই একটু যেন ঢিলে। এই শিথিলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতার মঙ্গলঘট যত শিগগির হোক স্থাপন করতে চান নেতাজি। এই জন্যই জীবনকে বাজি রেখে লড়াইয়ে নামতে চান তিনি। দিনরাতের ফারাক কবেই মুছে গেছে তাঁর। কাজ আর কাজ—ভাষণ—সফর—সংগঠন—কাজের শেষ নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেদের সরকার তৈরি করে, নিজেদের সম্পদে বলীয়ান হতে হবে। জাপানের কাছে যত কম হাত পাতা যায় ততই ভাল। মালয়ে আট লাখ, বর্মায় ছ' লাখ, থাইল্যান্ডে পঞ্চান্ন হাজার ভারতীয়ের কাছে ঝড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি—টোটাল মোবিলাইজেশন ফর এ টোটাল ওয়ার।

শোভাযাত্রা পৌঁছল কুয়ালালামপুরের আজাদ হিন্দ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সাতশো শিক্ষার্থী সামরিক শিক্ষা লাভ করছেন এই পূর্বতন ব্রিটিশ ক্যাম্পে। এদের মধ্যে আছেন প্রাক্তন ব্যবসায়ী, ছাত্র—এমন সব লোক যাঁরা কোনও দিন কোনও সামরিক কেন্দ্রের ধারে পাশেও যাননি। শুধু নেতাজির ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৈরি হচ্ছেন তাঁরা। 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে তাঁরা স্বাগত জানালেন নেতাজিকে। নেতাজি তাঁর ভাষণে বললেন,

'পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার যুবক-যুবতী আজ নিজেদের তৈরি করছে শুধু আসন্ন যুদ্ধের জন্য নয়, ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতকে রক্ষা করার জন্য। সেইদিনের কথা ভেবে, কোনও বিদেশি শক্তি যেন ভারতের ওপর ভবিষ্যতে লোভের থাবা না বসাতে পারে তার জন্য তৈরি হোন আপনারা।'

রাতে কুয়ালালামপুরের পাডাং ময়দানে নেতাজির সভা। প্রথম দর্শনেই নেতাজি মুগ্ধ করেছেন কুয়ালালামপুরের লোকেদের। সামনে বসা মেয়েদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলতে লাগলেন, 'আমার, মা বোনেরা। আজকে আপনারা দেখিয়ে দিন যে মেয়েরা শুধু পুরুষের ওপর নির্ভর করে থাকা দুর্বল লতা নয়, তারা আকাশ বিদীর্ণ করে ঝলসে ওঠা বিদ্যুল্লতা। আমাদের দেশে চাঁদবিবি, অহল্যাবাই, সুলতানা রাজিয়া দেখিয়ে দিয়েছেন কোনও বিচারেই তাঁরা পুরুষের চেয়ে কম নন। এই শতাব্দীতেও আমাদের বিপ্লবী মেয়েরা দেখিয়ে দিয়েছেন দরকার হলে বোমা, পিস্তলের ব্যবহারে কারও চেয়ে কম যান না তাঁরা।'

ভিড়ের পেছনে সাইকেল হাতে একটি সতেরো বছরের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খেলার মাঠ থেকে ফিরছিল সে। নেতাজির আহ্বান তাকে যেন আটকে রেখে দিয়েছে। হঠাৎ সাইকেল ফেলে রেখে মঞ্চের দিকে মোহাবিষ্টের মতো এগিয়ে চলে সে। পেছনে কে যেন চেঁচিয়ে বললে, 'ও মেয়ে, তোমার সাইকেল যে পড়ে রইল।' কে শোনে কার কথা! তার কানে শুধু গুঞ্জরিত হচ্ছে নেতাজির দৃপ্ত আহ্বান—'করো সব নিছাওর, বনো সব ফকির।'

নেতাজির ভাষণের পর সারি লেগে গেছে আজাদ হিন্দের তহবিলে দান করার জন্য। গয়না, পয়সা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকে। সামনের এক সারিতে জানকী দাঁড়িয়ে। একদৃষ্টে নেতাজি আর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীকে দেখছে সে। সবাই কিছু না কিছু দেবার জন্য এনেছে। তার কাছে তো কিছুই নেই। আর বেশি না ভেবে কান থেকে সোনার দুল দুটো খুলে নেতাজির হাতে তুলে দিল সে। নেতাজি হতচকিত—কানের সোনা মেয়েদের কাছে অনেক কিছু। ফটোগ্রাফারকে ডেকে

জানকীর ফটো তুলতে বললেন তিনি। আশীর্বাদ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেটি, কী নাম তোমার?'

'জানকী দাভার।'

'বাবা কী করেন?'

'ব্যাবসা করেন। একটা বড় ডেয়ারির মালিক উনি।'

'বেটি। ভারতবর্ষকে গোলামির ফাঁস থেকে উদ্ধার করার জন্য আর কী কী করতে পারো তুমি?'

জানকী হতচকিত। লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে দেখল তিনি হাসছেন। সভার শেষে নিজের সাইকেলটা খুঁজে নিয়ে জানকী বাড়ির পথ ধরল। যত বাড়ির কাছে আসছে তত চিন্তা বাড়ছে তার। বাবাকে বোঝানো যাবে তবে মাকে নিয়ে মুশকিল হবে। একটা কানের দুল হারাতে পারে, তা বলে দুটো কানের দুলই একসঙ্গে হারানো?

খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে রান্নার লোকের কাছ থেকে নিয়ে চুপচাপ খেয়ে নিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। চোখের সামনে ভাসছে লক্ষ্মীর হাসিভরা মুখ আর কানে বাজছে সেই স্নেহভরা কথাগুলো, 'বেটি ভারতবর্ষকে গোলামির ফাঁস থেকে উদ্ধার করার জন্য আর কী কী করতে পারো তুমি?' ঘুমের মধ্যেও সেই কথাগুলো যেন ফিরে ফিরে আসছে তার কাছে।

সকালে চোখমুখ ধুয়ে বসবার ঘরে এসে বাবার হাতে 'শোনান টাইমস' দেখে চমকে উঠল জানকী। নেতাজির হাতে দুল তুলে দেওয়ার ছবিটা প্রথম পাতাতেই বেরিয়েছে। বাবা অবশ্য কিছুই বললেন না তাকে। কাগজটা পাশে রেখে দিলে বড় বোন পাপাথি কাগজটা হাতে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, মা দেখো এসে, জানকী কী করেছে!' মা এসে দেখেই জানকীকে মারবার জন্য হাত তুললেন। বাবা সামলালেন তাকে।

স্বাধীনতা সংঘের নেতাদের সঙ্গে ভালই পরিচয় ছিল বাবার। সেই সূত্র ধরে লক্ষ্মীকে চায়ের নেমন্তন্ন করল জানকী। লক্ষ্মীকে দেখে বাড়ির সবাই মুগ্ধ। এত বড় একজন ডাক্তার, দেশের জন্য সব ছেড়ে দিয়েছেন! জানকী মনস্থির করে ফেলেছেন। লক্ষ্মীর সামনেই মহিলা রেজিমেন্টে ভরতি হওয়ার দরখাস্তটা সে বাবার হাতে দিল।

তখন সেটা সই করে দিলেও রাতে বাবার ঘুম নেই। জানকীও জেগে আছে বুঝতে পেরে জানকীকে কাছে ডাকলেন তিনি। বললেন, 'তুই এখনও ছোট। রাজনীতি, আন্দোলন—এ সবের কী বুঝিস তুই? ভারতবর্ষ তো চোখেই দেখিসনি তুই। তা ছাড়া সবাইকে ছেড়ে সিঙ্গাপুরে একলা গিয়ে থাকতে পারবি?'

'ভারতবর্ষ আমি দেখেছি বাবা। নেতাজির কথায় ইম্ফল, কোহিমা, ব্রহ্মপুত্র, দিল্লির লালকেল্লা—সব যেন ছবির মতো ভাসছে আমার চোখের সামনে।'

'পাগলি কোথাকার। মায়ের কথাটা ভেবেছিস?'

'তুমি মাকে একটু বোঝাও না বাবা।' বাবাকে মিনতি করে লক্ষ্মী।

মা শুনে কেঁদে কেটে একসা। মাকে ছাড়া একমুহূর্ত চলে না এখনও মেয়ের। সেই মেয়ে একলা সিঙ্গাপুরে গিয়ে থাকবে? কে তাকে দেখবে। মেয়ে আর বাপ, দুজনে মিলে এই কাণ্ড বাধিয়েছে!

কোথায় থাকবে, কবে ফিরবে, মেয়ের ভবিষ্যৎ কী কিছুই জানা নেই কারও। কত স্বপ্ন ছিল মায়ের। ভাল ঘরে, ভাল পাত্রে বিয়ে দেবেন মেয়ের। জানকী সুখে থাকবে তার নিজস্ব

'রাম'-এর সঙ্গে। সব কল্পনা চুরমার হয়ে যাচ্ছে। পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। জানকীকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মা, 'আমাদের ছেড়ে যাস না মা।'

'মা তুমি আমাকে আটকাচ্ছ, কিন্তু একবার ভাবো তো নেতাজির কথা, লক্ষ্মীদিদির কথা। দেশের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন নেতাজি। তারপরে দেশও ছেড়েছেন। অত ভাল প্র্যাকটিস ছেড়ে লক্ষ্মীদিদি পথে পথে ঘুরছেন। তুমি বাধা দিয়ো না মা। নেতাজির ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারছি না আমি।'

এবার বাবাকে নিয়ে পড়লেন মা। 'কী করছ তুমি? ওকে বোঝাও, আটকাও ওকে।'

'কী করে আটকাবো ওকে। আমার নিজেরই অস্থির লাগছে। এত বড় একটা চেষ্টা চলছে। এখন যদি আমরা শুধু নিজেদের কথাই ভাবি তা হলে কী করে হবে? আমি তো ঠিক করেছি এখন থেকে আমিও স্বাধীনতা সংঘের কাজ করব।'

জানকী অনড়। সে যাবেই। এত বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে যাচ্ছে শুনে শহরের আরও কয়েকটি মেয়ে তৈরি হল যাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত জানকীর দিদি পাপাথিও যাবার জন্য জেদ ধরল। ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হল সে।

বাবা গিয়ে দেখা করলেন নেতাজির সঙ্গে। 'নেতাজি, আমার দুই মেয়েকে তুলে দিচ্ছি দেশের জন্য। মেয়েরা তো পরের বাড়িতে যাবার জন্যই জন্মায়। তাই বোধহয় তাদের ওপর এত মায়া পড়ে যায়। এ বেদনা যে কী, সেটা কী করে বোঝাব আপনাকে?' চোখ মুছতে মুছতে বলেন বাবা।

জানকীর বাবার কথাগুলো হাতুড়ির মতো পড়ল নেতাজির বুকে। চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। কাউকে বলতে পারার উপায় নেই। কেমন আছে ছোট্ট 'অনিতা'। শেষ যখন তাকে দেখেছিলেন তখন পনেরো দিনের একটা তুলতুলে শরীর। মুখে বুলি ফোটেনি, হাসতেও শেখেনি সেই শিশু। তবু তার কথা আজ সবকিছু ছাপিয়ে মনে পড়ছে। 'আমাকে ক্ষমা করিস মা।' মনে মনে বারবার সেই কচি মুখটার কাছে ক্ষমা চান নেতাজি। অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে।

তাঁর এই অবস্থায় সবাই আশ্চর্য। নেতাজিকে এত বিমর্ষ এর আগে কেউ দেখেনি। প্রেম সেহগল, লক্ষ্মী, আবিদ হাসান কেউ কোনও খেই পাচ্ছেন না। সবাই নিজের নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করছেন।

১৪
চন্দ্রা বোস চিরজীবী হোন

১

'বল, নিজের দেশের সঙ্গে কেন তুই বেইমানি করলি?'

'না স্যার, এ কাজ আমি করিনি।'

'আমাদের গোপন কোড তুই দুশমনের হাতে তুলে দিয়েছিস।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে মেজর স্বামীর চাবুক সপাং সপাং করে ওই দেশদ্রোহীর শরীরে কেটে কেটে বসছে। তার আর্তনাদে ঘরের দেওয়ালগুলোও যেন শিউরে উঠছে। কিন্তু মেজর স্বামীর ভ্রূক্ষেপ নেই—চাবুকের ঘা একনাগাড়ে চলছে। একসময় অজ্ঞান হয়ে যায় লোকটি। মেঝের ওপর পড়ে ছটফট করছে, বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে তার সাড়ে ছ' ফুট লম্বা দেহটা।

নেতাজি দেখছিলেন সমস্ত। সঙ্গের জাপানি অফিসার কোয়ামাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই লোকটি?'

'একটা বেইমান। মোহন সিংয়ের সময় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল। এখন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে আসলে ও একটা বেইমান।'

মেজর স্বামীর আদেশে দুজন সিপাহি লোকটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

মালয়েশিয়ার পেনাং বন্দর শহরে এসেছেন নেতাজি আর কর্নেল ভোঁসলে। এই বাড়িটা আগে ছিল জাপানি সামরিক কার্যালয়। ফিল্ড মার্শাল তেরাউচিকে রাজি করিয়ে জায়গাটাকে বলতে গেলে পুনর্জীবন দিয়েছেন নেতাজি। জার্মানি থেকে এসে পৌঁছনোর পর মেজর স্বামীকে এখানে কাজে লাগিয়েছেন নেতাজি।

এই কেন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কোয়ামা আর শিক্ষক ইয়োমোনামিও আবার ফিরে এসেছেন এখানে। গোপন এজেন্টদের ট্রেনিং দিতে এদের পারদর্শিতা অসাধারণ। মেজর স্বামীও জার্মানিতে এ ব্যাপারে ট্রেনিং পেয়েছেন। এঁদের ওপরেই এই কেন্দ্রটির দায়িত্ব দিয়েছেন নেতাজি।

পেনাং-এর তাং জাং ব্যাং অঞ্চলে এই গোপন কেন্দ্রটির একদিকে নীল সমুদ্র অন্যদিকে মালয়ের জঙ্গল। মালয়ের রবার বাগানের কর্মকেন্দ্র পেনাং অবশ্য এমনিতেই অপরূপ সুন্দর।

নীল সমুদ্রের দিকে নির্দেশ করে মেজর স্বামী বললেন, 'আমাদের গুপ্ত বিপ্লবীদের ডুবোজাহাজে সহজেই কলকাতা, মাদ্রাজ পাঠানো যাবে পেনাং থেকে।'

কোয়ামাকে নেতাজি বললেন, 'প্রত্যেক মাসে অন্তত একশোজন গুপ্ত এজেন্টকে ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যখন জাপানি ফৌজের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের জওয়ানেরা ইম্ফল আর চট্টগ্রামের পথে ভারতে ঢুকবে, সেই সময় আমাদের

এইসব দুঃসাহসী এজেন্টরা সারা ভারতে ব্রিটিশের সাজসরঞ্জাম ভেতর থেকে তছনছ করে দেবে।'

স্যান্ডিক্রাফট স্কুল আর স্বরাজ্য ইনস্টিটিউটের কাজকর্ম সরেজমিনে দেখতে এসেছেন নেতাজি। প্রথম দিনেই সব কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি।

রাতে নেতাজির জন্য বিশেষ খাওয়ার আয়োজন হয়েছে। পুরোপুরি ভারতীয় খাবার। সবাই খাওয়া শুরু করতে যাবেন এমন সময় নেতাজি দেখলেন, পাশের একটা অন্ধকার মতো কামরা থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে একটা দারুণ লম্বা লোক। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা লোকটা এসে নির্বিকারভাবে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে খাওয়ার টেবিলে বসে পড়ল। নেতাজি দেখলেন লোকটা সেই 'বেইমান দেশদ্রোহী।' হতভম্ব নেতাজি কোয়ামোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী হচ্ছে।'

হো হো করে হেসে উঠে কোয়ামা বললেন, 'দুপুরের ওই ব্যাপারের কথা বলছেন? ওটা ট্রেনিং-এর অঙ্গ।'

এবার কথা বলল সেই লম্বা লোকটি। 'নেতাজি আপনি যখন আমাদের ভারতে পাঠাবেন তখন দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়ি তবে তো এই ধরনের ব্যাপারই ঘটবে। তখন কি আমি সব বলে দেব? শরীরটাকে সইয়ে নিতে হবে তো? জানেন তো শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।'

লোকটির কথায় হেসে উঠলেন সবাই। মুগ্ধ বিস্ময়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে সে হাসিতে নেতাজিও যোগ দিলেন তবে চোখের কোলে জল চিকচিক করে উঠল তাঁর।

লোকটির চেহারা আফগানদের মতো—লম্বা নাক, নীল চোখ, কালো চুল, রোদে পোড়া বাদামি রং।

নেতাজি তাঁর নামটা জানতে চাইলেন।

'বান্দার নাম ক্যাপ্টেন মহম্মদ দুরানি, নেতাজি। নেতাজি, এইটুকু আমি কথা দিতে পারি যে, যে দায়িত্বই আপনি আমাকে দিন না কেন, সেটা ভালভাবে করার জন্য প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব আমি। একবার দেশের মাটিতে আমি পৌঁছলে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সৈনিকদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলব।'

কোয়ামা এবার বললেন, 'আমারও বিশ্বাস ক্যাপ্টেন দুরানি যেখানেই যাবেন, কাজ হাসিল করেই আসবেন।' তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'ওর লম্বা চেহারার জন্য ওকে কেউ কেউ উট বলে ডাকে—আবার কেউ বলে লম্বু।'

দুরানি মাঝখানেই বলে উঠলেন, 'কেউ কেউ আমাকে ঘোড়াও বলে।'

'এর মধ্যে কোন নামটা আপনার পছন্দ?'

'ঘোড়া! সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রাণী।'

'আপনার মতো বিশ্বস্ত সৈনিক মাতৃভূমির গর্ব ক্যাপ্টেন।' কর্নেল ভোঁসলে বললেন।

ব্যারিস্টার জিন্নার কাজকর্মের ওপর বেজায় খাপ্পা ক্যাপ্টেন দুরানি। 'হিন্দু মুসলমান যদি আলাদা হয়ে যায় তবে পৃথিবীর সামনে ভারতবাসী বলে মুখ দেখাতে পারব না আমরা।' বললেন তিনি।

পরের দিন ভোরে ঠান্ডা জলে স্নান করে গীতাপাঠ করছিলেন নেতাজি। কানে এল লেফট রাইট। ভোর থেকে ট্রেনিং শুরু হয়। প্রথমে শারীরিক কসরত এর পরে তিন ঘণ্টা ধরে বেতারযন্ত্র সম্পর্কে শেখানো হয়। তারপর দুপুরে, হালকা কিছু খেয়ে একটা বড় হলে জমা হয়

সবাই। প্রোজেক্টরে দেখান হয় শত্রুপক্ষের জাহাজ, রণতরী, ডুবোজাহাজ আর যুদ্ধ-বিমানের ছবি। সেগুলোর বিভিন্ন অংশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে জাপানি শিক্ষক তাদের শক্তি এবং দুর্বলতার কথা বুঝিয়ে দেন। কোন দুর্বলতম জায়গায় ঘা মারলে বিমান বা যুদ্ধজাহাজ সহজেই ধ্বংস করা যাবে সে বিষয়ে শেখানো হয়। এ ছাড়া শেখানো হয় সাংকেতিক ভাষা। সাংকেতিক কোড কী করে তৈরি করতে হবে, শত্রুর কোডের মর্ম কী করে উদ্ধার করতে হবে তার হদিশ বাতলানো হয়। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয় মানচিত্র ব্যবহার সম্পর্কে।

পরিদর্শনের শেষে নেতাজি ফিরে যাবেন সিঙ্গাপুরে। তার আগে একটা হলে জমা হয়েছে চারশো শিক্ষার্থী। হলের দেওয়ালে ভারতবর্ষের এক বিশাল মানচিত্র। ম্যাপ নির্দেশিকাটা হাতে নিয়ে নেতাজি বললেন, 'আপনারা জানেন, করাচি, বোম্বাই, মাদ্রাজ আর কলকাতা ভারতের চারটি বন্দর। ডুবোজাহাজে এসব জায়গায় পৌঁছে আর চট্টগ্রামের জঙ্গল আর পার্বত্য রাস্তা দিয়ে ভারতে ঢুকতে হবে আপনাদের। ফরোয়ার্ড ব্লক আর বাংলাদেশের "অনুশীলন", "যুগান্তর" আর "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স"-এর সদস্যরা আপনাদের সহায়তা করবেন। জাপান আর আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা যখন মণিপুর দিয়ে ঢুকে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে ভারতভূমিতে এগিয়ে যাবে তখন ভেতর থেকে ব্রিটিশের বিমানবন্দর, সৈন্য ছাউনি আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দখল করে ব্রিটিশ প্রশাসন ব্যবস্থাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দিতে হবে আপনাদের। বাইরে থেকে আমাদের ফৌজ আর ভেতর থেকে আপনারা ব্রিটিশকে যে চূড়ান্ত আঘাত হানবেন তার ফলে ভারতের দাসত্বের শৃঙ্খল খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে। আপনাদের ওপর অগাধ আস্থা আছে আমার। আমি আজ আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি, অন্যান্য কাজে যতই ব্যস্ত থাকি আমি, পেনাং-এর এই ইনস্টিটিউটের ওপর সবসময় দৃষ্টি থাকবে আমার।'

ইনস্টিটিউটের শৃঙ্খলা আর শিক্ষা পদ্ধতির সপ্রশংস উল্লেখ করে নেতাজি বললেন, 'আমার বাহাদুর ভাইয়েরা একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন। প্যালেস্তাইন আর অন্য উপনিবেশ ছাড়ার আগে ব্রিটিশ টুকরো করে দিয়েছে তাদের। তারা চায় না যে ব্রিটেনের কোনও উপনিবেশ তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠুক। ভারতকেও কোনও না-কোনও সময় স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হবে ব্রিটিশ। কিন্তু তার আগে আমাদের বিশাল দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়ারই চেষ্টা করবে তারা। তাদের এই দুরভিসন্ধি সফল হবার আগেই তাদের দূর করে দিতে হবে আমাদের। তাই স্বাধীনতা পেতে হবে আমাদের নিজেদের শক্তিতে—ব্রিটিশের হাত থেকে ভিক্ষে হিসেবে নয়। তাই সর্বস্বপণ করে, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে এই লড়াই চালাতে হবে আমাদের।'

পূর্ব সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ পৌঁছনোর আগেই ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বার জন্য যেতে হবে তাদের।

সিঙ্গাপুরের দিকে চলে গেলেন নেতাজি। পেছনে রেখে গেলেন তাঁর জ্বলন্ত প্রেরণা। নতুন উৎসাহে টগবগ করতে লাগলেন মেজর স্বামী, অমরিক সিং গিল, ক্যাপ্টেন গিল আর তাঁদের শিক্ষার্থীরা। আগুনের পরশমণির ছোঁয়া তাঁদের প্রাণে।

২

টেবিলের ওপর বিশাল সামরিক মানচিত্র ছড়ানো রয়েছে। নেতাজির সঙ্গে শাহনওয়াজ, প্রেম সেহগল আর ইয়েলাপ্পা খুঁটিয়ে দেখছেন সেটা। সিঙ্গাপুর থেকে ইম্ফলের দূরত্ব স্কেল ফেলে মাপছেন নেতাজি। এইটুকু জায়গায় ভিড় করেছে অসংখ্য নদী, প্রণালী, উত্তুঙ্গ পাহাড় আর বিস্তীর্ণ সাগর। কিন্তু বাস্তবের প্রকৃত দুর্গমতা মানচিত্রে অনুভব করা অসম্ভব। সে বাস্তবের অনুভূতি আসতে পারে একমাত্র প্রত্যক্ষ পরিচয়ে। সিঙ্গাপুরের পরে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, আর ব্রহ্মদেশ পেরিয়ে তবে ভারতের পূর্ব সীমান্ত। মালয়েশিয়ার পরে হয় দুস্তর সাগর পেরিয়ে আর নয়তো থাইল্যান্ডের ঘোর অরণ্য সংকুল পথ দিয়ে ব্রহ্মদেশে যেতে হবে। ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতে যেতে হবে চিন্দুইন, সালুয়িন আর ইরাবতীর মতো পাহাড়ি নদী পেরিয়ে। মাঝখানে কাবোয়ার দুর্গম উপত্যকা। তারপরে দেখা যাবে মণিপুরের পাহাড়ি ভূমি। ঘন জঙ্গলে ঢাকা সেই অঞ্চল।

'প্রেম, সিঙ্গাপুর থেকে ইম্ফল কত দূর।' নেতাজি জানতে চাইলেন।

'দু' হাজার আটশো চব্বিশ মাইল।'

'এই পথে ফৌজ কী করে নিয়ে যাওয়া হবে?' নেতাজি নিজেকেই যেন প্রশ্ন করেন এবার।

আবার মানচিত্রের দিকে মন দেন নেতাজি। 'এখানে সিঙ্গাপুরে বসে থাকলে চলবে না। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড আর ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে।'

অবিলম্বে ব্রহ্মদেশে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন নেতাজি। বর্মা মুলুকের জাপানি সামরিক দপ্তরের মুখ্য কার্যালয় রেঙ্গুনে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাওয়াবে সেখানকার দায়িত্বে রয়েছেন। অত্যন্ত কড়া স্বভাবের লোক হিসাবে সবাই তাঁকে জানে। তাঁর সঙ্গে দেখা করা ছাড়াও আরও অনেক কাজ নিয়ে জাপানি সামরিক বিমানে রেঙ্গুন যাত্রা করলেন নেতাজি।

বিমান থেকে সবুজের মধ্যে দেখা যায় অসংখ্য প্যাগোডা। প্যাগোডাগুলো দেখে ধ্যানস্থ যোগীদের কথা মনে আসে। একসময় রেঙ্গুনের মিঙ্গলডান বিমানবন্দরে বিমান পৌঁছল। প্রায় পনেরো-কুড়ি হাজার বর্মাবাসী ভারতীয় নেতাজিকে স্বাগত জানাতে হাজির হয়েছেন। বিমান থেকে নেতাজি বাইরে আসতেই হাজার হাজার ত্রিবর্ণপতাকা আন্দোলিত হল। 'সুভাষবাবু জিন্দাবাদ', 'নেতাজি জিন্দাবাদ', 'মহাত্মা গাঁধী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে চারদিক মুখর। ব্রহ্মদেশ সরকারের সামরিক ব্যান্ডে বেজে উঠল স্বাগত সংগীত। ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন সদা হাস্যমুখ মাঝারি গড়নের ড. বা ম—ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মদেশের মন্ত্রীদের প্রায় সবাই এসেছেন এই বহুচর্চিত ভারতীয় নেতাকে দেখতে। ড. বা ম পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের। বছর পঁচিশের এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুবকের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে ড. বা ম বললেন, 'ইনি আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল আউঙ্গ সান।' ভাল করে তাঁকে দেখলেন নেতাজি।

ব্রহ্মদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য জাপান কয়েকজন তরুণকে বিশেষ সামরিক শিক্ষা দিয়েছিল। জেনারেল আউঙ্গ সান তাদেরই একজন। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার সংগ্রামে ড. বা ম অংশ নিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। মান্দালয় জেল থেকে কৌশলে পালিয়ে জাপানে চলে যান তিনি। জাপানের সাহায্যে ব্রিটিশ শাসন থেকে ব্রহ্মদেশের মুক্তির পর ড. বা ম নিজেদের সরকার করেছেন। পেশাগতভাবে তিনি আইনজ্ঞ। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর আন্তরিক আগ্রহ। নেতাজি রেঙ্গুনে পৌঁছবার আগেই নেতাজি সম্বন্ধে প্রায় সবকিছুই জানেন ড. বা ম। নেতাজিকে সবরকমের সাহায্য করতে চান তিনি।

সরকারি স্বাগত অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর বর্মার ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সদস্যরা ঘিরে ধরলেন তাঁকে। তাঁদের মধ্যে আছেন ভাই দীনা নাথ, ভাই পরমানন্দ, দেবনাথ দাস, ড. মেহতা প্রমুখ রেঙ্গুনের বিশিষ্ট ভারতীয়রা। সবাইকে নমস্কার জানালেন নেতাজি।

ড. মেহতার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে নেতাজির। রেঙ্গুনের অসাধারণ অভ্যর্থনাতে খুশিতে ভরে গেছে তাঁর মন। ভাই পরমানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'এখানে মোটামুটি কতজন ভারতীয় আছেন?'

'অন্তত পাঁচ-ছয় লাখ। কিন্তু নেতাজি শুধু রেঙ্গুন নয়, আমার সঙ্গে জিয়াওয়াডিতে চলুন আপনি।'

'জিয়াওয়াডিতে কেন?'

'সেখানে বিহারের প্রসাদ পরিবারের বিরাট চিনির মিল রয়েছে। এই প্রসাদেরা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কয়েক হাজার ভারতীয় শ্রমিক কাজ করে ওই মিলে। জিয়াওয়াডি আর আশপাশের এলাকায় ভারতীয় শ্রমিকদের চৌষট্টিটা বসতি আছে। আর্য সমাজের কর্মকর্তারা তাদের মধ্যে কাজ করছেন। আপনি গেলে সেখানে হইচই পড়ে যাবে।

৩০ জুলাই, ১৯৪৩। রেঙ্গুনের টাউন হলের সামনের ময়দানে জনসমুদ্র। দেড় লাখেরও বেশি ভারতীয় আবালবৃদ্ধবনিতা হাজির হয়েছেন সেখানে। গত কয়েক দশক ধরে কাজকর্মের সূত্রে বহু ভারতীয় রেঙ্গুনবাসী হয়েছেন। চিন্তাধারা আর রীতিনীতিতে আজও তাঁরা খাঁটি ভারতীয়। ভারতের পরাধীনতা তাঁদেরও দুঃখ দেয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাই তাঁদের সমস্ত সহানুভূতি।

পূর্ব এশিয়ার আন্তরিক অভ্যর্থনায় নেতাজিও অভিভূত। সভার বিপুল উপস্থিতিতে উদ্দীপিত তিনি। সকলকে সম্বোধন করে তিনি বলতে থাকেন, 'আমার ভাই-বোনেরা, আমি কোনও ধর্মগুরু নই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৈরি সেনাদলের সামান্য এক সৈনিক মাত্র। মাত্র দেড় দু' লাখ ইংরেজ আজ আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করছে, শোষণ করছে। এটা যে কী করে সম্ভব হল, ছোটবেলা থেকেই ভেবে ভেবে তাঁর উত্তর পাই না আমি। আমাদের দেশের সব লোক যদি ইট পাথর নিয়েও এক হয়, ব্রিটিশ পালাতে পথ পাবে না। আজকে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, শত্রুর বিনাশ না-হওয়া পর্যন্ত সে যুদ্ধের শেষ হবে না। এই যুদ্ধে আমি আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা চাই। বন্ধুগণ, আপনারা সবাই উঠে দাঁড়ান, আগুনের মতন জ্বলে উঠুন। কোমর বেঁধে তৈরি হন। অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে এ কাজ সফল করতে এগিয়ে আসুন আপনারা।'

'চল দিল্লি, চল দিল্লি' রবে মুখরিত হয়ে উঠল সারা সভাস্থল। নেতাজির জন্য অনেকে ফুল এনেছে, এনেছে ফুলের মালা। মঞ্চের ওপর মালার পাহাড় জমে উঠেছে।

'আমার ভাই-বোনেরা, একটা কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধ করার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু আজকের যুদ্ধ তো শুধু হাতে হয় না। তার জন্য লাগে নানারকম সাজসরঞ্জাম। এইসব সাজসরঞ্জামের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন আপনারা। আজকে যে সমস্ত ফুলের মালা দিয়েছেন আমি মনে করি আমাকে উপলক্ষ করে আপনারা দেশমাতৃকাকেই সেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন। সেইসব ফুলের মালা দেশের কাজেই লাগাতে চাই আমি। তাই এখন আমি প্রতীক হিসাবে একটি ফুলের মালা নিলাম করব। নিলামে যে টাকা উঠবে সে টাকা যাবে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামে।'

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের জন থিবি নিলাম ডাকার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। 'বলুন,

আপনারা বলুন। আপনাদের মধ্যে কে এই পবিত্র মালাটি নিতে সত্যিকারের আগ্রহী। আসুন এগিয়ে আসুন।'

বিশাল সভায় সবাই চুপ। হঠাৎ সভার মাঝখান থেকে নুর সিং নামে পঞ্জাবি উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এক লাখ টাকা।' সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় ধরনের পাগড়ি বাঁধা একটি লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পাঁচ লাখ।' তার উত্তরে এক সিন্ধি ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'এগারো লাখ।'

এবার নিলাম জমে উঠেছে। নুর সিংয়ের পঞ্জাবি রক্ত গরম হয়ে উঠেছে এই রেষারেষিতে। উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তিনি বললেন, 'একুশ লাখ।'

নেতাজি এবার জন থিবিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই লোকটি?'

'নুর সিং। রেঙ্গুনের বিরাট ব্যবসায়ী। আমদানি-রপ্তানির বিরাট ব্যাবসা আছে। তা ছাড়া অনেক কাঠের গোলার মালিক ইনি।'

নুর সিং-এর 'একুশ লাখ' ডাকের পরে কেউ আর কিছু বলছে না। হঠাৎ নেতাজি এবার নিজেই দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'স্বাধীনতার মন্দির তৈরি করতে হবে আমাদের। বন্ধুগণ এর জন্য যে অনেক টাকার দরকার আমাদের। আমি আশা করব আরও এগোবেন আপনারা।' স্বয়ং নেতাজি এগিয়ে আসাতে সেই দক্ষিণী ভদ্রলোক আবার উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'একত্রিশ লাখ।' আবার ডাক চড়ছে। দেখতে দেখতে পঞ্চাশ লাখে পৌঁছেছে ডাক। হঠাৎ দেখা গেল নুর সিং এগিয়ে চলেছেন মঞ্চের দিকে। সবাই অবাক হয়ে দেখছেন তাঁকে। দেখে মনে হচ্ছে কী এক আবেশের মধ্যে রয়েছেন তিনি। মঞ্চে উঠে প্রথমে নেতাজিকে প্রণিপাত করে মাইকের সামনে এগিয়ে এলেন তিনি। সবাইকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, 'হয়তো আপনাদের অনেকের কাছে আমার চাইতে অনেক বেশি টাকা আছে। কিন্তু নেতাজির গলার এই মালা আমি কিছুতেই ছাড়ব না। তাই আমি আমার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ আজ নেতাজির হাতে দেশের কাজে তুলে দিচ্ছি।'

সবার সামনে কোটের পকেট থেকে চেকবই বার করে খস খস করে চেক লিখলেন নুর সিং তারপর সেটা তুলে দিলেন নেতাজির হাতে। চেকের অঙ্কটা দেখে স্তম্ভিত নেতাজি। নুর সিংকে একটা ফুলের মালা পরিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধলেন তাঁকে। শ্রোতারা চিৎকার করছেন 'কত টাকা বলুন নেতাজি।' হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বলে চেকটাকে ঝান্ডার মতো দুলিয়ে নেতাজি প্রতিপ্রশ্ন করলেন, 'আপনারাই আন্দাজ করুন।'

এবার কৌতুকের সুরে সামনে বসা দু-তিনজন তরুণ বললেন, 'এক কোটি।' তাদের কথার ভঙ্গিতে আশেপাশের কিছু লোকও হেসে উঠলেন। তাদের হাসি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে পালটে যেতে বেশি সময় লাগল না। দৃপ্ত কণ্ঠে নেতাজি বললেন, 'বন্ধুগণ, শুধু এক কোটি নয়, এক কোটি চোদ্দো লক্ষ টাকা!' অঙ্ক শুনে সমস্ত সভা যেন পাগল হয়ে গেছে। 'ভারতমাতা কী জয়', 'নেতাজি জিন্দাবাদ', 'নুর সিং জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল চারদিক। নুর সিং মালা হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'বাবুজি, এ মালা হাতে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে এই মহাযুদ্ধটাই জিতে নিয়েছি আমি।'

পরের দিন টামু জেলা সফরে বেরোলেন নেতাজি। রেঙ্গুন থেকে মাইল পনেরো দূরের ছোট শহর পেগুতে শায়িত বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে পেগুর পুরনো সেতু পেরিয়ে উত্তরদিকে যাওয়ার রাস্তা ধরলেন। মান্দালয়, মিচিনা আর অসম যাওয়ার পুরনো রাস্তা এটা। পেগুর কাছেই আর একটা মোড়ে একটা রাস্তা থাইল্যান্ডের দিকে বাঁক নিয়েছে। মান্দালয় যাওয়ার রাস্তার সমান্তরালে চলে গেছে রেললাইন।

প্রায় তিন ঘণ্টায় জিয়াওয়াডি পৌঁছলেন নেতাজি। প্রধান রাস্তার পাশেই জিয়াওয়াডির বিশাল চিনির কারখানা। কর্নেল জাহাঙ্গীর, দেবনাথ দাস, ভাই পরমানন্দর সঙ্গে নেতাজি পৌঁছলেন রাজুগর গ্রামে। 'সুভাষবাবু আসছেন'—খবর পেয়ে সমস্ত ভারতীয় শ্রমিক প্রচণ্ড উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতীক্ষায় রয়েছেন তাঁকে দেখার জন্য। চিনির কারখানা বা অন্যান্য সব কাজ বন্ধ করে নেতাজিকে দেখতে এসেছেন তাঁরা।

'বন্ধুগণ, আপনাদের গ্রামের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া এই রাস্তা ধরেই একদিন আমাদের ফৌজ দিল্লির পথে যাবে। শিগগিরই অভিযান শুরু হবে তাদের। আপনারাও দলে দলে এগিয়ে আসুন। মাতৃভূমির জন্য এই চূড়ান্ত সংগ্রামে আপনারাও সর্ব শক্তি দিয়ে শামিল হন।'

রেঙ্গুনে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে নেতাজিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ড. বা ম। অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসেছেন দুজনে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন ড. বা ম।

রাত্রে ভোজের আসরে নেতাজিকে একান্তে পেয়ে ড. বা ম প্রশ্ন করলেন, 'নেতাজি বোস, আপনি কি মনে করেন ব্রহ্মদেশ আর ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপানিরা শেষ পর্যন্ত সাহায্য করবে?'

'এখনও পর্যন্ত জাপানিদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস আছে আমার। তবে আমাদের এই জীবনমরণ সমস্যা নিয়ে কেউ যদি আমাদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে একটুও দ্বিধা করব না।' ড. বা ম-র কথার ইঙ্গিত বুঝে স্পষ্ট করে দিলেন নেতাজি।

পরের দিন জেনারেল চ্যাটার্জি নেতাজিকে জানালেন যে, জাপানি জেনারেল কাওয়াবে ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

'খবরটা কে দিল?'

'তাঁর এ ডি সি ফোন করেছিলেন।'

'যদি জেনারেল কাওয়াবে মাসাকাজু স্বয়ং ফোন করেন তখন ভাবব।'

জেনারেলের কাছ থেকে ফোন এল রাত ন'টার সময়। তারপরে নেতাজি রওনা হলেন। জেনারেল তাঁর কঠিন স্বভাবের জন্য বিখ্যাত। সাতান্ন বছর বয়স জেনারেলের। সামুরাই বংশের ছেলে হিসেবে দারুণ গর্ব তাঁর। নেতাজিকে জাপানি কায়দায় ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন করলেন তিনি। সামরিক পোশাক, গোলাকার উঁচু টুপিতে তাঁকে একটু লম্বা চওড়া দেখালেও আসলে লোকটি বেঁটে আর ক্ষীণকায়। মানে জাপানিদের মাপকাঠিতেও বেশ বেঁটেই—বলা যায়। নিজের শারীরিক খামতি জামাকাপড়ে আড়াল করে রাখেন তিনি। শরীরের মধ্যে দর্শনীয় তাঁর চোমড়ানো গোঁফ।

শিগগির-ই ভারতের দিকে অভিযান শুরু হবে এ খবর জেনারেল কাওয়াবের কাছে আগেই পৌঁছেছে। 'আপনার স্বপ্নের অভিযান শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে।' নেতাজিকে বললেন তিনি।

নেতাজি বললেন, 'আপনাদের বাহিনীর সঙ্গে পাঁচ ডিভিশন আজাদি সেনা যাবার অনুমতির জন্য জাপানের কর্তৃপক্ষের কাছে লিখেছি আমি।'

'কাওয়াবে অবাক। বলে উঠলেন, 'আপনি ডিভিশন-এর কথা বলছেন। আমি তো জানি আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে আপনাদের কয়েকটা ব্যাটেলিয়ন শুধু যাবে।'

'অর্থাৎ মাত্র একশো দেড়শো লোক?' নেতাজির গলার আওয়াজ চড়ল। 'এমন প্রস্তাব কখনওই মেনে নেব না আমি। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক প্রবল ব্রিটিশ বাহিনীর মোকাবিলা করবে কী করে? আমি চাই আমাদের আজাদি ফৌজ জাপানি সৈন্যদের সঙ্গে একসঙ্গে যুদ্ধ

করুক। আমার সৈনিকদের আমি সেই কথাই দিয়েছি। আর সে কথা আমি রাখবই।'

'টোকিয়ো যদি এ প্রস্তাবে সম্মতি দেয়, আমরা আপত্তি করব না।'

'টোকিয়োর অনুমতির ব্যবস্থা আমি করব।'

বাড়ি ফেরার সময় জেনারেল চ্যাটার্জি বললেন, 'মাঝে মাঝে আপনি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করেন। জেনারেলকে নিজে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে হবে এ ধরনের জেদ ধরার কী দরকার ছিল?'

মূলত ব্রিটিশ আর্মির মেডিক্যাল উইং-এর লোক জেনারেল চ্যাটার্জি। নেতাজি বয়োজ্যেষ্ঠ এই অভিজ্ঞ মানুষটিকে যথেষ্ট সম্মান করেন। একটু হেসে তিনি বললেন,

'চ্যাটার্জিকাকা, ব্যক্তি সুভাষ বোসকে যদি ব্যক্তি জেনারেল কাওয়াবে আমন্ত্রণ জানাতেন তবে আমি একবার কেন বারবার তাঁর বাড়িতে যেতাম। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়ককে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে আমন্ত্রণ না জানালে, সেটা আজাদ হিন্দ ফৌজের অবমাননা। প্রাণ থাকতে সে অবমাননা আমি মেনে নেব না।'

৩

আগস্ট, ১৯৪৩। আটলান্টিকের নীল জল কেটে কেটে বিরাটকায় কুইন মেরি জাহাজটা এগিয়ে চলেছে কুইবেকের দিকে। জাহাজে রয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, ডিকি মাউন্টব্যাটেন আর ব্রিগেডিয়ার উইনগেট।

একটা বিশেষ পালঙ্কে তাকিয়া হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে রয়েছেন ঊনসত্তর বছর বয়সি চার্চিল। বিশাল চেহারা। গলার নীচে মাংসের ভাঁজ, দেখলে মনে হয় দ্বিতীয় চিবুক। ক্রমাগত চুরুট ফুঁকে যাচ্ছেন চার্চিল। বাইরে নীল সমুদ্রের জল আস্তে আস্তে কালো হয়ে আসছে। কেবিনে মৃদু আলো। সন্ধ্যার সময়টা চার্চিলের মদ্যপানের সময়। এই সময়টা মদ্যপান না করলে চলে না তাঁর। কামরার বাইরে দু-দুজন খাস সচিব। একজনের কাজ ওয়ারলেসে আসা খবরগুলো চার্চিলের কাছে পেশ করা, অপরজন চার্চিলের নির্দেশ ইত্যাদি নোট করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন।

চার্চিল বলছিলেন, 'বর্মা ফ্রন্টের সৈন্যদের সারা পৃথিবী ঠাট্টা করে বলে—দ্য ফরগটন আর্মি। সেটা মেনে নিতে হয়েছে আমাকে। তাই বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কেউ "দ্য ফরগটন এম্পায়ার" বললে সহ্য হবে না আমার।' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের কথায় চার্চিলের সংবেদনশীলতা সারা পৃথিবী জানে। ডিকি মাউন্টব্যাটেন কোনও উত্তর দিতে পারেন না।

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে চার্চিল বললেন, 'ডিকি পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে শেষ খবর কী?'

'আমার সবচেয়ে বেশি চিন্তা এখন ওখানকার ফিফথ কলামনিস্ট—পঞ্চম বাহিনীর লোকদের নিয়ে।' ডিকি বললেন।

'অর্থাৎ তুমি সুভাষ বোস আর তার সঙ্গী বেইমানগুলোর কথা বলতে চাইছ তো। সত্যি কথা বলতে কি, ওর নাম শুনলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।'

ডিকি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। হাতের ফাইলটা চার্চিলের দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফাইল খুলে গোপন সব রিপোর্টে চোখ বোলাতে লাগলেন চার্চিল। একটা ছবি বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তাঁর। সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং-এর সামনে প্রায় পঁচিশ হাজার সৈনিকের স্যালুট নিচ্ছেন আপাদমস্তক সামরিক পোশাকে সজ্জিত সুভাষচন্দ্র। দেখে লাল হয়ে ওঠে চার্চিলের মুখ। নাক কুঁচকে উঠল তাঁর। 'জাপানিদের পায়ে দাসখত লিখে

দিয়ে লোকটা ভারতের ডিক্টেটর হতে চায়,' ডিকি বললেন।

'ডিকি, আমি সব সহ্য করতে পারি। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোনও ক্ষতি যদি কেউ করে, তবে তার হাত কেটে ফেলতে আমি অগ্রপশ্চাৎ কিছুই ভাবব না। লোকে আমাকে দাম্ভিক, বদমেজাজি, অহংকারী, স্বার্থপর—যা খুশি বলুক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমি সব করতে পারি।'

ম্যাপ আর দরকারি কাগজপত্রের বান্ডিল নিয়ে ডিকি আর উইনগেট তৈরিই আছেন। মিত্রশক্তির শীর্ষ বৈঠক হবে কুইবেকে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আর রাশিয়ার স্তালিন-এর সঙ্গে গোপন বৈঠকের জন্য চলেছেন চার্চিল।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে চার্চিলের অদ্ভুত জেদে মাউন্টব্যাটেন আর উইনগেটেরও আশ্চর্য লাগে। রাজনীতিতে চার্চিলের অভিজ্ঞতা তো অসামান্য বটেই, সারা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাতেও অনন্যসাধারণ তাঁর জীবন। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরেই তিনি ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে, হাউস অফ কমনসের সদস্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনিই ছিলেন ব্রিটেনের সমরসচিব। বুয়র যুদ্ধের এই সৈনিক প্রিটোরিয়ায় যুদ্ধবন্দি থাকার সময় পালিয়ে ৪৮০ মাইল পথ অতিক্রম করে রাতারাতি কিংবদন্তির নায়ক বনে গিয়েছিলেন। বহুমুখী প্রতিভা তাঁর। সাংবাদিকতা, চিত্রশিল্প, বাগ্মিতা এবং রাজনীতি—প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই সংকটের সময়ে ইংল্যান্ডের অবিসংবাদী নেতৃত্ব তাঁর হাতে। জীবনে বহু উত্থান-পতনে অটল থেকেছেন চার্চিল। কিন্তু ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ তাঁকে যেন দিশেহারা করে দিচ্ছে।

রাত্রে মাউন্টব্যাটেন আর উইনগেট নিজেদের মধ্যে আসর জমিয়েছেন। 'বাইশ-তেইশ বছর আগে আমি প্রিন্স অফ ওয়েলসের সঙ্গে প্রথম যখন ভারতবর্ষে যাই তখন এই সুভাষ বোস লোকটার সঙ্গে একটা আলোচনার ব্যাপারে দেখা হয়েছিল। তখন থেকেই কংগ্রেসের কাজ করত লোকটা। সারা কলকাতাতে হরতাল করে প্রিন্স অব ওয়েলসকে অপমান করেছিল এই মাথাগরম লোকটা। তখনই গভর্নরকে আমি বলেছিলাম, ওয়াচ হিম অ্যান্ড ক্রাশ হিম বাই হুক অর ক্রুক। আগেপিছে দেখার দরকার নেই, খতম করে দাও লোকটাকে।' মাউন্টব্যাটেন বললেন।

গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে উইনগেট বললেন, 'আমি শুনেছি সরকার থেকে সে চেষ্টা অনেকবারই করা হয়েছে।'

'তা হয়েছে। একবার তো একটা মিছিলে আমাদের এক বাহাদুর মাউন্টেড পুলিশ ওর ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছিল। জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার সময় বাঁচার আশা ছিল না। লোকটাকে এগারোবার জেলে পাঠানো হয়েছে। বেশ কয়েকবার মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে এসেছে আমাদের জ্বালাবার জন্য। মাউন্টব্যাটেনের চোখ-মুখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনও চার্চিলের চেয়ে কম যান না। ইংল্যান্ডের রাজবংশের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে তাঁর। জন্মসূত্রে তাঁর পরিচয় 'প্রিন্স লুই' হিসাবে। চার্চিলের জন্ম সম্ভ্রান্ত মার্লবরো পরিবারে।

পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধটা অনেকটা আচমকাই বেধে গিয়েছিল। গত প্রায় দুশো বছর ধরে ভারতকে লুঠ করেই ব্রিটেনের সমৃদ্ধি। ভারতবর্ষ যদি হাত থেকে চলে যায় তবে সবই চলে যাবে। তাই চার্চিল আর মাউন্টব্যাটেনের মতো লোকেরা এত আতঙ্কিত।

'আমার পরিকল্পনা যদি আপনারা আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন, তা হলে আমি জাপানের

কোমর ভেঙে দেব।' যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বললেন উইনগেট।

'উইনগেট, জঙ্গলের যুদ্ধ জিততে হলে প্রথম দরকার আকাশের দখল নেওয়া। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এয়ারফোর্সের দিক দিয়েই আমরা পিছিয়ে আছি।' মাউন্টব্যাটেন মনে করিয়ে দিলেন।

কুইবেকের শীর্ষ বৈঠকে রাশিয়ার যুদ্ধ, ইউরোপের অন্য রণাঙ্গন, আফ্রিকার যুদ্ধ এইসব নিয়েই বেশি কথা হচ্ছে। একসময় পূর্ব রণাঙ্গনের কথা উঠল। এইবার চার্চিল অত্যন্ত সতর্ক।

'আমাদের কাছে চিনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই চিনের যুদ্ধেই আমরা বেশি মনোযোগ দিতে চাই।' রুজভেল্ট বললেন।

চার্চিল বলে উঠলেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আগে সিঙ্গাপুর আর রেঙ্গুনকে মুক্ত করা দরকার।'

'আমি তো বলেইছি, চিন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।' রুজভেল্ট আবার বললেন।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট আপনি বোধহয় জানেন না জাপান এবার কাজে লাগাচ্ছে বেইমান ভারতীয় ফৌজকে। "চল দিল্লি" শ্লোগান তুলে তারা ভারতের পূর্ব সীমান্তে জড়ো হচ্ছে। "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন আমরা অনেক কষ্টে থামিয়েছি। কিন্তু ভারতের পূর্ব সীমান্তে একবার যদি আই এন এ-র বেইমান ফৌজ ঢুকে পড়ে, সারা ভারতে আগুন জ্বলে যাবে।' চার্চিল বললেন।

'ইজ ইট সো?' রুজভেল্ট বললেন।

'সত্যি কথা বলতে কী প্রত্যেকটি মুহূর্ত এখন আমাদের কাছে দামি। এই মুহূর্তে বর্মা সীমান্তে আপনাদের সাহায্য আমাদের ভীষণ দরকার।' চার্চিলের স্বরে এবার আকুতি ঝরে পড়ে। এই ধরনের স্বভাব বিরুদ্ধ আকুতিতে সবাই আশ্চর্য।

পরিস্থিতি হালকা করার জন্য রুজভেল্ট বললেন, 'মিস্টার চার্চিল, এত কেন চিন্তা করছেন। ভারতবর্ষ তো একদিন আপনাদের ছাড়তেই হবে, দুদিন আগে পরে কী এসে যায়? আপনাদের লেবার পার্টির লোকেরাও তো এই কথাই বলছেন।'

'নো, নো, নেভার। নট টিল আই অ্যাম দেয়ার।' চার্চিলের মুখ দিয়ে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। মিস্টার প্রেসিডেন্ট আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করার জন্য আমি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হইনি।'

সকালের অধিবেশন শেষ হলে চার্চিল ব্রিগেডিয়ার উইনগেটকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে নিয়ে এলেন। ব্রিগেডিয়ার উইনগেটের চালচলন অনেকটা থিয়েটারের নায়কের মতো লাগল রুজভেল্টের।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আমাদের এই ব্রিগেডিয়ার উইনগেট একটা ছোট ফিল্ম তৈরি করেছেন। লাঞ্চের পর সেটা যদি আপনি দেখেন খুব ভাল লাগবে আমার।'

'ইনি ফিল্মও বানান নাকি?' রুজভেল্ট বললেন।

'না মিস্টার প্রেসিডেন্ট। ইনি আমাদের একজন অত্যন্ত সুদক্ষ সেনানায়ক। জঙ্গলের যুদ্ধের ওপর তিনি ফিল্মটা কেন বানিয়েছেন, ছবিটা দেখলেই বুঝবেন আপনি।' চার্চিল বললেন।

পদ মর্যাদায় উইনগেট সর্বোচ্চ পর্যায়ের নন। তাও চার্চিল তাঁকে নিয়ে এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন কেন রুজভেল্ট ঠিক বুঝতে পারছেন না। একচল্লিশ বছর বয়সি উইনগেট ভারতের নৈনিতালে জন্মেছেন। তাঁর ঠাকুরদা হাঙ্গেরিতে পাদ্রি ছিলেন বটে তবে বাবা ছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান বাহিনীর অফিসার। ছোটবেলা থেকে উইনগেটের পছন্দ ছিল বক্সিং, তিরন্দাজ, সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া—এইসব। কুড়ি বছর বয়সেই তিনি গোলন্দাজ বাহিনীতে কমিশনড অফিসার হন। প্রাণের

ঝুঁকি নিয়ে লিবিয়ার মরুভূমিতে 'জেরাজুরা' মরূদ্যানের সন্ধানে অভিযানে গিয়েছিলেন উইনগেট। প্যালেস্তাইনের বিদ্রোহের সময় তিনি অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে বিদ্রোহীদের খাস ডেরায় বিমানে সৈন্য নামিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা আর দক্ষতার নিদর্শনে মুগ্ধ ওয়াভেল গত বছর তাঁকে ভারতে নিয়ে এসেছেন।

ছবি শুরু হল। বর্মার জঙ্গলে উইনগেটের নেতৃত্বে যে অভিযান চালানো হয়েছিল তারই ওপর ছবিটা। নিবিড় বন, আর দুর্গম উপত্যকায় ভরা এলাকাতে ব্রিটিশ, দক্ষিণ আফ্রিকান আর গোর্খা সৈন্যরা নামছে প্যারাশুট নিয়ে। কেউ কেউ আবার উঁচু পাহাড়ের শিখর থেকে গ্লাইডারে নিজেদের বেঁধে পাখির মতো শত্রু এলাকায় পৌঁছচ্ছে। উইনগেট সেনা আর সাজসরঞ্জাম নিয়ে বর্মার অন্তর্গত এলাকায় পৌঁছেছেন। এই সব বনের মধ্যে গোপন বিমানঘাঁটিও তৈরি করা হয়েছে। সেখানে যেসব সৈনিক নেমেছে তারা জাপানি বাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত করে দিচ্ছে। সমস্ত ছবিটি ব্রিটিশ বাহিনীর বীরত্বের একটা গৌরবময় দিক তুলে ধরছে। ছবি শেষ হলে করতালিতে মুখর হয়ে উঠল সভা। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পর্যন্ত অভিনন্দন জানালেন উইনগেটকে।

হল থেকে বেরোবার সময় রুজভেল্টের হাত দুটি ধরে চার্চিল তাঁকে অনুরোধ জানালেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি যদি বিমান দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন তো নিশ্চয়ই আমরা বর্মা পুনরুদ্ধার করতে পারব। শুধু বিমানের অভাবেই আমরা পেরে উঠছি না।' তারপর মাউন্টব্যাটেনের হাত থেকে সেই ফাইলটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে তার থেকে ফটোগুলো বার করে রুজভেল্টের হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখুন এই ছবিগুলো।'

প্রথম ছবিটাতে নেতাজি প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার সৈন্যের আনুষ্ঠানিক অভিবাদন গ্রহণ করছেন দেখে রুজভেল্ট লোকটি কে জানতে চাইলেন।

'সুভাষচন্দ্র বোস, এক উগ্র ভারতীয় নেতা। আমাদের ব্রিটিশ-ভারতীয় ফৌজের প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য সিঙ্গাপুরে জাপানিদের হাতে বন্দি হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিশ-পঁচিশ হাজার সৈন্য সুভাষ বোসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এইসব বেইমানদের নিয়ে গড়া ফৌজের সাহায্যে সুভাষ বোস দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছবার পরিকল্পনা করছে। তার এই পরিকল্পনায় জাপানিদের পুরো সাহায্য আর সম্মতি পাচ্ছে সে।'

'কিন্তু এই সামান্য শক্তি নিয়ে সুভাষ বোস কী করতে পারবে? তা ছাড়া তার বিশ্বাসযোগ্যতাই বা কতটা? হোয়াট ইজ হিজ ক্রেডেনশিয়ালস?' রুজভেল্ট প্রশ্ন করলেন।

'হি ইজ এ ডেঞ্জারাস ম্যান। সাংঘাতিক উগ্রপন্থী আর অসম্ভব ক্ষমতা রাখে লোকটা। লোকটা আমাদের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করেও একদিনের জন্যও চাকরি করেনি। ভারতের তরুণ প্রজন্মের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব আছে তার। লোকটার এত প্রভাব যে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে সে গাঁধীর প্রার্থীকে পরাজিত করেছিল।'

'গাঁধী মানে এম. কে. গাঁধীর প্রার্থীকে?'

'হ্যাঁ! লোকটাকে এগারোবার জেলে আটকানো হয়েছে। মাঝে দু-তিনবার অসুখে মরতে বসেছিল। তা সত্ত্বেও আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে জার্মানিতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল সে। মুসোলিনি তো একেবারে গুণমুগ্ধ তার। কিন্তু ইউরোপে খুব একটা সুবিধে না হওয়ায় নব্বই দিনের ডুবোজাহাজ সফর করে এখন জাপানি এলাকায় হাজির হয়েছে।'

'জাপান তাকে কী সাহায্য করবে?'

'সাহায্য? মিস্টার প্রেসিডেন্ট, স্বয়ং জাপানি প্রধানমন্ত্রী বোসকে জাপানি ডায়েটের

অধিবেশনে নিয়ে গিয়ে এক রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মান দিয়ে তাকে সমস্ত রকম সাহায্যের কথা সেখানে ঘোষণা করেছেন।'

'উইনস্টন, দিস সিমস ভেরি স্ট্রেঞ্জ। ইউরোপে জার্মানি আর ইতালি, রাশিয়ান আর আফ্রিকান ফ্রন্টেই অবশ্য আমার নজর আটকে ছিল। কিন্তু এর মধ্যে ভারতের মতো পিছিয়ে পড়া একটা দেশের একটা লোক যে এরকম নাটকীয় ব্যাপার ঘটাতে পারে তা শুনলেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। যাই হোক আপনাকে কিন্তু বেশি চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে।' রুজভেল্ট বললেন।

'চিন্তা?' চার্চিলের নীলচোখ যেন জ্বলে উঠল। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি যদি অবিলম্বে আমাদের বিমান দিয়ে সাহায্য না করেন, আর জাপানের সাহায্যে বোস আর তার বেইমান ফৌজ একবার যদি বাংলার প্রান্তে পৌঁছতে পারে তবে ভারতবর্ষ আমাদের হাতছাড়া হতে একটুও দেরি হবে না—একথা আমি লিখে দিতে পারি।'

এবার রুজভেল্ট চার্চিলের এত উদ্বেগের কারণটা বুঝলেন। চার্চিল এবার একটা ম্যাপ বার করে ব্রিটিশ গুপ্তচরদের পাঠানো একটা গোপন চিঠি রুজভেল্টের সামনে এগিয়ে দিলেন। 'চিন আর জাপানের মধ্যে মৈত্রী ঘটানোর উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতা সুভাষ বোসের কিছু বিশ্বস্ত সঙ্গী সিঙ্গাপুর আর রেঙ্গুন থেকে চিনের পথে রওনা হয়েছেন। আমেরিকার কাছ থেকে সময়মতো সাহায্য না পাওয়ায় চিন ক্ষুব্ধ। তা ছাড়া জাপানের কাছে পর্যদুস্ত চিন হয়তো শেষ পর্যন্ত স্রেফ আত্মরক্ষার তাগিদেই জাপানের সঙ্গে মৈত্রী স্বীকার করে নিতে পারে। তাই বোসকে যদি সময়মতো রোখা না যায় তবে পরিস্থিতি ভীষণ রকম গোলমেলে হয়ে উঠতে পারে।'

চিঠিটা পড়ে রুজভেল্টের কপালে চিন্তার রেখা দেখে এবার চার্চিল তার মোক্ষম দাওয়াইটা প্রয়োগ করলেন। রুজভেল্টকে মনে করিয়ে দিলেন পার্ল হারবারের কথা—আমেরিকার কাছে সবচেয়ে সংবেদনশীল প্রসঙ্গ। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট আপনি কী মনে করেন যে জাপান, ব্রহ্মদেশ আর ভারত দখল করেই চুপ করে বসে থাকবে? তার পরেই তাদের নজর পড়বে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে—আমেরিকার দিকে। একবার ভাবুন আমেরিকার স্বার্থের দিক দিয়ে কে বেশি বিপজ্জনক—জার্মানি-ইতালি না জাপান?

পার্ল হারবারের অভিজ্ঞতা রুজভেল্টের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আর কিছু না বলে আপাতত দ্রুত পা ফেলে সেখান থেকে চলে গেলেন রুজভেল্ট।

রাত্রে খাওয়ার সময় রুজভেল্ট নিজেই চার্চিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমি রাজি। বর্মা ফ্রন্টে সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত আমি। বর্মা ফ্রন্টে জিততেই হবে আমাদের।'

চার্চিলের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। সেই রাত্রেই মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে 'সাউথ ইস্ট এশিয়া কম্যান্ড' স্থাপন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। জাপান আর আজাদ হিন্দ ফৌজকে রোখার জন্যে উইনগেটের অভিযানকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হল। অনেক দিন পরে চার্চিল আজ দারুণ খুশি।

৪

'আপনার মতো লোকের এই রকম সময়ে এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকাটা কি ঠিক হচ্ছে?' ব্যারিস্টার রাঘবনকে জিজ্ঞেস করলেন নেতাজি।

'সুভাষবাবু, জাপানের কয়েদখানায় আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আপনি যাই বলুন আমার বিশ্বাস আর ফিরবে না।' রাঘবন বললেন।

'একটা অভিজ্ঞতায় যদি আমরা থমকে দাঁড়াই তবে জীবনের গতিই তো স্তব্ধ হয়ে যাবে।'

রাঘবনের মনের তিক্ততা অত সহজে দূর হয় না। শেষ পর্যন্ত নেতাজি তাঁকে কথা দিলেন, 'দেখুন, ব্যারিস্টার সাহেব, এমন দিন যদি আসে যে জাপানি বা আপনার মধ্যে একজনকে আমাকে বেছে নিতে হবে তবে আমি আপনার সঙ্গেই থাকব।'

নেতাজির কথায় শেষ পর্যন্ত ভরসা পান রাঘবন। এমন সময় নেতাজির দেহরক্ষী সমশের সিং এসে বললেন যে কর্নেল ইয়ামামোতো নেতাজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। নেতাজি তাঁকে নিয়ে আসতে বললেন।

গোল সিঁড়ি দিয়ে ইয়ামামোতো উঠে এলেন। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে।

'বলুন কর্নেল সাহেব।'

'তেরাউচি এবং সমস্ত জাপানি সামরিক কর্তৃপক্ষের কথাই আপনাকে জানাতে এসেছি আমি। অস্থায়ী সরকার গঠনের যে সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন তার ফলে সামরিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হবে। জাপানের এই জীবন মরণের সংকট সময়ে আপনার এই ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করা উচিত হচ্ছে না।' ইয়ামামোতো সরাসরি বললেন।

নেতাজি গম্ভীর। আলোচনার গতি দেখে রাঘবন বললেন, 'সুভাষবাবু, আমার মনে হয় আমার এখন অন্য কোথাও গিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। আপনাদের আলোচনা শেষ হলে খবর দেবেন আমাকে।'

'আপনি এখানেই বসুন রাঘবন সাহেব। আপনার কাছে গোপন করার কোনও ব্যাপার নয় এটা। বরঞ্চ আপনার শোনাই ভাল। চারদিন পর ২১ অক্টোবর আমাদের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। কিন্তু আমার এই সিদ্ধান্ত জাপান সরকার আর তাদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের পছন্দ হচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে আমার।'

ইয়ামামোতো এবার বেশ ক্ষুব্ধ। 'মনে হচ্ছে জাপানি সরকার রাজি হবেই বলে ধরে নিয়েছেন আপনি।'

'আপনাদের প্রধানমন্ত্রী যখন সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন এ বিষয়ে জানিয়েছিলাম আমি।' নেতাজি উত্তর দিলেন।

'কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনাকে আনুষ্ঠানিক বলে গণ্য করা চলে না।'

'সেটা আমার ব্যাপার আর আমিই বুঝে নেব সেটা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনার ওপর কোনও আঁচ আসবে না এ ব্যাপারে। প্রয়োজন হলে আপনাদের সম্রাটের দরবারেও আমি হাজির হব।'

আর বলার কিছু নেই। ইয়ামামোতো চলে গেলেন। রাঘবন বিস্মিত। নিজেদের সরকার হোক না সেটা অস্থায়ী, নিজেদের পতাকা, নিজেদের মুদ্রা আর সবচেয়ে বড় কথা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এসব কিছুরই গুরুত্ব আলাদা। রাঘবন বললেন, 'আমাদের সরকার? কথাটা শুনেই দারুণ ভাল লাগছে আমার।'

'হ্যাঁ রাঘবনজি। আমি শিগগিরই স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করতে চলেছি। কবে আমরা রণাঙ্গনে এগিয়ে চলব তার জন্য অধীর হয়ে উঠেছি আমি। হয়তো আপনার স্মরণে থাকতে পারে, ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে আমি দাবি করেছিলাম "আয়ারল্যান্ডের মতো অস্থায়ী সরকার" গড়ে তোলা হোক। গাঁধীজি এ প্রস্তাবে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অনেক ভেবেচিন্তেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'

'পরিকল্পনাটা সত্যি রোমাঞ্চকর। কিন্তু একটু তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না আপনার?'

'হয়তো তাড়াহুড়ো হচ্ছে। কিন্তু আমার মানস গুরু স্বামীজির কাছ থেকে দুঃসাহসী হওয়ার শিক্ষাই পেয়েছি আমি। সময়ে সময়ে দুঃসাহসী হতেই হয়। আমাদের নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা হলে আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেক গুণ বেড়ে যাবে আর শত্রুর মনে আশঙ্কা ছড়াবে।'

'কিন্তু আজ তো যুদ্ধে নেমে পড়াটাই আমাদের কাছে বেশি জরুরি। এই সময় এই সরকার স্থাপনের চেষ্টা কি সময়ের অপচয় নয়?'

'আপনি ভুল করছেন রাঘবনজি। আইনগত দিক দিয়েও অস্থায়ী সরকার গঠন খুবই জরুরি। কোন অধিকার নিয়ে জাপানি ফৌজের সঙ্গে যাব আমরা? আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা যদি না থাকে তবে তো সমস্ত পৃথিবী আমাদের জাপানিদের তল্পিবাহক বলবে। তা ছাড়াও সরকার গঠনের অন্য অনেক উপযোগিতা রয়েছে। একবার টোকিয়ো আমাদের স্বীকৃতি দিলেই আমাদের সৈন্যবাহিনী বন্ধু-রাষ্ট্রের বাহিনী হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।'

নেতাজির হাত চেপে ধরলেন রাঘবন। আবেগের সঙ্গে বললেন, 'নেতাজি...।'

'আপনার মতো বয়োজ্যেষ্ঠ লোক সুভাষ বলেই যদি আমাকে ডাকেন—'

'না এখন থেকে আমি নেতাজিই বলব আপনাকে। ইউ ডিজার্ভ ইট। তা ছাড়া আমার আগের সব বক্তব্য আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। এখন থেকে দেশের কাজে আবার মন প্রাণ দিয়ে লেগে পড়ব আমি।'

অবিলম্বে সিঙ্গাপুরে এ খবর ছড়িয়ে গেল যে ইয়েলাপ্পার সহায়তা করার জন্য রাঘবন এসেছেন। সবাই খুশি মেয়র বাংলোতে কিছু একটা চলছে, সে কানাঘুষো আগে থেকেই চলছিল। তারপর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠার খবরটা জানার পর সৈনিক আর সাধারণ নাগরিক সবাই খুবই খুশি।

অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র লিখতে হবে নেতাজিকে। রয়টারের প্রতিনিধি এস. এ. আইয়ার সাহেব নেতাজির সঙ্গেই থাকেন।

তাঁর মারফৎ পৃথিবীর নানা খবরই পৌঁছয় নেতাজির কাছে। শিবরাম নামে আর একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিকের সঙ্গেও নেতাজির যোগাযোগ আছে।

প্রতিদিন হাজার কাজে ঘোষণাপত্র লেখার মতো একটুও ফুরসত পাচ্ছেন না নেতাজি। রাত এগারোটার সময় আইয়ার সাহেবকে রোজ ডেকে পাঠান তিনি। কিন্তু কিছুই লেখা হয় না। আজও রাতে ছাদে বসে রয়েছেন দুজনে। এই সময় সমুদ্রের হাওয়াটা খুব ভাল লাগে।

আইয়ার প্রশ্ন করলেন, 'নেতাজি, মন্ত্রিমণ্ডল সম্বন্ধে সবাই খুব উৎসুক মনে হচ্ছে।' কাদের কাদের মন্ত্রিমণ্ডলে নেওয়া হবে এ বিষয়ে কিছু কি করেছেন?'

নেতাজি বললেন, 'আইয়ার, আপনি কাদের উপযুক্ত মনে করেন?'

'আমার মত হচ্ছে যে কাউকেই মন্ত্রিমণ্ডলে নেবেন না আপনি। সত্যি কথা বলতে কী মন্ত্রিমণ্ডলে যাবার যোগ্য কাউকেই মনে হচ্ছে না আমার। আপাতত একা আপনিই থাকুন।'

'আইয়ার, ইউ আর টোটালি রং— প্রকৃত নেতা তিনিই যার নিজের ওপর আস্থা নিশ্চয় আছে, কিন্তু অন্যদের ওপরেও বিশ্বাস আছে। তা ছাড়া পরিস্থিতিও মানুষকে মহান হতে প্রেরণা দেয়। আমার সঙ্গে যারা আছেন তাদের আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা আর পরিশ্রম আমাকে মুগ্ধ করে।'

আইয়ার চুপ করে গেলেন। ঘোষণাপত্র টাইপ করার জন্য উন্মুখ তিনি। হঠাৎ নেতাজি নড়েচড়ে বসলেন। সামনে কাগজের তাড়া আর সিগারেটের প্যাকেট। একবার লেখা শুরু হতেই কলমের আগায় শব্দগুলো যেন হুড়মুড়িয়ে আসছে। এক পাতা লেখা হতেই আইয়ার চলে গেলেন টাইপ করতে। তারপর এক এক পাতা লেখা হল, আর স্বামী কিংবা আবিদ হাসান, আইয়ারের কাছে পৌঁছে দেন সেটা। নেতাজির সামনে না আছে কোনও রেফারেন্স বই, না কোনও নোট, না কোনও কাটিং। শতাব্দীব্যাপী ইতিহাস তাঁর অস্থিমজ্জায় যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে।

দুই শতাব্দীর ঘটনা, ব্যক্তি, লড়াই, পরাজয়, ইংরেজ শাসনের স্বরূপ, বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ, নির্বাসন, সবকিছু যেন মনের মধ্যে খোদাই করা রয়েছে। লিখতে লিখতে বারবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে দিল্লির লালকেল্লা। সেই লালকেল্লা আর বড়লাটের প্রাসাদের ওপর উড়ছে দাসত্বের প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক। সেই প্রতীক নামিয়ে আনতে হবে। তিনি দেখতে পান গর্বে বুক ফুলিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিজয়ী সেনারা চলেছে দিল্লির রাজপথ ধরে। ছবির পর ছবি যেন মিছিল করে চলেছে তাঁর মনে।

ঘোষণাপত্রের শুরুতে ভারতের পরাধীনতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে ১৮৫৭-র সংগ্রামের রানি লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া টোপি, কুঁওর সিং-এর কথা লিখতে গিয়ে চোখ জলে ভরে আসে তাঁর। লিখে চলেন, দুর্ভাগ্য আর কয়েকটা ভুলের ফলে সে সংগ্রাম ব্যর্থ হয়, কিন্তু সেই সংগ্রামের নায়কদের নাম ইতিহাসের পাতায় আগুনের অক্ষরে চিরকাল দেশের জন্য আত্মবলিদান আর সংগ্রামের প্রেরণা জাগাবে। কলম যেন আপনা আপনি লিখে চলেছে, ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা— তারপরে মহাযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত নানা আন্দোলন, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়াস আর ব্যর্থতা। অবশেষে নৈরাশ্যে মুহ্যমান ভারতবর্ষের হাতে ১৯২০ সালে মহাত্মা গাঁধী এক নতুন অস্ত্র তুলে দিলেন— অসহযোগ আর সত্যাগ্রহের অস্ত্র। এখন থেকে শুধু রাজনৈতিক চেতনা নয়, আসমুদ্র হিমাচল লাভ করল এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ঐক্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্ব কীভাবে শুরু হয়েছে পূর্ব এশিয়ার লোকেদের কাছে নতুন করে তুলে ধরলেন তিনি তাঁর লেখায়। সারা রাত লেখা চলছে আর সেই সঙ্গে তাঁর মনে চলছে নিজের সঙ্গেই লড়াই বিতর্ক। সামনের সমুদ্রের মতোই রূপ পাল্টাচ্ছে চিন্তার সমুদ্রের। সে সমুদ্র কখনও গর্জন করছে পূর্ণিমার ভরা কোটালে তীরে আছড়ে পড়ছে বিপুল বিক্রমে। কখনও হিমালয়ের বুকে ধ্যাননিমগ্ন যোগীশ্বরের মতো শান্ত হয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই শিবের মতো তাণ্ডব শুরু হচ্ছে সেই সাগরে।

ভোর হয়ে এল। টাইপ করা কাগজগুলো আইয়ার এসে নেতাজির হাতে দিলেন। সেগুলো পড়ে এক আধটা কমা, সেমিকোলন ছাড়া আর বেশি কিছু বদলালেন না নেতাজি। সকাল সাতটার সময় উঠে দু-এক ঘণ্টার জন্য শুয়ে নিতে শোয়ার ঘরে গেলেন তিনি।

৫

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মা, মেজদা আর মেজবউদি। সিঙ্গাপুরে এসেছেন তাঁরা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার এই অপূর্ব মুহূর্তে। খুশি উপচে পড়ছে তাঁদের চোখে মুখে। ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন এমিলি। তার সঙ্গে ওটি কে? দু' বছরের ফুটফুটে মেয়েটি— ঝালর দেওয়া ফ্রক পরে, ঢেউয়ের মতো নেচে নেচে আসছে? ওই তো অনিতা। বাবার কোলে আসার জন্য দৌড়ে আসছে সিঁড়ির দিকে। পড়ে যাবি যে রে পাগলি মেয়ে। দাঁড়া দাঁড়া আমি আসছি তোর কাছে... হঠাৎ মিলিয়ে গেল সবাই। ঘুমটা ভেঙে গেল নেতাজির। চোখ খুলে ধাতস্থ হলেন তিনি। যাই হোক অন্তত স্বপ্নেও তো আজকের দিনে দেখা দিল এরা!

২১ অক্টোবর, ১৯৪৩। সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা আজ অপরূপ সাজে সেজেছে। সকাল থেকেই লোক আসছে সেখানে। এইখানেই আজ নেতাজি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করবেন। এ খবর জানাজানি হওয়ায় দেশবিদেশের সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা ভোর থেকে ভিড় জমিয়েছেন সেখানে।

দুপুর পৌনে চারটের সময় নেতাজির গাড়ি এসে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছল। 'নেতাজি কী জয়', 'বন্দেমাতরম্', 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ', ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল চারদিক। সামরিক রীতিতে অভিবাদন জানানো হল নেতাজিকে। অসুস্থতার জন্য রাসবিহারী আজ সভায় আসতে পারেননি। ঠিক চারটের সময় মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে নেতাজি তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সভ্যদের নাম ঘোষণা করলেন। সমর এবং পররাষ্ট্রদপ্তর তিনি রেখেছেন নিজের কাছে। নারীসংগঠন বিভাগের ভার পেয়েছেন ক্যাপ্টেন ড. লক্ষ্মী স্বামীনাথন। লে. কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জি অর্থমন্ত্রী। এছাড়াও থাকলেন লে. কর্নেল এন. এস. ভগৎ, লে. কর্নেল জগন্নাথরাও ভোঁসলে, গুলজার সিং, লে. কর্নেল এম. জেড. কিয়ানি, লে. কর্নেল এ. ডি. লোগনাথন, লে. কর্নেল ইশানকাদের আর লে. কর্নেল শাহনওয়াজ খান। সেক্রেটারি আনন্দ মোহন সহায়। রাসবিহারী বসু প্রধান পরামর্শদাতা। তা ছাড়া পরামর্শদাতামণ্ডলীতে থাকবেন করিম গনি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান, ইয়েলাপ্পা, থিবি আর সর্দার ঈশ্বর সিং। আইনি পরামর্শ দেবেন এ. এন. সরকার।

সর্বপ্রথম নেতাজি এলেন শপথ নেওয়ার জন্য। আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছে তাঁর। তারপর শপথের প্রত্যেকটি কথা পরম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করে তিনি বললেন, 'আমি সুভাষচন্দ্র বসু ভগবানের নামে এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে ভারতবর্ষ এবং সমস্ত ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি সংগ্রাম করব। আমার আটত্রিশ কোটি ভারতীয়ের কল্যাণ সাধনাই হবে আমার জীবনের প্রথম, প্রধান এবং পবিত্রতম ব্রত।'

নেতাজির ধীর গম্ভীর স্বর চার্চের অরগ্যানের আওয়াজের মতো সারা সভা অনুরণিত করে তুলছে। দুচোখে অশ্রুধারা।

আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা পাঠের শেষ দিকে তাঁর শরীর থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অতীতের যেসব মুক্তিসংগ্রামী শৌর্য আর আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তাঁদের পূত নামে তিনি আজাদ হিন্দের পতাকার নীচে সমবেত হয়ে প্রতিটি ভারতীয়কে মুক্তি-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে আহ্বান করে শেষ বিজয়ের দৃঢ় বিশ্বাস রেখে যুদ্ধ চালাবার জন্য ডাক দিলেন।

সেই দিনই মাঝরাত্তিরে নেতাজি বাসস্থানে আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রথম অধিবেশন বসল। ঘড়িতে বারোটা বাজল। শান্ত স্বরে তিনি উত্থাপন করলেন ইংল্যান্ড আর

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব। এই ঘোষণার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য অনুভব করে সভা চঞ্চল হয়ে উঠল। অর্থমন্ত্রী চ্যাটার্জি উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আমাদের জন্মগত নৈতিক অধিকার। কিন্তু আমেরিকা কেন? এই শক্তিমান দেশের লেজে পা দেবার দরকার কী আমাদের?'

'আজ ইংল্যান্ড দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকার কাঁধে চড়ে। একই সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের দুটি মুখ এরা।'

প্রস্তাব গৃহীত হল। বৈঠকের পর বাড়ির সামনের লনে ডিনার পরিবেশন করা হল সবাইকে। নেতাজিকে অনেকটা মানসিক ভারমুক্ত লাগছে। হাসিঠাট্টা করছেন তিনি।

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীকে বললেন, 'লক্ষ্মী, তুমি মন্ত্রিমণ্ডলীর শপথ ঘোষণায় সই করেছ?'

'হ্যাঁ!' হঠাৎ এই প্রশ্নে লক্ষ্মী বোকা বনে গেছেন।

'ব্যস, হয়ে গেল। এবার পুরো ফেঁসে গেছ।'

'তার মানে?' লক্ষ্মী এবার আরও হতভম্ব।

'আয়ারল্যান্ডে সমান্তরাল সরকার স্থাপন করার পর মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রত্যেকটি সদস্যকে ব্রিটিশ গুলি করে মেরেছিল সেটা কি জানো তুমি? এখন তোমার ভবিষ্যৎও অন্ধকার।'

হাসির রোল উঠল নেতাজির কথার ভঙ্গিতে।

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মোহন সিংয়ের কথা মনে পড়ছে অনেকেরই। নেতাজি নিজেই বললেন, 'জাতিধর্ম, পথ, মতবাদ নির্বিশেষে সবাইকে ত্রিবর্ণ পতাকার নীচে সমবেত করতে হবে আমাদের। সবাই এক না হলে অখণ্ড স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন কী করে সার্থক হবে আমাদের? মোহন সিংয়ের ব্যাপারে আমি জাপানিদের সঙ্গে কথা বলব। তাঁকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনার জন্য সবরকম চেষ্টা করব আমি।'

তেরাউচির এ ডি সি ফুলের তোড়া নেতাজির হাতে দিয়ে বললেন, 'ইয়োর একসেলেন্সি, কাল সন্ধ্যাবেলা খানিকটা সময় করার জন্য জেনারেল তেরাউচি অনুরোধ জানিয়েছেন আপনাকে। আপনার সম্মানে বোটক্লাবে একটা পার্টির আয়োজন করতে চান তিনি। সেই ভোজসভায় আপনার মন্ত্রিমণ্ডলীর সমস্ত সদস্যকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।'

বোটক্লাব আলো ঝলমল। পার্টি জমজমাট। তেরাউচির সঙ্গে অনেক জাপানি কর্তাব্যক্তিই উপস্থিত আছেন পার্টিতে। শুধু এককোণে গেলাস হাতে চিন্তিতভাবে বসে রয়েছেন ইয়ামামোতো। হঠাৎ তেরাউচির সেক্রেটারি একটা ওয়ারলেস বার্তা নিয়ে এলেন সেখানে। বার্তাটি পড়ে উদ্ভাসিত মুখে নেতাজিকে অভিনন্দন জানালেন তিনি। তারপরেই নেতাজিকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে কিছু একটা বলতেই দুজনকেই দারুণ খুশি দেখাল। ঠিক সেই সময় নিপ্পন রেডিয়োতে খবর পড়া শুরু হল। 'ভারতের অগ্রগণ্য নেতা চন্দ্রা বোসের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত আজ জাপানি মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তোজো এবং সম্রাট হিরোহিতো এই উপলক্ষে চন্দ্রা বোসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।'

চারদিকে খুশির লহর। পার্টি শেষে নেতাজি বাসস্থানে ফিরে যাবার জন্য রওনা হতে যাচ্ছেন। সঙ্গে আছেন শাহনওয়াজ। তাঁদের থামিয়ে তেরাউচি বললেন , 'চন্দ্রা বোসজি, আরও একটা সুখবর আছে। টোকিয়োতে আগামী সপ্তাহেই এশিয়ার রাষ্ট্রনেতাদের একটি সম্মেলন হতে যাচ্ছে। সেই সম্মেলনে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান হিসাবে আপনাকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

শাহনওয়াজ তাকিয়ে আছেন নেতাজির মুখের দিকে। নিষ্পাপ শিশুর মতো অনাবিল হাসি আর আবেগের এক অদ্ভুত আলো সেই মুখে।

৬

টোকিয়োতে সরাসরি যাবার অসুবিধে ছিল। তাই নেতাজি প্রথমে ফিলিপাইনসের ম্যানিলায় পৌঁছলেন। সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান ড. জোস লরেল স্বয়ং নেতাজিকে অভ্যর্থনা করে তাঁর প্রাসাদে সসম্মানে নিয়ে গেলেন। পরের দিন বিমানটিকে পথে দু' জায়গায় জ্বালানি নিতে হল। রাতে থাকবার ব্যবস্থা হল ফর্মোসার তাইপোইতে।

জেনারেল জগন্নাথরাও ভোঁসলে, জেনারেল চ্যাটার্জি, ছাড়াও নেতাজির সঙ্গে আছেন ড. রাজু, আবিদ হাসান, সমশের সিং আর সহায়। সঙ্গীদের নিয়ে নেতাজির বিমান একসময় টোকিয়ো পৌঁছল। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শিগেমিৎসু জাপানি কায়দায় বাও করে হাসিমুখে নেতাজিকে স্বাগত জানালেন। নেতাজি জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। চন্দ্রাবোস বানজাই— চন্দ্রাবোস চিরায়ু হোন— ধ্বনিতে বিমানবন্দর মুখরিত হয়ে উঠল। অসংখ্য ত্রিবর্ণ পতাকা আর জাপানের পতাকা হিনোমারু আন্দোলিত হচ্ছে চারদিকে।

আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার পরে এই প্রথম জাপানে এসেছেন নেতাজি। গাড়িতে শিগেমিৎসু বললেন, 'মিস্টার বোস, আপনি জাপানেও হিরো হয়ে গেছেন।'

'কেমন করে?'

'আপনার অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা, মালয়ে আপনার বিশাল জনসভা, যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে আপনার ফৌজ গড়ে তোলা, তাদের কুচকাওয়াজের সচিত্র বিবরণ জাপানি পত্র-পত্রিকায় প্রথম পাতায় বিরাটভাবে বেরিয়েছে। আপনার নারীবাহিনীর গঠনের খবরও দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।'

'এই নারীবাহিনী গঠন কি পছন্দ হয়েছে আপনাদের?'

'সবাই এ ব্যাপারটার তারিফ করছে। কারণ জাপান অনেক ক্ষেত্রেই অসাধারণভাবে এগিয়ে গেলেও, মেয়েদের বন্দুক হাতে লড়াই করতে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি জাপানে আসতে এখনও সময় লাগবে।'

নেতাজি খুব খুশি। শুধু জাপান নয়, জার্মানি, ইতালি, ব্রহ্মদেশ, মাঞ্চুরিয়া, ফিলিপাইনস ইত্যাদি ন'টি রাষ্ট্রও স্বীকৃতি জানিয়েছে আজাদ হিন্দ সরকারকে। এশীয় রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি। এখানে তিনি ইম্ফলের চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে স্বয়ং জেনারেল তোজোর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা হল তাঁর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিরই প্রথমে অবতারণা করলেন তিনি।

'অক্টোবর মাস শেষ হয়ে গেল। আর বেশি দেরি করা উচিত হবে না।' নেতাজি জানালেন।

'হ্যাঁ সেটা আমিও জানি। বর্ষার আগেই অভিযান শেষ করতে হবে আমাদের।' চিন্তাগ্রস্তভাবে বললেন জেনারেল তোজো। 'বিপক্ষের মতলব সম্পর্কে আমরাও জানি। সাউথ ইস্ট কম্যান্ড গড়ে তুলে ভারত-বর্মা সীমান্তে বিশাল সৈন্য সমাবেশ করার আয়োজন করছে ওরা।' তোজো বললেন।

'একবার আমাদের আজাদি সেনাদের ভারত সীমান্তে পৌঁছতে দিন, তারপর দেখবেন ভারতে কীভাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।' অসীম প্রত্যয় নেতাজির।

'ইম্ফল অভিযান যত শিগগির সম্ভব শুরু করতেই চাই আমরা। তবে আপনাকে এখনও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য কর্নেল কিনোশিতা আর মেজর তানাশাহিকে জুলপি পাহাড় অঞ্চলে পাঠিয়েছি। পঞ্চদশ রেজিমেন্টের সেনাপতি মেজর ফুজিয়ারাও চিন্দুইন নদীর দুই পারের অঞ্চল ভাল করে পরীক্ষা করছেন। তাঁদের রিপোর্ট আসার অপেক্ষায় আছি আমি। আমি নিজেও ইম্ফল অভিযানের জন্য খুবই উৎসুক', তোজো বললেন।

'আমার কাছে খবর এসেছে যে আমেরিকা ব্রিটেনকে বিরাটভাবে বিমান সাহায্য দেবার তোড়জোড় করছে। চার্চিল আর মাউন্টব্যাটেন আজ প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে উঠেছেন।' নেতাজি জানালেন।

'ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি আর কাওয়াবের সঙ্গে তো যোগাযোগ আছে আপনার।'

সে কথায় স্বীকৃতি জানিয়ে নেতাজি বললেন, 'আপনাদের অনেক সেনাপতি চাইছেন যে ইম্ফল অভিযানে আমাদের বাহিনীর ছোট ছোট দল সংবাদ সংগ্রহ, রসদ সরবরাহ এইসব কাজ করুক। আপনার কাছে আমার অনুরোধ যে আপনি তাতে রাজি হবেন না। আমাদের সৈন্যরা চাইছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিতে। দেশের জন্য সংগ্রাম করে শহিদ হতেও তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে।'

'আপনার কী ইচ্ছে?'

'আমার ইচ্ছে তিনটি ডিভিশন অর্থাৎ ত্রিশ হাজার সৈন্য এগিয়ে যাবে।'

'সামরিক দৃষ্টিতে তাতে কিছু অসুবিধে হতে পারে, মিস্টার বোস আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনার সৈন্যরা ধৈর্য আর শৌর্যের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত?'

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়, আমাদের সৈন্যদের একমাত্র সামরিক দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন না। এরা আসলে বিপ্লবের গৌরবময় পতাকাবাহক। আপনিও বলুন, পৃথিবীতে কোথাও, কোনও কালে বিশ-পঁচিশ হাজার যুদ্ধবন্দি একসঙ্গে তাদেরই পূর্বতন প্রভুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, এরকম উদাহরণ কি আপনি আর একটিও দেখাতে পারবেন?'

না, এরকম উদাহরণ আর জানা নেই তোজোর। শুধু তাই নয় নেতাজির মতো আত্মবিশ্বাস, দেশপ্রেম আর নিষ্ঠাও কারও মধ্যে এর আগে দেখেননি তিনি। জাপানের সামরিক নেতাদের কাছে তোজো কঠিন হৃদয় বলে পরিচিত। কিন্তু নেতাজির জন্য তোজো সম্পূর্ণ এক ভিন্ন মানুষ। তিনি বললেন,

'চন্দ্রা বোসজি জাপানি সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অন্তত আপনার একটি ডিভিশন যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারে তার জন্য নির্দেশ আজ রাতেই ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির কাছে পৌঁছবে।'

এই বৈঠকেই আরও একটা দাবি জানাতে হবে নেতাজিকে। তিনি তোজোকে বললেন, 'ইয়োর একসেলেন্সি, ব্রিটিশের তাঁবেদাররা আমাকে ঠাট্টা করে "কিং উইদাউট কিংডম" বলে। বর্তমানে ভারতের যেসব অংশ আপনাদের দখলে এসেছে, সেগুলির শাসনব্যবস্থা যদি আপনারা আমাদের সরকারকে দেন তো এদের যোগ্য জবাব দিতে পারি আমরা।'

'ভারতের কোন অংশের কথা বলছেন আপনি?' তোজো একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন।

'আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।'

এবার চুপ করে থাকেন তোজো। এই দুটি দ্বীপে জাপানের নৌবহরের ঘাঁটি রয়েছে। তোজোর কাছে খবর আছে এই মাউন্টব্যাটেন সিংহলে ঘাঁটি তৈরি করার পরিকল্পনা করছেন। তাই এই দুটি দ্বীপ সামরিক দিক থেকে জাপানের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এবার নেতাজিও তাঁর অভিযানের রূপরেখা তোজোর সামনে মেলে ধরলেন। দেখে তোজো চমৎকৃত। শুধু অভিযান নয়, অধিকৃত ভূখণ্ডের প্রশাসনেরও বিস্তৃত পর্যালোচনা রয়েছে সে রূপরেখায়। নেতাজির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তোজো বললেন, 'আপনার ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই বলুন আর আপনাদের দেশের সঙ্গে আমাদের সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলশ্রুতিই বলুন, এই মহাযুদ্ধে জাপান আপনাদের যত সাহায্য করেছে অন্য কোনও এশীয় দেশকে অত সাহায্য করেনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বিজিত ভূখণ্ডের প্রতিটি এলাকা আপনাদের অধীনেই থাকবে।'

৫ আর ৬ নভেম্বর, ১৯৪৩ এশীয় পরিষদের শীর্ষ বৈঠক বসল। এর আগে কাসাব্লাঙ্কা আর তেহরানে মিত্রশক্তির সম্মেলন হয়েছিল। সেই সূত্রেই তোজো এশীয় রাষ্ট্রসমূহের এই সম্মেলন আহ্বান করেছেন। স্বয়ং তোজো ছাড়াও চিনের রাষ্ট্রপতি ওয়াং চিং ওয়েই, থাইল্যান্ডের রাজকুমার ওয়ান ওয়েথায়াফোন, মাঞ্চুরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চাং চিঙ্গই, ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি ড. লরেল আর ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী ড. বা ম সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। নেতাজিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে। কিন্তু তাঁর খ্যাতি, ব্যক্তিত্ব আর সাহসের জন্য তিনিই প্রকৃতপক্ষে সম্মেলনের নায়ক হয়ে উঠেছেন।

শুরুতেই ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী ড. বা ম নেতাজিকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব রাখলেন। 'সুভাষচন্দ্র বোসের অসামান্য কীর্তির কথা আমরা সকলেই জানি। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই মহান ভারতবর্ষের মুক্তি ছাড়া এশিয়ারও উন্নতি হবে না।' নেতাজি তাঁর ভাষণে সমস্ত এশিয়াবাসীকে এশিয়ার উন্নতির জন্য একসঙ্গে কাজ করতে আহ্বান জানালেন। জাপানকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বললেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই অসামান্য সুযোগ যদি আমরা হারাই তবে স্বাধীনতার জন্য আমাদের হয়তো আরও একশো বছর অপেক্ষা করতে হবে। আজ ঘটনাচক্রের আবর্তন আর ভাগ্য আমাদেরই পক্ষে। আমার সরকার "চল দিল্লি" ধ্বনি তুলে ক্ষমতান্ধ শত্রুদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে সচেষ্ট। একবার পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারলে ভারতবর্ষকে শক্তিমান আর সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে আজাদ হিন্দ সরকার আর আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।'

পরিষদের কাজ চলল চার-পাঁচ দিন ধরে। 'আপনি যতই দাবি জানান, জাপান সরকার নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি আন্দামান-নিকোবর কিছুতেই আপনাদের হাতে তুলে দেবে না।' ড. বা ম একান্তে নেতাজিকে বলেছিলেন। অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদেরও তাই ধারণা। সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণে তোজো বললেন, 'আজ মতভেদ ভুলে পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয় চন্দ্রা বোসের পতাকাতলে একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছে। চন্দ্রা বোসকে আমরা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা আমরা রক্ষা করবই। আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে সিলোনে ব্রিটিশ নৌবহরের প্রধান সামরিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তা সত্ত্বেও চন্দ্রা বোসের দাবি মেনে নিয়ে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনব্যবস্থা আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জাপান সরকার গ্রহণ করছে।' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে করতালির ঝড় যেন আর থামতেই চায় না। ড. বা ম এসে নেতাজিকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন।

রাতে ভোজের আসরে কথা প্রসঙ্গে তোজো বললেন, 'ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর চন্দ্রা বোস হবেন তার সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপ্রধান।' সঙ্গে সঙ্গে নেতাজি বলে উঠলেন, 'মাপ করবেন ইয়োর একসেলেন্সি। ভারতবর্ষে আমার চেয়ে অনেক যোগ্যতর লোক আছেন। তা ছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের পর কাকে তারা নির্বাচিত করবে সেটা নির্ণয় করার অধিকার একমাত্র

ভারতীয়দের। আমি আমৃত্যু শুধু দেশের এক বিনম্র সেবক হিসাবেই কাজ করে যেতে চাই।'

জাপানিদের কাছে জাপানের সম্রাট ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁর কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল নেতাজির। ১০ নভেম্বর, ১৯৪৩ টোকিয়োতে জাপানের রাজপ্রাসাদে গেলেন নেতাজি। প্রাসাদের বিখ্যাত ফিনিক্স হলে সম্রাট নেতাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে নেতাজিকে শুভেচ্ছা জানালেন সম্রাট।

হাবিযা পার্কে নেতাজিকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করলেন টোকিয়োবাসীরা। ময়দান লোকে লোকারণ্য। অনেক বছরের মধ্যে কোনও বিদেশিকে এরকম বিপুল সংবর্ধনা জানাননি জাপানিরা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী শিগেমিৎসুর বাড়িতে নেমন্তন্ন সারার পরদিনই প্রধানমন্ত্রী তোজো নৈশভোজের জন্য নেতাজিকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তোজো। তোজোর শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়ছে। নেতাজি তাঁকে শরীরের ওপর দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করলেন, তোজো বললেন, 'মহাযুদ্ধ ফুরসত দিলে তবেই না নজর দিতে পারব।' প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপারে তোজো বেশ চিন্তিত। তার ছাপ পড়েছে তোজোর শরীরে-মনে।

রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা না করে নেতাজির টোকিয়ো ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। সহায় আর কিয়ানিকে সঙ্গে করে রাসবিহারীর বাড়িতে গেলেন তিনি। বিছানার সঙ্গে মিশে যাওয়া রাসবিহারীর রোগজীর্ণ শরীরের দিকে তাকানো যায় না। নেতাজি তোসিকোর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়ার পর রাসবিহারী তাঁর কুশল সংবাদ নিলেন। তারপর বললেন, 'জাপান সফর কেমন হল?'

'আমাদের সৈন্যরা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে সেটা স্থির হয়েছে। তা ছাড়া আন্দামান আর নিকোবর আমরা পেয়েছি।'

'কিন্তু দিল্লি কবে পাওয়া যাবে?' আর্তস্বরে প্রশ্ন করেন রাসবিহারী। 'এই শেষ সফরের জন্য কবে থেকে তৈরি হয়ে আছি আমি। অপেক্ষা শুধু বিজয়ভেরীর আওয়াজ শোনার। একবার সেই মধুর আওয়াজ শুনলেই শান্তিতে চোখ বন্ধ করতে পারব আমি। দাও সুভাষ, আমাকে সেই শান্তি দাও।'

উত্তরে নিজের হাতটা রাসবিহারীর হাতে দিলেন সুভাষ। মহাবিপ্লবী যেন অনুভব করতে চাইলেন সেই হাতের ভরসাটুকু।

৭

দুপুরে খাওয়ার সময় নেতাজি ড. রাজুকে প্রশ্ন করলেন, 'রাজু, মোহন সিংহের ব্যাপার কতদূর এগোল?'

বিষম খেলেন রাজু। একটু জল খেয়ে বললেন, 'নেতাজি, গত সপ্তাহে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে শরীর একেবারে ভেঙে গেছে তাঁর।'

'কোথায় রাখা হয়েছে তাঁকে?'

'এই সিঙ্গাপুরের কাছেই পুলোউ উবিন বলে একটা দ্বীপে। ছয় মাইল লম্বা আর আধ মাইল চওড়া দ্বীপটাতে কয়েক ঘর জেলে ছাড়া আর কেউ থাকে না। ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড দাপট সেখানে।'

খাওয়ার সময় জগন্নাথরাও ভোঁসলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন তিনি।

ভোঁসলেরও মত যে মোহন সিংহকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনা উচিত। নেতাজি ইয়ামামোতোকে ডেকে পাঠালেন আলোচনার জন্য।

'তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে কোনও লাভ হবে না। জাপানকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন না মোহন সিং। তাঁর সঙ্গে কথা বলা মানে পাথরে মাথা কোটা। আর যদি তাঁকে আনতে পারেনও, তাঁকে সামলানো আরও কঠিন হবে।'

'কিন্তু মোহন সিং এক অনন্য দেশপ্রেমিক।'

'সে কথা আমরাও মানি। কিন্তু নিরঞ্জন গিল, মহাবীর সিং প্রভৃতি যারা তার পাশে ভিড় করে থাকত তারা চূড়ান্ত বেইমানি করেছে। আমাদের অনেক গোপন তথ্য তারা তুলে দিয়েছে ব্রিটিশের হাতে।'

'তবুও চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।' নেতাজি বললেন।

'আপনি যখন পূর্ব এশিয়ায় এলেন তখন আপনার ইচ্ছা অনুসারে গিল-মহাবীর সিং জোটের অন্যান্য কয়েদিদের তো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন ধরুন মেজর ভুরেওয়াল। আমাদের চূড়ান্ত অমত সত্ত্বেও আপনার জেদ মেনে নিয়েছিলাম আমরা।' ইয়ামামোতো এবার খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন।

'তার ফলটাও দেখুন। সৈন্যদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।'

মোহন সিং প্রসঙ্গ শেষ পর্যন্ত কাওয়াবে পর্যন্ত গেল। নেতাজিকে স্বয়ং মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন কাওয়াবে। চাঙ্গির বাংলোতে মোহন সিংকে আনতে পাঠালেন তিনি। মোহন সিং আবার আসছেন শুনে অনেকেই খুশি।

দুপুর চারটের সময় মোহন সিংকে নিয়ে একটা মোটরবোট এসে পৌঁছল। ছবির মোহন সিংয়ের সঙ্গে বাস্তবের মোহন সিংয়ের অনেক তফাত। শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। একমাত্র মুক্তোর মতো সাদা দাঁতগুলো হাসির সময় আগের মতোই ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

মোহন সিংকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন নেতাজি— 'জয় হিন্দ' বলে সম্ভাষণ করে সম্মানের সঙ্গে বসালেন তাঁকে। তারপর বললেন, 'আপনার মতো আজাদির লড়াইয়ের সাথি-কমরেডের সঙ্গে দেখা হওয়ায় দারুণ ভাল লাগছে আমার। কিন্তু আজ যখন চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু হতে যাচ্ছে তখন মোহন সিং দূরে সরে থাকবেন, এটা ভাল লাগছে না আমার। আপনাকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে এসেছি আমরা।'

'সুভাষবাবু, আপনি এখানে আসার পর তো বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। এর আগে এই সাথি-কমরেডের কথা মনে হয়নি, না জাপানিদের অনুমতি পাননি?'

মোহন সিংয়ের টিটকারির ভঙ্গি ভোঁসলে বা রাজু কারওরই ভাল লাগেনি। কিন্তু নেতাজি সেটা উপেক্ষা করে বললেন, 'মোহন, আজ আমাদের এক হয়ে লড়াটাই সবচেয়ে বেশি দরকার। আপনি যদি রাজি থাকেন তো প্রয়োজন হলে আমি তোজোর সঙ্গেও কথা বলব।'

'সুভাষবাবু, আপনি যদি পাহাড় থেকে ঝাঁপ মারতে বলেন, মারব, কিন্তু ওই জল্লাদ জাপানিগুলোর মুখও দেখতে চাই না আমি। এতে যদি স্বাধীনতা না আসে তো তাই সই।'

আলোচনা প্রসঙ্গে নেতাজি বললেন, 'আপনার আর রাসবিহারী বাবুর মতান্তর এত বেড়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।'

'ব্যস! আমার সামনে ওই বেইমানটার নামও উচ্চারণ করবেন না আপনি। লোকটা যে জন্মসূত্রে ভারতীয় সেটা ভারতের দুর্ভাগ্য।'

মোহন সিংয়ের একগুঁয়েমি বুঝে ফেললেন নেতাজি। প্রসঙ্গ পালটালেন তিনি। এবার খানিকটা মন খুলে কথাবার্তা হল। মোহন সিং বললেন, 'সুভাষবাবু আপনি পূর্ব এশিয়ায় বড় দেরি করে এসেছেন। অভিযানের সুবর্ণক্ষণ পেরিয়ে গেছে।'

'প্রবাসের নানারকম অসুবিধের ফলে দেরি খানিকটা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু আজও যদি আমরা ঠিক ঠিক রাস্তায় চলি তো লালকেল্লায় তেরঙা ঝান্ডা যে উড়বেই সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।'

'সুভাষবাবু, যারা আমাকে দাগা দিয়েছে তারা আপনাকেও নিশ্চয়ই দাগা দিতে পারে।'

'আমি সেটা মনে করি না। জাপান সম্রাটের উপস্থিতিতে জাপানি সংসদে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তোজো আমাদের সবরকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেটা অবিশ্বাস করার কী কারণ আছে।'

'বিশ্বাস করারই বা কী কারণ আছে?'

'দেখুন, স্থানীয় স্তরে প্রশাসন হয়তো কোনও অসুবিধে সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবীর সর্বত্রই এটা হয়। উপরওয়ালারা নীতি নির্ধারণ করেন আর নীচের তলার লোকেরা অনেক সময়ই সেটা বানচাল করে দেন।'

'জাপানের কাছ থেকে আপনার মতো সক্ষম মানুষ কী পেয়েছে সুভাষবাবু?'

'আমার ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার চেয়ে ভারতের স্বাধীনতা কি সহস্রগুণ বেশি দামি নয়?'

আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উঠল। মোহন সিং বললেন, 'পণ্ডিত নেহরু আমার কাছে দেবতা। তাঁর প্রত্যেকটা লেখা পড়েছি আমি। তাঁর সম্পর্কে যা কিছু খবর বেরিয়েছে সযত্নে জমিয়ে রেখেছি আমি। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই নেতা বলে মানতে পারব না আমি।' পণ্ডিতজির সম্বন্ধে বলতে বলতে নিজের অজান্তেই নেতাজির দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন মোহন সিং। নেতাজি লক্ষ করলেন সেটা। বললেন, 'মোহন সিং, আমার আর জওহরলালের সম্পর্ক, হৃদ্যতা যে কোন পর্যায়ের সেটা আপনি জানেনও না আর আপনার জানার কথাও নয়। আমার আজকের সংগ্রাম নেহরু কিংবা গাঁধীবিরোধী নয়— ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। আজ নেহরুসহ সমস্ত বড় বড় নেতা ব্রিটিশের জেলে। তাই প্রয়োজন ছিল কারও-না-কারও বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরার। ব্রিটিশদের ঘৃণা করি আমি। মহাযুদ্ধের ফলে রসাতলে যাচ্ছে তারা, কিন্তু ভারতকে স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারে টুঁ শব্দটিও করার ইচ্ছে নেই ব্রিটিশ কর্মকর্তা আর আমলাদের।'

'চার্চিলের মত পালটাবে বলে আপনি কি বিশ্বাস করেন না?' মোহন সিং জিজ্ঞেস করলেন।

'মত পরিবর্তন? চার্চিল কোনও হ্যামলেট নন, পাক্কা শাইলক। বুকের মাংস কেটে নেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব এক শাইলক। ইংরেজ গর্ব করে তার সংস্কৃতির, তার সাহিত্যের। অথচ কোটি কোটি মানুষকে দাসত্বের শিকলে বেঁধে রাখতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। এই ছলনার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষের জীবনের অন্ধকার দূর করার জন্যই আমার মন আকুল হয়ে আছে।'

'কিন্তু কাকে সঙ্গে নিয়ে? পাপী জাপানকে সঙ্গে নিয়ে? আর যদি তারা এই যুদ্ধেও বিশ্বাসঘাতকতা করে?'

'মোহন সিং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে কেউ পাপী নয়, কেউ পুণ্যবানও নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আমাদের দেশের মঙ্গল। নিজের দেশের মঙ্গলের জন্য অন্যের সাহায্য

নেবার মধ্যে কোনও পাপও নেই কোনও অন্যায়ও নেই। দেশের জন্য লেনিনও বিদেশে ঘুরেছেন। ফরাসি লাফায়েৎ-এর তরবারি আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল।'

মোহন সিংয়ের জাপানের ওপর এত অবিশ্বাস দেখে জেনারেল ভোঁসলে আর রাজু বিস্মিত। আবার একবার চেষ্টা করেন নেতাজি। 'মোহন, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করলে আমাদের সৈনিকেরা জাপানিদের দিকেই তাদের বন্দুক উঁচিয়ে ধরবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি খুঁটিয়ে দেখে আমি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি যে এরকম কিছুই ঘটবে না। জার্মানিতে থাকার সময় আমার দম আটকে আসছিল। জাপানে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি স্বস্তি অনুভব করছি আমি। হয়তো জাপান আর ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানই এর কারণ।'

সন্ধে হয়ে গেছে। সমুদ্রের জলে অন্ধকার নেমে আসছে। সমুদ্র বিহঙ্গের কলধ্বনি চারদিকে। নেতাজি আবার বললেন, 'মোহন আপনার অতীত কীর্তির জন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। তাই আমি চাই যে আপনি আবার আজাদ হিন্দ ফৌজে ফিরে আসুন।'

জেনারেল ভোঁসলেও মোহন সিংয়ের হাত দুটি চেপে ধরলেন—রাজুর চোখে অশ্রুবিন্দু টলটল করছে। কিন্তু সব ব্যর্থ। এত অনুরোধ, এত কাকুতি মোহন সিংয়ের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারল না।

'সুভাষবাবু, জাপানের সঙ্গে আবার আমার হাত মেলানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি আপনাকেও বলছি— এই হলদে পোকাগুলো একদিন আপনাকেও কামড়াবে।'

'মোহন এই যদি আপনার শেষ কথা হয় তবে আর আমি কী বলব।' বিষণ্ণ স্বরে আস্তে আস্তে বলেন নেতাজি।

বাইরে এখন ঘন অন্ধকার। মোহন সিংকে নিয়ে মোটরবোট ফিরে যাবে। তাঁর সঙ্গের জাপানি প্রহরীরা প্রস্তুত। ঘটনার পরিণতিতে ড. রাজু প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। নেতাজির কাছে বিদায় নেওয়ার সময় মোহন সিং নিজেও বিষণ্ণ। দুজনেই দুজনকে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু মতভেদ বড় তীব্র, বড় তিক্ত। মোহন সিং যখন মোটরবোটে উঠতে যাচ্ছেন তখন নেতাজি বললেন, 'মোহন, নিজের শরীরের যত্ন নেবেন। কয়েকদিনের মধ্যে আপনাকে যাতে কোনও ভাল জায়গায় নিয়ে গিয়ে, ভাল পথ্য, ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় তার ব্যবস্থা আমি নিশ্চয় করব।'

অন্ধকার সমুদ্রে এক সময় ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো মোটরবোটটা আর দেখা গেল না। ক্লান্ত, ধীর পা ফেলে নেতাজি, ভোঁসলে আর ড. রাজু ফিরে চললেন তাঁদের ডেরায়।

৮

'এই নাটকের শুধু প্রথম অঙ্কই শেষ হয়েছে। প্রথম অঙ্কে আমাদের সিঙ্গাপুর আর রেঙ্গুন ছেড়ে পালাতে হয়েছে। এই বিজয়ে জাপানিরা হাতে স্বর্গ পেয়েছে মনে করছে। তারা জানেও না যে দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হবার আগে পরদার আড়ালে আমাদের কী ধরনের প্রস্তুতি চলছে।'

সাউথ ইস্ট এশিয়া কম্যান্ডের ভার পাওয়ার পর থেকেই মাউন্টব্যাটেনের চালচলন বদলে গেছে। তাঁর অধীনে এখন আমেরিকার স্টিলউইল আর ব্রিটেনের জেনারেল স্লিম, জেনারেল স্কুল্স-এর মতো অনেক অভিজ্ঞ, বয়োজ্যেষ্ঠ সেনানী। এদের সবাইকার উপরওয়ালা হিসাবে তাঁর দাপট তো হবেই। কম্যান্ডের সমস্ত বড় বড় সেনানীকে দিল্লিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন।

মাউন্টব্যাটেন বলছেন, 'দ্বিতীয় অঙ্ক খুব শিগগিরই শুরু হতে চলেছে। আমাদের এখন চূড়ান্ত পরিকল্পনা স্থির করতে হবে। ঠিক করতে হবে আমাদের পথ। মনে রাখতে হবে আমাদের সামনে এখন দুটি মাত্র পথ রয়েছে। এক ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে জয়লাভ আর নয়তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভরাডুবি ঘটিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন।

প্রথমে বর্মার জঙ্গলে জাপানি সৈন্যরা কীভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে, চিন্দুইন নদীর ধারে আক্রমণের সম্ভাবনা কীভাবে ঘনিয়ে আসছে তার ওপর আলোচনা হল। মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'আমাদের চার ডিভিশন সৈন্য ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধূলিসাৎ করে দেবে জাপানের সমস্ত বাহিনী।'

আমেরিকান সেনাপতি স্টিলউইল বললেন, 'আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বর্মার রাস্তা খুলে দিয়ে চিনের সাহায্যে এগিয়ে যেতে। আমি তাই লিডোর রাস্তায় আক্রমণ করব।'

'আমার বিমানবাহিনী জাপানের সরবরাহ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করে দেবে। জাপানিরা পালাতে পথ পাবে না।' সদম্ভে ঘোষণা করলেন উইনগেট।

পরিকল্পনার রূপরেখা আকার নিতে থাকে দ্রুতগতিতে। সামনের মানচিত্রে কোথাও বৃত্ত, কোথাও অর্ধবৃত্ত কোথাও বা তিরচিহ্ন দাগানো হচ্ছে। ইম্ফল বিভাগের কম্যান্ডার স্কুন্স বললেন, 'স্যার, আমার বাহিনী অর্ধবৃত্তাকারে ইম্ফলের পুবে দুশো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সময়ে সাহায্য না এলে আমার বারোটা বেজে যাবে।'

স্কুন্সের গলার মিনমিনে সুর ডিকি সাহেবের ভাল লাগল না। তিনি গর্জন করে উঠলেন, 'জেনারেল, ডোন্ট ফরগেট ইন্ডিয়া ইজ দ্য জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন! এই রত্ন যদি আমরা হারাই তো শুধু আপনার নয় আমাদের সবাইকার কলঙ্ক জন্মেও ঘুচবে না।'

যেন তেন প্রকারেণ ইম্ফল, কোহিমা, ডিমাপুর, লিডো অর্থাৎ পূর্ব রণাঙ্গনে যে জিততেই হবে সে বিষয়ে সবাই একমত হলেন। বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে ডিকি মাউন্টব্যাটেন শুধু স্যান্ডহার্স্ট থেকে পাশ করা অফিসারদের কোনও বিশেষ কারণে একটু থেকে যেতে বললেন। অর্থাৎ মার্কিন এবং ভারতীয় অফিসারদের বাদ দিয়ে শুধু ব্রিটিশ অফিসারদের নিয়ে আলাদা শলাপরামর্শ হবে। বাকিরা চলে যাওয়ার পর ডিকি বললেন, 'ব্রিটিশ ভারতীয় ফৌজের বিশ্বস্ততা সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত। আজও ইউরোপে আর অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে আড়াই লাখেরও বেশি ভারতীয় সৈন্য আমাদের হয়ে জান কবুল করে লড়াই করছে। কিন্তু সম্প্রতি তাদের এই আনুগত্যে ফাটল ধরাবার জন্য দারুণ প্রচেষ্টা চলছে। দোজ বাস্টার্ড জিফস—জাপানিজ ইনস্পায়ার্ড ফিফথ কলামনিস্টস অর্থাৎ সো কলড আই এন এ, ব্রিটিশ ভারতীয় ফৌজের বহুদিনের ইমানদারির দুর্গে ফাটল ধরিয়েছে। কুইবেকের গোপন বৈঠকে স্বয়ং চার্চিল সাহেব এ ব্যাপারে আমাকে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। মোদ্দা কথা হচ্ছে দ্যাট স্কাউন্ড্রেল সুভাষ বোস একটা প্রচার যুদ্ধ শুরু করেছে। সেই প্রচার আমাদের পক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের যদি প্রভাবিত করতে পারে তবে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন বলা ছাড়া গতি থাকবে না। তাই অবিলম্বে আমাদেরও পালটা প্রচারের লড়াই শুরু করতে হবে। সত্য, অর্ধসত্য বা ডাহা মিথ্যের বিচার করার দরকার নেই। আমাদের লক্ষ হবে আমাদের সৈনিকদের এই বিষাক্ত প্রচারের হাত থেকে সরিয়ে রাখা। আমরা তাদের বলব, ক) জাপানিরা নারীদের কোনও সম্মান দেয় না। বাড়ির মেয়েদের চেয়ে "গেইসা" আর বেশ্যারা তাদের কাছে বেশি সম্মান পায়। খ) ফর্মোসা, কোরিয়া আর চিনে তারা অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। গ) হাজার হাজার ভারতীয় মজুরের মুখে রক্ত তোলা খাটনিতে তারা গড়ে তুলেছে মালয়েশিয়া আর থাইল্যান্ডের মৃত্যুর রেলপথ।'

মাউন্টব্যাটেনকে একটু থামিয়ে জেনারেল অকিনলেক বললেন, 'এর জবাবে লোকে যদি আমাদের লিডো যাওয়ার রেলের কথা তোলে? অসমের চা বাগান থেকে জোর করে ষাট-সত্তর হাজার শ্রমিক নিয়ে গিয়ে, এই রেলপথ আমরা তৈরি করেছি। তার উত্তর কী হবে?'

'আমাদের এই লিডোর রেলপথ এত গোপনে হয়েছে যে কেউই ভেতরের খবর জানে না। সুতরাং ওটা চাপা দিতে আমাদের বিশেষ কিছু করতে হবে না।'

জেনারেল অকিনলেক বললেন, 'একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না— জাপানিরা সুভাষ বোসকে নিয়ে এত নাচানাচি করছে কেন? তার সরকারের স্বীকৃতি দেওয়া, এশীয় পরিষদে তাকে মাথায় তোলা, এ সবের পেছনে তাদের আসল মতলবটা কী?'

আলোচনা এবার আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাপারে মোড় নিল। জেনারেল স্লিম এবার বললেন, 'স্যার, সম্প্রতি বোসের পাঠানো চারজন গুপ্তচর চট্টগ্রামের পথে ভারতে ঢোকার সময় আমাদের লোকের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের কাছে জানা গেছে এরকম আরও অনেক দুঃসাহসী এজেন্ট আলাদা আলাদা রাস্তায় ভারতে ঢুকে পড়েছে। জাপানিরা যখন বোসের বাহিনীর সঙ্গে ইম্ফলের দিকে হামলা করবে তখন এদের কাজ হবে চারদিকে বিশৃঙ্খলা আর বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। বিমানবন্দর ওড়ানো, রেলপথ ধ্বংস করা, অস্ত্রাগার খতম করে দেওয়া— এই সব কাজ তাদের শেখানোর জন্য পেনাং-এ একটা স্কুল খোলা হয়েছে। সেখানে একেবারে বাছা বাছা লোকদের ধুরন্ধর জাপানি ট্রেনাররা ট্রেনিং দিচ্ছে।'

অতি সাংঘাতিক খবর! অবিলম্বে এ ব্যাপারে ভারতের সমস্ত গভর্নরকে সতর্ক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মাউন্টব্যাটেন তার সহকারীদের বললেন, 'সীমান্তে কড়া নজর রাখুন। কাউকে পেলে ওসব বিচার-তদন্ত ইত্যাদি ঝামেলায় না গিয়ে সোজা জেলে পুরে দেবেন আর নয়তো খতম করে দেবেন।'

এবার একটু থেমে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'এবার নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন ভারতীয় অফিসারদের কেন বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। সুভাষ বোসের বক্তৃতা এমন মারাত্মক যে আমাদের অফিসাররাও যদি তা শোনেন তবে তাঁরাও ওর দিকে ঢলে পড়তে পারেন। মিস্টার গাঁধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও লোকটা কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্যে লড়াইয়ে জিতে গিয়েছিল। আগামী দিনে ফৌজি পোশাকে ও যদি ভারতে ঢোকে তবে আর কাউকে রোখা যাবে না। তাই আমাদের কট্টর সেন্সরশিপ চালু করতে হবে। এ রকম একটা ফৌজ যে গড়ে উঠেছে সেটা কাউকে জানতেই দেওয়া হবে না।'

মোদ্দা কথা কোনওভাবেই ভারতীয় সৈন্য বা অফিসারদের মধ্যে এই বেইমানদের খবর যেন না ছড়ায়। স্কুন্স বললেন, 'এ সম্পর্কে আগেই আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। "জোশ গ্রুপ" বলে একটা নতুন দল গড়ে তোলা হয়েছে। এই গ্রুপে বাছাইকরা বিশ্বস্ত আর ওস্তাদ সৈন্যদের নেওয়া হয়েছে। দুজন-চারজন করে এরা সব ক্যাম্পে ছড়িয়ে আছে। এদের কাজ প্রত্যেক ক্যাম্পে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর একেবারে সমর দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া। সারা পূর্ব সীমান্তে এরা জাল বিছিয়ে রয়েছে।'

মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'এদের হেড অফিস কলকাতায় রাখুন। আমি ব্যবস্থা করছি প্রেস অ্যাক্ট বদলাবার। দরকার বলে অর্ডিন্যান্স জারি করতে হবে।'

বলতে বলতে হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লেন মাউন্টব্যাটেন। হাত মুঠো করে বললেন, 'সামরিক শিক্ষার অ আ ক খ না শিখে, একটা গোলাম জাতির সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা একটা লোকের এত বড় আস্পর্ধা যে বেঁটে জাপানিগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের সঙ্গে টক্কর

দিতে চায়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে চায়! এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

রাতে মাউন্টব্যাটেন আর অকিনলেক বসেছেন। মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'মুশকিল হচ্ছে বোসের এই তথাকথিত সরকারকে নটা রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের দিক দিয়ে এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।'

অকিনলেক বললেন, 'আগামী দিনে এই লোকটা যদি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসে তবে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কটা কী হবে সেটা ভাবলেও মাথা ঝিমঝিম করে।'

'সে ব্যাপারটা স্বপ্নেও মনে আনবেন না। আগামী দিনে দুর্ভাগ্যবশত ভারতবর্ষকে যদি আমাদের বাধ্য হয়ে স্বাধীনতা দিতে হয় তবে আটঘাট বেঁধেই দেওয়া হবে সেটা।' মাউন্টব্যাটেন মিচকি হেসে বললেন।

'কিন্তু আপাতত এই বোসটাকে নিয়ে কি করা যায়?'

'হি শুড বি কিলড্—ইফ নট ফিজিক্যালি— দেন মরালি। উই শ্যাল নট স্পেয়ার হিম।' গেলাসের মদটুকু গলায় ঢেলে বললেন ডিকি।

৯

মালয়েশিয়ার তাইপিং স্টেশনে শাহনওয়াজ আর ক্যাপ্টেন রণ সিং দাঁড়িয়ে আছেন সুভাষ রেজিমেন্টের সৈন্যদের নিয়ে রেঙ্গুনে যাবার মালগাড়ির অপেক্ষায়। নেতাজির আদেশ এসেছে, 'শিগগির রওনা হও।'

যখন তখন বিমান আক্রমণ হচ্ছে। তাইপিং এখন নামেই স্টেশন। আশেপাশের একটা ঘরও আস্ত নেই। স্টেশন মাস্টার একটা খড়ের গাদার পাশে টেবিল পেতে কাজ চালাচ্ছেন। রেললাইনও অনেক জায়গাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাপানি ইঞ্জিনিয়াররা দিনরাত কাজ করে কাজ চালানোর মতো করে তুলছেন সে সব জায়গা।

মালয়েশিয়া থেকে থাইল্যান্ড হয়ে বর্মার রেঙ্গুন পর্যন্ত চারশো মাইল রাস্তা ভীষণ বিপজ্জনক। কখনও ট্রেনে, কখনও ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে, কখনও দেশি নৌকোয় পাড়ি দিয়ে যেতে হবে।

একসময় মালগাড়ি পৌঁছল। সবই খোলা ওয়াগন, মাথার ওপর ছাদ নেই। সৈন্যরা ঝটপট গাড়িতে উঠে বসল। কয়েকটা ওয়াগন সিঙ্গাপুর থেকেই ভরতি হয়ে এসেছে। একদিকে বোমারু বিমানের আক্রমণের ভয় অন্যদিকে এগিয়ে যাবার দুরন্ত কামনা প্রতিটি সৈনিকের মনে। হঠাৎ কানে এল হারমোনিয়ামের সঙ্গে গানের সুর।

দেহল্লিমে জানেওয়ালে মেরা সালাম লে যাও
গানা আজাদিকা দিল সে ভাই গাও
ও দেহল্লিমে জানে ওয়ালে...

প্ল্যাটফর্মের ওপর হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে গাইতে আসছে এক অন্ধ ভিখারি। সঙ্গে একটা ছোট মেয়ে নাচতে নাচতে চলেছে। গানের সুরে একটা আকুতি ঝরে পড়ছে। অনেকেই পয়সা দিল তাদের।

শাহনওয়াজ উঠেছেন সামনের ওয়াগনে। সব ওয়াগন ঠাসাঠাসি ভরতি। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কয়েকজন সদস্য ফুলের তোড়া আর মিঠাই দিলেন সৈনিকদের হাতে। 'নেতাজি

জিন্দাবাদ', 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে প্ল্যাটফর্ম। গার্ড জোরে জোরে হুইসল বাজিয়ে সবুজ পতাকা দেখাচ্ছেন বারবার। কিন্তু গাড়ি আর ছাড়ে না।

ব্যাপারটা কী দেখার জন্য গাড়ি থেকে নেমে শাহনওয়াজ এগোলেন। ইঞ্জিনের কাছে এসে তিনি স্তম্ভিত। রেললাইনের ওপর বসে আছে অনেক পঙ্গু সৈনিক—কেউ খোঁড়া— কারওর বা একটা হাত নেই। রেলওয়ের অফিসার আর জওয়ানদের প্রচেষ্টায় কোনও কাজ হচ্ছে না। হটতে রাজি নয় তারা।

'গাড়ি ছাড়তে দিচ্ছ না কেন তোমরা?' শাহনওয়াজ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদেরও নিয়ে চলুন। আমরাও যাব ইম্ফলে, দিল্লিতে।'

'তোমরা ভাল হয়ে ওঠো। ডাক্তার অনুমতি দিলেই নিয়ে যাওয়া হবে তোমাদের।'

একজন খোঁড়া সৈনিক বলে উঠল, 'আমি কিছুতেই হটব না। ব্রিটিশের হয়ে লড়তে গিয়ে সিঙ্গাপুরে একটা পা হারিয়েছি আমি। এখন, শুধু আরেকটা পা নয়, আমার প্রাণটাই দিতে চাই আমি নেতাজির জন্য। দয়া করে নিয়ে চলুন আমাকে।'

'কিন্তু আপনারা এরকম করলে তো নেতাজির কাজেই দেরি হচ্ছে।'

অনেক বুঝিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের জন্য আলাদা গাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থার কথা দিয়ে সরানো গেল তাদের। লাইন খালি হয়ে গাড়ি ছাড়ল। পঙ্গু সৈনিকরা এল প্ল্যাটফর্মের ওপর। সেই অন্ধ ভিখারি হারমোনিয়াম বাজিয়ে তখনও গান গাইছে 'দেহল্লিমে জানেওয়ালে, মেরা সালাম লে যাও...।' গানের সঙ্গে নাচছে সেই ফুটফুটে মেয়েটি।

গাড়ি ম্যাকসওয়েল পাহাড় পেরোল। শাহনওয়াজ তাকিয়ে দেখছেন এই পাঁচ হাজার ফুট পাহাড়টিকে। এই পাহাড়েই রুট মার্চের তালিম দেওয়া হয়েছে জওয়ানদের। অনেকের পায়েই বুট ছিল না। অসম্ভব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেছে জওয়ানেরা। পায়ে ফুটেছে কাঁটা, গায়ে লেগেছে বিছুটির খোঁচা, কিন্তু তখনও মুখে তাদের গান, 'কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশিকে গীত গায়ে যা'।

যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছনোর জন্য শাহনওয়াজও ব্যাকুল। কিন্তু নিজের সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়েন তিনি। অত্যাবশ্যক সাজসরঞ্জামের খুবই অভাব। সঙ্গে কামান নেই, ওয়ারলেস নিতান্তই কয়েকটা। তার মধ্যেও কয়েকটা ঠিক ঠিক কাজ করে না। মেশিনগান আছে তবে গোলাগুলি খুবই কম। তিন হাজার সৈনিকের জন্য মাত্র চারজন ডাক্তার। উর্দির অবস্থাও শোচনীয়। অনেক জওয়ানের গায়ে ব্রিটিশ ফৌজ থেকে পাওয়া পোশাক। পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটেন আর আমেরিকান বিমানের আক্রমণ খুব বেড়েছে। টোকিয়ো থেকে যে সব জাহাজ বেরিয়েছিল তাদের বেশ কিছু ডুবিয়ে দিয়েছে তারা।

রাস্তায় গ্রামের পর গ্রাম যুদ্ধ বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবু বহু জায়গাতেই নেতাজির আহ্বানে ভারতীয়রা স্বাধীনতা সংঘের শাখা গড়ে তুলেছেন। স্টেশনে স্টেশনে তাঁরা ত্রিবর্ণ পতাকা দুলিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এই পুরোগামী সৈনিকদের।

রেলপথের ধারে ভারতীয় মজুরদের অনেক ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে। থাইল্যান্ডে রেলপথ তৈরির কাজে জাপানিরা জোর করে কাজে লাগিয়েছিল এদের। প্রধানত মাদ্রাজ থেকে আগত এইসব তামিল মজুর দীর্ঘদিন অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে শীর্ণ। এখন অবশ্য ব্যাংকক থেমে মৌলমিন পর্যন্ত রেলপথের অনেকটাই তৈরি হয়ে গেছে। এইসব মজুরদের দুর্গতির কথা শুনে নেতাজি এ সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেবার জন্য ব্রহ্মচারী কৈলাসমের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছেন। এখন অবশ্য মজুরদের দুর্দশা অনেকটা কমেছে। কিন্তু গত চার-পাঁচ বছরের দুর্গতি তাদের হাড়মাস কুরে কুরে খেয়েছে।

চাম্পুন থেকে শুরু হল পায়ে হাঁটা। প্রায় তিনশো মাইল পাড়ি দিতে হবে পায়ে হেঁটে। প্রত্যেকের কাছে পিঠে একটা থলি, একটা পিস্তল আর ছত্রিশ রাউন্ড গুলি।

চলতে চলতে পা ফুলে যায়। রাতে নুনজলে সেঁক দিলে একটু আরাম লাগে তবে নুন-ও খুব একটা অঢেল নয়। আশা ছিল টামোক থেকে আবার ট্রেন পাওয়া যাবে। টামোক পৌঁছে দেখা গেল শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণে রেলপথ বিধ্বস্ত। সুতরাং আবার পথ চলা। যত এগোচ্ছে সৈনিকেরা ততই বাড়ছে শত্রু বিমানের হামলার আশংকা। অনেক সময় তাই রাতে চলতে হয় তাদের।

কণ্ঠে কিন্তু বেজেই চলে, 'কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশিকে গীত গায়ে যা। এ জিন্দগি হায় কৌম কি, কৌম পে লুটায়ে যা।' এ প্রাণ জাতির, এ প্রাণ দেশের। দেশের জন্যই দিতে হবে সে প্রাণ।

প্রতিদিন অন্তত ২৫ মাইল পথ চলে সৈন্যরা। মনে হয় যেন 'আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি।' ক্যাপ্টেন অমরিক সিং আর ক্যাপ্টেন সোতা সিং-এর অধীনস্থ সৈন্যরা আটত্রিশ মাইল করেও হেঁটেছে বেশ কয়েক দিন।

কিছুদিন পরে পথচলতি জাপানি সৈন্যদের সঙ্গে দেখা হল। এরা জেনারেল ইয়ামায়ুচির অধীনস্থ পঞ্চদশ রেজিমেন্টের সৈন্য। রেললাইন বিধ্বস্ত। তা ছাড়া যেটুকু রাস্তায় ট্রেন চলছে সেখানেও যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াগন বা বগির অভাব। তাই এই বিশাল বাহিনী পিঁপড়ের মতো সার দিয়ে হেঁটে চলেছে। রওনা হয়েছে ব্যাংকক থেকে। ফ্রন্টে জেনারেল মুতাগুচি এদের আসার পথ চেয়ে রয়েছেন।

জাপানিরা চার ঘণ্টা ঘুমোয়। যত বেশি সময় সম্ভব পথ চলে তারা। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়ামায়ুচির জিপ পথেই বিগড়েছে। তিনিও তাই সৈন্যদের সঙ্গেই হেঁটে চলেছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে হাতির ওপরেও চড়েন তিনি। হাতিগুলো প্রধানত কামান বইবার জন্য রয়েছে। বেশি বড় কামানগুলোর বিভিন্ন অংশ খুলে ইঞ্জিনিয়াররা আলাদা আলাদা প্যাকিং বাক্সে ভরেছেন। সেই সব বাক্স চলেছে লোকের মাথায়। কুড়ি হাজার জাপানি সৈন্যের ডিভিশন এই পঞ্চদশ ডিভিশন। এদের সবাই নেতাজির সম্বন্ধে জানে। ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে দেখা হলে অভিনন্দন জানায় 'চন্দ্রা বোস বানজাই' 'চন্দ্রা বোস বানজাই'— 'চন্দ্রা বোস চিরায়ু হোন' বলে।

রাস্তায় নদী পেলে জাপানি সৈন্যরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে স্নান করতে নেমে পড়ে। আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে সে দৃশ্য বড়ই অস্বস্তিকর লাগে। একবার এক জাপানি মেজরকে শাহনওয়াজ এরকম করার কারণটা জানতে চাইলেন। মেজর হেসে বললেন, 'আপনি কি জানেন জাপানের ন্যায়ের দেবতাও উলঙ্গ? আমাদের ন্যায়দেবতা আমাদের কাছে কোনও কিছু লুকিয়ে না রাখার প্রতীক।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'তাই তো আমরা তোমাদের চন্দ্রা বোসের কাছে কিছু লুকোই না।'

দিনে দিনে যুদ্ধ পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। বর্মার উত্তর প্রান্তে চিন, আমেরিকা আর ব্রিটেনের প্রচুর সৈন্য জমা হবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। জাপানের বিমান বাহিনী প্রশান্ত মহাসাগর আর অস্ট্রেলিয়ার দিকে ব্যস্ত রয়েছে। সুযোগ বুঝে আমেরিকান বিমান বাহিনী বর্মায় ঢুকে চাষের খেতেও বোমা ফেলছে বা গুলি চালাচ্ছে। 'চালের ভাণ্ডার' বলে বিখ্যাত ব্রহ্মদেশের খেতগুলো এখন ধু ধু করছে। চাষিরা পালিয়েছে তাই খেতগুলোয় লোকের অভাবে চাষ হচ্ছে না।

আজাদি সেনারা চলেছে মোরগুই আর ট্যাভয় নদীর পার ধরে। তাদের সঙ্গে ভারী মেশিনগান,

ভারী সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি চলেছে স্টিমারে নদী দিয়ে। স্টিমারগুলোর সঙ্গে অনেক ছোট ছোট নৌকোও রয়েছে।

দুই বছরের যুদ্ধের ক্ষত মৌলমিনের সর্বত্র। এখান থেকে শত্রুর বিমান আক্রমণের আশংকা আরও বেশি। এরপরে যেতে হবে জলপথে—জাহাজে— জাপানি ভাষায় 'মারু'-তে করে।

সিতাং-এর কাছে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একসময় মর্জবান শহরে পৌঁছল আজাদি সেনা। এবার ব্রহ্মদেশের এলাকা। মাঝে মাঝেই প্যাগোডা দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও কুড়ি ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তি আজাদি সৈন্যদের সংকেত দিচ্ছে যে তারা নিজেদের দেশ, নিজেদের সংস্কৃতির কাছে এসে পড়েছে।

এখান থেকে ট্রেনে করে যেতে হবে রেঙ্গুনে। বিমান হামলায় রেল লাইন অনেক জায়গাতেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আধঘণ্টা, এক ঘণ্টার পথ যেতে অনেক সময় সারা দিন লেগে যায়, কারণ গাড়িকে যেতে হয় অতি ধীরগতিতে। দীর্ঘ পথ পায়ে চলার পর ট্রেনে বসতে পারাটাই মনে হয় অনেক পাওয়া। আজাদি সেনাদের সঙ্গে জাপানি সেনারাও এতে খুশি।

সকাল এগারোটা নাগাদ ওয়াও নদীর তীরে গাড়ি পৌঁছল। এরপর পেগু পেরোতে পারলেই রেঙ্গুন আর বেশি দূর নয়। সিঙ্গাপুর থেকে যে সফর শুরু হয়েছিল তা শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। সবাই খুশি। এমন সময় আকাশে ঘর্ঘর আওয়াজে এক আমেরিকান বোমারু বিমান ধেয়ে এল। চিলের মতো ছোঁ মেরে নেমে এসে ট্রেনের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করল সেই মরণদূত। জাপানি আর আজাদি সেনারা খোলা ওয়াগন থেকে লাফ দিয়ে নামল। ড্রাইভার কোনওমতে গাড়ি থামিয়েছে। অনেকেই গাড়ির নীচেই ঢুকে পড়ল। কেউ বা কাছের গাছগুলোর আড়ালে লুকোল।

আবার ফিরে এল বিমান। আবার শুরু হল গুলিবর্ষণ। দু-একটা ওয়াগনে আগুন লেগে গেল। এই অতর্কিত হামলায় আটজন জাপানি সৈনিক প্রাণ হারাল। ছ'জন মারাত্মকভাবে আহত। গাড়োয়াল পাহাড়ের জিৎ সিং আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম শহিদ হলেন।

সামনের খানিকটা জায়গায় অনেক গাছ। ট্রেন সেখানে দাঁড়াল। দিনের বেলায় ট্রেন চালানো খুবই বিপজ্জনক। জিৎ সিং-এর জন্য শোকাকুল সৈনিকেরা ফৌজি রীতিতে বিদায়ী অভিবাদন জানিয়ে ওয়াও নদীতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করল।

ওয়াও নদীর জল ছুঁয়ে আঁধার নেমেছে। ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে। রণ সিং-এর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ স্বরে শাহনওয়াজ বললেন, 'দেড়-দুই বছরে কত তফাত হয়ে গেছে। তখন ছিল আকাশে জাপানের আধিপত্য। আজ ক্বচিৎ কখনও একটা দুটো জাপানি বিমান দেখা যায় আকাশে। দিনে দিনে ব্রিটেন আর আমেরিকার বিমানবাহিনীর শক্তি বেড়েই চলেছে। যত শিগগির সম্ভব ইম্ফলে পৌঁছতে হবে। বড়ই দুঃসময় সামনে।'

'জাপান সরকার ইম্ফলে অভিযানের জন্য নীতিগতভাবে রাজি হয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হবে। প্রস্তুত থাকুন।' দু-দিন আগে জেনারেল কাওয়াবে স্বয়ং এসে একথা নেতাজিকে জানিয়ে গেছেন।

কাজের পাহাড়। রসদ, পোশাক, ওষুধপত্র, তাদের পরিবহণের ব্যবস্থা—দিনরাত কাজ করছেন নেতাজি। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির আন্দাজ করে দু-মাস আগেই রেঙ্গুনে চলে এসেছেন

তিনি। জিয়াওয়াডি সুগার এস্টেটের একটা সম্পত্তি আছে রেঙ্গুনের বহান অঞ্চলে। সেখানে ১১ জামাল অ্যাভিনিউয়ের বিশাল বাংলো বাড়িতে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান কার্যালয় খোলা হয়েছে। সেখানেই বেশির ভাগ সময় থাকেন নেতাজি।

একটা জিপ এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে এলেন ছ'ফুট লম্বা কর্নেল শওকত মালিক। তার সঙ্গে ফৌজের এক জমাদার। স্মিতহাসি নিয়ে নেতাজি তাকালেন শওকতের দিকে। শওকতও হাসলেন তবে তার লালচোখ দেখে নেতাজি বুঝে নিলেন যে শওকত নিশ্চয় কয়েক পাত্র চড়িয়ে এসেছেন। শওকতের সুরাপ্রীতির কথা সবাই জানে।

'কী মালিক?' চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন নেতাজি।

'এই দেখুন।' জমাদারটির দিকে ইঙ্গিত করলেন শওকত। জামা ছিঁড়ে গেছে, বোতাম নেই— স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কোথাও একটা দারুণ মারামারি করে এসেছে সে।

'কী শওকত, তুমি আজকাল এই জমাদারটিকেও তোমাদের আড্ডায় নিয়ে যাচ্ছ নাকি?'

'আল্লা কসম, সে রকম কিছু নয়।'

এইবার জমাদারটি মুখ খুলল। কান্না চাপা গলায় সে বলল, 'নেতাজি, ওরা জাপানি বলে যা খুশি তাই করবে? আমি তো ওদের গোলাম নই যে ওদের সেলাম করব।'

'কী হয়েছে?'

'এই গাধাটা একজন জাপানি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মারামারি করে এসেছে।' শওকত জানালেন।

'কেন? কী হয়েছিল?'

'নেতাজি, আমি প্যারেড গ্রাউন্ডে আসতেই জাপানি বাহিনীর এক জমাদার-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়।' ও বলল, 'কী রে আমাকে স্যালুট করলি না যে?' আমি বললাম, 'তুমি কি আমার ওপরওয়ালা নাকি যে তোমাকে স্যালুট করব?' উত্তরে সে বলল, 'আমরাই তো বাঁচিয়ে রেখেছি তোদের—তাই তোরা আমাদের সেলাম করবি।' এমন সময় এক জাপানি ক্যাপ্টেন সেখানে এলেন। বললেন, 'তুই সেলাম করবি, না তোকে উলটো করে টাঙিয়ে রাখব?'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? লেগে গেল মারামারি। আমি সোজা বলে দিলাম, মরে গেলেও সেলাম করব না আমি।'

'সাবাস। শওকত, ওকে ছেড়ে দাও। ওর কোনও দোষ নেই।' নেতাজি আদেশের ভঙ্গিতে বললেন।

নেতাজি নিজের অফিসে এলেন। সেখানে ইয়েলাপ্পা আর স্বাধীনতা সংঘের অন্য কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে রেঙ্গুনে কয়েকজন ব্যবসায়ীও বসে আছেন। নেতাজি ভাই পরমানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ড. বা ম-র সঙ্গে দেখা হল?'

'হল, তবে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা ভাল লাগেনি তাঁর। তাঁর বর্মা ব্যাঙ্ক ডুবে গেছে। এ সময় আমাদের ব্যাঙ্ক যদি প্রতিযোগিতায় নামে তো আরও মুশকিল।'

'আমরা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যাব কেন? কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্রন্টে যেতে হবে আমাদের। ভারতের ভেতরে আমরা যখন ঢুকব তখন সেখানকার প্রশাসনের জন্য আমাদের নিজেদের ব্যাঙ্ক থাকাটা নিতান্ত জরুরি।'

স্বাধীনতা সংঘের কর্মকর্তাদের মতোই হাবিব, বাটাই আর নুর সিং-এর মতো ব্যবসায়ীরাও নেতাজির জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছেন। হাবিব আর বাটাই এই দুজন নিজেদের দেড়-দু'কোটি টাকার সম্পত্তি নেতাজির

হাতে তুলে দিয়েছেন। আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা বাস্তব করে তোলার জন্য তাঁরা আগ্রহী। সাগ্রহে নেতাজির দিকে তাকিয়ে আছেন তাঁরা। বশির নামে এক ব্যবসায়ী উঠে দাঁড়িয়ে নেতাজিকে বললেন, 'আপনার নতুন ব্যাঙ্কের মূলধন হিসাবে আমি দশ লাখ টাকা আজই দেবার অঙ্গীকার করছি।'

খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন উপস্থিত সবাই। নেতাজি কৌতুক করে ইয়েলাপ্পাকে বললেন, 'বোলিয়ে কুবের মিঞা, আপ কেয়া করনে চাহ্‌তে হেঁ? শুধু তো ফৌজ নয় কুবেরকেও তো ময়দানে জিততে হবে!'

'নেতাজি, আমার সঙ্গে অন্তত আরও পাঁচ-ছ'জন আছেন যারা প্রত্যেকে দশ লাখ টাকা করে দিয়ে ব্যাঙ্কের প্রধান মূলধনের জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু জাপানিদের সম্মতি প্রয়োজন।' নেতাজি প্রতিশ্রুতি দিলেন পরের দিনই জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে ইম্ফল অভিযানের ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা বলার সময় এ বিষয়েও কথা বলবেন।

আলোচনা, পরিকল্পনা, ইম্ফল অভিযানের প্রস্তুতি নানান কাজে মাঝরাত কখন পেরিয়ে গেছে। ক্লান্ত নেতাজি যখন শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবেন আবিদ হাসান একটা খাম দিলেন তাঁর হাতে। বললেন, 'তাড়াহুড়োর কিছু নেই, কাল পড়বেন।'

'কী আছে এতে?'

'বিশেষ কিছু নয়। হিন্দুস্থান টাইমসে বছর খানেক আগে বেরোনো পণ্ডিত নেহরুর একটা বিবৃতির কাটিং পাঠিয়েছেন কেশব মেনন। পরে পড়লেও চলবে।'

বিছানায় শুতে শুতে রাত দুটো বেজে গেল। চোখ জ্বালা করছে, শরীর আর বইছে না। তবু ঘুম আসছে না। মনে পড়ছে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। জওহরলালের সঙ্গে কাটানো দিনগুলো—তারপর সেই বিরোধ— সব মনে পড়ছে। ঘুম পালাল চোখ থেকে। আলো জ্বালিয়ে জওহরলালের বিবৃতি পড়তে শুরু করলেন তিনি।

'সুভাষ বোসের দেশপ্রেম আর নিষ্ঠার ওপরে আমার কোনওদিন সন্দেহ ছিল না। এক সময়ে আমাদের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা আর মৈত্রী। তারপর একদিন আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। পরস্পরবিরোধী মত আর বিশ্বাস আমাদের দূরত্ব ক্রমশ বাড়িয়ে তুলল। কিন্তু আজ সুভাষ যে রাস্তায় চলেছে সেখান থেকে শুধু তফাতে থাকা নয়, তার সক্রিয় বিরোধিতা করব আমি। সম্পূর্ণ ভুলপথে চলেছে সুভাষ। আজ যদি তার প্রচেষ্টা সার্থকতার পথে যায় তবে শুধু প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত হব না আমি। আমি বিশ্বাস করি হিটলার আর মুসোলিনি মানুষ কেন ঈশ্বরেরও ক্ষমার অযোগ্য। তাই সুভাষের উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা— যতই শুদ্ধ হোক, তাঁর অন্তঃকরণ যতই অনাবিল হোক, কাল যদি জাপানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে ভারতে প্রবেশ করতে আসে তবে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার বিরোধিতা করতে একটুও দ্বিধা করব না আমি। দরকার হলে তলোয়ার তুলে ধরব তার বিরুদ্ধে।'

বিবৃতি পড়ে অনেকক্ষণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইলেন নেতাজি। 'সত্যিই কি ভুল হচ্ছে আমার? আমি কি মিছিমিছি জওহরের মতো বন্ধুকে আর গাঁধীজিকেও আমার ওপর বিরূপ করে তুলেছি?' চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে অনিবার, অবিরাম। 'প্রিয়জনদের সবাইকে দূরে ফেলে— কলকাতায় মেজদা, বিভাবউদি, মা, বাসন্তী মা, সবাইকে ছেড়ে, দূর প্রবাসে নিজের সবকিছু উৎসর্গ করা এমিলিকে তার প্রাণঢালা ভালবাসার বদলে শুধু বিরহ যাতনা দিয়ে— আরও কতজনকে দুঃখ দিয়ে আমি কি ঠিক করছি? কেন করছি এসব?'

চারদিক নিথর, নিশ্চুপ। শুধু ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘরের পরদাটা লাট খাচ্ছে নিজেরই

চারদিকে। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা তলোয়ার। এই তলোয়ার তাঁর চেনা। এই তলোয়ার...। তলোয়ারের সঙ্গেই কথা শুরু হয় তাঁর।

'আমার দোষ কোথায়? যে ইংল্যান্ড একফোঁটা একটা দেশ হয়েও আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীকে জাঁতায় পিষছে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়া কি অন্যায়?'

'কিন্তু আজ ইংল্যান্ড লড়ছে গণতন্ত্রের জন্য, মানবতার রক্ষার জন্য।'

'তাদের উদ্দেশ্য যদি এতই পবিত্র হয় তবে আমাদের দেশকে তারা স্বাধীনতা দিক না। তা হলেই তো লড়াইয়ের আর কারণই থাকে না।'

'এই লড়াই বড় ভয়ংকর। এর জন্যে অনেক দাম দিতে হবে তোমাকে।' তলোয়ার বলে।

'ভালভাবেই জানি সেটা আমি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে আমাদের স্বাধীনতার সিংহদ্বারে পৌঁছতে হবে।'

'না তার চেয়ে অনেক কঠিন লড়াই করতে হবে তোমাকে। অহিংসার মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গাঁধীর দেশে প্রমাণ করতে হবে যে তোমার পথ ঠিক।'

'আজ পর্যন্ত কোনও দেশ অহিংসার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে? অহিংসার মন্ত্রে যদি ব্রিটিশদের মন গলানো যেত তবে গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে দেশের সমস্ত জেলগুলো উপচে পড়ছে কেন? কেন ভগৎ সিং-এর মতো তরুণকে ফাঁসি যেতে হয়? আমি নিশ্চিত যে ব্রিটিশ যখন দেশের ভেতর আর বাইরে—দুদিক থেকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে, হয় তার অস্ত্রের শক্তিতে পরাজয় ঘটবে আর নয় তো, ভারত রক্ষা করা তাদের খরচায় পোষাবে না— শুধু তখনই এদেশ ছাড়বে তারা। তারা কি আমাদের দেশ মানবতা দিয়ে, মানবতা রক্ষার জন্য অধিকার করেছে? ব্যাবসা করতে আসা একটা সামান্য কোম্পানি, ষড়যন্ত্র, বেইমানি আর গুন্ডাগিরি করে, অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের সোনার দেশ লুট করেছে। তাদের ভাষাতেই তাদের উত্তর দিতে পারলে তবেই তারা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তাই এই চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তলোয়ার আমাদের হাতে তুলে নিতেই হবে।'

গায়ের কম্বল ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন নেতাজি। টেবিলে বসে লেখালেখি শুরু হল। আলোচনার ব্যাপারে জাপানিদের মতো কঠিন আর কেউ নেই। অনেক কিছু আলোচনা করতে হবে। একমনে নোট করতে থাকেন নেতাজি।

বাইরে তখন ভোরের বাতাস বইতে শুরু করেছে। একটা শাল গায়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন নেতাজি। অত ভোরে তাঁকে নামতে দেখে হতভম্ব সান্ত্রিরা খটাখট সেলাম ঠোকে। ভেতরের ঘরে প্রেম সেহগলের ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে তিনিও নেতাজির পেছন ধরলেন।

নেতাজির সঙ্গে চলেছে একুশজন জানবাজ সৈনিকের একটি দল। রেঙ্গুন শহরের তিন দিকেই জল। পুবে ইরাবতী নদীর মোহনা, পেছন দিকে মর্জবানের সমুদ্রপ্রণালী। সকালের কুয়াশা ঘিরে রয়েছে শহরটাকে। সামনে রয়াল লেকের জলে ফুলগুলো দুলছে, পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়েছে।

পূর্বদিকে লাল আভা। আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। অরুণ আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সূর্য উঠছে। মাটির বুকেও সূর্যের মতোই হাজার কিরণে ঝলমল করছে শোয়েডাগন প্যাগোডা। শোয়েডাগন প্যাগোডার স্থাপত্য একেবারে স্বতন্ত্র—মন্দির বা মসজিদ কোনও কিছুর মতোই নয়। ঘণ্টার মতো আকৃতির এই বৌদ্ধ মন্দিরের মোচার মতো শিখর সোনায় মোড়া। সেখানে সূর্যের আলো পড়ে যেন দ্বিতীয় সূর্যের মতো আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। আট হাজারেরও বেশি সোনার টুকরো রয়েছে প্যাগোডার গায়ে। সূর্যের আলোয় মনে হচ্ছে সেগুলো থেকে সোনার স্রোত বইছে।

প্যাগোডার ভেতরে গেলেন নেতাজি। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে বুদ্ধের আটগাছি পবিত্র কেশ ভিক্ষুরা সযত্নে রেখে দিয়েছেন এখানে। সারা রেঙ্গুনে ছোটবড়ো আরও অনেক প্যাগোডা আছে।

প্যাগোডার গর্ভগৃহের বাইরের দালানে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নেতাজি। নেহরুর বিবৃতির প্রতিটা কথা এখনও ঝড় তুলছে তাঁর মনে। কিন্তু এই পবিত্র মন্দিরে এসে তাঁর সংকল্প আরও দৃঢ় হয়ে উঠছে। 'ভারতের বুদ্ধের বাণী একদিন সারা পৃথিবীকে আলো দেখিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি* সারা পৃথিবীর শাশ্বত সম্পদ হয়ে উঠেছে। আমার কথাও একদিন সারা পৃথিবীর শহিদবেদিতে অর্ঘ্য হয়ে থাকবে। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি মানবতার পূজা আর দাসত্বের প্রতিবাদ করে যাব। পৃথিবীতে সত্যিকারের মঙ্গল, সত্যিকারের সত্য, শিব, আর সুন্দরের পূজা কোনওদিন পরাধীনতার শিকলে বাঁধা পড়তে পারে না। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর রক্ত অসংখ্য জানা-অজানা শহিদদের উদ্বুদ্ধ করেছে। সত্যিই কী এই প্যাগোডার মঙ্গলের বাণী আর বিপ্লবের তূর্যধ্বনির মধ্যে সত্যিকারের তফাত রয়েছে?'

প্রেম সেহগল অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিলেন নেতাজিকে। এবার আর থাকতে না পেরে বললেন, 'বড় অস্থির দেখাচ্ছে আপনাকে নেতাজি। কী হয়েছে? কীসের জন্য এত ভাবছেন আপনি?'

'কী হয়েছে? ইংরেজের মতো ভণ্ড অত্যাচারীরা হিটলার আর মুসোলিনির সঙ্গে এক করে দেখাচ্ছে আমাকে, আর তাদের সুরে সুর মিলিয়েছে জওহর। প্রেম আমার হাতের অস্ত্র বিবেকহীন, মনুষ্যত্বহীন অত্যাচারের জন্যে কখনও উঠবে না। আমার কোনও কাজে আমার মাতৃভূমির ভাবমূর্তি যদি বিন্দুমাত্র কলঙ্কিত হয় তবে আমি আগুনে ঝাঁপ দেব। নেহরু তার রাজনীতি নিয়ে থাকুক, আমি থাকব লোকনীতি নিয়ে।'

১২

দুপুরে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনেকক্ষণ আলোচনা চলেছিল। নেতাজির মনে কিন্তু রাতে জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারটাই বার বার পাক খাচ্ছে। শাহনওয়াজ যখন সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই নেতাজি বুঝলেন কিছু একটা হয়েছে। নেতাজি প্রশ্নভরা দৃষ্টির উত্তরে শাহনওয়াজ বললেন, 'নেতাজি আমাদের সৈন্যবাহিনীতে কোন সামরিক আইন বলবৎ হবে?'

'আজাদ হিন্দ সরকারের একজন মন্ত্রীর মুখে এ ধরনের প্রশ্ন শুনে আমার তো অবাক লাগছে।' নেতাজি বললেন, 'আজাদ হিন্দ সরকার এবং ফৌজ তো ইতিমধ্যেই তাদের আইন আর সামরিক আইন তৈরি করেছে। তোমরা সেটা বাদ দিয়ে জাপানি আইন চালু করতে চাও নাকি?'

'জাপানি সেনাপতিরা বলছে যে অস্ত্র-শস্ত্র সবই তারা দিচ্ছে। কাজেই আজাদ হিন্দ ফৌজকে তাদের সমকক্ষ বলে গণ্য করা যায় না। সুতরাং আমাদের তাদের আইন মেনে চলতে হবে।'

বলতে বলতে শাহনওয়াজের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। নেতাজির মাথার মধ্যেও যেন চিন্তা পাক খেয়ে উঠল। এরকম হলে তো ভবিষ্যতে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে কোনও সৈনিককে যখন তখন বিনা তদন্তেই আটক করতে পারা যাবে।

রাতে জাপানি অধিকর্তাদের সঙ্গে অভিযান সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা। জমকালো গোঁফ আর সহকারীদের সঙ্গে নির্বিকার মুখে বসে আছেন জেনারেল কাওয়াবে। সাধারণত জাপানিদের মুখ দেখে তাদের মনের ভাব বড় একটা বোঝা যায় না।

ইম্ফল অভিযানের গোপন সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছে।

ভারত ভূমিতে আগে কারা ঢুকবে? জাপানিরা না আজাদি ফৌজ, আজাদি ফৌজ কী ভাবে লড়াইতে অংশ নেবে, বিজিত দেশ কাদের দখলে থাকবে এ সমস্ত সিদ্ধান্ত নেতাজি আগেই নিয়েছেন। তবে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কেও সবাই সচেতন।

নেতাজির দৃঢ়তা, আত্মসম্মানবোধ আর স্বপ্ন ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পদ বলতে আছে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছ থেকে যা খুদকুঁড়ো জোগাড় করা গেছে। প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই তুচ্ছ। সমানে সমানে আলোচনা চালাবার ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান যে কোথায় ভারতীয় প্রতিনিধিরা ভালই জানেন সেটা।

জেনারেল কাওয়াবে বার বার তাকাচ্ছেন নেতাজির দিকে। চন্দ্রা বোসের ব্যক্তিত্ব, মেজাজ, জেদ—সবই ভালভাবেই জানেন তিনি।

প্রথমেই উঠল বিজিত প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার কথা। নেতাজি বললেন, 'বিজিত প্রদেশের প্রশাসনের ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যেই আজাদ হিন্দের একটা বিশেষ দলকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছি। তারাই বিজিত জায়গাগুলোর প্রশাসনের ভার নেবে।'

'ঠিক আছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীই যখন আপনাদের এ দাবি মেনে নিয়েছেন সেখানে আমরা আপত্তি করার কে? তা ছাড়া, আন্দামান আর নিকোবর আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা তো এ ব্যাপারটার ফয়সালা করেই ফেলেছি।'

এরপর আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের কথা উঠল। ইরামামোতো এ ব্যাপারে সরাসরি আপত্তি জানালেন। জেনারেল কাওয়াবে বললেন, 'যুদ্ধের সময়ে অন্য দেশে এ রকম ব্যাঙ্ক আপনি কেন খুলতে চাইছেন? আপনাদের ব্যাঙ্কে যদি একবার লোকসান হতে শুরু করে তবে সেটা সামলানোর কোনও উপায় থাকবে না। আমানতকারীদের সর্বনাশ হবে। খামোকা এ ধরনের ঝুঁকি নিতে চাইছেন কেন?'

'কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য আমরা এ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি না। আমরা শুধু চাইছি অসুবিধের সময় আমাদের রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য আমাদের রক্ত আর অশ্রু দিয়ে গড়া এই ব্যাঙ্ক যেন সাধ্যমতো কিছু করতে পারে। তাই প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নামার আগেই এই ব্যাঙ্ক আমাদের স্থাপন করতেই হবে।'

নেতাজি যেভাবে সমস্ত ব্যাপারটা বললেন তার উত্তরে জাপানি কর্মকর্তাদের আর কিছু বলার থাকল না। কাওয়াবের নীরব সম্মতি লক্ষ করে নেতাজি ইয়েলাপ্পার দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে বসেই ইয়েলাপ্পা তাঁর হিসাব শুরু করে দিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানি সামরিক আইনের আওতায় থাকবে কি না—এ প্রসঙ্গ কাওয়াবের কাছে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক লাগল। গোঁফের ডগা চুমড়ে তিনি বললেন, 'চন্দ্র বোসজি। যুদ্ধ যখন মাথার ওপর ঝুলছে তখন এইসব ফালতু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে কেন সময় নষ্ট করছি আমরা? বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে সামরিক দায়িত্ব যখন জাপানের তখন জাপানি সামরিক আইনই তো সেনাদের মানতে হবে।'

'জেনারেল কাওয়াবে, আজাদ হিন্দ সরকার তাদের আইন তৈরি করেছে, তার কোডিফিকেশনও হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আপনাদের আইন কী হিসেবে মানব আমরা?'

'তাতে অসুবিধে কোথায়?'

'আমরা কি জাপানিদের গোলাম?' এবার নেতাজির আওয়াজ বিলক্ষণ চড়া।

'এই যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রের সৈন্যরাও লড়াই করছে। নানকিং-এ, বর্মায়, থাইল্যান্ডে সর্বত্র সেই সব সৈন্যেরা জাপানি সামরিক আইন মেনেই যুদ্ধ করছে। সেক্ষেত্রে আপনাদের আপত্তি হচ্ছে কেন? ভুলে যাবেন না যে জাপান সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজকে যত সম্মান-সমাদর দিয়েছেন আর কারও ভাগ্যেই সেটা ঘটেনি। কাজেই আপনাদের আশংকার কারণটা কী?'

'এটা আশংকার নয়, আত্মসম্মানের। প্রয়োজন হলে আমরা যত অসুবিধেই হোক মেনে নেব। কিন্তু জাপানি আইনের আওতায় আমরা আসব না।'

দুজনেরই মেজাজ এখন চড়া। দুজনেই অনড়।

ঘনঘন গোঁফে তা দিচ্ছেন কাওয়াবে। নেতাজির কাছেও এই ব্যাপারটা প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। বৈঠকে অচলাবস্থা!

ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দেড়েক পরে আবার আলোচনা শুরু হল, এবার একটু নরম সুরে কাওয়াবে বললেন, 'মিস্টার চন্দ্রা বোস, আপনি ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে বড় বেশি তোলপাড় করেন। এ ধরনের চুক্তি অন্য দেশের সঙ্গেও আমাদের রয়েছে। আপনাদের যদি ছাড় দিতে হয় তবে অন্যদেশগুলোই বা সে সুযোগ পাবে না কেন?'

'এটা আমাদের দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার, জেনারেল সাহেব। জাপান আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। এ অবস্থায় আমরা যদি আপনাদের আইনেরই আওতায় থাকি তবে আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসী ওই স্বীকৃতিটাকে প্রহসন বলে ভাববে। তার চেয়ে এক কাজ করুন। আপনি ফোনে আপনাদের সেনাধ্যক্ষ সুগিয়ামা অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রী শিগেমিৎসু অথবা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে কথা বলুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন।'

জাপানের সর্বোচ্চ প্রশাসনের ওপর এমনকী জাপানি নাগরিকদের মধ্যেও নেতাজির প্রভাবের কথা কাওয়াবের অজানা নয়। টোকিয়োর সিদ্ধান্ত কী হবে সেটা ভালই জানেন তিনি। তবুও আপাতত সম্মান বাঁচাতে টোকিয়োর ওপরই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিতে রাজি হলেন তিনি। আসলে সারা পূর্ব এশিয়ায় দাবড়ে বেড়ানো জাপানি ফৌজের আঙুল ধরে হাঁটিহাঁটি পা পা করে চলা সেদিনকার এই আজাদ হিন্দ ফৌজের এই বাড়াবাড়ি সহ্য হচ্ছে না তাঁর।

গৃহীত সিদ্ধান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ পুরো ব্যাটেলিয়ন হিসাবে জাপানিদের সঙ্গে সমমর্যাদায় লড়াই করবে, বিজিত দেশের প্রশাসনের দায়িত্ব নেবে আজাদ হিন্দ সরকার এগুলো লেখা হল। তারপর নেতাজি বললেন, 'জেনারেল কাওয়াবে, আপনারা আমাদের যে ভাবে সাহায্য করছেন তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন আমি। ভবিষ্যতে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের জন্য আপনারা যা কিছু খরচ করছেন তার প্রতিটি পয়সা ফিরিয়ে দেব আমরা। এমনকী ভবিষ্যৎ ভারত সরকার যদি এ ঋণ স্বীকার না করতে চায়, তা হলে আমি নিজে আমার দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে আপনাদের সমস্ত ঋণশোধ করব। পাইপয়সাও বাকি রাখব না।'

আপাতত বৈঠক শেষ হল। খাওয়ার টেবিলে নেতাজি আবার 'স্যালুট' প্রসঙ্গ তুললেন। এবার কাওয়াবে হেসে উঠলেন। বললেন, 'মিস্টার বোস, আপনি এ ব্যাপারটাতেও এত গুরুত্ব দিচ্ছেন? অভিবাদন করার মধ্যে মূল কথাটি কী? একজনকে আরেকজনের সৌহার্দ্য জানানো। আমরা আপনাদের সব কিছু দিচ্ছি, অন্তত আমাদের সম্মানটুকু আপনারা দিন।'

'ব্যাপারটা তা নয়। সৈনিকদের মধ্যে এই নিয়ে যাতে খামোকা ঝগড়া না বাধে তাই এ ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি করাই ভাল।' নেতাজি বললেন।

'বলুন, কী ভাবে নিষ্পত্তি করতে চান?'

'দুই বাহিনীর লোকেদের মধ্যে নিজের বাহিনীতে যার পদমর্যাদা কম সেই অপরজনকে প্রথমে স্যালুট করবে।' নেতাজি বললেন।

'আর দুজনেই যদি সমপর্যায়ের হয়?'

'তবে দুজনেই একসঙ্গে একে অপরকে স্যালুট করবে। এতে দুজনেরই সম্মান বজায় থাকবে।'

বৈঠকের পর শাহনওয়াজ সেহগলকে নিজের থাকার জায়গায় নিয়ে গেলেন। একদিন শাহনওয়াজ আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙবার চেষ্টায় অগ্রণী ছিলেন। আজ তিনি মনেপ্রাণে নেতাজির গুণমুগ্ধ। সেহগলকে বললেন, 'প্রেম, এই রকম লোকের হাতেই আমাদের আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকতে পারে।' বলতে বলতে আবেগে শাহনওয়াজের চোখ ভরে যায় জলে। 'প্রেম, আমাদের সহায় সম্বল বলতে নিজস্ব কিছুই নেই। এ-রকম অবস্থাতেও যিনি সামান্য স্যালুটের ব্যাপারেও আপস করতে রাজি নন, তিনি কী দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনও কোনও আপস করতে পারেন? প্রেম আমাদের নেতাজি শুধু নায়ক নয়, মহানায়ক। এই মহানায়কই আমাদের নিয়ে যেতে পারবেন স্বাধীনতার সিংহদ্বারে। তাঁর ডাকে একবার কেন, হাজারবার প্রাণ দিতে আমি প্রস্তুত।'

১৫
চল দিল্লি

১

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ রেঙ্গুন থেকে রওনা হচ্ছে। মেমিয়োতে জেনারেল মুতাগুচির কাছে যাবে তারা। রেঙ্গুন থেকে মেমিয়ো ৪৫০ মাইল দূর। ১১ জামাল অ্যাভেনিউয়ে নেতাজির দপ্তরে দারুণ ব্যস্ততা।

এ ডি সি ক্যাপ্টেন সমশের সিং বলছিলেন, 'নেতাজি আমেরিকার বি-২৯ বিমানগুলোর ক্রমশই সাহস বাড়ছে। যখন তখন হামলা চালাচ্ছে তারা।'

'তাদের কাজ তারা করছে। আমরা আমাদের কাজ করব।' হাসিমুখে উত্তর দিলেন নেতাজি।

কর্নেল লক্ষ্মী কাজের ব্যাপারে সিঙ্গাপুর গেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ঝাঁসি রানি বাহিনীর দল নিয়ে মেমিয়ো যাবার ভার নেতাজি দিয়েছেন তাঁর কুবের মিঞা ইয়েলাপ্পার ওপর। সেই ব্যাপারে ইয়েলাপ্পা দারুণ ব্যস্ত। মানবতী আর্যর জন্ম রেঙ্গুনেই। তার বাবা একজন চিত্রশিল্পী। তিনি ভারতমাতার একটা ছবি এঁকে মানবতীকে দিয়েছেন। ছবির ফাঁকা জায়গাগুলো নেতাজির বাণীতে ভরা। এরকম কত অভিভাবক নিজেদের মেয়েদের নেতাজির কাজে সঁপে দিয়েছেন।

মানবতীর মা সমানে কাঁদছেন। মানবতীর বাবা শুধু বলছেন, 'দেখিস মা, যুদ্ধ থেকে যেন পিঠ ফিরিয়ে পালাস না।'

কোনও কোনও অভিভাবক আবেগভরা কণ্ঠে নেতাজিকে বলছেন, 'নেতাজি আমাদের ছেলে নেই। নইলে মেয়ের সঙ্গে তার বউদিও স্বাধীনতার লড়াইয়ে শামিল হতে পারত।'

বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে লাবণ্যবতী এসে পৌঁছল। মাত্র কয়েক মাস আগে অভয় চ্যাটার্জি নামে একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে লাবণ্যবতীর। নেতাজির ডাকে দুজনেই যোগ দিয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজে। অভয় চলে গেছে জেনারেল কিয়ানির ফৌজে। আজ যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে লাবণ্যবতী। তার বড় বড় চোখ আবেগে উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে।

মানবতীকে কাছে ডেকে নেতাজি জিজ্ঞেস করলেন, 'সব মেয়েদের আলাদা আলাদা করে খোঁজ নিয়েছ।'

'সবাই তো চোখের সামনেই রয়েছে নেতাজি।'

'ভুল করছ বেটি। আমাদের ভরসাতেই এই ফুলের মতো মেয়েরা এই প্রথম পা বাড়াচ্ছে একেবারে নতুন এক দুর্গম রাস্তায়। এদের প্রত্যেকের খবর রাখা আমাদের প্রথম কর্তব্য।'

মানবতী বুঝলেন। কাল সকালে ঝাঁসির রানি বাহিনীর প্রথম দল রওনা হবে। বোঁচকা বুঁচকি নিয়ে সারারাত ধরে মেয়েরা আসছে। বাংলোর সামনের প্রাঙ্গণে নেতাজির গাড়ি সবুজ রং করা হচ্ছে। মেয়েদের ট্রাঙ্কগুলোও সবুজ রং করা হচ্ছে।

নেতাজির সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক মন্ত্রী, সামরিক অফিসার, সেক্রেটারি, ডাক্তার আরও অনেকে যাবেন। ফ্রন্টে যাচ্ছে আজাদি ফৌজ। তাদের কাছাকাছি থাকার জন্য নেতাজিও তাই নিজের মুখ্য কার্যালয় মেমিয়োতে স্থানান্তরিত করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

'শাহনওয়াজ, মেমিয়োতে মুতাগুচি তোমার অপেক্ষায় রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রন্টে যেতে হবে তোমাকে।'

'ফৌজকে বিদায় দিতে আপনি আসবেন তো নেতাজি?'

'নিশ্চয়।'

পরের দিন মিঙ্গলডন বিমানঘাঁটির কাছে পৌঁছলেন নেতাজি। সেখানে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শাহনওয়াজের অধীনের সৈন্যরা। গাড়ি থেকে নেমেই নজরে পড়ল। খেজুর পাতার মতো গোঁফ নিয়ে বিরাট লম্বা 'ভাওয়ালপুরি' শওকত মালিক। দাঁতগুলো তেড়াবেঁকা। নেতাজিকে দেখে অ্যাটেনশন অবস্থাতেই কর্নেলের পোশাক পরা শওকত আরও একটু বুকটান করে দাঁড়ালেন। সবই ঠিক আছে শুধু মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে ভক্‌ভক্‌ করে। সেদিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে জামান কিয়ানিকে বললেন নেতাজি, 'জামান, ভাওয়ালপুর রাজ্যে কি শুধু এইসব নমুনাকেই পদাতিক বাহিনীতে নেওয়া হয়?'

'হ্যাঁ নেতাজি। দেশীয় রাজ্যের রাজারা শুধু নিজেদের ঠাট বজায় রাখার জন্যই লোক ভরতি করে। ব্রিটিশ বাহিনীতে এখন লোকের দরকার। তাই দেশীয় রাজ্যের সৈন্যদেরও শামিল করছে ফৌজে।'

'যেমন এই শওকত তেমনি মহম্মদ দুরানি। দুটিই বিচিত্র!'

শওকত-এর মদ খাওয়ার জন্য নেতাজি ভাল চোখে দেখেন না তাঁকে। এটুকু বাদ দিলে সাহসের দিক থেকে শওকত কারও চেয়ে কম নন।

নেতাজি মঞ্চে দাঁড়িয়ে। বিউগল বাজিয়ে ব্যান্ডের তালে তাল মিলিয়ে সৈন্যরা সারি দিয়ে মার্চ পাস্ট করে নেতাজিকে স্যালুট করছে। এর পর তাঁর স্বপ্নকে সাকার করে তুলতে ফ্রন্টে যাবে ফৌজ। গর্বে বুক ভরে গেছে নেতাজির। 'চল দিল্লি' আওয়াজে মুখর চারিদিক।

এমন সময় বিমান আক্রমণের সংকেত দিয়ে সাইরেন বেজে উঠল। একটু পরেই কালো শকুনের মতো দুটি বিমান মাথার ওপর এসে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে গেল। তাদের পেছনে আসছে আরও দশ-বারোটা বিমান।

সামনের এক দক্ষিণ ভারতীয় সৈনিক রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল। সৈনিকরা পাশের বাঁশঝাড়ের আড়ালে আশ্রয়ের জন্য ছুট লাগাল। শাহনওয়াজ তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, 'নেতাজি নেমে আসুন, শিগগির নেমে আসুন।' কিন্তু নেতাজি একভাবে দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছে মনে মনে যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন তিনি, দেখি কত বিমান আছে তোমাদের, কত বোমা আছে। তাঁর অনড় স্থিরতায় শাহনওয়াজও একটুক্ষণের জন্য মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু তারপরেই সৈনিকশিক্ষার সতর্কতা সজাগ করে তুলল তাঁকে, 'নেতাজি, আমাদের সংকটের সামনে রেখে নিজের জীবন নিয়ে খেলা করার অধিকার নেই আপনার। নেতাজি, নিজেকে সামলান।'

ঠিক তখনই আর একটি বিমান বোমা ফেলে চলে গেল। একটা বোমা পড়ল নেতাজির সামনে। তখনও ফিউজ জ্বলছে বোমাটার। যে-কোনও মুহূর্তেই ফেটে মঞ্চসহ নেতাজিকে উড়িয়ে দেবে। ইয়েলাপ্পা দৌড়লেন বোমাটাকে আড়াল করে নেতাজিকে রক্ষা করতে। হঠাৎ চিতাবাঘের মতো গতিতে দৌড়ে এসে মেজর ভুরেওয়াল জ্বলন্ত বোমাটা তুলে নিয়ে দূরে ছুড়ে দিলেন। বেশ খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে ফাটল বোমাটা। ভুরেওয়ালের পোড়া হাত দিয়ে

রক্ত বেরোচ্ছে তখন। অসহ্য বেদনা তাঁর হাতে। অ্যাম্বুলেন্স করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে।

এইসব কিছুর মধ্যে অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নেতাজি। সবাই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে বলে যখন বুঝলেন তখনই তিনি শান্তভাবে নেমে এলেন সেই ছোট মঞ্চটা থেকে। বাকি সবাই তখন বাঁশঝাড়ের আড়ালে। একটু পরেই কুড়িটি বিমানের একটা ঝাঁক আবার এসে মেশিনগানের অগ্নিবর্ষণ শুরু করল। পাশের বিমানঘাঁটির অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফট গানগুলোও এবার সক্রিয় হয়ে উঠল। এইবার পালাতে বাধ্য হল বিমানগুলো।

আবার সবাই ময়দানে জমা হলেন। দৃপ্তভঙ্গিতে মঞ্চে দাঁড়ালেন নেতাজি। তাঁর প্রতিটি শব্দ এখন এক নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে সৈনিকদের কাছে পৌঁছচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জের স্পর্ধিত উত্তর তাঁর কথায় তাঁর ভঙ্গিতে। ভারতবর্ষের দিকে হাত দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওই ওদিকে, ওই নদীর ওপারে, ওই ঘন অরণ্যের আড়ালে, ওই পাহাড় পেরিয়ে আমাদের সুজলাং সুফলাং মাতৃভূমি। সেই পবিত্র মাতৃভূমিতে জন্মেছি আমরা। আবার ফিরে যাব আমরা সেখানে। শোনো, কান পেতে শোনো, মাতৃভূমি আমাদের ডাকছে, রক্ত রক্তকে ডাকছে, নিশ্বাস নিশ্বাসকে ডাকছে। ওঠ, আগুনের মতো জ্বলে ওঠ, অস্ত্র হাতে নাও। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। বিপ্লব আমাদের মুখ চেয়ে রয়েছে।

'চল, শত্রুর দুর্ভেদ্য ব্যূহ চুরমার করে দিয়ে আমাদের পথ তৈরি করে নিতে হবে। জয়ী আমরা হবই আর ভগবানের যদি ইচ্ছে হয় তবে শহিদের স্বর্গে স্থান পাব আমরা। যে রাস্তা দিল্লির দিকে গেছে সেই পথের ধুলো চুম্বন করে চিরনিদ্রায় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ব আমরা। দিল্লির পথ, স্বাধীনতার পথ। চল দিল্লি, দিল্লি চল।'

আজাদ হিন্দের মুখ্য কার্যালয়ে মেজর ভুরেওয়ালের তারিফ সবার মুখে। নেতাজি সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ভুরেওয়াল তোমার জন্য গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে আমার।'

থংগয়ান স্টেশন থেকে রেজিমেন্ট রওনা হবে। অনেক আগে থেকে নেতাজি হাজির সেখানে। এ ডি সি, সেক্রেটারিদের থেকে দূরে এক কোনায় দাঁড়িয়ে সব খুঁটিয়ে দেখছেন তিনি। একটু এগিয়ে শাহনওয়াজের কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। সে স্পর্শে পিতার স্নেহ। 'শানো, তেরঙা ঝান্ডা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পবিত্র সুযোগ সেনাপতি হিসাবে তুমিই পাচ্ছ। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে গেছে। হুইসল বাজল। শেষ মুহূর্তের চাঞ্চল্য প্ল্যাটফর্মে। শাহনওয়াজের মুখের দিকে তাকিয়ে নেতাজি বুঝলেন পরশুর বিমান আক্রমণের মতো আবার তাঁর ওপর আক্রমণ চিন্তিত করে তুলেছে শাহনওয়াজকে। হেসে নেতাজি বললেন, 'চিন্তা কোরো না। নিজের খেয়াল রেখ। সুভাষ বোসকে মারবার মতো গুলি ব্রিটিশের কারখানায় আজও তৈরি হয়নি।'

ট্রেন চলতে শুরু করল। স্যালুটের ভঙ্গিতে হাত কপালে ঠেকিয়ে সৈনিকদের অভিবাদন জানাতে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের প্রিয় নেতা। এক একটা বগি সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। স্যালুট করা নেতাজির চেহারাটা প্রতিটি সৈনিকের মনে আলোড়ন তুলছে। পুরনো অস্ত্র সম্বল, ভাল পোশাক নেই, অনেকেরই পায়ে ছেঁড়া বুট। জাপানিদের উদ্বৃত্ত অস্ত্র আর সাজসরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে আজাদি সেনাদের। কিন্তু সৈনিকদের মনে কিছুই নেই সে সব। তারা শুধু দেখছে অভিবাদনরত নেতাজির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। এই তো তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ! তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর ভালবাসা, তাঁর দৃপ্ত আহ্বান। সেই পাথেয় নিয়েই

বর্মার ঘনঘোর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে, ইরাবতীর মতো ভয়ংকর নদী পার হয়ে ছুটে চলা গাড়িতে এগিয়ে চলে অগ্রগামী আজাদি সেনার দল।

২

আজাদ হিন্দ সরকারের অ্যাডভান্স হেড কোয়ার্টার্স রেঙ্গুন থেকে মেমিয়ো যাচ্ছে। এই উপলক্ষে বর্মার প্রধানমন্ত্রী ড. বা ম একটা ভোজসভার আয়োজন করেছেন নেতাজির সম্মানে।

পার্টিতে সবাই হালকা মেজাজে হাসি ঠাট্টা করছেন। নেতাজি হাসি ঠাট্টায় শামিল হয়েছেন। হঠাৎ নজরে পড়ল সেই তালগাছের মতো ঢ্যাঙা কর্নেল শওকত মালিকের ওপর। নেশায় একেবারে চুর হয়ে আছেন শওকত। কোনও জ্ঞান আছে বলে মনে হচ্ছে না। নেতাজি তাঁর ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

ভোজসভায় রেঙ্গুনের অনেক সম্ভ্রান্ত বর্মী পরিবারের লোকেরাও এসেছেন। তাদের মধ্যে অনেক সুন্দরী তরুণী রং-বেরঙের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের অনেকে এসে নেতাজিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ যে শেষ পর্যন্ত ফ্রন্টে যেতে পারছে সবাই তাতে খুশি।

নেশায় চুর শওকত কী করছেন নিজেই জানেন না। হঠাৎ গেলাস হাতে নিয়ে সটান ড. বা ম র কাছে এসে তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে গড়গড়িয়ে অনেক কিছু বলে গেলেন। সে ভাষা বর্মী থেকে তামিল সব কিছুই হতে পারে। নিজেদের অফিসার অন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ ধরনের অসভ্যতা করছে দেখে নেতাজির রাগে গা জ্বলছে। পার্টিতে তিনি চেঁচাতেও পারছেন না আবার মিষ্টি কথায় শওকতকে বোঝানোও যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত প্রায় জোরজার করেই গাড়ি করে তাঁকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হল। নেতাজি ড. বা ম-র কাছে এ ব্যাপারের জন্য আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করলেন।

পরের দিন নেতাজির সামনে মাথা নিচু করে শওকত এসে দাঁড়ালেন।

'নেতাজি ভুল হয়ে গেছে।' শওকতের চোখে জল।

'কী ভুল? সিঙ্গাপুরের নাইট ক্লাবে চিনে মেয়েদের সঙ্গে মস্তি করা না প্যারেডে মদ খেয়ে আসা?'

'আপনার শপথ নেতাজি আমি আজ মদ খাইনি।'

'এখনও খাওনি একটু পরে খাবে।'

কর্নেল মালিক হঠাৎ কাতর স্বরে বললেন, 'নেতাজি আপনার পায়ে ধরছি। এবারের মতো ক্ষমা করে দিন আর ইম্ফলে যেতে দিন আমাকে।'

'সেখানকার গ্রামে অঢেল দেশি মদ পাওয়া যায় বলে?'

শওকতের কোনও কথাই কানে তুলতে রাজি নন নেতাজি। শওকতকে কী শাস্তি দেবেন তিনি, দেখার জন্য তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ভাস্করন, সমশের সিং সবাই অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ শান্তভাবে পকেট থেকে পাঁচ হাজার টাকার একটা তাড়া বার করে শওকতের হাতে দিয়ে নেতাজি বললেন, 'এই নাও। এবার বেরোও।'

'কো... কোথায় যাব নেতাজি?'

'প্লেনে ব্যাংকক চলে যাও। সেখানে গিয়ে যত ইচ্ছে মৌজমস্তি কর। আজাদির লড়াইয়ের ব্যাপারটা আমরা দেখে নেব।'

টাকাটা হাতে নিয়ে শওকত বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। এবার নেতাজির গলায় বাজ ডেকে উঠল, 'ফলো মাই অর্ডারস।' নেতাজিকে সামলাতে এবার বাকিরা দৌড়ে এলেন। জোর করে শওকতকে জিপে তুলে তাঁকে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা করে দিলেন।

সারাদিন কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝেই শওকতের খবর আসছে নেতাজির কানে। কর্নেল ব্যাংকক যাননি। অস্থির হয়ে বিমানবন্দরেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রেঙ্গুনের ভিখারিদের শওকত পয়সা বিলোচ্ছেন বলে খবর এল।

সন্ধেবেলায় নেতাজির সামনে উদয় হলেন শওকত। 'নেতাজি, মা কসম, আর কখনও মদ ছোঁব না।'

'মদের ঝোঁকেই তো বলছ সেটা।'

'হ্যাঁ নেতাজি খেয়েছি, খুব মদ খেয়েছি। কিন্তু কী লাভ হল খেয়ে?'

'কেন?'

'এত মদ খেয়েও নেশা হল না নেতাজি। খালি মাথা ফেটে পড়ছে। প্লিজ নেতাজি, আমাকে ফ্রন্টে যেতে দিন। নয়তো পাগল হয়ে যাব আমি।' বলতে বলতে থরথর করে কাঁপতে থাকেন শওকত।

খানিকক্ষণ একদৃষ্টে শওকতের দিকে তাকিয়ে রইলেন নেতাজি। তারপর জামান কিয়ানিকে ডেকে পাঠালেন। শওকতের মুখ দিয়ে মদের গন্ধে কিয়ানির প্রাণ ওষ্ঠাগত।

'জামান?'

'জি নেতাজি।'

'তোমার সঙ্গে শওকতকে নিয়ে যাও।'

'কোথায়?'

'ইম্ফলে।'

'কী?' জামান যেন চড় খেয়েছেন একটা।

'আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।' তোমার ডিভিশনে আলাদা একটা টাস্ক ফোর্স তৈরি করে শওকতকে তার ভার দাও।'

'কিন্তু...'

'ফলো মাই অর্ডারস।'

'ইয়েস, নেতাজি।'

জামান অবাক হয়ে দেখছেন। থরথর করে কাঁপতে থাকা হাতে নেতাজিকে স্যালুট করছে মদে চুর শওকত। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে তাঁর।

৩

কলকাতার কাছেই ব্যারাকপুরে জেনারেল স্লিমের হেডকোয়ার্টার্স। পাশের এয়ার স্ট্রিপে একটি সামরিক বিমান তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। সাউথ এশিয়া কম্যান্ডের সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন এসেছেন সফরে। একদল বাছাই করা লোক নিয়ে অসম-ব্রহ্মদেশ সীমান্ত পর্যবেক্ষণে যাবেন তিনি।

নতুন ফ্রন্টের জন্য ব্রিটিশরা চতুর্দশ রেজিমেন্ট তৈরি করে তার ভার দিয়েছে জেনারেল স্লিমের ওপর। সাউথ ইস্ট এশিয়া কম্যান্ডের সর্বময় কর্তা ডিকি মাউন্টব্যাটেনের মুখ্য কার্যালয় সিলোনের ক্যান্ডিতে। যুদ্ধক্ষেত্রের দায়িত্ব স্লিমের।

স্লিমের কাছেই বসে আছেন খেঁকশিয়ালের মতো দেখতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেফরি স্কুন্স। চতুর্থ কোর-এর দায়িত্ব নিয়ে তাঁকেই যেতে হবে ইম্ফলের অগ্নিকুণ্ডে। দুশ্চিন্তায় গত কয়েকদিন ঘুম হচ্ছে না তাঁর।

'জেনারেল স্লিম, জাপানি ফৌজ আক্রমণ করার আগেই আমাদের আক্রমণ করাটাই ভাল নয় কি?' তেতাল্লিশ বছর বয়সি ডিকি মাউন্টব্যাটেনের উৎসাহটা একটু বেশি।

'আমরা যদি এগিয়েও যাই তা হলে ইম্ফলের কাবোয়া পার্বত্য অঞ্চল থেকে চিন্দুইন নদীর তীর ১০০ মাইলেরও বেশি দূর। এতদূর পর্যন্ত সরবরাহ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সহজ নয়। তা ছাড়া জাপানি ফৌজ আর তাদের সঙ্গের ওই বেইমানদের আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রকৃত শক্তি না জেনে এটা করা হঠকারিতা হবে।'

'তবে জাপানিরা যখন চিন্দুইন নদী পার হবে তখন তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হোক।' মাউন্টব্যাটেন বললেন।

'সেটাও খুব ঝুঁকির কাজ হবে।' স্লিম বললেন।

বিমান প্রস্তুত খবর এল। সবাইকে নিয়ে বিমান উড়ল অসমের দিকে। তৃতীয় বিমান বাহিনীর এয়ার মার্শাল বল্ডউইনকে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'আমি সবাইকেই বলেছি যে অসমের জঙ্গলে লড়াই জিততে হলে আমাদের আকাশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। একমাত্র আপনিই করতে পারেন এটা। ইউ আর মোস্ট প্রেশাস টুডে।'

লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্কুন্সের মনে ইম্ফলের আশেপাশের ঘনজঙ্গল বারবার ভেসে উঠছে। তিনি বললেন, 'স্যার, আমাদের চতুর্দশ রেজিমেন্টের রণক্ষেত্রটা খুব বেশি রকম ছড়ানো। উত্তরে চিনের ফোর্ট হটস থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সাতশো মাইল ধরে এই ফ্রন্ট। তার মধ্যে ঘনজঙ্গল, উঁচু উঁচু পাহাড় আর গভীর উপত্যকা। এইসব অঞ্চলে গরমকালেও আমাদের পদাতিক সৈন্যদের ছোট ছোট দল হঠাৎ হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায়।'

'একেবারে বেপাত্তা?'

'এটা সত্যি।' স্লিম বললেন। 'গরমকালেও রাস্তাগুলো পাঁকে ভরতি। পায়ে চলার রাস্তাগুলো জানোয়ারদের পায়ে পায়ে তৈরি। তাও খুবই সরু সরু। তা ছাড়া এমন অনেক অঞ্চল আছে যেগুলো আমাদের সামরিক মানচিত্রেও দেখানো নেই।'

ডিকি মাউন্টব্যাটেন বাইরে তাকিয়ে দেখছেন। বাংলার সমতলভূমি শেষ হয়ে অসমের পাহাড়ি অঞ্চল দেখা যাচ্ছে এবার। সবুজ ঘন জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে মাটি। তার মধ্যে মাঝে মাঝে পাহাড়, টিলা, দুরন্ত নদী। কুইবেকের বৈঠকে চার্চিল তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'ডিকি তোমার ওপর ডবল দায়িত্ব। অসমে জাপানি ফৌজকে পর্যুদস্ত করার জন্য বিমান আক্রমণ আর জাপানি বিমান বাহিনীকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করা।' তা ছাড়াও তার ওপর দায়িত্ব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিন্দুইন নদী পার হওয়া আর আন্দামান-নিকোবর আবার দখল করা। তাই সিলোনে হেড কোয়ার্টার্স করেছেন তিনি। এখান থেকে একদিকে সিঙ্গাপুর আর অন্যদিকে রেঙ্গুনে হামলা চালানো যাবে।

নৌবাহিনীতে 'কিলার', 'ডেয়ারিং' প্রভৃতি জাহাজে কাজ করার সময় অনেক ঝুঁকি আর বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন ডিকি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, যার রাজবংশের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, জাপানি বোম্বেটেদের হাতে অপদস্থ হবে এ চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তোলে।

বল্ডউইনের কথায় বিমান উত্তরদিকে আমেরিকান জেনারেল স্টিলউইলের ঘাঁটি লিডোর দিকে চলল। ব্রহ্মপুত্র দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়াও সীমন্তিনীর সিঁথির মতো বনের মধ্যে দিয়ে চলে

যাওয়া একটা রেলপথ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। স্লিম জানালেন ওটাই লিডোর রেলপথ। কলকাতার থেকে প্রায় আটশো মাইল দূরের এই রেলপথ আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তায় গত দু-তিন বছরে তৈরি হয়েছে। এই রেলপথ তৈরির জন্য বিভিন্ন চা বাগান থেকে প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিককে লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে নিয়ে এসে দিনরাত খাটানো হয়েছিল। তাদের মুখে রক্ত তোলা খাটুনিতে লিডো, ডিমাপুর আর টামো-কে এই রেলপথের মাধ্যমে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে আমেরিকান বাহিনীর চিনকে রসদ সরবরাহ অনেক সহজ হয়ে গেছে এই রেলপথের জন্য।

বিমান উড়ে চলেছে। ডিব্রুগড়ের কাছে ছাবুয়া আর মার্ঘেরিটার জঙ্গলের বিমানঘাঁটি পেরিয়ে একসময় লিডোর আমেরিকান ছাউনি দেখা গেল। অনেকগুলো বোমারু বিমান দেখা গেল। সবুজ রং করে তাদের সাধ্যমতো ক্যামোফ্লেজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া দেখা যাচ্ছে 'ককুদ পাহাড়' হাম্প শিখর। ষাঁড়ের পিঠের কুঁজের মতো দেখতে বলে এই নাম। স্টিলউইলের বিমানগুলোকে এই ককুদ পাহাড় পেরিয়ে চিনে যেতে হয়।

এবার মোড় ঘুরে উলটো রাস্তায় ডিমাপুরের দিকে চলল বিমান। লোকালয়ের বাইরে অনেকগুলো গুদামের সারি দেখতে পাওয়া গেল। স্কুন্স জানালেন, এগারো কিলোমিটার জুড়ে এই সব গুদামে রসদ ভরতি করে রাখা হয়েছে। যুদ্ধ যতই দীর্ঘস্থায়ী হোক, রসদের অভাব হবে না।

ডিমাপুর থেকে প্রায় চব্বিশ মাইল দূরে আবার উঁচু উঁচু পাহাড়ের দেখা পাওয়া গেল। ওরই মধ্যে একটু নিচু একটা পাহাড়ের ওপর একটা জনবসতি দেখতে পাওয়া গেল। ওটাই কোহিমা শহর।

স্লিম বললেন, 'ডিকি আপনার কি মনে হয় যে জাপানিরা এইসব পাহাড় পেরিয়ে আসতে পারবে?'

জন বল্ডউইন রসিকতা করে বললেন, 'তাদের আসতেই হবে। তারা এসে সুভাষ বোসকে ডিমাপুরে ট্রেনে তুলে দেবে দিল্লি যাবার জন্য।' বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলেন। কিন্তু তার পরেই ডিকি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'সুভাষ বোসের আই এন এ কে আমরা ফার্স বলে মনে করলেও, সতর্ক না হলে ওই ফার্স আমাদের "ফাঁস"ও হয়ে উঠতে পারে। আমি "হুজ হু"-তে সুভাষের জীবনী খুঁটিয়ে পড়েছি। ভারতের জনমানসে তার প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। লন্ডন থেকে রওনা হওয়ার আগে স্বয়ং চার্চিল আমাকে বলেছেন, 'ডোন্ট আন্ডার এস্টিমেট সুভাষ বোস। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো এখন সুভাষকে মাথায় তুলেছেন। তার পরিকল্পনাতে জাপান যদি উপযুক্ত সাহায্য দেয়, ভাগ্যবলে বোস যদি একবার ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে বাংলার সীমান্তে পৌঁছতে পারে তা হলে আমাদের ফিরতি বিমানেই লন্ডন পালাতে হবে।'

স্লিম বললেন, 'বোস যে জাপানকে কী যাদু করেছে বোঝা ভার। আমরা যতই তাকে কুইসলিং, বেইমান বলে গালাগালি দিই না কেন জাপানের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ওরা বোসকে একটা ব্যক্তি হিসাবে নয়, একটা রাষ্ট্র হিসাবে সম্মান করে।'

মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'বোসের খবর যাতে আমাদের সৈন্যদের কাছে না পৌঁছয় তার দিকে সবরকম নজর দিতে হবে। আইনি বা বেআইনি সব রকম উপায়ে খবরগুলো ধামাচাপা দিতে হবে। যেন এরকম কিছু হয়ইনি।'

কোহিমা থেকে ইম্ফল পর্যন্ত একটা পাহাড়ের রেখা চলে গেছে। এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে ব্রিটিশ ফৌজ সম্প্রতি একটা রাস্তা তৈরি করেছে কোহিমার সঙ্গে ইম্ফলের সমতলকে যোগ

করে। কোহিমা থেকে ইম্ফল প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। এবার দেখা গেল ইম্ফলের সমতলভূমি। বর্মা আর হিমালয়ের পূর্ব-পার্বত্য এলাকা। এই চল্লিশ মাইল লম্বা আর কুড়ি মাইল চওড়া জায়গাটাই একমাত্র বিস্তৃত সমতলভূমি।

ইম্ফল আর ইম্ফল থেকে পঁচিশ মাইল দূরে পালেলের বিমানবন্দর দুটি এ অঞ্চলের সারা বছর সব ঋতুতে ব্যবহারোপযোগী বিমানবন্দর। সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইম্ফলের সমতলভূমি চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পূর্বদিকে ঝোবু পাহাড় প্রায় চার-পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। কিন্তু দক্ষিণের চিনি পাহাড়ের ওপর শত্রুপক্ষ হালকা কামান চেষ্টা করলে বসাতে পারে। দেখে মাউন্টব্যাটেনের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

বিমান এসে ইম্ফলে নামল। সাউথ ইস্ট এশিয়ার কম্যান্ডার-ইন-চিফের আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন সেসব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার এড়িয়ে খোলা জিপে স্লিমের সঙ্গে চতুর্থ কোর বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের দিকে রওনা দিলেন। এখানে বর্ষাও যেমন প্রচণ্ড, গরমও তেমনি। সবে শীত শেষ হয়েছে। এর মধ্যেই মাটিতে ফাটল দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় অনেক লোক হাত তুলে ডিকিকে স্বাগত জানাচ্ছে। রেঙ্গুন-মান্দালয় এলাকা থেকে জাপানিদের আক্রমণের সময় ষাট-সত্তর হাজার লোক ইম্ফলে এসেছে। এর আগে জাপানের জিরো বিমানগুলোর হামলার চিহ্ন এখনও চারদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ইম্ফল অঞ্চলে যুদ্ধের প্রস্তুতি জোর কদমে চলেছে। রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে রানওয়ে। হাজার হাজার মজুর কাজ করছে। গড়ে তোলা হচ্ছে অস্ত্রাগার। নগ্নগাত্র, বুভুক্ষু নাগা স্ত্রীপুরুষরা অবাক চোখে দেখে এসব প্রস্তুতি। কীসের জন্য যুদ্ধ, কেন এত হইচই বুঝতে পারে না তারা।

লোকবসতি অঞ্চল থেকে একটু দূরে স্কুন্স তাঁর মুখ্য কার্যালয় তৈরি করেছেন। এ অঞ্চলে অঢেল বাঁশ পাওয়া যায়। সেই বাঁশ দিয়েই তৈরি হয়েছে ক্যাম্প, কুটির, হাসপাতাল, গুদাম এমনকী অস্ত্রাগার পর্যন্ত। বাঁশের তৈরি ঘরগুলোকে এ অঞ্চলে 'ভাশা' বলে। চারদিকে অনেক 'ভাশা'। তা ছাড়া বিমান আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য সর্বত্র অনেক ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে।

বাঁশের একটা বড়সড় ছাউনির মধ্যে অফিসার্স ক্যান্টিনে কম্যান্ডার-ইন-চিফের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়ার সময় মাউন্টব্যাটেন স্কুন্সকে বললেন, 'দু' বছর আগে জাপানের তেত্রিশ নম্বর বাহিনীর হাতে আপনাদের ফৌজ প্রচণ্ড মার খেয়েছিল।'

'তখন কম্যান্ডার আমি ছিলাম না স্যার।' সদম্ভে মনে করিয়ে দিলেন স্কুন্স।

'লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে এবারও সেই ত্রয়োত্রিংশ রেজিমেন্টই ইম্ফল অভিযানে আসবে। পুরনো মারের বদলা নেবার সুযোগ এবার আপনাদের সামনে।

মণিপুর অঞ্চলের মানচিত্র টেবিলে বিছানো হয়েছে। ডানদিকে টিড্ডিমের কাছে চিনি পাহাড়ে ব্রিটিশের সপ্তদশ রেজিমেন্ট ঘাঁটি গেড়েছে। বাঁদিকে পালেল আর টামু অঞ্চলে বিংশ রেজিমেন্টকে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই দুই ঘাঁটির মধ্যে আশি মাইল ঘনজঙ্গলে ভরা অঞ্চলের দিকে নির্দেশ করে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'এই জঙ্গল এলাকাটাই বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।'

'যেখান দিয়েই আক্রমণ আসুক স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে একটা রিজার্ভ ডিভিশন তৈরি রেখেছি আমি।' স্কুন্স জানালেন।

দু বছর আগেই পর্যুদস্ত হওয়া একটা সৈন্যবাহিনীর মনোবল বাড়ানোই মাউন্টব্যাটেনের প্রধান কাজ। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া আর এ অঞ্চলের প্রচণ্ড বর্ষা তার সামনে দুটি বিরাট সমস্যা।

সামরিক হাসপাতাল পরিদর্শন করে সৈন্যদের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। তা ছাড়াও ক্যাম্পে

ক্যাম্পে ঘুরে দেখলেন তিনি। জঙ্গলের যুদ্ধের আতঙ্কে ম্রিয়মাণ সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে তাদের সাহস দেন তিনি।

একটা 'ভাশা'র সামনে সৈন্যরা জড়ো হল। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক নেতাদের ধরনে তাদের সামনে ভাষণ দিলেন মাউন্টব্যাটেন।

'কাল পর্যন্ত খদ্দর পরে কংগ্রেসের মঞ্চে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল সেই আজ জাপানের কাছ থেকে ধার করা উর্দি পরে বিপ্লবের বুলি আওড়াচ্ছে। তার কথার ফাঁদে পড়বেন না আপনারা। একথা কখনওই ভাববেন না যে, জাপানিরা অজেয়। তাদের মতো অকেজো আর কাপুরুষ আর কোথাও নেই। আপনাদের সহায়তার জন্য অনেক প্যারাশুট বাহিনী তৈরি রেখেছি আমরা। প্রবল বর্ষার মধ্যেও তারা তাদের কাজ করতে পারবে। প্রয়োজন হলে ডিভিশন ডিভিশন সৈন্য বিমানে পৌঁছবার ব্যবস্থা আছে আমাদের। আপনারা জানেন আমি একজন নাবিক। আমার মতো একটা খালাসি এই পাহাড়ি জায়গায় কেন এসেছে সমুদ্র ছেড়ে? কারণ যে করেই হোক এ যুদ্ধ জিততেই হবে আমাদের।'

৪

প্রেম সেহগলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল নেতাজির। প্রেম জিজ্ঞেস করলেন, 'জাপান পরবর্তী পদক্ষেপ কবে নেবে নেতাজি?'

'এই মুহূর্তে এই রেঙ্গুনেই কাওয়াবের প্রধান কার্যালয়ে চূড়ান্ত আলোচনা চলছে। জাপান থেকে তোজোর দুজন স্টাফ অফিসার আলোচনার জন্য এসেছেন।' নেতাজি বললেন।

'তার মানে খুব শিগগিরই যুদ্ধ শুরু হবে?' সাগ্রহে বললেন প্রেম।

'কিছু বলা যাচ্ছে না। জাপান থেকে বর্মা প্রায় চার হাজার মাইল দূরে। অনেকগুলো দুস্তর বাধাও রয়েছে। টোকিয়োর প্রধান সামরিক কার্যালয়ের নীচেই আছে দক্ষিণ কম্যান্ড। তাদের কেন্দ্র ফিলিপাইনসের ম্যানিলায় ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির অধীনে। তাঁর নীচে বর্মা অঞ্চলের সমস্ত বাহিনীর দায়িত্ব জেনারেল কাওয়াবের ওপর, এই রেঙ্গুনে। তাঁর অধীনে আছেন উত্তর বর্মার পাহাড়ি অঞ্চলের মেমিয়োতে জেনারেল মুতাগুচি। রেঙ্গুন থেকে মেমিয়ো প্রায় সাড়ে চারশো মাইল দূর। এই সব বাস্তব অসুবিধেগুলোই আমার চিন্তার কারণ। অথচ এ সব সমস্যার কোনও সমাধানও নেই।'

পাহাড়প্রমাণ অন্তরায় সামনে। কিন্তু উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সে সব মানতে চায় না। পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, নদী সাগর পাড়ি দিয়ে মন উড়ে যেতে চায় দিল্লির পথে। যত শিগগির হয় অভিযান শুরু করার ইচ্ছে সুস্থির থাকতে দেয় না। হঠাৎ নেতাজি বলে ওঠেন, 'প্রেম, আমার মনে হয় এই ব্যাপারেই মুতাগুচি কাওয়াবের কাছে এসেছেন। আগামী অভিযানের দায়িত্ব মুতাগুচির। চল আমরা এখনই তাঁর কাছে যাই।'

ঘড়িতে তখন রাত দেড়টা। প্রেম আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এখন?'

'হ্যাঁ এখনই। দিন আর রাত্রির তফাত তো আমার কাছে কবেই ঘুচে গেছে।'

সমশের সিং জেগেই ছিল। ড্রাইভারকে ঘুম থেকে তুলে বোট ক্লাবের বিশাল বাড়িতে মুতাগুচির আস্তানার দিকে রওনা হলেন সবাই। মুতাগুচির কামরায় তখনও আলো জ্বলছে। এত রাতে চন্দ্রা বোস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শুনে আশ্চর্য হলেও সাদরেই স্বাগত জানালেন মুতাগুচি। হেসে বললেন, 'আসুন আসুন— আমার মতো আপনারও ঘুম আসছে না মনে হচ্ছে।'

টেবিলে বিশাল সামরিক মানচিত্র। তার দিকে তাকিয়ে মুতাগুচি বললেন, 'ইম্পারু, ইম্পারু। কিন্তু আপনি আর আমি ছাড়া এই ব্যাপারে আর কারও আগ্রহ আছে বলে মনে হচ্ছে না।' খানিকটা যেন হতাশা তাঁর গলায়। 'ওদিকে আমার স্টাফ অফিসাররা রাত জেগে পরিকল্পনা করছে, আর এদিকে এদের সবাই এক পোঁ ধরে বসে আছেন। "ইম্পারু অভিযানের নামে মুতাগুচি জুয়ো খেলতে চাইছে। ওটা একটা পাগল"।'

'এরকম বলার কারণ?'

'কারণ মাঝখানের কাবোয়ার সংকীর্ণ উপত্যকা। বর্মি ভাষায় কাবোয়া মানে মৃত্যুর উপত্যকা। পাশে ভয়ংকর চিনি পাহাড়, বর্ষার ভয়ংকর চিন্দুইন, ইরাবতী আর সালুয়িনের মতো নদী, মানুষ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রবল বর্ষা। কিন্তু আমি এসব কোনও কিছুতেই ঘাবড়াই না। আমি চাই ইতিহাস সৃষ্টি করতে। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে দেখিয়ে দিতে চাই আমি।'

'আপনার পরিকল্পনার মূল রূপরেখাটা কী?'

'বর্মা সীমান্তে একটা প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করা, আমেরিকার চিনকে সাহায্য করার রাস্তা বন্ধ করা আর আপনাদের শুভেচ্ছার সঙ্গে দিল্লির পথে রওনা করে দেওয়া। আমি বলছি চন্দ্রা বোসজি, সে দিন আর বেশি দূরে নেই। আমি আপনাদের ইম্পারুর সমতলভূমিতে পৌঁছে দেবই।'

নেতাজির চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল মুতাগুচির কথায়। 'জেনারেল, একবার যদি সেদিন আসে, একবার যদি ইম্ফলে আমি পা রাখতে পারি সারা ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে। এর জন্য আমি আমার একশোজন সহকারীকে ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে আগেই পাঠিয়েছি।'

'আপাতত আমাদের অপারেশন "ইউ" অনুসারে ইম্ফল পর্যন্ত যাব। সেই সঙ্গে লিডো আর ডিমাপুরও দখল করার ইচ্ছে আছে আমার। কিন্তু আমার পরিকল্পনা অন্যদের সায় পাচ্ছে না। দেখা যাক কি হয়। আমি আশা ছাড়িনি।' মুতাগুচি জোর দিয়ে বললেন।

'আপনার প্রস্তুতি ঠিকমতো চলছে তো।'

'আলবত। মেমিয়োতেই আমার দুই ডিভিশনের চল্লিশ হাজার সৈন্য রয়েছে। শুধু একটাই অসুবিধে।'

'কী?'

'পঞ্চদশ বাহিনী এখনও পৌঁছয়নি। ব্যাংকক থেকে পায়ে হেঁটে আসছে তারা। এসে পড়বে ঠিকই।'

মুতাগুচির কাছ থেকে নেতাজি যখন বিদায় নিলেন, বাইরে তখন ফরসা হয়ে এসেছে।

ইম্ফল অভিযান অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে বেশির ভাগ জাপানিই মনে করে। এদের মন বদলানোই নেতাজির প্রধান কাজ হয়ে উঠল। অবশেষে কাওয়াবেরও মন গলল।

২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৩। আয়াবি আর নাকার উপস্থিতিতে কাওয়াবে ইম্ফল অভিযানের পরিকল্পনায় স্বাক্ষর করলেন। তিনদিন পরে সেটা নিয়ে আয়াবি পৌঁছলেন ম্যানিলায় দক্ষিণ কম্যান্ডের সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির কাছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিকল্পনাটা দেখলেন তিনি। তাঁর বার্ধক্যের বলিরেখাগুলো গভীর হয়ে উঠল পরতে পরতে। অবশেষে কাঁপা কাঁপা হাতে সই করে আয়াবিকে দিয়ে বললেন, 'ময়দানের সেনাপতিরা যখন মনে করছেন আমরা জিতবই, তখন আমার আক্ষেপ করে আর কি হবে?'

প্রধানমন্ত্রী তোজোর বাসস্থানের পরিস্থিতি অত্যন্ত থমথমে। নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনও অতিথি বা কাজ এলে তিনি ঘর থেকে বেরোন, নয়তো নিজের ঘরেই থাকেন।

টেবিলের ওপর একটা বিশাল মানচিত্র অসংখ্য ছোট ছোট পতাকায় চিহ্ন লাগিয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি বোঝানো আছে। একসময় জাপানের সবাই বিশ্বাস করত জার্মানি বিজয়ী হবে আর ব্রিটিশ এবং ফরাসি উপনিবেশগুলো দখল করে নেবে। আমেরিকার আগ্রহ চিনের ওপর। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে আমেরিকার দাপট জাপানের সহ্য হত না। খিটিমিটি লেগেই ছিল। অনেকবার আপসের ব্যর্থ চেষ্টার পর ১৯৪১-এর ৮ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বোঝাপড়ার জন্য একটা চূড়ান্ত পত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। পার্ল হারবার আক্রমণ করার জন্য জাপানি ডেস্ট্রয়ার তখন বেরিয়ে গেছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল পুরোদমে।

পার্ল হারবারে জয়লাভ করে জাপানি নৌবাহিনীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা হু হু করে বেড়ে গেল। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার দ্বীপগুলো দখল করার জন্য লোলুপ হয়ে উঠল তারা। কিন্তু পরিস্থিতি আস্তে আস্তে বদলাল। আমেরিকার ডেস্ট্রয়ারগুলো জাপানের অনেকগুলো জাহাজ সম্প্রতি ডুবিয়ে দিয়েছে। তোজো প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। তাঁকে দেখে মনে হয় দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তাঁর। শরীর ক্লান্তিতে আর বইতে চাইছে না।

এ ডি সি কাছে এসে চারবার ডাকার পর তন্দ্রা ভাঙল তাঁর। তন্দ্রা ভেঙেই তোজো জিজ্ঞেস করলেন, 'রেঙ্গুন থেকে কেউ এসেছে?'

'না তো।'

'আমি শুধু তার জন্যই অপেক্ষা করছি। আর কিছুই শুনতে চাই না আমি।' তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই বললেন, 'প্রশান্ত মহাসাগরে কোথাও যে আমরা সফল হব সেটা আজ আর মনে হচ্ছে না। আমার একমাত্র আশা ভারত সীমান্তে— ইম্ফলে। একটা গৌরবোজ্জ্বল জয়, একটা প্রচণ্ড সাফল্য একান্ত প্রয়োজন।'

রাত তখন নটা জেনারেল হিডেকি তোজো তাঁর সুসজ্জিত বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। সারাদিনের পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তায় অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে তাঁর। গা থেকে কিমোনো খুলে গরমজল ভরতি টবের মধ্যে গা এলিয়ে দিলেন তিনি। আঃ শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনও যেন জুড়িয়ে গেল। বাইরের জগতের সমস্ত দুশ্চিন্তা ওই কিমোনোটার মতোই খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখা আছে। ইচ্ছে করছে এই কবোষ্ণ জলেই পড়ে থাকতে।

শাওয়ারের আওয়াজে আর কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ মনে হল দরজার ওপরে লাগানো মোটা ঘষা কাচের ওপার থেকে যেন আওয়াজ আসছে। শাওয়ারটা কম করে দিলেন তোজো।

'কে?'

'আমি। কর্নেল নিশিরুবা। প্রধান কার্যালয় থেকে আসছি।'

'এত তাড়া কীসের?'

'রেঙ্গুন থেকে অফিসাররা এসে পৌঁছেছেন। ইম্ফল সম্পর্কে খবর এনেছেন তাঁরা।'

'একটু অপেক্ষা কর।'

তোজো অঞ্জলি ভরে গরমজল তুলে মুখে জলের ঝাপটা দিলেন। তারপর সেখান থেকেই ডাক দিলেন কর্নেল নিশিরুবাকে। বললেন পাশের ড্রেসিংরুমে আসতে। তোজো বাথরুমে। কর্নেল ড্রেসিংরুম থেকে শুধু তাঁর মুখটা দেখতে পাচ্ছেন। সেখান থেকেই একটা সরু জানলা দিয়ে একের পর এক প্রশ্নবাণ ছুড়ে দিচ্ছেন তোজো।

'রসদ সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা আছে কি?'

'মুতাগুচির পরিকল্পনায় কোথাও ভুল নেই তো?'

'আমাদের সবচেয়ে দুর্বল বিমানবাহিনী ব্রহ্মদেশে রয়েছে। শত্রুর বিমানবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী। তাদের মোকাবিলার জন্যে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?'

'ইম্ফলের সমতলভূমিতে পৌঁছনোর পর রসদ সরবরাহ কি বাড়াতে হবে?'

'আমাদের সেনাবাহিনী যদি ভারতবর্ষের সীমানায় থাকে তা হলে ব্রহ্মদেশের রক্ষণ ব্যবস্থায় কি শৈথিল্য আসবে?'

'যদি ব্রিটেন আর আমেরিকা দক্ষিণ ব্রহ্মের ওপর সাগরের পথে আক্রমণ চালায় তবে তার মোকাবিলা করার জন্য কিছু ভাবা হয়েছে কি?'

কাচের জানলা দিয়ে বাথরুম থেকে গরমজলের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। তোজোর হাতে কোনও নোটস-টোটস কিছু থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তবু একের পর এক প্রশ্নগুলো বর্ষিত হচ্ছে। প্রশ্নের বন্যায় কর্নেল নিশিরুবা হতভম্ব।

'কোণের ফোনটা তুলে প্রধান কার্যালয়ে এই সমস্ত প্রশ্নগুলো কর। তারপর আবার আমার সঙ্গে কথা বল।' তোজো ভেতর থেকেই চিৎকার করে বললেন। আবার শাওয়ারের আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু পরে বাইরে থেকে কর্নেল চেঁচিয়ে বললেন, 'চিন্তার কোনও কারণ নেই। সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে।'

এইবার আবার বাথটবে নেমে পড়লেন তোজো। মনের সুখে স্নান করে কিমোনো গায়ে দিয়ে একটু একটু ভিজে গায়ে ড্রেসিংরুমের মধ্যে এলেন। তারপর বাইরে এসে ইম্ফল অভিযান আদেশ ক্রমাংক ১৭৭৬ ভাল করে পড়ে বেশ সযত্নে স্বাক্ষর করলেন। তারপর তারিখ বসালেন ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৩।

বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে আছেন তোজো অত গরমজলে স্নান করার ফলে অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে তাঁর। পাশে বসে রুমাল দিয়ে সে ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছেন তোজোর স্ত্রী। শ্রান্ত ক্লান্ত স্বামীর দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে আছেন তিনি। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বিষণ্নভাবে হাসলেন তোজো। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভবিষ্যতে কী হবে ভবিষ্যৎই জানে। কার সময় ঘনিয়ে আসছে? আমার? আমার ক্ষমতার, জাপানি সামরিক শক্তির না আমাদের সবার? নাকি অন্ত নয়— নতুন সূর্যোদয়? আমারও, চন্দ্রা বোসেরও। যা হবার হোক। চন্দ্রা বোসকে সঙ্গে নিয়ে যদি আত্মহত্যা করতে হয় তাও মেনে নেব আমি। যাই ঘটুক, আমি তৈরি।'

৫

নেতাজির সম্মানে মেমিয়োতে মুতাগুচির প্রধান কার্যালয়ে একটা ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। মুতাগুচির অধীনে তিনটি ডিভিশনের কোর কম্যান্ডাররাও উপস্থিত আছেন সেখানে। দুদিন আগেই জাপানি ফৌজ রওনা হয়ে গেছে। অভিযানের সমস্ত কিছুর ওপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিতে চান মুতাগুচি।

মেমিয়োতে ভালই ঠান্ডা পড়ে। সন্ধের পর তো আরও বেশি। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে জাপানি সৈনিকরা আগুন পোয়ায়। ভারতের সিমলার মতো বর্মার মেমিয়ো এখানকার গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। মে নামে এক ইংরেজ মান্দালয় থেকে ত্রিশ মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর এই শহরটা প্রথম গড়ে তোলেন। তারপর একসময় এটা হয় বর্মার গভর্নরের গ্রীষ্মকালীন আস্তানা। আগেকার গভর্নর প্রাসাদেই এখন মুতাগুচির প্রধান কার্যালয়।

ভোজসভায় সেনাপতি, অফিসার আর অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে পৌঁছচ্ছেন। কিছুটা দূরে কন্ডোজি লেক। প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কি যুদ্ধবন্দিদের দিয়ে ব্রিটিশরা এই লেকটা খুঁড়িয়ে ছিল। এই লেকের পাশেই দুশো একর জমিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের ছাউনি পড়েছে। মেমিয়ো রেঙ্গুনের তুলনায় ভারতের অনেক কাছে বলে নেতাজি তাঁর অ্যাডভান্স হেড কোয়ার্টার মেমিয়োতে সরিয়ে এনেছেন। অন্যদের সঙ্গে ঝাঁসির রানি বাহিনীকেও আনা হয়েছে এখানে।

চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় অপরূপ দেখাচ্ছে মেমিয়ো শহর। ইম্ফল অভিযানে নেতাজি আর মুতাগুচির সমান আগ্রহ। টেবিলের ওপর বিশাল ম্যাপ। মুতাগুচি বললেন, 'বিশ হাজার করে সৈন্যের তিনটি ডিভিশন এই মুহূর্তে ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছে। এদের বীরত্বের আর সাফল্যের ওপরই আপনার আর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।'

'একসঙ্গে ইম্ফল আর কোহিমার দিকে আপনার অভিযানের পরিকল্পনাটা খুব ভাল হয়েছে।' তারিফ করলেন নেতাজি।

'নিশ্চয়। জেনারেল সাতোর ৩১ নম্বর ডিভিশন পাহাড় ডিঙিয়ে কোহিমার দিকে যাবে। ইম্ফলের দিকে যাবে দুটি ডিভিশন। জেনারেল ইয়ামায়ুচির নেতৃত্বে ১৫ নম্বর ডিভিশন যাবে উখরুলের রাস্তায় আর টিড্ডিমের পথে যাবে জেনারেল ইয়ানাগিডার নেতৃত্বে ৩৩ নম্বর ডিভিশন। দু'দিক থেকে সাঁড়াশির মতো ইম্ফলের ওপর আক্রমণ করবে তারা। ইতিমধ্যে কোহিমা থেকে ইম্ফলের দিকে রওনা হবে ৩১ নম্বর ডিভিশন।'

নেতাজিকে একটু চিন্তিত দেখাল। মুতাগুচি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথাও ভুল হচ্ছে কী?'

'আসলে আমি চাই আমাদের জেনারেল কিয়ানির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের এক নম্বর ডিভিশন লড়াইয়ে পুরোপুরি অংশ নিক।'

'নিশ্চয়। জেনারেল কিয়ানিকে আমরা পাঠাচ্ছি মোরে-বিশানপুরের দিকে। আপনাদের শাহনওয়াজ লড়বেন হাকা-ফালমে। নীচের দিকে আরাকানে লড়বেন কর্নেল মিশ্র। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। জাপান তার কথার খেলাপ করবে না।'

'জেনারেল আমি চাই আমাদের ফৌজ আরও বেশি করে অংশ নিক। মালয়েশিয়ায় ইপো, পেনাং, সিঙ্গাপুরে সমানে সৈন্য ভরতি হচ্ছে। আরও দুটি ডিভিশন পাঠাতে চাই আমি।'

'তার দরকার কি? হপ্তা তিনেকের মধ্যেই আমরা ইম্ফলের যুদ্ধে জিতে যাব।' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন মুতাগুচি।

'বলা কি যায়? মাতৃভূমির জন্য আরও রক্তের দরকার হলে তাতে যেন কম না পড়ে। আমার সৈন্যেরা মাতৃভূমির জন্য রক্ত দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।'

ইম্ফল অভিযানের জন্য মুতাগুচি একটা বিশেষ 'প্রাণী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' গড়ে তুলেছেন। অভিনব এই কেন্দ্রের কাজ দুর্গম রাস্তায়, যেখানে গাড়ি যাবে না সেখানে সাজসরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারবাহী পশুদের ট্রেনিং দেওয়া। এই কেন্দ্রের কাজে, প্রাথমিক কি কি অসুবিধে হয়েছিল, জানতে চাইলেন নেতাজি।

'গোড়ায় অসুবিধের কথা আর বলবেন না। তিন মাস ধরে হাজার কয়েক ঘোড়া, খচ্চরকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলতে শেখানো কি চাট্টিখানি কথা? কিন্তু এখন তারা এমন ট্রেনিং পেয়েছে যে হাওয়ার বেগে কোহিমা পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় পৌঁছে যাবে।'

তিন সপ্তাহের মধ্যেই ইম্ফলের যুদ্ধে জিতবেন বলে মুতাগুচির দৃঢ় বিশ্বাস। সবার সামনে খোলাখুলি তিনি বললেন, 'ইম্ফলের যুদ্ধে দুটি ব্যাপার আমাকে এত আগ্রহী করে তুলেছে। এক নম্বর উইনগেটের গা জ্বালানো ঠাট্টা আর দ্বিতীয় চন্দ্রা বোসের অতুলনীয় দেশপ্রেম।'

ইতিমধ্যেই নেতাজি আর মুতাগুচির চারপাশে অনেক সিনিয়র অফিসার জড়ো হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য করে মুতাগুচি বললেন, 'আমার রণনীতির মূল কথা স্পিড— দুরন্ত গতি। আমি চাই আমার তিনটে ডিভিশন এক মাসের মধ্যে ইম্ফল পৌঁছে যাবে। সেটা সম্ভব হবে তখনই যখন আপনারা নিজেরা জ্বলে, শত্রু এলাকা জ্বালিয়ে দাবানলের মতো এগিয়ে যাবেন। আমার পরিকল্পনা হচ্ছে হালকা অস্ত্রের সাহায্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে লড়াই ফতে করা।'

এর আগে 'চিন-জাপান' যুদ্ধ আর সিঙ্গাপুরের পতনের যুদ্ধের নায়ক ছিলেন মুতাগুচি। তাঁর এই তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ অভিযানও ইতিহাস সৃষ্টি করবে বলেই তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। 'এই অভিযানের ফলেই আসবে ভারতের স্বাধীনতা আর উদিত হবে জাপানের সৌভাগ্য সূর্য। সবাইকেই বলেন তিনি।'

একটু স্থূল হলেও বেঢপ নয় মুতাগুচির শরীর। খুব টিপিক্যাল মঙ্গোলীয় মুখ। সযত্নে ছাঁটা মানানসই গোঁফ। গলাবন্ধ সামরিক কোটের ডান দিকে অনেক পদক ঝকমক করছে। সামরিক মহলে একগুঁয়ে আর জেদি বলে তাঁর পরিচিতি।

'জেনারেল শুনেছি, একসময় আপনি ইম্ফল অভিযানের কট্টর বিরোধী ছিলেন!'

'সত্যি কথা বলব?' গেলাসে আর এক চুমুক দিয়ে মুতাগুচি বললেন, 'পাগলের মতো ভুল করেছি তখন। সিঙ্গাপুর আর রেঙ্গুনের মতো শহর ছেড়ে ইংরেজ যখন পালাল, সেই সময়ই ইম্ফলের দিকে এগোনো উচিত ছিল আমাদের।'

পরিস্থিতি যে দারুণভাবে বদলে গেছে সেটা ভালভাবেই জানেন মুতাগুচি। চিনের রাস্তায় স্টিলওয়েল ঘাঁটি গেড়েছেন। বর্মা পুনরাধিকার করার অদম্য ইচ্ছে নিয়ে স্লিম তৈরি হচ্ছেন। মাউন্টব্যাটেন আহত বাঘের মতো হিংস্র আক্রোশে ফুঁসছেন। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অবস্থা দারুণ অনিশ্চিত। এই মুহূর্তে মুতাগুচি যদি 'ইম্পারু'তে জাপানের পতাকা ওড়াতে পারেন তবে আবার সব কিছু পালটে যাবে।

মুতাগুচির বক্তৃতায় খুব হাততালি পড়ছে। তারই মধ্যে এককোনায় মদের গেলাস নিয়ে বসে আছেন সাতো আর ইয়ানাগিডা। তেরছা নজরে মুতাগুচির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'স্বপ্নে পোলাও খাওয়া হচ্ছে! খালি স্বপ্ন দেখা! দিবা স্বপ্ন! ফৌজ খতম হয়ে যাবে।'

ওদিকে নাকা প্রশ্ন করলেন, 'স্যার, মাত্র তিন সপ্তাহের রসদ নিয়ে রওনা হওয়াটা কি বাস্তব বুদ্ধিসম্মত হবে?'

'ঝটপট লড়াই ফতে করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।' মুতাগুচি বললেন। 'আমি আপনাদের বলছি, জাপানি ফৌজের কাছে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।'

সাতো দেখছেন মুতাগুচিকে। তাঁদের দুজনের মধ্যে অনেকদিনের রেষারেষি, আড়াআড়ি আছে। ১৯৩০ সালে জাপানি সৈন্যদের মধ্যে দুটো দল ছিল। একদল সম্রাটকে দেবতা বলে ভাবত। মুতাগুচি, তোজোদের এই দলকে বলা হত 'কোদো— হা'। এই উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর বিরোধী ছিল 'তোজে হি— হা' গোষ্ঠী। সাতো, ইয়ামায়ুচি প্রভৃতি অফিসারদের এই গোষ্ঠী ছিল জাপানের পুঁজিপতিদের কাছের লোক আর রাশিয়ার ধামাধরা। বছর আষ্টেক আগে 'কোদো— হা' গোষ্ঠীর অফিসাররা বিদ্রোহ করে অনেক অফিসারকে খুন করে। এদের সামলাতে স্বয়ং সম্রাটেরও সমস্যা হয়েছিল। সেই উগ্রবাদীরাই আজ ক্ষমতা পেয়েছেন। সাতো ভালভাবেই জানতেন যে একসময় মুতাগুচি কীভাবে তার ওপর নজর রাখতেন।

জাপানি হলেও সাতোর চেহারা চিনে ধাঁচের। বাহান্ন বছর বয়সে অনেক দেখেছেন সাতো।

ফৌজে এক সমর্থ সেনানায়ক বলে সুনাম আছে তাঁর। মাঞ্চুরিয়া অভিযানে তেইশ নম্বর ডিভিশনের সেনাপতি হিসেবে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। কিন্তু মুতাগুচির সঙ্গে বনে না তাঁর।

ভাজা মাংসের একটা টুকরো মুখে দিয়ে সাতো বললেন, 'ইয়ামায়ুচি, মুতাগুচি তাঁর স্বপ্ন সফল করার জন্যে আমাদের ফৌজকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে, আমি সেটা হতে দেব না।'

ইয়ামাউচি বললেন, 'কিন্তু ইম্ফলে জিতলে তো আমাদের রাষ্ট্রের জয় হবে সেটা।'

'হুঁ।' সাতো চোখ কুঁচকোলেন।

এই সময়ে সাতোর সঙ্গীদের কাছে এলেন স্টাফ অফিসার ওবেন। মাইফেল বেশ জমে উঠল। এত হাসি কীসের দেখার জন্য মুতাগুচিও এলেন সেখানে। ইয়ামায়ুচিকে মুতাগুচি বললেন, 'একটা কথা ভুলবেন না। গরমকাল শেষ হয়ে বর্ষা শুরু হবার আগেই আমাদের কোহিমায় পৌঁছতে হবে। আমাদের মহান সম্রাটের জন্মদিন ২৯ এপ্রিল আমি ইম্ফল বিজয়ের খবর তাকে উপঢৌকন দিতে চাই।' আত্মবিশ্বাসে ঝলমল করছেন মুতাগুচি।

ওবেনের বেশ নেশা চড়েছে। নেশার ঝোঁকে আত্মবিস্মৃতি ওবেন হঠাৎ বললেন, 'আজ পর্যন্ত পূর্ব দিকে কেউ ভারতের ওপর অভিযান করেছে কি? জিজ্ঞেস করুন না চন্দ্রা বোসকে।'

'তাই তো আমার এই দুঃসাহসী অভিযান—'

মুতাগুচি শেষ করার আগেই ওবেন বলে উঠলেন, 'স্রেফ মূর্খামি!'

ওবেনের কথায় চমকে উঠলেন সবাই। ইয়ানাগিডা আর ইয়ামায়ুচি আড়চোখে একে অপরকে দেখছেন। নেতাজি থতমতভাবে মুতাগুচির দিকে চেয়ে আছেন। ভারতীয় নেতার উপস্থিতিতে অধীনস্থ অফিসারের এরকম বেয়াদবিতে রেগে আগুন হয়ে গেছেন মুতাগুচি। ওবেন একটুও না দমে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'কম্যান্ডার মুতাগুচি, যা সত্যি তা বলতে ভয় পাই না আমি।'

'আবোল তাবোল বোলো না ওবেন। আমার কাছে পাকা খবর আছে। ইম্ফলে বিরাট পরিমাণ খাদ্যশস্য জমা করা হয়েছে। সে খাবারে আমাদের ফৌজের ছয় মাস ভালভাবে চলে যাবে। চার্চিল আমাদের রসদের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।' পরিস্থিতিটা রসিকতা করে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন মুতাগুচি।

'জেনারেল সাহেব, আগে নিজের জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে তাকান তারপর অন্যের ঘরে খাটিয়া পাতার খোয়াব দেখবেন।' ওবেন আবার বললেন।

ভোজসভার সব আনন্দ উধাও। একজন সামান্য অফিসারের এত স্পর্ধা। মুতাগুচি রেগে লাল হয়ে গেছেন। 'প্রাণ থাকতে আমার সৈন্যবাহিনীতে এ রকম বেয়াদবি সহ্য করব না আমি। ওবেন তোমার মতো লোক তো আস্তিনের সাপ।'

'জেনারেল, একটু শান্ত হন।' নেতাজি মুতাগুচিকে সামলানোর চেষ্টা করেন। সেদিকে একটুও নজর না দিয়ে মুতাগুচি তক্ষুনি স্টেনোগ্রাফার ডাকিয়ে সেখানেই ডিকটেশন দিতে শুরু করলেন।

'জাপানের মহান সম্রাটের দেওয়া অধিকার বলে, আমি, জেনারেল মুতাগুচি এই মুহূর্তেই স্টাফ অফিসার ওবেনকে আমাদের বাহিনী থেকে বরখাস্ত করার আদেশ দিচ্ছি।'

সবাই নিশ্চুপ। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা উচিত মনে হল না নেতাজির। ভোজসভা ছেড়ে রওনা দিলেন তিনি। ইয়ানাগিডা আর সাতোর মুখ অন্ধকার। কালো মুখ করে ওবেন চলে গেলেন।

মুতাগুচি প্রচণ্ড অস্থির। নিজের বাহিনীর অনেকের মনে যে এ ধরনের মনোভাব রয়েছে সেটা এই প্রথম বুঝলেন তিনি। অভিযানের শুরুতেই যদি এরকম হয় তবে পরে কী হবে?

খাবারের পাত্রগুলো সরিয়ে নিয়ে বড় টেবিলে ম্যাপ বিছোনো হল ইম্ফল আর কোহিমার দিকে দুটো লাল ফিতে দিয়ে চিহ্নিত করলেন মুতাগুচি। ম্যাপের নদী, পাহাড়, অরণ্যে ঘেরা এলাকার দিকে তাকিয়ে বললেন। 'ইম্ফল আর কোহিমার দিকে একসঙ্গে অভিযানের কথা অনেক ভেবেই ঠিক করেছি আমি! লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাতো, ভগবানের ইচ্ছেয় কোহিমার পতন যদি তাড়াতাড়ি হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে ডিমাপুরের দিকে এগোবেন আপনি।'

'ডিমাপুর? ডিমাপুরটা কোথায়?'

সাতোর কথায় আবার রাগের পারা চড়ল মুতাগুচির। 'আমাকে কি বিশ্বাস করতে হবে যে আপনার মতো একজন দক্ষ জেনারেল ভাল করে মানচিত্র দেখেননি? এই দেখুন কোহিমা থেকে ৩০-৪০ মাইল দূরে রয়েছে ডিমাপুর— ব্রিটিশদের শেষ বড় রেল স্টেশন। আমার বিশ্বাস এইখানেই ব্রিটিশদের রসদের প্রধান ভাণ্ডার।'

'অর্থাৎ এ সম্পর্কে পাকা খবর কিছু পাওয়া যায়নি?' সাতো বললেন।

'জেনারেল সাহেব, উদ্যোগী পুরুষ চেষ্টা করেই সফল হতে পারেন। এতে লাভ বই লোকসান নেই।'

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। সকালেই তিন সেনাপতি অভিযান শুরু করবেন। মুতাগুচি বিদায়ী সম্ভাষণের জন্য সাতোর হাত ধরলেন। 'তা হলে জেনারেল সাতো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোহিমা পাহাড়ে বিজয়পতাকা উড়িয়ে আপনি ইম্ফলের দিকে রওনা হবেন। মনে রাখবেন ২৯ এপ্রিল ইম্ফলে আমরা দুজনে সম্রাটের জন্মজয়ন্তীর উৎসব পালন করব।'

'আমার দায়িত্ব আমি পালন করব।' সাতো বললেন বটে, কিন্তু তাঁর হাত দারুণ ঠান্ডা। মুতাগুচি বললেন, 'নিজেদের স্বপ্ন সার্থক করে তুলতে মরণেও সুখ আছে, জেনারেল সাতো।'

'কিন্তু অকারণে মরার কী সার্থকতা আছে?' সাতোর মুখ থেকে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে এল। এবার ভাল করে সাতোর মুখের দিকে তাকালেন মুতাগুচি। সাতোর মুখে মনের ভাব কখনওই বিশেষ ফুটে ওঠে না। তবু তাঁর কপালের তিনটে রেখার কুঞ্চন, নিরুৎসাহ মুতাগুচির কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

নিজের তাঁবুর দিকে যেতে যেতে ইয়ানাগিডাকে সাতো বললেন, 'একেকজন মানুষের কপালে ভগবান যেন সাফল্য উজাড় করে দেন। কেন জানি না মুতাগুচির ওপর ঘেন্না হয় আমার।'

অশান্ত মুতাগুচি নিজের ডেরায় পৌঁছলেন। ওবেনের কথাগুলো ভুলতে পারছেন না তিনি। ওবেনের কথায় সাতোর গা জ্বালানো। হাসিটা মনে পড়ে তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে লাগছিল। মন শান্ত করার জন্য পাত্রের পর পাত্র মদ খেয়েও নেশা চড়ছে না তার। নাকাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'স্টাফ অফিসারকে ডাকো! ওই শয়তান সাতোটাকেও বরখাস্ত করব আমি।'

'স্যার, এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার সময় নয় এটা। হয়তো এতক্ষণে আমাদের বাহিনী চিন্দুইনের তীরে পৌঁছে গেছে। এখন এসব করতে যাওয়া মানে সাপের গর্তে পা দেওয়া।'

'কেন? কী হবে?'

'সাতো "তোজে হি— হা" গোষ্ঠীর একজন চাঁই। তাঁকে কিছু করলে টোকিয়োর সমর দপ্তরেও হইচই পড়ে যাবে। আপনি এখানে ইম্ফল অভিযান সামলাবেন না টোকিয়োর দিকটা সামলাবেন?'

মুতাগুচি কিছুটা নরম হলেন। নাকা এবার বিশ্রামের জন্য চলে গেলেন।

এই মেমিয়োতেও মুতাগুচির সঙ্গে একটা গেইশা থাকত। তার জন্য বিছানায় বসে অপেক্ষা করছিল নুন নামের সেই সুন্দরীটি। ফৌজি পোশাক দূরে ছুড়ে ফেলে মুতাগুচি নুনকে জাপটে ধরলেন। কিন্তু সম্ভোগের উত্তেজনাও তাঁর মনকে ভোলাতে পারছে না। মাথায় যেন ঘণ্টা বাজছে— বিদ্রোহের ঘণ্টাধ্বনি। সাতোর মোটা মোটা ভুরুগুলোর কথা মনে পড়ছে বার বার।

নুনের শরীরটাও কেমন ঠান্ডা লাগছে মুতাগুচির কাছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে নানান ছবি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'কোথাকার পেতনি একটা!' গালাগালটা নুনের হাসি মুখে থাপ্পড়ের মতো পড়ল। নুনকে সরিয়ে দিয়ে সাধারণ জামাকাপড় পরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লেন মুতাগুচি।'

সঙ্গে খালি দুজন দেহরক্ষী নিয়ে শেষরাত্তিরের ভেজা রাস্তা দিয়ে চলেছেন মুতাগুচি। হাঁটতে হাঁটতে তাঁবু থেকে অনেকটা দূরে চলে গেলেন তিনি। একটা আগুনের কুণ্ড জ্বেলে জনতিনেক সৈন্য আগুন পোয়াচ্ছে। চলতে চলতেই তাদের কথা কানে এল মুতাগুচির। 'মুতাগুচির হাতে লাগাম আছে ঠিকই— তবে তার তিন ঘোড়া তিনদিকে যেতে চাইছে। এ অবস্থায় যে ইম্ফল অভিযানের কী হবে তা কে জানে।' পা থেমে গেল মুতাগুচির। দেহরক্ষীদের ইশারা করে দূরে থাকতে বলে মুতাগুচি গিয়ে আগুনের পাশে বসলেন। কান ঢাকা টুপি আর গরম ওভারকোটে ঢাকা মুতাগুচিকে চিনতে পারেনি সেই সৈন্যরা। আলোচনায় এবার মুতাগুচিও যোগ দিলেন। কথায় বুঝলেন এরা অশ্বারোহী বাহিনী সৈন্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সি লোকটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সৈন্যবাহিনীতে ত্রিশ বছরেরও বেশি হয়ে গেছে তার।

'আচ্ছা, আমাদের ফৌজে কেউ কি কখনও সম্রাটের হুকুম অমান্য করেছে?'

প্রশ্ন শুনে লোকটা একেবারে ধড়ফড় করে উঠে তাকে চুপ করতে ইশারা করল। কানে হাত দিয়ে বলল, 'এ কথা শোনাও পাপ। আমাদের সম্রাট ঈশ্বরের অংশ। স্বপ্নেও কেউ তাঁর কথা অমান্য করার কথা ভাবতে পারে না।' শুনে অনেকটা স্বস্তি পেলেন মুতাগুচি। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। তাঁবুর দিকে রওনা হলেন মুতাগুচি।

আধুনিক জাপানি সৈন্যবাহিনীর আশি বছরের ঐতিহ্য ফুটে উঠল তাঁর চোখের সামনে। সৈনিকদের 'বুশিডো' রীতি পাঁচটি বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওপরওয়ালা যদি হুকুম দেন তো যে-কোনও সৈনিক হাসিমুখে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে রাজি। যুদ্ধে যারা লড়াই করবে তারা মৃত্যুর পর সরাসরি স্বর্গে যাবে। ঐতিহ্যের সংস্কার, উদয়সূর্যের কিরণ আর সম্রাটের প্রতি অবিচল ভক্তি একটার সঙ্গে আর একটা এমনভাবে জড়িয়ে গেছে, যে জাপানি সৈনিকেরা আদেশ অমান্য করার কথা ভাবতেও পারে না। বিদ্রোহ তো দূরের কথা, যুদ্ধবন্দি হয়ে শত্রুর হাতে পড়ার চেয়ে হারাকিরি করে মৃত্যুবরণ করতে সর্বদা প্রস্তুত এরা। এই 'বুশিডো' আর 'সামুরাই'-এর পরম্পরার কথা মনে পড়ে মুতাগুচির মন একটু শান্ত হয়। বিছানায় শুয়ে গায়ে চাদরটা টেনে নিয়ে বালিশের ওপর এপাশ ওপাশ করতে করতে আপনমনেই বলে ওঠেন তিনি, 'সাতো, বাবা, তোর ভাল লাগুক আর না লাগুক, আমার জন্য নয়, আমাদের প্রিয় সম্রাটের জন্য, দেশের জন্য তোকে লড়তে হবে।'

মেমিয়োতে প্রত্যেকটা দিন আনন্দে কাটছে। ফ্রন্ট থেকে রোজ সাফল্যের খবর আসছে। প্রেম সেহগলকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎই নেতাজি হাজির হলেন মুতাগুচির সঙ্গে দেখা করতে। মেজর ফুজিয়ারা সম্প্রতি জাপানিদের পঞ্চদশ বাহিনীতে স্টাফ অফিসার হিসাবে এসেছেন। নেতাজিকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বললেন, 'অপেক্ষার দিন শেষ হতে চলেছে। আর দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই আমরা ইম্ফলে পৌঁছতে পারব মনে হচ্ছে।'

প্রায় বছর দেড়েক হল মেমিয়োতেই রয়েছেন মুতাগুচি। গোলাপ বাগান করার নেশা পেয়ে বসেছে তাঁকে। নানারকম গোলাপের চাষ করেছেন তিনি বাসভবনের চারদিকে। রোজ নিজে বাগানের তদারক করেন মুতাগুচি। হঠাৎ চন্দ্রা বোস এসে পড়ায় জলের ঝারিটা আরদালির হাতে দিয়ে জাপানি প্রথায় বাও করে নেতাজিকে স্বাগত জানালেন তিনি। নেতাজি 'জয়হিন্দ' বলে প্রত্যুত্তর দিলেন।

মুতাগুচি হেসে বললেন, 'আমাকে গোলাপ বাগানে কাজ করতে দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন? ওদিকে আমার অফিসাররা যুদ্ধ ভালভাবে সামলাচ্ছেন, তাই এদিকে আমি গোলাপ বাগান সামলাচ্ছি।' মুতাগুচির কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয় ঝরে পড়ছে। তাঁর কালো চোখগুলোতে একটা বিশেষ দীপ্তি তাঁর পোশাকের ওপরকার মেডেলগুলোর মতোই ঝকমক করছে। তাঁর প্রত্যয়ে নেতাজিও খুশি।

মুতাগুচির তিনটি ডিভিশন ফ্রন্টে লড়ছে। আরাকান বিভাগে আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর মিশ্র দারুণভাবে লড়ছেন। টামু বিভাগের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে জেনারেল জামান কিয়ানির বাহিনী।

সুভাষ ব্রিগেডের দ্বিতীয় আর তৃতীয় ব্যাটেলিয়ন নিয়ে শাহনওয়াজ অনেক আগেই চিন্দুইন নদী পার হয়ে এগিয়ে গেছেন।

নেতাজি বললেন, 'প্রধান রণক্ষেত্রে যাবার সুযোগ না পেয়ে শাহনওয়াজ দুঃখ পেয়েছেন।'

'দয়া করে এরকম ভাববেন না।' মুতাগুচি বললেন, 'সমুদ্রতটের দিকে আরাকানের লড়াই আসলে প্রধান লড়াইয়ের ট্যাকটিক্যাল অংশ। আসলে শত্রুকে সেদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে মণিপুর অঞ্চলে ব্রিটিশদের নাস্তানাবুদ করার জন্যই ওই লড়াই।'

দুজনে মুতাগুচির অফিসে এলেন। মুতাগুচি বললেন, 'শাহনওয়াজের কাজটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। উনি আমাদের জাপানি বাহিনীর সরবরাহ লাইন সুরক্ষিত রাখছেন। আট হাজার ফুট উঁচু দুটি পাহাড়ি অঞ্চলে যে দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর কাজ করছেন তা আমাদের জাপানি সৈন্যদেরও তাক লাগিয়ে দিয়েছে। কাবোয়া উপত্যকার প্রচণ্ড ঠান্ডায় একবস্ত্রে লড়ছেন তাঁরা। ওই উপত্যকা নামেও মৃত্যুর গুহা আর কাজেও তাই।'

নেতাজির চোখ ছলছল করে ওঠে। বললেন, 'জেনারেল সাহেব, জগতের মধ্যে আমিই একমাত্র সেনানায়ক যে তার সৈন্যদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর অসহনীয় কষ্ট ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি।'

'আপনি ভুল করছেন। দেশভক্তির যে অপূর্ব মন্ত্র আপনি দিয়েছেন তাই দিয়েই তারা সংকট উত্তীর্ণ হবে।' মুতাগুচি বললেন।

'জেনারেল সাহেব। শাহনওয়াজের চিঠি এসেছে। লিখেছে, নেতাজি এখানে থেকে কয়েক মাইল দূরে শত্রুদের ডাকোটা বিমান আসে। প্যারাশুটে করে তাদের জন্য অস্ত্র, খাদ্য নামানো

হয়। তাতে আমাদের কোনও দুঃখ হয় না। আমরা এই পাথুরে ভিজে জমির ওপর বসে আমাদের শুকনো রুটি খাই আর স্বপ্ন দেখি আজাদির।' বলতে বলতে রুদ্ধ হয়ে আসে নেতাজির গলা।

মুতাগুচি বললেন, 'আপনার জন্য ভাল খবর আছে চন্দ্রা বোসজি। টোকিয়োর মুখ্যালয় থেকে খবর এসেছে, ভারতে প্রবেশ করার জন্য চন্দ্রা বোসকে তৈরি থাকতে বলো।'

মানচিত্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নেতাজি বললেন, 'একবার ইম্ফলের পতন হতে দিন। এর আগেই গোপন রাস্তায়, ডুবোজাহাজে আমার একশোরও বেশি সহকারীকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছি আমি। তা ছাড়া আমার ফরোয়ার্ড ব্লকের সহকর্মীরাও আমার আসার পথ চেয়ে আছেন। তা ছাড়াও রয়েছে অন্য বিপ্লবী সংগঠন। সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ আর জাপানিদের মিলিত বাহিনী আর দেশের মধ্যে বিপ্লবের আগুন। ব্রিটিশরা পালাতে পথ পাবে না।'

নেতাজির ভেতরের কবিমন যেন পাখা মেলে দিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে বিপ্লবী মনটা আছে বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তির ওপর। আবেগ ভরে তিনি বললেন, 'আমার কোনও আসন বা সিংহাসন চাই না। আমি চাই মুক্ত ভারতবর্ষ, শক্তিমান ভারতবর্ষ। আমার নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের জন্যই গাঁধীজির বিরাগভাজন হয়েও আমার দেশের তরুণেরা আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্রিটিশের বন্দিশালা থেকে উধাও হয়ে আমি এখন কোন পদক্ষেপ নিচ্ছি তার দিকে দৃষ্টি রেখে আমার দেশবাসী প্রতীক্ষা করছে।'

'আপনি নিশ্চিত যে দেশ আপনাকে বিরাটভাবে অভ্যর্থনা করবে?'

'বিরাট? আলবা থেকে চলে আসার পর সমস্ত ফ্রান্স যেমন নেপোলিয়নের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, আমার দেশবাসীও তেমনিভাবেই দাঁড়াবেন আমার আর আমার বীর সৈন্যদের পেছনে। বাংলার তরুণরা লাখে লাখে আমার সঙ্গে দিল্লির পথে মার্চ করে এগোবে। আমি শুধু দিন গুনছি সেই দিনের।'

নেতাজির দেশপ্রেমের অনুভূতি মুতাগুচিকে অভিভূত করে। এই দিন আলোচনা শুরু করার আগে দুজনের একসঙ্গে একটা ছবি তোলা হয়েছিল।

'জেনারেল আপনার সঙ্গে এটাই আমার প্রথম ছবি। এর পরের ছবি একসঙ্গে আমরা তুলব ইম্ফলে।'

'আশা রাখি আগামী পনেরো-কুড়ি দিনের মধ্যেই আপনার ইচ্ছে বাস্তবে রূপ পাবে।' মুতাগুচি বললেন।

দুজনে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মানচিত্র দেখছেন। হঠাৎ নেতাজি বললেন, 'জেনারেল, দয়া করে ইম্ফল আর কোহিমার মধ্যে এই রাস্তাটা বন্ধ করবেন না।'

'কিন্তু এটাই তো আমার পরিকল্পনার একটা প্রধান অঙ্গ। ইম্ফল আর কোহিমাকে আলাদা করে দুদিকে একসঙ্গে আঘাত হানব আমি। আপনার এতে আপত্তি হচ্ছে কেন? এ রাস্তা কেন খোলা রাখতে চাইছেন?'

'ব্রিটিশ সৈন্যদের পালাবার পথ দেওয়ার জন্য। রেঙ্গুন আর তার আগে মালয়েশিয়া থেকে যেভাবে পালিয়েছিল তারা সেইভাবে।'

'না চন্দ্রা বোসজি। ইম্ফলে একটা বড় মাছ বড় ফরফর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই সাদা মাছটাকে ধরতে হবে আমাকে।'

'এর পরবর্তী পদক্ষেপ কী?'

'২৯ এপ্রিল! তেনেচোসেৎসু—আমাদের সম্রাটের জন্মজয়ন্তী। ইম্ফলেই সে উৎসব পালন করব আমরা।'

রাতে মেজর ফুজিয়ারার সঙ্গে নিজের বাসস্থানে এলেন নেতাজি। অনেক বিষয়ে আলোচনা হল। যুদ্ধ লাগার পর থেকে তার মধ্যে যেন একটা দৈবী প্রেরণা ভর করেছে। একসঙ্গে নানান কাজ সামলাচ্ছেন তিনি। যুদ্ধের সাম্প্রতিকতম খবর রাখা, মেমিয়োর অফিসের নানা কাজ— এর মধ্যেই আবার আশপাশের ভারতীয় বসতিতে গিয়ে সর্বাত্মক প্রস্তুতির জন্য আহ্বান জানান, ফ্রন্টের সৈনিকদের যতদূর সম্ভব রসদ আর সাজসরঞ্জামের ঘাটতি পূরণ করা— কাজের আর শেষ নেই। সিঙ্গাপুরের পশ্চাদ্‌বর্তী ঘাঁটির দায়িত্ব রয়েছে জেনারেল ভোঁসলের ওপর। তাঁর সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলতে হচ্ছে। জামান কিয়ানির এক নম্বর ডিভিশন টামু-পালেল অঞ্চলের পাহাড়-উপত্যকায় লড়াই করছে। কিন্তু গুলজার সিং-এর দ্বিতীয় ডিভিশন এখনও বর্মার বেশ খানিকটা ভেতরেই রয়ে গেছে। সিঙ্গাপুরে তৃতীয় ডিভিশনের ট্রেনিং চলছে। অনেক তামিল, মালয়ালি শ্রমিক আরও অনেক সেনা শেষ পর্যায়ের ট্রেনিং নিচ্ছেন সেখানে। এই ডিভিশনের অস্ত্র আর পোশাকের জন্য কাওয়াবের কাছে ধরনা দিতে হচ্ছে।

চট্টগ্রাম খাঁড়ি পেরোলেই আরাকানের অরণ্য অঞ্চল। সেখানে কর্নেল মিশ্রের অধীনে আজাদি ফৌজ অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে লড়ছে। তাদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে ব্রিটিশ দক্ষিণ আফ্রিকার ফৌজ বুথিয়াডংগ ছেড়ে একশো মাইল পেছনে পালিয়েছে। এই বীরত্বের জন্য নেতাজি কর্নেল মিশ্রকে 'সর্দার-ই-জং' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। কর্নেল মিশ্রের সহকারী পিয়ারা সিং একটা পা হারিয়ে মেমিয়োর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

পিয়ারা সিং-এর সম্মানে নেতাজি মেমিয়োতে একটা সংবর্ধনা সভার আয়োজন করলেন। মুখ্য অতিথি হিসাবে এলেন জেনারেল মুতাগুচি। সভায় কর্নেল লক্ষ্মী বলতে উঠে নেতাজির উপর এক চোট নিলেন, 'নেতাজি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। আপনার প্রতিশ্রুতিমতো আমাদের প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে যেতে দিন। ইম্ফলের খবর শুনে শুনে আমাদের রক্ত টগবগ করে উঠছে।'

'আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর। আমাদের দ্বিতীয় ডিভিশন একবার ভারতে পৌঁছলে তোমাদের সবার ব্যবস্থা করব।'

'কিন্তু আমাদের লড়াইয়ের সুযোগ?'

এবার উত্তর দিলেন মুতাগুচি, 'নিশ্চয়ই লড়াইয়ের সুযোগ পাবে তোমরা। কয়েক দিনের মধ্যেই ইম্ফলের পতন ঘটবে। আমাকেও সেখানে যেতে হবে। তোমাদের নেতাজি তৃতীয় ডিভিশন নিয়ে যাবেন সেখানে। তখন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য আমাকে তো থাকতেই হবে সেখানে।'

হাততালিতে কেঁপে উঠল সভা। 'নেতাজি জিন্দাবাদ', 'বন্দেমাতরম্', 'হিন্দি-জাপানি ভাই ভাই' ধ্বনিতে মুখর হল সভা।

মুতাগুচি মাইক হাতে দাঁড়িয়ে সভার উদ্দেশ্যে আবার বললেন, 'আমার ভারতীয় সহযোদ্ধাবৃন্দ। আমার একটা আনন্দ সংবাদ দেওয়ার আছে— সেটা কি আমি এখন দেব না সভার পরে?'

'এক্ষুনি বলুন, এক্ষুনি বলুন।' আওয়াজ উঠল।

'কালই আমাদের ডায়েটে—জাপানের সংসদে—প্রধানমন্ত্রী তোজো ঘোষণা করেছেন যে ভারতের সমস্ত বিজিত এলাকা জয়ের পরেই অবিলম্বে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

আবার একবার হাততালিতে অনুরণিত হল সভা। আরাকান-যুদ্ধের বীর পিয়ারা সিংকে ঝাঁসির রানি বাহিনীর কয়েকজন হুইল চেয়ারে করে নিয়ে এলেন সভায়। তাঁর একটা পা একেবারে কোমর থেকে ভেঙে গেছে। এখনও ব্যান্ডেজ খোলা হয়নি। নেতাজি নিজে এগিয়ে গিয়ে পিয়ারা সিং-এর জামার ওপর শৌর্যপদক লাগিয়ে দিলেন। বললেন, 'পিয়ারা সিং, এ সম্মান শুধু আপনার নয়, আপনার বীরত্বে আমরা সবাই সম্মানিত।'

পিয়ারা সিং তাঁর উত্তরে বললেন, 'দেশের কাছে আমার যে ঋণ আমি শুধু সেটাই শোধ করার চেষ্টা করেছি। আমার একটা পা চলে গেছে ঠিকই, কিন্তু আরেকটা পা, হাত, মাথা সবই তো এখনও আছে নেতাজি। তা হলে কেন আমাকে ফিরিয়ে আনলেন। আপনিই তো আমাদের শিখিয়েছেন বীরের কাজ এগিয়ে যাওয়া পিছিয়ে আসা নয়।'

এবার নেতাজি বলতে উঠলেন। টোকিয়ো রেডিয়ো থেকে এ ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল।

'বন্ধুগণ, আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরেরা এখন দৃপ্ত পদক্ষেপে ভারতভূমির সীমান্তে এগিয়ে চলেছেন। তুমুল সংগ্রাম করে তারা দুর্বারবেগে দিল্লির পথে অগ্রসর হচ্ছেন। সামরিক শক্তির প্রচণ্ড ধাক্কায় ব্রিটিশ আর আমেরিকান ফৌজকে আমাদের দেশ থেকে দূর করে দিয়ে লক্ষ কোটি ভারতবাসীকে নিজেদের সরকার তৈরি করার সুযোগ করে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আপনাদের কাছে আমার মিনতি আমাদের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে আপনারা সহযোগিতা করুন। রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের কাজে আপনারও হাত মেলান।'

'জাপানি ফৌজের লক্ষ্য ব্রিটিশ আর আমেরিকান ফৌজকে দূর করে দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করা। মুক্তির শুভলগ্নের আর দেরি নেই। পরাধীনতার শৃঙ্খল টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙতে শুরু করেছে। দুঃসময়ের অন্ধকার দূর করে উদয় হচ্ছে নতুন সূর্য।'

চা-পানের সময় নেতাজি খুব মৃদুস্বরে মুতাগুচিকে বললেন, 'পরশুর ভোজসভায় আপনাদের জেনারেল সাতোর কথার সুর আমার তেমন ভাল লাগল না।'

'যেতে দিন না ওসব কথা। একসঙ্গে চলতে গেলে একটু আধটু খটাখটি তো হয়ই।'

'মেমিয়ো থেকে ইম্ফল প্রায় দুশো মাইল দূরে। আমরা যদি আমাদের প্রধান কার্যালয় একটু এগিয়ে নিয়ে ফৌজের কাছাকাছি থাকি তা হলে ভাল হত না কি?'

'জাপানি পরিকল্পনা যে কী বস্তু সেটা অন্যের পক্ষে বোঝাটা খুব সহজ নয়।' মুতাগুচি বললেন। আপনি চিন্তা করবেন না। আমি তো আপনাকে বলেছি, আমি আমার গোলাপ বাগানের ওপর নজর রাখছি। যুদ্ধের দিকটা সামলানোর জন্য আমার অফিসাররাই যথেষ্ট সক্ষম।'

চিন্দুইনের পারে রক্ত জমাট করে দেওয়া ঠান্ডা, গর্জন করে ছুটে চলা ভয়ংকরী নদী, আর দিনে আর রাতে সমান অন্ধকার জঙ্গল। জঙ্গলের যুদ্ধে বিখ্যাত জাপানি ফৌজের কাছেও এটা একটা দারুণ চ্যালেঞ্জ।

চার দিন ধরে জাপানের ৩১ নম্বর বাহিনী চিন্দুইন পার হওয়ার চেষ্টা করছে। জেনারেল সাতো চান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী পার হতে। কিন্তু ৩১ নম্বর ডিভিশন পার করা তত সহজ ব্যাপার নয়। বিশ হাজার সৈনিক, তিন হাজার ঘোড়া আর পাঁচ হাজার বলদ। এই বলদগুলোর

পিঠেই কামানের গোলা, ভারী জিনিসপত্র ইত্যাদি নিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া সামরিক হাসপাতাল, গাড়ি, কামানের টুকরো করে নেওয়া অংশগুলো, তাঁবু ইত্যাদি আরও কত কিছু আছে।

হাজার হাজার সৈন্য গত চারদিন ধরে বাঁশ, হালকা কাঠ, খড় ইত্যাদি দিয়ে ভেলা তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। একসময় নদী পেরনো শুরু হল। বলদগুলোর নাকের আংটা ধরে সৈন্যরা জলে নামল। অন্ধকারে জলের আওয়াজে ভয় পাওয়া বলদগুলোকে জলের মধ্যে সামলানো মহা সমস্যার ব্যাপার। জলের প্রচণ্ড স্রোতে এগোনো যায় না। ভেলায় চড়ে নদী পার হওয়া মানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া। স্রোতে পড়া প্রাণীগুলো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। তাদের কিছু কিছু স্রোতে ভেসেও যাচ্ছে। তবু আবার চেষ্টা করছে এই খরস্রোতা চিন্দুইন পেরোতে।

বেশির ভাগ ফৌজকে রাত্রিতেই ওপারে নিয়ে যাওয়া দরকার। দিনের বেলা বেশি হইচই হলে ব্রিটিশ আর আমেরিকান বিমানগুলো টের পেয়ে ঝাঁঝরা করে দেবে সবাইকে। প্রথম রাতে অনেক লোকসান সত্ত্বেও বেশ কিছু জিনিসপত্র পার করা হল। তারপর একসময় ভোর হল। নিজের তাঁবুতে বসে রয়েছেন জেনারেল সাতো। সারারাত জেগে ছিলেন তিনি। মদের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে স্টাফ অফিসার নাকাকে বললেন, 'একবারে অবাস্তব এই অভিযানের পরিকল্পনা। আমাদের রসদের আর খাবারের যে কী হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'জেনারেল তোজো নিশ্চয় কোনও ব্যবস্থার কথা ভেবেছেন।' নাকা বললেন।

'এই মুতাগুচির মতো মাথামোটা লোক জীবনে দেখিনি আমি।'

'কিন্তু জেনারেল তোজো...'

'ওটাও তো একটা ভাঁড়। ওর ঠাকুরদা আর ঠাকুরদা বাবা ছিলেন নাচিয়ে। বংশের পেশা ছেড়ে এই যুদ্ধের খেলা কেন যে খেলতে এসেছে!'

নাকা একটু বললেন, 'জেনারেল, আপনার সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে একটা হিংসে আর আক্রোশ ফুটে বেরোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না আপনার নিজেরই।'

'যেমন বোঝ! কিন্তু কাল যদি যুদ্ধে জয় হয় তবে ওই তোজো আর মুতাগুচিরা কি টোকিয়োর রাস্তায় আমাদের পুছবে বলে মনে হয় তোমার?' বিষণ্ণসুরে বললেন সাতো।

জলের গর্জন, জানোয়ারদের চিৎকার, মানুষদের হল্লা সব কানে আসছে। প্রচণ্ড জলস্রোত বাধার প্রাচীর তুলে সামনে দাঁড়িয়ে। তবু হার মানছে না মানুষ। প্রাণপণে এগোবার চেষ্টা করছে। কোহিমার গিরিশিখর জয় করতে হবে এই তাদের জেদ। তাদের সেই জেদই যেন ঘোষিত হচ্ছে নদীর কল্লোলে। মনে হচ্ছে পাহাড় আর রাত্রিও গলা মিলিয়েছে সে ঘোষণায়।

৮

কামাইনের কাছে আমেরিকার সামরিক ছাউনি পরিদর্শন করার জন্য মাউন্টব্যাটেনের ডাকোটা বিমান লিডোর বিমানঘাঁটিতে এসে নামল। স্টিলউইল তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য এগোলেন। সামরিক ব্যান্ড বাজছে। পাশেই বাছাই করা আমেরিকান সৈন্যদের কয়েকটি প্লেটুন দাঁড়িয়ে আছে গার্ড অফ অনার দেবার জন্যে। ডিকিকে নিয়ে স্টিলউইল সেদিকে এগোবেন এমন সময় এক অফিসার এসে স্টিলউইলের হাতে একটা খাম দিলেন। খামটা খুলে চিঠিটা পড়েই স্টিলউইলের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মাউন্টব্যাটেন খবরটা জানতে চাইলে স্টিলউইল বললেন, 'চিন্দুইন নদীর ধারে জাপানিরা শুয়োর, ছাগল এরকম সব জানোয়ার ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

'তার মানে জাপানি আক্রমণের আর বেশি দেরি নেই। এই জানোয়ারগুলো কেটে রোস্ট করে ব্যাকপ্যাকে নিয়ে যুদ্ধে এগোবে তারা।'

হঠাৎ এদের খেয়াল হল ব্যান্ডের দল চুপচাপ তাদের দেখছে। তৎক্ষণাৎ সংকেত দিলেন তাঁরা। ব্যান্ড বাজতে শুরু করল। সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করে জিপ এগিয়ে গেল।

গার্ড অফ অনার শেষ হওয়ার পর একটা কলেজের ছেলের মতো হঠাৎ উৎসাহে ছটফটিয়ে উঠলেন ডিকি। ড্রাইভারকে সরিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং হাতে নিলেন। বললেন, 'চলুন জেনারেল একটু ঘুরে আসা যাক।' চারদিকে সবুজের সমারোহের মাঝে ককুদ পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জিপ ছুটল হু হু করে। খুব খুশি দেখাচ্ছে মাউন্টব্যাটেনকে। একটা বাঁকের মুখে পৌঁছে ডিকি আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি ঘোরাবার চেষ্টা করলেন। গাড়ির ধাক্কায় মড়মড় করে একটা বাঁশ ভেঙে পড়ল উইন্ডস্ক্রিনের ওপর। কাচের একটা টুকরো ঢুকে গেল মাউন্টব্যাটেনের চোখে। কোনওরকমে জিপ থামালেন ডিকি। চোখ থেকে রক্ত পড়ে পোশাক ভিজিয়ে দিচ্ছে।

বিমানঘাঁটির কাছেই আমেরিকান সামরিক হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু হল। অন্য চোখটির ওপর যাতে চাপ না পড়ে তাই দুটো চোখেই ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন ডাক্তাররা। এখন ডিকির চারপাশে শুধু অন্ধকারের রাজত্ব।

রাত্রে সবে একটু ঘুম এসেছে ডিকির। দেহরক্ষী এ ডি সি হঠাৎ সবাইকে সরিয়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন ডিকির শোবার ঘরের সামনে। ডিউটিরত ডাক্তার আর নার্সরা তাঁকে রোখবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'এখন ওকে ওঠাবেন না। এতে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। বিশ্রামের প্রয়োজন ওঁর।'

'সরুন আপনারা। এই খবর যদি এক্ষুনি না দিই তবে উনি খুন করবেন আমাকে।' এ ডি সি দরজা ধাক্কাতে শুরু করলেন জোরে জোরে।

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসে এ ডি সি-র গলা পেয়ে মাউন্টব্যাটেন চিৎকার করে উঠলেন, 'কী হয়েছে রবার্ট?'

'স্যার জাপানিরা এসে গেছে।' বিছানা থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়েই ডিকির মনে পড়ল চোখের ব্যান্ডেজের কথা। এমন একটা সময়ে চোখে দেখতে না পাওয়াতে ভীষণ অসহায় লাগছে নিজেকে। আরও খবর যে স্কুন্সের ১৭ নম্বর ডিভিশন সময়ে ইম্ফলে পৌঁছতে না পারায় জাপানিদের ১৫ নম্বর ডিভিশন ঘিরে ফেলেছে তাদের। সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠল ডিকির।

কত ভরসা করে চার্চিল এই সাউথ ইস্ট এশিয়া কম্যান্ডের ভার দিয়েছিলেন তাঁর ওপর। সেই মহান সম্মানের মর্যাদা তিনি যদি রাখতে না পারেন! আর ভাবতে পারেন না ডিকি। সেক্রেটারি, এ ডি সি সবাইকে ধমকাতে থাকেন। 'কোনও খবর, তা যতই ভয়ানক হোক, আমার কাছে লুকোবেন না। আমি মরিনি, একটা চোখে শুধু একটু আঘাত লেগেছে।'

রোজ জাপানিদের অগ্রগতির খবর পাওয়া যাচ্ছে। সাপের ব্যাং ধরার মতো মুতাগুচির সৈন্যরা ১৭ নম্বর ডিভিশনকে গিলতে শুরু করেছে।

ফাঁদে পড়া আহত পাখির মতো ছটফট করছেন মাউন্টব্যাটেন। একটা, দুটো করে চারদিন কেটে গেল। ডাক্তারের ওপর চেঁচামেচি শুরু করলেন ডিকি। 'ব্যস, অনেক হয়েছে। এবার আমাকে ছেড়ে দিন।'

'স্যার, তাড়াহুড়ো করলে আপনার চোখটা চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

'অন্তত যে চোখটা ভাল তার ওপর থেকে ব্যান্ডেজটা সরান।'

'সেটাও করা যাবে না স্যার।' ডাক্তার বললেন।

চোখের যন্ত্রণার চেয়ে মনের যন্ত্রণা বেশি। রাতে রবার্ট নিচু গলায় বললেন, 'কম্যান্ডার, জেনারেল সাতোর ৩১ নম্বর ডিভিশন কোহিমার পাহাড়ের দিকে এগোবার খবর এসেছে।'

'দূর দূর। কয়েকটা রেজিমেন্ট হবে হয়তো।'

'ডিভিশন স্যার, বিশ হাজার সৈন্যের ডিভিশন।'

'ইম্ফলের দিকের খবর!'

'জাপানের দুটি ডিভিশনের সঙ্গে ওই বেইমানদের, আজাদ হিন্দ ফৌজের গাঁধী ডিভিশন ইম্ফলের দিকে এগোচ্ছে। তাদের সেনাপতি জামান কিয়ানি।'

অসহ্য লাগছে সবকিছু। ব্যান্ডেজ খুলতে আরও দুদিন লাগবে। রাতে ভাল ঘুম হয় না। হঠাৎ ভোরবেলা একটানে খুলে ফেললেন ব্যান্ডেজ। নার্স, ডাক্তার দৌড়ে এলেন। কিন্তু সাউথ ইস্ট এশিয়ার সুপ্রিম কম্যান্ডারের ওপর বেচারি নার্স আর ডাক্তাররা কী আর করতে পারেন?

লিডো বিমানঘাঁটি থেকে মাউন্টব্যাটেনের অতি সুসজ্জিত মারকিউরি ডাকোটা বিমান আকাশে উড়ল সেনানায়ককে নিয়ে।

৯

অসমের জঙ্গলে এখনও ভাল করে আলো ফোটেনি কেন? এত ঝাপসা দেখাচ্ছে কেন সব? চতুর্দশ বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের শহরের দিকে বিমান উড়ে চলেছে। জেনারেল স্লিম নিজের দপ্তরেই রয়েছেন। অসমের এক জেলা সদর কোমিলাতে আর্মি হেডকোয়ার্টার্স হওয়ার ফলে শহরের ভোল পালটে গেছে। বিমান থেকে ট্রান্সমিটারের এরিয়াল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিমানঘাঁটিতে কয়েকটা ডাকোটা অসুস্থ পাখির মতো ঝিমিয়ে পড়ে রয়েছে।

১৩ মার্চ, ১৯৪৪। সকাল ১০টায় বিমান এসে নামল কোমিলার রানওয়েতে। বল্ডউইন, স্লিম সবাই মুখে হাসির ভাব আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সবাই জাপানি আক্রমণের আশঙ্কায় ভেতরে ভেতরে অস্থির। এয়ার মার্শাল বল্ডউইনকে ডিকি প্রশ্ন করলেন, 'কী করা যায়?'

উত্তর দিতে পারেন না বল্ডউইন। এবার জেনারেল স্লিমের দিকে তাকিয়ে ডিকি প্রশ্ন করলেন, 'বলুন জেনারেল, এই জাপানিদের "বিয়ার হাগ"—থেকে কী করে বাঁচা যায়?'

'একটাই উপায়। আরাকান থেকে বিমানে সৈন্যদের ইম্ফলে নিয়ে আসা।'

'সেটা অসম্ভব।' ডিকি মৃদুস্বরে বললেন।

'অন্যের পক্ষে হয়তো অসম্ভব। কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে পারেন সেটা করতে।'

যত ভাবছেন তত দিশেহারা হয়ে পড়ছেন মাউন্টব্যাটেন। জাপানের দু-দুটো ডিভিশন ইম্ফল গ্রাস করার জন্য এগোচ্ছে। সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজেরও একটা ডিভিশন। কোহিমার অজেয় পাহাড়ও হাতছাড়া হবে বলেই মনে হচ্ছে। কোমিলায় থেকে কিছু করা যাবে না। ডিকি নয়া দিল্লির পথে রওনা হলেন।

অকিনলেককে সঙ্গে নিয়ে চার্চিলকে ফোন করলেন তিনি। তাঁর গলার আওয়াজেই ঘাবড়ে গেলেন চার্চিল। ডিকির কথা শুনে মোটাসোটা শরীরটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে জোর করে বললেন, 'ডিকি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আব্রু এখন তোমার হাতে।'

'স্যার, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু সেভ আওয়ার স্কিন—চামড়া বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়েছে।'

'অসুবিধেটা কীসের?' চার্চিল যেন ডুবে যাচ্ছেন।

'আরাকানের পাঁচ নম্বর ডিভিশনকে যদি খুব তাড়াতাড়ি ইম্ফল নিয়ে আসা যায় তবেই ইম্ফল বাঁচানো যাবে।'

'তা হলে নিয়ে এস তাদের।'

'যথেষ্ট বিমান আমাদের হাতে নেই, স্যার।'

'ডিকি, তুমি জানো জার্মানি আমাদের বিমানবাহিনীর কী পরিমাণ ক্ষতি করেছে। আমাদের বিমানশক্তির অবস্থা তুমি ভালই জানো। অন্য রাস্তা ভাব। ট্রেনে নিয়ে এস তাদের।'

'অন্তত চার সপ্তাহ লাগবে। ততদিনে জাপানি আর ওই বেইমানদের ফৌজ ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে চলে যাবে।'

'তা হলে?'

'আমেরিকান বিমানবাহিনীর সাহায্য যদি পাওয়া যায় তবেই এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া যাবে।' মাউন্টব্যাটেন বললেন।

'তবে তাদের কাজে লাগাও। ইউ আর দ্য কম্যান্ডার অফ সাউথ ইস্ট এশিয়া! স্টিলউইলকে বলো।'

'তাঁর হাতে নেই এটা। বিমানবাহিনীর কর্তৃত্ব ওয়াশিংটনের প্রধান কার্যালয়ে।'

'ঠিক আছে। যে করেই হোক রুজভেল্টকে রাজি করিয়ে আমি বিমানের ব্যবস্থা করছি। ইতিমধ্যে তোমার হাতে যা আছে তাই দিয়েই লড়াই চালিয়ে যাও। একটা কথা মনে রেখ! যে পর্যন্ত আমি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আছি ততদিন ভারতকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে দেব না আমি।'

এপ্রিল, ১৯৪৪। জোরহাটের বিমানঘাঁটিতে মারকিউরি বিমানটি থেকে নামলেন মাউন্টব্যাটেন। ইতিমধ্যেই গরম পড়তে শুরু করেছে। চারদিকে ধুলো।

ডিকিকে স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত আমেরিকান অফিসারদেরও চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। স্কুল্স ছাড়া সব সেনাপতিরাই এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত আছেন। জেনারেল স্লিমের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন যখন হলে ঢুকতে যাবেন তখন সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা তাঁকে ঘিরে ধরলেন।

'স্যার, স্যার— আপনারা কি এত শিগগির জাপানি আক্রমণের কথা ভেবেছিলেন?'

'ভাবিনি। তবে এটা যুদ্ধ। যে-কোনও রকম পরিস্থিতির জন্য সবসময়ই তৈরি থাকতে হয়।'

'সাউথ ইস্ট এশিয়ান কম্যান্ড কি এ সংকট থেকে বেরোতে পারবে।'

'লড়াই তো চলছে।'

জেনারেল স্লিম চেয়েছিলেন আগে তাঁরাই ব্রহ্মদেশে আক্রমণ চালাবেন। জাপানি আর আজাদ হিন্দ ফৌজের জোরদার আক্রমণে সে পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। এখন 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা—'

উইনগেটের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বৈঠক শুরু হল। টেবিলে উইনগেটের একটা ছবিতে মালা পরানো হয়েছে। বর্মায় যাবার সময় উইনগেটের বিমান কাবোয়া উপত্যকায় দুর্ঘটনায় পড়ে ধ্বংস হয়।

উইনগেটের এই আকস্মিক মৃত্যুতে ডিকি মর্মাহত। তিনি বললেন, 'উইনগেট ছিলেন লরেন্স অফ অ্যারাবিয়ার মতোই দুর্দম্য। কাউকে পরোয়া করতেন না তিনি। এমনও হয়েছে যে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তিনি সোজা চার্চিলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁর দুর্জয় সাহসের এই সময় আমাদের বড় প্রয়োজন ছিল।'

জেনারেল স্লিম বললেন, 'উইনগেটের মৃত্যুতে ব্রিটিশ বাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। জঙ্গলের যুদ্ধে দক্ষ জাপানিরা যখন ধেয়ে আসছে ঠিক তখনই এই মৃত্যু আমাদের কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের।'

সভায় এর পর উইনগেটের 'চিন্দে অভিযান' সম্পর্কে আলোচনা হল। বর্মায় প্যাগোডার প্রবেশদ্বারে দুপাশে দুটি পাখা লাগানো সিংহের মতো একটি প্রাণীর মূর্তি থাকে। এদের বলা হয় 'চিন্দে'।

বর্মিরা বিশ্বাস করে এরাই প্যাগোডাকে রক্ষা করবে। তাই উইনগেট অনুপ্রবেশ পরিকল্পনার নাম 'চিন্দে অভিযান' দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য তিনি নিজেই চিন্দে হতে চেয়েছিলেন।

গত মাসেই ডাকোটা বিমান আর গ্লাইডারের সাহায্যে ন' হাজার সৈন্য আর এগারোশো খচ্চর আর ঘোড়া তিনি বর্মার অভ্যন্তরে পাঠাতে পেরেছিলেন। মূল উদ্দেশ্য, জাপানিরা যখন ইম্ফলে লড়বে তখন পেছন থেকে তাদের সরবরাহ ব্যবস্থা পর্যুদস্ত করে দেওয়া। তাই বর্মার জঙ্গলে বিমান অবতরণের জন্য 'ব্রডওয়ে', 'পিকাডিলি', 'চৌরঙ্গি'— এইসব নাম দিয়ে অনেকগুলো রানওয়ে তৈরি করিয়ে ছিলেন উইনগেট। এই কাজে উইনগেটের বিকল্প খুঁজে পাওয়া যে অসম্ভব সেটা ভালই জানেন মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো ভার দিতেই হবে।

মূল আলোচনা শুরু হওয়ার আগে স্টিলউইল ডিকির চোখের অবস্থা জানতে চাইলেন। 'এখনও খোঁচা মারছে ভেতরে,' মাউন্টব্যাটেন জানালেন।

স্টিলউইলকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। গোড়া থেকেই মাউন্টব্যাটেনের ওপর এক ধরনের হিংসে ছিল তাঁর। মাউন্টব্যাটেনের চেয়ে তিনি দশ বছরের বড়। তা ছাড়া এই যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা। তা সত্ত্বেও এই নতুন কম্যান্ডের ভার পেয়েছেন মাউন্টব্যাটেন— স্টিলউইল তাঁর সহকারী মাত্র।

'যুদ্ধে উত্থানপতন বাজারদরের মতোই ওঠানামা করে। কিন্তু আজকের সংকট আকাশছোঁয়া। ওদিকে চিনে আমাদের সৈন্যদের রসদ সরবরাহ বজায় রাখার জন্য আমরা বর্মা আর চিনের মধ্যে বর্মা রোড খোলা রাখার জন্য আমরা জান দিয়ে লড়ছি—'

স্টিলউইলের কথার ভঙ্গিতে মাউন্টব্যাটেনের লাল চেহারা কালচে হয়ে গেল। স্টিলউইল অবশ্য বলেই চললেন। 'একবার যদি ডিমাপুরের পতন হয়, জাপানিরা যদি লিডো যাবার রেলপথ কেটে দিতে পারে তবে সব শেষ হয়ে যাবে। এমনকী চিনের দিকে ছাড়া আমাদের পালানোরও আর কোনও পথ থাকবে না।'

'আমরা কিছুতেই তা হতে দেব না।'

'ইচ্ছে দিয়েই তো আর পৃথিবী চলে না। শুধু ইচ্ছে দিয়ে বিয়ে পর্যন্ত টেকানো যায় না আজকাল।' স্টিলউইল বললেন।

এই সময় আমেরিকার দেওয়া ডাকোটা বিমানগুলো দিনরাত আরাকান সীমান্ত থেকে পাঁচ নম্বর ডিভিশনের সৈন্যদের নিয়ে আসছে। আমেরিকা যদি এ সাহায্য না করত তো বড়জোর

আর দিন দশেকের মধ্যেই সবাইকে দিল্লির পথ ধরতে হত। ডিকি ভালই জানেন সেটা। কিন্তু এর ফলে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আমেরিকাকে অনেক বিমান সরিয়ে আনতে হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার নৌঘাঁটিগুলোর ওপর বিপদ এর ফলে অনেক বেড়ে গেছে। সেটা স্টিলউইলের একেবারেই ভাল লাগেনি।

স্লিম জিজ্ঞেস করলেন, 'জাপান যদি ইচ্ছে করতো রেঙ্গুনের পতনের পরই, অসম জিতে নিতে পারত। হঠাৎ এখনই বা তারা আক্রমণ করল কেন?'

'তার কারণ তখন তাদের হাতে এই সুভাষ বোস নামক বেইমানটা ছিল না।' স্টিলউইল বলে উঠলেন।

মণিপুরের সমতলভূমিতে যদি জাপানিরা পৌঁছয় তা হলে যে কী হবে সবাই জানেন। মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'যে করেই হোক জাপানের অগ্রগতি আমাদের রুখতেই হবে। জাপানিদের সরবরাহের লাইন অনেক দূরে। একবার তাদের সরবরাহ বন্ধ করতে পারলেই কোমর ভেঙে যাবে তাদের। বর্ষা পর্যন্ত যদি আমরা তাদের আটকে রাখতে পারি তবে আর চিন্তা নেই। জলে কাদায় ডুবে মরবে তারা। ফেরার রাস্তাই পাবে না।'

'কিন্তু জাপানিরা বর্ষার আগেই ইম্ফল দখল করতে চায়। ইম্ফলের পতন হলে বোসের খাসজায়গা কলকাতা আর কত দূরে?' জেনারেল স্লিমের ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট।

'ভগবানের সহায় আমাদের ওপর। মণিপুরের লোকসংখ্যা এমনিতেই কম। যারা আছে তাদের মধ্যে জংলি আর উপজাতিই বেশি। তাদের কাছে কংগ্রেসের কোনও পরিচিতি নেই। গাঁধী, নেহরু, বোস— এদের নাম শুনেছে খুবই কম লোক। কলকাতা ছেড়ে দিন, জব্বলপুরের মতো ছোটখাটো শহরও যদি সেখানে থাকত তবে বোসের জাদুকাঠিতে সেখানে অনেক আগেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে এতদিনে আমাদের পাততাড়ি গুটোতে হত।'

'এখানেও যে সে সম্ভাবনা নেই তা বলা যায় না।' স্টিলউইল ফোড়ন কাটলেন।

এইবার মাউন্টব্যাটেনের সংযম ভেঙে গেল। লোক দেখানো বীরত্বের জায়গায় ভেতরকার ভয়টা যেন ফুটে বেরোল। কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি বললেন, 'জেনারেল, আরাকান সীমান্তের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। জাপানি জেনারেল হানিয়া আমাদের লেফটেন্যান্ট জেনারেল ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন। ইম্ফলের পা গিলতে চলেছে জাপানি অজগর। কোহিমা জ্বলছে। লন্ডনের ভূগর্ভে বসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী লম্বাচওড়া ভাষণ দিচ্ছেন আর প্রত্যেকদিন জার্মান বম্বারদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হচ্ছে লন্ডন। যখন এই কম্যান্ডের দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম অনেক ভরসা ছিল নিজের ওপর। আজ আমার এই খোঁচা খাওয়া চোখটা থেকে ঝরে পড়া জলে সব কিছু বড় ঝাপসা দেখাচ্ছে।'

ডিকি মাউন্টব্যাটেনের মুখে এ ধরনের কথা এর আগে কেউ কখনও শোনেনি। বৈঠক নিস্তব্ধ। স্টিলউইলের মতো পোড়খাওয়া সেনানীও গলে গেলেন। ডিকির আর তার কম্যান্ডের ওপর রাগটা কোথায় মিলিয়ে গেল। শুধু একটা বিষয়ে আশ্বাস চান তিনি। সর্বশক্তি দিয়ে লিডোর রাস্তা রক্ষা করা হবে। উত্তরে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'ধরুন, এক আধবার যদি জাপানিরা কোথাও দখল নেয়ও, আমি কথা দিচ্ছি যে চার-পাঁচদিনের মধ্যে আবার দখল করে নেব আমরা।'

উইনগেটের অপঘাত মৃত্যু সমস্ত ব্রিটিশ অফিসাররা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। মাউন্টব্যাটেনও প্রচণ্ড মর্মাহত। বৈঠক শেষ হতেই তিনি সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে মারকিউরি বিমানের দিকে ছুটলেন। ইম্ফলে পৌঁছে সেখানকার সৈন্যদের ভরসা দিতে হবে। বিমান ওড়বার

মুহূর্তে পাইলটকে থামতে বললেন তিনি। ওয়ারলেসের মাধ্যমে দিল্লির ইন্ডিয়া কম্যান্ডের সঙ্গে কথা হওয়ার পর বিমান উড়ল।

'এই মিটিংয়ে স্কুন্স আসেননি কেন?' অসন্তুষ্ট গলায় ডিকি বললেন।

'স্যার ইম্ফলের বর্তমান পরিস্থিতিতে ফ্রন্ট ছেড়ে তিনি কি করে আসবেন।'

'ও ইয়েস।' নিজের ভুলটা বুঝে মাউন্টব্যাটেন একটু বিব্রত বোধ করলেন।

'স্যার একটা ভাল খবর আছে। আমাদের ১৭ নম্বর ডিভিশন যখন ফিরে আসছিল তখন তারা পুরোপুরি জাপানিদের কব্জায় চলে গিয়েছিল। জাপানি কম্যান্ডার ইয়ানাগিডা ভুল বুঝেই হোক আর ভুল খবর পেয়েই হোক হাতে পাওয়া আঠেরো হাজার সৈন্যকে ছেড়ে দিয়েছেন। ভগবানের অসীম কৃপা বলতে হবে।'

১১

ইম্ফল পৌঁছতে পৌঁছতে দিন কাবার হয়ে এল। বিমানের জানলা দিয়ে কাছাকাছি অনেক পাহাড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিটি পাহাড়ই যেন প্রশ্নচিহ্ন তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই সব পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই চলে গেছে, টিড্ডিম-ডিমাপুরের রাস্তা, শিলচর যাবার রাস্তা। চারদিকে ঘন জঙ্গল। ইম্ফলেও জাপানি বিমান হামলার চিহ্নগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দিনে সব শান্ত থাকে। জাপানিদের বিমানশক্তি কম। তাই তারা দিনে জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরোয় না। রাতে যুদ্ধ করাটাই তাদের পছন্দ।

অন্ধকার হতেই দূর থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শুরু হল। একদিকে সাত-আট মাইলের মধ্যেই এসে পৌঁছেছে জাপানিরা। অন্যদিকে পনেরো মাইল দূরে রয়েছে তারা। কামানগুলোর অগ্নিবর্ষণে জাপানিদের যুদ্ধস্পৃহা আরও বেড়ে ওঠে। তবে ব্রিটিশ বাহিনীও সমানে লড়ছে। লড়াইটা মূলত হচ্ছে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। ইম্ফলের অবস্থাটা এখন অনেকটা গভীর সমুদ্রে আটকে পড়া জাহাজের মতো। তফাত এই যে সাগরের ঢেউয়ের বদলে চারদিকে ঘিরে আসছে শত্রুসৈন্য।

সুপ্রিম কম্যান্ডার মাউন্টব্যাটেন সবাইকে 'আফটার ডিনার ডিসকাশনে'র জন্য ডেকেছেন। কোনও রকমে রুটি-মাংস গিলে সব অফিসাররাই এসে হাজির হলেন। টেবিলের ওপর একটা গোপন খবরের প্রতিলিপি বারবার দেখছেন মাউন্টব্যাটেন। ব্রিটিশ বাহিনীর কিছু কিছু সৈনিক আজাদ হিন্দ ফৌজে গিয়ে যোগ দিতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ছোট্ট এই খবরটা মাউন্টব্যাটেনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। 'জেনারেল স্কুন্স, বেইমানদের ঠেকাবার কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?' চড়া গলায় জানতে চাইলেন ডিকি।

স্কুন্সকে প্রশ্নটা করলেও ডিকির আসলে রাগটা যে তাঁরই ওপরে সেটা বোঝেন স্লিম। ১৪ নম্বর বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে তাঁরই কাজ ছিল জাপানিদের ওপর প্রথম আক্রমণ করে তাদের এ পর্যন্ত না এগোতে দেওয়া। গোড়াতেই গোলমাল করেছেন স্লিম— এ অভিযোগ প্রকাশ্যেই করেছেন মাউন্টব্যাটেন। তার ওপর 'জিফস' বা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' কথাগুলো কানে গেলে তাঁর মেজাজ একেবারে টং-এ চড়ে যায়। এখন আবার সেই সব বেইমানদের সঙ্গে নিজেদের কিছু সৈন্যের হাত মেলাবার সম্ভাবনার কথা জেনে তিনি একেবারে রেগে আগুন হয়ে আছেন।

টেবিল চাপড়ে ডিকি মাউন্টব্যাটেন চিৎকার করে উঠলেন, 'এই বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে

চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে একটা অতি সাধারণ লোক। পিঁপড়ে, হাতিকে দাঁত খিঁচোচ্ছে, খরগোশ বাঘের গোঁফের চুলগুলো গুনে দেখছে। দিস ইজ টু মাচ।'

রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন মাউন্টব্যাটেন। চোখে ঘুম নেই। সারা জীবনের সাফল্য যেন পরিহাস করছে তাঁকে। কোথায় গেল সেই দুঃসাহসী অজেয় নাবিক? শত্রুর অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের মধ্যে দিয়ে, ৫১ জায়গায় জাহাজ ফুটো হয়ে যাওয়ার পরেও ৯১ ঘণ্টা লড়াই করে তীরে পৌঁছতে পেরেছিল সেই নাবিক। ক্রিটের কাছে ভূমধ্যসাগরে শত্রুর গোলায় আগুন লেগে অর্ধেক ক্রু জলে ডুবে গিয়েছিল তা সত্ত্বেও সেই বীর সাঁতরে তীরে পৌঁছেছিল।

চোখের সামনে ভেসে ওঠা ছবির রং বদলায়। তার মধ্যে ভেসে ওঠে এক নারীর হরিণচোখ। এডুইনা। এই নতুন কম্যান্ডের ভার নেবার জন্য হিথরো থেকে যখন রওনা হচ্ছিলেন তিনি এডুইনা এসেছিলেন বিদায় জানাতে। বিদায় আলিঙ্গনের পর দু'হাতে এডুইনাকে ধরে সেই চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ডিকি বলেছিলেন, 'ডার্লিং, পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম এক নাবিককে পদাতিক আর বিমানবাহিনীর সেনাপতি করে পাঠানো হচ্ছে। এ যেন জল উজান বেয়ে পাহাড়ে চলেছে আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তুমি ভেব না— এবারও নিশ্চয় সফল হব আমি।'

বাইরে গোলাগুলির শব্দ বাড়ছে, পাওয়া যাচ্ছে বিমানের শব্দ। মণিপুরের পাহাড়-উপত্যকায়, কোহিমার পাহাড়ি জঙ্গলের সঙ্গে মিশে রয়েছে জাপানের পঁচাশি হাজার সৈন্য। ঘূর্ণিঝড়ও আসছে, সে ঘূর্ণি যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে তাঁকে।

মাথা ঝিমঝিম করছে। গুলিবর্ষণের আওয়াজ, উইনগেটের কফিনের দৃশ্য, জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা সব কিছু চাপা দিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সামরিক পোশাকে একটি ভারতীয় চেহারা। কী অদ্ভুত ব্যাপার! কী অসম্ভব ঘটনা! শতাব্দীর পর শতাব্দী যে দেশ পরমসুখে গোলামগিরি করছে, বিদেশি শাসনকে দেবতার দান বলে মেনে নিয়েছে, যে দেশে বেশির ভাগ মানুষ জন্মায় মেরুদণ্ডবিহীন হয়ে, 'রায়বাহাদুর' খেতাব পাওয়ার জন্য কর্তাদের জুতো চাটে, শয়ে শয়ে দেশীয় রাজারা 'ইয়োর একসেলেন্সি' বলে বিদেশি শাসকের বেতনভুক ভৃত্যকেও লাইন দিয়ে আভূমি কুর্নিশ করে, যেখানে বিজ্ঞানকে ধর্মের ছাই দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যেখানে ফুটে উঠতে চাওয়া কুঁড়িগুলোকে বিদেশি রাজার কুশলের জন্য 'গড সেভ দ্য কিং' বলে প্রার্থনা করতে শেখান হয়— সেখানে, সেই মাটিতে কী করে এরকম একটা লোক জন্মাল? কী স্পর্ধা লোকটার! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কখনও অস্ত না যাওয়া সূর্যকে অস্তে পাঠাতে চায়! পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত উত্তাল করে এখন ভারতের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে এই লোকটা।

এই শুকনো ডাঙায় কি ভরাডুবি হবে সমুদ্রজয়ী সেই দুর্ধর্ষ নাবিকের? হঠাৎ চটকা ভেঙে যায় ডিকির। সামনে দাঁড়িয়ে একটা শেয়াল— না শেয়াল তো নয়— জেনারেল স্কুন্স।

'স্যার, জঙ্গল থেকে এসে আমাদের সৈন্যদলে ঢুকে পড়া চারজন "জিফস" অর্থাৎ তথাকথিত আজাদ হিন্দ ফৌজের চারজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে।'

বড় বড় চোখ করে মাউন্টব্যাটেন দেখছেন চারজনকে। একজন মুসলমান, একজন হিন্দু আর দুজন শিখ। মালয়েশিয়া থেকে এসেছে তারা। স্কুন্স বললেন, 'এই চারজন আমাদের সৈন্যবাহিনীর আশেপাশে ঘুরছিল। এদের কাছে বোসের লেখা চিঠি পাওয়া গেছে। এদের উসকানিতে আমাদের তিনটি ব্যাটেলিয়ন বিশানপুর গিয়ে শত্রুর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছিল।'

'এ সব খবর জানা গেল কী করে?'

'দুটি বিশ্বস্ত ভারতীয় সৈনিক ফাঁস করে দিয়েছে এদের পরিকল্পনা।'

'এক কাজ কর। ওই তিন ব্যাটেলিয়নকে ফ্রন্ট থেকে সরিয়ে দাও আর কড়া নজর রাখ। বাকিদের যেন ছোঁয়াচ না লাগে।'

'এদের সঙ্গে আমাদের ছ'জন সৈন্যকেও ধরা হয়েছিল। তারাই এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।'

'কোথায় সেই রাস্কেলগুলো?'

'তাঁদের মুখ বেঁধে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।'

হিংস্রদৃষ্টিতে মাউন্টব্যাটেন দেখছিলেন মালয়েশিয়া থেকে আসা চারজনকে। একজনকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন তিনি, 'নাম কি তোর?'

'সান্তা সিং।'

'আগে কী করতিস?'

'পেনাং-এ ইংরিজির শিক্ষক ছিলাম।'

'কম্যান্ডো ট্রেনিং কোথায় নিয়েছিস?'

'পেনাং-এর স্বরাজ ইনস্টিটিউটে।'

'তোর সঙ্গে আর কতজন ভারতে এসেছে।'

'জানি না।'

'জানিস না, না বলবি না।'

'হ্যাঁ, বলব না। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে বেইমানি করা আজাদ হিন্দ ফৌজের রীতি নয়।' সান্তা সিং এবার বেপরোয়া।

ভয় দেখানো, অকথ্য নির্যাতন— কোনও কিছুতেই কাজ হল না। একটা কথাও বার করা গেল না তাঁদের কাছ থেকে। রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন মাউন্টব্যাটেন। দশজনকেই তৎক্ষণাৎ গুলি করে মারবার হুকুম দিলেন তিনি। না-কোনও তদন্ত, না-কোনও বিচার। আন্তর্জাতিক আইন-টাইন রাজঘরানার ছেলে ডিকি মাউন্টব্যাটেনের জন্য নয়।

একটু পরেই বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ এল। বাইরে এসে ডিকি দেখলেন গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দশটি শবদেহ। মরবার ঠিক আগে তাঁদের 'জয় হিন্দ', 'নেতাজি জিন্দাবাদ' ধ্বনিটা যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

শবদেহগুলোকে নিয়ে কী করা হবে? স্কুন্সের প্রশ্নের উত্তরে ডিকি বললেন, 'এগুলোকে ইউনিয়ন জ্যাক দিয়ে ঢেকে, কলকাতায় ওদের বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও।' স্কুন্স স্তম্ভিত। বেইমান সৈনিক আর শত্রুর গুপ্তচরদের এ রকম সম্মান। ক্রূর হাসি হেসে ডিকি বললেন, আই অ্যাম নট এ স্টুপিড, স্কুন্স। আমাদের পতাকা দিয়ে ঢেকে এদের বাড়ির লোকদের কাছে পাঠিয়ে দিলে সারা ভারতে এই বার্তা যাবে যে, এরা রাজার জন্য লড়তে লড়তে, নিমকের মর্যাদা রেখে প্রাণ দিয়েছে। বোসের অস্তিত্বটাকেই মুছে দাও। আই এন এ বলে কিছু নেই, কোনও দিন ছিল না। যা ছিল সেটা হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বেইমান— জাপানের হাতের পুতুল। ভবিষ্যতেও আমরা এই পদ্ধতিই নেব।'

হঠাৎ এগিয়ে যান মাউন্টব্যাটেন। বুট দিয়ে লাথি মারতে থাকেন শবদেহগুলোর ওপর। তাঁদের হাতের ওপর বুট দিয়ে চাপ দিতে থাকেন। রানি ভিক্টোরিয়ার নাতির ছেলের রাজরক্ত টগবগ করে ফুটছে উন্মত্ত আক্রোশে।

১৬
রণভেরী

১

উঁচু পাহাড়ের শিখরগুলোর ছায়া পড়েছে নীচের মাটিতে। সন্ধ্যার ঠান্ডা হাওয়ায় শিরশিরানি লাগছে শরীরে। সাতোর সৈন্যরা খোলা জায়গাতেই ছাউনি ফেলেছে। জায়গায় জায়গায় ধুনি জ্বালিয়ে খর্বকায় জাপানি সৈন্যরা টনটনিয়ে ওঠা পায়ে সেঁক দিচ্ছে। আর মাত্র দুদিনের মধ্যেই কোহিমার গিরিশিখর নজরে আসবে।

ক্যাপ্টেন নিশিদা বললেন, 'যাক, বাড়ি থেকে পাঁচ হাজার মাইলের দূরত্ব শেষ হল তা হলে। ভারতের সীমানায় পৌঁছেছি আমরা। এবার জাপানের মঙ্গলের জন্য সবাই মিলে লড়াই করতে হবে।'

মিয়াঝাকি তড়বড় করে বললেন, 'মুতাগুচির আদেশ অনুযায়ী তীব্র গতিতে এগিয়ে গিয়ে কোহিমার গিরিশিখর দখল করে ইম্ফলের দিকে এগোতে হবে আমাদের।'

প্রধান সেনাপতি মুতাগুচির ওপর সাতোর হিংসে আর রাগ কারওরই বিশেষ অজানা নেই। অনেকবারই চোখ ঘুরিয়ে বলেছেন তিনি, 'একমাত্র কোনও অলৌকিক কিছু ঘটলেই আমরা এই বিদেশ বিভুঁই থেকে ফিরতে পারব। নয়তো এই ইম্ফল কোহিমার পথেই জাপানি সৈন্যদের কবর তৈরি হবে।' সাতোর এই ধরনের নিরাশাজনক কথা নিশিদা, কোবোয়াশি প্রভৃতি অফিসারদের নজর এড়ায়নি।

নিশিদা বললেন, 'জেনারেল সাহেব, নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের রসদ তো ঠিকই আসছে।'

সাতো বললেন, 'যে পরিমাণ রসদ আসবে, সেই অনুযায়ী যুদ্ধও হবে।'

সাতোর এই ধরনের কথা কারওই ভাল লাগে না। কিন্তু ওপরওয়ালার সম্মান বজায় রেখে কথা কাটাকাটি এড়িয়ে যান তাঁরা। তবে ওপরে ওপরে বিনীতভাব দেখিয়ে যা বলার বলতে ছাড়েন না তাঁরা।

পরের দুটো রাত্রি যেন কালরাত্রির মতো। ঘাড় হেলিয়ে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাতে গেলে মাথার টুপি খুলে পড়ে যায় এত উঁচু। ঘন জঙ্গল, মারাত্মক বাঁক— পাথুরে রাস্তায় জায়গায় জায়গায় বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই। এই চড়াই অতিক্রম করে জাপানি সৈন্যরা কোহিমায় পৌঁছতে পারবে বলে বিশ্বাস করে না ব্রিটিশরা। ওদিকে জঙ্গলের যুদ্ধের নামেই জাপানিদের শিরায় শিরায় রক্ত নাচতে থাকে। ওই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে সাতোরও বুক ফুলে ওঠে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য। রাগ হিংসে সব গৌণ হয়ে যায়। পাহাড়ের চুড়োগুলোর হাতছানিতে জাপানি সৈনিকদের শিরায় শিরায় শিহরন।

মেমিয়োর পাহাড়ে ভারবাহী জন্তুদের মুতাগুচি যে ট্রেনিং দিয়েছিলেন সেটার ফল পাওয়া যাচ্ছে এখন। নয়তো গোড়াতেই বসে পড়ত তারা। পিঠে রসদের বোঝা নিয়ে খাড়া রাস্তায় চলতে গিয়ে বলদগুলোর পিঠ বেঁকে যাচ্ছে। ঘোড়াগুলোর মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। আঁকাবাঁকা রাস্তায় পা টিপে টিপে পশুগুলো এগোচ্ছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। কয়েকটা হাতির পিঠে চলেছে কামানের যন্ত্রাংশগুলোর বোঝা। তাদের চলন দেখে মনে হচ্ছে নেশা হয়েছে তাদের। রাস্তার ছোট ছোট গাছগুলো মড়মড় করে ভেঙে টলমল করতে করতে এগোচ্ছে তারা।

সেই দুই ভয়ংকর রাত্রিও একসময় শেষ হল। দ্বিতীয় রাত্রির শেষে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছল সাতোর শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যেরা। পুবদিকের পাহাড়ের চূড়া এখন সাতোর দখলে। জেনারেল সাতো দূরবিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন চারদিক।

হিমালয়ের এই পূর্বভাগে কোহিমা, আংটির মধ্যে পাথরের মতো ঝলমল করছে। চারদিকে পাহাড় ঘেরা। পশ্চিম দিকের পাহাড়ি পাকদণ্ডি বেয়ে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে কোহিমা। দুদিকে বিরাট উঁচু পাহাড়ের মধ্যে ঘোড়ার পিঠে জিনের খোঁদলের মতো একটু নিচুতে কোহিমা শহর। পশ্চিম দিকে দশ হাজার ফুট উঁচু গিরিশিখরের সারি। সামনের দিকের পাহাড়গুলোও আট-সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু। এই পাহাড়গুলো থেকেই একটা রাস্তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে ইম্ফলের দিকে চলে গেছে। সেখান থেকে আবার পাক খেয়ে নেমে গেছে ব্রহ্মদেশের সমতলভূমির দিকে।

জেনারেল সাতোর দূরবিনে কোহিমা শহর কুয়াশার আড়াল থেকে আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে। সবে ঘুম থেকে উঠছে কোহিমা। দূরে পাহাড়ের ঢালে লালটালির ছাদওয়ালা ব্রিটিশ অফিসারদের বেশ কয়েকটা বাংলো দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমদিকের পাহাড়ের কোলে কালেক্টরের ছোট কিন্তু খুব সাজানো বাংলোটা দেখা যাচ্ছে। তার সামনে একটা সুন্দর টেনিস লন। পশ্চিম দিকের আর একটা ঢালে ট্রেজারি। একদম ডানদিকে গ্যারিসন টিলা— কোহিমার প্রধান সৈনিক ছাউনি। তার পাশের টিলাতেই রয়েছে অনেক শস্যের গোলা।

কালেক্টর বাংলোর সামনে দিয়ে কোহিমার প্রধান রাস্তা। এই রাস্তার দুপাশেই কোহিমা শহরের মূল বসতি। এই বসতির পেছনে নাগাদের গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

কোহিমা শহর রক্ষার ভার রয়েছে কর্নেল রিচার্ডসের ওপর। ইম্ফলের পথে জাপানিদের অগ্রগতির খবর সবে পৌঁছেছে কোহিমায়। কোহিমার দিকে তাদের আসার সম্ভাবনাও শোনা গেছে গুপ্তচরদের মুখে। কিন্তু সকলেই জানে এতদূরে এসে হামলা করাটা সহজ নয়।

কিন্তু মার্চ মাস শেষ হতে না হতেই ব্রিটিশদের মালুম হল ব্যাপারটা। জাপানের পতাকা দূরের পাহাড়ের ওপর উড়তে লাগল। মেজর জেনারেল মিয়াঝাকি সবার আগে রেজিমেন্ট নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কোহিমার ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়ের ঢালে ছোট ছোট গ্রাম। পশ্চিমের উতরাইয়ে শস্যভাণ্ডার আর প্রধান সেনা ছাউনি। মিয়াঝাকির ফৌজ গুলি চালাতে শুরু করল। ব্রিটিশ বাহিনীর ওয়েস্ট কেন্ট আর অসম রেজিমেন্ট তার উত্তর দিতে শুরু করল। শুরুতে জাপানিরা অবস্থাটা ভালভাবে বুঝে নেবার চেষ্টা করছিল। ব্রিটিশদের শক্তি ঠিক কতটা বুঝে উঠতে পারছিল না তারা। দুই পক্ষই একটু ভয় পাচ্ছে। রিচার্ডস আকাশের দিকে তাকিয়ে আশা করছেন যে-কোনও মুহূর্তে স্কুল, স্লিম বা মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে সাহায্য এসে পৌঁছবে। পশ্চিমের দিকের নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন অন্তত ডিমাপুর থেকে পদাতিক বাহিনী এসে পৌঁছবে। সে আশাও সত্যি হয়ে উঠছে না।

৫ এপ্রিল নাগা গ্রামগুলোর পেছন দিকের পাহাড় দিয়ে নেমে জাপানিরা ছোট ছোট দল করে কোহিমার দিকে এগোতে লাগল। হলদে হলদে, বেঁটে বেঁটে জাপানিদের ভীষণ একরোখা মেজাজ।

কর্নেল রিচার্ডস কালেক্টর বাংলোতেই থাকেন।

ইম্ফল ফ্রন্টে যুদ্ধ ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠার খবর পেয়ে কর্নেল রিচার্ডসের চিন্তা বাড়ে। দুই ডিভিশন জাপানি সৈন্য হিংস্র হায়েনার মতো দাঁত বার করে ইম্ফলের দিকে ধেয়ে চলেছে বলে খবর পেয়েছেন তিনি। ভীত কর্নেল রিচার্ডস ফোন তুলে সরাসরি জেনারেল স্কুন্সের সঙ্গে কথা বললেন। জেনারেল স্কুন্স বললেন, 'পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। এই জাপানিগুলো দারুণরকম লড়াকু। ইম্ফলের সংরক্ষণ প্রাচীর কোনওমতে খাড়া রেখেছি আমি। ওদিককার খবর কী?'

'কোহিমা এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে। তবে কয়েকজন নাগা গ্রামবাসী গত দুদিনে জাপানিদের ছোট ছোট দলকে লুকিয়ে চুরিয়ে আসতে দেখেছে।'

জেনারেল স্কুন্সের গলার আওয়াজ এবার বদলে গেল। কোহিমা রক্ষার দায়িত্ব নীতিগত দিক থেকে তাঁরই। একসঙ্গে কতগুলো ফ্রন্টে লড়তে চায় এই জাপানিরা? বঙ্গোপসাগরের তীরে আরাকান যুদ্ধ হচ্ছে। জাপানের হানিয়া কর্নেল ক্রিশ্চিয়ানকে পেড়ে ফেলছে সেখানে। উত্তর বর্মায় একটা পুরো জাপানি ডিভিশন জেনারেল স্টিলউইলের বাহিনীকে আক্রমণ করেছে। ইম্ফল এলাকায় যুদ্ধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। সেখানে ব্রিটিশের দুটো ডিভিশন বিপদে পড়েছে। এরপর কোহিমাতেও যদি যুদ্ধ লাগে তবে কী ভাবে সামলান হবে এই বেড়া আগুন?

'রিচার্ডস, তোমরাই এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ার দখল নিচ্ছ না কেন? কামান বসাও সেখানে।' স্কুন্স পরামর্শ দিলেন।

'স্যার, আমার কাছে কোহিমা রক্ষার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া পাহাড়ের চূড়ায় কামান নিয়ে যেতে, যত তাড়াতাড়িই করি না কেন, দিন পনেরো তো লেগেই যাবে।'

কোহিমার ছাউনিতে পনেরোশো সৈন্য। তা ছাড়া সাহায্য করার জন্য আছে অসম রেজিমেন্ট আর এক হাজার অসামরিক কর্মী। সামনের পাহাড়গুলোর পেছনে জেসামি খারাসোম আর লিয়াশি থানা এলাকায় জাপানিদের ছোট ছোট দলের দেখা পাওয়ার খবরে রিচার্ডসের হৃৎকম্প শুরু হয়েছে। এইরকম মানসিক অবস্থায় উদ্বিগ্ন রিচার্ডস সামনের পাহাড়ের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন অনেকগুলো ফুটকি যেন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে সেখানে। পিঁপড়ের বাসা ভেঙে যাওয়ার মতো হঠাৎ পিলপিল করে হাজার হাজার জাপানি সৈনিক দেখা যেতে লাগল। হাত থেকে রিসিভার পড়ে গেল রিচার্ডসের। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন তিনি।

'স্যার, স্যার, নীচে কোহিমার বাজারে হইচই শুরু হয়েছে।' স্টাফ অফিসার আর সান্ত্রিদের চিৎকারে চটকা ভাঙল রিচার্ডসের।

'কী হয়েছে?'

'জাপানিরা এসে গেছে বলে চিৎকার শোনা যাচ্ছে।'

বাংলো থেকে বাজার দেখতে পাওয়া যায়। নিজের নিজের ঝুড়ি-টুকরি সামলে নাগা আর অন্যান্য আদিবাসীরা এদিক ওদিক দৌড়চ্ছে। চারদিক থেকে 'জাপানিরা এসে গেছে, জাপানিরা এসে গেছে।' চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ঘাবড়ে গেলেন রিচার্ডস। জাপানিরা এখনও অনেক দূর। মাঝখানের চড়াই-উতরাই ভেঙে এখানে পৌঁছনোটা সহজ নয়। হয়তো এক আধটা রেজিমেন্ট পৌঁছতে পারবে। কিন্তু সামনের পাহাড়ে যে কত সৈন্য রয়েছে তার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে না।

মনে মনে ঘাবড়ে গেলেও সাহসে বুক বাঁধলেন রিচার্ডস। কামান আর বন্দুক তৈরি রাখলেন।

ব্রিটিশ ছাউনি পাহাড়ের ঢালে। সেদিক দিয়ে একরকম খোলা জায়গাই বলতে হবে। ব্রিটিশ আত্মাভিমান জেগে উঠল রিচার্ডসের। বিশ হাজারই হোক আর ত্রিশ হাজারই হোক ওই বেঁটে জাপানিগুলো পিঁপড়ে ছাড়া আর কিছু নয়।

কোহিমার যুদ্ধক্ষেত্র অতি অদ্ভুত। অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রের থেকে একেবারেই আলাদা। মাঝখানে লড়াই হওয়ার মতো কোনও সমতল ভূমিই নেই। ওদিকেরই পাহাড় থেকে নেমে এলে মাঝখানে ডিমাপুর থেকে ইম্ফলে যাবার যে কাঁচারাস্তাটা আছে সেটাই দুপক্ষের সীমারেখা বলে ধরে নিতে হবে। দুই বড় পাহাড়ের মাঝখানে অনেক ছোট ছোট পাহাড়, গিরিখাত আর ঝরনা রয়েছে। আর রয়েছে সবকিছু ঢেকে দেওয়া সেগুনবন। আক্রমণ করার আগে দু'পক্ষই তাই দু'পক্ষকে ভাল করে বুঝে নিতে চায়।

হাতির পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে ঝটপট কামানের টুকরো টুকরো অংশগুলো জোড়া দেবার কাজে লাগল জাপানি ইঞ্জিনিয়াররা। ৬ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকে অগ্নিবর্ষণ শুরু হল। পাহাড়গুলো প্রতিধ্বনি তুলল দুই পক্ষের কামানের আওয়াজের।

দু' পক্ষ থেকেই একটু পরে আক্রমণ থামানো হল। মিয়াঝাকি ভালই বুঝতে পারলেন, ব্রিটিশ বাহিনী প্যাঁচে পড়লেও চট করে আত্মসমর্পণ করবে না। ছাউনির পেছনে তাদের একটা রিজার্ভ ব্রিগেডও রয়েছে। কাজেই সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হবেই। তাই জাপানি ফৌজ লেগে পড়ল ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কাজে।

সাতো প্রথমেই ইম্ফল যাবার রাস্তাটা বন্ধ করলেন। এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে মানুষ তো দূরের কথা জন্তু-জানোয়ারও যেতে না পারে। কোহিমার যে টিলার ওপর ছাউনি, কালেক্টর বাংলো সেটা এবং পশ্চিমদিকের পাহাড়গুলো বাদ দিয়ে কোহিমা অঞ্চলের বাকি প্রায় তিন-চতুর্থাংশতে জাপানিরা জাঁকিয়ে বসল। সুবিধেমতো জায়গায় কামান বসাল। নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করে তুলতে লাগল জাপানিরা।

ব্রিটিশ ফৌজ তাদের কামানগুলো জাপানিদের মতো তৎপরতায় পাহাড়ের ওপর তুলতে পারে না। রিচার্ডস তাকিয়ে থাকেন অপেক্ষায়। কামান ছাড়া জাপানিদের আক্রমণ করার কথাই ওঠে না। আচমকা আক্রমণও সম্ভব নয়। জাপানি ইঞ্জিনিয়াররা চারদিকে মাইন পেতে রেখেছে।

জেনারেল স্লিমের কাছে ইতিকর্তব্য জানতে চান রিচার্ডস। স্লিম বলেন, 'যখন একেবারে আর কোনও উপায় থাকবে না, তখন জানিয়ো। দু-এক স্কোয়াড্রন বিমান যে করেই হোক পাঠিয়ে দেব।'

ওদিকে মিয়াঝাকি গেলেন সাতোর কাছে। বললেন, 'স্যার, গোড়াতেই ব্রিটিশ ছাউনির ওপর আক্রমণ করা যাক।'

'আমাদের যা কাজ ছিল সেটা তো হয়েছে। ইম্ফলে যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি। তিন-চতুর্থাংশ কোহিমা অঞ্চলও কব্জা করে নিয়েছি। এখন কী করতে চাও?'

'সম্পূর্ণ ডিভিশন নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোহিমার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা যাক।'

'আমার আপত্তি নেই। তবে এ ব্যাপারে মুতাগুচির সঙ্গে কথা বলে নাও। চাও তো বিমান বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ কর। বিমানবাহিনীর সাহায্য পেলে দেখ ব্রিটিশ ছাউনির কী অবস্থা করি।'

'স্যার, এরকম কথা কেন বলছেন? আপনি তো জানেন, আমাদের বিমানবাহিনী এখন খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা যে আসতে পারবে না সেটা তো আপনি জানেন?' মিনতি করেন মিয়াঝাকি।

'ঠিক আছে। ধীরে-সুস্থে কোহিমা দখল করা যাবে। তোমার এত তাড়া কীসের?' সাতো অনড়।

মিয়াঝাকির সারা গা যেন জ্বালা করছে। কিন্তু জাপানি ফৌজে ওপরওয়ালার কথার প্রতিবাদ করা পাপ বলেই গণ্য হয়। যা ইচ্ছে তা করা যায় না। হাত শক্ত করে ধরে আছে জাপানের অলঙ্ঘনীয় 'সমর-সংহিতা'।

২

টিড্ডিম পেরিয়ে মেজর জেনারেল ইয়ামামোতোর বাহিনী চলেছে বিশানপুরের পথে। জাপানি বাহিনী আশা করছে আগামীকাল মোইরাং গ্রামে পৌঁছবে তারা। পনেরো-কুড়ি মাইল দূরে অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে মিটমিটে ইলেকট্রিক আলো দেখা যাচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কর্নেল শওকত মালিক সহকারী অভয় চ্যাটার্জিকে বললেন, 'ওই দূরে যেখানে আলো মিটমিট করছে ওটাই আমাদের ইম্ফল।'

'ইম্ফল' কথাটা কানে যেতেই সবাই সাগ্রহে তাকালেন সে দিকে।

'তা হলে এখানে না থেমে আমরা সোজা ইম্ফলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না কেন?' অভয় বলল।

'তুমি একটা পাগল। জেনারেল স্লিমের তিন ডিভিশন সৈন্য দিনরাত সতর্ক রয়েছে সেখানে। ইম্ফলের পাশেই ব্রিটিশদের চার চারটে বিমানঘাঁটি রয়েছে। ইম্ফলে যাওয়া অত সহজ নয়।' শওকত মালিক বললেন।

'এই সময় যদি ১৭ নম্বর ডিভিশনটা থাকত আমাদের সঙ্গে।' অভয় চ্যাটার্জি আক্ষেপ করেন।

৩৩ নম্বর জাপানি ডিভিশনের সেনাপতি মেজর জেনারেল ইয়ামামোতো জেগেই ছিলেন। একটা বিশাল আমগাছের নীচে তাঁর তাঁবু লাগানো হয়েছে। চারদিকে শুকনো পাতার খসখসানি। স্টাফ অফিসার ওয়ারলেস মেসেজ নিয়ে দৌড়ে এলেন।

'স্যার জেনারেল মুতাগুচির কাছ থেকে মেসেজ এসেছে।'

আলো জ্বেলে ইয়ামামোতো মেসেজটা পড়তে লাগলেন। 'শিগগির রওনা হও। জেনারেল ইয়ানাগিডার মতো বোকামি করে বোসো না।' "তেনেচোসেৎসু" অর্থাৎ আমাদের সম্রাটের জন্মদিনের আর মাত্র পনেরোদিন রয়েছে। যে-কোনও মূল্যেই হোক ইম্ফল আমার চাই-ই।'

জামান কিয়ানির বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ামামোতো মণিপুরের সমতল ভূখণ্ডের দিকে হামলা শুরু করেছেন। পেছনের টামু উপত্যকায় জামান কিয়ানি লড়াই করছেন। সাইকেলের চাকার স্পোক-এর মতো সব রাস্তাগুলো নানাদিক থেকে ইম্ফল-এর কেন্দ্রের দিকে গেছে।

'মেজর জেনারেল সাহেব, দিল্লির দিকে এগোনোর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি আমরা।' মালিক বললেন।

'ঠিক আছে! কাল মোইরাং-এ হামলা শুরু কর। তারপর বিশানপুর পড়লেই শত্রু আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। তখন ইম্ফলের কাছে যেতে পারব আমরা।'

'বিশানপুরের জন্য কী করতে হবে আমাদের?' শওকত বললেন।

'বিশানপুর থেকে শিলচরের দিকে যে রাস্তাটা গেছে তার ওপর একটা পুল শত্রুপক্ষের কাছে প্রতিরক্ষার জন্য খুব জরুরি। সেটার কী করা যায় তাই ভাবছি আমি।'

'সোজা আক্রমণ করব?'

'অত সোজা নয়। ওই পুলের জন্য ব্রিটিশদের অনেক ব্যবস্থা আছে।'

মোইরাং-এর ম্যাপটা মাথার পাশেই রেখেছেন শওকত। রাতে বার বার উঠে দেখছেন সেটা। লোকটাক নামে একটা আধমাইল লম্বা লেকের ধারে ছোট্ট গ্রাম এই মোইরাং। সেখানে অনেক নাগাপল্লি রয়েছে। খবর আছে ওই গ্রামে ব্রিটিশ সৈন্যরা একটা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে।

শেষরাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই হঠাৎ আওয়াজ এল, 'নেতাজি জিন্দাবাদ', 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ', 'বন্দেমাতরম্'।

কর্নেল মালিক চমকে গেলেন। এ আবার কী ব্যাপার? আলো ফুটতেই নাগা গ্রামবাসীদের একটা দল এল মালিকের কাছে। তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে শওকত আসতে দিলেন তাদের। সবার আগে কুরিয়ান সিং, সনবা সিং আর গ্রামের অন্যান্য মান্যগণ্যরা রয়েছেন। কুরিয়ান সিং 'জয় হিন্দ' বলে সেলাম করল শওকতকে। নেতাজির একটা চিঠি দিল সে।

'সাথিরা, আমি কুরিয়ান সিং। এই গ্রামেরই লোক। নেতাজির কাছ থেকে খবর পেয়ে আমি জঙ্গলের রাস্তায় গোপনে রেঙ্গুনে গিয়েছিলাম। আমার মতো আরও অনেক নাগা তরুণও তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছে। আমরা "আজাদ হিন্দ দলে"র লোক। নেতাজি যখন তাঁর সরকার এখানে প্রতিষ্ঠা করবেন, আমরা তাঁকে প্রশাসনের ব্যাপারে সাহায্য করব। আপাতত আপনাদের কী কাজে লাগতে পারি আমরা।'

'আমাদের খাবার জন্য চালগমের খুব অভাব।'

কুরিয়ান সিংয়ের মুখটা কালো হয়ে গেল। 'কর্নেল সাহেব। বড়ই দুর্ভাগ্য। একে তো যুদ্ধের জন্যে ভাল করে চাষ হয়নি। আমার নাগাসঙ্গীরা জঙ্গলে, গুহায়, গাছের ওপর আশ্রয় নিয়েছে। গোলাগুলিতে তাদের বড্ড ভয়। আটদিন আগে এই রাস্তায় ব্রিটিশ ফৌজ ইম্ফলে যাওয়ার সময় আপনারা সাহায্য যাতে না পান সে জন্য গ্রামকে গ্রাম একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। মোইরাং-ও এখন শ্মশানের মতো হয়ে গেছে।'

খবর শুনে মুষড়ে পড়লেন শওকত। তাঁকে ভরসা দিয়ে কুরিয়ান বলল, 'তবুও আপনি চিন্তা করবেন না। গ্রামবাসীরা এটা বুঝে গেছে যে নেতাজির সৈন্য মানে আমাদের আপনজন। ঘাসপাতা, ফলমূল, যা আমাদের আছে তাই আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে খাব আমরা। কিন্তু আপনারা লড়াই থামাবেন না। তা হলে আজাদি কেমন করে আসবে?'

১৪ এপ্রিল, ১৯৪৪ সন্ধেবেলা। নাগাদের গ্রামে ঢোল আর শিঙা বেজে উঠল। নাগারা গ্রামে যখন তাদের রাজা আসে তখন এইভাবে শিঙা বাজায়। তাদের নতুন রাজা অর্থাৎ নয়া সরকার এসে গেছে বলে তারা খুশিতে আত্মহারা। নেতাজির উর্দিপরা চেহারার একটা ছবি একটা মোটা বাঁশের লাঠিতে আটকে টাঙিয়ে দিয়েছে তারা। সে ছবিতেই বুনোফুলের মালা দিয়ে সাজিয়েছে তারা। মিছিলের সামনে হাত ধরাধরি করে নাচছে নাগা তরুণ-তরুণীরা। গোলাগুলির ভয় উধাও তাদের।

কয়েকদিন আগে ব্রিটিশ বাহিনী এখান দিয়ে যাবার সময় সত্যি সত্যিই শ্মশান করে দিয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম। মণিপুরের জঙ্গলে জাপানি আর আজাদ হিন্দ ফৌজের পৌঁছনোর খবর পৌঁছেছে তাদের কাছেও। তাই তাদের বিমানগুলো দিগ্বিদিক না দেখে বোমা ফেলে চলেছে। মোইরাং-এর অনেক গাছও বোমার আগুনে পুড়ে গেছে। নিষ্প্রদীপ মোইরাং রিক্তহাতে কিন্তু ভরা মনে আজাদ হিন্দ ফৌজকে স্বাগত জানাচ্ছে।

গ্রামের কাছারির কাছেই হেমারু থাম্বালয়ু সিং-এর একটা ঘর তখনও অক্ষত ছিল। সেই

ঘরটাতেই কর্নেল শওকত মালিক 'আজাদ হিন্দ ফৌজের পরবর্তী মুখ্যালয়' স্থাপন করলেন। দূরে বিশানপুরের দিক থেকে কামানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মোইরাং-এ যেন ঝড়ের আগেরকার থমথমে ভাব। তবুও সবার প্রাণে নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠার আনন্দ লহর তুলছে। অস্তসূর্যের আলোয় যখন মোইরাং-এ তেরঙা ঝান্ডা উড়ল তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের এই বাহাদুর গ্রুপের সৈন্যরা খুশিতে নাচছে। কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, কেউ বা মাথায়, মুখে মাটি মাখছে। কেউ কেউ মুখেও দিচ্ছে দেখে অন্যরা প্রশ্ন করলে উত্তর দিচ্ছে, 'দেশের মাটি যে, দোস্ত, খেয়ে দেখ না, কী দারুণ স্বাদ।'

নিজের ছোট্ট ভাষণের প্রথমেই কর্নেল মালিক বললেন, 'ইম্ফল তো দূরে নয়ই, দিল্লিও আর দূরে নয়।' আবার 'নেতাজি জিন্দাবাদ' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উঠল। তেরঙা ঝান্ডা উড়ছে পতপত করে। কর্নেল মালিকের ভাষণ শেষ হতে এক বুড়ো মতো নাগা উঠে বলল, 'তোমরা যে এগিয়ে এলে, ছেলেকে কোথায় রেখে এলে?'

'ছেলে? কে তোমার ছেলে?'

'সুভাষ, সুভাষ। তাকে পেছনে ফেলে রেখে এলে কেন?'

'দাদু, তোমার ছেলের মাথার ওপর যে অনেক দায়িত্ব। একসঙ্গে আট জায়গায় আজাদ হিন্দ ফৌজ লড়ছে। তাদের অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবস্থা, খাবার ব্যবস্থা সবই তো নেতাজির মাথার ওপর। তোমরা যদি আমাদের এই রকম সহায় থাকো তবে দেখবে কালো মেঘে বিজলির সঙ্গে সঙ্গে নেতাজি এসে পড়বেন এখানে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ঝড়ে উপড়ে যাওয়া গাছের মতো মুখ থুবড়ে পড়বে। দাদু, সে দিন আর বেশি দূরে নেই।'

'দেখো বাছারা, আমরা বেঁচে থাকতে থাকতেই দিল্লি পৌঁছতে হবে তোমাদের। ব্রিটিশদের মরা শরীরগুলোর উপর নাচবে তোমরা।'

ব্রিটিশ ফৌজের ষাট-সত্তরজন ভারতীয় সৈন্য মোইরাং-এর যুদ্ধে বন্দি হয়েছে। শওকত মালিক তাদের শোনালেন নেতাজির কথা, তাঁর দুঃসাহসী পরিকল্পনার কথা। মাতৃভূমির কাছে নিজেদের জীবন যে কত তুচ্ছ সে কথা বোঝালেন তাদের।

রাতে শওকত বাছা বাছা নাগাদের নিয়ে একটা বৈঠক করলেন। কুরিয়ান সিং-এর সহায়তায় কয়েকজন নাগা তরুণকে নিয়ে একটা দল তৈরি হল। এরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে গোপনে খবর সংগ্রহ করবে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা চাল জোগাড় করা গেল ছোট ছোট মাটির হাঁড়িতে সেগুলো ফুটিয়ে নিল নাগারা। জাপানি ক্যাপ্টেন ইসোন্ডার সঙ্গে কর্নেল মালিক সেই ভূরিভোজ তৃপ্তি করে খেলেন। মাঝে মাঝে বিশানপুরের দিক থেকে কামানের আওয়াজ শুনতে শুনতে শওকত মালিক নাগাদের আপ্যায়ন উপভোগ করছেন।

দুটি তরুণ মাটির হাঁড়িতে দেশি মদ নিয়ে এসে গ্রামের নজরানা হিসাবে শওকতের সামনে রাখল। শওকত হেসে বললেন, 'মদ খাওয়া আমি অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। মদের নেশা কখনও না কখনও কেটে যায়, কিন্তু নেতাজির কাছ থেকে পাওয়া দেশকে ভালবাসার নেশা কখনও কেটে যায় না। যতদিন লালকেল্লায় তেরঙা ঝান্ডা না উড়ছে ততদিন এ নেশার ঝোঁক কাটবে না।'

রাতে নিজের ক্যাম্প খাটে মেজর জেনারেল ইয়ামামোতো শুয়ে রয়েছেন। গার্ড ডিউটির ক্যাপ্টেন তাঁকে জাগাতে রাজি নন। আজাদ হিন্দ ফৌজের চার সৈনিকও নাছোড়বান্দা।

'ইয়ামামোতোর সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে হবে আমাদের।'

'তাঁকে এখন ওঠানো যাবে না।'

'তাঁকে বলুন যে নেতাজির কাছ থেকে জরুরি খবর এসেছে।'

'চন্দ্রা বোসের কাছ থেকে?'

'হ্যাঁ।'

আড়মোড়া ভেঙে কাঁচাঘুম থেকে উঠলেন ইয়ামামোতো। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? এত রাতে? কী খবর এসেছে?'

'মিথ্যে বলব না স্যার। আমাদের ঘুম আসছে না। সারা শরীর যেন জ্বালা করছে। মনে হচ্ছে নুন মাখানো ছুরি দিয়ে কে যেন খোঁচাচ্ছে আমাদের।'

'কিন্তু তার জন্য এই রাতে কী করতে চাও তোমরা?'

'শিলচরের রাস্তার ওপরে পুলটাই তো আমাদের এগিয়ে যাবার পথের বাধা। আপনি কয়েকটা শক্তিশালী বোমা দিন। সেগুলো পেটে বেঁধে আমরা গিয়ে ওই পুল উড়িয়ে দিচ্ছি। তা হলে রাস্তাও সাফ।'

বিস্ফারিত চোখে ইয়ামামোতো তাকিয়ে থাকেন এই তরুণদের দিকে। পাশেই ছিলেন ফুজিয়ারা। তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। ইয়ামামোতো নিজের দুজন সৈন্যকে তাদের সঙ্গে দিলেন।

শিলচরের রাস্তায় আশিফুট গভীর খাদের ওপর সেই বিশাল পুল বাঁধা হয়েছে। ভোররাত্রের ঠান্ডায় পাহারাদার ব্রিটিশ টমিরা ধুনি জ্বালিয়ে হাত পা সেঁকছে। তারা বুঝতেও পারল না কখন সেই ছজন সেপাই জলের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে পুলের ঠিক তলায় এসে হাজির হল। গায়ের ওপর কাঁকড়ার বাচ্চারা কিলবিলিয়ে উঠছে। অতি সাবধানে গা থেকে তাদের নামিয়ে দিচ্ছে তারা। সবাই আস্তে আস্তে জায়গামতো তৈরি হয়ে বসল। একসঙ্গে ফাটল বোমাগুলো। কেঁপে উঠল দূরের পাহাড়। আগুনের ঝলক আকাশ ছুঁতে চাইল। পুলের থামগুলো আর তার সঙ্গে পুলটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল খাদের মধ্যে। বোমার আওয়াজ ছাপিয়েও শোনা গেল 'বন্দেমাতরম্'।

দূর থেকে ইয়ামামোতো আর কর্নেল শওকত অবাক বিস্ময়ে দেখলেন সে দৃশ্য। মোইরাং-এ তোলা তেরঙা ঝান্ডাটা তখন ভোরের হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে।

৩

নেতাজির বিশেষ বিমান 'আজাদ হিন্দ' মেমিয়োর বিমানঘাঁটিতে এসে নামল। আজাদ হিন্দ সরকারের ইয়েলাপ্পা, ব্যারিস্টার রাঘবন, ভাই পরমানন্দ প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত আছেন। কর্নেল লক্ষ্মী একটা মালা পরিয়ে দিলেন নেতাজির গলায়। ওপরে হাসিমুখ থাকলেও নেতাজিকে দেখে বোঝা যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে কী যেন একটা চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁকে। নেতাজির চোখ যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঠিক এই সময় একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে এসে জেনারেল মুতাগুচি জাপানি কায়দায় ঝুঁকে নেতাজিকে সম্ভাষণ করলেন। দুজনে চলে গেলেন কানাত ফেলে তৈরি করা অস্থায়ী লাউঞ্জের ভেতরে।

'চলুন, গভর্নর হাউসে মুখ্যালয়ে যাওয়া যাক।' নেতাজি বললেন।

'কী ব্যাপার? কিছু হয়েছে?' মুতাগুচি জিজ্ঞেস করলেন।

'এখানে বলা যাবে না।' নেতাজির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছেই নেতাজি বললেন, 'জেনারেল, আজ ২২ এপ্রিল।

তেনেচোসেৎসু অর্থাৎ আপনাদের সম্রাটের জন্মদিনের আর মাত্র সাতদিন বাকি। ইম্ফলের কী হল?'

মুতাগুচি মুখ নামিয়ে নিলেন। নিজেই বুঝতে পারছেন তাঁর নিশ্বাসের গতি বেড়ে গেছে। যুদ্ধের যে পরিস্থিতি তাতে সাতটা দিন হাওয়ার মতো চলে যাবে। ফ্রন্টে অগ্রগতির খবর পাওয়া গেলেও কোহিমা, উখরুল আর বিশানপুর— কোনও ফ্রন্টেই বড়সড় কোনও জয়ের খবর নেই। ২৯ এপ্রিল ইম্ফলে সম্রাটের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানের আশা তো সুদূরপরাহত।

চিন্তিত মুতাগুচির মুখ থেকে কথাগুলো যেন হঠাৎ বেরিয়ে এল, 'কিছু একটা বিশেষ রকম গোলমাল হয়েছে।'

'জেনারেল সাহেব আপনার ৮৫ হাজার সৈন্য আর আমাদের দুই ডিভিশন সৈন্যের সমস্ত ভবিষ্যতের প্রশ্ন এটা। আমার দেশবাসী যদি আমাকে প্রশ্ন করে, 'সুভাষ পৃথিবীর অর্ধেকটা ঘুরে বেড়িয়ে, তুমি কী খুঁজে পেলে? তবে আমি কী জবাব দেব তাদের?'

মুতাগুচিকে আগে থেকেই অত্যন্ত অস্থির লাগছিল। ভেতরের জ্বালা আর সামলাতে না পেরে তিনি বললেন, 'আমার কপালদোষে আমার ভাগ্যে এরকম সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড জুটেছে। ব্রিটিশের ১৭ নম্বর ডিভিশনের কুড়ি হাজার টমি শুরুতেই ইয়ানাগিডার কবলে একেবারে অসহায় অবস্থায় পড়েছিল। কিন্তু তার বোকামিতে তারা ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে। যুদ্ধের নিয়মানুসারে এটার মতো অপরাধ আর নেই।'

'জেনারেল মুতাগুচি, যে করেই হোক আপনাকে আর সেই সঙ্গে আমাকেও এই গাড্ডা থেকে বেরোতে হবে। ইম্ফলের পতনের পর সারা দেশে বিপ্লবের ঝান্ডা তুলে ধরতে হবে। তার জন্য আমার হাজার হাজার আন্ডারগ্রাউন্ড সঙ্গীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তারা শুধু দিন গুনছে ইম্ফলের পতনের।'

নেতাজির কাতর স্বরে ছটফট করে উঠলেন মুতাগুচি। জাপানিদের ওপর তাঁর অবিশ্বাসের কথাও জানতেন মুতাগুচি। তিনি নেতাজিকে বললেন, 'এই মুতাগুচিই একদিন চিনের সঙ্গে যুদ্ধে ভেলকি দেখিয়েছিল। ছুরি দিয়ে পাউরুটি কাটার মতো অনায়াসে মালয়েশিয়া দখল করেছিল। সেই মুতাগুচিই আজ আপনাকে ভরসা দিচ্ছে। একটু-আধটু গোলমাল হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু অবস্থা এখনও আয়ত্তের বাইরে যায়নি। চিন বলুন, মালয়েশিয়া বলুন মুতাগুচি কোথাও ব্যর্থ হয়নি। ভারতবর্ষের যুদ্ধেও ব্যর্থ হবে না সে। লালকেল্লায় আপনি যখন ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করবেন তখন আপনার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলানোর কথা মনে আছে আমার।'

নেতাজির হাত শক্ত করে ধরে মুতাগুচি এবার বললেন, 'তোজোর কথাই আমার কথা। ভারতবর্ষ জাপানকে ভগবান বুদ্ধের বাণী দিয়েছে, এক নতুন সংস্কৃতি দিয়েছে। ইম্ফলকে উপঢৌকন হিসাবে আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা সে দানের প্রতিদান দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

নেতাজি উঠলেন। ওদিকে কাজের পাহাড় জমে রয়েছে। তিনি মুতাগুচিকে একটু মনে করিয়ে দিলেন, তাঁর আগের কথা। 'একটা গোলাপবাগান যদি শুকিয়েও যায় হাজারটা গোলাপবাগান করা যাবে। কিন্তু এবার জলদি করুন। এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন।'

মুতাগুচিরও শিক্ষা হয়েছে। সহকারীদের ওপর নির্ভর করার একটা সীমা আছে। মেমিয়োর গোলাপবাগানে এখন ফুল না কাঁটাই বেশি মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, 'চন্দ্রা বোসজি, আজই আমি এখান থেকে রওনা দিচ্ছি।'

২২ এপ্রিল দুপুরবেলা। আকাশের দিকে তাকিয়ে নেতাজি দেখলেন একটা জাপানি জিরো বিমান মেমিয়ো থেকে উড়ে গেল।

৪

মেমিয়োর অফিসে দিনরাত কাজ করে চলেছেন নেতাজি। খাদ্য সংগ্রহ করাটাই সবচেয়ে কঠিন। তবু মেমিয়োর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সদস্যদের আপ্রাণ চেষ্টায় রণাঙ্গনের দিকে কিছু কিছু খাদ্য লরি করে পাঠানো হচ্ছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে জাপানি বিমান বাহিনীর শক্তি এখন নেই বললেও চলে। তাই এই মওকায় ব্রিটিশ আর আমেরিকান বিমানগুলো যেখানে সেখানে যেমন খুশি বোমা ফেলে যাচ্ছে। মেমিয়োতে প্রত্যেক রাতে পুরো ব্ল্যাক আউট। এমনকী হাসপাতাল আর ক্যাম্পেও মোমবাতি আর কুপি জ্বেলে কাজ হচ্ছে।

ড. বাওয়া আর কর্নেল লক্ষ্মীর সঙ্গে নেতাজি সামরিক হাসপাতালে আহত সৈনিকদের দেখতে গেলেন। এদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের হাত পা খুইয়েছে। তবু নেতাজিকে দেখে তারা উল্লসিত। ঝাঁসির রানি বাহিনীর মেয়েদের নিষ্ঠা দেখে গর্বে বুক ভরে ওঠে নেতাজির। সৈন্যদের অনেকেই সজল চোখে তাকে বলল, 'নেতাজি আমাদের মা বোনেরাও আপনার এই মেয়েদের মতো সেবা করতে পারত না।'

ওষুধপত্রের অভাব। কিন্তু সে সম্পর্কে কারও মুখে কোনও অভিযোগ শোনা গেল না। একটি সৈনিকের পায়ে প্লাস্টার করে ওপর থেকে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। নেতাজিকে দেখে তার মুখে ব্যথা ছাপিয়ে হাসি ফুটে ওঠে। কৃতজ্ঞকণ্ঠে সে বলে, 'নেতাজি, আমার এই বোনটি গত দু'রাত আমার জন্য ঘুমোয়নি।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন নেতাজি। লাবণ্যবতী চ্যাটার্জি। কনেচন্দন ভাল করে ধুয়ে যাবার আগেই যোগ দিয়েছিল ঝাঁসির রানি বাহিনীতে। চুলটাও ছোট করে কেটে ফেলেছে। পরনে পুরুষের পোশাক। 'জয় হিন্দ' বলে ফৌজি কায়দায় স্যালুট করল লাবণ্য।

'নেতাজি, আমার অভয় কোথায়?'

'ফ্রন্টে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কর্নেল শওকতের সঙ্গে মোইরাং-এ আছে অভয়।'

দুদিন পর, দুপুরবেলা নেতাজি নিজের অফিসে বসে কাজ করছেন। মানবতী আর্যকে সঙ্গে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তভাবে লাবো অর্থাৎ লাবণ্যবতী এল সেখানে। শুকিয়ে যাওয়া চোখেমুখে প্রচণ্ড ভয় আর উদ্বেগ।

'নেতাজি, আমি একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আমার অভয় এসেছিল স্বপ্নে। সারা শরীর রক্তে মাখামাখি। তা ছাড়া আমার ঘড়িটা হঠাৎ হাত থেকে খুলে পড়ে গেল খাদের মধ্যে। চারদিকে সব কিছুর মধ্যেই অমঙ্গলের চিহ্ন।' লাবণ্যবতী আর বলতে পারে না। কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে তার। সমস্ত শরীরটা শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে।

লাবণ্যকে কাছে টেনে নেতাজি তাকে শান্ত করতে থাকেন। 'ঘড়ি হারিয়েছ তো কী হয়েছে? এই নাও ঘড়ি।' নিজের হাত থেকে ঘড়িটা খুলে লাবণ্যকে দিলেন নেতাজি।

'কিন্তু আমার অভয়?'

'আসবে, আসবে। সেও আসবে। এখন তো দেশের জন্য লড়াই করছে ফ্রন্টে। এখন কী করে আসবে বল?'

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীও এসেছেন সেখানে। লাবণ্যবতীর অস্থিরতার খবরটা তিনিও পেয়েছেন। তিনিও সামলাতে থাকেন লাবণ্যকে। নেতাজির সঙ্গে কথা বলে অনেকটা হালকা হয়েছে লাবণ্যবতী।

'লক্ষ্মী, তোমার মেয়েরা শুনছি একটা নাটক অভিনয় করবে?'

'হ্যাঁ। ৩০ এপ্রিল। সেইদিন সবাই মিলে একটু ভাল খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মানবতী আর্যই নাটকটা লিখেছে। নাম 'পরিবর্তন'।

'বাঃ। তো তোমাদের নাটকে লাবণ্যর পার্ট আছে তো?'

'লাবণ্যই তো হিরোইন।' মানবতী বলল।

'অ্যাঁ। হিরোইন নিজেই এমন করছে? তবে নাটকের হাল কী হবে?'

লাবো এবার খুব লজ্জা পেল। মেয়েরা সবাই চলে গেল এবার।

৩০ এপ্রিল নাটকটা যাতে ভাল হয় তার জন্য মানবতী, শকুন্তলা গাঁধী, অরুণা আর করুণা গাঙ্গুলি বলে দুই বোন খুব খাটছে। মানবতীর লেখা নাটকটা সবার খুব ভাল লেগেছে। নাটকের নায়িকা, দেশকে দারুণ ভালবাসে। আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছে সে। কিন্তু তার প্রেমিক একেবারেই অন্যরকম। দেশ নয়, টাকা ভালবাসে সে। দারুণ হিসেবি। নায়িকা তাই প্রেমিককে তার দেওয়া আংটিটা ফেরত দিয়ে দেয়। সে যদি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ না দেয় তবে তার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না নায়িকা। প্রেমিকপ্রবর দুঃখে নেশার আশ্রয় নেয়, কিন্তু শান্তি পায় না। তারপর একদিন তার চোখ খোলে। প্রেমিকার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সেও যোগ দেয় আজাদ হিন্দ ফৌজে।

এই নাটকের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় লাবণ্য একটু সামলাতে পেরেছে নিজেকে। ৩০ এপ্রিল নাটকের অভিনয় হওয়ার কথা। তার আগের দিন ভোরবেলা নেতাজি লক্ষ্মী আর ইয়েলাপ্পাকে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীরভাবে বললেন, 'লক্ষ্মী আজ রাতেই নাটকটা করার ব্যবস্থা কর।'

'কিন্তু তৈরি হতে যে এখনও অনেক বাকি।'

'একদিনের জন্য এমন কিছু তফাত হবে না।'

সবাই বুঝতে পারল যে নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও কারণে নেতাজি এই অনুষ্ঠানটাকে একদিন আগে করতে চাইছেন। লক্ষ্মী আর ইয়েলাপ্পা যখন বেরোতে যাবেন তখন ইয়েলাপ্পাকে আলাদা করে আস্তে আস্তে বললেন নেতাজি, 'অল ইজ নট ওয়েল মাই কুবের।'

রাতে পরিষ্কার আকাশ। অনুষ্ঠানের শুরু হল দেশভক্তির গান দিয়ে। প্রেম সেহগলও গাইলেন। উদাত্ত কণ্ঠ তাঁর। লক্ষ্মী আর প্রেমের মধ্যে ভালবাসার কথাটা চাপা নেই। কিন্তু দুজনের কাছেই দেশ আগে। তাই এই পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা আর এগোতে পারছে না।

নাটক উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করল। বিশেষ করে নায়িকার ভূমিকায় নাটককার মানবতী নিজে আর নায়কের ভূমিকায় লাবণ্য অনবদ্য অভিনয় করল। নেতাজির সঙ্গে উপস্থিত অন্যান্য অফিসাররাও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত।

লক্ষ্মী আর ড. বাওয়া কিন্তু সম্পূর্ণ নাটকটা দেখেননি। নাটক চলার মধ্যেই ড. বাওয়া, লক্ষ্মীকে আস্তে আস্তে ডেকে নিয়ে গেলেন একটু দূরে। ড. বাওয়ার অস্থির চেহারা দেখে লক্ষ্মীও সন্ত্রস্ত। একটু দূরে লক্ষ্মীকে নিয়ে এসে ড. বাওয়া বললেন, 'একটা খারাপ খবর আছে লক্ষ্মী। মোইরাং-এর পাশের নদীতে অভয় নৌকো করে সঙ্গীদের নিয়ে যাচ্ছিল। ব্রিটিশদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কামান হাতবোমা মেরে উড়িয়ে দেবার প্ল্যান ছিল তাদের। কিন্তু তার আগেই শত্রুর গুলিবর্ষণে গোলাবারুদ ভরতি নৌকোটা টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেছে। সব শেষ লক্ষ্মী।'

খবরটা শুনে লক্ষ্মী স্তম্ভিত। এই সাংঘাতিক খবরটা লাবণ্যবতীকে কীভাবে দেওয়া যায়? অনুষ্ঠান কখন শেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্মী এবার মানবতীকে সঙ্গে নিলেন। দুজনেই নিজেদেরই সান্ত্বনা দিতে পারছেন না, তা লাবণ্যকে কি বলবেন? তবু বলতে হবেই! দুজনে লাবণ্যর খুপরিতে গেলেন। লাবণ্য তখন মেক-আপ তোলার জন্য তেল ঘসছে মুখে।

'লাবো, "ঝাঁসির রানি" নাটকটা পড়েছিস?'

'হ্যাঁ। তা তো পড়েছি। কিন্তু হঠাৎ এই কথাটা বলার জন্যেই কি এত রাতে তোমরা দুজন এসেছ আমার কাছে?' লাবণ্যর প্রশ্নে সাদা হয়ে গেল দুজনের মুখ। এবার লাবণ্যও বুঝল কিছু একটা হয়েছে। আকুলভাবে লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, 'দিদি, আমার কাছে লুকিয়ো না। কী হয়েছে? খুলে বল?' এবার মানবতীও আরেক পাশ থেকে জড়িয়ে ধরলেন লাবণ্যকে। আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে বললেন সব কথা। লাবণ্যর চোখ বিস্ফারিত। পাগলের মতো দেখাচ্ছে তাকে। হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাগলের মতো ছুটল সে। লক্ষ্মী আর মানবতী কোনওরকমে ধরল তাকে। কিন্তু সামলানো যাচ্ছে না লাবণ্যকে। শেষ পর্যন্ত আস্তে আস্তে বুঝিয়ে তাঁরা শান্ত করলেন তাকে।

৩০ এপ্রিল রাত্রে কন্ডোজি লেকের দিকে চাঁদ সবে উঠছে। আজ সারাদিন লিলি নামে ঝাঁসিরানি বাহিনীর একটি মেয়ের খুব জ্বর। লক্ষ্মী ছিলেন তার কাছে। সন্ধের সময় লক্ষ্মী এক ফাঁকে সবে লাবণ্যর কাছে এসেছেন এমন সময় সাইরেন বেজে উঠল। মেয়েরা সবাই বেরিয়ে এসে ট্রেঞ্চে লাফিয়ে নামল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোমা পড়া শুরু হল। বেশ বোঝা গেল বোমার লক্ষ্য ক্যাম্প আর হাসপাতাল। হঠাৎ ট্রেঞ্চের মধ্যে লক্ষ্মীর মনে পড়ল লিলির কথা। দৌড়ে গিয়ে লিলিকে কোলে করে বেরিয়ে আসতে না আসতেই বোমা পড়ল হাসপাতালে। এক চুলের জন্য বাঁচলেন দুজনে।

সকাল হলে দেখা গেল, যেখানে ক্যাম্পটা ছিল, সেখানে এখন অনেকগুলো পুকুরের মতো গর্ত। বেশ বোঝা গেল জায়গাটার নিখুঁত ম্যাপ ছিল শত্রুর বৈমানিকদের কাছে।

পাশের জঙ্গলে এমারজেন্সি শিবির তৈরি হল, তাঁবু, বাঁশ, খড় ইত্যাদি দিয়ে। এরই মধ্যে লাবণ্য পাগলের মতো সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে 'নেতাজি সব জানতেন। নয়তো তিনি অনুষ্ঠানটা একদিন এগিয়ে দেবেন কেন?'

নেতাজিকে অসম্ভব গম্ভীর লাগছে। ভেতরে ভেতরে একটা প্রচণ্ড ছটফটানির আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাঁর আপাত শান্ত চেহারায়। ইয়েলাপ্পাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। 'ইয়েলাপ্পা সাহেব। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সেদিন আপনাকে বলেছিলাম যে অল ইজ নট ওয়েল। আমাদের মধ্যে কেউ শত্রুকে খবর দিচ্ছে। তাকে খুঁজে বার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেই হবে। এই নেকড়েটাকে খুঁচিয়ে খতম করতে হবে।'

পরের দিন লক্ষ্মী সহায় সাহেবকে গিয়ে নেতাজির সঙ্গে আলোচনা করছেন। ঠিক সেই সময় পাগলের মতো লাবণ্য এসে উপস্থিত হল। নেতাজির পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে আকুল হয়ে সে বলল, 'নেতাজি আপনি অন্তর্যামী। আপনি তো সব দেখতে পান। এই ব্যাপারটা তো আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন আপনি। তাই তো নাটকের অনুষ্ঠানটা একদিন আগে করতে বলেছিলেন। তবে আপনি আমাকে মিথ্যে কথা কেন বললেন? কেন বললেন অভয় ফিরে আসবে।'

লাবোর উন্মাদিনী অবস্থা দেখে খুব খারাপ লাগছে নেতাজির। 'তুমি ভুল করছ মা। আমি কোনও ভবিষ্যদ্বক্তা বা পির-পয়গম্বর নই। আমি একটা সাধারণ মানুষ। মাতৃভূমির জন্য

জীবনের বাজি রাখা এক পথিক। মা রে, সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত নিয়তিকে কেউ ঠেকাতে পারেনি। শ্রীরাম আর শ্রীকৃষ্ণকেও তো একদিন অযোধ্যা-দ্বারকা ছেড়ে যেতে হয়েছিল মহাপ্রয়াণে।' অনেক করে বুঝিয়ে লাবণ্যকে তাঁবুতে পাঠালেন নেতাজি। লাবণ্যকে সান্ত্বনা দিলেও নেতাজি নিজে সান্ত্বনা পান না। লক্ষ্মীকে বললেন, 'লক্ষ্মী জেলখানা বা জীবনের দুর্গম পথে চলতে আমার কোনও কষ্ট হয়নি। কিন্তু স্বজন হারানোর ব্যথা আমাকে অস্থির করে তোলে। লাবণ্যর শোক আমাকে বারবার আমার এমিলির কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।'

'এমিলি? এমিলি কে?' লক্ষ্মী আশ্চর্য।

অজান্তে মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। বিব্রতভাবে চুপ করে গেলেন তিনি। একটু পরে নিজে থেকেই বললেন, 'তোমার কাছে লুকোব না লক্ষ্মী। কিন্তু যাই ঘটুক, কাউকে বোলো না তুমি। আই অ্যাম ম্যারেড। এমিলি আমার স্ত্রী।'

লক্ষ্মী হতভম্ব। 'এত বড় একটা খবর এমনভাবে চেপে রেখেছেন আপনি? কেন?'

'কারণ এই যুদ্ধ। কাউকে ভরসা নেই। ইউরোপের যুদ্ধের অবস্থা ভাল নয়। আমি চাই না আমার জন্য এমিলি আর আমার অনিতার কিছু ক্ষতি হয়।'

অনিতার কথা বলতে বলতেই চোখ জলে ভরে আসে নেতাজির। কাতরে ওঠেন তিনি।

'লক্ষ্মী, যখন আমি জার্মানি থেকে রওনা হই তখন আমার অনিতা মাত্র দু'মাসের মেয়ে। তার মুখে বুলি ফোটেনি। ছোট কুঁড়িটার মতো ফুটে উঠতে চাইছে। আমার মেয়ে এতদিনে নিশ্চয়ই হাঁটি হাঁটি পা পা ছেড়ে ছোট ছোট পায়ে ছুটে বেড়াচ্ছে বাড়িময়।'

'নেতাজি আপনিও তো ছুটে বেড়াচ্ছেন।'

'এটাই আমাদের ভাগ্য লক্ষ্মী। সবাই যাতে ভবিষ্যতে ভাল থাকে, তার জন্য আমাদের বর্তমান, আমাদের ভবিষ্যৎ তো বটেই— আমাদের প্রিয়জনদেরও উৎসর্গ করতে হয়। তাদের জীবনে থাকে মরুভূমির শূন্যতা।'

'কিন্তু এটাই তো সাধনার দস্তুর নেতাজি।'

'এ সাধনা বড় পাগল করা সাধনা লক্ষ্মী। মনের দিকে না তাকিয়ে কূলহীন, দিগন্তহীন সমুদ্রে ভেসে চলা। প্রিয়জনদের থেকে দূরে, ঘর ছেড়ে অজানার আহ্বানে শুধু চলা আর চলা।'

৫

মোইরাং বিজয়ের খবরে গাঁধী রেজিমেন্ট আনন্দে উত্তাল। পেছনের টামুর সংকীর্ণ উপত্যকায় গাঁধী রেজিমেন্টের মূল ঘাঁটি। ডিভিশন অধিনায়ক জেনারেল কিয়ানির পরিখার পাশে অনেক সৈনিক জড়ো হল।

জামান কিয়ানির পাশেই বসে আছেন জাপানি সেনাপতি ইয়ামামোতো। ড. আকবর শাহ্ বলে উঠলেন, 'ইয়ামামোতোজি, আমাদের একটা সুযোগ দিন। আমরা কি করতে পারি দেখার জন্য নেতাজি, উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন।'

ঠিক তখনই মাথার ওপর দিয়ে চারটে আমেরিকান বিমান উড়ে গেল। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ইয়ামামোতোর মাথায় একটা চিন্তা ঝলকে উঠল। পরক্ষণেই বলে উঠলেন তিনি, 'শত্রুর আসল শক্তি তাদের বিমানবাহিনী। তাদের এই সুরক্ষাবর্মের ওপরই আঘাত হানব আমরা।'

'তার মানে? কী করতে চান আপনি?' জামান কিয়ানি বললেন।

'ওদের একটা বিমানঘাঁটি ওড়াবার সুযোগ আপনারা পেতে পারেন।'

'কোন বিমানঘাঁটি?' এনায়েত বলে একজন জিজ্ঞেস করল।

'পালেলের বিমানঘাঁটি। মাত্র কয়েক মাইল দূরেই রয়েছে এই বিমানঘাঁটি।' ইয়ামামোতো বললেন। 'কিন্তু সেখানে দারুণ কড়া পাহারা। ওখানে যাওয়ার চেষ্টা মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো।'

'আমরা যাব, ওই বিমানঘাঁটি উড়িয়ে দেব।' একসঙ্গে অনেকে বলে উঠল। ফুজিয়ারা কিয়ানিকে বললেন, 'সত্যিই যদি এই বিমানঘাঁটি আজাদি সৈন্যরা ধ্বংস করতে পারে, তবে আমি দারুণ খুশি হব।'

কিয়ানি বললেন, 'বাঘের গুহায় ঢুকে লড়াই করার মধ্যেই তো আসল বাহাদুরি। এ কাজ আমরা করে দেখাব।'

ইয়ামামোতো প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'তোমাদের পেছনে আমাদের একদল সৈন্যও যাবে।'

গাঁধী রেজিমেন্টের সবাই উৎসাহে টগবগ করছে। 'বলো, কে এই দলের দায়িত্ব নেবে?' কিয়ানি যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। 'আমি!' সবাই তাকিয়ে দেখল কর্নেল প্রীতম সিং উঠে দাঁড়িয়েছেন। পঞ্জাবের দৃপ্ত শৌর্য যেন ঝলসে উঠল। পথে অনেক বিপদ। তাই মেডিক্যাল বিভাগের ড. আকবর শাহ্-ও সঙ্গে চললেন। সঙ্গে নেওয়া হল শুধু একদিনের খাবার। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করে ফিরে আসতে হবে এই পরিকল্পনা করে ৩০০ জন সাহসী সৈনিক রওনা হল এই দুঃসাহসিক অভিযানে।

দারুণ উৎসাহে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, কখনও উঁচু কখনও নিচু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে আজাদি সেনার দল। ম্যাপ অনুযায়ী দূরত্ব মাত্র ১২ মাইল। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ যেন আর শেষ হয় না। শত্রুর বিমানের নজর থেকে বাঁচবার জন্য রাতের অন্ধকারে চলেছে সৈন্যরা। গাছে গাছে বাঁদরগুলো ভয় পেয়ে কিচমিচ করছে। মাঝে মাঝে গভীর খাদের মধ্যে থেকে বাঘের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। একসময় আজাদি সেনারা কাছের পুরুম চ্যাপাং গ্রামে ঘাঁটি গেড়ে বসল।

২ মে, ১৯৪৪। রাতের অন্ধকারে খাদগুলো ভয়ংকর দেখাচ্ছে। একটা টিলার ওপর থেকে জঙ্গলের মাঝখানে বিমানঘাঁটিটা দেখতে পেলেন প্রীতম সিং। ইম্ফল কত কাছে তবু কত দূর। নেতাজির বেতারভাষণের আহ্বান মনে পড়ে প্রীতম সিংয়ের। ইম্ফলের কাছেই এ পাহাড়টা ভারতবর্ষেরই অঙ্গ। মনে হচ্ছে মাটি কাঁদছে, 'মুক্ত করো আমাকে, মুক্ত করো এই গোলামি থেকে।' ইম্ফলে ব্রিটিশের দুর্গ পড়েও পড়ছে না। ইম্ফল জয় করবার আগে এই বিমানঘাঁটিটা শেষ করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বিমানঘাঁটির চারপাশে অনেক বিমান বিধ্বংসী কামান বসিয়েছে ব্রিটিশেরা। কাঁটা তারের বেড়া ঘেরা সৈন্যদের ছাউনি। রাতদিন পাহারা। এইসব পাহারা-চৌকি আগে উড়িয়ে দিতে হবে। প্রীতম, একদিকে ক্যাপ্টেন সাধু সিং আর অন্যদিকে আর এক সহকর্মীকে পাঠালেন। অতি সাবধানে, দম বন্ধ করে সঙিন সামলে, আস্তে আস্তে পা ফেলে জওয়ানেরা এগিয়ে চলল রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।

প্রীতম সিং হঠাৎ ঢুকলেন এক পাহারা-চৌকিতে। ভেতরে অসতর্ক পাহারাদারদের মধ্যে দুজন গোর্খা সৈনিক থরথর করে কাঁপছে। তাদের বুকের ওপর সঙিন তুলে ধরতেই পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে তারা তাদের না মারার জন্য মিনতি করতে থাকে সজল চোখে। লাল সিং চেঁচিয়ে উঠল, 'প্রীতম, গুলি চালাও।'

'মত্ মারো, হাম হিন্দুস্থানি হ্যায়।' আকুল কাকুতিতে ভেঙে পড়ে লোক দুটো।

'হিন্দুস্থানি' শব্দটা তীরের মতো প্রীতম সিং-এর বুকে বেঁধে। 'হিন্দি ভাইদের ওপর গুলি

চালিয়ো না। তাদের বোঝাবে আমরা কীসের জন্য লড়াই করছি।' নেতাজি একবার বলেছিলেন। তাই এই দুজনের কাকুতি মিনতি আরও বেশি করে মনে লাগে প্রীতমের।

'হামারি ফৌজমে আওগে?'

'হাঁ-হাঁ জরুর, আউর সাথি লেকর আয়েঙ্গে।' সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে সেই দুজন। দুজন ব্রিটিশ টমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। গোর্খারা আত্মসমর্পণ করেছে। প্রীতম সিং আনন্দে অধীর। আরাকানের যুদ্ধেও এইভাবে বহু সৈন্য পক্ষ-পরিবর্তন করেছে। খুশিতে বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল প্রীতম। হঠাৎ দেখে টমি দুটো সামনে নেই। 'কোথায় গেল সেই গোরা দুটো?' গোর্খারা দেখিয়ে দিলে একটা কোণায় লুকিয়েছে তারা। দুটো গুলিতে লুটিয়ে পড়ল দুজন। প্রীতম সঙ্গীদের নিয়ে সামনের দিকে দৌড়লেন। যে 'হিন্দুস্থানি' ভাইয়ের ওপর ভরসা করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন প্রীতম তারাই এবার সুযোগ পেয়ে বন্দুক তুলে নিল। পেছন থেকে গুলি চলল। লুটিয়ে পড়ল লাল সিং। প্রীতমকে এবার লড়তে হচ্ছে সামনে-পেছনে।

ততক্ষণে আজাদি সেনাদের আর একটা দল পেছনদিক থেকে হামলা শুরু করেছে। মোট সাতবার হামলা চলল। সারারাত লড়াইয়ের পর দুটো পাহারা-চৌকি বিধ্বস্ত করে আজাদি সেনারা বিমানঘাঁটির মধ্যে ঢুকে পড়ল। রানওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা গোটা দুয়েক বিমানের ওপর শুধু গুলি নয় বড় বড় পাথর ছুড়ে জখম করতে লাগল সেগুলো। দুটো বিমানে আগুন লাগিয়ে দিল তারা।

এই প্রচণ্ড বিজয়ের মধ্যেও প্রীতম সিং চিন্তিত। ইয়ামামোতোর প্রতিশ্রুত জাপানি সৈন্যরা কোথায়? এই বিজিত বিমানঘাঁটি দখলে রাখা তো সম্ভব হবে না তাদের শক্তিতে। সাধু সিং বলল, 'প্রাণপণে লড়ব।' কিন্তু প্রীতম জানে সেটা সম্ভব নয়। এখান থেকে মাত্র চব্বিশ মাইল দূরে ইম্ফলের বিমানবাহিনী। দুশো আড়াইশো সৈনিক তাদের কাছে কিছুই নয়। তবু বলল, 'দেখি। যতক্ষণ পারব লড়ব।'

পালেলের বিমানঘাঁটিতে সব ব্রিটিশ টেকনিশিয়ানরা রক্তাক্ত শরীরে লুটিয়ে পড়েছে। তারই মধ্যে একজন যেন প্রেতের মতো উঠে দাঁড়াল একসময়। রক্তাক্ত দেহে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় সে। ওয়ারলেস যন্ত্রটাতে খবর পাঠাতে থাকে। 'হ্যালো হেড কোয়ার্টার, পালেল কলিং। পালেলের বিমানঘাঁটি জয়হিন্দওয়ালারা দখল করে নিয়েছে। বাস্টার্ড জিফস হ্যাভ ক্যাপচার্ড দিস এয়ারস্ট্রিপ। টেক নোট—ডু সামথিং...।' জড়িয়ে আসছে কথা, তারই মধ্যে খবর পাঠাতে থাকে সে।

ভোর হয়ে গেছে। জেগে উঠেছে পাখিরা। কর্নেল প্রীতম সিং আর তার সাথিরা যেন তাদেরই জিজ্ঞেস করছে—'কখন আসবে ইয়ামামোতোর সৈন্যরা? কখন আসবে তাদের সঙ্গে মেশিনগান। এই জিত যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।'

ওদিকে ইম্ফলে অসম্পূর্ণ ঘুম থেকে উঠে জেনারেল স্কুন্স এই ভয়ংকর খবরে থরথর করে কেঁপে উঠলেন। 'কী সাংঘাতিক! পালেল পতনের পর ইম্ফল আর কতই বা দূর। গেট আপ। বাঁচতে হলে পালেল বাঁচাতেই হবে। বল্ডউইন নিজে ডিউটিরত পাইলটদের নির্দেশ দিচ্ছেন। ইম্ফলের বিমানবন্দর থেকে একটির পর একটি বিমান ঝাঁক বেঁধে উড়ল আকাশে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ল পালেল বিমানঘাঁটি।

আজাদি সৈনিকেরা আসতে দেখল তাদের। পাশের জঙ্গলে পটাপট আশ্রয় নিল তারা। তাদের কাছে আছে শুধু রাইফেল আর ব্রেনগান। তাই নিয়েই লড়তে থাকে তারা।

বিমানগুলো থেকে অগ্নিবর্ষণ শুরু হল নির্বিচারে। 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দিয়ে লুটিয়ে পড়তে

লাগল বীর শহিদেরা। ড. আকবার শাহ্ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিছু নেই। নেই অসাড় করে দেওয়ার ইঞ্জেকশন। থাকার মধ্যে আছে একটা সাধারণ কাঁচি আর ক্ষুর। তাই দিয়ে গাছের নীচে তার সাধ্যমতো চিকিৎসা করে চলেছেন তিনি। যন্ত্রণায় চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তবু দাঁতে দাঁত দিয়ে যন্ত্রণা সহ্য করছে জওয়ানেরা। নিজের জন্য বিলকুল পরোয়া না করে জওয়ানদের দেখছেন ড. আকবর শাহ্।

দুশো মৃত্যুঞ্জয়ী বীর তাদের মৃত্যুহীন প্রাণ দান করে পালেলের মাটিকে পূত পবিত্র করে গেল।

৬

টামুর কাছেই একটা জঙ্গলে আজাদ হিন্দ ফৌজের গাঁধী রেজিমেন্টের ছাউনি পড়েছে। সেগুন গাছের ঘন ছায়ার আড়ালে ইনায়েত কিয়ানির রেজিমেন্টের প্রধান কার্যালয়। যে-কোনও মুহূর্তে শত্রুর বিমান হানা হতে পারে। তাই চারদিকে অনেক ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে। আকাশে শত্রু বিমানের একাধিপত্য। তাই সাবধান হওয়াটা জরুরি।

টামু থেকে পালেল 'নো ম্যানস্ ল্যান্ড' বলা যায়। এই দুই জায়গার মাঝখানের জায়গাটা খুব আলাদা ধরনের। একদিকে প্রচণ্ড উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে টামুর দিকে গভীর গিরিখাত। মাঝখানের উতরাইটা অর্ধবৃত্তাকার। পালেলের বিমানঘাঁটির ঘটনার পরে গাঁধী রেজিমেন্ট সেখান থেকে কুমাউ-এর পাহাড়ের ওপর ছাউনি ফেলেছে। দূরে সিতাং চাঙ্গির জঙ্গল। ব্রিটিশ ২৩ নম্বর ডিভিশনের অ্যাডভান্স পার্টিদের কখনও কখনও দেখতে পাওয়া যায় সেখান থেকে।

নিজের তাঁবুর সামনে থেকে ইনায়েত কিয়ানি দূরবিন নিয়ে দেখছিলেন চারদিক। সামনের পাহাড়ের ওপর শত্রুর পিলবক্স আর পাশের পাহারাদার সৈন্যদের চলাফেরা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আকাশের দিকে নজর ফেলে ইনায়েতের পেটের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। বর্ষা এসে পড়েছে। শত্রু চুপচাপ ইম্ফলে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। এগোচ্ছেও না—ঘাঁটিও ছাড়ছে না। ওদিকে শুধু রেঙ্গুন নয়, টোকিয়ো থেকে রোজ জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'কী হল? ইম্ফলের আর কতদিন?'

নীচে বর্মা সীমান্ত মেমিয়ো থেকে মোরে পর্যন্ত আজাদ হিন্দ দলের লোকেরা তৈরি হয়ে বসে আছে। অভিযানের ব্যাপারে তারাও উৎসুক। একবার ইম্ফলের পতন হলে বিজিত এলাকার প্রশাসনের দায়িত্ব নিতে হবে তাদের। ফৌজ যাবে দিল্লির পথে এগিয়ে।

রসদ শেষ হয়ে আসছে এদিকে। বর্ষাও এল বলে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মেঘের ডাক পিলে চমকে দেয় যখন তখন। যা হোক কিছু একটা করা দরকার। মাঝে মাঝে ছোটখাটো সংঘর্ষও হচ্ছে। দু'দিন আগেই স্কটিশ হাইল্যান্ডার সৈন্যদের একটা দল আক্রমণ করেছিল। আজাদি সৈন্যদের তাড়ায় পালাতে পথ পায়নি তারা। উলটে তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে অনেক অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এই সব ছোটখাটো সংঘর্ষের কোনও মানে নেই এখন। দরকার ইম্ফলের পতনের।

কর্নেল ইনায়েত কিয়ানি আজ একটা জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। গাঁধী ব্রিগেডের মেডিক্যাল ইউনিটের ড. আকবর আলি শাহ্ তাঁর জন্য এসেছেন। পালেলের স্মৃতি আজও তাজা তাঁর মনে। চামোলের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে মেজর ভুরেওয়াল কালই এসে পৌঁছেছেন এখানে। রেঙ্গুনের সেই বোমার চিহ্ন তাঁর হাতের তালুতে আজও স্পষ্ট। তারপরে আবার অসুস্থ

হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর মুখে এখনও ক্লান্তির ছাপ। সবাই একমত হলেন। টামুতে শত্রুকে আর কিছুতেই ঢুকতে দেওয়া নয়। সুযোগ পেলেই জাপানি সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে ইম্ফলের ওপর চড়াও হতে হবে।

ভুরেওয়াল অনেকেরই শিক্ষক। তাই সবাই তাকে 'ভুরেওয়াল স্যার' বলেই ডাকে। মেজর ড. আকবর শাহ্ বললেন, 'ভুরেওয়ালস্যার, সত্যি কথা বলতে কি আমি হয়তো কোনও দিনই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতাম না। কিন্তু যে আন্তরিকতা দিয়ে আপনি আমাদের আপন করে নিয়েছিলেন, বিশেষত আপনার সেই গান,

সর পর তিরঙ্গা ঝান্ডা
জলোয়া দিখ রহা হায়
হো তেরি সর বুলন্দি
জো চাঁদ আসমা হায়—

তার মধ্যে "তিরঙ্গা ঝান্ডা জলোয়া দিখ রহা হায়" অংশটুকু গাইবার সময় মনে হত কানায় কানায় ভরে গেছে যমুনা নদী। সেই ভরা নদীতে ঝলমল করছে আলোয় সাজানো লালকেল্লার প্রতিবিম্ব।'

ভুরেওয়াল বললেন, 'কিন্তু ফৌজের রসদ যে শেষ। কতদিন আর পেটে কিল মেরে পড়ে থাকবে?'

বিষণ্ণ স্বরে ইনায়েত বললেন, 'কী করা যাবে? মেমিয়ো থেকে মাত্র তিন সপ্তাহের রেশন নিয়ে বেরিয়েছিলাম আমরা। এ ছাড়া ছিল একটা করে বন্দুক আর একটা করে কম্বল। ফিরে যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ। দিল্লির পথে আমাদের যেতেই হবে। আমাদের রসদের ডিপো এখান থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। মাথায় বস্তা নিয়ে একজন সৈনিকের কম করে ছ' দিন লাগে এখানে আসতে। আসতে আসতে চাল থেকে গাছ গজিয়ে যায়।'

'শত্রুরা বিমান থেকে নানারকম প্রচারপত্র ফেলছে। আজাদ হিন্দ ফৌজে যাতে ফাটল ধরে তার জন্যে আপ্রাণ প্রচার করছে তারা।'

'যতই প্রলোভন দেখাক না তারা, গুলিতে শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেলেও নেতাজির সৈনিক শেষ পর্যন্ত দিল্লি পৌঁছবেই। এখানে আর ফিরবে না তারা।' আবেগভরে বললেন মেজর ভুরেওয়াল।

কয়েকজন সৈনিক এসে নিচু গলায় জানাল, 'স্যার পেছনদিকে জাপানিরা একটা হাতি কেটে তার মাংস খাচ্ছে।'

'আল্লাহ্, এ সংকট থেকে রাস্তা দেখান।' জামান কিয়ানি হাত আকাশের দিকে তুলে বললেন।

রসদ সরবরাহের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর বেশি নির্ভর করার পক্ষে মত দিল সকলে। আশেপাশের নাগা আর কুকিরা গোড়ার দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের খুব ভয় পেত। কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের ভয় ভেঙেছে। এখন তারা ডিম আর মুরগি বিক্রি করার জন্য সৈন্যদের কাছে আসে। তারা ব্রিটিশ আর জাপানি কাউকেই পছন্দ করে না কিন্তু আজাদি সেনাদের ভালবাসে তারা। 'নয়া সরকার'-কে খুব শ্রদ্ধা করে তারা। কিন্তু সংখ্যায় তারা বড় কম আর তা ছাড়া তাদের কাছেও বিশেষ কিছুই নেই।

একদিন নাগাদের একটা দল ঢোল আর বাঁশি বাজাতে বাজাতে কিয়ানির কাছে এল। শত্রুরা সন্ধান পেয়ে যাবে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বাজনা বন্ধ করতে বলা হল তাদের। এই অর্ধউলঙ্গ নাগারা কর্নেল সাহেবকে 'রাজা' হিসাবে মেনে নিয়ে নজরানা দিতে এসেছে। দলটাতে

আশেপাশের গ্রামগুলোর মুখিয়ারা ছিল। তারা কর্নেল সাহেবকে পাঁচটা শুয়োর, একশো বোতল তাড়ি আর দশ বারোটা ডালি ভরতি মুরগি নজরানা দিল। এক মুখিয়া তসলিম করে বলল, 'রাজাসাহেব, আমাদের বড় রাজা—সুভাষ রাজা কবে আসবে?'

'ঠিক সময়েই এসে পড়বেন তিনি।' কর্নেল সাহেব প্রতিশ্রুতি দিলেন।

হাতির মাংস হজম না হওয়ায় জাপানিরা অনেকেই পেট খারাপ আর অন্যান্য রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ল। 'খাবার' এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধের চেয়ে বস্তা বওয়াতেই আজাদি সেনাদের বেশি শক্তিক্ষয় হচ্ছে। বর্ষা আর না খেতে পাওয়া—দুইয়ে মিলে পরিস্থিতি সঙ্গিন হয়ে উঠল। কিয়ানির গাঁধী রেজিমেন্টে এখন মাত্র হাজার খানেক লোক বেঁচে আছে। অনেক সৈনিককে ম্যালেরিয়া ধরল। তা ছাড়াও আন্ত্রিক, পেটখারাপ অনেককেই শেষ করে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কে কতদিন টিকে থাকবে সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মে মাস শেষ হয়ে আসছে। মাঝখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হল। একবার বৃষ্টি শুরু হলে আর থামবার নাম করে না। বিশ-তিরিশ দিন সমানে বৃষ্টি চলে এখানে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির জন্য বিখ্যাত চেরাপুঞ্জি এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। বৃষ্টি—ব্রিটিশ, জাপানি আর আজাদি সেনা সবার অবস্থাই করুণ করে তুলেছে।

এদিকে মনের মধ্যে বিঁধে রয়েছে ইম্ফল। ইম্ফলের কাছের পাহাড়গুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রোদ্দুর উঠলে কখনও কখনও ইম্ফল দেখা যায় কখনও আবার মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। মন খারাপ হয়ে যায় তাদের।

এই প্রচণ্ড বর্ষায় গায়ে উপযুক্ত কাপড়-চোপড়ও নেই। কোনওরকমে গাছের নীচে, খড়ের ছাউনির আড়ালে থেকে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে তারা। এই পরিস্থিতিতেও তাদের মনে হয় নেতাজির কথা যেন গুঞ্জন করে ফিরছে তাদের কানে, 'স্বাধীনতার মঙ্গল প্রভাত দেখবার জন্য আমাদের মধ্যে ক'জন এ সংগ্রামের শেষে বেঁচে থাকবে আমি জানি না। কিন্তু এটা আমি নিশ্চয়ই জানি যে সে প্রভাত আসবেই—ভারত স্বাধীন হবেই। আমার বীর সৈনিক ভাইয়েদের আমি বলছি যাঁরা সবরকম কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত একমাত্র তাঁরাই যেন ফ্রন্টে যান। এই মুহূর্তে আমি তোমাদের খিদে, তৃষ্ণা, কষ্ট ছাড়া আর কিছুই দিতে পারব না। যাঁরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে রাজি আছেন একমাত্র তাঁরাই যেন এগিয়ে যান। বাকিদের আমি বলব ফিরে যেতে।'

কয়েকদিন আগে সামনের একটা টিলা শত্রু-সৈন্য দখল করে নিয়েছে। তরুণ লেফটেন্যান্ট মনসুখলালের সহ্য হচ্ছে না সেটা। অনেক রাতে তিনি ইনায়েত কিয়ানির কাছে এলেন। 'স্যার আমি আজ রাতে ওই সামনের টিলাটা দখল করব।' উত্তেজিতভাবে বললেন মনসুখলাল।

'মনসুখ আমাদের কাছে আর মাত্র ছশো-সাতশো সৈনিক বেঁচে রয়েছে। ওখানে, ওই টিলার ওপরে দুশমনের পুরো ব্রিগেড রয়েছে। তা ছাড়া ওই টিলার পেছন দিকেই ২৩ নম্বর ডিভিশন ছড়িয়ে রয়েছে।'

'স্যার আমার মাত্র এক প্লেটুন সৈন্যই যথেষ্ট।'

'প্লেটুন? ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন সৈন্য নিয়ে তুমি ওখানে গিয়ে কী করতে পারবে?'

'স্যার। ইম্ফল আমরা পাচ্ছি না। এটা একেবারেই আর সহ্য হচ্ছে না আমার। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে।'

'তুমি একটা পাগল।' ইনায়েত ব্যাপারটা হালকাভাবেই নিলেন।

পরের দিন আলো ফুটতেই পাহারাদার সৈনিকেরা কর্নেল ইনায়েত কিয়ানিকে জাগালো।

অবাক চোখ মেলে কর্নেল দেখলেন সামনের টিলার ওপর তেরঙা ঝান্ডা উড়ছে। ওই পতাকাই পতপত করে উড়ে খবর দিচ্ছে বিজয়ের। কিন্তু এই বিজয়ের রূপকার মনসুখলাল কেন ফেরেনি এখনও? ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই কাদা ভেঙে কর্নেল ইনায়েত কিয়ানি আর মেজর ভুরেওয়াল টিলার ওপর পৌঁছলেন। রাস্তাতেই জানতে পারলেন সব কথা।

ত্রিশ-বত্রিশজন সঙ্গী নিয়ে মনসুখলাল প্রথমে একশো আটজনের কোম্পানিকে আক্রমণ করেছিলেন। তাদের সেই প্রচণ্ড আক্রমণে বিপর্যস্ত হয় সেই এক কোম্পানি সৈন্য। তখন তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে সাতশো সৈনিকের একটা ব্যাটেলিয়ন। তাদেরও পর্যুদস্ত করে দেয় মনসুখলালের দল। রাতের অন্ধকারে একটা ছোট্ট প্লেটুনের কী বিরাট জয়!

মেঘলা আকাশ। মারাত্মকভাবে আহত মনসুখলাল পড়ে আছেন মৃত্যুর অপেক্ষায়। ইনায়েত কোলে তুলে নিলেন মনসুখকে। পঁচিশ বছরও হয়নি মনসুখের বয়স। মনসুখের সমস্ত সাথি ভিজে মাটিতে পড়ে আছে। মনসুখের খাকি পোশাক রক্তে লাল। সারা শরীরে তেরো জায়গায় গুলি ঢুকেছে। কিন্তু লড়াই ফতে করার আনন্দে তার মুখ ঝলমল করছে। কিয়ানির মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল বেরিয়ে আসে তার।

'মনসুখ, তোমার মতো বীরের চোখে জল কেন ভাই?' কিয়ানি বললেন, 'মরার ভয় বড় ভয়ানক কর্নেল।' মেজর ভুরেওয়াল বললেন।

'মরণের ভয়? দূর দূর। কে পরোয়া করে মরণের?' চোখে জল নিয়েও মনসুখের মুখে হাসি ফুটে উঠল। 'আমার মনে শুধু একটাই দুঃখ রয়ে গেল স্যার—ইম্ফল দখল হল না। একবার যদি দেখতে পেতাম তেরঙা ঝান্ডা উড়ছে সেখানে, নেতাজির হাসিমুখটা চোখ ভরে দেখতে পেতাম, তবে জন্ম সার্থক হত আমার। সেটা হল না, শুধু এই আক্ষেপ নিয়েই যাচ্ছি আমি।'

'মনসুখ। ধৈর্য ধরো। আমরা তোমাকে টামুর হাসপাতালে নিয়ে যাব। সেখানে ভাল হয়ে উঠবে তুমি।'

'না। কর্নেল সাহেব। আমার জন্য সময় নষ্ট করবেন না। আপনারা এগিয়ে যান। লড়াই করুন। দেশকে বাঁচান। নেতাজির কথা মনে রাখুন। জয় হিন্দ—জ—য়—নে—তা—জি।' ঘাড় ঝুঁকে পড়ল মনসুখের। বর্ষায় শুকনো কাঠ কোথাও নেই। সবাই আনাম নদীতে গেলেন। ভিজে মাটিতে মনসুখের পবিত্র দেহ শুইয়ে দিয়ে প্রণত হলেন সেই শহিদের স্পর্শপূত মাটির সামনে।

৭

কোহিমাতে দুই পক্ষই 'পহলে আপ, পহেলে আপ' করছে। কয়েক জায়গাতে দুই বাহিনীর ট্রেঞ্চগুলো এত কাছাকাছি যে এক ট্রেঞ্চের মাটি খুঁড়ে জোরে ছুড়ে দিলে বোধহয় অন্যপক্ষের ট্রেঞ্চে গিয়ে পড়বে। দিনের পর দিন জাপানিরা শুধু একটা অতিকায় অজগরের মতো কোহিমাকে নিজের পাকে জড়িয়ে বসে আছে। শুরুর সাফল্যের পরই জেনারেল সাতোকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ জাপানি সৈনিক অতন্দ্র। একদিন কোহিমার জলসরবরাহ করার জায়গাটা জাপানিদের দখলে চলে গেল। ব্রিটিশদের মুখ শুকিয়ে গেল। কয়েকজন অফিসার দৌড়ে গেলেন রিচার্ডসের কাছে। 'স্যার জল নেই।'

রিচার্ডস অনেকদিন দাড়ি কামাননি। গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'মাটি খুঁড়ে জলের ব্যবস্থা করো। না পারলে যা পারো করো নয়তো যা খুশি খাও।'

জাপানি সৈনিকদের সাহস যেমন বাড়ছে, কর্নেল রিচার্ডসের চিন্তাও তেমন বাড়ছে। জাপানি অজগরের পাক ক্রমশ এঁটে বসছে। জোরসোম পাহাড়ের ওপর একটা ব্রিগেড জাপানিদের কবলে যে-কোনও মুহূর্তেই যেতে পারে। দূরবিন দিয়ে দেখা যায় দূরের পাহাড়গুলোর ওপরে জাপানি সৈনিকদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। ছাউনির টিলায় খাবার আর অস্ত্রের অভাব নেই—কিন্তু জল নেই। খুঁজতে খুঁজতে একটু দূরে গাছ-গাছালির আড়ালে একটা ছোট্ট স্রোতস্বিনীর খোঁজ পাওয়া গেল। কোনওমতে সেখান থেকে জল ভরে আনার ব্যবস্থা হল।

কর্নেল রিচার্ডস অপলকে তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে। স্লিম আর মাউন্টব্যাটেনের প্রতিশ্রুত রসদ আর প্যারাশুট বাহিনীর সৈন্যরা কখন আসবে?

ওদিকে জাপানি ফৌজের সাহস বাড়ছে। মিয়াঝাকি ফৌজ সামনের একটা টিলা দখল করে একটা গ্রামে ঢুকে পড়ল। আগুন লেগেছে বাঁশখড়ের অনেক চালাতে। জাপানিদের টিলা থেকে নামতে দেখে ওয়েস্ট কেন্ট বাহিনীগুলি চালাতে থাকল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগোতে থাকে জাপানিরা। রাস্তায় পাঁচ ছ'টা বড় বেকারি ছিল। তাদের আড়ালে থেকে জাপানিরা এগোতে লাগল। আগুনে বোমা ছুড়ে বেকারিগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল ব্রিটিশ সৈন্যরা। দু'পক্ষেই গোলাগুলিতে মরছে অনেকে। কিন্তু মৃতদেহ তুলে নিয়ে যেতে পারছে না কেউ।

জাপানি সৈন্যদের উৎসাহের অভাব নেই, কিন্তু অভাব আছে রসদের। কথায় বলে 'সৈন্য চলে পেটের বলে।' মিয়াঝাকি, নিশিদা, কোবোয়াশি সবাই মিলে সাতোর কাছে হাজির হলেন। কোবোয়াশি বললেন, 'জেনারেল, গত আটদিন থেকে কোনও রসদ আসেনি।'

'তার জন্য কি আমি দায়ী?' সাতো খিঁচিয়ে উঠলেন।

'কিন্তু রসদ যে এদিকে ফুরিয়ে এসেছে।'

'তার দায়িত্বও আমার নয়, কম্যান্ডার-ইন-চিফের।' সাতো বললেন।

সাতোর মতো সিনিয়র জেনারেলের সঙ্গে তর্ক করবে কে? কিন্তু গরজ বড় বালাই। তাই মিয়াঝাকি সাহস করে নরম সুরে বললেন, 'আমরা যদি আর একটু সাহস আর দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করি...'

'মুখ সামলে কথা বলুন। কীসের সাহস, কোন দূরদৃষ্টি? কী বলতে চান আপনি?' সাতো হুংকার দিয়ে ওঠেন।

'মুতাগুচি খবর পাঠিয়েছেন যে এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ডিমাপুরে সম্ভবত প্রচুর খাদ্যশস্য রয়েছে।'

'সম্ভবত! অর্থাৎ ঠিকমতো জানা নেই। আমার ওপর আদেশ ছিল, কোহিমা জয় করার। সেটা করব আমি। এইসব "সম্ভবত" "হতে পারে" নিয়ে আমি কেন জুয়ো খেলতে যাব? আমি তোমাদের মুতাগুচি নই যে গেইশাদের মেহফিলে রং জমাব।'

৮

মুতাগুচি চিন্তিত। কোহিমার সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। সাতোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনি।

'ডিমাপুরের দিকে এগোও। সব মুশকিল আসান হবে।'

'কী আছে ডিমাপুরে?'

'কী নেই? শস্য, অস্ত্রাগার, অনেক জিপ। তা ছাড়া ডিমাপুরের পতন হলে শত্রুর সমস্ত

যোগাযোগ ব্যবস্থা দারুণভাবে বিপর্যস্ত হবে। ডিমাপুর দখল করতে পারলে ভাগ্য ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা।'

'আমি কোথায় না বলছি? কিন্তু এই গভীর জঙ্গল থেকে বের হওয়া যে কী ব্যাপার সেটা এখানে না এলে বোঝা যাবে না। আমরা এখান থেকে বেরোলেই শত্রুর বিমান আমাদের ফুঁড়ে ফেলবে। তার দায়িত্ব কে নেবে?'

'তোমাদের যতদূর সম্ভব বিমানবাহিনীর সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করার জন্য আমি কাওয়াবেকে বলছি। তোমরা ডিমাপুর আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করো।'

রেঙ্গুনে কাওয়াবেকে ফোন করলেন মুতাগুচি।

'দেখছি আমি। তোজোর পাঁচ নম্বর বিমানবাহিনীকে ডেকে পাঠাচ্ছি আমি।' কাওয়াবে বললেন।

জামাল অ্যাভেনিউ-তে মুতাগুচির ফোন এল। নেতাজিও সাগ্রহে বললেন, 'জেনারেল জাপানি ফৌজকে সাহস করে ডিমাপুর আক্রমণ করতেই হবে। ভাগ্যদেবী সাহসীর ওপরেই প্রসন্না হন। ফরচুন স্মাইলস অন ব্রেভ। সামুরাই ঐতিহ্যের ধারকদের সেটা আমাকে বোঝাতে হবে না।'

চন্দ্রা বোসের অধীরতা কাওয়াবের মতো ঠান্ডা মাথার লোকও ভালই বোঝেন। কিন্তু সমস্ত বিমানবাহিনী প্যাসিফিক অঞ্চল সামলাতে চলে গেছে। বর্মায় যে ক'টা বিমান পড়ে আছে সবগুলোরই রুগ্‌ণ অবস্থা। মেরামতি চলছে তাদের। মেরামতির অভাবে অনেক জিরো বিমান পড়ে আছে রানওয়ের ওপর।

পাহাড়ি এলাকার মধ্যে ট্রেঞ্চ আর খাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। রোগ আর খিদেতে জাপানি সৈন্যেরা সেগুলোতে বসে ধুঁকছে। এই সময় যদি ব্রিটিশদের সাহায্য এসে পৌঁছয় তা হলে কী যে হবে ভাবতেও ভয় করে।

কোহিমার অবরোধের পর প্রায় বিশ-পঁচিশ দিন কেটে গেছে। কী যে হবে, কে মারবে আর কে মরবে কেউ জানে না। সবসময় গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সৈনিকদের চান করা বা উর্দি বদলানোর উপায় নেই। প্রত্যেকদিন কোহিমার চেহারা বদলে যাচ্ছে। অনেক বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। অনেক বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে। বহু দেওয়ালে বড় বড় গর্ত। অনেক গাছও ধরাশায়ী। তার ওপরে জলের অভাবে সকলের প্রাণ কণ্ঠাগত। বারুদপোড়া গন্ধ ছেয়ে রয়েছে সারা শহর।

সৈনিকেরা ট্রেঞ্চ থেকে বাইরে আসতে সাহস পায় না। আহত সৈন্যদের ক্ষতস্থানে পোকা ধরছে। চারদিকে মৃতদেহ পচার গন্ধ। রিচার্ডসের চোখে ঘুম নেই। একদিন খুব ভোরে রিচার্ডস সান্ত্রিদের ডাকাডাকিতে তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন।

'স্যার স্যার জাপানিদের দুটো দল ডিমাপুরের রাস্তার দিকে চলেছে।'

'ও মাই গড', ধপ করে বসে পড়েন রিচার্ডস। ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠলেন তিনি। 'শিগগির স্লিমের সঙ্গে যোগাযোগ করো। মাউন্টব্যাটেন কোথায় আছেন দেখো। আর যত শিগগির সম্ভব পাকা খবর জোগাড় করো।'

সকালে রোজকার মতো গোলাবর্ষণ শুরু হল। রিচার্ডস ব্রেকফাস্ট মুখে তুলতে পারলেন না।

ডিমাপুর! উত্তর-পূর্ব কোণে ভারতের শেষ রেলস্টেশন। পূর্ব রণাঙ্গনের প্রধান রসদ আর অস্ত্রভাণ্ডার। এইখানেই অসম, বর্মা, মণিপুর, আর চিনের রণাঙ্গনের মূল ঘাঁটি। এগারো মাইল জুড়ে গুদামের সারি এখানে। সেইখানে যদি হামলা হয়—ভাবতেও হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসে

রিচার্ডসের। ডিমাপুরের পতন হলে ব্রিটিশ বাহিনীর কোমর ভেঙে যাবে। ছাদ ভেঙে যাওয়া চার্চটার দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা জানান রিচার্ডস, 'সেভ আস, ও জিশাস, সেভ আস।'

দুপুরবেলা গুপ্তচর এল। হাসি হাসি মুখ তার। 'স্যার, আসলে জাপানিদের দল দুটো জলের খোঁজে নীচে নেমেছিল। ডিমাপুরের পথে যাবার জন্য নয়।'

খবর যে পাকা বোঝা গেল। অনেক হালকা লাগছে নিজেকে এখন। একছুটে চার্চে পৌঁছলেন তিনি। নতজানু হয়ে বেদির সামনে বসলেন। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাঁর। এক পাদ্রি বসেছিলেন সেখানে। বেশ কয়েকদিন চান হয়নি। রুক্ষ চুল দাড়িতে জটাধারী সাধুর মতো দেখতে লাগছে তাঁকে। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে যাওয়া চেহারা।

'কর্নেল, ভয় করো না। আমাদের ভাগ্য এখন খারাপ যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এদিন থাকবে না। গড ব্লেস আস মাই সন।'

৯

হঠাৎ ঘটনাচক্রেই একদিন সাতোর কাছে প্রকাশ হয়ে গেল ব্যাপারটা। সাতোর সৈন্যরা লুকিয়ে লুকিয়ে বাহিনীর ভারবাহী পশুগুলো অর্থাৎ খচ্চর, ঘোড়া ইত্যাদি মেরে খাচ্ছে। এইসব জানোয়ারগুলোকে অনেকদিন ধরে 'প্রাণী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে' প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কোহিমার পাহাড়ে যে জাপানিরা পৌঁছতে পেরেছে তার পেছনে এইসব প্রাণীদের অবদান কম নয়। সাতো যখন জানতে পারলেন তখন অনেকগুলো প্রাণীরই ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। স্তম্ভিত সাতো বুঝতে পারলেন কি প্রচণ্ড খিদের জ্বালায় সৈনিকদের এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। তাই সৈনিকদের ওপর রাগ না করে তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মুতাগুচির ওপর।

স্বয়ং জেনারেল সাতোর তলব পেয়ে মেজর জেনারেল মিয়াঝাকি তাড়াতাড়ি এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই সাতো দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, 'নিজের অসম্ভব, অবাস্তব স্বপ্নের জন্য ওই মুতাগুচি সমস্ত বাহিনীর প্রাণ নিয়ে খেলা করছে। ওই লোকটা সদম্ভে বলে বেড়ায় যে জানোয়ারদেরও সে এমন শিক্ষা দিয়েছে যে তারা পাখা মেলে উড়বে। কিন্তু আসলে দরকার ওই লোকটার কল্পনার পাখাটা কেটে দেওয়া।'

'জেনারেল সাহেব তো আদেশ দিয়েছেন আশেপাশের নাগাবস্তি থেকে রসদ জোগাড় করার।'

'কিন্তু এখানে আশেপাশে লোক আর কে আছে? বাঁশের ঝুপড়িগুলো খোলা রেখে তারা কবেই তো জঙ্গলে পালিয়েছে।'

'কিন্তু একলা মুতাগুচি কী করবেন?'

'মানে? রসদের ব্যবস্থা করা তবে কার দায়িত্ব? তার কাজ কি শুধু গেইশা নিয়ে মেহফিল জমিয়ে এখানে সৈন্যদের মরণের মুখে এগিয়ে দেওয়া?'

'আসলে মুতাগুচির কপাল খারাপ। তিনি তো রসদ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু হোমালিনের কাছে চিন্দুইন নদী পার হওয়ার সময় আমাদের কুড়িটা ট্রাক উইনগেটের বাহিনী বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।'

'তার মানে? উইনগেট তো মারা গেছে!'

'মরবার আগে সে আমাদের অনেক লোকসান করে তবে মরেছে। এখনও তার শয়তানগুলো আমাদের যেখানে পারছে বেগ দিচ্ছে।'

সামনা-সামনি যুদ্ধ এক জিনিস। তার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই অবরোধের রণনীতি অসহ্য। গত তিরিশদিন ধরে এই অবরোধে কোহিমার দম আটকে আসছে। কেউই এগোচ্ছে না।

দিনের বেলা ডাকোটা বিমানগুলো ছাউনি রক্ষা করে। রাত্রিতে জাপানিরা হামলা চালায়। এদিকে ছাউনির রসদও ফুরিয়ে এসেছে। জলের অবস্থা তো বর্ণনার বাইরে। দু-চার দিন পরে পরে রিচার্ডসের অনেক কাকুতি মিনতির পরে বিমান থেকে টায়ার-টিউবে ভরে জল ফেলা হয়।

'স্যার আমি আর বেশিদিন প্রতিরোধ বজায় রাখতে পারব না।' রিচার্ডস খবর পাঠান বারে বারে।

'আর একটু ধৈর্য ধরে থাকো।'

'স্যার, ওদের গুপ্তচরেরা আমাদের প্রকৃত অবস্থার খবর ঠিক ঠিক পায়নি। নইলে কবেই আমাদের গিলে ফেলত।'

'বলেছি তো। আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরো।'

কোহিমা অঞ্চলের তিন-চতুর্থাংশ দখল করার পর চুপ করে বসে আছেন সাতো। মুতাগুচিকে কড়া কড়া নোট পাঠিয়ে নিজের জেদ বজায় রাখেন তিনি। এটাই একটা বাহাদুরি মনে হয় তাঁর। শুধু একটা দুটো জোরদার হামলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী যে দ্বারে দাঁড়িয়ে অশ্রুবিসর্জন করছেন, সাতো জানতেই পারলেন না।

১৮ এপ্রিল পরিস্থিতি বদলে গেল। ডিমাপুর থেকে রিচার্ডসের সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছল একটি পঞ্জাবি ব্যাটেলিয়ন, একটা ট্যাঙ্ক বাহিনী। তাদের পেছনে পেছনে আসছে পঞ্চম ট্যাঙ্ক বাহিনী। তাদের পেছনে পেছনে আসছে পঞ্চম ব্রিগেড। পশ্চিমের পাহাড় জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে তারা ছাউনির পাহাড়ে এসে পৌঁছল। ভরসা পেলেন রিচার্ডস। নতুন আসা ফৌজ যাকে বলে একদম তরতাজা। তারা জাপানিদের বিছিয়ে রাখা 'মাইন'গুলো খুঁজে খুঁজে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। সাত নম্বর ইন্ডিয়ান ডিভিশন-ও এসে পৌঁছল একদিন।

১০

রাত দশটা বেজে গেছে। অন্ধকারের বুক চিরে সার দিয়ে ছুটছে গোলাগুলির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। নিজের তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছেন সাতো।

আজ ২৯ এপ্রিল। তেনেচোসেৎসু সম্রাটের জন্মজয়ন্তী। সারা বছর সমস্ত জাপানি, সৈনিক-নাগরিক নির্বিশেষে এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু আজ উৎসবের কথা কেউ ভাবতেই পারছে না।

সাতো মনে মনে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন।

নানান রোগ ছড়িয়ে পড়েছে সৈন্য আর জানোয়ারদের মধ্যে। বিশেষ করে ম্যালেরিয়াতে মরছে বহু সৈনিক। এই পরিবেশে আর কতদিন আটকে থাকতে হবে কে জানে।

ওদিকে এখনও ব্রিটিশ বাহিনীর ছাউনি নির্ভয় হতে পারেনি। এখনও সুযোগ আছে। সাতোর সামনে তাঁর অফিসাররা দল বেঁধে হাজির হলেন। সবার চেহারায় একটা সামুরাইসুলভ উদ্দীপনা। সবাই মনস্থির করেই এসেছেন।

'কী মুতাগুচির কাছ থেকে রসদ এসে পৌঁছেছে নাকি?' বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বললেন সাতো।

'রসদের অভাবে তিলে তিলে মরার চাইতে সোজা লড়াই করে মরতে চাই আমরা।' সবাই সমস্বরে বললেন।

'কী করতে চান আপনারা?'

'রাতে আক্রমণ করার হুকুম দিন আপনি। আমরা যে করেই হোক ডিমাপুর যাব। নিজেরাও শেষ হব আর ডিমাপুরকেও শেষ করব।'

'আমি হুকুমের গোলাম। কাগজপত্রে কী পরিকল্পনা রয়েছে? আমি পরিকল্পনা মতোই কাজ করছি। এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমিই সেনাপতি। আমার কী করা উচিত সেটা আপনাদের কাছে শিখব না আমি।'

'কিন্তু স্যার। জেনারেল মুতাগুচি নিজে কালেমাও গ্রামের কাছে এগিয়ে এসেছেন। যে করেই হোক এই যুদ্ধ জিততে বলছেন তিনি। সে ক্ষেত্রে আপনি কেন ইতস্তত করছেন।' মিয়াঝাকি বলে উঠলেন।

'আমি মূর্খ-ও নই আর ভিতু-ও নই। কিন্তু কারও খামখেয়ালিপনার জন্য সৈন্যদের বলি দিতে পারব না আমি।'

মে মাস। বর্ষা জাঁকিয়ে নামল। যখন তখন ঘূর্ণি হাওয়া আর মাঝে মাঝে দুরন্ত ঝড়-ও বইছে। বৃষ্টি তো আছেই। সমস্ত সৈনিকেরা ভীত ত্রস্ত। মনে হচ্ছে এইভাবে তিলে তিলে মরার চেয়ে একটা আচমকা ঘূর্ণিঝড় যদি উড়িয়ে নিয়ে যায় তো ভাল হয়। কামানের গর্তে জল জমছে। যেসব শবদেহ ভালভাবে মাটি চাপা দেওয়া হয়নি সেগুলো থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। সাঁজোয়া গাড়িগুলো কাদায় বসে গেছে। সৈনিকদের মুখগুলো কালচে হয়ে গেছে। ঘুমের অভাবে চোখগুলো লাল। ট্রেঞ্চ আর খাদে শেয়াল-কুকুরের চেয়েও খারাপ অবস্থা তাদের। অনেকেরই শরীর অস্থিসার। রোগদুর্বল শরীরে উর্দিগুলো ঢলঢল করছে।

চিন্দুইনের রাস্তায় হাতি ঘোড়াও আর চলতে পারছে না। সাতো ভীষণ বিক্ষুব্ধ। কাওয়াবে, মুতাগুচি আর ফিল্ড মার্শাল তেরাউচিকে চিঠির পর চিঠি লিখে চলেছেন তিনি।

মাঝে মাঝেই হাতাহাতি যুদ্ধ হচ্ছে এখানে সেখানে। দুই পেট্রল পার্টি মুখোমুখি হলেই লড়াই বেধে যায়। একবার জাপানিরা রাস্তাটা দখল করে এগিয়ে গেল। টমিরাও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। কালেক্টর বাংলোর দখলের জন্যে দুই পক্ষই লড়তে থাকে প্রাণপণে। দু' পক্ষেই অবিরাম বোমাবর্ষণ শুরু হয়। অবশেষে একদিন এই দুশো বছরের পুরনো বাংলোটা বোমার আঘাতে, আগুনে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আধভাঙা চিমনিটা শুধু মনে করিয়ে দিতে লাগল বাংলোটার কথা।

গাছ-গাছালি থেকে শুরু করে পশুর খাদ্য যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে জাপানিরা। অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র যা আছে সেটুকু আত্মরক্ষার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছে তারা। প্রায় পঞ্চাশ দিন হয়ে গেল কোহিমা ফ্রন্টে এই লুকোচুরি খেলা চলছে। আস্তে আস্তে ব্রিটিশদের সাহস বাড়তে থাকে। হাওয়াই বাজির মতো কাঠির আগায় বারুদ বেঁধে তারা জাপানিদের ট্রেঞ্চগুলো আক্রমণ করতে থাকে। খাসি আর নাগারা অবাক হয়ে দেখে এই নতুন ধরনের আতসবাজির খেলা। কাঠির আগায় এইভাবে আগুন দিয়ে তারা গর্ত থেকে গোসাপ শিকার করে।

পাহাড়ের মাথায় মেঘ নেমে আসে অনেকদিন। ঘন কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি হয়। একদিন এইরকম কুয়াশার সুযোগ নিয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ে দড়ি আটকে চড়তে শুরু করল ব্রিটিশরা। বৃষ্টির তোড় বাড়ল। জাপানিদের ট্রেঞ্চ আর খাতগুলো জলে ভরে গেল। অনাহারে অর্ধাহারে এমনিতেই শ্রান্ত তারা। পর্যাপ্ত অস্ত্রও নেই। তবু প্রাণপণ প্রতিরোধ করতে থাকে

তারা। তা সত্ত্বেও নাগাপল্লির পেছনদিকের একটা উঁচু পাহাড় ব্রিটিশদের অধিকারে এসে গেল। এই জয়ে দারুণ উৎসাহ বেড়ে গেল তাদের।

কুয়াশা আর বৃষ্টির মাঝে খোলা জায়গায় জাপানিদের দেখতে পেলেই ব্রিটিশ বিমান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয় তাদের ওপর। একদিন একটা বিমান সাতোর ডেরার ঠিক ওপরটাতে চলে এল। পাইলট বুঝল এটাই কম্যান্ডারের আস্তানা। গোলন্দাজও বুঝেছে। ঠিক গোলা দাগবার মুখেই পাইলট চেঁচিয়ে উঠল, 'আহাম্মকের মতো কী করতে যাচ্ছ?'

'স্যার, ওটা সাতোর আস্তানা। এখুনি উড়িয়ে দিচ্ছি।'

'স্টপ ইট, ননসেন্স।' ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল। তারপরেই ডিগবাজি খেয়ে বিমান উড়ে চলল উলটোদিকে। বাকিরা অসন্তুষ্ট ক্যাপ্টেনের ওপর। এমন একটা মওকা হাতছাড়া হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন হেসে বলল, 'তোমরা বুদ্ধু। স্লিমের হুকুম ভুলে গেলে? সাতোর ওপর বোমা ফেলতে নিষেধ করেছেন স্লিম। ওকে ওর কোহিমার স্বপ্ন নিয়ে থাকতে দাও। খোঁচাখুঁচি করলেই হয় ও ডিমাপুরের রাস্তা ধরবে নয়তো ইম্ফলের দিকে এগোবে। তার চাইতে এখানে বসে বসে কোহিমার পাহাড়গুলো দেখুক। ওকে ঘাঁটালে আমাদের কোনও লাভ হবে না।'

বিমানের সবাই হেসে উঠল এবার।

সাতোর বাহিনীকে প্রায় উপোসি থাকতে হচ্ছে। মে মাসের মাঝামাঝি থেকেই সৈন্যরা যে কী করে টিকে থাকবে সে চিন্তাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। রেঙ্গুনে কাওয়াবেকে আর মুতাগুচির দপ্তরে খবরের পর খবর পাঠাচ্ছেন সাতো। 'হয় তাড়াতাড়ি রসদ পাঠাও নয়তো পয়লা জুন বাহিনী ফিরে যাওয়ার রাস্তা ধরবে। যেখানে খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে সেখানে গিয়ে ডেরা গাড়বে। আর এইসবের জন্যে দায়ী আমি হব না—হবে তোমরা।'

জেনারেল স্কুন্সের অবস্থা খাদে পড়া শেয়ালের মতন। খাড়া চড়াইয়ে নখ বিঁধিয়ে বারবার ওঠার চেষ্টা পা পিছলে ব্যর্থ হয়। উলটে পড়ে রক্তাক্ত হয় ওই শেয়ালের শরীর। অন্যদিকে বাঘের ভয়। বাগে পেলে সে ছিন্নভিন্ন করে দেবে শেয়ালকে।

জাপানি ফৌজ কোহিমার রাস্তা আটকে বসে আছে। সামনে দুই ডিভিশন জাপানি সৈন্য গলায় ফাঁস আটকে দিয়েছে। হঠবার নামই নেই তাদের।

তার ওপরে আবার ইতালি সীমান্ত থেকে যেসব বিমান ইম্ফলে আনা হয়েছিল তারাও চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এক মাসের কথা বলে আমেরিকানদের কাছ থেকে আনা বিমানগুলো তারা এখন ফেরত চাইছে। আকাশে ঘন মেঘ ক্রমশই বাড়ছে। তাড়াতাড়ি যদি একটা কিছু না করা যায় তবে জাপানি অজগর ইম্ফল গিলে ফেলবে।

নিজের দপ্তরে বসে স্কুন্স যখন এইসব সমস্যার কথা ভাবছেন তখনই ক্যান্ডি থেকে মাউন্টব্যাটেনের ফোন এল।

'ওখানকার অবস্থা কী?'

'পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন নেই স্যার। জাপানির পিছু হঠবার কোনও লক্ষণ নেই।'

'যা করতে হয় করো। জাপানিদের অবরোধ যে করেই হোক ভাঙো। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের লোভ দেখাও। যা চায় তাতেই রাজি হয়ে যাও। যে করেই হোক তাদের আটকাও।'

'স্যার জাপানি আর বেইমান আজাদি ফৌজ উপোস করে দিন কাটাচ্ছে কিন্তু আত্মসমর্পণের কথা মনে ঠাঁই দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'বললাম তো। সবরকম লোভ দেখাও। যে করেই হোক ওদের ভাঙাও। যে-কোনও মূল্যে ইম্ফল আমার চাই।' ডিকি গর্জন করে ওঠেন।

'সুভাষ রেজিমেন্টকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে হবে। টামুর রাস্তা দিয়ে কোহিমার দিকে এগোও। কোহিমার অন্তিম যুদ্ধে তাদের অংশ নিতে হবে।' নির্দেশ হাতে পেয়ে শাহনওয়াজ উল্লসিত। কোহিমা হাতে এলেই সেখান থেকে অসমের পাহাড় ডিঙিয়ে বাংলা-বিহার—তারপর দিল্লি! 'চল দিল্লি, চল দিল্লি' ধ্বনি উঠল বারবার।

আহত সৈনিকদের মধ্যেও এক অদ্ভুত উদ্দীপনা। মেজর মেহবুব, মেজর রামস্বরূপ আর অন্যান্য অফিসাররা জড়ো হলেন শাহনওয়াজের কাছে। বিজয়া দশমীর মতো পরিবেশ। ডেরা-ডান্ডা গোটানো হচ্ছে। তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে। আহত সৈনিকদের গোরুর গাড়িতে তোলা হল। যারা বেশি অসুস্থ তাদের হাসপাতালে পাঠান হল।

রাস্তায় অনেক পাহাড়। তার মধ্যে চিনি পাহাড় আট হাজার ফুট উঁচু। কাবোয়া গিরিখাতের পেছনে দশ হাজার ফুট উঁচু নাগা পাহাড়। এই পাহাড়ি রাস্তা ভাল জানা নেই কারও। খানা-খন্দ-নালা পেরিয়ে, খাড়া চড়াই বেয়ে—এগোতে হচ্ছে ফৌজকে। মাথার ওপর আকাশ মাঝে মাঝেই কালো মেঘে ছেয়ে যায়। সবকিছু ভিজিয়ে দিয়ে যায় তারা। শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়া। বর্ষা আসন্ন। বাতাসে সোঁদা গন্ধ। বর্ষা শুরু হবার আগেই শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

একসময় 'মোরে' পৌঁছল ফৌজ। এখান থেকেই ভারতভূমির শুরু। আগে আসা জাপানি আর আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাম্প ছিল এখানে। বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য জঙ্গলের মধ্যে অনেক বড় বড় খাদ তৈরি করা হয়েছে। রাত তিনটের সময় এইরকম একটা খাদে মেজর ফুজিয়ারা আর শাহনওয়াজের সাক্ষাৎ হল। দৃঢ় আলিঙ্গনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁরা। শাহনওয়াজের পেটে বাঁধা হাতবোমা দুটোর স্পর্শ পেয়ে হাসলেন ফুজিয়ারা। দুজনেরই মনে পড়ে যাচ্ছে সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলি—ফারের পার্কের সেই উদ্দীপনা, নেতাজি আর তোজোর সামনে সেই দৃপ্ত কুচকাওয়াজ।

অধীরতা চেপে রাখতে পারেন শাহনওয়াজ। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা অর্থাৎ জাপানিরা আমাদের লড়াই করবার সুযোগ দিচ্ছেন না কেন?'

বিষণ্ণ ফুজিয়ারা বললেন, 'কী আর বলব শাহনওয়াজ। একশো বছরের মধ্যে আমাদের সেনাবাহিনীতে যা কখনও ঘটেনি তাই ঘটছে এবার। আমাদের ফৌজে দেখা দিয়েছে মতানৈক্যের রোগ। প্রধান সেনাপতি মুতাগুচি আর তাঁর ডিভিশনাল কম্যান্ডারের মধ্যে ঝগড়া বেড়ে চলছে। এই ধরনের শৃঙ্খলাহীনতা জাপানি ফৌজে কস্মিনকালেও ছিল না।'

দু-একদিন একটু থিতিয়ে নিয়ে আবার এগোতে হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্তিত্ব শত্রুর অজানা নয়। বিমান থেকে প্রচারপত্র ছড়ানো হচ্ছে। ব্রিটিশ কম্যান্ডারের স্বাক্ষর করা সেইসব প্রচারপত্রে অনেক প্রতিশ্রুতি।

'ভারতীয় বন্ধুগণ। জাপানের ছলনায় ভুলবেন না আপনারা। আপনাদের পরিবার-পরিজনরা আপনাদের পথ চেয়ে রয়েছে কবে ঘরে ফিরে আসবেন আপনারা? আপনারা কোনও চিন্তা করবেন না। আপনারা এলেই বিমানে আপনাদের দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন সদাশয় ব্রিটিশ সরকার। তিন মাসের সবেতন ছুটিও পাবেন আপনারা।'

প্রচারের মোহময় কথাগুলো অনেকের মনেই নাড়া দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যায় নেতাজির মুখ—তাঁর আদেশ। কোহিমা দখল করতে হবে। অদম্য উৎসাহে এগিয়ে চলে আজাদি সেনারা।

একদিন রাত প্রায় দেড়টা-দুটোর সময় শাহনওয়াজের ঘুম ভেঙে গেল। ক্লান্ত শরীরে চোখের পাতা খুলতে চায় না। কেউ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করছে। কোনওমতে চোখ খুলে দেখলেন মেজর মেহবুব আহ্‌মেদ। 'কী হয়েছে মেহবুব?'

'আমাদের পেট্রল পার্টির হাতে আপনার ভাই ক্যাপ্টেন নুরা ধরা পড়েছে।'

'নুরা? মানে আমার ছোট ভাই? ধরা পড়েছে?' শাহনওয়াজ এবার ধড়মড় করে উঠে বসেন।

'উনি ব্রিটিশদের ত্যাগ করে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে চান।'

'ওকে এগিয়ে দিয়ে আমার ওপর কোনও চাপ সৃষ্টি করার কায়দা নয়তো?' শাহনওয়াজ তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করেই ফেলেন।

'তার জন্য ভাবছেন কেন? ও তো এখন আমাদের এলাকায়।'

'চলো। দেখা যাক।'

'কিন্তু একটু অসুবিধে আছে।' মেহবুব জানালেন। 'উনি একা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আলোচনা যদি সফল না হয় তবে তাকে নিরাপদে ফিরে যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে আমাদের।'

শাহনওয়াজ একটু চিন্তায় পড়লেও শেষে সম্মতি জানালেন। হাজার হলেও ছোটভাই, রক্তের সম্পর্ক। পাঁচ বছর পরে আবার দেখা হতে চলেছে। তাঁর প্রাণও আকুল হয়ে উঠেছে দেখা করার জন্য।

নুরাকে আলিঙ্গন করে সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠল শাহনওয়াজের। মা-বাবার পরেই শাহনওয়াজও ছোটবেলায় সামলে রেখেছিলেন নুরাকে—বড় আদরের এই ছোট ভাইটি। নুরাও শিহরিত। তবে তারই মধ্যে তিনি খুঁটিয়ে দেখছেন শাহনওয়াজকে। ময়লা উর্দি, মাথায় অনেকদিনের অযত্নে বেড়ে ওঠা চুল, অর্ধাশনে দুর্বল শরীর। দেখে নুরের মনটা আকুলি বিকুলি করে। কান্নাভেজা গলায় তিনি বলেন, 'দাদা। একি অবস্থা তোমার? কতদিন যেন খাওনি মনে হচ্ছে।'

'এখানে দিন কে গোনে রে? আমরা শুধু সকাল হওয়া, রাত্তির হওয়াটা খেয়াল করি।'

শাহনওয়াজ আদর করে হাত বোলাচ্ছেন নুরের গায়ে। চুলে বিলি কেটে দিচ্ছেন। পাঁচ বছরের মধ্যে নুর কেমন তাগড়া জোয়ান হয়ে উঠেছে। শাহনওয়াজ বললেন, 'তোকে পেয়ে মন ভরে গেছে রে আমার। তুইও চলে আয়। দুই ভাই মিলে একসঙ্গে আজাদির লড়াই লড়ব। নেতাজির হুকুম তামিল করব।'

'দাদা। তোমার শরীরে যে আর কিছু নেই। এই অস্থিসার শরীর নিয়ে কি লড়াই করা যায়?'

'তবে কী করব নুর।'

'দাদা তুমি দেরাদুনের অ্যাওয়ার্ড উইনার ক্যাডেট। ইংল্যান্ডের সম্রাট দয়ালু। তুমি যদি একবার রাজি হও তবে তোমাকে ওরা মেজর জেনারেলের র‍্যাঙ্ক শুধু নয়, স্পেশাল কম্যান্ডও দেবে।'

'তার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' এবার শাহনওয়াজও সতর্ক।

'সুভাষ বোসের প্ররোচনায় আমরা ভুল রাস্তায় চলেছিলাম, এইটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে আর কম্যান্ড নিতে সম্মত হতে হবে ব্যস।'

'হ্যাঁ, যখনই তুই আমার শরীর নিয়ে বলছিলি তখনই বুঝে গিয়েছিলাম আমি। যেভাবে এসেছিস, সেই রাস্তায় ফিরে যা নুর।' সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে শাহনওয়াজের।

'দাদা ভেবে দেখো।' শাহনওয়াজের পা ধরে মিনতি করেন নুর। 'সাউথ ইস্ট কম্যান্ডের সর্বেসর্বা মাউন্টব্যাটেন স্বয়ং তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য ইম্ফলে আসবেন। দাদা এ সুযোগ বারবার আসে না।'

'নুর, তুই এখনও কিছুই বুঝিস না। মরতে একদিন সবাইকেই হবে—মিশে যেতে হবে মাটিতে। কিন্তু যাবার আগে নেতাজির আদেশে, দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার যে সুযোগ আমরা পেয়েছি সেটা যে যুগ-যুগান্তরেও আর আসবে না। পা রক্তাক্ত হয়ে যায় যাক, মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ে পড়ুক, দিল্লির পথে আমাদের চলতেই হবে।'

'কিন্তু দাদা। তুমি একটু ভাবো। তোমার কেরিয়ার, তোমার প্রমোশন, তোমার ভবিষ্যৎ।'

'এ সবের অনেক ওপরে পৌঁছে গেছি আমরা। শক্তিমান, সমৃদ্ধিশালী, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের জন্য নেতাজি যে মহাযজ্ঞ শুরু করেছেন, আমি এখন তারই একটুকরো সমিধ। কবে এই যজ্ঞে আমাকে উৎসর্গিত হতে হবে, তারই জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি।'

'কিন্তু দাদা, স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন...'

'চুপ কর নুর। কে তোদের এই মাউন্টব্যাটেন। ইংল্যান্ডের রাজার মাইনে করা চাকর। নেতাজি আমাদের অনভিষিক্ত সম্রাট। কম্যান্ড দিয়ে কী হবে? মাইনে দিলে মাউন্টব্যাটেন আর ওয়াভেল অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশকে বাঁচাবার জন্য নেতাজি বা গাঁধীজির মতো নেতারা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে একবারই জন্মান।'

নুরের যা বলার ছিল বলা হয়ে গেছে। সজল চোখে ফিরে গেল নুর। ঠিক সেই সময় তাঁবুর বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে শাহনওয়াজ দেখলেন মেহবুব মুখ লুকিয়ে পালাচ্ছেন। 'থামো' গর্জন করে উঠলেন শাহনওয়াজ। ফিরে দাঁড়ালেন মেহবুব। হাতে তাঁর স্টেনগান।

বজ্র গম্ভীর স্বরে শাহনওয়াজ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের কথা শুনছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'মনে করো, নুরের প্রস্তাবে আমি যদি রাজি হতাম কী করতে তুমি?'

'আমি আর কী করতাম স্যার। যা করার আমার এই স্টেনগান করত। আপনাদের দুজনের ছাতি ফুটো করে দিত।'

এইবার হো হো করে হেসে উঠলেন শাহনওয়াজ। মেহবুবের কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, 'মেহবুব, তুমি পাগল। আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মুক্তির জন্য নেতাজি যে সংগ্রাম শুরু করেছিল, আমার ভাই কেন, স্বয়ং আল্লাহ্‌তাল্লাও যদি আদেশ দেন, সে সংগ্রাম ছেড়ে পালাব না আমি। এ জীবনে আর নেতাজির পক্ষত্যাগ করা সম্ভব হবে না আমার।'

১৭
ভাঙন

১

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেফরি স্কুন্সের মনে হচ্ছে পুরোপুরি ফেঁসে গেছেন তিনি। রোজ নতুন নতুন দুঃসংবাদ। উস্কোখুস্কো চুল আর বেড়ে ওঠা দাড়িতে পাগলের মতো দেখাচ্ছে তাঁকে। ইম্ফলের ওপর এরকম দুর্দিন যে নেমে আসতে পারে কোনওদিন স্বপ্নেও তা ভাবেননি তিনি।

খোলা জিপে বসে ইম্ফলে চক্কর মারতে মারতেও আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। আশা আমেরিকার বিমানবাহিনী যদি এসে পৌঁছয়। কিন্তু কোথায় তারা? সকালে উঠেই কোহিমায় ফোন করেছিলেন তিনি। খবর একই। ষাট দিন হতে চলল অজগরের পাকের মতো কোহিমা জাপানিদের বেড়াপাকে। নড়বার নাম নেই তাদের। পাহাড়ি গোসাপের মতো মাটি আঁকড়ে বসে আছে তারা।

ফোনের মধ্যে দিয়ে রিচার্ডসের খনখনে গলায় ভীতি আর আতঙ্কের ভাবটা খুবই স্পষ্ট। ইম্ফল আর কোহিমার মধ্যে রাস্তাটাও পুরো আটকে রেখেছে জাপানিরা।

'স্যার। এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়টা কী? বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। ওই বেঁটে জাপানিগুলো ঘাসপাতা খেয়েও কাটাতে পারে। কিন্তু আমাদের ব্রিটিশ সৈন্যদের জলখাবার থেকে শুরু করে মদ-সিগারেট পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক চাই। এই প্রচণ্ড বর্ষাই বা কী করে কাটাব?' আকুলভাবে জানতে চান রিচার্ডস।

'আমি কী বলব বলো? বড় কর্তারা যে যার অফিসে আয়েসে রয়েছেন। খাঁড়া ঝুলছে আমার মাথায়।' অসহায় স্কুন্সের গলায় ঝাঁঝটা লুকোনো থাকে না।

ওদিকে জাপানি বাহিনীর অভ্যন্তরীণ বিবাদটা চলছেই। মাটি আঁকড়ে লড়ছে শুধু সাধারণ সৈন্যরা। তা সত্ত্বেও ইম্ফল আর কোহিমায় তাদের দম আটকে আসছে।

এয়ার মার্শাল বল্ডউইনও খুব চিন্তিত। স্কুন্সের কাছে এসে তিনিও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। চিন্দুইন আর শিলচরের দিকে অনেক ব্রিটিশ বিমান জাপানিদের বিমানবিধ্বংসী গোলায় ধ্বংস হয়েছে। অস্থির স্কুন্স তাঁর কাছে জানতে চান, কেন তাদের সাহায্যের জন্য আমেরিকান স্কোয়াড্রন আসছে না? বিষণ্ণ হেসে বল্ডউইন জানালেন যে এর জন্য জেনারেল স্লিম এখানে ওখানে বারবার দরবার করছেন। 'কিন্তু বর্তমানে চিন সীমান্তে, অস্ট্রেলিয়ার দিকে, প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানি বিমানবাহিনী প্রচণ্ড হামলা চালাচ্ছে। ইম্ফল-কোহিমার দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসতটুকুও নেই আমেরিকার।'

'আচ্ছা মনে করুন যদি বর্মা সীমান্ত থেকে জাপানিরা প্যাসিফিকের দিকে ওদের বিমানগুলো না সরাত?' স্কুন্স বললেন।

'তা হলে এখানে দুটো কবর—তোমার আর আমার—একটা আর একটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত।' বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস পড়ে বল্ডউইনের।

সামনের একটা টিলা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে স্কুন্স বললেন, 'ওই দূরের টিলাটার ওপাশ থেকে জাপানিদের পনেরো নম্বর ডিভিশন ইম্ফলের রক্ষা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। জাপানিগুলো ওই টিলাটার ওপরে অনেকগুলো হালকা ধরনের কামান বসিয়েছে। আর যদি কিছুটা এগিয়ে আসে তবে ইম্ফলের বিমানঘাঁটির দফারফা করতে তাদের সময় লাগবে না। তারপর আমাদের অবস্থাটা কল্পনা করে নিন।' স্কুন্স একটা ক্রশ আঁকলেন নিজের শরীরে।

'শুনলাম, পরশু রাতে জাপানিদের একটা দল নাকি ওই টিলাটার নীচ পর্যন্ত চলে এসেছিল। সত্যি?'

'একবার নয় দু'বার। কী করে যে ঠেকিয়েছি তাদের! কিন্তু এরপর কী হবে জানি না। গোলাবারুদ শেষ হয়ে আসছে। তা ছাড়া খাবার, আনাজ সব শেষ হতে চলেছে। সৈন্যরা কী খেয়ে লড়বে!' এর ওপরে রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে আসা লাখখানেক লোক ইম্ফলে রয়েছে। খাবার না পেয়ে তারাও খাপ্পা আমাদের ওপর। তাদেরই বা কী বলব? পালাবার রাস্তাও বন্ধ। কোহিমা বা টামু দু'দিকের রাস্তাতেই জাপানিরা থাবা গেড়ে বসে আছে। জাপানিরা দু-দুবার বিশানপুর দখল করে নিয়েছিল। টামু তাদের দখলে। এই রাস্তায় সাত-আট মাইল জায়গায় তারা ঘাপটি মেরে রয়েছে। তারপরে সুভাষ বোসের ভূতের দলও রয়েছে। সুভাষ বোসের ছবি নিয়ে তারা ছোট ছোট গ্রামগুলোতে মিছিল করে বেড়াচ্ছে। কর্নেল মালিক সভা করছে। এখানেও মণিপুরীরা কবে যে বেইমানি করবে তাও কিছু বলা যায় না। স্কুন্সের আতঙ্ক হড়বড়িয়ে বেরিয়ে আসে।

বল্ডউইনও ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না। 'কেন যে এরকম হচ্ছে! আমিও তো মোইরাং-এর ওপর বেশ কয়েকবার বিমান আক্রমণ চালিয়েছি। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ মোটেই হটছে না।'

'স্থানীয় লোকেরা নিজেরা আধপেটা খেয়েও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের খাওয়াচ্ছে। ওদের হটতে দায় পড়েছে। কী আর বলব বল্ডউইন! লক্ষণ একেবারেই সুবিধের নয়।'

'চিফ কম্যান্ডার মাউন্টব্যাটেন কী বলছেন?'

'তিনি তো শুধু একজন বাকসর্বস্ব রাজকুমার। আমেরিকার দৌলতেই তাঁর যত বারফট্টাই। তা না হলে কবেই জাপানি আর আজাদ হিন্দ ফৌজ মিলে তাঁকে জলে চুবোত।'

স্কুন্সের টেবিলে খাবার যেমনকার-তেমন পড়ে আছে। পকেট থেকে বউয়ের হাসি হাসি চেহারার ছবিটা বার করে অস্ফুটে বলেন তিনি, 'মোনা, আর কখনও দেখা হবে কী না কে জানে?'

এমন সময় স্কুন্সের স্টাফ অফিসার প্রায় দৌড়ে এসে বললেন, 'স্যার কোমিলা থেকে ফোন এসেছে।'

'কার ফোন?'

'জেনারেল স্লিম নিজে ফোন ধরে আছেন।'

'বলে দাও আমি এখন কাজে ব্যস্ত।'

স্টাফ অফিসার মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন। বল্ডউইন অবাক। স্টাফ অফিসার আবার ছুটে এলেন। ভয়ে কাঁপছেন তিনি। সাদা মুখ আরও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। তাঁর অবস্থা দেখে বল্ডউইন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে অফিসার?'

'জেনারেল স্লিম ফোন ছাড়ছেন না। সমানে ধমকাচ্ছেন।'

'ধমকাচ্ছেন মানে? কী বলছেন?'

'তিনি বলছেন পুরো কোরের কোর্ট মার্শাল হবে। সব কম্যান্ডারকে ফাঁসি দেবেন তিনি।'

'বলে দাও যখন খুশি ফাঁসি দিতে পারেন তিনি।' স্কুন্স এবার দাঁড়িয়ে উঠে প্রায় নাচতে লাগলেন। বল্ডউইন তাঁকে শান্ত করার চেষ্টায় বললেন, 'একবার শুনেই এস না কী বলতে চান উনি।'

স্কুন্স এবার গিয়ে রিসিভারটা ধরলেন, 'বলুন স্যার, কী বলছেন।'

'জাপানিদের বেষ্টনী ভাঙো। মণিপুরের সমতল জায়গাটা থেকে ভাগাও তাদের।'

'ঠিক আছে স্যার। কিন্তু হটাব কী করে?' গোলাবারুদ তো প্রায় শেষ। সৈন্যদের খাবারদাবারও শেষ হতে চলেছে।'

'কম্যান্ডারদের এরকম কাঁদুনি মানায় না।' স্লিমের আওয়াজ চড়ল।

'সত্যি কথা বলব স্যার? আমাদের সৈন্যদের জাপানিদের মতো হারাকিরি করার আদৌ ইচ্ছে নেই। তাদের কথা হচ্ছে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে আবার লড়া যাবে।'

অন্যদিক থেকে ঠকাস করে রিসিভার রেখে দেওয়ার আওয়াজ এল। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না স্কুন্সের। জাপানিদের দাপট রাতেই বেশি বাড়ে। ক্রমাগত গোলাবর্ষণের আওয়াজ আসছে, দেখা যাচ্ছে আগুনের ঝলক।

মে শেষ হতে চলেছে। চতুর্দশ ব্রিটিশ রেজিমেন্ট ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি শুরু হবে। ইম্ফলের অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে উঠবে। একসঙ্গে সাতশো মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গন তখন গলায় এঁটে বসবে। আমেরিকার সাহায্য না পেলে পূর্ব রণাঙ্গনে ব্রিটিশের ক্ষমতা সবারই জানা। ইম্ফল চাতকের মতো আমেরিকান বিমানবাহিনীর আসা-পথের দিকে আশাভরা চোখে চেয়ে আছে। কোমিলায় ম্যালেরিয়ার রোগী জেনারেল স্লিম বারবার ফোন করছেন ক্যান্ডিতে।

'ডিকি, অবিলম্বে যদি বিমান না আসে তবে ধরে নাও আমরা যুদ্ধ হেরে বসে আছি। ইম্ফলকে আর বাঁচানো যাবে না।'

'বিমানের আশা ছেড়ে দাও।'

'সে কী? কেন?'

'ইতালি ফ্রন্ট থেকে একমাসের কথা বলে যে একশো ডাকোটা বিমান আনা হয়েছিল সেগুলোও এখন ফেরত দিতে বলছে আমেরিকা। নতুন বিমান দেওয়ার তো কথাই ওঠে না।'

'তা হলে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে কথা বলো।'

'তিনি আর আমি রুজভেল্টকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোনওমতে ওই বিমানগুলো আটকে রেখেছি।'

গত দু'দিন ধরে মাউন্টব্যাটেন ধাক্কার পর ধাক্কা খাচ্ছেন। মণিপুরের সমতলভূমিতে জেনারেল মুতাগুচির এগিয়ে আসা চিন্তার খবর তো বটেই কিন্তু তাঁর চাইতেও অন্য একটা ব্যাপার তাঁকে বেশি ঘা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর ফোন এড়িয়ে যাচ্ছেন। অনেক কাকুতি মিনতি করেও তাঁকে ফোনে ধরা যাচ্ছে না।

রাতে স্বপ্ন দেখলেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর জাহাজে বোমা পড়ে আগুন লেগেছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন মাউন্টব্যাটেন। সারা শরীর ঘেমে গেছে তাঁর। অকিনলেক দিল্লিতে চুপ করে বসে আছেন। ম্যালেরিয়া হওয়াতে স্লিম একরকম বেঁচে গেছেন। নিজের অফিসে ছটফট করতে

করতে পায়চারি করতে থাকেন মাউন্টব্যাটেন। মাঝে মাঝে এডুইনাকে চিঠি লেখেন, আবার ছিঁড়ে ফেলেন সেই চিঠি।

'আর দু-তিন দিন যদি এই অবস্থা চলে তবে আমাদের অনেক ভারতীয় সৈন্য সুভাষ বোসের পঞ্চম বাহিনীতে যোগ দেবে বলে মনে হচ্ছে।' ফোনে খবরটা দেওয়ার সময় স্কুন্সের গলা চিরে গেল।

জখমি জানোয়ারের মতো অবস্থা স্কুন্সের। দিনে জাগতে পারছেন না—রাতে ঘুমোতে পারছেন না। ওদিকে বিশানপুরের নানাদিক থেকে জাপানিরা এগোচ্ছে। বিশানপুরের আসন্ন পতনের সম্ভাবনা তাঁকে পাগল করে দিচ্ছে। যুদ্ধভূমির প্রত্যক্ষ সেনাপতি হিসাবে দায়িত্বটা তাঁর ওপরেই বর্তাবে। বিছানায় শুয়েও তাই ছটফট করছেন স্কুন্স। এমন সময় স্টাফ অফিসার এসে জেনারেল স্লিমের ফোনের কথা জানালেন।

'বলে দাও বোমার আঘাতে জখম হয়েছি আমি।'

'কিন্তু স্যার মনে হচ্ছে বেশ খোশমেজাজে আছেন জেনারেল। কোনওরকম চেঁচামেচি করছেন না।'

এবার একটু অবাক হয়েই স্কুন্স গিয়ে রিসিভার তুললেন।

'জেফরি, তুমি কি সত্যি সব আশাভরসা হারিয়ে ফেলেছ? মানে আমার মতো?' স্লিমের শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ফোনে।

'স্যার, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে শরীরটা তো ঠান্ডা হয়ে যাবেই।'

'এখন পর্যন্ত তুমি যে বীরত্ব দেখিয়েছ তার জন্য অভিনন্দন স্কুন্স।'

'তার মানে স্যার?'

'ফোনে এখন এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। ওয়ারলেসে সব জানাচ্ছি। ডিকোডিফাই করে ঠান্ডা মাথায় পড়ো।'

ওয়ারলেস বার্তাটি স্কুন্স নিজে ডিকোডিফাই করলেন। বার্তাটির প্রতিটি শব্দ তাকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

'আর শুধু চারদিন দেখো। যদি কিছু না হয় তবে ৭ জুন, ১৯৪৪ দুপুর বারোটার সময় তোমরা জাপানি জেনারেল ইয়ামামোতোর কাছে আত্মসমর্পণ করবে।'

স্কুন্সের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেছে। 'যেন তেন প্রকারেণ' নিজের সৈন্যদের রক্ষা করাই তাঁর একান্ত ইচ্ছে। কিন্তু 'আত্মসমর্পণ'—এই বিষাক্ত কথাগুলো একেবারে মনে গিয়ে বিঁধেছে তাঁর। ভেতর থেকে কান্না উপচে এল তাঁর। বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে উঠে, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়লেন তিনি। সিঙ্গাপুরের পরে আবার জাপানিদের কাছে এই অপমান। তার চাইতেও বড় কথা ওই বেইমান সুভাষ বোসের দলবলের কাছে এই হার। এর চাইতে যদি পৃথিবীতে প্রলয় নেমে আসত, কী এমন খারাপ হত!

দাঁত দিয়ে রুমালটা কামড়ে ধরে তাঁর সারা শরীরটা নিঃশব্দে কাঁপতে থাকে।

অধীনস্থ অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করছিলেন মুতাগুচি। ক্ষোভে, রাগে, হতাশায় যা মুখে আসে তাই বলছেন তিনি। অফিসারদের ছোট বড় বিচার করছেন না। কথা তো নয় যেন চাবুকের ঘা। মুতাগুচি বলছেন, 'ইম্ফল যদি জয় করতে হয় তবে আমাকে নিজে হাল ধরতে হবে এটা বুঝতে পেরেই এসেছি আমি। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হলে তিন সপ্তাহের মধ্যে ইম্ফল জেতার কথা আমাদের। তারপরে এক মাস কেটে গেছে। কিন্তু আমার অফিসাররা কী করছেন বসে বসে?'

সবাই মাথা নিচু করে বসে। কেউ কোনও উত্তর দিচ্ছে না। মুতাগুচির গর্জন সমানে চলেছে।

'চন্দ্রা বোসকে আমি দম্ভ করে বলেছিলাম, আমি শুধু আমার গোলাপ বাগান নিয়েই থাকব, আমার অফিসাররাই যুদ্ধের ব্যাপার সামলাবেন। আর তোমরা আমার নাক কেটে দিয়েছ। কেন এরকম করলে তোমরা? কেন? ইয়ানাগিডা, তুমি বলো।'

লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়ানাগিডা তোতলাচ্ছেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মুতাগুচি আবার বললেন, 'আমার প্ল্যান ছিল একদম নিখুঁত। মেমিয়ো থেকে রওনা হবার সময় আমি তোমাদের বলেছিলাম যে সমতলভূমিতে ব্রিটিশের সতেরো নম্বর ডিভিশনটাকে সবার আগে খতম করো। ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ স্যার', ইয়ানাগিডা স্বীকার করলেন।

'সতেরো নম্বর ডিভিশন পুরোপুরি তোমার কব্জায় এসেছিল, এটাই সত্যি নয় কি?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তবে তুমি বাগে পেয়েও তাদের ছেড়ে দিলে কেন?'

ইয়ানাগিডা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'স্যার, গন্ডগোলটা হয়েছিল গোপন বার্তা সংক্রান্ত একটা খবরের ভুল বোঝাবুঝির ফলে। আপনি তো জানেন আত্মসমর্পণের আগে সাংকেতিক ভাষার নির্দেশিকা, কোড-কি নষ্ট করে ফেলতে হয়। কর্নেল সসাকার আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন "সাংকেতিক নির্দেশিকা ধ্বংস—শত্রুরা আত্মসমর্পণের জন্যে তৈরি হচ্ছে।" দুর্ভাগ্য যে যান্ত্রিক গোলমালে শেষটুকু আসেনি। তাই আমার মনে হল আমাদের সৈন্যরা কোড-কি ধ্বংস করে আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি হচ্ছে। তাই... তাই আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিল।' মুতাগুচির চোখ দিয়ে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। 'পরিকল্পনা অনুযায়ী তুমি শিলচর রোড ধরে ইম্ফলের দিকে এগোলে না কেন?'

'স্যার শত্রুর সাঁজোয়া বাহিনীর আক্রমণে আমাদের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল। তাঙ্গঝাঙ্গ আর টিড্ডিমের রাস্তায় আমাদের অনেক সৈন্য নিহত হয়েছে।'

'তোমার মতো একটা অপদার্থকে কে যে ডিভিশনার কম্যান্ডার করেছে! যুদ্ধে সৈন্য নিহত হবে না তো কি ইঁদুর মরবে? তোমাকে গোরুর গাড়িতে জুড়ে দিয়ে চাবকানো উচিত।'

ইয়ানাগিডা থরথর করে কাঁপছেন। সবার সামনে এরকম প্রচণ্ড অপমান! এরকম একজন উঁচুদরের অফিসারের এমন অবস্থা দেখে একটু নিচুস্তরের অফিসারদের তো মুখ শুকিয়ে গেছে।

'আমার তিনটি ঘোড়াই অকর্মার ধাড়ি। ইয়ানাগিডা অপদার্থ, সাতো অতি চালাক আর

ইয়ামায়ুচি পোয়াতি মেয়ের মতো দিনের পর দিন হাসপাতালে পড়ে থাকে। আমার কপালে কেন যে জুটলে তোমরা!'

রাগে দুঃখে মুতাগুচি অধীর। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনে তাঁর বাহিনীর পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনার কথাও চিন্তা করছেন তিনি। এবার ইয়ানাগিডাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তিনি সমস্ত নির্দেশ কর্নেল তানাকাকে দিতে শুরু করলেন। এটা খুব পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, ইয়ানাগিডাকে সরিয়ে ত্রয়োবিংশ ডিভিশনের ভার তিনি তানাকার হাতেই দেবেন। তানাকার খ্যাতি আছে সাহসী এবং কর্তব্যপরায়ণ অফিসার হিসাবে।

স্টাফ অফিসারের দিকে তাকিয়ে মুতাগুচি প্রশ্ন করলেন, 'কোহিমা থেকে মিয়াঝাকি আসেনি কেন?'

'সাতো খবর পাঠিয়েছেন যে মিয়াঝাকিকে এখন তিনি পাঠাতে পারবেন না।'

'পাঠাতে পারবেন না মানে? মাথা ঠিক আছে তো সাতোর? আসবে না মানে? ওকে আমি এখানে এনে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখব।'

মুতাগুচির রাগ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে কেউ আর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা পাচ্ছে না। সবাই চাইছেন মুতাগুচির শ্রবণ-সুখকর প্রসঙ্গই তাঁর কানে তুলতে, অপ্রিয় প্রসঙ্গ চেপে যেতে।

'কী বলছে সাতো?'

'সাতো জানিয়েছেন শিগগিরই কোহিমা দখলে আসবে।'

অফিসারটি অবশ্য সাতোর বক্তব্যটা একটু ঘুরিয়েই বলেছেন। আসলে সাতো যেটা বলে পাঠিয়েছেন সেটা একটু অন্যরকম। তিনি বলে পাঠিয়েছেন, 'আমি তিন সপ্তাহের মধ্যেই কোহিমা কবজা করছি। তোমাদের মুতাগুচিকে বলো ইম্ফল কবজা করতে।' সাতোর এই ভাষা মুতাগুচিকে বলার হিম্মত কোনও অফিসারেরই নেই।

এমন সময় হঠাৎ খবর এল যে হাসপাতালে ইয়ামায়ুচির মৃত্যু হয়েছে। খবরটা শুনে মুতাগুচি কিছুই বললেন না। ভাবখানা যেন, 'বাঁচা গেল, এবার অন্য কাউকে ভার দেওয়া যাবে।' কিন্তু উপস্থিত বাকি সবাইকার মনেই আতঙ্ক—মুতাগুচির জুয়াখেলার পরবর্তী ঘুঁটিটি কে?

মুতাগুচি ইয়ানাগিডা আর ইয়ামায়ুচির জায়গায় নতুন সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। মে শেষ হয়ে আসছে। মুতাগুচি অস্থির। উইনগেটের দলবল রসদ লুট করে নিয়েছে। ইম্ফল আর কোহিমায় প্রচণ্ড সংঘর্ষ হচ্ছে। ইম্ফলের দিকে দুটি বাহিনীই চাইছে ইম্ফল গ্রাস করতে। জাপানিদের অজগর বেষ্টনে কোহিমার নাভিশ্বাস উঠছে। ইম্ফলের সমতলভূমি ধুঁকছে।

একদিন রাতে মুতাগুচির কাছে রেঙ্গুন থেকে ফোন এল। ফোন তুলে চন্দ্রা বোসের অধীর আওয়াজ শুনতে পেলেন।

'জেনারেল, আমি আগামীকালই "আজাদ হিন্দ" বিমানে ইম্ফলের সমতলভূমিতে পৌঁছচ্ছি।'

'দয়া করে এ ধরনের দুঃসাহস করবেন না।'

'জেনারেল, অনেক হয়েছে। ভারতবর্ষে আমাকে পৌঁছতেই হবে।' আবেগে নেতাজির গলা ভেঙে আসছে।

'দয়া করে এরকম অস্থির হবেন না। এখানে একশোরও বেশি আমেরিকান বিমান রয়েছে। অনর্থ ঘটে যাবে।'

'যা হবার হোক। কী হবে? বিমান ধ্বংস হবে; ছাই হয়ে যাবে আমার শরীর? তাই হোক। সেই ছাই থেকেই আবার নতুন আগুন জ্বলবে। সুভাষ মাস্ট ডাই সো দ্যাট মাদার ইন্ডিয়া ইজ সেভ্ড।'

'এখন অস্থির হবেন না। প্রতিপদে বিপদ। আমি আপনাকে কিছুতেই আসতে দেব না।'

'ঠিক আছে। আমি মেমিয়ো থেকে পায়ে হেঁটে আসব। তাতে যা সময় লাগার লাগবে। পরোয়া নেই।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনি আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতীক। এরকম পাগলামি আপনার মানায় না। চন্দ্রা বোস আপনার কি জাপানি সৈন্যদের ওপর ভরসা নেই?'

'নিশ্চয় আছে।'

'আমি মানছি যে আমার সৈন্যবাহিনীতে হুকুম তামিল না হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমার সৈন্যবাহিনী এখনও ভেঙে যায়নি। তা ছাড়া মুতাগুচি এখনও বেঁচে আছে। বন্ধু, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না। ইম্ফলের জন্য আমার প্রতিটি রক্তকণা আকুল হয়ে উঠেছে।'

'চন্দ্রা বোস, আপনাকে আমি একটা সুখবর দিচ্ছি। এটা ঠিক যে আমরা একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছি। কিন্তু শত্রুপক্ষের অবস্থাও কাহিল। খুব সম্ভবত আর দিন চারেকের মধ্যেই ইম্ফলে তারা হয় আত্মসমর্পণ করবে আর নয়তো পালাবে। বর্ষাই এখন আমার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে বাধা আমি নিশ্চয় পার হব। যে মুহূর্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ আর জাপানি ফৌজ ইম্ফলে ঢুকবে, সেই মুহূর্তেই খবর পাবেন আপনি। তখন আসবেন আপনি। ইম্ফলের মাটিতে আপনার এই জাপানি দোস্ত...'

হঠাৎ টেলিফোনটা বন্ধ হয়ে গেল। খরখর করে আওয়াজ করছে যন্ত্রটা।

মাথার ওপরে কালো মেঘ। বর্ষা আর দুশমন কারওরই পরোয়া না করে জেনারেল মুতাগুচি নিজে নেমে পড়েছেন লড়াইয়ে। সৈন্যদের উজ্জীবিত করছেন।

'অস্ত্র নেই বলে লড়তে পারিনি, গোলাবারুদ ছিল না বলে লড়তে পারিনি—এসব অজুহাত চাই না আমার। গোলাবারুদ না থাকলে সঙিন দিয়ে, সঙিন ভেঙে গেলে হাত দিয়ে, হাত ভেঙে গেলে পা দিয়ে—পাও যদি ভেঙে যায় দাঁতে নখে লড়তে হবে তোমাদের। কিছুতেই ভুলো না জাপানের শাশ্বত ঐতিহ্য—"ইয়োমাতো দামাশি"।'

৩

কলকাতা,
১৮ এপ্রিল, ১৯৪৪

নেতাজি,

কবে পতন হবে ইম্ফলের? কবে পূর্ব সীমান্তে আসবেন আপনি? আমরা সকলে আপনার আসা পথ চেয়েই রয়েছি। এখানে অভ্যুত্থানের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। পেনাং, সিঙ্গাপুর আর রেঙ্গুন থেকে আপনার বিপ্লবী সাথিরা এখানে এসে পৌঁছেছেন। মাদ্রাজ, করাচি, বোম্বাই, দিল্লিতেও পৌঁছে গেছেন তাঁরা। এখানে আমাদের অনেক গোপন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতীক্ষা শুধু আপনার আদেশ আর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের। দিল্লির পথে আপনি যখন চলবেন তখন আপনার সঙ্গে চলবে লক্ষ লক্ষ মানুষ, 'চল দিল্লি' হুংকারে আকাশ বিদীর্ণ করে।

ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন হায়েনার মতো আমাদের পেছনে লেগেছে। অনেককে ফাঁসি দিয়েছে, অনেকে জেলে পুরেছে। আমাদের মধ্যেও কিছু কিছু ঘরশত্রু বিভীষণ আছে—চিরকালই যেমন ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আপনাকে বলছি এই যুদ্ধে সফল আমরা হবই। আপনি আসুন, নেতাজি, তাড়াতাড়ি আসুন। আপনার দীপ্ত অভ্যুদয়ে ঘুচে যাক শতাব্দীব্যাপী অন্ধকার—উজ্জ্বল হয়ে উঠুক আটত্রিশ কোটি মানুষের জীবন। ভগবান আপনাকে সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করুন।

আপনার
হাজার হাজার সঙ্গী
আর অনুশীলন আর যুগান্তরের সহকর্মীবৃন্দ

এক মাস আগেই এসেছে চিঠিটা। সাতো কোহিমা প্রায় গ্রাস করেছেন। ইম্ফলের দ্বারপ্রান্তেও পৌঁছেছে জাপানিরা। মণিপুরের সমতলে পৌঁছে গেছেন শাহনওয়াজ, মেহ্‌বুব, শওকত, প্রীতম সিং, কিয়ানি—প্রভৃতি বীর সেনানায়কেরা। কিন্তু ভারতে এখনও অভ্যুত্থানের কোনও লক্ষণ নেই কোনও? এদিক থেকে শতাধিক বিপ্লবীর ভারতে পৌঁছে যাবার খবর পাওয়া গেছে। অনেক ডুবোজাহাজ তাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে খবর দিয়েছে। কিন্তু ভারতে কোথায় আলোড়ন?

পেনাং থেকে এন. জি. স্বামী আর মহম্মদ দুরানিকে ডেকে পাঠালেন নেতাজি।

'স্বামী পরিকল্পনামতো ইম্ফলে ফৌজ এগোচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ভিতরে অভ্যুত্থানের কোনও লক্ষণ নেই কোনও?'

'স্যার প্রস্তুতিতে কোনও ত্রুটি ছিল না।'

'কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায়?'

'স্যার আমাদের একটা দলকে কোনারকের সূর্য মন্দিরের কাছে নামানো হয়েছে। দিল্লি থেকে লালা শংকরলাল আর শীলভদ্র যাজির কাছ থেকে প্রস্তুতির খবর পৌঁছেছে। তা ছাড়াও গুজরাতে নাথালাল পারেখের খামারেও একটা দল পৌঁছেছে।'

'তা হলে কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না কেন?'

এতক্ষণ 'লম্বু' মহম্মদ দুরানি চুপ করেছিলেন। এবার বললেন, 'স্যার। সারা ভারত একটা বারুদখানা হয়ে রয়েছে। চোপরা, দুবে, অমরিক সিং-এর মতন লোকেদের দলও রওনা হয়ে গেছে।'

'কথা নয়, প্রত্যক্ষ ফল চাই আমার।' নেতাজি অসহিষ্ণু।

এমন সময় আয়ার সাহেব একটা ছোট রেডিয়ো নিয়ে এলেন সেখানে। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে বিশেষ সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে।

'জাপানের কিছু এজেন্ট সমুদ্রতীর দিয়ে ভারতে ঢুকতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন শহরে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে তারা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকলকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। জানা গেছে এদের মধ্যে কিছু পান্ডাদের নাম চোপরা, দুবে ইত্যাদি। এই এজেন্টদের সম্পর্কে খবর দিলে প্রত্যেকের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্পর্কে নিকটবর্তী থানা অথবা সামরিক কেন্দ্রে খবর দিতে নাগরিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।'

আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেদের জাপানি এজেন্ট বলে ঘোষণা করায় মহম্মদ দুরানির

'ভাওয়ালপুরি' রক্ত গরম হয়ে উঠল। নেতাজি চিন্তিত অন্য কারণে। এদের ভারত প্রবেশের কথা ব্রিটিশ জানল কী করে?'

এমন সময়ে নেতাজির ব্যক্তিগত সুরক্ষা আধিকারিক কুন্দন সিং এলেন। বললেন, 'নেতাজি, আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে কেউ বা কারা ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের জন্য প্রচার করছে তারা। এই কাগজটা দেখুন।'

কাগজটা হাতে নিয়ে জোরে জোরেই পড়তে শুরু করলেন নেতাজি। 'আজাদ হিন্দ ফৌজের মুসলিম অফিসারবৃন্দ। উঁচু পদের লোভ তোমাদের জাতির কথা, ধর্মের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। একটা বাঙালির পেছনে পেছনে তোমরা লেজুড় হয়ে ঘুরছ। হিন্দু অফিসারদের চাইতেও বেশি বেশি আনুগত্য দেখাচ্ছ তোমরা। কিন্তু কেন? ওই ভণ্ড গাঁধী আর এই সুভাষ দুজনেই পাক্কা হিন্দু। গাঁধীর মতোই সুভাষও চায় ভারতে হিন্দু রাজত্ব। এই হিন্দুদের দাসত্ব কোরো না—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে—জিন্না সাহেবের জন্য জীবন উৎসর্গ করো।'

'থামুন নেতাজি। ওই বিষমাখানো কথাগুলো আর পড়বেন না আপনি।' লম্বু দুরানি ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

'পাকিস্তান—এই শব্দটা শোনার চেয়ে মরা ভাল। আমি চললাম নেতাজি। আজাদ হিন্দ ফৌজে যারা ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করছে তাদের খুঁজে বের করে আপনার সামনে হাজির না করা পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না আমি।' রেগে মেগে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন দুরানি। সস্নেহে সেদিকে তাকিয়ে স্বামীকে বললেন নেতাজি, 'দিজ ভাওয়ালপুরিজ আর শর্ট টেম্পার্ড বাট সো ইনোসেন্টস। কিন্তু কারা এইসব চেষ্টা করছে তার ওপর তুমিও নজর রেখো।'

সেই রাত্রে শুতে যাবার সময় রেডিয়োতে একটা খবর কানে আসতেই সজাগ হয়ে উঠলেন নেতাজি। খবর বলছিল, 'করাচি, বোম্বাই আর পশ্চিম ভারতের অনেক বন্দরে শত্রুদের কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। কিছু জাপানি এজেন্ট করাচি বন্দরে গোলাবারুদ ভরতি একটা জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। জানা গেছে একটি তরুণী নিজের শরীরে বিস্ফোরক বেঁধে শত্রুদের এজেন্টদের সহায়তায় জাহাজের ওপর লাফিয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের পর তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও পুলিশ তদন্ত করে জেনেছে যে মুগ্ধা সহস্রবুদ্ধে নামে এই মরাঠি তরুণীটি বোম্বাইতে থাকত।'

খবরটা শুনে নেতাজি নির্বাক, নিষ্পলক। অতীতের মধ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি। কংগ্রেসের সেই অধিবেশনের কথা মনে পড়ছে। মুগ্ধার লম্বা, ছিপছিপে শরীর আর মুগ্ধ দৃষ্টির কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সেই 'মাই ডিয়ার হাজব্যান্ড' সম্বোধনের চিঠি, এখান ওখানে তাকে অনুসরণ করা। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ল বোম্বাইতে সেই শেষ দেখার মুহূর্তগুলি।

'কেন এইভাবে পাগলের মতো আমার পেছনে পেছনে ঘুরছ। তার চেয়ে দেশের জন্য কিছু করো না কেন? তাতে তোমার জন্য আমার গর্ব হবে।' তারপরে দেশ থেকে পালানোর পরে ঘটনার পর ঘটনার আবর্তে মুগ্ধার কথা আর মনেই পড়েনি তাঁর। আজ আবার মনে পড়ছে সব কথা। ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগকেও ধন্দে ফেলে দিয়েছিল মেয়েটি।

সহ্যাদ্রির কোলে বেড়ে ওঠা সেই নিষ্পাপ তরুণীটির মুখ আজ আগুনের পরশমণির দীপ্তিতে দ্যুতিমান হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে নেতাজির—সে চোখের জল মিশতে চায় সেই অগ্নিকন্যার স্পর্শপূত করাচির সাগরজলে শ্রদ্ধায়, গর্বে।

মোটরগাড়ি রেঙ্গুনের মিঙ্গলডন বিমানবন্দরের দিকে মোড় নিল। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন নেতাজি। রানওয়ের ওপর কয়েকটা জাপানি বোমারু বিমান দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের পাখায় জলের ফোঁটাগুলো সকালের আলোয় হিরের মতো ঝলক দিচ্ছে।

গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত পায়ে বিমানের দিকে এগোচ্ছেন নেতাজি। তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে তাঁর এ ডি সি আর পেছনের গাড়ি থেকে নেমে তাঁর দেহরক্ষীরাও দৌড়চ্ছে পেছনে পেছনে। বোমারু বিমানগুলির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ইলেভেন সিটার বিমান—আজাদ হিন্দ। অক্ষরগুলোর পাশেই আঁকা রয়েছে ব্যাঘ্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা। পতাকায় লাফ মারা বাঘের ছবিটা আজ যেন বিশেষ করে নজরে আসছে। তার লাল চোখগুলোতে লেখা রয়েছে অনেক দিনের অনেক কথা।

'ক্যাপ্টেন রাওত, বিমানে তেল ভরা আছে?' এ ডি সি-কে জিজ্ঞাসা করলেন নেতাজি।

'ট্যাঙ্ক পুরো ভরা। তা ছাড়া দুটো বেলুনেও অতিরিক্ত তেল নেওয়া আছে।'

'পাইলট কোথায়?'

'সে তো এই বিমানবন্দর ছেড়ে কোথাও যায় না। লাউঞ্জেই শোয়। ইম্ফলে পৌঁছনোর জন্য তাঁর আগ্রহ আপনার চাইতেও বেশি।' রাওত হাসতে হাসতেই বললেন।

বিমানটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন নেতাজি। চিকচিক করতে থাকা জলের ফোঁটাগুলোকে মনে হচ্ছে অনেকগুলো চোখ। ময়ূরের পাখায় আঁকা নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ চোখ নয়—রামধনুর রং ছড়ানো সজীব চোখ। সেইসব চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। মেজদা, মা, বাসন্তী মা, দেশবন্ধু, বিঠ্ঠলভাই, এমিলি, অনিতা—সবার চোখই যেন দেখতে পাচ্ছেন তিনি। আরও দু' জোড়া চোখ—কেমন যেন শঙ্কাভরা নজর তাদের। গাঁধীজি আর জওহরলালের চোখ।

মনে মনে অনেকক্ষণ আগেই বিমানযাত্রা শুরু হয়ে গেছে নেতাজির। কোহিমা-ইম্ফল ছাড়িয়ে, ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে বাংলা—লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে অনুরণিত হচ্ছে, 'চল দিল্লি, চল দিল্লি।' মিছিল চলেছে দৃপ্ত মহিমায়। সেই মিছিলে শুধু মানুষেরাই নয়—শামিল হয়েছে অনেক কিছু। তার মধ্যে আছে ত্রিপুরী কংগ্রেসের মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য আনা সেই স্ট্রেচার, কলকাতার রাস্তায় সেই উন্মত্ত ঘোড়সওয়ার পুলিশদের লাঠি, কাবুলের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো জিয়াউদ্দিনের সেই ঢোলা জামাটা, বার্লিনে ম্যাজুটার গায়ের দামি স্যুটটা। রয়েছে কস্তুরবার রান্নাঘরের তাকে রাখা দার্জিলিং চায়ের কৌটোটা—এমনকী ভগৎ সিং-এর ফাঁসির মঞ্চটা পর্যন্ত। সেই বিচিত্র মিছিলে সবার মুখে শুধু একই ধ্বনি—'চল দিল্লি।'

আবিষ্টের মতো নেতাজি এলেন কাওয়াবের কাছে। বিশাল গোঁফে তা দিতে দিতে কাওয়াবে একটা ম্যাপ দেখছিলেন তখন।

'আপনাদের বাহিনী কোহিমায় চুপ করে বসে আছে কেন? কেন আর এগোচ্ছে না।' সরাসরি প্রশ্ন করলেন নেতাজি। 'ইম্ফলের পতন হতে আর কত দিন লাগবে?'

'মুতাগুচি এবার স্বয়ং ভার নিয়েছেন। পরিস্থিতি নিশ্চয় বদলাবে এবার।' কাওয়াবে ভরসা দেন।

যুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতিটা কী, কেন অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে রয়েছে এইসব সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য জেনারেল চ্যাটার্জির নেতৃত্বে একটি দলকে নেতাজি ফ্রন্টে পাঠিয়েছেন। কিন্তু

তাদের কাছ থেকেও এখনও কোনও খবর আসেনি। আসলে বেতার যোগাযোগ ভালভাবে করা যাচ্ছে না। 'আট দিনের মধ্যে ফ্রন্ট থেকে কোনও খবর আসেনি।' হতাশ স্বরে বললেন নেতাজি।

'আবহাওয়ার জন্যই হচ্ছে এটা। অন্যান্য বারের চেয়ে আগেই বর্ষা শুরু হয়ে গেছে এবার। জোরটাও বেশি মনে হচ্ছে।' বিষণ্ণ কাওয়াবে জানালেন।

দেওয়ালে একটা ছবির দিকে নজর গেল নেতাজির। ঘোড়ায় চড়া নেপোলিয়নের ছবি। সেই বিখ্যাত টুপি—সেই দৃপ্ত ভঙ্গি। কিন্তু সব ছাড়িয়ে যেটা নজর কাড়ে সেটা হচ্ছে দুটো চোখ। আশ্চর্য প্রত্যয় সেই দুটো চোখে।

৫

সাতো নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছেন জানতে পেরে মুতাগুচি তড়িঘড়ি স্টাফ অফিসার হাশিমিতোকে পাঠিয়ে দিলেন সাতোর কাছে। কাদা ভরা রাস্তায় দিনরাত চলে হাশিমিতো পৌঁছলেন সাতোর ছাউনিতে। দূর থেকেই তিনি দেখতে পেলেন ছাউনি গোটাবার আয়োজন চলেছে। মানুষের খিদের কবল থেকে যে ভারবাহী পশুগুলো এখনও বেঁচে আছে তাদের পিঠে বোঝাই করা হচ্ছে সাজসরঞ্জাম। মুতাগুচির দূতকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সাতো। তাঁর হাতে পায়ে ধরে হাশিমিতো বললেন, 'জেনারেল আর কিছুদিন একটু অপেক্ষা করুন।'

'অপেক্ষা করার মতো সময় নেই আমার হাতে।'

'আপনার জন্য মুতাগুচির চিঠি আছে।'

'আমি দেখতে চাই না।' সাতো হুংকার দিয়ে উঠলেন মাটিতে লাথি মেরে। কাদা ছিটকালো হাশিমিতোর গায়ে।

হাশিমিতোর ধমনিতে সামুরাই রক্ত ছলকে উঠল। সাতোর কথায় কান না দিয়ে জোরে জোরে মুতাগুচির চিঠি পড়তে শুরু করলেন তিনি। 'সাতো, বন্ধু আমার। কী রকম বীরত্বের সঙ্গে কী ভীষণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করছ তুমি, সেটা আমি জানি। পশ্চাদপসরণের কথা মনে স্থান দিয়ো না। প্রকৃত সেনানায়ক কখনও নিজের সৈন্যদের উপোস করে মরতে দেবার কথা ভাবতেও পারে না। তোমাদের রসদের ব্যবস্থার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি— আমার এই কথাটা বিশ্বাস করো। ভুলো না এই সংকট আমাদের "বুশিডো" পরম্পরাকে উজ্জীবিত হতে আহ্বান জানাচ্ছে। উদয়সূর্য পরীক্ষা নিতে চাইছে আমাদের নিষ্ঠার।'

'অত্যন্ত বাজে ধরনের কাব্য'—মুখ থেকে তেতো পাতা ফেলে দেবার ভঙ্গিতে থুতু ফেলে গর্জে উঠলেন সাতো।

'দয়া করে যাত্রা স্থগিত রাখুন। যুদ্ধ যদি নাও করেন অন্তত ঘাঁটি আগলে বসে থাকুন।'

'সেটা এখন আর সম্ভব নয়।'

'একবার ইম্ফলের পতন হলেই আমাদের সব কষ্ট সফল হবে।'

'এ ধরনের জুয়োখেলার জন্য আর অপেক্ষা করতে রাজি নই আমি।'

'জেনারেল, ভগবান সাহসীর সহায় হন।'

'তুমি কি তোমার এই ভাষণ বন্ধ করবে, না একটা লাথি কষাব তোমার—' অশ্রাব্য কথাটা বেরিয়ে এলো সাতোর মুখে। এবার এগিয়ে এসে হাশিমিতোর হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন তিনি। সাতোর চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে।

মিয়াঝাকি আর অন্যান্য অফিসাররা মাঝখানে এসে পড়লেন। সবাই মিলে মিনতি করতে

লাগলেন, 'স্যার, আর একটু অপেক্ষা করুন। এই সময় কোহিমা ছেড়ে গেলে অনর্থ ঘটবে।'

'আমি সেটা মনে করি না।'

'কোহিমা থেকে ইম্ফলের রাস্তা নিষ্কণ্টক হবে শত্রুদের। কোহিমার ব্রিটিশ বাহিনী ইম্ফলের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাবে। অনর্থ হয়ে যাবে স্যার।'

সাতোকে রোখা গেল না। নিজেই একটা চিঠি লিখে ফেললেন তিনি। 'আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা বিগত দু'মাস যাবৎ কোহিমায় লড়াই করে চলেছি। এখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমরা এখন সম্পূর্ণ হতবল। চূড়ান্ত হতাশা নিয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা কোহিমা থেকে বিদায় নিচ্ছি।' সত্যিই চোখে জল গড়াচ্ছে সাতোর। সবাই স্তম্ভিত। কার ওপরে প্রতিশোধ নিচ্ছেন সাতো—নিজের ওপর? মুতাগুচির ওপর? সৈন্যবাহিনীর ওপর? না কি নিজের মাতৃভূমির ওপর?

নিজের হাতে সিল করে চিঠিটা হাশিমিতোর হাতে দিলেন সাতো।

সমানে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। ট্রেঞ্চগুলো জলে ভরে যাচ্ছে। গত তিন মাসের কোহিমার যুদ্ধ শেষ। কোহিমা শত্রুর হাতে চলে যাবে অবিলম্বে।

সাতোর মনে ভয়—পাছে সৈন্যরা বিদ্রোহ করে বসে। তাই অধীনস্থ অফিসারদের নির্দেশ দিলেন তিনি, 'সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করো। ওয়ারলেস সেটটা ভেঙে ফেল। মুতাগুচির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখতে চাই না আমি।' সবাই মনে করলেন এটা সাতোর রাগের কথা। অফিসারদের নিশ্চল দেখে সাতো এবার নিজেই উঠলেন। বড় একটা পাথর তুলে নিয়ে আছড়ে ফেললেন ওয়ারলেস সেটটার ওপর। নিজের হুকুম নিজেই তামিল করলেন সাতো। ছিন্ন হল সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

কাবোয়া নদীর দিকে পশ্চাদপসরণ শুরু করল জাপানি সৈন্যরা। বৃষ্টিতে, কুয়াশায় পথের দিশা পাওয়া ভার। পশ্চাদপসরণের গ্লানি কুরে কুরে খাচ্ছে অনেককেই। এই অপমান, এই কালিমা থেকে মুক্তি পেতে নিজেদের সঙিন নিয়েই হারাকিরি করল অনেকে। দুঃসহ কষ্ট সহ্য করতে পারল না অনেকের অনশনক্লিষ্ট শরীর।

রাস্তার দুধারে জল থই থই খানাখন্দগুলো গ্রাস করল অনেককে। রাস্তায় শবদেহগুলো সারি দিয়ে শুয়ে রইল শত্রুকে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য।

৬

উখরুলের ছ'মাইল দক্ষিণে জাপানিদের ছাউনি পড়েছে। বিরামহীনভাবে মুষলধারে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। ডিভিশনের প্রধান দপ্তরের জন্য কোনওমতে একটা ত্রিপলের আচ্ছাদন তৈরি হয়েছে। বাকিরা বড় বড় গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সাতোর। যেন আগুন লেগেছে এইরকম চিৎকার করতে করতে সান্ত্রি হুড়মুড় করে এসে হাজির হল, 'স্যার উঠুন, উঠুন। চিফ কম্যান্ডার আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না সাতো। এই প্রচণ্ড বর্ষার রাত্রে, এই দুর্গম জায়গায় মুতাগুচি? কোনওমতে গায়ের চাদর সরিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে একটা কিমোনো গায়ে জড়িয়ে তাঁবুর দরজায় এলেন তিনি। লালচোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মুতাগুচি। প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিলেন সাতো। তাঁর চোখেও আগুন ঠিকরোচ্ছে। মুখে মেঘ রৌদ্রের খেলা।

মুতাগুচি এগিয়ে এসে সাতোর কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, 'বন্ধু, এখনও, হ্যাঁ এখনও, আমরা যুদ্ধের গতি ফেরাতে পারি। চল, দুজনে মিলে ইম্ফলের ওপর শেষ হামলা চালাই।'

'তার জন্য বড্ড দেরি হয়ে গেছে কম্যান্ডার মহোদয়।'

'এ রকম করে বোলো না বন্ধু। পঞ্চদশ ডিভিশনের এই পশ্চাদপসরণে ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। এখন যদি না ফের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'ফিরতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু পেটের জ্বালার কী করব?'

'তার ব্যবস্থা আমি করছি।'

'লিখিত আদেশ কোথায়?'

'কাওয়াবের নির্দেশ যথেষ্ট স্পষ্ট।'

'অনেক কিছুরই উল্লেখ নেই সেখানে।' এবার সাতোর গলাটা একটু মিনমিনে শোনাল।

'প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির জন্য হুকুমনামার দরকারটা কী, বুদ্ধিমান লোকেদের শুধু লিখিত অক্ষর ছাড়াও নির্দেশের আসল তত্ত্বটা বুঝে নেওয়া উচিত।' মুতাগুচি বললেন, 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাতো। আমার ওপর রাগ করে নিজের কর্তব্যে অবহেলা করবেন না আপনি। জাপানের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করবেন না।'

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন হিরোশিতো, মিয়াঝাকি, কোবোয়াশি প্রমুখ অন্য অফিসাররাও এসে পৌঁছেছেন সেখানে। এই বাদানুবাদে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন তাঁরা। দুজন অত্যন্ত সিনিয়র অফিসারের মধ্যে এরকম মতান্তর আধুনিক জাপানের আশি বছরের ইতিহাসে কখনও ঘটেনি।

মুতাগুচি এবার সোজা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি স্পষ্ট করে বলুন যে আমার হুকুম মানবেন কিনা।'

'আগে রসদের ব্যবস্থাটা পরিষ্কার হয়ে যাক।'

কাকুতি-মিনতি করে আর ফল নেই। এবার ধৈর্য হারালেন মুতাগুচি। 'আশা করি, ফৌজি নিয়ম ভাঙবার ফলটা জানেন আপনি। আমি কোর্ট মার্শাল করব আপনার।'

'আপনার ইচ্ছে হলে নিশ্চয়ই তা করতে পারেন। সৈন্যদের প্রাণ রক্ষার জন্যে বিমানে অন্তত খাদ্যশস্য পাঠানোর জন্য আমি যে অন্তিম আবেদন জানিয়েছিলাম তাতেও কান দেয়নি আমাদের হেড কোয়ার্টার। আমাদের কামান আছে, গোলাবারুদ নেই। লড়বার ইচ্ছে আছে, কিন্তু খালি পেটে শক্তি নেই। তা সত্ত্বেও কোহিমাতে আমাদের সাধ্যমতো লড়েছি আমরা।' সাতো জবাব দিলেন।

'টোকিয়ো থেকে বিমান না পেলে আমি কোথা থেকে পাঠাব? তা সত্ত্বেও মাতৃভূমির সম্মানের জন্য লড়াই করা আমাদের সবাইকার পবিত্র কর্তব্য।' দাঁতে দাঁত দিয়ে বললেন মুতাগুচি। 'আর যুদ্ধে এদিক ওদিক হতেই পারে। যুদ্ধ স্কুলের বাচ্চাদের ছেলেখেলা নয়।'

'কিন্তু "ফৌজ চলে পেটে হেঁটে" কথাটা জানেন বোধহয় আপনি।'

'কিন্তু শুধু পেটের জন্যেই লড়াই করে না ফৌজ। সাতো, আপনি যদি আমার একটা অনুরোধ রাখতেন, ডিমাপুর আক্রমণ করতেন, তা হলে জাপানের ইতিহাস বদলে যেত।' রাগে দুঃখে নাকের ডগা লাল হয়ে উঠেছে মুতাগুচির।

'কিন্তু ওই ধরনের পাগলামিতে আমার ফৌজ বিধ্বস্ত হয়ে যেত।'

'তা হলেও সার্থক হত তাদের জীবন।'

'ওই ধরনের অনর্থক রক্তপাতের সম্ভাবনায় গা গুলিয়ে ওঠে আমার।'

'রক্তপাতে যার গা গুলিয়ে ওঠে তার তো সৈন্যবাহিনীতে আসাই উচিত নয়।'

বাদানুবাদ বেড়ে চলেছে। তার-ই মধ্যে মুতাগুচি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সাতোর মন ফেরাতে। কিন্তু সাতো কোনও কথাই শুনতে রাজি নন। তিনি মুতাগুচিকে শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমাকে যে-কোনও সামরিক আদালতে সোপর্দ করতে পারেন আপনি। আপনার এই পরিকল্পনা ভুল শুধু নয়, একটা চূড়ান্ত হঠকারিতা। আমি প্রমাণ করে দেব সে কথা। আমার চোখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে। কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'আর আমার চোখ দিয়ে জল। তুমি চাও বেঁচে থাকতে আর আমি চাই দেশের জন্য, আমাদের মর্ত্যের ভগবান সম্রাটের জন্য জীবন দিতে।'

রাগে, দুঃখে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মুতাগুচি বেরিয়ে গেলেন। ফরসা হয়েছে। কিন্তু জাপানিদের পরম শ্রদ্ধার একান্ত আদরের সূর্যদেব মুখ দেখাচ্ছেন না। কালো মেঘে আকাশ ছাওয়া।

৭

ইম্ফলের যুদ্ধের মহাযজ্ঞে আহুতি হচ্ছে হাজার হাজার প্রাণ। স্টেনগান, মেশিনগানের রক্ততৃষ্ণার শেষ নেই। তা ছাড়াও রয়েছে ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক আর তার সঙ্গে বিষাক্ত কীটের আক্রমণ। কর্নেল ইনায়েত কিয়ানি জোঁকের বিষে অচল। পায়ের ডিমের যে জায়গায় জোঁকটা কামড়ে ছিল সেটা বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। ডাক্তার আকবর আলি একটা ছোট অপারেশন করেছেন কিন্তু জখম সারছে না।

ট্রেঞ্চের পাশেই একটা ছোট্ট শামিয়ানা গোছের খাটিয়ে নিয়ে একটা চাদরে শুয়ে আছেন ইনায়েত। ভোর হয়েছে তবু চোখ খুলতে পারছেন না তিনি। দূর থেকে কানে আসছে বুমবুম আওয়াজ। জেনারেল জামাল কিয়ানি অনেকক্ষণ থেকে এসে মাথার কাছে বসে রয়েছেন। অনেক দিনের অর্ধাশন-অনশন আর ছুটোছুটির ফলে জামানের সুদর্শন মুখটা শুকিয়ে কেমন উগ্র দেখাচ্ছে। মুখে দাড়ির জঙ্গল, চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে।

ইনায়েত ওঠার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পা দুটোতে যেন লোহা বেঁধে রাখা আছে—নড়ানো যাচ্ছে না। কোনওরকমে একটু মাথাটা তুললেন তিনি। 'দাদা, জোঁকটা আমার পা দুটোকে শেষ করে দিয়েছে একেবারে।'

'ভাবিস না। আর দিন দুয়েকের মধ্যেই ইম্ফল আমাদের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে।'

'কী বলছ দাদা? সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'আমাদের চেয়ে ওদের অবস্থা অনেক খারাপ। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ইম্ফল। বিমানেও আর আগের মতো সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। খুব কাহিল অবস্থা ওদের। তা ছাড়া ওদের মধ্যে ফাটল ধরাতেও সক্ষম হয়েছি আমরা। আমরা এখন জয়ের দোরগোড়ায়।'

ইনায়েতের শরীরে রোমাঞ্চ-শিহরন। পায়ের ব্যথা ভুলে সাগ্রহে উঠে বসলেন তিনি, 'দাদা খুলে বল। কী হয়েছে?'

জামান কিয়ানি আস্তে আস্তে বললেন, 'মোইরাং-এ কর্নেল শওকত মালিকের হাতে যে ষাট-সত্তরজন ধরা পড়েছিল তাদের উদ্বুদ্ধ করে আমরা আবার ব্রিটিশ ফৌজে ফেরত পাঠিয়েছি। ব্রিটিশদের অনেক ভারতীয় ব্যাটেলিয়ন আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে আগ্রহী বলে সংকেত পেয়েছি আমরা।'

ইনায়েত কিয়ানির চোখ বুজে এল। 'আল্লা মেহেরবান— তোমার দুয়া।' চোখ খুলে বললেন, 'দাদা সে শুভক্ষণ কবে আসবে?'

'বড়জোর আর দু-তিন দিন। তার জন্যই আমি বিশানপুর যাচ্ছি।'

এবার জামান কিয়ানিকে একটু চিন্তিত দেখাল। 'ওখান থেকে খবর এলেই ইম্ফলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ওদিকে পালেল থেকে প্রীতম সিং আর শওকত মালিকও ইম্ফলে আসবে।'

অনেকদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। আর ঠিক এই সময়েই পা'টা—ইনায়েতের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। তাঁর ব্রিগেডের নেতৃত্ব কে দেবে? জামান কিয়ানি বললেন, 'আমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। ব্রিটিশরা ভয় পেয়েছে। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ফুরিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে। আগের মতন আর গোলাগুলি ছুড়ছে না তারা। পালেলের দিক থেকে অনেকগুলো লরি ইতিমধ্যেই ফিরতে শুরু করেছে।'

'তোর ব্রিগেডের দায়িত্ব কার ওপর দেওয়া যায় বল তো?' নরমসুরে জিজ্ঞেস করলেন জামান।

'মেজর ভুরেওয়াল।'

'একদম মনের কথাটা বলেছিস তুই। আমার মনেও ওর কথাই এসেছিল। বড় কঠিন সময় এটা খুবই বিশ্বাসী লোকের প্রয়োজন।'

সঙ্গে সঙ্গেই ডেকে পাঠানো হল মেজর ভুরেওয়ালকে। জামান কিয়ানি তাঁকে বললেন, 'শিগগিরই সামনের পাহাড়টা পেরিয়ে ইম্ফলের দিকে এগোতে হবে আমাদের। এই অভিযানে ইনায়েতের বাহিনীর ভার আপনার হাতে দিচ্ছি আমি।'

মেজর ভুরেওয়াল 'জয় হিন্দ' বলে দৃপ্তভঙ্গিতে অভিবাদন করলেন। তাঁর হাত দুটো ধরে ইনায়েত বললেন, 'ভুরেওয়ালজি, পা দুটো আমাকে উঠতে দিচ্ছে না— তাই আমি পারলাম না। কিন্তু আপনার মতো লোকের হাতে ভার দিয়ে ভাল লাগছে আমার।'

'আপনারা দুই ভাই নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আপনার সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলেই আপনাকে ভার দিচ্ছি আমি। নেতাজির প্রাণরক্ষার জন্য যিনি নিজের হাতে জ্বলন্ত বোমা তুলে নিতে পারেন তাঁর হাতেই ভার দিচ্ছি। নিশ্চিন্ত না থাকার প্রশ্নই ওঠে না।'

'আপনারা হয়তো ভুলে গেছেন। কিন্তু আমি ভুলিনি। জাপানিদের কবল থেকে নেতাজিই উদ্ধার করেছিলেন আমাকে। নেতাজি যদি না থাকতেন তা হলে গিল আর মোহন সিং-এর মতো আমাকেও চিরকাল জাপানিদের কারাগারে পচতে হত।'

৮

নিজের মাথায় দায়িত্ব! মেজর ভুরেওয়ালের উৎসাহের শেষ নেই। কোন রাস্তায় ইম্ফল যেতে হবে দিনরাত সেই চিন্তায় অধীর তিনি।

আজ আকাশ শান্ত। ঝিঁঝিপোকাগুলো পর্যন্ত চুপ করে আছে মনে হচ্ছে। হয়তো বিমান হামলার ভয় তাদের মনেও ঢুকেছে। পাহাড়ি নদীগুলো বর্ষায় কানায় কানায় ভরে উঠে ছুটে চলেছে দুরন্ত গতিতে। মেজর ভুরেওয়াল ট্রেঞ্চগুলোর মুখ থেকে পেট্রল পার্টিগুলোর হদিশ করার চেষ্টা করছিলেন। সঙ্গে আরদালি শ্যামকান্ত।

বাহিনীর দপ্তরে এলেন ভুরেওয়াল। নিজের বাহিনীর অবস্থানের নকশাটা বার করলেন। মোমবাতির আলোতে পরীক্ষা করলেন সেটা। স্টাফ অফিসার ঘুমচোখে দেখতে লাগলেন

তাঁকে। রাতজাগা তাঁর ভাল লাগে না। তবু ভুরেওয়ালের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন তিনি। ভুরেওয়াল বললেন, 'ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে তোমার। যাও, গিয়ে বিশ্রাম কর। আমার জন্য ভেবো না। চারদিকে আমাদের ফৌজ সতর্ক আছে। আমার ভয় কীসের? শুধু এই শ্যামকান্ত আমার সঙ্গে থাকলেই হবে।'

পেট্রল পার্টি আর অন্যান্য সৈন্যদের খবর নিতে নিতে নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছেন ভুরেওয়াল। হাতে তাঁর সেই নকশাটার একটা কপি। বিশ্বাসী শ্যামকান্তও সমান উৎসাহে চলেছে তাঁর সঙ্গে। সিঙ্গাপুর থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল শ্যামকান্ত। নেতাজির ডাকে আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে চলে এসেছে ফ্রন্টে। কবে ব্রহ্মপুত্রের ওপারে পৌঁছবে তার জন্যে অধীর হয়ে রয়েছে সে।

এমন সময় 'ওয়াক ওয়াক' করে উঠলেন ভুরেওয়াল। তাড়াতাড়ি জলের বোতল এগিয়ে দেয় শ্যামকান্ত। 'কী হল স্যার? কী খেয়েছিলেন আজ।'

'রোজ যা খাই। আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের খানা— আধসেদ্ধ ওলের তরকারি। ওটা সহ্য হয় না আমার।'

অন্ধকারে একটা গাছের নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ভুরেওয়াল। নদীর অন্যপারের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'স্যার ওপারে শত্রুর পেট্রল পার্টি নিশ্চয় ঘুরছে।'

'নিশ্চয়ই ঘুরছে। শত্রুদের ফাঁদেই তো ফেঁসে রয়েছি আমরা।'

ভুরেওয়াল উঠলেন। বাহিনীর পাহারাদাররা কোথায় কোথায় রয়েছে দেখতে লাগলেন সতর্ক দৃষ্টিতে। নদীর জলের স্রোত পরীক্ষা করলেন। হাতে রাইফেল—কোমরে বাঁধা পিস্তল। দুটোই গুলিভরা।

এক জায়গায় জলে নেমে পড়লেন তিনি। তাঁকে জলে নেমে যেতে দেখে শ্যামকান্ত চেঁচিয়ে উঠল, 'স্যার স্যার, এই অন্ধকারে জলে নামছেন কেন? কখন কী হয়ে যাবে।'

'আমার সঙ্গে আসবি?' চাপা আওয়াজে বললেন ভুরেওয়াল।

'কোথায়?'

'আমাদের দেশে—ভারতবর্ষে।'

'সেখানে যাবার জন্যই তো প্রাণ কাঁদছে আমার। কিন্তু একলা? এ ভাবে? নেতাজির সঙ্গে সবাই মিলে—'

'তুই একটা পাগল। তোর নেতাজির "চল দিল্লি"র বুদবুদ কবে ফেটে গেছে। আরও দশ পুরুষেও ব্রিটিশদের হঠাতে পারব না আমরা। ওরে আজাদির জন্য এখনও যোগ্যই হয়ে উঠিনি আমরা। আমাদের জন্য গোলামিই ভাল।'

'স্যার, এ তো বেইমানি।'

'বেইমানি, দেশপ্রেম—এ সব শুধু শব্দ নিয়ে খেলা। ওরে বাবা ডুবন্ত জাহাজ থেকে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আয় আয়। জলে নাম। চল আমার সঙ্গে।'

'স্যার এ রকম ঠাট্টা করবেন না। এ বড় ভয়ংকর ঠাট্টা—বুক হিম হয়ে যায়। শ্যামকান্তের মাথা ঘুরছে এ সব শুনে। বিজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে এ কথা উচ্চারণ করাও পাপ স্যার।'

'বিজয়? ওরে সব শেষ। "দিল্লি চল"র স্বপ্ন স্বপ্নই থাকবে। পাথরে মাথা খুঁড়লে স্বাধীনতা আসে না। নেতাজির স্বপ্ন আকাশকুসুমই থেকে যাবে। তার চেয়ে চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। চলে আয় আমার সঙ্গে। তোর সাতপুরুষের ভাল হবে।'

শ্যামকান্ত এবার নিজের রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরল। 'সর পর তিরঙ্গা ঝান্ডা জলওয়া দিখা রহা হ্যায়—' এ গান ভুরেওয়ালই গেয়েছিলেন একদিন। এ গান শুনতে শুনতে কতবার গর্বে, আবেগে শ্যামকান্তের বুক ভরে গেছে। আর আজ সেই ভুরেওয়াল!

'স্যার, ফিরে আসুন। নয়তো আমার রাইফেলের গুলি ঝাঁঝরা করে দেবে আপনার বুক। আপনিই আমাকে বন্দুক ছুড়তে শিখিয়েছেন। আমার নিশানা কেমন সেটা ভালই জানেন আপনি।'

থতমত খেয়ে গেলেন ভুরেওয়াল। নিজের রাইফেলের দিকে হাত উঠতে উঠতে ও থেমে গেল। গুলির আওয়াজে যদি নদীর ধারের পাহারাদার সৈন্যরা ছুটে আসে সব ফাঁস হয়ে যাবে। কায়দা পালটে হেসে উঠলেন ভুরেওয়াল। তাঁর হাসিতে এবার অবাক হওয়ার পালা শ্যামকান্তের। 'স্যার কি তা হলে ঠাট্টা করছিলেন?'

'একটু দাঁড়া, হাসতে হাসতেই বললেন ভুরেওয়াল, 'আমি জল খেয়ে নিই।' নদীতে নেমে অঞ্জলি করে জল তুলে নিলেন তিনি। সরল শ্যামকান্ত অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে আঁজলা আঁজলা জল খাচ্ছেন ভুরেওয়াল। জল খেতে খেতেই একসময় কোমরে গোঁজা ছুরিটা হাতে নিয়ে নিয়েছেন ভুরেওয়াল। সাঁ করে ছুরিটা ছুটে এসে অব্যর্থ লক্ষ্যে বিঁধল শ্যামকান্তের বুকে। পড়ে গেল শ্যামকান্ত।

নদী পার হচ্ছেন ভুরেওয়াল। জলের ছপছপ শব্দ যেন তাড়া করছে তাঁকে।

খুব ভোরে পাহারাদার সৈন্যদের একটা দল এসে দেখতে পেল আহত শ্যামকান্তের দেহটা। জীবনের দীপ নিভে এসেছে। সেই নিভন্ত দীপের সমস্ত শক্তিটুকু জড়ো করে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে শ্যামকান্ত। 'ভুরেওয়াল— স্যার—শত্রুপক্ষে— সঙ্গে নকশা— নদী পার হয়ে— সবাইকে হুঁশিয়ার করে দাও। নেতাজি— জয় হিন্দ।'

প্রাণপাখি উড়ল, হয়তো বা দিল্লির পথে।

গাঁধী রেজিমেন্ট স্তব্ধ, বিষণ্ণ। জয় যখন করায়ত্ত তখন এই বেইমানি! তাও ভুরেওয়ালের মতো মানুষ? অনেককেই সামরিক শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। অনেকেরই গুরু তিনি। শিষ্যরা অনেক সময়েই গুরুর প্রতি বেইমানি করেছে। কিন্তু গুরু শিষ্যদের সঙ্গে বেইমানি করেছেন, এ উদাহরণ বিরল।

তেরঙা ঝান্ডার দৃপ্ততেজের গানের চারণ আজ শত্রুর শিবিরে। মনে হচ্ছে নদীর জলও লজ্জায় মুখ লুকোতে চাইছে জঙ্গলের অন্ধকারে।

৯

আত্মসমর্পণের খবর গোপন রাখার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তবুও কানাকানি চলেছে। কিছু একটা আন্দাজ করছে অনেকেই। সকাল আটটা। তবে সূর্য মেঘে ঢাকা। হাওয়াতেও একটা শিরশিরে ভাব।

ইম্ফলের দিকে চলতে থাকা একটা জিপ হঠাৎ দেখল রাস্তার মাঝে দু' হাত তুলে তাদের থামতে বলছে একটা লোক। পরনে উর্দি, কেমন কেমন হাবভাব। সন্দেহজনক— অতি সন্দেহজনক।

ব্রেক কষে থেমে গেল জিপটা। পরক্ষণেই লোকটার সামনে পেছনে সঙিন উঁচিয়ে ধরল কয়েকজন।

'কে তুমি?'

'আমি মেজর ভুরেওয়াল। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জাপানিদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি আমি। এক মুহূর্ত দেরি করার সময় নেই। তোমাদের কম্যান্ডারকে একটা অত্যন্ত জরুরি খবর দিতে হবে আমাকে। শিগগির নিয়ে চল তাঁর কাছে।'

ভুরেওয়ালের ব্যক্তিত্বই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তিনি একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। নিজে থেকেই নিজের সব অস্ত্রশস্ত্র জিপের লোকেদের হাতে তুলে দিলেন তিনি। আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাজটাও দেখালেন তিনি। সবাই তাকাল তাঁর হাতের গোটানো ম্যাপটার দিকে। নিঃসন্দেহে লোকটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কম্যান্ডারের কাছে এই দামি শিকারটিকে পেশ করার জন্য জিপ ছুটল পূর্ণ গতিতে।

কোনও রকমে ব্রেকফাস্ট শেষ করেছেন স্কুল্স। হলদেটে কাগজটার প্রত্যেকটা শব্দ বারবার পড়ছেন তিনি। টাইপকরা কালো অক্ষরগুলো যেন আরও কালো দেখাচ্ছে তাঁর চোখে। অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণার ছাপ তাঁর মুখে। 'আত্মসমর্পণ'— কি জঘন্য এই শব্দটা। সব শেষ হয়ে গেল। সামনের কাগজটাতে জেনারেল স্লিমের সই আর সিল রয়েছে। ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। তীক্ষ্ণ আওয়াজটা মৃত্যুর ঘণ্টার মতো শোনাচ্ছে।

'ইয়েস।'

'জেফরি? দিস ইজ জেনারেল স্লিম কলিং।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আর্মি মেডিক্যাল কোরের ড. জয়ন্ত সেন পৌঁছেছেন?'

'ইয়েস স্যার।'

'সারেন্ডার অর্ডারটা পেয়েছ?'

'ইয়েস স্যার।'

'জাপানি ফৌজের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ?'

'মেজর জেনারেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। আত্মসমর্পণ যদি করতে হয় তবে আর অসুবিধে কীসের? কিন্তু—। স্যার গত তিনদিনের মধ্যে ঘুমোইনি আমি। এরকম অবস্থা যেন শত্রুরও না হয়।

'নেভার মাইন্ড জেফরি। আমাদের সময়টাই খারাপ।'

'স্যার, সুপ্রিম কম্যান্ডারের কাছ থেকে অন্য কোনও আদেশ?'

'সেসব পর্ব শেষ হয়ে গেছে জেফরি। পরিস্থিতির পরিবর্তনের কোনও আশা মনেও স্থান দিয়ো না।'

'সুপ্রিম কম্যান্ডার এখন কোথায়?'

'ডিকি বোধহয় এখন কোনও চার্চে যিশুর কাছে ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছে।'

কথা শেষ হল। সাদা নিশান তৈরিই আছে। আর মাত্র দু' ঘণ্টা বাকি। ঘড়ি দেখলেন জেফরি স্কুল্স। সাদা নিশান নিয়ে এগিয়ে যাবার দায়িত্ব দিলেন কোমিলার হেডকোয়ার্টার থেকে আগত ড. সেনের ওপর। এই ঘৃণ্য, কাপুরুষোচিত কাজের ভার দেওয়া হল এক ভারতীয় অফিসারের ওপর। মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন জেফরি।

উইনগেটের মৃত্যুর পর থেকেই ব্রিটিশ বাহিনীর খারাপ সময় চলছে। কোহিমার রাস্তা বন্ধ। আমেরিকা বিমান পাঠাচ্ছে না। বর্ষার আকাশে মেঘের পাহাড়। ব্রিটিশ-ভারতীয় ফৌজের অনেক ব্যাটেলিয়ন আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে উদ্‌গ্রীব। বর্ষায় গেড়ে বসা

জাপানিদের পিছু হটার কোনও লক্ষণ নেই। তিনটি ডিভিশনের মোট প্রায় ষাট হাজার সৈন্যের প্রাণ বাঁচানোর একটাই রাস্তা— আত্মসমর্পণ।

মেজর ভুরেওয়াল নিরাপত্তা অফিসারদের হাতে পায়ে ধরছেন— 'শুধু আধ মিনিটের জন্য দেখা করতে চাই আমি— স্রেফ আধ মিনিট।'

'সব শেষ। এখন আর কোন সগ্‌গে বাতি দেবে তুমি?'

'কিছু শেষ হয়নি। সেটাই জানাতে চাই আমি। আমার কাছে দারুণ খবর আছে।'

শেষ পর্যন্ত হার মানলেন নিরাপত্তা অফিসার। ভুরেওয়ালের দেওয়া স্লিপ গেল ভেতরে। ফিরে এল না-মঞ্জুর হয়ে। দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করছে ভুরেওয়ালের। কী করা যায়। হঠাৎ মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো ঝলকে উঠল একটা কথা। গিল আর মহাবীর সিং-এর সঙ্গে ব্রিটিশদের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করার সময়কার একটা কোড-ওয়ার্ড। আবার স্লিপ লিখলেন তিনি। আবার নিরাপত্তা অফিসারের হাতে পায়ে ধরা। স্লিপটা ভেতরে গেল। কিন্তু এবার একেবারে উলটো ব্যাপার। ওই নির্জীব অক্ষরগুলো যেন ভেলকি দেখাল। স্কুন্সের দুজন স্টাফ অফিসার প্রায় দৌড়ে বাইরে এসে ছোঁ মারার মতন করে ভুরেওয়ালকে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মসমর্পণ। তারপর চিরস্থায়ী কলঙ্ক। সিঙ্গাপুরের পুনরাবৃত্তি। আবার একটা 'ফরগটন আর্মি'। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'বস্ত্রহরণ' পালা। ভুরেওয়ালকে একদৃষ্টে দেখছেন স্কুন্স। এই 'বস্ত্রহরণে'র পালার কৃষ্ণ কি এসে হাজির হয়েছেন ভুরেওয়ালের মধ্যে দিয়ে? ডুবন্ত মানুষের খড়কুটোই সই।

ভুরেওয়ালও স্তম্ভিত সব ব্যাপার দেখে। এ সব কী ব্যাপার?

'আপনাকে মিনতি করছি স্যার। আর একটু অপেক্ষা করুন। এখনই সিদ্ধান্ত নেবেন না।।'

'উপায় নেই। না আছে রসদ— না আছে গোলাবারুদ। একটা আশার আলোও কোথাও নেই। অবশিষ্ট সৈন্যদের প্রাণ বাঁচাতে হলে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় নেই।'

'কী বলছেন কী স্যার? ওদের কাছেই বা কী আছে? ওদেরও তো ভাঁড়ে মা ভবানী।'

'তার মানে?' স্কুন্স হতভম্ব।

'ঠিক বলছি স্যার। ভিকিরির অধম অবস্থা ওদের। দিন দুয়ের মধ্যেই পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হবে ওই বেইমানগুলো।'

'কীসের ভিত্তিতে এ কথা বলছ তুমি? আমাদের খবর অনুসারে সুভাষ বোসের বাহিনীতে মোট প্রায় ষাট-সত্তর হাজার সৈন্য আছে। ইম্ফলে শুধু ভ্যানগার্ডবাহিনীই এসেছে । আসল ফৌজ পেছনে।'

'এইসব ভ্যানগার্ডের কথা কে বলেছে আপনাদের।' রিজার্ভ ফোর্স নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের মোট সৈন্যসংখ্যা পনেরো হাজার পুরো হবে না। আহাম্মক জাপানিগুলো শুধু শুধু এদের মাথায় নিয়ে নাচানাচি করছে।'

'ওদের আরও দু' ডিভিশন—'

'এক ডিভিশন তো এখনও রাস্তায়। ইম্ফলের ধারেকাছেও এখনও পৌঁছয়নি তারা।'

হাতে ধরা নকশাটা এবার স্কুন্স আর বল্ডউইনের সামনে মেলে ধরলেন ভুরেওয়াল। নকশায় জাপানি আর আজাদ হিন্দ ফৌজের অবস্থান, কামানগুলোর অবস্থান এমনকী ট্রেঞ্চ আর প্রতিরক্ষা ব্যূহ সবিস্তারে দেখানো রয়েছে। তৎক্ষণাৎ ফ্রন্টে নিজের বাহিনীর লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন স্কুন্স। সবকিছু উলটে গেল। স্কুন্সের কাছে ভুরেওয়াল যেন স্বর্গের দেবদূতের মতো এসে উপস্থিত হয়েছেন।

শুধু নাচতে বাকি রাখলেন স্কুন্স। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, 'শ্বেতপতাকা নিয়ে রওনা হয়ে যাওয়া জিপটা থামাও।' জিপ ফিরে এল। পতাকাটা নিজের হাতে টুকরো টুকরো করলেন স্কুন্স। টুকরোগুলো বুটের তলায় মাড়াতে লাগলেন। কিন্তু মনের কোণে একটা চিন্তা রয়েই গেল। সম্পূর্ণ দায়িত্বটা বর্তাচ্ছে তাঁর একলার কাঁধে। এদিক-ওদিক যদি কিছু হয়ে যায়? এমন সময় দৈববাণীর মতো এল কোহিমা থেকে রিচার্ডসের ফোন।

'স্যার, স্যার। দারুণ সুসংবাদ।'

'কী হয়েছে রিচার্ডস?'

'কোহিমা বেঁচে গেছে স্যার। জাপানিরা পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরে যাচ্ছে। গড ইজ গ্রেট।'

'সার্টেনলি। অভিনন্দন তোমাকেও।' স্কুন্সের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রুধারা তাঁর অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে।

নিজের খাস অফিসারদের বলছিলেন উল্লসিত স্কুন্স। 'দুর্ভাগ্য ওই জাপানিদের আর বেইমানদের ফৌজের। জানতেও পারল না জয়ের কত কাছাকাছি পৌঁছেছিল ওরা। সাহস করে যদি আর চার পা এগোত কবেই পতন ঘটত আমাদের।'

শ্যামকান্তের মৃতদেহ অন্তিম সংস্কারের জন্য আনা হয়েছে নদীর ধারে। যুদ্ধের সময় চিতা জ্বালানোর প্রশ্ন ওঠে না। তাই সন্ন্যাসীদের মতো কবর দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সমাধিতে মাটি দেওয়া শেষ হতে-না-হতেই শত্রু বিমানের হামলা শুরু হল। আশ্চর্য! এবার একেবারে মোক্ষম জায়গাগুলো লক্ষ্য করেই চলছে তাদের বোমাবর্ষণ আর মেশিনগানের গুলিবর্ষণ। সাম্প্রতিককালে এরকম আক্রমণের দুঃসাহস দেখায়নি শত্রুরা।

জখম পায়ে, শক্ত করে ব্যান্ডেজ বেঁধে চিতাবাঘের মতো দাঁড়িয়ে উঠতে চান ইনায়েত। আবিদ হাসান তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'দুশমন এরকম অভ্রান্ত লক্ষ্যে আক্রমণ করছে কী করে?'

মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ইনায়েত প্রায় ডুকরে উঠলেন, 'ওই ভুরেওয়াল। যাওয়ার সময় আমাদের অবস্থানের বিস্তারিত নকশাটা নিয়ে গেছে ওই ইবলিশের বাচ্চা। হামলার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে— নকশাটা চোখের সামনে বিছানো রয়েছে তাদের।'

প্রথমে প্রথমে বিশৃঙ্খলা চরমে উঠল। আবিদকে বললেন ইনায়েত, 'দোস্ত কোথায় ওই মনসুখলালের দৃপ্ত শৌর্য আর কোথায় এই ভুরেওয়ালের গদ্দারি। দোস্ত এই দুঃসময়ে গাঁধী রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ডের দায়িত্ব তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি আমি।'

'ইয়েস স্যার।' অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট করলেন আবিদ।

'যেভাবে নেতাজিকে সাত সাগর পার করে নিয়ে এসেছ তুমি, সেইভাবেই পার কর এই ঝড়ে পড়া বাহিনীকে।'

অবিরাম গোলাবর্ষণ চলছে। তারই মধ্যে নির্দেশ গেল সব জায়গায়। ট্রেঞ্চ বদলাও। গার্ডদের অবস্থান বদলে ফেল। অবজার্ভেশন পোস্ট সরিয়ে নাও।

শুধু গোলাবর্ষণ নয়— অবিরাম বৃষ্টিও পড়ছে। তারই মধ্যে জান কবুল করে কাজ করছে সৈন্যরা। 'গুরু'র এই বেইমানিতে আগুন ধরে গেছে তাদের রক্তে। তারা কাজ করে চলে অবিশ্রান্ত বর্ষণের মাঝে— বর্ষণ গোলাগুলির, বর্ষণ বর্ষার।

পরের দিন শত্রুপক্ষের একটা বোমারু বিমান দুঃসাহসে ভর করে আজাদ হিন্দ ফৌজের ছাউনির ওপরে ইতস্তত ঘুরতে লাগল। বিমান থেকে বোমা পড়ল না— পড়ল হাজার হাজার সাইক্লোস্টাইল করা কাগজ। কাগজে লেখা,

'জাপানের তাঁবেদারি ছাড়। ব্রিটিশ সরকার অতি দয়ালু। তোমাদের তিন মাসের সবেতন

ছুটি আর স্থায়ী চাকরি দেওয়া হবে। তোমরা আবার তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের কাছে যেতে পারবে। বেইমানদের সঙ্গ ছাড়। ব্রিটিশ-ভারতীয় ফৌজ আমার মতোই তোমাদেরও সসম্মানে স্বাগত জানাবে। পদ, প্রতিষ্ঠা, পেনশন, পরিবারের সাহচর্য সব পাবার এমন সুযোগ হারিয়ো না।

'এই দুঃখের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার এমন সুযোগ ত্যাগ কোরো না।'

তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
মেজর বি. এস. জে. ভুরেওয়াল

চিঠিটা যেন কাটাঘায়ে নুনের ছিটে। সমস্ত গাঁধী রেজিমেন্ট কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়াল। শত্রু বার বার হানা দিচ্ছে। আবিদ হাসান ভীম পরাক্রমে নদীর ধারে তাদের সঙ্গে লড়াই করছেন। শত্রুও লড়ছে প্রাণপণে। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা যেন অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর।

রাতে ইয়ামামোতো কম্যান্ডার জামান কিয়ানির সঙ্গে দেখা করলেন। উত্তেজিত ইয়ামামোতো বললেন, 'দেখলেন কম্যান্ডার। এই বেইমানগুলো চন্দ্রা বোসের নামে কালি ছিটিয়ে দিল।'

'কিন্তু কলঙ্ক তো সব ফৌজেরই আছে। জাপানের ফৌজও তো নিষ্কলঙ্ক নয়। গোড়াতেই যদি আপনাদের ইয়ানাগিডা ব্রিটিশের সপ্তদশ ডিভিশনকে ছেড়ে না দিতেন তবে তো এক মাসের মধ্যেই ইম্ফলে আমাদের বিজয় পতাকা সগৌরবে উড়ত।'

এবার মাথা নিচু করার পালা ইয়ামামোতোর। শান্তকণ্ঠে জামান কিয়ানি বলে চললেন, 'ব্রিটিশের চতুর চালে একটা-দুটো ভুরেওয়াল তৈরি হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের মধ্যে নেতাজির জন্য নিজের শরীরে বোমা বেঁধে সাঁজোয়া গাড়ির নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার মতো হাজার বীর এখনও রয়েছে। ইয়ামামোতোজি, নেতাজির জন্য রক্ত দেওয়া তো ঠিকমতো শুরুই হয়নি এখনও।'

ক্যান্ডিতে কয়েকদিন আগেও যেখানে নীরবতা ছেয়ে গিয়েছিল সেই দপ্তর আজ মুখর। মাউন্টব্যাটেন খুশিতে উচ্ছল। সহকারীদের ফোনের পর ফোন করে চলেছেন তিনি। বলছেন, 'স্কুপ্স, আত্মসমর্পণের ওইসব কাগজপত্র একদম জ্বালিয়ে দাও। একটা টুকরোও যেন কোথাও না পড়ে থাকে। আগামী দিনের গবেষেকরা তন্নতন্ন করে খুঁজেও যেন বুঝতে না পারে যে আমরা আত্মসমর্পণের পরিকল্পনা করেছিলাম। একটা বেইমান ভারতীয়র জন্য হাজার হাজার ব্রিটিশ সৈন্য আত্মসমর্পণের কলঙ্ক থেকে ছাড়া পেয়ে গেল এ কথা যেন কেউ বুঝতে না পারে। কিল দ্যাট আই এন এ অ্যান্ড ইটস লিডার। শুধু পৃথিবী থেকে নয়, ইতিহাস থেকে মুছে ফেল তাদের।'

'চলে গেল, আমার খরগোশ দুটো পালিয়ে গেল। ধর ধর, শিগগির ধর ওদের।' ভোর রাতে আর্তনাদ করে উঠে বসলেন মুতাগুচি। চিৎকার শুনে দৌড়ে এল দ্বাররক্ষীরা। 'কীসের খরগোশ? কার খরগোশ?' স্টাফ অফিসার প্রশ্ন করলেন।

'গাধা কোথাকার! আমার দু' হাতে ধরা দুটো খরগোশ ছিল— ইম্ফল আর কোহিমা। হাত থেকে পালিয়ে গেল তারা।'

মুতাগুচির মাথা নিশ্চয়ই গোলমাল হয়ে গেছে ভাবছেন সবাই। ইদানীং তিনি মাঝে মাঝেই বিড়বিড় করতে থাকেন আপন মনে। 'আমার সব গেল। গোলাপ বাগান শুকিয়ে গেল আমার। আমার লোকেরা ছুরি বসাল আমার পিঠে। হাতে ধরা শিকার পালাল।'

অধীনস্থ কর্মচারীদের ওপর নজর না রাখা পাপ। তাদের ওপর অন্ধবিশ্বাস ঘোর পাপ। অনুতাপের আগুনে জ্বলে যাচ্ছেন তিনি।

অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ করছেন মুতাগুচি। একদিন হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু করলেন। তাঁর বিছানার নীচে নাকি কেউ ডাকিনীবিদ্যার তুকতাক করে রেখেছে। আবার কখনও আপনমনে বিড়বিড় করেন। সেনাপতির অবস্থা দেখে ভয় পাচ্ছেন অন্য অফিসাররা। মাঝে মাঝেই বলে ওঠেন, 'মেমিয়োতে বসে থেকে কী ভুলই না করেছি আমি। এইসব ভীরু, কাপুরুষ, নপুংসকদের ওপর বিশ্বাস রেখে নিজের তো বটেই, আমার বাহিনীর, আমার দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছি।'

এখনও মুতাগুচির আশা যে লড়াইয়ের মোড় ঘোরাতে পারবেন তিনি। কিন্তু মণিপুরের বিরামহীন বৃষ্টিতে জন্তু-জানোয়ার বেরোতে পারে না— মানুষ তো দূরস্থান। ২২ জুন ইম্ফল-কোহিমার সংযোগ খুলে গেল। ডিমাপুরের রাস্তায় ইম্ফলে পৌঁছল তাজা রসদ। অর্ধাশনে থাকা ব্রিটিশ বাহিনীর মধ্যে যেন প্রাণ ফিরে এল। কোহিমা থেকে স্টপফোর্ড আর রিচার্ডস রওনা হলেন ইম্ফলের দিকে।

'পশ্চাদপসরণ' কথাটা আজীবন চূড়ান্ত ঘেন্না করে এসেছেন মুতাগুচি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমাগত হাত মুচড়ে দিচ্ছে তার। নিরুপায় মুতাগুচি ওপরওয়ালাদের কাছে খবর পাঠালেন। সরাসরি পশ্চাদপসরণের হুকুম দেওয়ার দায়িত্বটা কেউ-ই ঘাড়ে নিতে চান না। মুতাগুচির চিঠি গেল রেঙ্গুনে কাওয়াবের দপ্তরে। সেখান থেকে সাউথ কম্যান্ডের সেনাপতি তেরাউচির কাছে। তেরাউচি সেটা পাঠালেন টোকিয়োর প্রধান সামরিক দপ্তরে। এদিকে বিরামহীন বর্ষণের মধ্যে সৈন্যরা অপেক্ষা করে চলেছে ওপরওয়ালাদের আদেশের। এই বর্ষায় বিমানগুলোও উড়তে পারছে না। তাই চিঠি যাচ্ছে শম্বুকগতিতে।

একদিন রাতে সাত-আটশো সৈন্য নিয়ে শাহনওয়াজ এসে পৌঁছলেন মুতাগুচির কাছে। মুতাগুচি কি বলবেন ভেবে পান না।

'কোথা থেকে আসছেন মেজর জেনারেল?'

'ও কথা দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না। যেভাবে এসেছি আমরা, অতি বড় শত্রুর কপালেও যেন তা না হয়। হাকা-ফালম থেকে তিন হাজার সঙ্গী নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আজ অবশিষ্ট আছে আটশোজনেরও কম। সে কথা যাক। আগে বলুন, আমাদের লড়াই করার সুযোগ কেন দিলেন না আপনারা? কেন আমাদের মতো গরিব বাহিনীর স্বপ্ন চুরমার করে দিলেন আপনারা? এ ভাবে কেন ফাঁসিয়ে দিলেন আমাদের?'

'আমরা আপনাদের ফাঁসিয়ে দিলাম?'

'দেননি?' গর্জে উঠলেন শাহনওয়াজ।

'আপনার আর নেতাজির আদেশ ছিল কোহিমাতে গিয়ে সাতোর সঙ্গে মিলিত হবার। বর্ষা, ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক সবকিছু সহ্য করে, নদী-নালা-পাহাড় ডিঙিয়ে তিনশো মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। পথেই শেষ হয়ে গেছে কত সাথির জীবন। আমরা থামিনি। সব বাধা পেরিয়ে আমরা শুধু দেখতে চেয়েছিলাম কোহিমার বুরুজের ওপর উড়ছে তেরঙা ঝান্ডা। কিন্তু আমরা সেখানে পৌঁছবার আগেই আপনাদের সৈন্যরা কোহিমা ছেড়ে চলে এল। আমাদের

ওপর আদেশ হল উখরুলের পথে যাওয়ার জন্য। রাস্তায় সানজাহক গ্রামের কাছে দেখা হল আপনাদের সাতোর সঙ্গে। তিনি কী বললেন জানেন?'

'কী বললেন?'

'সেই ঘেন্নার কথাটা উচ্চারণ করতেও লজ্জা করছে আমার। বলে কিনা, খামোখা লড়াই করার খোয়াব দেখছ কেন? জান বাঁচাতে হলে আমার সঙ্গে চিন্দুইনের দিকে চল।'

লজ্জায় মুতাগুচি মাথা নিচু করলেন। উত্তেজিত শাহনওয়াজ বললেন, 'মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের সঙ্গে ভাঁওতাবাজি কেন করলেন আপনারা? কেন অপমান করলেন নেতাজিকে?'

'এরকম করে বলবেন না। সৈন্যবাহিনীতে এরকম বিদ্রোহ আধুনিক জাপানের ইতিহাসে এর আগে কখনও ঘটেনি। আমাদের বিখ্যাত সেনানায়কই ইম্ফলে আমাদের কবর খুঁড়লেন।'

'কিন্তু নেতাজিকে তো কথা দিয়েছিলেন আপনি।'

'তাই তো আমি এই প্রচণ্ড বর্ষা আর দুর্ভাগ্য সবকিছু উপেক্ষা করে আজও দাঁড়িয়ে আছি এখানে। শাহনওয়াজ জেতা-হারা ভাগ্যের খেলা। কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস করবেন। জাপানিরা তাদের প্রিয় রাজকুমারের চেয়েও চন্দ্রা বোসকে বেশি ভালবাসে। আর এইরকম ভালবাসে বলেই এই পরিকল্পনা, যেটা ফাইলচাপা পড়েছিল, আবার নেওয়া হয়েছিল। শাহনওয়াজ দয়া করে এইসব "ফাঁসানো", "দাগাবাজি" কথাগুলো উচ্চারণ করবেন না। ওই কথাগুলো শুনলে এই জঙ্গলে জাপানি সৈন্যদের যেসব মৃতদেহ সার দিয়ে পড়ে আছে তারা, যেসব জাপানি প্রাণ দিয়েছে ইম্ফলে আর কোহিমার যুদ্ধে, তাদের বিদেহী আত্মা— সবাই আর্তনাদ করে উঠবে।'

অনেক করে বোঝালেন মুতাগুচি। ঠিক সেই সময় দপ্তরে চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রধান সামরিক দপ্তর থেকে ইম্ফল আর কোহিমা অভিযান প্রত্যাহার করার নির্দেশ এসেছে। মুতাগুচি এই নির্দেশেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু সত্যি সত্যি এই ভিজে যাওয়া কাগজটা যখন এল, তখন তাঁর মনে হল শরীর থেকে কেউ যেন মাংস টেনে টেনে ছিঁড়ছে। বহু যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন কাগজটা হাতে নিয়ে। সেনাপতির অবস্থা দেখে বাকি সবাইকারও চোখে জল।

'শাহনওয়াজ কোথায় গেলেন?' ফুজিয়ারাকে জিজ্ঞেস করলেন মুতাগুচি।

'পাগলের মতো গোঁ গোঁ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।' ফুজিয়ারা বললেন, 'ইম্ফলের জঙ্গলে থেকে ব্রিটিশদের সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাবার সংকল্প নিয়েছেন তিনি।'

১১

আকাশও বিরূপ। প্রত্যেক বছরের চেয়ে অনেক আগেই বর্ষা এসেছে এবার। আকাশভাঙা বৃষ্টি। বিপদের পর বিপদ গাঁধী রেজিমেন্টের সামনে। একদিকে মনসুখের অমর আত্মা তাদের এইসব বিপদের মুখোমুখি হতে প্রেরণা দিচ্ছে। অন্যদিকে ভুরেওয়ালের বেইমানি তাদের মন বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে।

জাপানি ফৌজের কাছ থেকে ভাল-মন্দ কোনও খবর আসছে না। বিশানপুর থেকে পালেল পার হয়ে কোহিমা পর্যন্ত প্রায় শ' দেড়েক মাইল জুড়ে আজাদি ফৌজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। খাবার সব ফুরিয়েছে। ক্রমাগত উপবাস চলছে সবার। বিষাক্ত ফলমূল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে অনেকে। দলে দলে সৈন্য পেটের রোগের শিকার হয়ে পড়ছে। ভারতীয় সৈন্যরা জাপানিদের

মতো গোরু-ঘোড়া খেতে পারে না। বনে জঙ্গলে তারা খাদ্য খোঁজে। বাঁশের কোঁড় খেয়ে কেটেছে কিছুদিন। তাও আর মিলছে না। বেশি খোঁজাখুঁজি করাও যাচ্ছে না। শত্রু বিমানের হামলা চলছেই। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে কিছু কিছু লোক অখাদ্য মাংস খাচ্ছে বলেও জেনারেল কিয়ানির কাছে খবর পৌঁছেছে। জেনারেল কিয়ানিও বোঝেন তাদের অসহায়তার কথা। তিনি তাদের বলেছেন যে আপৎকালে নিয়মনিষ্ঠার কথা না ভেবে বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। সৈন্যরা বেঁচে না থাকলে কে চলবে দিল্লির পথে!'

সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে পেট খারাপের রোগ। এই রোগ যেন শরীরকে নিংড়ে শেষ করে দেয়। পেটের মধ্যে গুড়গুড়ুনির আওয়াজের চেয়ে শত্রুর বিমানহানার আওয়াজে ভয় কম।

দু' দিন ধরে ড. আকবর শাহ্ কিয়ানির কাছে আসেননি। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন কিয়ানি। আকবর শাহ্র চেহারা দেখে চেনা যাচ্ছে না। নিস্তেজ দেহটা বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। অস্থিসার মুখে কোটরে ঢোকা চোখ। সীমান্তপ্রদেশের সেই হট্টাকট্টা লোকটির ছায়াটুকুই যেন আছে। কায়া নেই। তারই মধ্যে উঠে বসার চেষ্টা করেন আকবর। 'উঠবেন না। বিশ্রামের খুব দরকার আপনার।' কিয়ানি থামালেন তাঁকে।

'ফ্রন্টে শুয়ে থাকলে চলে? এতগুলো লোকের দায়িত্ব। নেতাজি শুনলে কি বলবেন?'

'ডাক্তার। পালেলের পাহাড়ে বিমান আক্রমণের মধ্যেই আপনার সেই অপারেশন করার কথা তো আর নেতাজির অজানা নেই।'

বাবু সিং আরদালি এক চামচ চিনি এনে ডাক্তারের মুখে ধরল। হাওয়াই হামলার ভয়ে আশেপাশের গ্রাম থেকে সবাই পালিয়েছে। দুধের ফোঁটাটুকুও পাওয়া যাবে না কোথাও। কম্যান্ডার হিসেবে লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে কিয়ানির।

খুব ভোরেই ফুজিয়ারা এলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের ছাউনিতে। কিয়ানিকে ডেকে তুললেন তিনি। ফুজিয়ারার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভীষণ একটা কিছু হয়েছে। সবাই চুপ করে আছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে গলা খাঁকারি দিয়ে বিষণ্ণ স্বরে ফুজিয়ারা জানালেন জাপানের পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্তের কথা। জানালেন ইতিমধ্যেই মুতাগুচির কাছে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ এসে পৌঁছে গেছে।

ভূমিকম্পের মতো ধাক্কা লাগল সবার মনে। শত্রুর বোমার চাইতেও মারাত্মক বোমার মতো কথাটা ফেটে পড়ল সবার কানে। পশ্চাদপসরণ? কেন? আজাদি সৈন্যের কাছে কথাটা শোনার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয় মনে হয়। বিপর্যস্ত লাগছে নিজেদের। চারদিন উপোসি? তাতে কী হয়েছে? এই এতদিনের এত কষ্ট তবে কীসের জন্য? এই অনশন-অর্ধাশন, থই থই কাদার মধ্যে জোঁকের কামড় খেয়ে দিন কাটানো—এ সব কী ওই ঘৃণ্য জঘন্য পশ্চাদপসরণ কথাটা শোনার জন্য?'

'ফুজিয়ারা, এ আদেশ কার?' নিস্তব্ধতা ভেঙে গর্জে উঠলেন জামান কিয়ানি।

'স্বয়ং মুতাগুচির।'

'খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন জামান কিয়ানি। তাই বল! এ আদেশ নেতাজির নয়।'

'ফুজিয়ারা সাহেব। নেতাজির আদেশ "কদম কদম বাড়ায়ে যা।" আমরা মরবার জন্য প্রস্তুত—পিছোবার জন্য নয়।' সাধারণ সৈন্যরাও সমস্বরে বলে ওঠে।

ফুজিয়ারার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। চোখের জল মুছে তিনি বললেন, 'ফারের পার্কের সেই ঐতিহাসিক সমাবেশে আমিই আপনাদের এগোতে বলেছিলাম। আজ ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে এই আদেশ আপনাদের কাছে পৌঁছনোর দায়িত্বও এসে পড়েছে আমারই

ওপর। ভগবানের কী নিষ্ঠুর বিধান। কিন্তু কী করা যাবে। মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েছে। তাকে কী করে জোড়া দেব?'

'কিন্তু আমরা পশ্চাদপসরণ করতে পারব না।' সাফ জবাব দিলেন কিয়ানি। 'ফুজিয়ারা সাহেব। আমরা নেতাজির সৈনিক। আগে তাঁর কাছ থেকে আদেশ আনুন তারপর ভাবব। ভুলে যাবেন না আপনাদের দেশ পেছনে কিন্তু আমাদের মাতৃভূমি সামনে। দিল্লির পথে যদি আমাদের মৃতদেহগুলো পড়ে থাকে থাকুক। আমাদের বিদেহী আত্মাই চলবে দিল্লির পথে।'

'জেনারেল সাহেব। দয়া করে ভেবে দেখুন।'

'ভাবার কী আছে? বলেছি তো। নেতাজির কাছ থেকে তাঁর লিখিত আদেশ এলে তখন ভাবব। এখন নয়।'

১২

মেমিয়ো থেকে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী এলেন নেতাজির কাছে। তাঁকে দেখে অবাক হয়ে নেতাজি প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার লক্ষ্মী? হঠাৎ তুমি এলে যে?'

'আমার বাহিনীর মেয়েরা বাধ্য করল আমাকে আসতে। একটা আর্জি পাঠিয়েছে তারা।'

কাগজটা খুলে নেতাজি স্তম্ভিত। কালি দিয়ে নয়— রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে চিঠিটা। নিজেদের রক্ত দিয়ে লেখা চিঠিতে মেয়েরা জানিয়েছে যে পরিচারিকা হবার জন্য ফৌজে যোগ দেয়নি তারা। পুরুষ সৈন্যদের সঙ্গে তারাও অংশ নিতে চায় প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে।

'পাঁচ ছয়দিনের মধ্যেই ইম্ফল রওনা হব আমি। তখন আমাদের সবাইকেই রক্ত দিয়ে হোলি খেলতে হবে লক্ষ্মী। তোমার মেয়েদের বল একথা।'

নেতাজির কথা শুনে লক্ষ্মী চলে গেলেন খুশি হয়ে। একটু পরেই এলেন জেনারেল কাওয়াবে। মুখ কালচে মেরে গেছে। অত সাধের গোঁফও ঝুলে পড়েছে অনাদরে। তাঁকে দেখে তাঁর মনের মধ্যেকার প্রচণ্ড আলোড়নের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কথা বলতে গলা আটকে আসছে, 'চন্দ্রা বোসজি, ক্ষমা করবেন আমাকে। বড় দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আমি।'

ভুরু কুঁচকে গেল নেতাজির। কী এমন দুঃসংবাদ! ভণিতা না করে বিষণ্ণ স্বরে বললেন কাওয়াবে, 'আমাদের চতুর্দশ বাহিনী ইম্ফলের রণাঙ্গনে প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।'

নেতাজি স্তম্ভিত। হঠাৎ এরকম একটা খবর।

কাওয়াবে বলে চলেন, 'কাকে দায়ী করব বুঝতে পারছি না। মুতাগুচির মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, গোড়ার দিকের বেপরোয়াভাব, অধীনস্থ সেনাপতিদের বেইমানি—কোনটা যে বেশি দায়ী কে বলবে। তার ওপরে সময়ের আগে এসে পড়া প্রবল বর্ষা বিপদের পাহাড় নিয়ে হাজির হয়েছে।'

'আপনি আসলে কথাটা কী বলতে চান?'

ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন নেতাজি।

'সব শেষ।' বলতে বলতে কান্নার আবেগে বিপর্যস্ত কাওয়াবে ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। 'বোসজি, জাপানি ফৌজ সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে ইম্ফল থেকে পশ্চাদপসরণ করছে।'

'পশ্চাদপসরণ' কথাটা তিরের মতো বুকে বিঁধল নেতাজির। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছেন তিনি। ঘামে ভিজে গেল সারা শরীর। কাওয়াবে বলে চললেন। 'চন্দ্রা বোসজি। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জাপান জিত ছাড়া হার দেখেনি কখনও। এই অভাবনীয় দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হবার যন্ত্রণায়

শয়ে শয়ে জাপানি সৈনিক হারাকিরি করছে। এই প্রচণ্ড ধাক্কায় তেরাউচির মতো সেনানায়কও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। এই পরাজয় জ্বালিয়ে দিচ্ছে সবার মন।'

'কিন্তু কেন এই পিছু হটা? আসল কারণটা কী?' নেতাজি অসহিষ্ণু।

'আমাদের বিমানশক্তি শেষ হয়ে গেছে, সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, অস্ত্রশস্ত্রও তলানিতে পৌঁছেছে।'

'কিন্তু এইসব কারণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পিছু হটার সিদ্ধান্ত আপনারা নিয়েছেন—আমি না। দিল্লি যাবার আরও অনেক রাস্তা আছে। আমাদের এগিয়ে চলা কেউ থামাতে পারবে না। আমার সৈন্যরা জীবন দেবে, তারপরও ভৈরবের মতো এগিয়ে যাবে তারা। ইম্ফল কোহিমার পাহাড়ে জঙ্গলে লড়বে তারা। "মন্ত্রের সাধন" যদি নাও হয় "শরীর পাতন" থেকে কেউ তাদের বিরত করতে পারবে না। আমরা লড়ব— ভেঙে যাব কিন্তু পিছু হটব না। কিছুতেই না।'

আগুনে তাতা তামার মতো লাল হয়ে উঠেছে নেতাজির মুখ। কাওয়াবের কোনও যুক্তিতেই কান দিচ্ছেন না তিনি। গনগনে তাওয়ার ওপর তেলের ফোঁটা পড়ার মতোই ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে কাওয়াবের সব যুক্তি। বাইরে মুষলধারে বর্ষণ আর বিদ্যুতের ঝলকানি। দুজনেই চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। কাওয়াবে আর কী করে নেতাজিকে বোঝাবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেতাজিই বললেন, 'এবার বলুন, এই মুহূর্তে আমার কাছে কী চাইছেন আপনি?'

'আমি চাই যে আপনি অবিলম্বে জেনারেল কিয়ানিকে আদেশ পাঠান।' ইম্ফলের পাহাড় থেকে ফিরে আসতে রাজি নন তিনি। "আমরা দরকার হলে আগুনে পুড়তে পুড়তে দিল্লি যাব।" এই কথা বলে পাঠিয়েছেন তিনি।" মোইরাং থেকে কর্নেল শওকত মালিকও পিছু হটার কথা শুনতেই রাজি হননি।'

'তাদের ভুলটা কোথায়?' নেতাজি পাল্টা প্রশ্ন করলেন। 'জেনারেল, আমি কিয়ানি আর শওকত মালিককেই সমর্থন করছি। শুধু তাই নয়—আমি নিজেও ফ্রন্টে যাব বলে ঠিক করে ফেলেছি।' তারপর সামনের একটা মানচিত্রে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নেতাজি বললেন, 'জেনারেল কাওয়াবে, ভাল করে দেখুন। আমাদের দেশ আমাদের ডাকছে। শরীরে শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত আমাদের দিল্লির দিকেই যেতে হবে। আর সে রাস্তা টোকিয়ো থেকে উলটো দিকে।'

কাওয়াবে আর কিছু ভেবে পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, 'এই রকম পরিস্থিতিতে আপনার মতো একজন দেশনায়কের এই ধরনের জেদ শোভা পায় না, চন্দ্রা বোস।'

'জেনারেল কাওয়াবে, দিল্লির পথ যে কী তা আপনার সামরিক দৃষ্টি দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন না। আমাদের সমস্ত স্বপ্ন দিয়ে গড়া ওই পথ।' নেতাজির চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে না রক্ত বেরোচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। 'ওই পথে রয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগের অসহায় মানুষদের নিষ্ফল আর্তনাদ, বাপুজির কারাবাসের যন্ত্রণা। কান পাতলে শুনতে পাওয়া যাবে ঝাঁসির রানির দৃপ্ত ঘোষণা, রণক্ষেত্রে তাঁর ঘোড়ার হ্রেষারব। এই রেঙ্গুনেই কবরে শুয়ে থাকা বাহাদুর শাহের সন্তানহারানোর বেদনা, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে অসংখ্য তরুণের জীবনের জয়গান, টিপু সুলতানের তরবারির ঝলক, তাঁতিয়া টোপির বর্শা-ফলক, ভগৎ সিং, সুখদেব আর রাজগুরুর আত্মত্যাগ—এই সমস্ত দিয়ে গড়ে উঠেছে ওই দিল্লির পথের আহ্বান। আপনি কী মনে করেন পিছে হট বললেই ওই পথ থেকে পিছে হটা যায়?'

আবেগে আপ্লুত নেতাজির দিকে তাকিয়ে থাকেন কাওয়াবে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,

'জাপানের আজ মহা দুর্দিন। একদিকে তার নিজের সন্তানদের কেউ কেউ তার কথা না ভেবে বেইমানি করছে অন্যদিকে আকাশ, প্রকৃতি তার ওপরে নির্দয় হয়ে উঠেছে। এমন সময় আপনিও, চন্দ্রা বোস আপনিও জাপানের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন, তার পিঠে ছোরা বসাচ্ছেন।'

'কী বললেন? প্রত্যাহার করুন আপনার কথা। সুভাষ বোস পেছন থেকে ছুরি বসাবে তাও দুর্দিনের বন্ধুর শরীরে? আপনি একথা বললেন কী করে?' রাঙা চোখে এবার সত্যিই উন্মাদের দৃষ্টি নেতাজির।

'আপনি যদি অন্তত সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত না করেন তা হলে তাই হবে। আমেরিকার বোমারু বিমানগুলো হায়েনার মতো বারবার জাপানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চার চারটি ফ্রন্টে একসঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি এই মিনতি পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।'

এইবার টললেন নেতাজি। কাওয়াবের কম্পমান কণ্ঠ তাঁকে ব্যথিত করে তুলল। 'জেনারেল কাওয়াবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, জাপানের ক্ষতি হয় এমন কিছু আমি করব না। অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত জাপানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ব আমি।'

এবার কেঁদে ফেললেন কাওয়াবে। 'ধন্য আপনি, ধন্য সে দেশ যে আপনাকে জন্ম দিয়েছে। আপনার এই ত্যাগ, এই নিষ্ঠার দশ ভাগের একভাগও যদি আমাদের সাতো আর ইয়ানাগিডার মধ্যে থাকত, তা হলে জাপানকে এরকম বীভৎস দিন দেখতে হত না।'

বৃষ্টি একটু ধরেছে। জল জমেছে বহু জায়গায়। গাছগুলো থেকে এখনও জল ঝরছে। কাওয়াবে বয়সে অনেক বড়। জ্যেষ্ঠের মতোই নেতাজির হাত দুটো হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি একটু ভাবুন। পুরো ফৌজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলে কী লাভ হবে? নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সব। তার চেয়ে সাময়িকভাবে চার পা পিছিয়ে এলে আবার নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারব আমরা। সাময়িক। এ পশ্চাদপসরণ নিতান্ত সাময়িক। রণকৌশলেরই একটা অঙ্গ। শীতের সময় ইম্ফলের জমি যখন শুকিয়ে আসবে তখন আবার আক্রমণ করব আমরা।'

নেতাজি, রাজি হলেন। জেনারেল কিয়ানিকে নিজের হাতে সাময়িক পশ্চাদপসরণের কথা লিখলেন। তারপর জাপসম্রাটকে আর একটা চিঠি লিখলেন। তারপর কাওয়াবেকে বললেন, 'মনে রাখবেন, আমার একটি সৈনিকও মান্দালয় ছাড়িয়ে আসবে না। একটু গুছিয়ে নিয়ে আবার দিল্লির পথ ধরব আমরা।'

কাওয়াবেকে গাড়িতে তুলে দিতে এলেন নেতাজি। বৃষ্টি থেমে যাওয়া আকাশের মেঘরৌদ্রের খেলা তাঁর মুখে। একদিকে আগুনের ঝলক তাঁর মুখে। লাল চোখ দুটোতে আগুনের দৃষ্টি। অন্যদিকে সে চোখের পাপড়িগুলো ভেজা—গোপন অশ্রুর লুকোচুরি খেলা। শরীর টানটান। কিন্তু ভেতরে হাজার আগ্নেয়গিরি লাভা উদ্‌গিরণ করে চলেছে।

গাড়িতে কাওয়াবে সম্রাটের কাছে লেখা নেতাজির চিঠিটা আর একবার খুলে পড়লেন,

'আপনাদের অসামান্য সহযোগিতার জন্য চিরঋণী হয়ে রইলাম আমি। আশা করব ভবিষ্যতেও ভগবান বুদ্ধের দেশের আটত্রিশ কোটি লোকের জন্যে আপনার এই দরদ বজায় থাকবে। আমাদের প্রকৃত সংগ্রাম এখনও শুরু হয়নি। ভবিষ্যতের সেই সংগ্রামের জন্য আবার তৈরি হতে হবে আমাদের। সেদিনও আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা আশা করব আমরা।'

'সাময়িক পশ্চাদপসরণ মানে দু'পা পিছিয়ে যাওয়া, ভবিষ্যতে যাতে দশ পা এগোতে পারা যায় তার প্রস্তুতি নেবার জন্য। মরণের মুখে দাঁড়িয়েও আমরা দিল্লির পথ চুম্বন করেই মরব।'

রেডিয়োতে নেতাজির কথাগুলো শুনছিলেন জামান কিয়ানি। জলভরা চোখে রেডিয়োটা বন্ধ করলেন তিনি।

ক্যাপ্টেন রাম সিং-এর বেহালা বাজছে। আত্মহারা হয়ে গেয়ে চলেছেন তিনি। 'জায়েঙ্গে জায়েঙ্গে, হম দেহল্লি জায়েঙ্গে।'

জেনারেল কিয়ানি বলছিলেন সবাইকে, 'গ্রহণের সময় রাহু গ্রাস করে সূর্যকে। কিন্তু অগ্নিময় সূর্যকে চিরকাল আড়াল করতে পারে না সে। সে ক্ষমতা তার নেই।'

বর্ষায় গাঁধী রেজিমেন্টের বেহাল অবস্থা। কেবল ঘাসপাতা খেয়ে রয়েছে তারা গত তিনদিন। সকাল হলেও অন্ধকার কাটেনি। আকাশে ঘনকালো মেঘ। পেছন থেকে গোলাবর্ষণের আওয়াজ বেড়েই চলেছে, বাড়ছে বিমান হামলা। সামনে থেকে একজন দৌড়ে এল। ভীতত্রস্তভাবে বলল, 'সিফোর্থ হাইল্যান্ডার্সদের একটা পুরো ব্যাটেলিয়ন আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।'

জেনারেল কিয়ানির ডিভিশন আগেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে একটিমাত্র ব্রিগেডের মতো সৈন্য আছে তাঁর সঙ্গে। এই কজনও কখন যে শত্রুর জালে আটকে যাবে তার ঠিক নেই।

অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে শত্রুরা। গাঁধী রেজিমেন্টকে এমনভাবে ঘিরে ফেলেছে তারা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লড়াই করেও বেরোতে পারছে না তারা। রাতে একটু স্তিমিত হল লড়াই। অবশিষ্ট সৈন্যেরা এক জায়গায় জড়ো হতে লাগল। শত্রু অবশ্য পিছন ছাড়ছে না।

কিয়ানি সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, 'আগে মোরে, তারপর মান্দালয়ের দিকে যেতে হবে আমাদের।' অবিশ্রান্ত অগ্নিবর্ষণের মধ্যে যতদূর সম্ভব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রওনা হল আজাদি বীরেরা। আজাদ হিন্দ সরকারের দপ্তরখানা ছিল তাদের কাছে। কিন্তু একদিকে শত্রুর অগ্নিবর্ষণ অন্যদিকে মাথার ওপরে অবিরাম ধারাবর্ষণ। নিরুপায় হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত কাগজ-নথি-দস্তাবেজ—এককথায় আজাদি বীরেদের বীরত্বের অমূল্য সব দলিল আগুনে ফেলে দিতে হল। পুড়ে গেল ইতিহাসের অসংখ্য উপাদান। সেইসব কাগজপত্রের মধ্যে ছিল নেতাজির অনেক নির্দেশনামা, বাণী। অসংখ্য নকশা, লিপি জ্বলন্ত আগুনে পুড়ছে ইতিহাস—জলভরা চোখে তাকিয়ে দেখছে উপস্থিত সবাই।

ডাক্তার আলি আকবর শাহ্ এখনও শয্যাশায়ী। তাঁর জন্য ত্রিপল দিয়ে একটা স্ট্রেচার মতো তৈরি করা হয়েছে। খুব ভোরে গোলাগুলির বর্ষণ একটু কমেছে। ইনায়েতের পাঠানো একজন শিখ অফিসার এসে জানালেন, 'এখন সকালে ব্রিটিশ সৈন্যরা সম্ভবত ব্রেকফাস্ট নিয়ে ব্যস্ত। তাদের ফাঁকি দিয়ে পালাবার এইটাই প্রকৃষ্ট সময়।'

ইনায়েতের আন্দাজ ঠিক প্রমাণ হল। খানাখন্দ পেরিয়ে সবাই দৌড়ল। সবাই যখন সিবাঁয়ার পুল পেরিয়ে গেছে তখন আবার গোলাবর্ষণ শুরু হল। বোধহয় ব্রিটিশদের ব্রেকফাস্ট শেষ হল।

রাস্তায় জাপানিদের ফেলে যাওয়া অনেক সাঁজোয়া গাড়ি, গোলাবারুদের খালি বাক্স জাপানি ফৌজের পশ্চাদপসরণের করুণ কাহিনির সাক্ষ্য দিচ্ছে। পরাজিত বাহিনীর এই যাত্রা বোধহয় পৃথিবীর করুণতম মিছিল। খোঁড়া ঘোড়ায় চড়া অফিসাররা, চিকিৎসা কর্মীরা নিজেরাই অসুস্থ,

বিধ্বস্ত ফৌজ—ক্লান্ত পায়ে চলেছে এই দুর্গম পথে। সে পথ দুর্গমতর করে তুলছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি।

কাবোয়ার গিরিখাত আর চিন্দুইন পাহাড় থেকে চিন্দুইন নদী অঞ্চল পর্যন্ত দৃশ্য সবচেয়ে ভয়ংকর নরককেও হার মানায়। দুর্গন্ধে যমদূতেরাও বোধহয় নাকে কাপড় দেবে। রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য মৃতদেহ পচছে। নগ্নপদ সৈন্যদের কাছে না আছে বন্দুক, না আছে বাড়তি পোশাক বা পিঠের ব্যাকপ্যাক। শুধু আছে কাদাভরা রাস্তায় চলার জন্য একটা বাঁশের লাঠি। চলতে চলতে যারা পড়ে যাচ্ছে তাদের দিকে ফিরে তাকানোর কেউ নেই। আহতদের ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠেছে। কোনও ওষুধ নেই। আছে শুধু চলা আর চলা। আর আছে ম্যালেরিয়া আর ভয়ংকর পেট খারাপের অসুখ।

কিন্তু অনেক জাপানি সৈনিকদের কাছে এ সব যন্ত্রণা ছাপিয়ে আর একটা যন্ত্রণা আরও বেশি মনে হচ্ছে। সম্রাটকে তারা বিজয়গৌরব দিতে পারেনি, কলঙ্কিত হয়েছে জাপানের শৌর্যময় ঐতিহ্য। নিজেদের মনে হচ্ছে অপদার্থ শুধু নয়—দেশদ্রোহী। সেই যন্ত্রণায় অধীর হয়ে নিজের পেটে ছোরা ঢুকিয়ে হারাকিরি করছে তারা।

প্রতিশোধের উন্মত্ত তৃষ্ণা নিয়ে ব্রিটিশ আর আমেরিকান ফৌজ সমানে পিছনে ধাওয়া করছে। শুধু বৃষ্টি যখন খুব বাড়ে তখন বোমাবর্ষণ একটু কমে।

জেনারেল কিয়ানির অসহায় চোখের সামনে মাটিতে পড়ে যায় তাঁর সঙ্গীরা। তারা বলে, 'চিন্দুইন পর্যন্ত পৌঁছনো আর হল না জেনারেল সাহেব। শুধু একটা কাজ করবেন। নেতাজির সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে আমাদের জয় হিন্দ জানিয়ে বলবেন, শেষ নিশ্বাসটুকু থাকা পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করেছি।'

চিন্দুইন পর্যন্ত না পৌঁছতে দেবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে শত্রুরা। হঠাৎ একদিন মাথার ওপর উড়ে এল দুটি বিমান। কিন্তু বোমা না ফেলে তারা পেট্রলের ফোয়ারা ছড়াল। তারপর হাঙরের মতো ডিগবাজি খেয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল। তারপর অনেকটা ওপরে উঠে এগিয়ে এসে বোমা ফেলল। মুহূর্তে চারদিক ঘিরে ধরল বেড়া আগুন। সে দৃশ্য, সেই করুণ আর্তনাদ, সেই সর্বগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখার বিপুল বিস্তার বর্ণনা করার মতো শক্তি পৃথিবীর বীভৎসতম কাহিনিকারেরও নেই।

এইসব দুর্দৈব মাথায় করে প্রায় দশ হাজার আজাদি সেনা চলেছে হাকা, ফালম, কালাদান আর বিশানপুরের রাস্তায়। ডাক্তার আকবর শাহের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে এসেছে। তাঁর ত্রিপলের ডুলির একদিক ধরে আছে বাবু সিং অন্যদিকে আবিদ হাসান। হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হল ড. আকবরের। ডুলি নামিয়ে তাড়াতাড়ি জামান কিয়ানিকে ডেকে আনলেন আবিদ। বললেন, 'যদি দু-একজনকে সঙ্গে দেন তবে মানেব-এর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখি যদি কোনও ওষুধ পাই।'

হাতজোড় করলেন ডাক্তার। 'কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে। আমার শেষ ঘনিয়ে এসেছে। নেতাজিকে বোলো, এই ডাক্তার তার শরীরের শেষ শক্তিটুকু থাকা পর্যন্ত তার কর্তব্য করেছে। খোদাতালা আর বেশি কিছু করার সুযোগ দিলেন না—শুধু এই আক্ষেপ নিয়েই আলবিদা জানাচ্ছি আমি। জয় হিন্দ।' চলে গেলেন ডাক্তার আকবর শাহ্। সব কষ্টের অবসান হল তাঁর।

ভিজে মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া হল ড. আকবরকে।

বিক্ষুব্ধ বাবু সিং প্রশ্ন করেন জেনারেল কিয়ানিকে, 'কেন এই পিছে হটা জেনারেল সাহেব? কীসের জন্য? রাস্তায় উপোস করে মরার জন্য?'

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে বাবু সিং ডাক্তার আকবরকে বয়ে নিয়ে চলছিলেন, তিনি নিজেই অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে চলেছেন। তাঁর বোঝা হালকা করার জন্যে জেনারেল কিয়ানি তাঁর রাইফেলটা নিতে গেলে আর্তনাদ করে উঠলেন বাবু সিং। 'দোহাই জেনারেল সাহেব। রাইফেল ছাড়া সেপাই মানে কাপড় ছাড়া স্ত্রীলোক। একজন সৈন্যের কাছে এর চেয়ে লজ্জা আর কী আছে?'

আরও একটা দিন গেল। নিজেকে আর দাঁড় করাতে পারলেন না বাবু সিং। পড়ে গেলেন কাদায়। কিয়ানি এগিয়ে এসে তাঁর মাথাটা কোলে তুলে নিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে বাবু সিং বললেন, 'আপনার খোদাতালা আপনাকে মাপ করবেন না, সাহেব।'

'কেন? এ কথা কেন বলছ?'

'এইভাবে পথে পড়ে ইঁদুরের মতো মরার চাইতে আমরা যদি শত্রুর সঙ্গে লড়াইতে প্রাণ দিতাম, কত সুখের হত সে মরণ। কেন এই পশ্চাদপসরণ?'

চল্লিশ হাজার জাপানি আর দশ হাজার আজাদি সেনাও একই প্রশ্ন করে চলে মনে মনে।

১৪

মোইরাং-এর মাটিতে দাঁড়িয়ে জাপানি লেফটেন্যান্ট জেনারেল তানাকা আর শওকত মালিক রক্তরাঙা চোখে আজও ইম্ফলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ইম্ফলের দিক থেকে এগিয়ে আসছে শত্রু সৈন্যরা। ভুরেওয়াল, প্রভুদয়ালের মতো বেইমানদের দেওয়া খবরের ওপর ভিত্তি করে শত্রুরা মোক্ষম জায়গায় আঘাত হানছে। বারবার অবস্থান বদলাতে ইচ্ছে। কিন্তু তানাকা আর সৈন্যরা পেছন ফিরতে রাজি নয়।

মোইরাং রক্ষার ভার শওকতের ওপরে দিয়ে এক রাতে তানাকা চললেন বিশানপুরের পথে। আবার একবার বিশানপুর দখল করল জাপানিরা। দুদিন বিশানপুর দখল করে রাখল তারা। তারপর একদিন এল সেই দুঃসংবাদ। তানাকার ফৌজ বিধ্বস্ত। তানাকা কোথায় কেউ জানে না।

অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে মোইরাং রক্ষার সংকল্প নিয়ে অপেক্ষা করছেন অটল দৃঢ়তায়। মাত্র আশি-নব্বইটি সৈন্য অবশিষ্ট আছে তাঁর। বেপরোয়া শওকত নাগা তরুণদের জড়ো করে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তাদের। অস্ত্রশস্ত্র প্রায় শেষ। এবারে হতাশ শওকতকে ভরসা দিয়ে নাগারা নিয়ে এল তাদের পরম্পরাগত অস্ত্র—তিরধনুক।

পশ্চাদপসরণের আদেশ রেডিয়োতে আসার পরে রেডিয়ো বন্ধ করে দিয়েছেন শওকত। পেছোবার কথা মনেও স্থান দেন না তিনি।

তাজা রসদ সরবরাহ ব্রিটিশ সৈন্যের প্রাণে নতুন উদ্দীপনা এনে দিয়েছে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে তারা। পোড়া বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা নাগাদের মধ্যে চাঞ্চল্য। মোইরাং গ্রামে তাদের সুভাষ রাজার ঝান্ডা নামাবার জন্য ছুটে আসছে দুশমন। খবর পেয়ে তিরধনুক হাতে ছুটে এল তারা। ডেরা গাড়ল গাছের তলায় আর খাল ট্রেঞ্চগুলোতে। সকাল হতে না হতে পঁচিশটি বিমানের একটা স্কোয়াড্রন এসে শুরু করল অগ্নিবর্ষণ।

শওকত মালিক, কুরিয়ান সিং আর নাগারা সতর্ক হয়ে বসে। হাওয়াই হামলা শেষ হল একসময়। এবার কানে এল ট্যাঙ্কের ঘড়ঘড়। তাদের পেছনে তিন হাজার সৈন্যের পুরো

একটা রেজিমেন্ট। কোথাও কোনও প্রতিরোধ না পেয়ে ক্রমশ এগিয়ে আসে তারা।

আজাদ হিন্দ সরকারের দপ্তরটা নীরব, শান্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হল সেটা। কিন্তু তখনও টিলার ওপর উড়ছে পতাকাটা। কয়েকজন ব্রিটিশ সৈন্য এগোল সেটাকে নামানোর জন্য। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল এক ঝাঁক তির। কয়েকজন ব্রিটিশ টমি ধরাশায়ী হল। ব্রিটিশরা হতচকিত। একি নাগাদের জাদুমন্তর নাকি? কোথা থেকে আসছে তির? কোথা থেকে আসছে বোঝা না গেলেও তারা আসছে।

সারাদিন ধরে চলল এই মরণখেলা। বহু আজাদি সেনা আর নাগাবীর প্রাণ হারাল। কিন্তু প্রতিরোধ শেষ হয়েছে ভেবে যেই ব্রিটিশ সৈন্য ঝান্ডার দিকে এগোতে চায় ছুটে আসে তিরের ঝাঁক।

অন্ধকার হয়ে এলেই ঝান্ডা নামানোর চেষ্টা হবে আন্দাজ পাওয়া গেল। কিন্তু ব্রিটিশরা ঝান্ডার কাছে জমা হতেই কোথা থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশজন আজাদি সৈন্য আর দু-তিনশো নাগা স্ত্রীপুরুষ, কিশোর-কিশোরী যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হল সেখানে। আবার চলল গুলি। মৃতদেহের স্তূপ হয়ে উঠল। অনেকের শরীরে আগুন লেগে গেছে।

ঝান্ডার কাছে এসে গেছে ব্রিটিশরা। হঠাৎ শওকত মালিক একটা হাতবোমা ছুড়লেন তাদের দিকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল চার পাঁচজন ব্রিটিশ সৈন্য। আবার গুলির ফোয়ারা। রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন শওকত।

মোইরাং দখলে এসেছে ব্রিটিশদের। কিন্তু এই মৃতের স্তূপ সরাবে কে? আনা হল বুলডোজার। কিন্তু এখনও মাঝে মাঝেই ছুটে আসছে বিষাক্ত তির। তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে ব্রিটিশ টমিরা। আর ব্রিটিশের নিমক খাওয়া বিশ্বস্ত গোর্খা সৈন্যরা। মৃতের স্তূপে সামান্য প্রাণের চিহ্ন দেখলেই কুকরি ঢুকিয়ে দিচ্ছে তারা। বিস্মিত ব্রিটিশ সৈন্যরা বুঝতে পারে না এরকম কেন করছে তারা। বুলডোজার তো মাটি চাপা দিয়ে সংক্ষেপে কাজ সেরে ফেলবে।

'না সাহেব। জীবন্ত মানুষকে মাটি চাপা দিলে আমাদের পাপ হবে।' ধর্মভীরু গোর্খাদের একজন উত্তর দিল এ প্রশ্নের।

মোইরাং-এর রক্তরাঙা মাটি জালিয়ানওয়ালাবাগকে হারিয়ে দেয়।

চারদিন পরে শওকতের জ্ঞান ফিরল। তিনি মরেননি। কয়েকজন নাগা কীভাবে যেন তাঁকে বয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। জ্ঞান হয়ে শওকত দেখলেন একটা গাছে টাঙানো খড়ের দোলনায় শুয়ে আছেন তিনি। নাগারা বুনো গাছপালা দিয়ে তাঁর ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়েছে।

তাঁর বাহিনীর অবশিষ্ট আটজন সৈনিক ঘিরে রয়েছে তাঁকে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন শওকত। সবাই ধরে ফেলল তাঁকে। সে অবস্থাতেও হাসলেন শওকত। 'প্রাণ থাকা পর্যন্ত লড়াই যে আমাকে চালাতেই হবে। মদের নেশা ছাড়িয়ে এ নেশা যে নেতাজি নিজের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন আমাকে। আটজন মাত্র রয়েছে তো কী হয়েছে? নাগাদের নিয়ে আবার লড়ব আমরা।'

নাগাদের ডেরায় ওয়ারলেস সেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ব্রিটিশ বাহিনী আসার আগে। সেইটা এখন নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। সৈন্যদের একজন চালিয়ে দিল সেটা। হঠাৎ ভেসে এল নেতাজির গলা।

'শাহনওয়াজ, জেনারেল কিয়ানি, প্রীতম সিং, শওকত, গুলজার সিং। তোমরা কোথায় আছ বন্ধু? সুখে দুঃখে, আলোতে, অন্ধকারে তোমাদের সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি আমি ভুলিনি বন্ধু। মাতৃভূমির জন্য পুড়ে ছাই হতেই জন্মেছি আমি। ইম্ফলের রণাঙ্গনে পাখির মতো উড়ে গিয়ে

তোমাদের পাশে দাঁড়াতে চাই আমি। কিন্তু জাপানের মতো সাচ্চা দোস্তকে দেওয়া কথা রাখার জন্য, আগামী দিনের জন্য আরও জোরাল প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য, আজ তোমাদের সাথিদের একটু বিশ্রাম দাও তোমরা। আগামী দিনে দশ পা এগোবার জন্য আজ আমাদের দু'পা পেছোতে হবে।

'বন্ধু। এ জগৎ নশ্বর। জন্মের মুহূর্তেই মরণের মুহূর্তটি কপালে লেখা হয়ে যায়। কিন্তু মৃত্যু হয় না ধ্যানের, স্বপ্নের।

'তোমাদের আমাদের আজকের জ্বলন্ত দেহ থেকে জন্ম নেবে আগামী দিনের অগ্নিময় প্রাণপ্রবাহ।

'দিল্লি যাওয়ার এক রাস্তা বন্ধ হয়েছে তো কী হয়েছে? নতুন পথ খুলে যাবে। দিল্লির পথ খুলবেই। লালকেল্লায় তেরঙা ঝান্ডা উড়বে-ই। "চল দিল্লি। জয় হিন্দ।"

১৮
আবার রণাঙ্গন

১

নভেম্বর, ১৯৪৪। সঙ্গীদের নিয়ে টোকিয়ো চলেছেন নেতাজি। পথে তাইপেতে একরাত্রি থাকতে হল তাঁকে। তাঁর প্রিয় তাইপের রেলওয়ে হোটেলেই উঠলেন তিনি। সেখানে সন্ধেবেলা কফি খেতে খেতে সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। সম্প্রতি তরুণ কর্নেল হবিবুর রহমান তাঁর খুব কাছাকাছি এসে গেছেন। হোটেলের ছাদেই বসে আছেন সবাই।

প্রশান্ত মহাসাগরে আর বিশেষ করে ইম্ফলে জাপানের বিপর্যয়ের পর জেনারেল তোজোর কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন কোইস্তো।

নতুন প্রধানমন্ত্রী আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবেন, সহকারীদের এই প্রশ্ন নেতাজি এড়িয়ে গেলেন। আসলে সেটা জানতেই তাঁর এই টোকিয়ো যাত্রা। ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁর মাথায়।

তাইপে থেকে টোকিয়োর পথে আবার উড়ল বিমান। একসময় পাইলট ঘোষণা করল যে বিমান জাপানের সীমার মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আচমকা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বিমানটা মোড় ঘুরল। যাত্রীরা হতচকিত। হবিবুর নেতাজির হাত ধরে আছেন।

'কী ব্যাপার ক্যাপ্টেন?' নেতাজি জানতে চাইলেন।

'জাপানি কন্ট্রোল থেকে নির্দেশ এসেছে বিমান যেন আর না এগোয়। এইখানেই নামতে হবে।'.

ওসাকার সামরিক বিমানঘাঁটিতে নামল বিমান। বৈমানিকদের মধ্যে ফিসফাস কথা হচ্ছে। দু'ঘণ্টা পর আবার ওড়বার অনুমতি পাওয়া গেল। টোকিয়ো পৌঁছেও চট করে বিমান অবতরণের অনুমতি পাওয়া গেল না। আকাশেই পাক খেতে লাগল বিমান। অন্ধকার হয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় রানওয়েতে আলো নেই। কিছুক্ষণ পরে অনুমতি পেয়ে খুব সাবধানে বিমান নামল মাটিতে।

স্বাগত জানাবার জন্য জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শিগেমিৎসু, জেনারেল ইসোডা আর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নেতাজি আর তাঁর সহকর্মীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সরকারি গাই-হিন-কান গেস্ট হাউসে।

ডিনারের সময়ও শিগেমিৎসু উপস্থিত। তাঁকে খুব চিন্তাগ্রস্ত লাগছে। একসময় তিনি বললেন, 'আজ দুপুরবেলায় ওসাকার কাছেই আমাদের একটা অস্ত্রকারখানার ওপরে আমেরিকান বি-২৯ বিমান বোমা ফেলে গেছে।'

চমকে উঠলেন নেতাজি। বোমাবর্ষণ হয়েছে তিনটে নাগাদ। জেনারেল কিয়ানির দিকে

তাকালেন তিনি। কন্ট্রোল রুম যদি সময়মতো সতর্ক না করত কী হত কে জানে?

বিষণ্ণ শিগেমিৎসু মৃদুস্বরে বললেন, 'একসময় আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম যে খাস জাপানে আমেরিকার বোমারু বিমান পৌঁছতে পারবে না। এখন খবর পাওয়া গেছে সায়পন আর লিট্টে দ্বীপে আমেরিকানরা বিরাট সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। সেখান থেকে জাপানে সহজেই আসতে পারবে। বোমারু বিমানের পাল্লার মধ্যেই এই দূরত্ব। ভবিষ্যৎ সংকটময়।'

নেতাজির অভ্যর্থনায় জাপান সরকার কোনও ত্রুটি রাখেননি। টোকিয়োর সাধারণ মানুষের কাছেও নেতাজি দারুণ জনপ্রিয়। রাস্তায় অনেক জায়গাতেই তাঁর গাড়ি থামিয়ে শুভেচ্ছা জানায় তারা। হাবিয়া পার্কে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হল। সভাপতিত্ব করলেন ওকুমা হাকু। ভাষণে নেতাজি বললেন, 'ইম্ফলের সংঘর্ষে আমাদের সাময়িক বিপর্যয় মানে এ নয় যে যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে। আমরা লড়ছি, আমরা লড়ব। ভয় পাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না।'

টোকিয়োর নাগরিকদের নেতাজির প্রতি ভালবাসা একটুও কমেনি বটে তবে নতুন শাসনকর্তাদের মনোভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নেতাজি সে জন্যই চিন্তিত।

একদিন দুপুরে শিগেমিৎসুর ফোন এল, 'চন্দ্রা বোস—বানজাই—বানজাই—'

'কী হয়েছে?'

'আগামীকাল রাতে প্রধানমন্ত্রী কোইস্তো আপনার জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করেছেন।'

সুন্দর আয়োজন হয়েছে। অনেক দেশের রাষ্ট্রদূত আর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন সেখানে। হঠাৎ নেতাজি লক্ষ করলেন এক কোণায় নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোককে। চমকে উঠলেন নেতাজি। একি পরিবর্তন। কোথায় সেই দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব! এই শীর্ণ মানুষটিই কি জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো? ভাগ্য তাঁকে সহায়তা করেনি। ভাগ্যহত, বিফল মনোরথ তোজো তাই আজ নিঃসঙ্গ। কিন্তু নেতাজি কী করে ভুলবেন একসময় তোজোর সেই বিরাট আনুকূল্য? তাই দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি ওই নিঃসঙ্গ মানুষটির কাছে।

তোজো জানালেন বর্তমানে তিনি থাকেন শহরের বাইরে তাঁর নিজস্ব ছোট একটা ফার্মহাউসে।

'টোকিয়ো থেকে যাওয়ার আগে নিশ্চয়ই আপনার ওখানে যাব আমি।' নেতাজি বললেন।

প্রধানমন্ত্রী কোইস্তোর সঙ্গে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতাজির কাছে।

'ইম্ফলের ঠিক পতনের মুহূর্তে ভাগ্যের পরিহাসে হারতে হল আমাদের। প্রকৃতি বিরূপ হল। জাপান যদি সেই সময় প্রয়োজনীয় বিমান সহায়তা দিতে পারত তা হলে ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুবিয়ে দিয়ে দিল্লির পথ ধরতাম আমরা।'

কোইস্তো কী বলেন শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব সবাই। দোভাষী কাকিৎসুবো পর্যন্ত উৎকণ্ঠায় অধীর।

'চন্দ্রা বোস, আপনি জানেন জাপান হঠাৎ করে কারও সঙ্গেই মৈত্রীচুক্তি করে না।'

'ইয়েস, ইয়োর একসেলেন্সি।'

'সেই সঙ্গে এটাও সত্যি একবার মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দিলে জাপান সে হাত চট করে পেছনে টেনে নেয় না। জেনারেল তোজো আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি পালন আমি পবিত্র কর্তব্য বলেই মনে করি। তা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পর্কের কোনও পরিবর্তন জাপানের মঙ্গলের পক্ষে অনুকূল নয় বলেই আমার বিশ্বাস।'

নেতাজির মাথা থেকে একটা বিরাট চিন্তা নেমে গেল। প্রগাঢ় মৈত্রীর প্রতীক হিসাবে পাঁচ কোটি ইয়েনের একটা চেক নেতাজি যখন কোইস্তোর হাতে তুলে দিলেন তখন অবাক হবার পালা কোইস্তোর। এরপরে নেতাজি তাঁর বক্তব্যে এলেন।

'ইয়োর একসেলেন্সি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের যদি সরাসরি যোগাযোগ থাকে তা হলেই ভাল হয় বলে আমার মনে হয়। মাঝখানে এই হিকারি কিকনের থাকাটার প্রয়োজন কী?'

কোইস্তো নেতাজির কথা তৎক্ষণাৎ মেনে নিলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের জাপানের রাজদূত হিসাবে নিয়োগ করলেন হাচিয়াকে। টোকিয়োতে আজাদ হিন্দ সরকারের রাজদূত হিসাবে কাজ করবেন এস. এ. আইয়ার। একথাও নেতাজি জানিয়ে দিলেন।

বিদায়ের সময় কোইস্তো নেতাজির হাত দুটো চেপে ধরলেন। বললেন, 'চন্দ্রা বোস। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে আমেরিকার দাপটে আজ জাপানের বড় দুর্দিন। এত বড় দুর্দিন আমাদের ইতিহাসে কখনও আসেনি। এই পরিস্থিতিতে আপনার একটা সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।'

'কেন দ্বিধা করছেন? আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।'

'বর্মা আর সিঙ্গাপুর রক্ষার জন্য আমাদের ত্রিশ-চল্লিশ হাজার সৈন্য আটকে রয়েছে। তাদের সাহায্য করুন। বর্মার লোকেরা আপনাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে, তাই আপনাকে একথা বলছি।'

তোজোর ওখানে যাবার জন্য বেরোলেন নেতাজি। সেদিন বেশ বৃষ্টি হয়েছে। টোকিয়োর বেশ বাইরে গ্রামের রাস্তায় কাদা জমেছে। তারই মধ্যে নেতাজি যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন ভাবতে পারেননি তোজো। চোখের পাতা ভিজে উঠল তাঁর। আবেগভরা গলায় বললেন, 'ক্ষমতা হারানো মানুষের ছায়াও মাড়ায় না লোকে।' আর বলতে পারলেন না তোজো।

'তোজোজি, ভারতবর্ষের লোক উপকারীকে কখনও ভোলে না। শ্রদ্ধার সঙ্গে পাথরের টুকরোকেও দেবতাজ্ঞানে পুজো করে তারা।'

'আপনার এই আমার কাছে আসাটা নতুন প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ হবে কি না—'

তোজোকে কথা শেষ না করতে দিয়ে নেতাজি বললেন, 'আমি তার পরোয়া করি না। আর আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার কথা তাঁকে জানিয়েই এসেছি আমি। আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতাই টেনে এনেছে আমাকে।'

শ্রীমতী তোজো স্বয়ং তাজা ফল কেটে নিয়ে এলেন নেতাজির জন্য।

তোজোর সঙ্গে কাটানো বিগত মুহূর্তগুলো মনে পড়ছে নেতাজির। সিঙ্গাপুরের কুচকাওয়াজ, এশিয়া পরিষদের অধিবেশন—কত কথা—কত উজ্জ্বল স্মৃতি। এমন সময় তোজোর ছোট্ট দুটি নাতি ফুলের তোড়া এনে দিল নেতাজিকে।

'আমি যা কিছু করেছি আমার দেশের মঙ্গলের কথা ভেবেই করেছি।' বিষণ্ণ তোজো বললেন। বিদায় নেওয়ার সময় নেতাজিকে বারবার তাঁর নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে বললেন তোজো।

জাপানের বিশিষ্ট কবি নাগায়ুচির সঙ্গেও দেখা করলেন নেতাজি। আধুনিক বিমানবিদ্যার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে চল্লিশজন ভারতীয় তরুণকে নেতাজি টোকিয়ো পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ভারতের ভাবী বিমানবাহিনীকে তারা যেন ভবিষ্যতে গড়ে তুলতে পারে। তাদের বাসস্থানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে সেই তরুণদের কাছে একটা উদ্দীপনাময় ভাষণ দিলেন তিনি।

বৃদ্ধ রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছের কথা শুনে কাকিৎসুবো বিপাকে পড়ে গেছেন মনে হল।

'কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে কিছু অসুবিধে আছে?' নেতাজি প্রশ্ন করলেন।

'কী আর বলব আপনাকে! ইম্ফলের পতনের একটা খবর ছ'মাস আগে টোকিয়ো পৌঁছেছিল। সেই খবরটা রুগ্‌ণ রাসবিহারীর কাছে "সঞ্জীবনী" সুধার মতো মনে হয়েছিল। নিজের শরীরের অবস্থার পরোয়া না করে তিনি চলে গিয়েছিলেন টোকিয়ো বেতারকেন্দ্রে। সেখানে তাঁর একটা ভাষণও রেকর্ড করা হয়। কিন্তু পরে যখন জানা গেল খবরটা ভুয়ো তখন দারুণ আঘাত পান তিনি। তারপর আর বিছানা ছেড়ে ওঠেননি তিনি।'

রাসবিহারীর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলেন নেতাজি। বৃদ্ধ সিংহের মুখ দিয়ে শুধু দুটো কথা বেরিয়ে এল, 'ইম্ফল আজাদি।' তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যে তাঁর জলভরা চোখের সামনে অতীতের সহস্র স্মৃতি ফিরে ফিরে আসছে। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। কানে আসছে পরপারের ডাক। সাধনা অপূর্ণ রেখে চলে যেতে হবে এই ভাবনা কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁকে।

রাসবিহারীর শিয়রের কাছে তাঁর শাশুড়ি আর পরলোকগতা স্ত্রীর ছবির পাশেই আর একটা ছবি দেখে চমকে উঠলেন নেতাজি। জাপানি নৌবাহিনীর সেই তরুণ অফিসারটি আর নেই। শত্রুর গোলাবর্ষণে তার জাহাজটা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। নেতাজির মনে পড়ে গেল সেই তরুণটির কথা, 'কাকা কবে আজাদ হিন্দ ফৌজের নৌবাহিনীতে যোগ দিতে পারব আমি?'

রাসবিহারীর হাত দুটো ধরে নেতাজি বললেন, 'দাদা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যে তলোয়ার আপনি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তা এখনও উন্মুক্তই আছে—কোষবদ্ধ হয়নি। আর হবেও না।'

যাবার আগে 'ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে' শুধু এইটুকু শুনে যেতে চান রাসবিহারী। নেতাজি তাঁকে বললেন, 'যে চাঁদনিচক থেকে ভাইসরয়ের মিছিলের ওপর বোমা ছুড়েছিলেন আপনি, সেখান থেকেই শোভাযাত্রা করে গিয়ে আপনার পবিত্র হাতে লালকেল্লার ওপরে পতাকা তুলবেন আপনি। তার জন্য মরণপণ করে লড়ব আমরা।'

২

মুতাগুচির সঙ্গে নেতাজি দেখা করতে চান জেনে জাপানি সামরিক কর্তাব্যক্তিরা বেশ বিপদে পড়ে গেলেন। মুতাগুচির কাছে কেউ যেতে সাহস করেন না। ইম্ফলে ব্যর্থতার পরে গত কয়েক মাস ধরে নিজের বাড়ির বাইরে বেরোন না মুতাগুচি। দেখাও করেন না কারও সঙ্গে। কিন্তু নেতাজিও ছাড়ার পাত্র নন।

মুতাগুচির বাড়িতে নেতাজি যখন পৌঁছলেন তখন রাত নটা বেজে গেছে। তাঁর আসার খবরটুকুও ভেতরে নিয়ে যেতে কেউ রাজি নয়। গত কয়েক মাসে কারও সঙ্গে দেখা করেননি মুতাগুচি। বহুকষ্টে তাঁকে স্লিপটা ভেতরে পাঠাতে হল।

'চন্দ্রা বোস' এই একটা কথা লেখা চিঠিটা পেয়েই স্বয়ং মুতাগুচি বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাড়ির বাইরের বাগানে এসে জড়িয়ে ধরলেন নেতাজিকে। বাগানেই ছোট টেবিল এনে খানাপিনার ব্যবস্থা করতে বললেন। সামান্য কিছু পানাহারের পর কথাবার্তা শুরু হল দুজনের।

নিজের কপাল চাপড়ে মুতাগুচি বললেন, 'শুধু আমাকে খাটো করার জন্য, আমার ওপর

তার রাগ মেটানোর জন্যে সাতো জাপানের অজেয় বাহিনীর সর্বনাশ করে দিল। সর্বনাশ করে দিল জাপানের ভবিষ্যতের আর সেই সঙ্গে আপনাদের ভবিষ্যতের।'

আজও 'কোহিমা' কথাটা জাপানি সৈন্যদের হাড় কাঁপিয়ে দেয়। কোহিমা প্রসঙ্গ যে মুতাগুচির কাছে কী ভয়ানক নেতাজি সেটা জানেন।

নেতাজির কাজে বেশি কিছু সাহায্য করতে পারেননি বলে আফসোস করতে লাগলেন মুতাগুচি। এই অপমানিত জীবন কাটানোর চেয়ে ইম্ফলের রণাঙ্গনে সহস্র সহযোদ্ধাদের সঙ্গে একসঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয় ছিল। বারবার সে কথাই বললেন মুতাগুচি।

নেতাজির সঙ্গে বৈঠক করার জন্য জাপানের তরুণ প্রজন্মের বিপুল উৎসাহ। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সভার আয়োজন করা হল। ভাষণ এবং ভাষণের পরে প্রশ্নোত্তরে দ্ব্যর্থহীনভাবে নেতাজি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত জানালেন। তিনি বললেন যে ব্রিটিশ শাসনই যে ভারতকে ঐক্যসূত্রে বেঁধেছে এ তত্ত্ব নিতান্তই ভুল। তা ছাড়াও বললেন, 'স্বাধীনতার পরে দেশের পুনর্গঠন, আধুনিকীকরণ, কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদির সফল রূপায়ণের জন্য আমাদের একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার চাই। একমাত্র শক্তিশালী একটা কেন্দ্রীয় সরকার-ই পারবে দারিদ্র্য নির্মূলন, শিক্ষণ ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবর্তন, প্রতিরক্ষা, কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়নের জন্যে সাহসী পদক্ষেপ নিতে। বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা নানান সমস্যার সমাধানের জন্যে অন্তত কিছুদিনের জন্য এই সরকারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন হবে। এই ধরনের সরকার আপাতদৃষ্টিতে হয়তো স্বৈরাচারী বলে মনে হতে পারে—কিন্তু জনগণের মঙ্গলের জন্যেই এ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে।'

'জন্মসূত্রে নয়, কাজের ভিত্তিতে মানুষের মূল্যায়ন করতে হবে। ধর্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। দেশের সামগ্রিক জীবনে খামোখা ধর্মকে টেনে আনা বিপজ্জনক।'

ভাষণের পরে চা খাওয়ার সময় তাঁর পাশে ভিড় করে দাঁড়াল ছাত্ররা। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর মত জানতে চাওয়ায় নেতাজি বললেন, 'আমার মনে হয় আমাদের ন্যাশনাল সোস্যালিজম আর কমিউনিজমের একটা সুপরিকল্পিত সংশ্লেষণ করতে হবে। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হবে জাতীয় ঐক্য আর রাশিয়ার মতো পরিকল্পিত আর্থিক বিকাশ। কংগ্রেস সভাপতি থাকার সময়ে আমি আমার ভাবনার কথা বলেছিলাম। শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব ভারতের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। কারণ আমাদের দেশে শ্রমিকদের চেয়ে কৃষকদের সমস্যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদ আর্থিক সমস্যার ওপরই গুরুত্ব দেয়। আর্থিক প্রশ্ন নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের পৃথিবীতে তাই মার্কসবাদ বহুল আলোচিত। কিন্তু আর্থিক দিকটাই জীবনের একমাত্র দিক এই ধরনের যুক্তি ঠিক নয়।'

'কিন্তু জাতীয়তাবাদের কোন ব্যাপারটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে?'

'দেশগঠন। জাতীয়তাবাদই দেশকে উন্নয়নের পথে প্রেরণা দিতে পারে। ইহুদি নির্যাতনের মতো সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বিসর্জন নিয়ে জগন্নাথের রথকে এগোতে হবে। সমস্ত এশিয়াকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে ন্যায় আর স্বাধীনতার মন্ত্রে।'

নেতাজির প্রাঞ্জল বক্তব্য আর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে ছাত্ররা দারুণ প্রভাবিত। জামান কিয়ানি আর হবিবুর রহমানকে তারা বলল, 'আপনাদের সৌভাগ্য নেতাজির মতো একজন এক ইতিহাসস্রষ্টা, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ব্যক্তিকে নেতা হিসাবে পেয়েছেন। একনিষ্ঠভাবে তাঁকে অনুসরণ করে আপনাদের দেশকে আবার গড়ে তুলতে পারবেন আপনারা।'

টোকিয়ো থেকে ভরা মনে নাগাসাকির দিকে রওনা হলেন নেতাজি। তাঁর বেশির ভাগ দাবিরই স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছেন তিনি। দূতাবাস স্থাপনের দাবি তো আগেই স্বীকৃতি পেয়েছে। এর আগে জাপান সরকার আজাদ হিন্দ সরকারকে অর্থসাহায্য করত অঙ্গীকার পত্রের মাধ্যমে। এবার স্থির হয়েছে এবার থেকে সাহায্য দেওয়া হবে এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রকে যেভাবে ঋণ দেয় সেই ভিত্তিতে। আজাদ হিন্দ সরকারের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব যেন কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে প্রত্যেক চুক্তির খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নেতাজির।

জাপানের দক্ষিণতম রাজ্য ফুকুওকা। সঙ্গীদের নিয়ে সেখান থেকে সাংহাইয়ের দিকে যাবেন নেতাজি। সেখানকার গভর্নর সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁদের। মান্য অতিথিদের রাখা হল একটি সম্ভ্রান্ত হোটেলে। নাগাসাকির গভর্নর বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন।

এক রাতে খানাপিনার পরে জাপানের কৃষ্টি সংস্কৃতির এক অনন্য নিদর্শন গেইশাদের নাচগানের ব্যবস্থা করা হল। গেইশারা নাচে-গানে কিন্নরীদের হার মানায়। সমাজেও তাদের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। রূপ আর গুণের অনবদ্য মিশ্রণ এই গেইশাদের মধ্যে।

সমস্ত রূপসীদের মধ্যেও বছর কুড়ি বয়সের একটি তরুণী সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অপরূপ দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গে মিলেছে সুন্দর পোশাক আর বিশিষ্ট ধরনের কেশবিন্যাস। সবার নজর তার ওপরে। কিন্তু তরুণীটির অপলক দৃষ্টি শুধু নেতাজির ওপরে। মেহফিলের সমস্ত সময়টাই এ রকম চলল।

মেহফিল শেষ হওয়ার পরে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেতাজি নিজের কামরার দিকে যাওয়ার সময় ব্যাঞ্জোটি হাতে নিয়ে তরুণীটি তাঁর কাছে এল। গভর্নর সাহেব নেতাজির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'এ হচ্ছে কুমি। নাগাসাকির সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে বলে সকলে জানে একে। আমাদের এক অত্যন্ত উচ্চপদস্থ অফিসারের মেয়ে।'

'স্যার আপনাকে ব্যাঞ্জো বাজিয়ে শোনাতে চাই আমি।' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল মেয়েটি।

মেয়েটির মিনতিভরা আগ্রহ উপেক্ষা করতে পারলেন না নেতাজি। সহকারীদের ফিরে ডাকলেন তিনি। বললেন, 'সবাই একটু অপেক্ষা করে ব্যাঞ্জো শুনে যাও।' সবাই জড়ো হলেন নেতাজির কামরায়।

বাকিদের উপস্থিতি কুমির পছন্দ হল না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল একলা নেতাজির সঙ্গেই থাকতে চায় সে। যাই হোক ব্যাঞ্জোর ওপরে কুমির সুদক্ষ আঙুলগুলো নেচে চলল। তার বাজনা সবাইকেই মুগ্ধ করল। ঘণ্টাখানেক ধরে চলল বাজনা। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। সবাই চলে গেলেন নিজের নিজের কামরার দিকে। কুমির কিন্তু নেতাজির কামরা থেকে বেরোবার লক্ষণ নেই। ব্যাপার দেখে কিয়ানিকে ইশারা করলেন নেতাজি। দরজার বাইরেই পায়চারি করতে লাগলেন কিয়ানি।

'মিস কুমি। অনেক ধন্যবাদ। রাত অনেক হয়েছে। এবার তুমি যাও।' শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন নেতাজি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল কুমি। তারপর বলল, 'জাপানি পত্র-পত্রিকায় আপনার বহু ছবি দেখেছি আমি। টোকিয়োতে আপনার ভাষণ শোনার সৌভাগ্যও হয়েছিল আমার। আপনার মতো লোককে যে আমি বাঁধতে পারব না, সেটা আমি জানি। আমি শুধু একটা রাত কাটাতে চাই আপনার সঙ্গে।'

নেতাজি স্তম্ভিত। কুমি শুধু সুন্দরীই নয়। বাকপটুত্বও অসামান্য। আবেশভরা গলায় সে বলল, 'গিরিশিখরের মহিমা আপনার মধ্যে। আমি শুধু চাই একটা রাতের জন্য সেই গিরিশিখরের বুকে ঝরনার মতো উচ্ছল আবেগ।'

ততক্ষণে নেতাজি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। ধীরভাবে বললেন, 'কুমি— আমি তোমার বাবার মতো। সেই অধিকারেই বলছি, শিগগির এখান থেকে চলে যাও তুমি।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না। প্রত্যেক মেয়েই চায় বীরের হৃদয়ে স্থান পেতে। আর প্রত্যেক বীরই তো চায় জয়ের আনন্দ।'

এইবার মেয়েটির প্রতি করুণা হল নেতাজির। শান্তস্বরে বললেন, 'তোমার এ কথাটা সত্যি যে প্রত্যেক বীরই সুন্দরকে চায়। আমিও চাই। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণের পর্যায় অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি আমি। আমিও সুন্দরকে চাই—চাই একটা সুন্দর, সুস্থ, সমৃদ্ধ জীবন সমস্ত মানুষের জন্য। ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা নয়, আমার সমস্ত কামনা দীন-দুঃখী-দুর্বলের মঙ্গলের জন্য। দুনিয়ার পথে আমি এক মুসাফির—যার মঞ্জিল আমার দেশের আর সমস্ত মানুষের মঙ্গলমন্দির।'

বহুকষ্টে কুমিকে বোঝাতে পারলেন নেতাজি। কিন্তু যাবার আগে নিজের ব্যাঙ্গোটি নেতাজির হাতে দিয়ে গেল কুমি।

৩

পশ্চাদপসরণের পরে ছয়-সাত মাস কেটে গেছে। নববলে বলীয়ান ব্রিটিশ ফৌজ মণিপুরের সমতল ভূমি পার হয়ে বর্মার ওপর ঢুঁ মারছে। প্রতিশোধের তৃষ্ণায় উন্মত্ত জেনারেল স্লিম চিন্দুইন নদী পার হয়ে ইরাবতীর তীরে পৌঁছে গেছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বরিষ্ঠ সেনানায়কদের বৈঠক চলছে। ধীরগম্ভীর স্বরে নেতাজি বললেন, 'বর্মায় জাপানি ফৌজকে সাহায্য করব বলে আমি প্রধানমন্ত্রী কোইস্তোকে কথা দিয়েছি।'

এই মন্তব্যে বৈঠকে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। অনেকের চোখেই শঙ্কা-সংশয়। তারই মধ্যে মেজর মেহবুব সাহস করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে জাপানের সহায়তা করতে গেলে আমরা নিজেরাই শেষ হয়ে যাব।'

নেতাজি চমকে উঠলেন। আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকালেন উপস্থিত সবার মুখের দিকে। সক্ষোভে বললেন, 'জাপানের কাছ থেকে আমরা কী পাব এ প্রশ্ন আপনারা যখন পঞ্চাশ হাজার জাপানি সৈন্য ইম্ফলের রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, তখন কেন করেননি? কেন তাদের প্রশ্ন করেননি যে আমাদের জন্য তোমরা কেন লড়ছ? ভারতের সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক?'

মাথা হেঁট করে রইলেন সবাই। নেতাজি বলে চললেন, 'সুদিনে বন্ধুদের সঙ্গে যদি ওঠাবসা করে থাকি, দুর্দিনে তাদের ছেড়ে যাওয়া কি ভারতের ঐতিহ্য।'

'এখন জাপানে নতুন প্রধানমন্ত্রী ভার নিয়েছেন। এই নতুন প্রশাসন কী করবে সে বিষয়ে আমার আশংকা ছিল। অনায়াসেই হাত ধুয়ে ফেলতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। আমাদের সাহায্য করা বন্ধ করেননি নতুন প্রধানমন্ত্রী। এই দুর্দিনেও জাপান যদি আমাদের সাহায্য করতে পারে তা হলে আমরা কেন পারব না তাঁদের সাহায্য করতে?'

সবাই বুঝলেন। বৈঠক শেষে সবার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে নেতাজি বললেন,

'ইতিহাসে আর একটা অধ্যায় যোগ করতে হবে আমাদের। ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপানি ফৌজ যেভাবে লড়েছে, ভারতের আজাদি সেনারাও দুর্দিনে জাপানিদের রক্ষা করার জন্য সেভাবেই লড়েছে—এই কথাটা প্রমাণ করে যেতে হবে আমাদের।'

দ্বিতীয় ডিভিশন যুদ্ধে যাবে বলে স্থির হল। এই ডিভিশনের নেতৃত্বের দায়িত্ব নেতাজি দিলেন মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানকে। মধ্যব্রহ্মে মাউন্ট পোপা আর ম্যাকটিলার ভূমিতে ব্রিটিশ ফৌজের অগ্রগতি রুখতে হবে তাঁকে। জাপানি ফৌজকে রক্ষার এই ঐতিহাসিক দায়িত্বে খুশিতে উচ্ছল তিনি।

মেয়র বাংলোয় ফিরে গেলেন নেতাজি। ছাদে বসে রাতের খাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন গুরুবক্স ধিল্লোঁ।

অনেক দিন ধরেই গুরুবক্সের মনে একটা কথা পাক খাচ্ছিল। আজ বলেই ফেললেন সেটা।

'নেতাজি, ভারতবর্ষ থেকে রওনা হবার আগে আপনি কি আপনার স্বপ্ন, আপনার পরিকল্পনার কথা কাউকে বলেছিলেন?'

প্রশ্ন শুনে হাতের গ্রাস হাতেই থেকে গেল নেতাজির। মৃদু হাসি ফুটল মুখে। তারপর সহজ স্বরে বললেন, 'ভারতে একজন লোকই আছেন যিনি আমার সমস্ত পরিকল্পনার কথা জানতেন। একমাত্র তাঁকেই সব কথা মন খুলে বলা যেত। তিনি সবই জানতেন।'

'কে তিনি?'

'মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী।'

ভিজে আসা চোখদুটো মুছে নিলেন নেতাজি। অন্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা অবাক। গাঁধীজি আর নেতাজির মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক যে অন্তঃসলিলা নদীর মতো বয়ে চলছে সেটা ধারণার বাইরে ছিল তাদের।

নতুন নেহরু ব্রিগেড তৈরি করার সময় তার নেতৃত্ব কাকে দেওয়া যায় ভাবা হচ্ছিল। নতুন ব্রিগেডে কুয়ালালামপুর, পেনাং প্রভৃতি শহরের নাগরিক ছাড়া প্রচুর তামিল শ্রমিক ভরতি হয়েছে। মাঝখানে কোনও কারণে এই ব্রিগেডের প্রায় আটশো সৈনিক বিদ্রোহ পর্যন্ত করেছিল। এমন সময় গুরুবক্স সিং ধিল্লোঁ নিজেই নেতাজির কাছে এসে এই নতুন ব্রিগেডের ভার নিতে চাইলেন।

গুরুবক্সের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে নেতাজি বললেন, 'গুরুবক্স তুমি কি জানো যে তোমার আগে দুজন সিনিয়র অফিসার এই দায়িত্ব নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন?'

'ইয়েস স্যার।' গুরুবক্স জানালেন।

'কতদিনের মধ্যে তুমি শত্রুর মুখোমুখি হতে পারবে মনে কর?'

'ওদের কাছে পৌঁছতে যে কদিন লাগবে সেই কদিন।'

যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য অধীর আগ্রহ গুরুবক্স সিং ধিল্লোঁর। ইম্ফল-কোহিমার যুদ্ধের সময় সদরে স্টাফ অফিসার ছিলেন বলে যুদ্ধে যেতে পারেননি তিনি। সে দুঃখ ভুলতে পারেন না তিনি।

ধিল্লোঁর কথায় নেতাজির চিন্তা খানিকটা দূর হয়েছে মনে হচ্ছে। সসম্ভ্রমে স্যালুট করে ধিল্লোঁ বললেন, 'আমার ওপর ভরসা রাখুন নেতাজি। কোনওমতেই আপনার অসম্মান হতে দেব না আমি।'

জেনারেল স্লিম ঝড়ের বেগে ইরাবতীর দিকে এগিয়ে আসছেন। তাকে রোখবার দায়িত্ব নেহরু ব্রিগেডের ওপর। তাড়াতাড়ি মিনজাঁও পৌঁছলেন ধিল্লোঁ। সঙ্গে জাপানি ক্যাপ্টেন ইজুমি।

আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আপনাদের নেতাজির তুলনা নেই। জাপানের এই দুর্দিনে হাওয়ার গতি লক্ষ্য করে অধিকাংশ লোকই জাপানের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে আজ।'

'তার মানে?'

'এতদিন পর্যন্ত আমাদের সমর্থন করার পরে বর্মার যুদ্ধমন্ত্রী আউঙ্গ সান আজ পক্ষ পরিবর্তন করেছেন।'

'কী বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। ক্যান্ডিতে গিয়ে মাউন্টব্যাটেনের হাতে পায়ে ধরে তিনি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। একমাত্র নেতাজিই এই দুর্দিনে নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করছেন। তাঁর এই উপকার জাপান কখনও ভুলবে না।'

ইরাবতীর তীরে ব্রিটিশ ফৌজের গতিরোধ করার চেষ্টা মানে পাহাড় থেকে নেমে আসা ধস হাত দিয়ে আটকানোর চেষ্টা। ধিল্লোঁর কর্তৃত্বাধীন ব্রিগেড এক বিচিত্র ব্রিগেড। এর আগে কোনও সৈন্যদলের এত শোচনীয় অবস্থা দেখেননি তিনি। অনেক সৈন্যের উর্দি নেই। পরনে পথচলতি পথিক বা বর্মি চাষিদের পোশাক। ভালমতন সামরিক শিক্ষাও নেই তাদের। কর্নেল ধিল্লোঁ তাদের নেতাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উর্দি পরতে বললেন। মাথার ওপর শত্রু বিমানের আনাগোনা উপেক্ষা করে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ শেখাবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। তাদের বোঝালেন, কুচকাওয়াজ ছাড়া আত্মবিশ্বাস আসে না আর আত্মবিশ্বাস ছাড়া যুদ্ধ করা যায় না। এই সময়ে মান্দালয়ে মেজর খোসলার নিহত হবার খবর এল।

ধিল্লোঁর সঙ্গে ক্যাপ্টেন চন্দ্রভান, লেফটেন্যান্ট হরেরাম আর লেফটেন্যান্ট খান মুহম্মদের ব্যাটেলিয়নও রয়েছে। সব মিলিয়ে তিন-চার হাজার সৈন্য। এদের রুখতে হবে শত্রুর সপ্তম ডিভিশন ছাড়াও আরও তিনটি ব্রিগেডকে। তাদের মোট সৈন্য ত্রিশ হাজারেরও বেশি। এদের আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে লড়তে হবে কতকগুলো পুরনো রাইফেল দিয়ে। কিন্তু আজাদি বীরদের আসল অস্ত্র তাদের দৃঢ়তা আর নিষ্ঠা। একেবারে শেষ মুহূর্তে ক্যাপ্টেন ইজুমি বহুকষ্টে তিনটি কামান জোগাড় করলেন। খরচের জন্য পাঁচ লাখ টাকাও তিনি ধিল্লোঁকে দিলেন।

পাঁচ রাত ঘুমোননি ধিল্লোঁ। একমাত্র গোপন আক্রমণই আজাদি ফৌজের জয় সম্ভব করে তুলতে পারে। সে জন্য প্রয়োজন আশেপাশের বর্মিদের বিশ্বাস অর্জন করা। সেই চেষ্টাই করে চললেন তিনি।

পাশের একটি গ্রামের প্রধানের মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হল তাঁর। মেয়েটির নাম মাই। পড়াশোনায় ভাল আগ্রহ আছে তার। এমনিতে ও বেশ সপ্রতিভ। মেয়েটি সরোজিনী নাইডু আর ঝাঁসির রানি বাহিনীর কাজকর্ম সম্বন্ধেও পড়েছে। সাপের মতো আকৃতির একটা তামার তাগা ধিল্লোঁর হাতে পরিয়ে দিল সে। বলল, 'দাদা, এই তাগা যতক্ষণ তোমার হাতে থাকবে, মৃত্যু স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে।'

এরই মধ্যে ধিল্লোঁর অনুপস্থিতিতে একদিন গুজব রটল যে শত্রুর বোমার আঘাতে ধিল্লোঁর মৃত্যু হয়েছে। একদিন একটা গ্রাম থেকে ফিরছেন ধিল্লোঁ। হঠাৎ নদীর ধারে একটা প্যাগোডার কাছে এসে ভেতরের কথা কানে এল তাঁর। লেফটেন্যান্ট চন্দ্রভান অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছেন, 'আমাদের কম্যান্ডার ধিল্লোঁ নিহত হয়েছেন। শত্রু ইরাবতী নদী পার হয়েছে।'

'দুটো খবরই ভুল।' মাঝখানে ঢুকে পড়ে ধিল্লোঁ বললেন, 'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি, কম্যান্ডার ধিল্লোঁ জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছি। তার মানেই হচ্ছে যে দ্বিতীয় খবরটিও মিথ্যে। শত্রুরা এখনও পর্যন্ত ইরাবতী পেরোতে পারেনি।'

কর্নেল ধিল্লোঁ ফিরে আসায় সবাই স্বস্তি বোধ করলেন। একটা চারদিক খোলা ছাউনিতেই ধিল্লোঁর দপ্তর। ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডারদের নিয়ে সেখানেই একটা বৈঠক করলেন তিনি। সঙ্গে আছে আটটা মেশিনগান। তার মধ্যে তিনটি দেওয়া হল তাঁর সঙ্গে থাকা তিনটি ব্যাটেলিয়নকে। বাকি পাঁচটা নেহরু ব্রিগেডের কাছে। মেশিনগান পিছু চারটে করে কার্তুজের বাক্স।

বৈঠক চলার সময়েই এক বর্মি ছুটে এসে খবর দিল। নদীর ওপারে ব্রিটিশ সৈন্যরা কুকুর মারছে।

কর্নেল ধিল্লোঁ বুঝলেন। কুকুর মারার অর্থ একটা বড় রকমের আক্রমণ হতে যাচ্ছে। তাদের দেখে কুকুরগুলো যেন ডাকাডাকি না করতে পারে তাই এই সতর্কতা।

সত্যিই ভোর হতে না হতেই শত্রু বিমানের হামলা শুরু হল। নদীর ধারে অনেকগুলো ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিল আজাদি সেনারা। সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেল বোমার আঘাতে। ভাগ্য ভাল। আজাদি সৈন্যরা পেছনে অন্য ট্রেঞ্চে আগেই সরে এসেছিল। দুপুরে আরও ভীষণ বোমাবর্ষণ হল। আজাদি ফৌজ আশঙ্কা করছে এইবার এগোতে শুরু করবে শত্রু ফৌজ। কিন্তু জমির ওপর আক্রমণ শুরু হল না। শত্রুর মনেও তাদের সম্পর্কে ভয় রয়েছে।

ইরাবতী বিশাল নদী। বগান গ্রামের কাছে হাঁসুলির মতো একটা বাঁক নিয়েছে ইরাবতী। বগান গ্রামে অসংখ্য প্যাগোডা গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে আজও।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ভোরবেলাতেই দেখা গেল সাউথ ল্যাঙ্কাশায়ার বাহিনীর অনেক সৈন্য ছোট ছোট নৌকোতে জলে নেমে পড়েছে। আজাদি সেনারাও সতর্ক। রাইফেলের পাল্লার মধ্যে আসতেই শত্রুদের মাথা লক্ষ্য করে গুলি চলল। প্রচুর শত্রু সৈন্য মারা গেল। হাওয়ায় আর ঢেউয়ে নৌকোগুলো টলমল করছে। লক্ষ্য স্থির রাখা মুশকিল। তা সত্ত্বেও গোলাগুলিতে কয়েকটা নৌকায় আগুন লেগে গেল। আজাদি সেনারা গর্জে উঠল, 'চল দিল্লি, নেতাজি জিন্দাবাদ।'

'আরে এরা তো দেখছি "চল দিল্লি" ওয়ালারা।' নদীর মধ্যে থেকে আওয়াজ এল। বোঝা গেল ওপারের সেনারাও ভারতীয়।

হরিরামের ব্যাটেলিয়ন মেশিনগান চালানো শুরু করল। সারাদিন যুদ্ধ চলল। একসময় আঁধার নামল। ল্যাঙ্কাশায়ার বাহিনী পিছু হটল। আনুমানিক প্রায় চারশো লোককে হারিয়েছে তারা। আজাদি সেনাদের মধ্যেও প্রায় চল্লিশজন প্রাণ দিয়েছে।

পরের দিন শত্রুসৈন্য আর আক্রমণ করার সাহস পেল না। ক্যাপ্টেন ইজুমির সঙ্গে ধিল্লোঁ চললেন জাপানি ফৌজের সদর দপ্তরের পথে। মাইল দুয়েক যাবার পর হঠাৎ দেখা গেল শত্রু বিমান উড়ে আসছে। ছোট ছোট টিলা আর খাদ রয়েছে পথের ধারে। সেই সব টিলার খাঁজে খাঁজে আশ্রয় নিলেন ধিল্লোঁরা। জায়গাটা একটা গুহার মতো। ওপার থেকে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ শুরু হল এবার। গুহার মুখটার কাছে পাথরগুলো চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে গুহার মুখটা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। আটকে পড়তে হবে এখানে।

কিছুটা দূরে বেশ কয়েকটা বড় বড় গাছ রয়েছে। প্রাণ বাঁচানোর একমাত্র উপায় সেখানে দৌড়ে যাওয়া। প্রায় দেড়শো গজ দূরত্ব। জীবনমরণ নির্ভর করছে পায়ের গতি আর শত্রুসৈন্যের তাক কতটা তার ওপরে। কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

গুহার মুখ থেকে বেরোতে যেতেই ইজুমি ধিল্লোঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমাকে আগে যেতে দিন।'

'কেন?'

'আমি মরলে শুধু একটা ক্যাপ্টেন মরবে। কিন্তু আপনার কিছু হয়ে গেলে আপনার বাহিনী কম্যান্ডারকে হারাবে।'

ধমকে উঠলেন ধিল্লোঁ। 'হট। আমি সিনিয়র। আমিই আগে যাব। তুমি পেছনে পেছনে এস।'

শোঁ শোঁ করে গুলি ছুটছে গা ঘেঁসে। এঁকে বেঁকে ছুটছেন দুজনে। এক গাছের আড়াল থেকে আরেক গাছের আড়ালে। রাতের অন্ধকার নেমে এল একসময়। নিজের ঘাঁটির দিকে ফিরে চললেন ধিল্লোঁ। চন্দ্রভানের কোনও খবর নেই। লোক পাঠানো হল তাঁর কাছে। একটু পরে বোঝা গেল বগানের কাছাকাছি একটা জায়গা দিয়ে দুশমন নদী পার হয়েছে। চন্দ্রভানের বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

সকাল হল। ধিল্লোঁর কয়েকজন সহকারী এসে তাঁকে বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে। আর কত রক্ত ঝরাব আমরা? যারা এখনও বেঁচে রয়েছে তাদের প্রাণ বাঁচান। চলুন আমরা আত্মসমর্পণ করি।'

'আমাকে একটু ভাবতে দাও।' ধিল্লোঁ বললেন। একটা খড়ের গাদার পেছনে গিয়ে একটা গোল চোঙার মধ্যে থেকে নেতাজির একটা ছবি বার করলেন ধিল্লোঁ। আত্মসমর্পণ—কী ঘেন্নার এই শব্দটা। কান্নার আবেগে থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। 'কী করব? নেতাজি, কী করব আমি?' সেখানেই নতজানু হয়ে বসে গুরু গোবিন্দের বন্দনা গাইতে শুরু করলেন তিনি। হঠাৎ মনে হল জ্যোতির্ময় মূর্তিতে গুরুজি যেন দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সামনে। মুখে আশ্বাসের হাসি। সেই সৌম্য কিন্তু দৃপ্ত মূর্তি। আকুল ধিল্লোঁ বললেন, 'বলে দিন গুরুজি কী করব আমি? আমি যে নেতাজিকে কথা দিয়েছি—কোনওমতেই তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দেব না আমি। শক্তি দিন গুরুজি, শক্তি দিন।' প্রসন্নহাস্যে উদ্ভাসিত হল গুরুজির মুখ। বললেন, 'বেটা আজকে নেতাজিই তোমার গুরু। প্রাণ থাকতে তাঁকে ছেড়ো না।'

চটকা ভেঙে গেল ধিল্লোঁর। পাখির কলকাকলি শোনা যাচ্ছে। ধিল্লোঁ যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠলেন। কোনও সংশয় নেই তাঁর মনে।

সাথিদের কাছে ফিরে এলেন ধিল্লোঁ। আত্মসমর্পণের সাদা পতাকাটা হাতে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লেন সেটা। টুকরোগুলো বুট দিয়ে মাড়িয়ে দিলেন।

আবার চলল বলদগাড়ি বগানের দিকে। শত্রুর অগ্রগতি রোধ করতে হবে। গত কয়েকদিন ধরে না হয়েছে ভাল করে খাওয়া, না ঘুম। দুপুরে পৌঁছলেন সেই বর্মি ধর্মবোন মাইয়ের গ্রামে। একটু বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছে হল। মাইয়ের বাবা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আবার উনুন ধরানো হল। মাইয়ের কাছে নেতাজির একটা ফটো ছিল। সেই ফটোতে ধিল্লোঁর স্বাক্ষর নিল সে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে আবার রওনা হলেন ধিল্লোঁ। মাই আর তার বাবার চোখে জল। কে জানে আবার কবে দেখা হবে।

বলদগাড়ি গ্রাম থেকে সামান্য দূরে এগোতেই বিমান হামলা শুরু হল ওই বর্মিগ্রামের ওপর। বাঁশখড়ের বাড়িগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। আবালবৃদ্ধবনিতার করুণ আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছেন ধিল্লোঁ। মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে তারা। আজাদি সেনাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে গ্রামটাকে। কী হল মাইয়ের? দূর থেকে মনে হচ্ছে তার বাড়িতেও আগুন লেগেছে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে ধিল্লোঁর। মনে মনে স্থির করে ফেললেন তিনি। এর পর আর কোনও গ্রামে আশ্রয় নেবেন না তিনি।

বলদগাড়িতে খড়ের গাদার ওপরে শুয়ে আছেন শ্রান্ত ক্লান্ত ধিল্লোঁ। মনে হচ্ছে কত যুগ ধরে চলেছেন তিনি। হঠাৎ নজর গেল হাতের তাগাটার দিকে সেই সাপের মতো তাগাটা। 'মাই—এই তাগাটা যদি তোমার কাছে থাকত!'

হঠাৎ চটকা ভেঙে গেল ধিল্লোঁর। একজন অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের জাপানি অফিসার ঝাঁকি দিচ্ছেন তাঁকে।

'শিগগির চলুন। ম্যাকটিলার জঙ্গলে নেতাজি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' নেতাজি গুরুবক্স সিং ধিল্লোঁর জন্য অপেক্ষা করছেন! একি স্বপ্ন না সত্যি? অবাক চোখে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকেন ধিল্লোঁ।

৪

ইম্ফল এখন পুরোপুরি ব্রিটিশদের কর্তৃত্বাধীন। আশপাশের অশান্ত পাহাড়গুলো এখন শান্ত। কিন্তু সাউথ ইস্ট এশিয়ার সেনাপতি মাউন্টব্যাটনের মনে শান্তি নেই। জেনারেল স্লিমকে অধীরভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কবে আমাদের ফৌজ রেঙ্গুনে পৌঁছবে?'

'এতদিনে পৌঁছনো উচিত ছিল! কিন্তু জাপানি ফৌজ ম্যাকটিলায় শক্ত প্রতিরোধ ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। জাপানি কম্যান্ডার মেজর জেনারেল কাসুয়া আমাদের প্রতিরোধ করছে।'

একটা ব্যাপার ডিকি মাউন্টব্যাটেনকে দারুণ কষ্ট দেয়। অসম আর চিন সীমান্তে ছয় ডিভিশন জাপানি সৈন্য লড়াই করেছিল। তাদের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ বিবাদ, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ইত্যাদি কারণে তাদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে বটে কিন্তু একটা ডিভিশনকেও পর্যুদস্ত করা যায়নি। তাই জাপানিদের বর্মা থেকে নিশ্চিহ্ন করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে।

'ডিকি, মান্দালয়ের কাছে সুভাষ বোসের এক ডিভিশন সৈন্যও জাপানিদের সঙ্গে রয়েছে।'

বোসের নাম শুনলেই মাউন্টব্যাটেনের মুখ ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তিনি বললেন, 'এই সুভাষ বোস আর তার ওই তথাকথিত আজাদ হিন্দ ফৌজ আমার কাছে একটা দগদগে ঘা হয়ে উঠেছে। এই উৎপাতটাকে সমূলে ধ্বংস না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই দেখছি।'

'ডিকি, বোসের ওপর তোমার রাগটা খুব বেশিই মনে হচ্ছে।'

'কেন হবে না? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু আমাদের এত লোকসান আজ পর্যন্ত আর কেউ করতে পারেনি। এত স্পর্ধা ওই গোলামটার!'

'তার মানে?'

'ও যদি না উসকাতো তা হলে জাপানিরা কখনই ইম্ফল-কোহিমার ওপর চড়াও হত না। জাপান যদি ভারতবর্ষ দখল করতে চাইত তা হলে ৪১ সালের ডিসেম্বরেই রেঙ্গুনের পতনের পর ভারতবর্ষ আক্রমণ করত। জাপানের আক্রমণটা পুরোপুরি বোসের উসকানিতে। হি শুড বি কিলড। ওকে খতম করতেই হবে। না হলে এই আপদটা চিরকাল আমাদের জ্বালাবে।'

'ডিকি তোমার কি মনে হয় এই লোকটা গাঁধীর চেয়েও ভয়ংকর।' জেনারেল স্লিম প্রশ্ন করলেন।

'মিস্টার গাঁধীর আমরণ অনশন কোনও দিনই আমাদের পক্ষে ভয়ের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এই সুভাষ বোস শক্তি দিয়ে আমাদের মোকাবিলা করতে চায়। দেড়বছর আগে চিন আর জাপানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের জন্য তার প্রচেষ্টা যদি সফল হত তবে আমাদের হাল কি হত ভাবলে আতঙ্ক হয়। আমেরিকান বিমানগুলো যদি সেই সময় ইম্ফলে আমাদের সাহায্যের জন্য না আসতে পারত তা হলে অবস্থাটা কী হত?'

ব্রিটিশের চতুর্দশ বাহিনী বর্মায় কবেই ঢুকে পড়েছে। মান্দালয় আর ম্যাকটিলা দখল করে তাড়াতাড়ি রেঙ্গুনের পথে চলতে চায় তারা। কিন্তু আশঙ্কার কথা হচ্ছে ব্রহ্মদেশের ছাদভাঙা বৃষ্টি

শিগগিরই শুরু হয়ে যাবে। তা হলেই আটকে যাবে ব্রিটিশ ফৌজ। সেই ভয়ে জেনারেল স্লিম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেঙ্গুনের দিকে এগোতে চান।

'বোসকে জ্যান্ত অথবা মৃত অবস্থায় ধরবার জন্য বর্মায় আমাদের বিমানবাহিনীর একটা স্কোয়াড্রন আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে। কয়েকজন দুঃসাহসিক বৈমানিক রেঙ্গুনে ওর সদর দপ্তরেও বোমা ফেলে এসেছে। কিন্তু বোস ক্রমাগত জায়গা বদলাতে থাকায় তার খবর পাওয়া যাচ্ছে না।' জেনারেল স্লিম বললেন।

'জেনারেল স্লিম। যে করেই হোক এই সুভাষ বোসের মতো মারাত্মক ব্যামোটা থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে।' সাফ ফতোয়া দিলেন মাউন্টব্যাটেন।

৫

'প্রয়োজন হলে আমি নিজেই ফ্রন্টে যাব।' আক্ষরিকভাবেই নেতাজি নিজের কথা রেখেছেন। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষার্ধে তিনি এসে পৌঁছেছেন ম্যাকটিলার পাহাড়ে। সেখান থেকে দেখা যায় পোপা পাহাড়শ্রেণির কালচে সারি। পাহাড়ের মাথায় আগুনের ঝলকানি। ম্যাকটিলা থেকে পোপা পাহাড়ের মুখ্য ঘাঁটি প্রায় দু'ঘণ্টার পথ। সেখানে গিয়ে অগ্রবর্তী সৈন্যদলকে প্রেরণা যোগানোর সংকল্পে নেতাজি অটল।

সামরিক দৃষ্টিতে ম্যাকটিলার গুরুত্ব খুব বেশি। ম্যাকটিলা মান্দালয় থেকে রেঙ্গুন রেলপথের একটা গুরুত্বপূর্ণ জংশন স্টেশন। তা ছাড়া জাপানি ফৌজের অনেক প্রশাসনিক দপ্তর আর গুদামও রয়েছে সেখানে। ম্যাকটিলা থেকে অনেকগুলো রাস্তা বিভিন্ন জায়গায় গেছে। পশ্চিম চাকপাডাং, বগান ছাড়াও প্রোম হয়ে রেঙ্গুনে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে ম্যাকটিলায়। তা ছাড়া মান্দালয়, মেমিয়ো, মিচিনা যাবার রাস্তা, দক্ষিণদিকে জিয়াওয়াডি—পেগু হয়ে রেঙ্গুন যাবার একটা ঘোরা রাস্তাও রয়েছে। এইসব প্রধান প্রধান রাস্তা ছাড়াও রয়েছে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে থাইল্যান্ডে যাবার চোরাপথ। জাপানি বিমানবাহিনীর দুটি অস্থায়ী বিমানঘাঁটিও রয়েছে ম্যাকটিলায়।

রাতে সামরিক পোশাকে নেতাজি দাঁড়িয়ে রয়েছেন ম্যাকটিলার পাহাড়ে। একটু পরেই নেতাজির সহকারীদের মধ্যে ফিসফাস শুরু হল। 'মান্দালয়ের অজেয় পাহাড়ি ঘাঁটিও জাপানিদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

'অর্থাৎ মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে রয়েছে শত্রুর ফৌজ। যে-কোনও মুহূর্তেই ম্যাকটিলায় পৌঁছতে পারে তারা।' গম্ভীর স্বরে বললেন নেতাজি।

'নেতাজি, আপনি দয়া করে ফিরে যান।' মৃদু কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললেন শাহনওয়াজ।

'শানো, সামনে পোপা পাহাড়ে পৌঁছতেই হবে আমাকে।'

'নেতাজি, যুদ্ধের ব্যাপারটা আমরাই সামলাব। আপনাকে যে কথা আমরা দিয়েছি তার একটুও খেলাপ করব না। নেতাজি আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের চেয়ে আপনার জীবন বেশি দামি।'

'সেটা সম্ভব নয় শাহনওয়াজ।'

নেতাজির কথার ওপর কে কথা বলবে? জাপানি সেনাপতি তাকাশা-ও তাঁকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন। সম্প্রতি নেতাজিকে মাঝে মাঝে সাগ্রহে আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস পড়তে দেখা যাচ্ছে।

তাকাশা তাঁকে বললেন, 'চন্দ্রা বোসজি। জার্মানির কোমর ভেঙে গেছে। জাপানও দ্রুত পরাজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। সব শেষ হয়ে গেছে। এইবার দয়া করে পেছন ফিরুন।'

নেতাজি নির্বিকার। সামনে থেকে উড়ে আসা শত্রু বিমান তাঁকে বিচলিত করে না। আজকাল মুখ দিয়ে কোনও শক্ত কথাও বের হয় না তাঁর। শান্ত, দৃঢ় স্বরে সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'সামনের ওই পাহাড়ের সারি কী সুন্দর? ওখানেই মরতে চাই আমি।'

নেতাজির কথাতে শুধু তাঁর দেহরক্ষী ক্যাপ্টেন রাওয়াত, কর্নেল রাজুই নয় জাপানি সেনাপতি তাকাশার চোখ দুটোও জলে ভরে এল। দূরে শত্রু বিমানের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নেতাজি বলে চললেন, 'তোমরা আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস বোধহয় ভাল করে পড়নি। সংগ্রামের গোড়ার দিকে সমস্ত দেশভক্তকে মরতে হয়েছিল। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেল। সেইসব শহিদদের প্রেরণায় উঠে দাঁড়াল নতুন সংগ্রামী প্রজন্ম। ভবিষ্যতের জন্য আমাকেও আজ তাই শহিদ হতে হবে।'

শহিদ হবার জন্য নেতাজির দৃঢ় সংকল্পে সঙ্গীরা হতবাক। এমন সময় এক জাপানি ক্যাপ্টেন ঘোড়া ছুটিয়ে পৌঁছলেন সেখানে। রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'দুশমনদের ফৌজ চাওসে গ্রামের কাছে এসে গেছে। একটা ট্যাঙ্ক ব্রিগেড আর তার সঙ্গে কয়েক লরি পদাতিক বাহিনীর সৈন্য ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে এদিকে।'

'তার মানে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই দুশমন এখানে এসে পৌঁছবে। চন্দ্রা বোস এবার অন্তত তাড়াতাড়ি ফিরে চলুন।'

নেতাজি অটল। বললেন, 'দিল্লি নাই বা পৌঁছলাম—কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অমরত্বতে তো পৌঁছতে পারব।'

এইবার শাহনওয়াজের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। ক্ষুব্ধস্বরে তিনি বললেন, 'নেতাজি, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনার জীবনের ওপর এখন আর আপনার অধিকার নেই। আপনি আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর অমূল্য সম্পদ। আপনি এখন আপনার প্রাণ নিয়ে খেলা করতে পারেন না।'

'শানো, পোপা পাহাড়ে যাবার জন্য আমার যে সংকল্প সেটা থেকে আজ স্বয়ং ভগবানও আমাকে টলাতে পারবেন না।'

সংকল্পে দৃঢ় নেতাজিকে ফেরানো অসম্ভব। উলটোদিকে বাকি সবাই নেতাজিকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। এবার শুরু হল এক নাটক। মোটরগাড়িকে তৈরি হতে বলা হল। কিন্তু গাড়ি আর স্টার্ট নেয় না। ড্রাইভার গাড়ির হুড খুলে টর্চের আলোয় সারাবার চেষ্টা করছে। রওনা হবার আগে দুটো জরুরি চিঠি লিখে যেতে চান নেতাজি। কিন্তু ভাস্করনের টাইপরাইটারও বিগড়ালো। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। এবার রাগে আগুন হয়ে গেলেন নেতাজি। বললেন, 'এসব কী হচ্ছে শাহনওয়াজ। গাড়ি বিগড়োচ্ছে, টাইপ মেশিন বিগড়োচ্ছে! তোমরা কি ভেবেছ আমি কিছুই বুঝি না?'

এইবার নেতাজির পায়ের কাছে শাহনওয়াজ, ভাস্করন, রাওয়াত সবাই বসে পড়লেন। শাহনওয়াজ তো কেঁদেই ফেললেন। বললেন, 'নেতাজি আপনি কেন বুঝছেন না? আজ যদি শাহনওয়াজ মরে তবে আমাদের অবশিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে থেকেই একশো শাহনওয়াজ আপনি তৈরি করতে পারবেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগা দেশ আর একটা নেতাজি কোথায় পাবে? দেশের স্বাধীনতার জন্য শুধু নয় স্বাধীনতা পাবার পরে সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপনাকে যে কতটা প্রয়োজন সেটা কেন বুঝছেন না আপনি?'

সকাল হয়ে গেছে। এতক্ষণে নেতাজির মত পরিবর্তনে সহকারীরা সফল হলেন। এখন

অবশ্য আর রওনা হবার প্রশ্নই নেই। সারাদিন খড়ের গাদার আড়ালে, রানা প্রতাপের মতো তৃণশয্যায় কাটালেন নেতাজি। রাতে রেঙ্গুন থেকে জেনারেল কিয়ানির সংকেত এল। 'সামনে বিপদ। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন।' জাপানি কম্যান্ডারের কাছ থেকেও একইরকম খবর এল।

রাত্রি তো নয় যেন কালরাত্রি। ম্যাকটিলার চারপাশে যুদ্ধের আগুন। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গেল। মনে হল কোনও বারুদখানার বিস্ফোরণ। একটু পরেই এক জাপানি অফিসার এসে সেই ভয়ংকর খবরটা দিলেন, 'ম্যাকটিলার পতন হচ্ছে।'

পায়ের নীচে মাটিটা যেন দুলে উঠল সবার।

'একটু আগে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছেন আপনারা। শত্রুদের একটা ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছিল। আমাদের বাহাদুর সৈন্যরা ট্যাঙ্কটাকে রুখতে বদ্ধপরিকর হয়ে প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু তাদের কাছে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী গ্রেনেড-টেনেড কিছুই ছিল না। ছিল শুধু বিমান থেকে যেসব বোমা ফেলা হয় সেই বোমা। কয়েকজন দুঃসাহসী জাপানি আর আজাদি সেনা মিলে ট্যাঙ্ক আসার রাস্তায় একটা খাদ খুঁড়ে ফেলল তাড়াতাড়ি। তারপর সেই বোমাটা নিয়ে খাদের মধ্যে বসে রইল। ট্যাঙ্ক খাদের ওপরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা বোমাটির পিন খুলে দিল। ট্যাঙ্ক আর সেই বীরদের ছিন্নভিন্ন শরীরের টুকরোগুলো একইসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।'

বীরত্বের এই অপরূপ কাহিনি শুনে নেতাজি স্তব্ধ। দু'চোখে প্লাবন। এই অকল্পনীয় শৌর্য পরাজয়কেও করে তুলেছে পবিত্র, মহীয়ান।

'নেতাজি। তাড়াতাড়ি করুন। ম্যাকটিলাকে বেড় দিয়ে ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ি এগিয়ে আসছে। শিগগিরই রেঙ্গুনের রাস্তা বন্ধ করে দেবে তারা।' সহকারীরা সন্ত্রস্ত।

এবার সাফ বলে দিলেন শাহনওয়াজ। 'নেতাজি আমি এখন আর পোপা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি না। আমার প্রধান কাজ এখন আপনাকে নিরাপদে রেঙ্গুন পৌঁছে দেওয়া। রেঙ্গুনের রাস্তা এখন অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

আকাশে শত্রু বিমানের একাধিপত্য। মাটিতে গুপ্তচরদের জাল বিছানো। কখন মাথার ওপরে বোমা পড়বে ঠিক নেই। মোটরে বসলেন নেতাজি। দুই পকেটেই হাত বোমা। কোলের ওপর গুলিভরা বন্দুক। শাহনওয়াজের সঙ্গে পেছনের সিটে বসেছেন তিনি। শাহনওয়াজের পকেটে হাতবোমা, হাতে ব্রেনগান। ড্রাইভারের পাশে বসা ড. রাজুর কাছেও হাতবোমা। চাঁদনি রাত। শত্রুদের যাতে নজর না পড়ে সেইজন্য মোটরের হেডলাইট বন্ধ। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে কোনওমতে এগোচ্ছে গাড়ি। গাড়ির পাদানিতে দাঁড়ানো একজন জাপানি ক্যাপ্টেনের নির্দেশ অনুসারে গাড়ি চলছে।

জেনারেল স্লিমের বিশেষ আদেশ অনুসারে সুভাষ বোসকে শিকারি কুকুরের মতো খুঁজছে ব্রিটিশরা। 'জাপানের ক্রীড়নক, দেশদ্রোহী বোস বর্মার জঙ্গলেই কোথাও রয়েছে। তাকে যে কোনওভাবে—জীবিত অথবা মৃত খুঁজে বার করো।' চরেরা আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে, খুঁজছে বিমানবাহিনী।

কোনওমতে মাইল কুড়ি রাস্তা পেরোন গেল। সকালে ইন্ডো নামে একটা গ্রামের কাছে পৌঁছল গাড়ি। গ্রামের অর্ধেকটা বিমান আক্রমণে আগেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। নেতাজি বললেন, 'দিনের আলোতে গ্রামের মধ্যে আশ্রয় নিলে গ্রামের মানুষ বিপদে পড়বে।' গ্রাম থেকে দূরে একটা মনসা গাছের জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন সবাই। সেখানে পৌঁছবার পর পাঁচ-দশ মিনিটও কাটেনি। গ্রামের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু হল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল গ্রামটা।

ফৌজি ওভারকোটটা মাটিতে বিছিয়ে শুধু গেঞ্জি গায়ে বসলেন নেতাজি। হাতে তাঁর

আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস। অন্ধকার হওয়ার আগে রওনা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ফাঁকা জায়গাতেই আগুন জ্বালিয়ে ভাত রাঁধলেন রাজু। বিনা ব্যঞ্জনে সেই ভাতই খেলেন সবাই। নেতাজি খেলেন ভাতের মণ্ড। খাবার সময়েই দুজন বর্মি পথিক তাঁদের কাছে এসে পড়ল। তাদের চোখে গভীর সন্দেহ। তারা চলে যাবার পর রাজু বললেন, 'গতিক ভাল মনে হচ্ছে না। এ জায়গা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে যাওয়াই ভাল।'

নেতাজি হাসলেন। বললেন, 'লুকোচুরি খেলাটা ভাল জমেছে। মৃত্যু আমাকে খুঁজছে আর আমি মৃত্যুকে।'

সমস্ত আকাশই যেন বিরূপ হয়ে উঠেছে। কর্নেল রাজু আর শাহনওয়াজ তাড়াতাড়ি ট্রেঞ্চ খুঁড়লেন। সবাই গাছের আড়ালে বা ট্রেঞ্চে গা ঢেকে বসলেন। একটু পরে কয়েকটা বিমান জঙ্গলের ওপরেও উড়ে এল। হয় বিমান থেকে কিছু দেখা গেছে আর নয়তো কেউ খবর দিয়েছে বলেই মনে হল। বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলি বর্ষণ করে বিমানগুলো ফিরে গেল। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিশোধের উন্মত্ত আক্রোশে শত্রু এখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। সেইদিনই ব্রিটিশ বিমান ম্যাকটিলায় আজাদ হিন্দ ফৌজের হাসপাতালের ওপরে বোমা ফেলল। প্রাণ হারাল প্রায় এক হাজার আহত সৈনিক। আধপোড়া অবস্থায় যারা বেঁচে রইল তারা তাদের শেষ করে দেওয়ার জন্যে সঙ্গীদের কাতর মিনতি জানাতে লাগল। দুঃখে, ক্ষোভে নেতাজি অস্থির হয়ে উঠলেন।

রাতে পিমিনাতে নেতাজি রয়েছেন। এমন সময় রেঙ্গুনে কাওয়াবের কাছ থেকে জাপানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের খবর এল—'এরপর বর্মাতে লড়াই চালানো জাপানের পক্ষে আর সম্ভব নয়।' খবরটা পেয়ে সবাই স্তম্ভিত।

চিনেবাদাম আর ছোলা খেয়ে রাত কাটালেন সবাই। 'নেতাজির মুখে ভাতের মণ্ডটুকুও তুলে দিতে পারেননি'—এই দুঃখটাই সহকারীদের কুরে কুরে খাচ্ছে। নেতাজি অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবছেন। মাঝরাতে সবাইকে ডাকলেন তিনি। বললেন, 'এখন রেঙ্গুনে যাওয়ার আর কী সার্থকতা আছে? পোপা পাহাড়ে ধিল্লোঁ আর সেহগল লড়ছে। এদিকে কর্নেল ঠাকুর সিং-এর দলটা রয়েছে। তাকে ডেকে পাঠিয়ে তার নেতৃত্বে বাছাই করা সৈন্যদের নিয়ে আমরা একটা এক্স-রেজিমেন্ট গড়ে তুলব।'

'তাতে কী হবে?' শাহনওয়াজ জানতে চাইলেন।

'হয়তো এটাই হবে আমাদের শেষ লড়াই। এই শেষ লড়াইয়ে আমি নিজেও অংশ নিতে চাই।'

সবাই নিস্তব্ধ। শেষ পর্যন্ত নেতাজির আদেশ মেনে নেওয়াই ঠিক হল।

রাত তখন প্রায় আড়াইটে। হঠাৎ ক্যাপ্টেন শিন্দে আর অন্য কয়েকজন সৈন্য এসে পৌঁছল সেখানে। পোপা পাহাড় থেকে আসছে তারা। সবাই উঠে বসলেন ধড়মড় করে। উদ্বিগ্ন নেতাজি পোপার পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন তাদের কাছে।

'নেতাজি, আমার দুর্ভাগ্য যে এই সাংঘাতিক খবরটা পৌঁছনোর ভার পড়েছে আমারই কপালে।' অনেক কষ্টে, অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে ক্যাপ্টেন বললেন, 'নেতাজি আমাদের বাহিনীর চারজন মেজর আর একজন লেফটেন্যান্ট পালিয়ে গিয়ে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে।'

'জাপান পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' এ খবরটাও এত আঘাত করেনি নেতাজিকে। কিন্তু মেজর রিয়াজ, মেজর ম্যাডান, মেজর সারোয়ার, মেজর দে আর লেফটেন্যান্ট মহম্মদ বক্স-এর বেইমানি বজ্রাঘাতের মতো এল তাঁর কাছে। লজ্জায়, দুঃখে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে তাঁর।

একটু সামলে উঠে ক্যাপ্টেন রাওয়াতকে ডেকে নির্দেশ দিলেন তিনি, 'যেখানে যেখানে সৈন্যরা লড়াই করছে প্রত্যেক জায়গায় নির্দেশ পাঠাও। যারা যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক তারা যে কোনও সময়ে পশ্চাদপসরণ করতে পারে। সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া রইল তাদের। কিন্তু কেউ বেইমানি করছে বুঝতে পারলেই তাকে গুলি করা হবে।'

শাহনওয়াজ বোঝাতে চেষ্টা করলেন নেতাজিকে। 'এত অস্থির কেন হচ্ছেন আপনি। ত্রিশ-চল্লিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে শ'-দেড়শো বদলোক তো থাকতেই পারে। তার জন্য অন্যদের নিষ্ঠা তো আর মিথ্যে হয়ে যাবে না।

শাহনওয়াজ পোপা পাহাড়ের পথে রওনা হয়ে গেলেন। বর্মার বিভিন্ন অঞ্চল মিত্রশক্তির গোলাবর্ষণে এত সন্ত্রস্ত যে দিনের বেলায় ইঁদুর-বেড়ালও রাস্তায় বেরোতে ভয় পায়। নেতাজির গাড়ি তাই রাত্রেই চলে রেঙ্গুনের পথে। ভালভাবে খাওয়া নেই, ঘুম নেই—এই দুঃসহ যাত্রা শরীরের সমস্ত শক্তি নিংড়ে নিতে চায়। তবু উৎসাহের কমতি নেই নেতাজির। চলার পথে যেসব ভারতীয় বসতি পড়ছে সেখানে স্বাধীনতার বার্তা শোনান তিনি।

জিয়াওয়াডির ভারতীয় শুভার্থীরা রাতে রওনা হতে দিলেন না তাঁকে। তা ছাড়া শত্রুদের কিছু কিছু পেট্রল পার্টি এদিকেও এসে পড়েছে বলে জানা গেল। তাই নেতাজি এবার বর্মি কৃষকের ছদ্মবেশ নিয়ে গোরুর গাড়িতে চললেন। অবশ্য ছইয়ের ভেতরে রয়েছে তাঁর টমিগান আর হাতবোমা। সঙ্গীরাও বিভিন্ন ছদ্মবেশে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তাঁর। তাঁর গাড়িটা আসছে অনেকটা পেছনে পেছনে। গাড়িতে রয়েছেন এক জাপানি অফিসার। পথেই কয়েকবার বোমার সম্মুখীন হতে হল তবে সৌভাগ্য যে সেগুলো এড়াতে পারলেন সবাই।

সামনের একটা জঙ্গলে জাপানি মোটরবাহিনীর একটা ঘাঁটি ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক নম্বর ডিভিশনও ঘাঁটি গেড়েছে সেখানে। ইম্ফল-কোহিমার লড়াইয়ে জখম হওয়া অনেক সৈন্যের চিকিৎসাও করা হচ্ছে সেখানে। জেনারেল কিয়ানির সঙ্গে দেখা হতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন নেতাজি। নেতাজির শরীরের অবস্থা দেখে কিয়ানি যাকে বলে একেবারে স্তম্ভিত। বেশ কিছুদিন পরে টাটকা ভাত জুটল নেতাজির।

সার্জেন্ট মেজর কিতানো নেতাজির দেখাশোনা করছেন। নেতাজির ইচ্ছে এখানে থেকে একটা শেষ লড়াই করা। কিয়ানি ভেবে পাচ্ছেন না কী করবেন। শেষে কিতানো অনেক করে বোঝালেন। 'এখানে এই ছোট্ট লড়াই আপনার জন্য নয় নেতাজি। ভুলে যাবেন না আপনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সুপ্রিম কম্যান্ডার আর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক। তাড়াতাড়ি রেঙ্গুন পৌঁছে এর থেকে অনেক বড় লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে হবে আপনাকে।'

সেই রাতেই রেঙ্গুন থেকে চিফ অফ জেনারেল স্টাফ কিমুরার কাছ থেকে খবর এল, 'শিগগির চলে আসুন।' গায়ে জ্বর। তাই নিয়েই রওনা হলেন নেতাজি।

কালেওয়ার হাসপাতালে আজাদ হিন্দ ফৌজের আহত, রোগাক্রান্ত সৈনিকদের দেখতে এলেন নেতাজি। সঙ্গে আছেন কর্নেল লক্ষ্মী, ইয়েলাপ্পা, আরও অনেকে। নেতাজির উপস্থিতিতে অসুস্থ সৈনিকদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'জয় হিন্দ' বলে নেতাজিকে অভিবাদন জানায় তারা।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতেই মেজর মেহবুব তাঁর কাছে একটা গোপন চিঠি নিয়ে এলেন। চিঠিটা পড়ে সবাইকে সম্বোধন করে নেতাজি বললেন, 'সাউথ ইস্ট কম্যান্ডের সুপ্রিম

কম্যান্ডার মাউন্টব্যাটেন ফতোয়া জারি করেছেন। আদেশ দিয়েছেন আমাকে যে-কোনও উপায়ে, জীবিত অথবা মৃত ধরতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ বিমানও বেরিয়ে পড়েছে আমাকে খুঁজতে। কিন্তু আমি পরোয়া করি না। আপনাদের আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি সুভাষ বোসকে মারতে পারে এরকম গুলি বা বোমা ব্রিটিশ আজও তৈরি করতে পারেনি।'

কর্নেল লক্ষ্মী আর থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন, 'ব্রিটিশ এখন আর আন্তর্জাতিক আইন বা রীতিনীতির কোনও পরোয়াই করছে না। ওরা নিজেরাই বলে শত্রুর দেশেও ঐতিহাসিক স্মারক আর হাসপাতালের কোনও ক্ষতি করা অন্যায়। অথচ মেমিয়োর হাসপাতালের ওপর তাদের নির্মম গোলাবর্ষণ, অসহায় রোগীদের করুণ আর্তনাদ আজও আমার কানে বাজছে।'

'ব্রিটিশদের নৃশংসতার নির্মম নিদর্শন দেখা গেছে জিয়াওয়াডিতে। ২৩ জানুয়ারি জিয়াওয়াডির চিনির কারখানার বয়লারের ওপর বোমা ফেলেছে তারা। পাঁচ-ছ'শো শ্রমিক পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।' ইয়েলাপ্পা বললেন।

কালেওয়ার সামরিক হাসপাতাল দেখে নেতাজি অভিভূত। ইয়েলাপ্পাকে বললেন তিনি সেকথা। 'যখন ভাবছি কী প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যে তোমরা একটু একটু করে জিনিসপত্র জোগাড় করে এই হাসপাতাল গড়ে তুলেছ তখন আমার গাঁধী রেজিমেন্টের ডাক্তার আকবর আলির কথা মনে আসছে। পশ্চাদপসরণের সময় পথেই শেষ নিশ্বাস পড়েছে তাঁর। খুঁজলেও সেই জায়গাটা আর পাওয়া যাবে না।'

'নেতাজি, আপনার জন্য কোটি কোটি টাকা হাসিমুখে যেসব ব্যবসায়ী দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই ইম্ফলের পাহাড়ি জঙ্গলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগের সেই পবিত্র জায়গাগুলোই বা কে দেখাবে?'

'কুবেরজি, ইম্ফলের রাস্তা তৈরি হয়েছে দশ হাজার জানা-অজানা আজাদি সৈনিকের স্বেদ-অশ্রু-রক্ত আর আত্মত্যাগে। তাদের অন্তিম কাজের সময়েও না ছিল কোনও মন্ত্র, না ছিল কোনও অনুষ্ঠান। কিন্তু ভবিষ্যতের তরুণদের একথা জানাতেই হবে আমাদের। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঙ্গাপুরে এদের স্মৃতির উদ্দেশে একটা দীপস্তম্ভ তৈরি করুন।' নেতাজি বললেন।

'আপনার আদেশের অন্যথা হবে না নেতাজি। এই হাসপাতালের কাজ থেকে একটু ফুরসত পেলেই আমি রেঙ্গুনে আসব।' ইয়েলাপ্পা প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পরের দিন মান্দালয়ের পথে রেঙ্গুন যাবার জন্য রওনা হবেন নেতাজি। তাঁকে রক্ষা করার ভার নিয়েছে 'জানবাজ' দল। গাড়িতে বসেও হঠাৎ লক্ষ্মীর দিকে আবার নজর পড়ল নেতাজির। গাড়ি থামিয়ে নেমে এলেন তিনি। লক্ষ্মীকে একটু দূরে নিয়ে গেলেন নেতাজি। একান্তে বললেন, 'লক্ষ্মী। বাকি সব মেয়েদের তো রেঙ্গুনে পাঠিয়েছি। তোমার জন্য বড্ড চিন্তা হয় আমার। আমার সঙ্গে তুমিও রেঙ্গুন চলো না কেন?'

নেতাজির গলায় লক্ষ্মী যেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া বাবার আওয়াজ শুনতে পান। তবু চোখ তুলে বলেন, 'নেতাজি। আমি আসলে ডাক্তার তো? এই হাসপাতালের যে আমাকে বড় প্রয়োজন। এইসব অসহায়দের ছেড়ে কোথায় যাব আমি?'

নেতাজি বুঝলেন। লক্ষ্মীর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।' গাড়ি রওনা হল।

হাসপাতালের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন ইয়েলাপ্পা। অর্থের প্রচণ্ড অভাব। যেখান

থেকে পারছেন সেখান থেকেই অর্থ সংগ্রহ করছেন ইয়েলাপ্পা। দু-তিন বছর আগেও তিনি যে সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে পসারওয়ালা উকিল ছিলেন সে কথাটা প্রায় ভুলেই গেছেন ইয়েলাপ্পা। সবসময় নেতাজি আর নেতাজির কাজের চিন্তা তাঁর। একদিন সকালে ইয়েলাপ্পা লক্ষ্মীকে বললেন, 'লক্ষ্মী। এখানকার কাজ একটু সামলে নিয়েই আমাকে নেতাজির কাছে যেতে হবে। তাঁর জন্য বড় চিন্তা হচ্ছে আমার। আসলে তাঁকে বুঝতে পারে এমন লোক কাছে থাকা খুব দরকার এখন।'

লক্ষ্মী হেসে ফেললেন কথাটা শুনে। বললেন, 'আচ্ছা ইয়েলাপ্পা সাহেব। বহুদিন আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও তো দেখা হয়নি আপনার। তাঁর কথা কি কখনও মনে পড়ে?'

কুণ্ঠিত ইয়েলাপ্পাকে কবুল করতে হল। 'আগে আগে মনে পড়ত। এখন কখনও কখনও ভুলেই যাই যে আমি বিবাহিত।'

পরের দিনই খবর পাওয়া গেল ম্যাকটিলায় শত্রু পৌঁছে গেছে। ইয়েলাপ্পা খুব চিন্তায় আছেন। নেতাজি নিরাপদে পৌঁছতে পারবেন তো?'

২ মার্চ কালেওয়ার ওপর বিমান আক্রমণ শুরু হল। হাসপাতালটা জঙ্গলের মধ্যে। সেখান থেকে লক্ষ্মী দেখতে পেলেন কালেওয়ার বাজার এলাকায় বোমা পড়ল। প্রাণ উড়ে গেল লক্ষ্মীর। ইয়েলাপ্পা তো ওখানেই থাকেন। লক্ষ্মী দৌড়লেন সেদিকে।

লক্ষ্মীর আশঙ্কা সত্যি। ইয়েলাপ্পার বাড়ির কাছেই বোমা পড়েছে। আগুন জ্বলছে এলাকা জুড়ে। হঠাৎ লক্ষ্মী দেখলেন আগুনের মধ্যে থেকে আহত ইয়েলাপ্পা কোনওমতে বেরিয়ে আসছেন। লক্ষ্মীর ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল।

ইয়েলাপ্পার পায়ে বোমার টুকরো ঢুকে গেছে। অন্যান্য জখম তত মারাত্মক না হলেও পায়ের হাড় ভেঙে গেছে। তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে ইয়েলাপ্পাকে হাসপাতালে নিয়ে এলেন লক্ষ্মী।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস। ইয়েলাপ্পা নেতাজির আদরের 'কুবের'। আজ সেই কুবেরের চিকিৎসার জন্য না আছে উপযুক্ত ব্যবস্থা, না আছে ওষুধ। এক্স-রে পর্যন্ত নেই। কোনওমতে শুধু ব্যান্ডেজটুকুই করতে পারলেন লক্ষ্মী।

কালেওয়ার হাসপাতাল এখন শত্রুদের নাগালে। এখানে আর বেশিদিন থাকা মানেই বিপদ ডেকে আনা। ডাক্তার ব্যানার্জি হাসপাতালের কর্তা। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে রোগীদের সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন লক্ষ্মী। কয়েকটা বলদ-গাড়ি আর দুটো জাপানি ট্রাকের ব্যবস্থা করা গেল। তাতেই রোগীদের সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হল।

রাস্তাতেই ইয়েলাপ্পার পায়ের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠল। মনে হচ্ছে ভেতরে পচন ধরেছে। একটু নাড়াচাড়া লাগলেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে তাঁর। সঙ্গী ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন লক্ষ্মী।

'লক্ষ্মী, ইয়েলাপ্পা সাহেবের পায়ের হাড় অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে মনে হচ্ছে।' তাঁদের একজন বললেন। 'এ অবস্থায় রেঙ্গুন পর্যন্ত তাকে যে কী করে নিয়ে যাওয়া যাবে সেটাই তো বুঝতে পারছি না। অথচ এক ইয়েলাপ্পার জন্য এতগুলো রোগীর জীবনের ঝুঁকি নেওয়াটাও তো ঠিক হবে না।'

কথাটার যুক্তি অস্বীকার করতে পারেন না লক্ষ্মী। কালেওয়ার থেকে রেঙ্গুন আট-ন'শো মাইল রাস্তা। সম্প্রতি খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এই রাস্তা। স্থির হল সঙ্গী ডাক্তাররা বাকি সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাবেন। ইয়েলাপ্পাকে নিয়ে লক্ষ্মী পেছনে পেছনে আসবেন। লক্ষ্মীর সঙ্গে আট-দশজন সৈন্যের একটা দল থাকবে।

ইম্ফল থেকে মেমিয়োর পরে এটা আজাদ হিন্দ ফৌজের পশ্চাদপসরণের দ্বিতীয় পর্যায়। লক্ষ্মী জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে চলাই ভাল মনে করলেন। এক রাতে ইয়াংস্চে গ্রামে ছিলেন তাঁরা। তাঁদের কাছে রেডিয়োও ছিল না। বাইরের কোনও খবরই পাননি তাঁরা।

ইয়াংস্চেতে লক্ষ্মী বুঝলেন গ্রামবাসীরা আর মোটেই খুশি নয় তাঁদের ওপর। তারা বুঝে গেছে যে আজাদি ফৌজকে আশ্রয় দেওয়া মানেই মাথার ওপর বিপদ ডেকে আনা। যে-কোনও সময়ে তারাও আক্রমণ করতে পারে। ইয়েলাপ্পা নেতাজির এক বিরাট সহায়। যে-কোনও মূল্যে তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব লক্ষ্মীর। এক রাতে একটা ট্রাক এসে পৌঁছল তাঁদের কাছে। ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে এলেন মেজর বাওয়া। 'লক্ষ্মী, তোমাদের তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার জন্য নেতাজি আমাকে পাঠিয়েছেন।' বললেন তিনি।

'কিন্তু ইয়েলাপ্পা সাহেবের এ অবস্থায়—'

'লক্ষ্মী, শত্রুসৈন্যেরা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। নেতাজিও রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পেট্রলও ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে।'

'সময় থাকতে পেট্রল জমা করার ব্যবস্থা করার জন্য আমি রাঘবন সাহেবকে বলেছিলাম। তার কী করেছেন তিনি?' এই অবস্থাতেও ক্লান্তস্বরে বললেন ইয়েলাপ্পা।

মেজর বাওয়া সঙ্গে করে কিছু ব্যান্ডেজ, মলম ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলোতে ইয়েলাপ্পা খানিকটা আরাম পেলেন। পরের দুদিনে তাঙ্গাই পর্যন্ত পৌঁছলেন তাঁরা।

বর্মার সর্বত্র অন্নাভাব। চার বছর ধরে যুদ্ধের ফলে ফসল হয়নি। বর্মি চাষিরা জঙ্গলের ইঁদুর মেরে খেয়ে কোনওমতে বাঁচার চেষ্টা করছে। বাচ্চাদের জন্য বাঁচিয়ে রাখা খাদ্যশস্য-ও লুট হয়ে যাচ্ছে। চিন সীমান্ত থেকে ফিরে আসা জাপানি সৈন্যরা-ও গ্রামে ঢুকে ফসল ছিনিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে প্রতি হিংসায় উন্মত্ত ব্রিটিশ বিমান পাহাড়-জঙ্গল তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

পথে জাপানিদের কয়েকটা দলের সঙ্গে দেখা হল। তাদের সঙ্গেই এগিয়ে চলল লক্ষ্মীর দল। ট্রাকের আওয়াজে ইয়েলাপ্পার কোঁকানি চাপা পড়ছে বটে তবে তাঁর অবস্থা প্রতি মুহূর্তেই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

রাতেই পথ চলতে হয়। হঠাৎ একদিন খবর পৌঁছল। বার্তাবাহক জানাল, সোজা রাস্তায় গেলে সামনে বিপদ। রাস্তায় তাঙ্গু বলে গ্রামটা আর দু-একদিনের মধ্যেই ব্রিটিশের দখলে যাবে। এ পথে গেলে নিশ্চিত শত্রুর খপ্পরে পড়তে হবে।

জাপানি ক্যাপ্টেন, লক্ষ্মী আর বাওয়াকে বললেন, 'তোমরা আর ঝুঁকি নিয়ো না। আমরা এবার ট্রাক ফেলে রেখে জঙ্গলের রাস্তায় সালুয়িন নদী ধরে চলব।'

ট্রাকের মধ্যে শুয়ে থাকা ইয়েলাপ্পার দিকে তাকালেন লক্ষ্মী। জাপানিদের সঙ্গে যাওয়া মানে ইয়েলাপ্পাকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া। লক্ষ্মী কী করে করবেন সেটা। জাপানিদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তিনি। শত্রুসৈন্যদের হাতে যাতে না পড়ে সে জন্য নিজেদের ট্রাকগুলো পুড়িয়ে দিল জাপানিরা। তারপর জঙ্গলের ঘুরপথে এগিয়ে গেল তারা।

লক্ষ্মীর দলও এবার মূল রাস্তা ছেড়ে দিল। পথে একটা ছোট্ট গ্রাম। সকালে বোঝা গেল এটা কারেনের জঙ্গলের অংশ। এই অঞ্চলে অনেক গোর্খা আছে। বর্মায় প্রথম যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ফৌজ হিসাবে এসেছিল তারা। তারপর এখানেই থেকে গেছে। কয়েক পুরুষ ধরে ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য তাদের রক্তে। জাপানিদের দেখলেই তাদের খতম করার চেষ্টা করে কারেনের এই বাসিন্দারা। তা ছাড়া খবর পাওয়া গেল ছ' দিন আগে কয়েকজন ব্রিটিশ সৈন্য প্যারাশুটের সাহায্যে নেমেছে এ অঞ্চলে।

ইয়েলাপ্পা বুঝলেন সবার অবস্থা। ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'কামান যতই বড় হোক, অকেজো হয়ে যাবার পরে তার জন্য চোখের জল ফেলে লাভ কি? আমার তো সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে। আমার জন্য তোমরা আর নিজেদের ওপর বিপদ ডেকে এনো না। আমার চাইতে তোমাদের দরকার আজ অনেক বেশি।'

'ইয়েলাপ্পা সাহেব, আপনি কি ভুলে গেছেন যে আমরা ভারতীয়। শুধু ঘরের মানুষরাই নয়, ঘরের পোষা পশু-পাখিদেরও আমরা আপন করে নিই। তা ছাড়া আপনি তো আমাদের অভিভাবক। আপনাকে ফেলে কী করে যাব আমরা?' লক্ষ্মী বললেন।

মাওচির সাময়িক আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন সবাই। সঙ্গের দুটি বর্মি কিশোরকে পাঠানো হল রাস্তার খবর নিতে। পাহাড়ের নীচের একটা গ্রামের মুখিয়া এদের আশ্রয় দিতে রাজি হলেন। বর্ষা শুরু হয়েছে। ইয়েলাপ্পার অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে চলেছে। ঘা পেকে দগদগে হয়ে উঠেছে। খুব জ্বর আসছে রোজ। এভাবে বসে থেকেই বা কী লাভ। মেজর বাওয়ার ডাক্তারি সত্তা অধীর করে তুলেছে তাঁকে। দু-দুজন ডাক্তারের অসহায় চোখের সামনে এমনিভাবে এরকম একটা লোক শেষ হয়ে যাবে?

বর্মি কিশোরদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে একটু দূরে একটা পাহাড়ি জায়গায় ব্রিটিশদের ছাউনি পড়েছে। হেঁটে গেলে দিন দুই লাগে সেখানে যেতে। মেজর বাওয়া লক্ষ্মীকে বললেন, 'এরকম চুপ করে বসে থেকে কিছু হবে না। আমি চললাম। যদি শত্রুর স্মরণ নিতে হয় সেও ভাল। যেভাবেই পারি ওষুধ এনে আজাদ হিন্দ ফৌজের এই কুবেরকে বাঁচাতেই হবে।'

মেজর বাওয়া রওনা হয়ে গেলেন। চিন থেকে ফিরে আসা জাপানি সৈন্যরা যেখানে সেখানে হিংস্র নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে খাবারের জন্য। সাহসী গোর্খারা পর্যন্ত তাদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করল। আজাদি সেনাদের ছায়া মাড়াতেও রাজি নয় তারা। কাছে খাবার-দাবার যা ছিল শেষ হয়ে আসছে। উপায়ান্তর না দেখে সাথিদের ব্রিটিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বললেন লক্ষ্মী। খাবার মুখ অন্তত কয়েকটা তো কমবে!

ওদিকে জ্বরে বেহুঁশ ইয়েলাপ্পা সমানে ভুল বকে চলেছেন। 'নেতাজি আর কতক্ষণ কাজ করবেন? দু' গ্রাস মুখে দিয়ে নিন না। খাবার যে ঠান্ডা হয়ে গেল। ওরে, নেতাজির যাবার সব ব্যবস্থা হয়েছে? নেতাজি, চলুন, আজ আপনাকে দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে তুলাদান ব্রত করবে সবাই। এক পাল্লায় আপনি আর এক পাল্লায় মেয়েদের গয়না, টাকা, পয়সা এইসব। না না, ওসব মন্ত্রিত্ব-টন্ত্রিত্ব আমার দ্বারা হবে না। আমি শুধু আপনার সেবা করব।'

একদিন রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্মীর ঘুম আসেনি। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখলেন সূর্য অনেকটা উঠে এসেছে। ঘরের দরজা ভাঙা। দুজন জাপানি সৈন্য সঙিন উঁচিয়ে ধরে আছে তাঁর ওপর। বর্মি কিশোর দুটির চিৎকার শোনা যাচ্ছে—'আরে বলছি তো আমরা ব্রিটিশের গুপ্তচর নই। আমরা চন্দ্রা বোসের লোক—আজাদ হিন্দ ফৌজ। কী আশ্চর্য—নাম শোনোনি তোমরা চন্দ্রা বোসের?' জাপানিদের ওপর এসব কথা বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়ছে না। এরা চিন সীমান্তে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল। চন্দ্রা বোসের নামও শোনেনি। 'শিগগির তৈরি হয়ে নাও।' জাপানিরা বলে উঠল।

লক্ষ্মী উঠলেন। পাশের ঝুপড়িতে গিয়ে সামরিক পোশাক পরে নিলেন তিনি। মাথায় টুপিটা ঠিক করে পরে নিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি।

এবার পাঁচজনের পিঠে সঙিন ঠেকিয়ে তাদের বাইরে এনে দুটো গাছের গুঁড়িতে বেঁধে

ফেলল জাপানিরা। লক্ষ্মী বুঝলেন চেঁচিয়ে বা মিনতি করে কোনও ফল নেই। ভাষার ব্যবধান তো রয়েছেই।

জাপানিরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হল কারও অপেক্ষা করছে তারা। এমন সময় একটি অল্পবয়সি জাপানি অফিসার এসে পৌঁছল সেখানে। তার হাতে একটা জাপানি সাময়িকী। সেটা দেখতে দেখতেই এগিয়ে আসছে সে। বেশ বোঝা গেল এই অফিসারটির জন্যই অপেক্ষা করছে সবাই। সে এসে হুকুম দিলেই সব শেষ।

লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু চমকে উঠল অফিসারটি। একবার লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকায় আর একবার সাময়িকীর পাতার দিকে। তারপর একসময় লক্ষ্মীর কাছে এগিয়ে এসে সাময়িকীর একটা পাতায় একটা ছবির দিকে ইশারা করল ছেলেটি। এবার অবাক হবার পালা লক্ষ্মীর। কী আশ্চর্য! এটা তো তারই ছবি। সিঙ্গাপুরে ঝাঁসির রানি বাহিনীর প্রতিষ্ঠার সময় জাপানি পত্র-পত্রিকায় তার সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছিল। এটা সেই সময়েরই একটা সাময়িকী।

এবার জাপানি অফিসারটি হাসল। নিজের হাতে বাঁধন কেটে দিল সবার। উপরন্তু কয়েকটা বিস্কুট বার করে খেতে দিল সবাইকে। লক্ষ্মী ওষুধপত্রের কথা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু জাপানিদের কাছেও ওষুধপত্র কিছু নেই। অফিসারটি বলল, 'আমরা উত্তর বর্মা থেকে আসছি। আমাদের মতো আরও অনেক আসছে সেখান থেকে। বারবার ভাগ্য তোমাদের সহায়তা করবে না। শিগগির চলে যাও এখান থেকে।' লক্ষ্মী তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। অফিসারটি বিদায় নিলেন তাঁর কাছ থেকে।

সত্যিই জায়গাটা শিগগিরই ছাড়া দরকার। একজন বলল যে খাদের ওপারে একটা গ্রাম এখনও সুরক্ষিত আছে। ইয়েলাপ্পার অচেতন উত্তপ্ত শরীরে হাত বোলালেন লক্ষ্মী। এক ডোজ আফিং খাওয়ালেন তাঁকে। তারপর বর্মি কিশোর দুটির ওপর তাঁর দেখাশোনার ভার দিয়ে নিজে বেরোলেন গ্রামটির সন্ধানে।

ছ-সাত ঘণ্টা চলার পর জঙ্গলের ঘেরা গ্রামটি পাওয়া গেল। আঁধার ঘনিয়ে আসছে। গ্রামে আশ্রয় চাইলেন লক্ষ্মী। কিন্তু তাঁকে দেখেই দূরে পালাচ্ছে গ্রামবাসী। গ্রামের মধ্যে একটা প্যাগোডা। সেখানেও আশ্রয় পাওয়া গেল না। শেষে একটা বাঁশের 'ভাসা' খুঁজে পেলেন লক্ষ্মী। 'ভাসা'টাকে একটু পরিষ্কার করে নিতে লাগলেন লক্ষ্মী। এমন সময় ঝুপড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তিনজন ব্রিটিশ আর একজন গোর্খা সৈন্য। বন্দি হলেন লক্ষ্মী।

সকালে লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল ব্রিটিশ সৈনিকেরা। অনেক করে লক্ষ্মী তাদের মিনতি করতে লাগলেন। ইয়েলাপ্পার কথা বললেন তাদের। 'আমরা নিজেরাই স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে যাব তাঁকে। শুধু তাঁকে নিয়ে আসতে দিন আমাদের।'

'আমাদের ছাউনি অনেকটা ওপরে। সুস্থ মানুষের পক্ষেই পাহাড়ে চড়া বেশ মুশকিল। স্ট্রেচার নিয়ে ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবু চলুন। আমাদের কর্নেলকে গিয়ে বলছি। তিনি কিছু একটা হয়তো করবেন।' লক্ষ্মীর সব মিনতি ব্যর্থ হল।

লক্ষ্মীকে নেতাজির মহিলা বাহিনীর অধিনায়িকা হিসাবে চিনে ফেলেছে সৈন্যরা। এরকম একটা শিকারকে একটুও চোখের আড়াল করতে রাজি নয় তারা। পাহাড়ে চড়তে চড়তে ইয়েলাপ্পার কথাই ভেবে চলেছেন লক্ষ্মী। দুদিন ধরে পাহাড় চড়া চলল। তারপর সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের মাথায় ছাউনিতে পৌঁছল সবাই। ছ-সাতশো সৈন্যের এই ঘাঁটির ভার রয়েছে কর্নেল পিককের ওপরে। লক্ষ্মীকে চিনতে পেরে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করলেন তিনি।

পরের দিন মেজর বাওয়ারও দেখা মিলল সেখানে। দুজনে মিলে কর্নেল পিককে মিনতি

করে বললেন, 'আমাদের আটকে রাখুন। কিন্তু অন্তত অন্য কাউকে পাঠিয়ে আমাদের ইয়েলাপ্পা সাহেবকে বাঁচান দয়া করে।'

'আমার কোনও উপায় নেই। আমি এ ব্যাপারে আপনাদের কোনও সাহায্যই করতে পারব না।' কর্নেলের এক কথা।

লক্ষ্মী অস্থির। কখনও কখনও তাঁর মনে হয় অস্থির নেতাজি তাঁর সামনে এসে প্রশ্ন করছেন, 'লক্ষ্মী আমার কুবেরকে একলা কোন জঙ্গলে ফেলে এলে?' কী হল ইয়েলাপ্পার।

মাসখানেক পরে ছাউনিটাকে তাঙ্গাইতে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ওপর থেকে হুকুম এল। সবাইকে পাহাড় থেকে নামতে বলা হল। উতরাইয়ের পথে লক্ষ্মী হঠাৎ একজন বর্মিকে দেখে চিনতে পারলেন। যেখানে ইয়েলাপ্পাকে রাখা হয়েছিল তার কাছেই ছিল বর্মিটির 'ভাসা'। তাকে জিজ্ঞেস করে লক্ষ্মী সব জানতে পারলেন।

লক্ষ্মী সে জায়গাটা ছেড়ে আসার পর গ্রামের লোকেরা অনেকেই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। ইয়েলাপ্পা সেই ঝুপড়িতেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। একটি বর্মি ছেলে শেষ পর্যন্ত তাঁর সেবা করছিল। একদিন রান্না করার জন্য আগুন জ্বালিয়েছিল ছেলেটি। দূর থেকে কিছু কারেন সৈন্য ঝুপড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখে ভাবে যে জাপানিরা আশ্রয় নিয়েছে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গেই হাতবোমা ছোড়ে তারা। আগুন লেগে যায় ঝুপড়িতে। বর্মি ছেলেটি বেরিয়ে এসে তাদের অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয় না। নিরুপায় ছেলেটি তখন দৌড়ে ভেতরে গিয়ে ইয়েলাপ্পাকে পাঁজাকোলা করে বাইরে আনার চেষ্টা করে। এমন সময় জ্বলন্ত ঝুপড়িটা ভেঙে পড়ে তাদের ওপর। দুজনেই পুড়ে শেষ হয়ে যায়।

চলতে চলতেই সমানে কেঁদে চলেছেন লক্ষ্মী। নেতাজির ডাকে সাড়া দিয়ে এরকম কতজন শহিদ হয়েছেন। কী করুণ এই সমাপ্তি। মনসুখ, ডাক্তার আকবর আলি, জ্ঞান সিং, ইয়েলাপ্পা—কী সব মানুষ! নেতাজির আদরের 'কুবের' ইয়েলাপ্পা একসময় সত্যিই কুবেরের মতোই ধনী ছিলেন। সিঙ্গাপুরে তাঁর বাংলোর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত কত গাড়ি। নিজের সমস্ত প্রতিষ্ঠা, আত্মীয়স্বজন, উপার্জন সবকিছু মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন ইয়েলাপ্পা। কেউ জানবে না বর্মার কোন অজ্ঞাত, অখ্যাত গ্রামে তাঁর শেষ মুহূর্তটি ঘনিয়ে এসেছিল। কে শোনাবে দেশবাসীকে এদের কাহিনি? দেশের জন্য যাঁরা নেতাজির এই মহাযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়েছেন কেউ জানবে না তাঁদের কথা।

একভাবে কেঁদে চলেছেন লক্ষ্মী। মেজর বাওয়া ভাইয়ের মতোই আগলে রয়েছেন তাঁকে। তাঁর চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মী, নিজেকে সামলাও। তুমি নেতাজির ঝাঁসির রানি। তোমাকে তো তার মর্যাদা রাখতেই হবে। এই আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না লক্ষ্মী। নেতাজির কথা, তাঁর স্বপ্ন একদিন রূপ পাবেই। হাম জিন্দা রহে ইয়া মুর্দা, হিন্দুস্থান আজাদ হোগা, জরুর আজাদ হোগা...।'

জামাল অ্যাভেনিউয়ের বাড়িতে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন নেতাজি। এস. এ. আইয়ার সাহেব এসে বললেন, 'জেনারেল আউঙ্গ সানের অনুগামীরা ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে আমাদের পক্ষে।'

আউঙ্গ সানের ক্যান্ডি যাওয়া, মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে হাত মেলানো—সবই জানেন নেতাজি। এটাও জানেন যে এই সময়ে আউঙ্গ সানই বর্মার সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। পরিস্থিতি ক্রমশই

জটিল হয়ে উঠছে। জাপানের সহযোগী আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিষদৃষ্টিতে দেখছে অনেক বর্মি।

দুপুরবেলা রেঙ্গুনের জাপানি সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল কিমুরা ফোনে জানিয়ে দিলেন যে অবিলম্বে রেঙ্গুন ত্যাগ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। খুব বেশি হলে দু-তিনদিনের মধ্যে।

রেঙ্গুন থেকে সবকিছু সরিয়ে নেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। প্রথম সমস্যা আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর দপ্তর কোথায় করা হবে? তা ছাড়া সর্বাত্মক প্রস্তুতির জন্য সংগৃহীত ধনরত্ন সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা, আগামী দিনের খরচ চালানোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যাপার। জাপানের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের পাহাড়প্রমাণ সমস্যারাশি নেতাজির মাথার ওপরে।

অনেক রাতে বিছানায় শুয়ে সবে চোখ লেগে এসেছে এমন সময় দরজায় খটখট শব্দ।

'কে?'

'নেতাজি, আমি কুন্দন সিং। তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন।'

সাংঘাতিক জরুরি কিছু না হলে কুন্দন সিং কিছুতেই নেতাজিকে ঘুম থেকে ওঠাবে না, এটা ভাল করেই জানেন তিনি। এর আগে কতবার জেনারেলদেরও ফিরিয়ে দিয়েছে সে।

দরজা খুলতেই কুন্দন সিং স্যালুট করে বলল, 'স্বয়ং রাসবিহারী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছেন। নীচে অপেক্ষা করছেন তিনি।'

রাসবিহারী? এমন সময়ে? কুন্দন সিং-এর মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? নাকি নেশা করেছে?

'সিঁড়ি থেকে উঁকি মেরেই দেখুন না। জাপানি জিপও দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়।'

সত্যিই রাস্তায় একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নেতাজি রাসবিহারীকে দেখতে পেলেন। হঠাৎ এই সময়ে রাসবিহারী? সিঁড়ি থেকেই 'জয় হিন্দ' বলে সম্ভাষণ করার সঙ্গে সঙ্গেই শোঁ শোঁ করে গুলি ছুটল পাশ দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে পাশের দিকে ঝুঁকলেন নেতাজি, তারপরেই পাশের দিকে লাফ মারলেন।

গুলির আওয়াজ শুনেই পাহারাদাররা ছুটে এসেছে। মুহূর্তের মধ্যে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল কালো চশমা পরা রাসবিহারী। নেতাজিও নেমে এলেন তরতর করে। লোকটিকে দেখে স্তম্ভিত তিনি। হুবহু রাসবিহারী। একমাত্র চোখদুটো একটু বেশি কটা। তাই ওই কালো চশমা। যে কেউ ভুল করবে রাসবিহারী বলে।

বাকি যারা ছিল, গোলমালের সুযোগে জিপ নিয়ে পিঠটান দিয়েছে।

নেতাজির ওপর এই ধরনের হামলায় সবাই বিভ্রান্ত। জেনারেল কিমুরা খবর পেয়ে রাত্রেই একটি রক্ষীদল পাঠিয়ে দিলেন জামাল অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে। নেতাজির ওপর যে কী পরিমাণ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে সবাই বুঝতে পারছে। কুন্দন সিং একদৃষ্টিতে দেখছে লোকটাকে। একে আমি কোথায় দেখেছি। বারবার সবাইকে বলছে সে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না কোথায় দেখেছে।

অনেকক্ষণ পরে বিশ্রাম নেবার জন্য নেতাজি সিঁড়িতে পা দিয়েছেন এমন সময় মনে পড়ল কুন্দন সিংয়ের।

'নেতাজি, এবার স্পষ্ট মনে পড়েছে আমার। কোথায় দেখেছি একে।'

'কোথায়?'

'পেনাং-এর সান্ডিক্র্যাফ্‌ট স্কুলে।'

'তুমি একেবারে নিশ্চিত?'

'একদম। ক্যাপ্টেন দুরানির একেবারে খাস চেলা এই লোকটা।'

নেতাজি স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারলেসে জাপানি সদর দপ্তরে খবর চলে গেল। রেঙ্গুন থেকে সিঙ্গাপুর, পেনাং, ইপো—সর্বত্র একই খবর পাঠানো হল বেইমান ক্যাপ্টেন দুরানিকে গ্রেফতার করো।

আস্তে আস্তে সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে আসছে নেতাজির কাছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুসলমান অফিসারদের মন বিষিয়ে দেবার প্রচেষ্টার মূলে দুরানিই ছিল। কেউ কেউ নেতাজির কাছে দুরানির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে সাগরপথে যেসব বিপ্লবীকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল তাদের ধরিয়ে দেবার জন্য দুরানিই দায়ী।

এই বিশ্বাসঘাতকতায় ভেঙে পড়েছেন নেতাজি। সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে তিনজন জাপানি ট্রেনারের কথা মনে পড়ায়। পেনাং-এ শিক্ষা পাওয়া কয়েকজন সৈন্য যখন ব্রিটিশের পক্ষে যোগ দিয়েছিল তখন সেটা সহ্য করতে পারেননি তাঁরা। নিজেদের হাতে গড়া শিক্ষার্থীদের আচরণের জন্য তাঁরা নিজেরাই দায়ী ভেবে হারাকিরি করেছিলেন তাঁরা।

৮

'অনেক তো লড়াই করলেন। এবার একটু বিশ্রাম নিন না।' ফোনের মধ্যে দিয়ে আউঙ্গ সানের গলা ভেসে এল।

'তারপর?' নেতাজি প্রশ্ন করলেন।

'আমার মতো আপনিও ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মেলান। জাপানের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিন। আপনার জন্য আমি নিজে মাউন্টব্যাটেনকে বলব।' আউঙ্গ সান বলেই চলেছেন।

'জেনারেল আপনি কিন্তু খুব হাসাতে পারেন।' নেতাজি হাসতে হাসতেই বললেন।

'তার মানে?'

'মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে।' নেতাজির গলায় একটু যেন ধমকের সুর। ফোনটা রেখে দিলেন নেতাজি।

আউঙ্গ সানের দূত অবশ্য সশরীরে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। ব্রিটিশের সঙ্গে আপস? কী অদ্ভুত চিন্তা—মনে করলেই সারা শরীর রি রি করে ওঠে নেতাজির। তা ছাড়া জাপানের বিরোধিতার কথা ভাবলেই টনটন করে ওঠে নেতাজির মন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ইম্ফল অভিযানের পরিকল্পনার ব্যর্থ রূপকার মুতাগুচির পতন, আর মিয়াঝাকির পরিণতির কথা মনে পড়ে তাঁর। মনে পড়ে ইম্ফলের রাস্তায় হাজার হাজার জাপানি সৈনিকের আত্মবলিদানের কথা। সেইসব কথা সঙ্গীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে নেতাজি বললেন, 'এই দুর্দিনে জাপানের পিঠে ছুরি বসানোর চিন্তা যদি ঘুণাক্ষরেও মনে আসে আমার তো সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাত কেটে ফেলব আমি। আমার মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য ইম্ফল, কোহিমা, আরাকান আর ইরাবতীর তীরে জীবন দিয়েছে জাপানের একটা প্রজন্ম। তাদের সে রক্তঋণ কি কোনওদিন শোধ করতে পারব আমরা?'

জেনারেল আউঙ্গ সানের দূতকে শান্তস্বরে নেতাজি বললেন, 'জেনারেলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। আমি বিশ্বাস করি শিগগিরই আমাদের দুটি দেশই গোলামি থেকে মুক্তি পাবে।'

রেঙ্গুন এখন সম্পূর্ণ অরাজক। চোর, লুটেরা, গুন্ডাদের দাপটে সুস্থ নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। নিরাপত্তা বলে কিছু নেই শহরে। নাগরিকেরা ত্রস্ত।

জেনারেল কিমুরা তাঁর বিদায়ী বার্তা পাঠিয়েছেন নেতাজিকে। 'রেঙ্গুনে আর থাকা সম্ভব নয়। আমি আজই রওনা হচ্ছি। আপনি যদি আমার সঙ্গে যেতে চান আপনার জন্য বিমানে একটা আসনের ব্যবস্থা করব আমি।' ধন্যবাদের সঙ্গে কিমুরার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন নেতাজি। সহকর্মীদের বললেন, 'নিজের সৈন্যদের ব্যবস্থা না করে কিমুরার মতো চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

জামাল অ্যাভেনিউয়ের বাড়িতে সবসময় আলোচনা চলছে। ভারতীয় ছাড়াও বর্মি, চৈনিক নাগরিকেরা নেতাজির কাছে এসে শহরের অরাজক অবস্থার কথা জানাচ্ছেন। অন্যদিকে নেতাজির জন্য সহকর্মীরা সবাই চিন্তিত। আর দিন চারেকের মধ্যে ব্রিটিশ ফৌজ রেঙ্গুন দখল করবে বলে মনে হচ্ছে। এদিকে নেতাজি কিছুতেই শহর ছেড়ে যেতে রাজি হচ্ছেন না। নেতাজির জন্য জেনারেল জগন্নাথরাও ভোঁসলে, জেনারেল জামান কিয়ানি আর অন্য সবাই দারুণ চিন্তিত। সবাইকে নিয়ে একটা বৈঠক করার জন্য নেতাজির ওপর চাপ দিলেন তাঁরা।

বৈঠকে নেতাজি বললেন, 'আপনারা কেন এ বৈঠকের জন্য এত পীড়াপীড়ি করছেন, সেটা আমি বুঝি। কিন্তু আমার ইচ্ছে শেষ সৈনিকটি থাকা পর্যন্ত আমরা এই রেঙ্গুন শহরে থেকেই একটা চূড়ান্ত লড়াই করব।'

'নেতাজি, আপনার প্রত্যেকটি আদেশ পালন করেছি আমরা। আপনার আদেশে খালি পায়ে হাজার হাজার মাইল দুর্গম রাস্তায় চলেছি আমরা। আজও আপনার ওপর আমাদের ইমানদারি সম্পূর্ণ অটুট। আপনার ইচ্ছা অনুসারে আমরা সবাই এখানে থেকে লড়ব। কিন্তু দয়া করে আপনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন।'

নেতাজির আওয়াজ চড়ল এবার। 'কিয়ানি সাহেব, আজাদ হিন্দ ফৌজের এক নম্বর ডিভিশনের সেনানায়ক হিসাবে আপনার কথার যথেষ্ট দাম দিই আমি। আমাকে চলে যেতে বলছেন আপনারা। কিন্তু কী করে যাব? ভুলে যাবেন না, সেহগল, ধিল্লোঁ, শাহনওয়াজরা আজও বর্মার পাহাড়ে-জঙ্গলে ব্রিটিশ ফৌজের মোকাবিলা করছে। সিতাং আর অন্যান্য নদীর ধারে আমাদের বীর গোলন্দাজেরা আজও ব্রিটিশ বিমানের ওপর গোলাবর্ষণ করছে। এদের সবাইকে ছেড়ে আমি একলা কোথায় যাব?'

সেনাপতিদের মধ্যে জেনারেল ভোঁসলে সবচেয়ে সিনিয়র। তিনি বললেন, 'নেতাজি, দয়া করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা ভাবুন। এখন এখানে এভাবে লড়াই করে কী লাভ হবে আমাদের?'

'জেনারেল লাভ-লোকসানের হিসাব কোনওদিনই করিনি আমি আর ওটা আমার দ্বারা হবেও না। পরিস্থিতি যাই হোক সংগ্রাম আমাকে করতেই হবে।'

অন্তিম সংগ্রামের জন্য সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি নেতাজির চেহারায় ভাস্বর হয়ে ফুটে উঠছে। তার মত ফেরানো ক্রমশই অসম্ভব মনে হচ্ছে।

এইবার উঠে দাঁড়ালেন লোগনন্দন। বললেন, 'আউঙ্গ সান আর তাঁর অনুগামীদের বিদ্রোহের কথা অজানা নেই আপনার। তার ওপরে জেনারেল স্লিম আর মাউন্টব্যাটেনের প্যারাট্রুপাররা নেমে পড়েছে কারেন অঞ্চলে। কারেন আর বর্মিরা ভারতীয় আর জাপানিদের নির্বিচারে হত্যা করছে। রেঙ্গুন, ম্যাকটিলা, মান্দালয় সম্পূর্ণ অরাজক। আইনকানুন বলে আর কিছু নেই। এই অবস্থায় শুধু নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য আপনি যদি এখানে আটকে থাকেন, তবে ভবিষ্যতের সমস্ত আশা নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

সহকর্মীদের উপরোধ-অনুরোধ-যুক্তি এবার নেতাজিকেও অন্য পথ ভাবতে বাধ্য করল।

সঙ্গে সঙ্গেই জাপানি সেনাপতি ইসোডাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। ইসোডাও বললেন যে পরিস্থিতি খুবই খারাপ। ব্রিটিশরা ইতিমধ্যে তাঙ্গু পেরিয়ে এসেছে। আজকালের মধ্যে রেঙ্গুনে পৌঁছবে তারা।

কাকিৎসুবো বললেন, 'হ্যাঁ নেতাজি। দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন। যে-কোনও মুহূর্তেই পেগুর পতন হবে।'

পেগুর কথা শুনে সবাই হকচকিয়ে গেলেন। পেগু নদীর তীরে পেগু নামের এই গ্রামটা রেঙ্গুন থেকে মাইল কুড়ি দূরে। পেগুর গুরুত্ব খুব বেশি। উত্তর বর্মা থেকে রেঙ্গুনে আসতে হলে পেগু হয়েই আসতে হয়। তা ছাড়া রেঙ্গুন থেকে ব্যাংকক যেতেও পেগু পড়ে। এ ছাড়াও পেগু অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংযোগস্থল।

জামান কিয়ানি আর চুপ থাকতে পারলেন না। বললেন, 'নেতাজি, ইম্ফল থেকে আমি যে বেঁচে ফিরেছি সে কি আপনার হাতে হাতকড়ি দেখার জন্য? আপনাকে স্পষ্ট বলছি আমি—সে দৃশ্য দেখার আগে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেব আমি।'

তরুণ প্রীতম সিং উঠে দাঁড়ালেন এবার। টপটপ করে চোখ দিয়ে জল পড়ছে তার। বললেন, 'নেতাজি, আপনার ডাকে, আপনার প্রেরণায় সমস্ত পরিবার পরিজনদের কথা ভুলে গত দু'বছর ধরে মশালের মতো জ্বলেছি আমরা। আর কাল যদি আমাদের আপনাকে বন্দি অবস্থায় দেখতে হয় তবে সে চোখ থাকার চেয়ে নিজের হাতেই উপড়ে ফেলব আমি।'

চারদিক থেকেই আওয়াজ উঠল এবার। সবারই এক কথা। নেতাজিকে বন্দি দেখার আগে প্রাণ দেবেন তাঁরা।

ভারতীয় আর জাপানি সহকর্মীদের অনুরোধের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হলেন নেতাজি। আগামীদিনে আবার সংগ্রামের জমি তৈরি করার জন্য তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করতে সম্মত হলেন। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

এরপর নেতাজি বললেন, 'ব্রহ্মদেশ একসময়ে আমাদের যে উপকার করেছে তা কখনও ভুলতে পারা যাবে না। আজ রেঙ্গুনের বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে রেঙ্গুনকে বাঁচাতে হবে। তাই গুন্ডা, লুটেরাদের শক্ত হাতে দমাবার, মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু বাঁচাবার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। যে পর্যন্ত না ব্রিটিশ বাহিনী এসে রেঙ্গুনের শাসন-ব্যবস্থা হাতে তুলে নিচ্ছে, আজাদ হিন্দ ফৌজের পাঁচ হাজার সৈন্যকে এই কাজ করতে হবে। লোগনন্দন সাহেব, আপনাকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে।'

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঝাঁসির রানি বাহিনীর মেয়েদের অনেককেই বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন নেতাজি। অবশিষ্ট আছে প্রায় পঞ্চাশজন। তাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে জেনারেল ইসোডাকে অনুরোধ করলেন নেতাজি। ইসোডা বললেন, 'আপনি রওনা হয়ে যান। আমি এদের ব্যবস্থা করছি।' সাফ অস্বীকার করলেন নেতাজি, 'আমার এই মেয়েদের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এক পা-ও নড়ব না আমি।'

মেয়েদের পাঠানোর ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন জাপানি সেনাধ্যক্ষ। নিজের বিশেষ চিকিৎসক ডাক্তার রাজুকে রেঙ্গুনের চিকিৎসাব্যবস্থার দায়িত্ব দিলেন নেতাজি। রাত্রে একটা সামরিক ট্রেনে ঝাঁসির রানি বাহিনীর মেয়েরা রওনা হবে। তারপর গভীর রাতে নেতাজি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রওনা হবেন। স্বামী, রাওয়াত, সমশের সিং, ভাস্করন—অর্থাৎ নেতাজির ব্যক্তিগত কর্মীরা সবাই বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত। প্রতি দশ মিনিট অন্তর নেতাজি আইয়ারকে ডেকে নানারকম নির্দেশ দিচ্ছেন।

রাত্রে নীচে বাঁধাবাঁধি চলছে। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় নেতাজি দাঁড়িয়ে আছেন ছাদে। হঠাৎ শ'-দুই তিন গজ দূর থেকে একটা বোমারু বিমান বেশ খানিকটা নেমে এসে গুলি ছুড়তে লাগল। ফুলঝুরির ফুলকির মতো আগুনের বর্ষণ। একটুর জন্য বেঁচে গেলেন নেতাজি। কিন্তু কোনও ভাবান্তর নেই তাঁর। হাসিমুখে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি।

এমন সময় সমশের সিং জানকী দাভারকে নিয়ে এলেন সেখানে। যে ট্রেনটির ঝাঁসির রানি বাহিনীর মেয়েদের নিয়ে যাবার কথা ছিল সেটা এসে চলে গেছে। সে ট্রেনের জাপানি মাতব্বরেরা সাফ বলে দিয়েছেন যে জায়গা নেই ট্রেনে।

আইয়ারকে জিজ্ঞেস করে নেতাজি জানলেন যে পরের দিনও কোনও গাড়ি আসার সম্ভাবনা নেই। সঙ্গে সঙ্গে জাপানি রাজদূত হাচিয়ার কাছে আইয়ারকে পাঠিয়ে দিলেন নেতাজি। সোজা বলে দিতে বললেন যে মেয়েদের না পাঠানো পর্যন্ত এক পাও নড়বেন না তিনি।

সঙ্গিনীদের নিয়ে জানকী বসে আছেন নেতাজির পাশে। এক মাস আগেই ঝাঁসির রানি বাহিনীর অনেক মেয়েকে যখন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন জানকী যেতে চাননি। নেতাজিকে বাবার মতো শ্রদ্ধা করে জানকী। তাই নেতাজিকে ছেড়ে যেতে রাজি হননি জানকী।

২৫ এপ্রিল, ১৯৪৫। অপরূপ জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে চারদিক। নেতাজির বাড়ির সামনে চারটি লরি দাঁড়িয়ে। লরির সঙ্গে কর্নেল মিশ্রর অধীনে জানবাজ দলের সৈন্যরা রক্ষী হিসাবে পায়ে হেঁটে যাবে। কিছু যাবে একটা লরিতে। তিনটি লরিতে যাবে ঝাঁসির রানি বাহিনীর মেয়েরা। তা ছাড়া যাবে নেতাজির নিজস্ব মোটরগাড়ি।

সোনা, রুপো, হিরে জহরত-ভরা তিনটি বেশ বড় সিন্দুক বাইরে নিয়ে এসে নেতাজির গাড়িতে তোলা হল। সিন্দুকগুলো দেখে নেতাজির মনটা কেমন কেমন করে ওঠে। মাত্র মাস তিনেক আগে নেতাজির জন্মদিনে অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারি, ১৯৪৫—রেঙ্গুনের ভারতীয়রা নেতাজিকে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় চাপিয়ে অন্য পাল্লায় ধনরত্ন দিয়ে ওজন করেছিলেন। ইম্ফলের পরাভবের পরও নেতাজির ওপর বিশ্বাস হারাননি তাঁরা। প্রকৃতপক্ষে মা-বোনেরা যত অলংকার দিয়েছিলেন তার ওজন নেতাজির ওজনের দেড়গুণেরও বেশি। প্রতিটি অলংকারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক আবেগ, অনেক স্মৃতি।

ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল লরিগুলো। জায়গায় জায়গায় কর্তব্যরত আজাদি সৈন্যরা জলভরা চোখে বিদায় দিচ্ছেন নেতাজিকে। জাপানিদের দপ্তরগুলো আগেই গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাগজপত্রের স্তূপ পুড়ছে সেখানে। ধুলোতে, ধোঁয়াতে চারদিক ভরে গেছে। মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে শত্রুবিমান।

নেতাজির গাড়ি রয়েছে সব পেছনে। এত রাতেও বহু ভারতীয় নাগরিক জমা হয়েছেন নেতাজিকে বিদায় দিতে। বিমান হামলার পরোয়া নেই তাঁদের। ভিড় ক্রমশ বেড়ে উঠছে। গাড়ি আর এগোতে পারে না।

বৃদ্ধ বলেরাম গাওলি ভিড় থেকে এগিয়ে এসে নেতাজির পায়ের কাছে বসে পড়ল। বলেরামের ছেলে আর ছেলের বউ দুজনেই আজাদি ফৌজে যোগ দিয়েছিল। ইম্ফলের রণাঙ্গন থেকে কেউ-ই ফেরেনি।

'ছেলে আর ছেলের বউয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল?' এইরকম পরিস্থিতিতেও বলেরামকে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করলেন নেতাজি।

'নেতাজি, আপনি এখন নিজের কথা ভাবুন। আপনি ভাল থাকলে আমার ছেলে আর বউয়ের আত্মত্যাগ কখনও বৃথা যাবে না।'

ভিড় বেড়েই চলেছে। গাড়ি এগোনো অসম্ভব। নেতাজি এবার বনেটের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। নেতাজি উঠে দাঁড়াতেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা স্যালুট করল তাঁকে। তাদের সম্বোধন করে নেতাজি বললেন, 'রেঙ্গুনের নাগরিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি আপনাদের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। ব্রিটিশ ফৌজ যখন রেঙ্গুনে পৌঁছবে তখন সুশৃঙ্খলভাবে আত্মসমর্পণ করবেন আপনারা। আত্মসমর্পণের সময়ও আপনারা নিজেদের হীন ভাববেন না। সগর্বে মাথা তুলে, বুক ফুলিয়ে থাকবেন আপনারা।'

তারপর নাগরিকদের সম্বোধন করে বললেন, 'হাজার হাজার শহিদের রক্তপূত এ পুণ্যভূমি ত্যাগ করে যেতে আমার মন চাইছে না। কিন্তু আমার মন্ত্রিমণ্ডলী আর সামরিক অফিসারদের সমবেত অনুরোধ আর ভবিষ্যতের সংগ্রামের মুখ চেয়ে আমাকে আজ চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু এ চলে যাওয়া নিতান্তই সাময়িক। আমি বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবেই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই। আগামীদিনে যেসব শিশু জন্মাবে, তারা জন্মাবে মুক্ত, স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে—গোলাম হিসাবে নয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনাদের অতুলনীয় আত্মত্যাগ কখনওই ব্যর্থ হবে না। ভবিষ্যতের ভারত আপনাদের এই আত্মত্যাগের কাহিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে প্রেরণা পাবে। আজকে মণিপুর থেকে বা বর্মা থেকে আমাদের পশ্চাদপসরণ করতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এটা সাময়িক। আমি বিশ্বাস করি রাতের গভীরতম অন্ধকারের পরই উষার আলোক দেখা দেয়। আমরাও আজ চলেছি সেই গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। তাই আমি জানি যে প্রভাতের আর বিলম্ব নেই। আপনারাও এই বিশ্বাস রাখবেন, এই প্রার্থনাই করি আমি। আমি আবার আসব। ফিনিক্স পাখির মতো ছাই হয়ে গিয়েও ফিরে আসব আমি—আগামী দিনের মহাসংগ্রামের জন্য।'

নেতাজির গাড়ি চলতে শুরু করল। দলের সামনে ক্যাপ্টেন রাম সিংয়ের বেহালা সুর ধরেছে—'আজাদ করেঙ্গে, আবাদ করেঙ্গে, সব সে উঁচা হ্যায় ঝান্ডা হামারা।'

৯

আজাদ হিন্দ ফৌজ চলেছে। রেঙ্গুন ছাড়ার পর এক ঘণ্টাও কাটেনি। মাথার ওপরে শত্রুবিমান থেকে বোমাবর্ষণ শুরু হল। সৈন্যরা লরি থেকে লাফিয়ে নেমে আশেপাশের খেতে আশ্রয় নিতে লাগল। ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়নি।

সকালে পেগু পেরিয়ে গেল দলটা। সবসময়েই বর্মি গেরিলাদের আক্রমণের ভয় রয়েছে। ব্রিটিশ বিমানের হামলা তো আছেই। সারা পেগু জ্বলছে। শহর ছেড়ে যাবার আগে জাপানিরা তাদের দপ্তরগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। যে সমস্ত অস্ত্র বা গোলাগুলি নিয়ে যাওয়া যাবে না সেগুলোকেও আগুনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। বাড়িগুলোর চালা বা ছাদগুলো শুধু নয়, ভিত পর্যন্ত জ্বলছে।

ফরসা হতে হতে সবাই ওয়া নদীর কাছে পৌঁছলেন। রাস্তায় ইয়গি নামে একটা গ্রাম পড়ল। গ্রাম এখন জনশূন্য। দিনের আলোয় পথ চলা বিপজ্জনক। হাচিয়া আর কাকিৎসুবো নেতাজিকে থামতে অনুরোধ করলেন। সবাই গাছপালার আড়ালে আশ্রয় নিল। সারারাত জেগে নেতাজির চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটুও ক্লান্ত দেখাচ্ছে না তাঁকে। সমান উৎসাহে প্রত্যেকটি দলের খোঁজ নিচ্ছেন ঘুরে ঘুরে।

পরিদর্শন শেষ করে এক পেয়ালা চা খাচ্ছিলেন নেতাজি। এমন সময় হাচিয়া, মাসামি সুরুতা

নামে একটি সুদর্শন জাপানি তরুণকে নেতাজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য নিয়ে এলেন। বছর পঁচিশ বয়সের তরুণটি জাপানি গায়মুশো অর্থাৎ পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মী। কালই সেখান থেকে অত্যন্ত জরুরি খবর নিয়ে হাচিয়ার কাছে পৌঁছেছে সে। সাহেবদের মতো ফরসা এই তরুণটির সুদর্শন চেহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নেতাজি সম্পর্কে অসীম কৌতূহল স্তরুতার।

একটা গাছের গায়ে আয়না লাগিয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলেন নেতাজি। হঠাৎ তিনটি শত্রু বিমান উড়ে এল মাথার ওপর। লরিগুলো আধ মাইল দূরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাই সেগুলো দেখতে পেল না তারা। নেতাজি যেখানে ছিলেন তার কাছে এসে মেশিনগান চালাতে শুরু করল বিমানগুলো। 'নেতাজি শিগগির আড়ালে যান,' সৈন্যদের সঙ্গে স্তরুতাও চেঁচাচ্ছে। তাতে কান দিলেন না নেতাজি। শান্তভাবে দাড়ি কামানো শেষ করলেন তিনি। দেখে স্তরুতা স্তম্ভিত। নেতাজি সম্বন্ধে অনেক শুনেছে সে। কিন্তু চোখের সামনে তাঁর সাহস দেখে বিস্ময়ে পলক পড়ে না তার।

বিমানগুলো চলে গেছে। নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন নেতাজি। স্তরুতা এবার কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'এইরকম বিমান হামলাতেও আপনি এত শান্ত কী করে থাকেন?'

'কারণ আমাদের দেশ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত ভগবান রক্ষা করবেন নেতাজিকে।' জানকী বলে উঠল।

নেতাজিও হাসলেন এবার। কয়েকজন সৈন্যের মনে পড়ল দিন তিনেক আগে একটা শত্রুবিমান ভেঙে পড়েছিল রেঙ্গুনে। বিমানটি থেকে পাওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল কয়েকটা মানচিত্র। রেঙ্গুনের মানচিত্রটার একটা জায়গা গাঢ় লাল কালিতে দাগানো। চিহ্ন করা জায়গাটিতে ছিল নেতাজির বাংলো। এর আগেও নেতাজির বাংলোটা উড়িয়ে দেবার অনেক চেষ্টা হয়েছে। প্রত্যেকবারই ভাগ্যবলে বেঁচে গেছেন নেতাজি।

সন্ধের সময় আবার যাত্রা শুরু হল। সূর্য ডুবলেই আজাদি সেনাদের দিন শুরু হয়। জাপানি বাহিনীর অনেক লরিও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। ওয়াভ নদীর ধারে ধারে চলেছে সবাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিতাং নদী পেরোতে হবে। কিন্তু রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারে বৃষ্টি। ভুসভুসে মাটি বৃষ্টিতে কাদা হয়ে গেল। লরির চাকা কাদায় আটকে একই জায়গায় ঘুরে কাদা ছিটকোচ্ছে। সৈন্যরা চাকার নীচে পাটাতন ফেলে, বহুকষ্টে লরিগুলো এগোবার ব্যবস্থা করে। খুব ধীরে ধীরে গাড়িগুলো এগোতে থাকে।

নেতাজির গাড়িও আটকে গেছে। নেতাজি নিজেই নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। লরি থেকে মেয়েরাও নামল। অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না কিছু। বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে গেছে সবাই। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া খুবই দরকার। কাঁচা রাস্তায় বহু জায়গায় জল জমেছে। অনেক জায়গায় বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ নেতাজির গাড়ি হড়কে একটা পাঁচ-ছয় ফুট গভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। সৈন্যরা তাড়াতাড়ি সিন্দুকগুলো গাড়ি থেকে বার করে আনল। নেতাজিকে গাড়িতে হাত লাগাতে দেখে তার সঙ্গে স্তরুতা তো বটেই জেনারেল ইসোডা আর হাচিয়াও হাত লাগালেন। হঠাৎ হাচিয়া হেসে উঠে বললেন, 'নেতাজি গাড়িটার ভাগ্যটা দেখুন। একজন প্রধানমন্ত্রী, একজন জেনারেল, একজন রাজদূত আর তাগড়া তাগড়া মেজররাও গাড়িটাতে হাত লাগাচ্ছেন।'

জলে কাদায় পা পিছলে যাচ্ছে। একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের নির্দেশ দিচ্ছেন নেতাজি। রাতের মধ্যে ওয়াভ নদীর পার হওয়াটা খুব দরকার। নদীর ওপরকার সেতুটা

শত্রুবিমানের হামলায় অনেক আগেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে তার ধ্বংসাবশেষ।

বর্ষায় ওয়াভ নদী ভরে উঠেছে। তারই মধ্যে লরিগুলো পার করার জন্য কতকগুলো ভেলা বাঁধা হয়েছে। দুঃসাহসী সৈনিকরা ভেলাগুলোকে লরিসমেত পার করার চেষ্টা করছে। কয়েকটা লরির সলিল সমাধিও হল। কয়েকটা নৌকোতেও সৈন্যরা পেরোচ্ছে। জেনারেল ইসোডা এসে নেতাজিকে প্রথমে নদী পার হতে বললেন। নেতাজি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যা তা বকবেন না, মেয়েরা সবাই পার না হলে আমি ওপারে যাচ্ছি না।'

কর্নেল মালিক আর স্বামী দুজনেই ছ' ফুটের ওপর লম্বা। নেতাজি তাদের জলের গভীরতার আন্দাজ নিতে বললেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল এক জায়গায় জল মাত্র ছয়-সাত ফুট গভীর। মেয়েদের ওইখান দিয়ে সাঁতরে নদী পার হতে বলা হল। কনকনে ঠান্ডা জলে নেমে নিজের নিজের পিঠের বোঝা আর রাইফেল সামলে, একে অপরকে সামলে একসময় সব মেয়েরা অপর তীরে পৌঁছল। নদীর এপারে অসংখ্য লরি পড়ে আছে। লরিগুলো যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে সেজন্য জাপানিরা আগুন ধরিয়ে দিল বেশ কিছু লরিতে। দাউদাউ করে জ্বলছে লরিগুলো। তারই মধ্যে তাদের ওপর বৃষ্টি পড়ছে চড়বড় আওয়াজ করে। নেতাজি এখনও এপারেই দাঁড়িয়ে। তখনও তিনি চেষ্টা করছেন যে-ক'টা লরি ওপারে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য। আগুনের পটভূমিতে, বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়ানো নেতাজিকে মনে হচ্ছে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।

নেতাজির সারারাতের চেষ্টায় বেশ কয়েকটা লরিকে পার করা সম্ভব হল। যখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে তখন শেষ নৌকোটিতে করে নদী পেরোলেন নেতাজি।

সামনে অপিয়া নামে একটা গ্রামে সৈন্যরা ঘাঁটি ফেলল। গ্রামটিতে কোনও ট্রেঞ্চ তো দূরের কথা কোনও খানাখন্দও নেই। বড়সড়ো গাছের আড়ালে আশ্রয় নিল সৈন্যরা। লরিগুলোকেও যতটা সম্ভব লুকিয়ে রাখা হল। গ্রামে বৌদ্ধ মন্দিরের পাশেই একটা মণ্ডপ ছিল। আগেই বোমা পড়ে আধখানা পুড়ে গেছে সেটা। তারই আড়ালে পাথরের ওপর একটা ময়লা চাদর বিছিয়ে নেতাজি শুয়ে পড়লেন। চা ছাড়া কিছুই খেলেন না তিনি। মেয়েরা ভাত রেঁধেছিল। কিন্তু তাও খেলেন না তিনি। অনেকদিন ধরে অবিরাম পরিশ্রমে তাঁকে অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

দুপুর তিনটে নাগাদ ছ'খানা ব্রিটিশ বিমান শকুনের মতো মাথার ওপর উড়তে লাগল। আন্দাজ করে করে বোমা ফেলছে তারা। হাচিয়া আর স্তরুতা নেতাজিকে ওঠাতে চেষ্টা করছেন। মেয়েরাও চেঁচাচ্ছে। নেতাজি একবার তাকিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলেন। আধঘণ্টা ধরে বোমা ফেলে চলে গেল বিমানগুলো। পাঁচটা লরি বোমার আগুনে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে।

২৬ এপ্রিলের মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। যে ক'টা লরি এখনও অবশিষ্ট আছে সেগুলো মাছের ঝুড়ির মতো ঠাসাঠাসি ভরা। গাড়ি আবার কাদায় আটকাল। খবর পাওয়া গেছে যে শত্রু দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকে। সিতাং নদী এখনও দশ মাইল দূরে। সিতাং পার না হতে পারা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। সিতাং-এর ওপারে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটা গোলন্দাজ দল রয়েছে। লরি আটকে যেতে মেয়েরা নেমে পড়ল লরি থেকে। নেতাজি কর্নেল চোপরাকে নির্দেশ দিলেন লরিগুলোর দেখাশুনো করার জন্য। জেনারেল ভোঁসলে আর চ্যাটার্জির সঙ্গে মেয়েরা চলল পায়ে হেঁটে। ই. ভাস্করন আর ভোঁসলের সেক্রেটারি পি. এন. ওক-ও সঙ্গে আছেন। বৃষ্টিও পড়ে চলেছে।

মেয়েরা সিতাং নদীর ধারে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেতাজি আর তাঁর সঙ্গীরা এসে পৌঁছলেন সেখানে। মেয়েদের জন্য সবসময় চিন্তা তাঁর। কোথা দিয়ে নদী পেরোনো যায় তার

সন্ধান করতে নিজেই লেগে গেলেন নেতাজি। মেয়েরাও কাদা ভেঙে, মাথায় নিজের নিজের বোঝা নিয়ে, রাইফেল নিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে এগোচ্ছে।

এই সময় নেতাজির গাড়ি এবং ধনরত্নভর্তি সিন্দুকগুলো নিয়ে, যেগুলো নেতাজি রাস্তায় ফেলে রেখে এসেছিলেন, জাপানি সৈন্যদের একটা দল এসে সেখানে পৌঁছল। কোনও রকমে নদী পার হওয়া গেল। সূর্য ওঠার আগেই পৌঁছতে হবে সামনের গ্রামে।

এরপরে যে গ্রামে আশ্রয় নেওয়া হল সেখানে জানবাজ দলও এসে পৌঁছল। সারা রাস্তা পায়ে হেঁটে এসেছে তারা। কী কঠিন এই পথ চলা। সারাদিন ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থেকে রাতে পথচলা। এই নিশাচর জীবনে উপযুক্ত খাবার তো দূরের কথা খাবার জলটুকুও জোটেনি অনেক সময়। মেয়েরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে তাদের। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে তাদের।

নেতাজি তাদের কাছে এক বিস্ময়। সবসময় সঙ্গীদের ভাল-মন্দর খবর নিচ্ছেন। লরি মেরামতিতে সাহায্য করছেন এমনকী খাবারও পরিবেশন করছেন। কখনও কখনও নিজের খাবার থেকে অন্যকে দিচ্ছেন।

এর পরে যে গ্রামে আশ্রয় নেওয়া হল সেখানে দুজন সৈনিক দৌড়তে দৌড়তে একটা অত্যন্ত সাংঘাতিক খবর নিয়ে এল। ব্রিটিশ গুপ্তচর সন্দেহে স্তুরুতাকে মারাত্মকভাবে জখম করেছে আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন সৈন্য। সাহেবদের মতো ফরসা রং স্তুরুতার। তাইতেই ভুল বোঝাবুঝি। ফলে এই বিপত্তি।

খবরটা শুনে নেতাজি অস্থির হয়ে উঠলেন। হাচিয়া আর কাকিৎসুবো নিজেদের সহকর্মীদের ওপর এই আক্রমণে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ। একটু পরেই ক্ষতবিক্ষত স্তুরুতাকে বয়ে আনা হল সেখানে। নেতাজি দৌড়ে গিয়ে স্তুরুতার মাথাটা কোলে নিয়ে একটা ময়লা শতরঞ্চিতে শোয়ালেন তাকে। জাপানিদের কাছে এরপর তিনি মুখ দেখাবেন কী করে?

আস্তে আস্তে বোঝা গেল ব্যাপারটা। স্তুরুতা পথ হারিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের পরের ঘাঁটিতে পৌঁছে নেতাজির সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিল। স্তুরুতার ইংরিজি বোঝেনি সেখানকার সৈন্যরা। তার ওপর স্তুরুতার গায়ের রং জাপানিদের মতো হলদেটে নয়, সাহেবদের মতো ধবধবে সাদা। তাই এই হামলা।

জেনারেল চ্যাটার্জি তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ওষুধ বা উপযুক্ত উপকরণ কোথায়? সেই অবস্থাতেও স্তুরুতা আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'নেতাজি। দোষ কারও নয়। এটা আমার ভাগ্যের লিখন।'

জানকী তাঁকে একটু দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করলেন। স্তুরুতা ইশারায় হাচিয়াকে কাছে আসতে বলল। ক্ষীণস্বরে বলল, 'গত এক বছর আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তার সঙ্গে যদি দেখা হয় বলবেন, আমি সবসময় তার কথা ভেবেছি।'

'স্তুরুতা সাহস হারিয়ো না। আমরা তোমাকে মৌলমিনের হাসপাতালে নিয়ে যাব।' জলভরা চোখে বললেন নেতাজি।

স্তুরুতা হাসল। 'আর কোনও কিছুতেই কিছু হবে না।' নেতাজির হাতটা ধরে বলল স্তুরুতা। আস্তে আস্তে চোখ বুজল। সে চোখ আর কোনওদিন খুলবে না।

অঝোরে কাঁদছেন নেতাজি। কেউ থামাতে পারছে না তাঁকে। বারবার বলছেন, 'কী মিষ্টি ছিল ছেলেটা।' নেতাজির ছোটভাই সন্তোষ ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছিল। তার মৃত্যুতেও এভাবে কাঁদেননি নেতাজি।

জাপানি প্রথায় স্তুরুতার অন্তিম সংস্কার শেষ করে, রাতে আবার পথ চলা শুরু হল।

২৯ এপ্রিল। দিনের বেলা পথ চলা নেই। জানকী জোর করে নেতাজির বুট দুটো খুলে পা দুটোকে একটু বিশ্রাম দিতে বললেন। নেতাজি জুতো-মোজা খুলতেই জানকী তাঁর পায়ের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত। সারা পা ফোসকায় ভরা। মেয়েরা হেঁটে যাচ্ছে বলে নেতাজিও গাড়ি থেকে নেমে তাদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছেন। তার ওপরে দিনের বেলাতেও তাঁর বিশ্রাম নেই। সবকিছুর তদারকি করে বেড়ান তিনি। অবাক দৃষ্টিতে নেতাজির দিকে তাকিয়ে থাকেন জানকী। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক, হাজার হাজার সৈন্যের চোখের মণি, অসংখ্য দেশবাসীর আত্মার আত্মীয়, নবযুগের সারথি নেতাজি। যাঁর একটা মুখের কথায় হাজার হাজার তরুণ-তরুণী আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে আজ কতদিন ধরে ভাল করে দু' মুঠো খাবারও জোটেনি তাঁর। বর্মার এই জঙ্গলে, গাছের নীচে ময়লা চাদরের ওপর বসে আছেন নির্বিকারভাবে শুকনো পাতার রাশির মাঝে। মনে শুধু একটাই চিন্তা। সৈন্যরা কোথায় ঘুমোবে, কী খাবে, কী পরবে? কোনওদিন কোনও সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা নেননি তিনি। তা সত্ত্বেও শুধু অভিজ্ঞতা আর চিন্তার পুঁজি সম্বল করে অকল্পনীয় প্রতিকূলতার মধ্যে আমেরিকা আর ব্রিটিশের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

নেতাজির পায়ে ফোসকা গলে অনেক জায়গায় দগদগে ঘা হয়ে গেছে। সযত্নে পা ধুইয়ে আয়োডিন লাগিয়ে দেন জানকী।

রাতে আবার পথ চলা। জানকী আর অন্যান্য মেয়েরা এবার লরিতে ওঠার জন্য নেতাজিকে অনুরোধ করেন। সে অনুরোধে কান দেন না তিনি। সারা পায়ে ফোসকা থাকা সত্ত্বেও সে রাতেও পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করলেন তিনি।

পথে কয়েকটা নদী খেয়া নৌকোয় পার হতে হয়েছে। তাতেই অনেকে পেছিয়ে পড়েছে। জানবাজ দলও নদী পেরোতে না পেরে বেশ কিছুটা দূরে। বিলিন নদীর অন্যপারে রয়েছে। নেতাজি স্থির করলেন তাঁদের জন্য অপেক্ষা করবেন। সঙ্গের জাপানিরা চলে গেল মৌলমিনের দিকে।

সন্ধের সময় জাপানি জেনারেল ইসোডা এলেন কয়েকটা লরি নিয়ে। নেতাজিকে মিনতি করে বললেন যে ঝাঁসির রানি বাহিনীর মেয়েদের নিয়ে লরি করে তিনি যেন চলে যান। 'জানবাজ' বাহিনীর সৈন্যদের খাবার ব্যবস্থা তিনি পরে করছেন। এ প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন নেতাজি। বললেন, 'আপনি কি আমাকে বর্মার বা ম পেয়েছেন যে আমার প্রিয় সাথিদের পেছনে ফেলে রেখে নিজের জান বাঁচাবার জন্য পালিয়ে যাব আমি?'

নেতাজির কথায় ইসোডার চোখেও জল দেখা দিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকদের তিনি বললেন, 'ভগবান বুদ্ধ রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে কীভাবে তপস্যা করেছিলেন, সেটা আজ আমরা বুঝতে পারছি।' পয়লা মে বাহিনী মৌলমিনে পৌঁছল। খবর পাওয়া গেল ব্রিটিশরা পেগু দখল করেছে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সদস্যরা আগত সৈনিকদের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। অভুক্ত, অর্ধভুক্ত সৈন্যরা অনেকদিন পরে দু-মুঠো খেতে পারল। আধপেটা খাওয়া, দুর্বল সৈন্যরা ঘুমোতে পারল। এখান থেকে ব্যাংকক যেতে হবে ট্রেনে। নেতাজি সারাদিন তার ব্যবস্থা করার জন্য ছুটোছুটি করছেন।

রাতে সবাই রেলস্টেশনে জমায়েত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মেয়েদের যাবার ব্যবস্থা হয়েছে দেখে নেতাজির একটু নিশ্চিন্ত লাগছে। কর্নেল শওকত মালিককে মেয়েদের সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। অনেকদিন ধরে একটা কথা তাঁর মনে পাক দিচ্ছিল। হঠাৎ বিষণ্ণ নেতাজির মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে পড়ল। বললেন, 'মা-র কথা কিছুদিন ধরে বড় মনে হচ্ছে আমার। কলকাতায় বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একটা ভীষণ অপরাধ করেছিলাম আমি।'

সবাই কান পেতে আছে। রুদ্ধস্বরে নেতাজি বললেন, 'তিন-তিনবার মা-র কামরার কাছে গিয়েও ফিরে এসেছি আমি। মনে হয়েছে, আমি চলে যাচ্ছি শুনে মা যদি চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন, তা হলে? কিন্তু আজ মনে হচ্ছে দারুণ অন্যায় করেছিলাম আমি। এটা করা উচিত হয়নি আমার।'

এরপরের যাত্রা মালগাড়িতে। একটা ডিব্বায় ঠেসেঠুসে বসল মেয়েরা। বৃষ্টি পড়ছে। ঘণ্টা দুই কোনওমতে গাড়ি চলল। তারপর থেমে গেল একটা জঙ্গলের মাঝে। সামনের নদীর ওপরকার পুল উড়িয়ে দিয়েছে শত্রু বিমান। গাড়ি থেকে নেমে আবার পায়ে হাঁটা শুরু করল সবাই। একটা নদী পেরিয়ে অনেকটা রাস্তা অতিক্রম করল তারা। কিন্তু সামনে যে ট্রেন থাকার কথা তার দেখা নেই। রেললাইনের ওপর জায়গায় জায়গায় খড়ের গাদা। প্ল্যাটফর্মেও তাই।

সন্ধে হল। জাপানিরা তাড়াতাড়ি খড়ের গাদা সরাতে লেগে গেল। খড়ের গাদার নীচ থেকে বেরিয়ে পড়ল মালগাড়ির আলাদা করে রাখা ডিব্বাগুলো। শত্রুদের বিমানের লক্ষ থেকে বাঁচারই কৌশল ছিল এটা। ডিব্বাগুলোকে জোড়া দিয়ে মালগাড়ি তৈরি হল আবার। রাতে শুরু হল চলা।

নেতাজির গাড়ি চলেছে পাশের একটা রাস্তা দিয়ে। মধ্যে মধ্যেই তিনি গাড়ির কাছে এসে মেয়েদের খবর নিচ্ছেন। একসময় দেখা গেল সামনের আর একটা পুলও উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার পায়ে হাঁটা শুরু হল। নেতাজিও সঙ্গীদের নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলেছেন।

বহু ভারতীয় শ্রমিকের রক্ত দিয়ে গড়ে উঠেছে এই রেলপথ শ্যাম আর ব্রহ্মদেশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। এর প্রতিটি অংশে রয়েছে অনেক ভারতীয় শ্রমিকের জীবনদানের কাহিনি। অসংখ্য মৃত্যুর মূল্যে গড়া এই রেলপথের নাম তাই 'মৃত্যুর রেলওয়ে'।

রেলপথের ধারে দেখা গেল এক জরাজীর্ণ বেঁকে যাওয়া শরীর, ছেঁড়া পোশাক পরা জাপানিকে। অস্থিসার শরীরেও সে সযত্নে রেলপথের পাথরগুলোকে ঠিক করে রাখছে যাতে রেলপথটা ঠিক থাকে তার জন্য।

নেতাজির কাছে কিছু খাবার চাইল লোকটি। মেয়েরা নিজেদের খাবার থেকে খাবার দিল তাঁকে। নেতাজি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে।

লোকটি কথা বলছে ইংরেজিতে। বোঝা গেল লোকটি অফিসার ছিল। তাঁর সঙ্গীরা সবাই মারা গেছে বোমার আঘাতে। গত চার বছর ধরে একাই রয়েছে সে। করুণায় কেঁদে ওঠে নেতাজির মন। বললেন, 'আমাদের সঙ্গে টোকিয়ো চলুন আপনি।'

সবিনয়ে অস্বীকার করে লোকটি বলল, 'এই রেলপথকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সম্রাট আদেশ দিয়েছেন আমাকে। আমাদের সাক্ষাৎ ভগবান, আমাদের সূর্যবংশী সম্রাটের আদেশ পালনের জন্যে এখানেই থাকতে হবে আমাকে।'

লোকটির নিষ্ঠায় সকলে অভিভূত।

আবার পায়ে হাঁটা। অবশেষে একদিন, কখনও ট্রেনে, কখনও হেঁটে রেঙ্গুন থেকে তিনশো মাইল পথ অতিক্রম করে ব্যাংকক পৌঁছল বাহিনী।

ব্যাংককে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সদস্যরা এঁদের স্বাগত জানালেন। সিন্ধি ব্যবসায়ী সেবকরাম মেহতা নেতাজির থাকার জন্য নিজের বিরাট বাড়িটি ছেড়ে দিলেন। মেয়েদের মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা হল দিন চারেকের মধ্যেই। সবাইকে নিয়ে একটা বিদায়ী-ভোজের ব্যবস্থা হল সেবকরামের বাড়িতে।

খাওয়ার সময় নেতাজিকে বেশ খুশি দেখাচ্ছিল। এত খুশির কারণটা জানতে চাইলেন জানকী। নেতাজি বললেন, 'তোমাকে তো আমি আগেই আমার কলকাতা থেকে আসার সময় মায়ের সঙ্গে দেখা না করে আসার কথা বলেছি।' কাল রাতে মা এসেছিলেন স্বপ্নে। আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে তিনি হেসে বললেন, 'তুই এখনও পাগলই রয়ে গেলি। তুই যদি যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেতিস তা হলেই বা কী হত? তুই কি মনে করিস আমি ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতাম? ওরে আমি যে সুভাষচন্দ্রের মা! সেটা কী করে ভুললি তুই।'

ঝাঁসির রানি বাহিনীর সব মেয়েরা নিজেদের বাড়ি ফিরে গেছে। রয়ে গেছে শুধু জানকী। নেতাজির কাছে জেদ ধরল সে। বাড়ি যাবে না। অনেক করে বোঝালেন তাকে নেতাজি। 'যুদ্ধের চাকা ঘুরে গেছে। এখন আর কোনও উপায় নেই। তুমি ভেব না। সুদিন যদি আসে আবার ডেকে নেব তোমাকে।'

নেতাজির প্রতিশ্রুতিতে শান্ত হলেন জানকী।

জানকী তখন কুয়ালালামপুরের পথে। গাড়িতে একজনের কাছে খবরটা পেলেন জানকী। রেডিয়োতে বলেছে গতকাল রাতে কলকাতায় সুভাষজননী প্রভাবতী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

মা আর ছেলের সাক্ষাৎ আর হল না। নেতাজি কীভাবে নেবেন এ খবর? কে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে?

১০

নেতাজির কাছ থেকে বিদায় নেবার পরে শাহনওয়াজ জিপে করে পঁচিশ মাইল দূরে পোপা পাহাড়ে পৌঁছলেন। ইরাবতী তীরের বগান আর ন্যাঙ্গু থেকে ম্যাকটিলা যাবার রাস্তা পোপা পাহাড়ের ওপর দিয়েই গেছে। পঁচিশ বর্গমাইল ছড়ানো পোপা পাহাড় সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা চূড়া তারই মধ্যে বিশাল একটা শিবলিঙ্গের মতো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চূড়াটার ওপর তিনটে প্যাগোডা রয়েছে। ওখানেই শাহনওয়াজের সঙ্গে গুরুবক্স সিং ধিল্লোঁর সাক্ষাৎ হল। ইরাবতী তীরের যুদ্ধে ধিল্লোঁর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন বাগরির মতো সামর্থ্যবান তরুণ এখনও তাঁর সঙ্গে আছেন। ক্যাপ্টেন বাগরি শাহনওয়াজকে বললেন, 'ভেবেছিলাম একদিন জীবনের চরম সার্থকতা পাব লালকেল্লায়। তেরঙা ঝান্ডা উড়তে দেখে। সেটা যদি ভাগ্যে না থাকে তবে সবার আগে মৃত্যুবরণ করাই আমার বাসনা।'

প্রেম সেহগল আর ধিল্লোঁ শাহনওয়াজের দলে যোগ দিলেন। প্রাণপণ চেষ্টায় ধিল্লোঁ প্রায় সাতশোজন সৈনিককে জড়ো করলেন। চাকপাডাং থেকে ম্যাকটিলা যাবার রাস্তা রক্ষার ভার শাহনওয়াজ তার ওপরে দিলেন। ইরাবতী তীর থেকে রেঙ্গুন যাবার পথে শত্রুকে এখানেই রুখে দেবার দায়িত্ব তার ওপরে। পোপা পাহাড়ে জলটা সহজেই পাওয়া যায়। খাবার জন্য আছে বুনো কলা আর বেল।

দু-তিনদিনের মধ্যেই শত্রুর ছোট ছোট দলকে ইরাবতীর তীর থেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কিন্তু মূল ডিভিশনটি ম্যাকটিলার দিকে না এগিয়ে প্রোমের রাস্তা ধরল। তাদের গতিপথের খবর পেয়েই প্রেম সেহগল লেগি গ্রামের কাছে ওত পেতে বসলেন। প্রেমের দলটা ছোট। রাইফেল আর হালকা অস্ত্র ছাড়া ভারী কামান কিছু নেই। এই পরিস্থিতিতেও ইয়াসিন

খান, কানোয়ার সিংদের নিয়ে অসীম বীরত্বে পুরো একটা ব্রিগেডকে রুখে দিলেন প্রেম। খবরটা পেয়ে শাহনওয়াজ খুশিতে উচ্ছল।

হঠাৎ এক রাতে প্রেম শাহনওয়াজের কাছে ছুটে এলেন। উত্তেজিতভাবে বললেন, 'বেইমানি। আবার বেইমানি। ইয়াসিন খান শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমি বুঝতে পারি না এদের। ইয়াসিনের মতো বীর, যে সেদিনও প্রাণপণ করে শত্রুর মোকাবিলা করেছে সে গিয়ে দুশমনের সঙ্গে হাত মেলায় কেন? কারও ওপর আর ভরসা নেই আমার।'

'মন খারাপ কোরো না প্রেম। যতক্ষণ পর্যন্ত নেতাজি রেঙ্গুনে রয়েছেন ততক্ষণ প্রাণপণে শত্রুকে রুখতেই হবে আমাদের। শত্রু যদি তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করে তো সেই হবে আমাদের চরম অপমান।'

সেই রাতেই সেই পাহাড়ে শাহনওয়াজ নিজের সমস্ত সৈন্যদের জড়ো করলেন। হাত জোড় করে বললেন, 'সাথিরা শোনো। আমরা জানি শত্রুর শক্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তবু আমরা লড়ছি আমাদের আদর্শের জন্য, সম্মানের জন্য। তোমাদের মধ্যে যারা ভয় পাচ্ছ, কিংবা যারা নেতাজির স্বপ্নে বিশ্বাস করো না তারা অনায়াসে ফিরে যেতে পারো। কেউ তাদের আটকাবে না। যদি তোমাদের কেউ শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাও তো খোলাখুলি বলো। শুধু তোমাদের অস্ত্রটা রেখে দিয়ে আর শত্রুকে আমাদের গোপন তথ্য দেবে না—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমরা তাও করতে পারো।'

'জেনারেল সাহেব। যারা ভীরু, যারা কাপুরুষ তারা ইতিমধ্যেই চলে গেছে, আপনি চিন্তা করবেন না।' ক্যাপ্টেন বাগরি বললেন।

ব্রিটিশ ফৌজ বাঘের মতো পেছনে লেগে আছে। প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের সামনে পড়ে জাপানি ফৌজ ক্রমেই অসহায় হয়ে পড়ছে। বর্মায় ব্রিটিশ দখল দ্রুত বাড়ছে। প্রোমের রাস্তায় তাদের আটকাবার ভার জ্ঞান সিং ভিস্তকে দিলেন শাহনওয়াজ। পাহাড়ের নীচে অনেক ট্রেঞ্চ খোঁড়া হল। আটানব্বই জন সাথিকে নিয়ে বীর জ্ঞান সিং ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। শাহনওয়াজ চলে যাবার পর ব্রিটিশ বাহিনী তেরোটা ট্যাঙ্ক, এগারোটা সাঁজোয়া গাড়ি আর দশটা লরিতে এগিয়ে এল। তারা গুলির আওতায় আসা পর্যন্ত চুপ করে বসে রইলেন জ্ঞান সিং। তারপর এই আটানব্বইজন বীর সৈন্য আক্রমণ শুরু করল। শত্রু প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাদের কাছে রয়েছে কামান আর অফুরন্ত গোলাগুলির ভাণ্ডার। সে তুলনায় আজাদি সেনারা নিঃস্ব বললেই হয়। সংখ্যার দিক দিয়েও তারা অনেক অনেক কম। কিন্তু চিতাবাঘের মতো, জ্ঞান সিংও পিছে হটার পাত্র নন। ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে ব্রিটিশ বাহিনী অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে। মাটি ধসছে, রক্তমাখা শরীরগুলো লুটিয়ে পড়ছে। অবশেষে পনেরোজন বাহাদুর সৈন্য 'ফায়ার', 'নেতাজি কী জয়', 'চল দিল্লি' ধ্বনি দিতে দিতে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে ট্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের মধ্যে অনেকে লুটিয়ে পড়ল গুলির আঘাতে। মেশিনগানের গুলিও ফুরোল। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান সিং পেটে একটা হাতবোমা বেঁধে সাঁজোয়া গাড়ির নীচে লাফ মারলেন। সাঁজোয়া গাড়িটা আর জ্ঞান সিংয়ের শরীর একই সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল। সেই এক কোম্পানি সৈন্য ব্রিটিশের এই সাঁজোয়া বাহিনীর অর্ধেকটা বিধ্বস্ত করে দিল। পোপার রাস্তায় রচিত হল নতুন ইতিহাস।

বর্মায় এখন উলটো হাওয়া বইছে। জেনারেল আউঙ্গ সানের অনুগামীরা যেখানে সেখানে জাপানিদের ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছে। একমাত্র আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরাই ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। কিন্তু বর্মিরা আর আগের মতো তাদের ওপর সহানুভূতিশীল নেই।

প্রোম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে পৌঁছে শাহনওয়াজ বর্মা থেকে জাপানি ফৌজের পশ্চাদপসরণের খবর পেলেন। বর্মায় বর্ষা এসে পড়েছে। কাঁচা রাস্তাগুলো কাদাভরা। সে কাদা শিকলের মতো পা আটকে দিচ্ছে আজাদি সেনাদের। কিন্তু নেতাজির প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর তারা।

জ্ঞান সিংয়ের মতো লড়াইয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন ক্যাপ্টেন বাগরি। একটা ধানখেতে বিশ্রাম করার সময় হঠাৎ তাদের ওপর সাঁজোয়া গাড়ির একটা বাহিনীর আক্রমণ শুরু হল। সাঁজোয়া গাড়িগুলো ঘিরে ফেলল তাদের। অস্ত্রশস্ত্র বলতে তাদের কাছে আর কিছুই নেই। ক্যাপ্টেন বাগরি আর তার সাথিরা এবার পেটের সঙ্গে পেট্রলের বোতল বেঁধে নিলেন। এইভাবে পেট্রলের বোতল বেঁধে ট্যাঙ্কগুলোর নীচে লাফিয়ে পড়লেন তাঁরা। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উড়ে গেল ট্যাঙ্ক। পরের দিন শাহনওয়াজ যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন দেখলেন তাদের আধপোড়া শবদেহগুলো আর তাদের বীরত্বের সাক্ষী ভাঙাচোরা ট্যাঙ্কগুলো।

একভাবে বৃষ্টি পড়ছে। শাহনওয়াজ, ধিল্লোঁ আর মেহ্‌রদাস, লোগি নামে একটা গ্রামে পৌঁছলেন। সে দিনটা ছিল ১৪ মে, ১৯৪৫। গ্রামের প্রধান কিছুটা দুধ এনে দিল তাদের। আশেপাশের অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়ে গেছে প্রায়।

লোগিতেই জাপানি ক্যাপ্টেন ইজুমি এসে শাহনওয়াজকে জানালেন যে দশদিন আগেই পেগু ব্রিটিশদের দখলে চলে গেছে।

শিউরে উঠলেন শাহনওয়াজ। নেতাজি কি তখনও রেঙ্গুনে ছিলেন? তিনি বন্দি হননি তো? ওদিকে ধিল্লোঁ অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথায় কাতর। সেই প্রচণ্ড ব্যথা নিয়েও হাঁটছেন তিনি অন্যদের সঙ্গে। তাঁর কাছে রয়েছে প্রায় তিন লাখ টাকা।

বৃষ্টির তোড় বাড়ছে। ১৬ মে, ১৯৪৫। পেগু নদীর তীরে পৌঁছেছে সবাই। নদীতে বান ডেকেছে। ঘোলা জল খলখল করে ছুটে চলেছে। আশেপাশে কোথাও কোনও নৌকো দেখা যাচ্ছে না। সৈন্যরা নদীর ধারের কতকগুলো খালি ঝুপড়ি ভেঙে সেগুলোর বাঁশ-কাঠ-চাটাই দিয়ে ভেলা তৈরি করল। জলে ভাসাতেই নদীর স্রোতে সেগুলো ভেসে গেল অনেক দূরে। তবু হাল ছাড়ে না তারা। প্রায় মাঝরাত্তির নাগাদ বহু কষ্টে নদী পেরোতে পারা গেল।

নদীর অপর পারে পৌঁছে কিছু জাপানির দেখা পাওয়া গেল। তারা জানাল যে সামনের গ্রামটাও ব্রিটিশ বাহিনীর দখলে চলে গেছে। অর্থাৎ চারদিকেই শত্রুর চক্রব্যূহ সম্পূর্ণ।

কোনওদিকে কোনও আশার আলো নেই। কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে ধিল্লোঁর হাতে দিয়ে শাহনওয়াজ বললেন, 'বক্সি, এর মধ্যে আটটা গুলি আছে। ছ'টা শত্রুর জন্য আর দুটো আমার জন্য।'

'তুমি আত্মহত্যা করতে চাও শানো?' ধিল্লোঁ আর্তনাদ করে উঠলেন।

'এটা আত্মহত্যা নয়, আত্মবলি।' ক্রুদ্ধস্বরে বললেন শাহনওয়াজ।

সিন্টপিনজেকস নাম গ্রামটার। রাত দুটোর সময় আজাদি সেনাদের বৈঠক শুরু হল সেখানে। বাইরে বৃষ্টি আর ভয়ংকরী পেগু নদীর প্রচণ্ড স্রোতের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কিছুটা দূরেই শত্রু ফাঁদ পেতে বসে আছে। শান্ত, ধীরস্বরে পরিস্থিতিটা তুলে ধরলেন শাহনওয়াজ।

'আমাদের সামনে এখন তিনটি মাত্র রাস্তা রয়েছে। এক আত্মহত্যা—'

'ওটা কোনও বীরের কাজ নয়', শাহনওয়াজকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ধিল্লোঁ।

'দ্বিতীয় রাস্তা শত্রুদের সঙ্গে লড়তে লড়তে মৃত্যুবরণ করা আর তৃতীয় যুদ্ধবন্দিত্ব স্বীকার করা। এবার আপনারা বলুন কোনটা করতে চান আপনারা?' একবার সবার দিকে তাকিয়ে

শাহনওয়াজ বললেন, 'আমার নিজের পছন্দ প্রথম দুটি রাস্তা অর্থাৎ হয় আত্মহত্যা নয়তো শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে বীরের মতো মরা। আমাদের বীর জ্ঞান সিং এই শেষের রাস্তাটা দেখিয়ে গেছেন। ক্যাপ্টেন বাগরি আমাদের তাই শিখিয়ে গেছেন। অবশ্য এটা সত্যি যে তাতে অবস্থার বিশেষ কিছু ইতর বিশেষ হয়নি।'

'ভুল শানো ভুল।' কাতরে উঠলেন ধিল্লোঁ। 'তাঁদের এ আত্মত্যাগ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেখাবে দেশকে কীভাবে ভালবাসতে হয়। আমাদের দায়িত্ব এই আত্মদানের কথা আগামী প্রজন্মকে জানিয়ে যাওয়া। ব্রহ্মদেশের মাটিতে নেতাজি যে মহাযজ্ঞ শুরু করেছিলেন তার কথা জানাতে হবে সবাইকে।'

'সেটা এই পরিস্থিতিতে কী করে সম্ভব?'

'আমরা যুদ্ধবন্দি হব। ব্রিটিশরা নিশ্চয়ই আমাদের কোর্ট মার্শাল করবে। সেই মামলার সময় সারা দেশবাসী জানবে নেতাজি কী করে গেছেন! এই জঙ্গলে প্রাণ বিসর্জন দিলে কে জানবে সে কাহিনি? প্রাণ দিতে আমার কুণ্ঠা নেই। আর এটাও ঠিক কোর্ট মার্শালে ফাঁসি আমাদের হবেই। কিন্তু সেই মরণের আগে আমরা তো দেশবাসীকে জানাতে পারব এইসব বীরেদের কাহিনি।'

গুরুবক্সের কথার যুক্তি অস্বীকার করতে পারেন না শাহনওয়াজ। কিন্তু মন সায় দেয় না। এই জঙ্গল, এই পাহাড়, নেতাজিকে দেওয়া কথা আর তা ছাড়া...। না এখানেই থেকে যাবেন তিনি।

ধিল্লোঁ চিন্তা করছেন। হঠাৎ উঠে শাহনওয়াজকে নিয়ে বাইরে চলে এলেন তিনি। চারপাশ দেখে নিয়ে বললেন, 'আমি জানি কেন তুমি যেতে চাইছ না। আসলে নেতাজির নিরাপত্তার চিন্তা অস্থির করে তুলেছে তোমাকে, তাই না?'

শাহনওয়াজের মনের কথাটা জেনে ফেলেছেন ধিল্লোঁ। হেসে ফেললেন শাহনওয়াজ। এবার ধিল্লোঁ বললেন, 'তোমার জন্য সুখবর আছে শানো। চিন্তার কোনও কারণ নেই। মৌলমিনের রাস্তায় ব্যাংককের দিকে চলে গেছেন নেতাজি। বেশ কয়েকদিন আগেই তিনি ব্রিটিশের নাগালের বাইরে পৌঁছে গেছেন।

খবরটা শুনে আনন্দে ধিল্লোঁকে জড়িয়ে ধরেন শাহনওয়াজ। দুপুরে একটা গাছের নীচে আবার বৈঠক শুরু হল। আকাশে মাঝে মাঝেই উড়ে যাচ্ছে ব্রিটিশ বিমান। দূরে একটা গ্রাম থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। সেই গ্রাম আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের আশ্রয় দিয়েছিল এই অপরাধে গ্রামটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে ব্রিটিশেরা। এমন সময় আর একটা ছোট্টগ্রাম থেকে কাঁদতে কাঁদতে এল একটা লোক। একই কথা জানাল সে। শাহনওয়াজ বুঝলেন। যে গ্রামেই যাবেন তাঁরা, ব্রিটিশের প্রতিহিংসার আগুনে পুড়বে সে গ্রাম। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। আত্মসমর্পণ করাই সঠিক পদক্ষেপ।

কয়েকজন আজাদি সেনা আর একজন গ্রামবাসী সাদা নিশান নিয়ে ব্রিটিশ ছাউনিতে গেল। মেহ্‌র সিং সবার হাতে একটা করে রুটির টুকরো আর একটু করে মাখন দিলেন। বৃষ্টির মধ্যে, গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সবাই আজাদ হিন্দ ফৌজের শেষ খাওয়া খেয়ে নিল।

একটু পরে দুটো ট্রাক কাদা ভেঙে এসে পৌঁছল। অবশিষ্ট সামান্য যে ক'টা অস্ত্রশস্ত্র ছিল সেগুলো ট্রাকের মধ্যে ফেলে দিল সবাই। শাহনওয়াজ অফিসারদের নিয়ে জিপে বসলেন। তাদের পাশে একজন ইংরেজ মেজর আর একজন ভারতীয় মেজর। এদের পোশাক-আশাকের দৈন্যদশায় মজা পাচ্ছে তারা।

একসময় সবাই এসে পৌঁছল ব্রিটিশ বাহিনীর গোলন্দাজ ছাউনিতে। ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যরা অবাক হয়ে দেখছে তাদের।

বুক ফুলিয়ে, সারি দিয়ে দাঁড়াল তিনশোজন আজাদি সেনা। উর্দিগুলো কাদামাখা। ছিঁড়েখুঁড়েও গেছে অনেক জায়গায়। বেশির ভাগ লোকেরই পায়ে জুতো নেই। কিন্তু সবার হাতে বাঁধা আজাদ হিন্দ ফৌজের তকমায় I.N.A—এই অক্ষরগুলো যেন জ্বলজ্বল করছে। শাহনওয়াজ হিন্দুস্থানিতে হুকুম দিলেন, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ দাহিনে সিধাই লেঙ্গে—দাহিনে সিধাই লো।'

আত্মসমর্পণের মুহূর্তেও আজাদি সেনাদের ধ্বনিতে মুখর হল ব্রিটিশ ছাউনি।

'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ'
'পেয়ারে নেতাজি জিন্দাবাদ'
'চল দিল্লি, হামারি দিল্লি।'

১১

'চন্দ্রা বোস তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যদের নিয়ে ব্যাংককে আসছেন। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য একটা প্লেটুন রওনা করে দাও।' ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি সহকারীদের আদেশ দিলেন।

তিন সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্রটা পুরো বদলে গেছে। কয়েক মাস আগে রাশিয়ার একটা বিরাট অংশ ছিল জার্মানদের দখলে। মস্কোর প্রায় অর্ধেক বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল হিটলারের বাহিনী কিন্তু আজ সেই জার্মানদের রাজধানী মিত্ররাষ্ট্রগুলির কবলে। বার্লিনের পতন ঘটেছে। হিটলার আত্মহত্যা করেছেন। সব শেষ। ইউরোপে যুদ্ধের আগুন নিবে গেছে। একমাত্র ছোট্ট জাপান আজও পাশ্চাত্য শক্তির কাছে নতিস্বীকার করেনি। পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ এখনও চলছে।

কিন্তু আর কতদিন লড়বে জাপান? আমেরিকার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। রাশিয়া একসময় জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিল। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে রাশিয়ার লাল ভালুক কবে যে পিঁপড়ের ঢিবিতে নাক ঢোকাবে সেটা বলা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় আজাদ হিন্দ ফৌজের কী হবে এই চিন্তাই করে চলেছেন নেতাজি। ব্যাংককে তাঁর বাড়িতে সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে একান্তবাসে ধ্যান আর অধ্যয়ন নিয়ে রয়েছেন তিনি।

পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের বিশ্লেষণ করছেন তিনি। পূর্ব এশিয়ায় এখন যুদ্ধের শেষ পর্যায়। ফিলিপাইনসের একটার পর একটা দ্বীপ থেকে জাপানিদের তাড়িয়ে মার্কিনবাহিনী টোকিয়োর দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রশান্ত মহাসাগর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের B-29 বিমানগুলো।

নেতাজির সঙ্গীরা চিন্তা করছেন নেতাজির নিরাপত্তার বিষয়ে। আর নেতাজি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। প্রত্যেকদিন আইয়ার রেডিয়োর খবরের চুম্বক তৈরি করে নেতাজির টেবিলে রেখে দেন। ব্রিটিশ কূটনীতি এবার আর এক কুটিল চাল চালছে। ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল প্রস্তাব এনেছেন যে বড়লাটের কাউন্সিলে হিন্দু আর মুসলমানদের সমান সংখ্যা রাখা হবে। নেতাজি দেবনাথ দাসকে বললেন, 'ওরা ছুরি শানাচ্ছে।'

'কীসের ছুরি নেতাজি?'

'ব্রিটিশ কূটনীতির। আমাদের আস্ত, মস্ত দেশটাকে দু' টুকরো করার জন্য হাত নিশপিশ করছে ওদের।

'এখনই দেশভাগের ব্যাপারটা আপনি কেন অনুমান করছেন?'

'এখন নয়, সাত বছর আগেই হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণেই আমি এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ যে সব দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, সব জায়গাতেই এই চাল চেলেছে। দেশগুলোকে টুকরো করে তবেই ইংল্যান্ডের রাস্তা ধরেছে তারা।'

'তার মানে আপনি দেশভাগের বিপক্ষে—'

'ছিলাম, আছি, আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকব।'

ব্যাংককের রেডিয়ো স্টেশনে আমেরিকানরা বোমা ফেলেছে। অনেক কিছুই ভেঙেচুরে গেছে। তবু দুর্বার আগ্রহ নিয়ে নেতাজি গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। ইঞ্জিনিয়ারদের উৎসাহ দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা করে ভারতের উদ্দেশ্যে তাঁর আকুল বার্তা পাঠালেন। সেই ভাষণে তিনি বললেন, 'বন্ধুগণ, দেশবিভাগের দুর্দৈব মেনে নিয়ে দেশকে দুর্বল, পঙ্গু দেখার চেয়ে আমি বছরের পর বছর গৃহযুদ্ধও মেনে নেব। আমেরিকাকে এক রাখার জন্য আব্রাহাম লিঙ্কন গৃহযুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইতিহাসের সাধ্য নেই তাঁকে দোষারোপ করে। সেই একই উদ্দেশ্যে, আমাদের প্রিয় দেশকে অখণ্ড রাখার জন্য যদি আমি সংগ্রাম করি তবে ইতিহাস আমাকে কী করে দোষ দেবে? আমাদের দেশকে এক অখণ্ড শক্তিশালী দেশ হিসাবে গড়ে তুলতেই হবে আমাদের। তাই বন্ধুগণ ক্রিপস প্রস্তাবের মতো ওয়াভেলের এই বিষাক্ত প্রস্তাবও দূরে ছুড়ে ফেলে দিন আপনারা।'

আমেরিকান ফৌজ পূর্ব এশিয়ায় ক্রমশই এগিয়ে আসছে। তেরাউচির ওপর তাই আঁচটা বেশি। সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর দপ্তর সায়গনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর দপ্তর কোথায় রাখা হবে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

জাপানি রাজদূত হাচিয়া এসে নেতাজির সঙ্গে দেখা করে জানালেন যে জাপান সরকার বৃহৎ এশিয়া পরিষদের সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানকে জাপানে রাজাশ্রয় দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই ফিলিপাইনসের প্রেসিডেন্ট, নানকিংয়ের চিন সরকারের চেন কুকান পো আর বর্মার ড. বা ম জাপানে আশ্রয় নিয়েছেন। আরও অনেকে রওনা হয়ে গেছেন জাপানের পথে।

নেতাজি এ প্রস্তাব সোজা অগ্রাহ্য করলেন। বললেন, 'আমার সহকর্মীরা এখনও তাঁদের তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে ফেলেননি। স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই চালাতেই হবে।'

সহকর্মীদের ডেকে পাঠালেন নেতাজি। বললেন, 'আজকের পরিস্থিতিতে সব কিছুই সম্ভব। কে জানে এই টালমাটালের মধ্যে দিয়েই হয়তো ভারতে যাওয়ার নতুন রাস্তা পেয়ে যাব আমরা। আমি জানি না আমার ভবিষ্যৎ। হয়তো সাইবেরিয়ার অতি দূর প্রান্তে জীবন কাটাতে হবে আমাকে, বন্দি হয়ে জাঁতা পিষতে হবে— কিন্তু আমি আবার ফৌজ তৈরি করব। ভারতবর্ষের জন্য বিশ্বযুদ্ধও যদি লড়তে হয় তাও লড়ব। কিন্তু ব্রিটিশদের দূর করে দিয়ে স্বাধীনতার সিংহদ্বার খুলে দেবই আমরা।'

নেতাজির অস্থির মন পথ খুঁজে চলেছে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল এক জাপানি জাহাজের ক্যাপ্টেনের কথা। একসময় তাঁর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁর। পৃথিবীর প্রায় সব ঘাটের জল খাওয়া, সাগরে সাগরে আধখানা পৃথিবী ঘুরে আসা জাপানি ক্যাপ্টেন নাকোডা নিশ্চয়ই কোনও রাস্তা বাতলাতে পারবেন। নাকোডা একসময় তাঁকে বলেছিলেন, 'ভগবান না করুন, ইম্ফলের যুদ্ধে যদি কিছু গোলমাল হয়ে যায় তো আমাকে স্মরণ করবেন।' ভাগ্যক্রমে নাকোডা এখন সায়গনে আছেন বলে খবর পেলেন নেতাজি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে খবর পাঠালেন তিনি। খবর পেয়েই নাকোডা এলেন ব্যাংকক।

নাকোডাও খুব ভয় পেয়েছেন। নিজে থেকেই বললেন, 'আমেরিকার বিমান হামলা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। রোজ কমপক্ষে দশ হাজার জাপানি প্রাণ হারাচ্ছে। যে-কোনও মুহূর্তে আরও বড় বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।'

'ঠিক কথা। ব্রিটিশরা এর আগে পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র দারুণ মার খেয়েছে। সাম্প্রতিককালে তাদের সমস্ত সাফল্যের মূলে রয়েছে আমেরিকার বুদ্ধি আর শক্তি।' নেতাজি বললেন। 'নাকোডা আপনার কাছে একটা পরামর্শ চাইছিলাম আমি।' নেতাজি এবার নাকোডাকে জানালেন তাঁর কথা।

একটা পুরনো অনেক চিহ্ন করা ম্যাপ বার করে টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন নাকোডা। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'আগামী দিনে একমাত্র রাশিয়াই আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।'

'আমিও সেটাই ভাবছি। রাশিয়া আর আমেরিকার বন্ধুত্ব বেশিদিন টিকবে না। আগামী দিনের পৃথিবী আমেরিকা আর রাশিয়া— এই দুই জোটের মধ্যেই ভাগ হয়ে যাবে।' নেতাজি বললেন।

'রাশিয়া আর জাপানের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি এখনও রয়েছে। তারই সুযোগ নিতে হবে। আমি বিভিন্ন সময়ে সারা পূর্ব গোলার্ধ চষে বেড়িয়েছি। আপনাকে আমি নিরাপদে সমরখন্দ বা তাসখন্দ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারব।' নাকোডা জোর দিয়ে বললেন।

দুজনের মতৈক্য হল। কিন্তু এই পরিকল্পনায় জাপানের সদর দপ্তরের সম্মতি পাওয়া দরকার। তারা অনুমতি না দিলে নাকোডা কিছু করতে রাজি নন। নেতাজিও জাপান সরকারের অজ্ঞাতে কিছু করাটা উচিত মনে করেন না। নেতাজি তাঁর পরিকল্পনার কথা জাপানের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন। অবিলম্বে উত্তরও এসে পৌঁছল। সদর দপ্তর স্পষ্ট অসম্মতি জানিয়েছেন এই প্রস্তাবে। বিষণ্ণ নাকোডা চলে গেলেন। ওপরওয়ালাদের বিপক্ষে যাবার ইচ্ছে বা শক্তি— কোনওটাই নেই তাঁর।

নেতাজি প্রচণ্ড মর্মাহত। তাঁর গতিবিধির ওপর জাপানের এই খবরদারি সারা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে তাঁর।

এর পরে ব্যাংককে থাকা মানে আগ্নেয়গিরির মুখে বিছানা পাতা। তিনি খবর পেয়েছেন থাইল্যান্ডের অনেক মন্ত্রী ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। কিছু একটা করতেই হবে। জাপান যদি আত্মসমর্পণ করে তবে আজাদ হিন্দ সরকারের কী হবে? আগামী দিনের সংগ্রামের কী হবে? সমস্ত সম্ভাবনা বারবার খতিয়ে দেখছেন তিনি।

জেনারেল কিয়ানিকে সিঙ্গাপুরে আগেই পাঠিয়েছেন তিনি। ইনায়েত কিয়ানি গেছেন ইপোতে আর জেনারেল চ্যাটার্জি রেঙ্গুনে। এক দেবনাথ দাস রয়েছেন ব্যাংককে। চারদিকে নিরাশার অন্ধকার। এরই মধ্যে নেতাজি খবর পেলেন যে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি স্বয়ং আসছেন। কারণটা বুঝতে পারছেন না নেতাজি। তেরাউচি খুব উদার মনের মানুষ। সত্যিকারের বন্ধু তিনি। সিঙ্গাপুরে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে সাহায্য করেছেন তিনি। ইম্ফল অভিযানের ব্যাপারেও মুতাগুচির পেছনে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। নাকোডার সঙ্গে তাঁর আলোচনার ব্যাপারটা তেরাউচির গোচরে আসেনি তো? নিশ্চয় তাঁর আসার গুরুতর কোনও কারণ ঘটেছে।

অনেকদিন পরে দেখা হল দুজনের। ফিল্ড মার্শালের মাথার ওপর এখন দায়িত্বের বোঝা। এখন তিনি শুধু পূর্ব এশিয়ার নন, সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সেনানায়ক।

'আমি শুনেছি তোজোর পর জাপানি জনসাধারণ আপনাকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চেয়েছিল?'

'চন্দ্রা বোস, আমি আর কোনওরকম রাজনৈতিক পদে যেতে চাই না। এক সময়ে যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে আমার দায়িত্ব যে পালন করতে পেরেছিলাম সেটাই যথেষ্ট আমার কাছে। আমার এখন একটাই চিন্তা। এই যুদ্ধের আগুন থেকে আমার দেশকে কী ভাবে বার করে আনব। এই চিন্তাই কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে।' তেরাউচির প্রতিটি কথায় সম্রাটভক্তি আর দেশের প্রতি ভালবাসা ঝরে পড়ছে।

সাম্প্রতিক কালে তেরাউচির শরীর ভাল যাচ্ছে না। মানসিক দিক থেকেও তিনি যে দারুণ অশান্তির মধ্যে রয়েছেন সেটা নেতাজি জানেন।

ধীরে ধীরে কথা বলছেন তেরাউচি। 'চন্দ্রা বোসজি কী আর বলব? আমার দেশ আজ আগুনে জ্বলছে। মার্চ মাসে আমেরিকার বোমারু বিমানগুলো সারা জাপানে সংহারলীলার চূড়ান্ত করেছে। একমাত্র টোকিয়ো জেলাতেই এক লাখের ওপর মানুষ মারা গেছে। সুমিধা নদী ভরে গেছে মৃতদেহে।

'একসময় আপনাদের তো ভরসা ছিল যে হাজার মাইল দূর থেকে আমেরিকা জাপানের ওপর কোনও আক্রমণ চালাতে পারবে না।' নেতাজি বললেন।

'আমেরিকানরা অনেকদিন আগেই আমাদের সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছে। সায়পন আর লিট্টেতে তারা ঘাঁটি তৈরি করেছে। সেখান থেকে তাদের বোমারু বিমানগুলো বারবার টোকিয়ো আর ইয়োকোহামার মতো শহরগুলোর ওপর উলটে পালটে হামলা চালাচ্ছে। আমাদের সারা দেশ এখন অগ্নিকুণ্ড। প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে তারা আমাদের ছোট ছোট গ্রামগঞ্জগুলো পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। সে সব হামলা তারা চালায় অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে। যে রাতে ঝোড়ো হাওয়া বয় সে সব রাত্রিতেই বেশি করে হামলা হয়। আগুন ডাকে হাওয়াকে আর হাওয়া আগুনকে সঙ্গ দেয়।'

বলতে বলতে তেরাউচির গলা বুজে আসে। নেতাজিও বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন। বললেন, 'ঈশ্বর করুন, জাপানি সাধারণ নাগরিকদের জীবনে যেন শান্তি ফিরে আসে।'

'চন্দ্রা বোসজি, আপনি হয়তো বিশ্বাসই করবেন না। কিন্তু এটা সত্যি। গত মে মাসের একরাতে ছশো আমেরিকান বিমান টোকিয়োর ওপর হামলা চালিয়েছিল। রাত ন'টা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত অবিরাম বোমাবর্ষণ করেছিল তারা। হাজার হাজার লোক মারা গেছে সেদিন।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপান নতিস্বীকার করবে না বলেই মনে হয় আমার।' নেতাজি বললেন।

'তার মূলে আমাদের দেশভক্তি। আপনি জানেন না কী সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে জাপানিরা। জুতো তৈরি করার চামড়া নেই। তবু জাপানি তরুণেরা খালি পায়ে কুচকাওয়াজ শিখছে। মাথাপিছু মাত্র পঞ্চাশ গ্রাম চাল দেওয়া হয় রেশনে। তাও আমার দেশ দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ছে আর ভবিষ্যতেও লড়বে।'

একটু চুপ করে থেকে নেতাজি বললেন, 'তবুও— ধরে নিন— মানে স্রেফ ধরে নেওয়ার কথা বলছি— আগামীদিনে জাপানকে যদি পরাজয় স্বীকার করতে হয় বা আত্মসমর্পণ করতে হয়— '

নেতাজির কথাগুলো শোনামাত্রই তীব্র ক্ষোভে বৃদ্ধ তেরাউচি ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। রাগে, ক্ষোভে তাঁর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। প্রচণ্ড

অপমানিত বোধ করে তিনি বললেন, 'চন্দ্রা বোসজি, আপনি জাপানের ইতিহাস ভাল করে পড়েননি মনে হচ্ছে। আমাদের ছাব্বিশশো বছরের ইতিহাসে "পরাজয়" কখনও ঘটেনি। জাপানের মাটিতে পরাজয় কথাটার কোনও স্থান নেই। আত্মসমর্পণের তো কথাই ওঠে না।'

তেরাউচিকে একটু শান্ত করে নেতাজি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার শরীরের এই অবস্থাতেও আপনি কষ্ট করে এখানে আসতে গেলেন কেন?'

'আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য।'

'সে কী কথা। আমরাই তো জাপানের কাছে ঋণী।'

'সেটা কথা নয়। চন্দ্রা বোসজি, আপনারা আউঙ্গ সানের মতো জাপানের পিঠে ছুরি বসিয়ে দেননি। বর্মা থেকে পশ্চাদপসরণের সময় আপনার আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈন্যরা যদি নিজেদের প্রাণের পরোয়া না করে তাদের সহায়তা না করত তা হলে আরও হাজার হাজার জাপানি সৈন্য শেষ হয়ে যেত। জাপানি সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সফল হত ব্রিটিশরা। আপনাদের এই উপকারের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি আমি।'

নেতাজি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'শুধু তর্কের খাতিরেই বলছি। আগামী দিনে ভার্সাইয়ের মতো কোনও সন্ধিপত্রে জাপানকে যদি সই করতে হয় আর সেই সন্ধির শর্ত হিসাবে ব্রিটিশ যদি আপনাদের কাছে সুভাষচন্দ্র বোসকে হাতকড়ি পরিয়ে তাদের হাতে তুলে দেবার দাবি করে তা হলে কী হবে?'

নেতাজির কথা শুনে তেরাউচির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। অত্যন্ত বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'চন্দ্রা বোসজি, এ কথা মনেও স্থান দেবেন না। আপনার ব্যক্তিত্ব আর দেশভক্তিতে মুগ্ধ অসংখ্য লোক জাপানে আজও বেঁচে আছে।'

'কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর যে-কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। বিশেষ করে চার্চিল আর মাউন্টব্যাটেন আমাকে হাতে পাওয়ার জন্য সব কিছু করতে পারেন।' নেতাজি বললেন।

'না। জাপান কোনও অবস্থাতেই আপনাকে তাদের হাতে তুলে দেবে না। এই তেরাউচি আমেরিকা থেকে শুরু করে নানা ঘাটের জল খেয়েছে। অনেক দেশ দেখেছে। অনেক বিপ্লব দেখেছে। অনেক বিপ্লবীকেও দেখেছে। কিন্তু নিজের মাতৃভূমির জন্য এইরকম অসাধারণ ভালবাসা, আপনার মতো এরকম দেশভক্ত সারা পৃথিবীতে কোথাও দেখিনি আমি।'

বলতে বলতে তেরাউচির শরীরের রোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। আবেগের সঙ্গে তিনি বলতে থাকেন, 'চন্দ্রা বোসজি, আপনার হয়তো জানা নেই। যে দিন ব্রিটিশ ফৌজ মান্দালয়ে আমাদের সূর্যবংশীয় মহান সম্রাটের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিল, সেদিন আমার একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। কিন্তু আমার প্রিয় দেশের প্রিয় সম্রাটের জন্য ফৌজি পোশাকের আড়ালে আমার সমস্ত যন্ত্রণা লুকিয়ে রেখেছি। আমি স্বীকার করছি এই যুদ্ধে সব কিছুই হতে পারে। আপনি যে রকম বললেন তাই যদি হয় অর্থাৎ ব্রিটিশরা যদি আপনাকে তাদের হাতে তুলে দেবার দাবি জানায়—!' বলতে বলতে একটু থেমে গেলেন তেরাউচি। চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললেন, 'এমনকী আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় আমার সম্রাট স্বয়ং যদি আপনাকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিতে চান তবে তাঁকে একটা কথাই বলব। বলব, আমার মৃতদেহ মাড়িয়ে তবেই চন্দ্রা বোসকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিতে পারবেন আপনারা। বিশ্বাস করুন, তেরাউচি জীবিত থাকতে আপনার কেশস্পর্শ করতে পারবে না কেউ।'

১৯
অজানার সন্ধানে

১

জুলাই, ১৯৪৫। সিঙ্গাপুর থেকে দেড়শো মাইল দূর সেরেম্বনের জাপানি ব্যারাকে আসছেন নেতাজি। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। গোটা পনেরো মোমবাতির আলোয় অন্ধকার ঘোচেনি। মাঝের উঠোনে একটা থামের সঙ্গে মহম্মদ দুরানিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। বলির পাঁঠার মতো ভয়ে কাঁপছে দুরানি। কল্পনায় দুরানি দেখছে যে ফাঁসিকাঠে ঝুলছে তার ফুলে যাওয়া শরীরটা। জাপানি ক্যাম্পেকাইদের বেদম মার খাওয়া দুরানি কালা হয়ে গেছে। এর চাইতে ওরা যদি একেবারে মেরে ফেলত তো ভাল হত। জাপানিরা বেইমানদের কী ভাবে খেলিয়ে খেলিয়ে, একটু একটু করে মারে সেটা বেশ ভালই বুঝে গেছে দুরানি।

কালকেই একটা জাপানি সৈন্য তাকে বলে গেছে। 'ওঠ ছোকরা, ভাগ্য ভাল তোর।'

ফুলে যাওয়া চোখ দুটো খুলেছিল দুরানি। জাপানিটি বলল, 'ভাগ্যটা খুব ভাল তোর। আমাদের খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়ে গেলি। এবার তোকে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে হাজির করা হবে।'

'সুভাষবাবুর কাছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। চন্দ্রা বোস আমাদের ধমকেছেন। বলেছেন ভারতীয়দের বিচার করার তোমরা কে? এবার তোর বিচার তিনি নিজে করবেন?'

রাত ন'টা বেজে গেছে। তালগাছগুলোকে ঝাঁকড়া চুলো ডাইনিদের মতো দেখাচ্ছে অন্ধকারে। প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। আবহাওয়ার অবস্থাও ভাল নয়। জাপানিদের অধিকর্তা কুনিঝুকা সামনে ঘোরাফেরা করছেন। ভূতের মতো দেখাচ্ছে তাঁকে। এমন সময় তিনটে মোটরগাড়ির হেডলাইটের আলো এসে পড়ল উঠোনে। দুরানির দুর্বল শরীরটা থামটাকে আঁকড়ে ধরল।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাগর আনুষ্ঠানিকভাবে 'হিজ একসেলেন্সি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, সুপ্রিম কম্যান্ডার অফ আজাদ হিন্দ ফৌজ, আর্জি হুকুমত-এ আজাদ হিন্দ-এর প্রধানমন্ত্রী আসছেন— ঘোষণা করলেন। জানবাজ বাহিনীর একটা দল স্যালুট করল। তারপরই বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হল, 'জয় হিন্দ, জয় হিন্দ।'

নেতাজির দৃষ্টি যেন, দুরানির সারা গায়ে বল্লমের ফলার মতো বিঁধছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের আর প্রত্যক্ষভাবে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা মানুষটাকে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে নেতাজি গর্জন করে উঠলেন, 'তোমার মতো সাপকে আমরা এতকাল পুষেছি সেটাই অন্যায় শুধু নয়, পাপ হয়েছে আমাদের।'

'নেতাজি, আমি নিরপরাধ,' দুরানি কাতরে উঠল।

'সেটা ভেবেই তো ঠকেছি আমরা। সর্বনাশ ডেকে এনেছি নিজেদের। শুধু গুপ্তচরবৃত্তির ঘৃণ্য অপরাধ নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি জঘন্য কাজ করেছ তুমি— হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেছ। আমাদের ডুবোজাহাজগুলোর খবর ব্রিটিশদের কে দিয়েছিল?'

'আমি— আমি নই নেতাজি।'

'শাট আপ ইউ স্কাউন্ড্রেল। একমাত্র ভারতীয় বলে তোমার ওপর আমরা মমতা দেখিয়েছিলাম। আর প্রতিদানে তুমি আজাদ হিন্দ ফৌজের এতবড় সর্বনাশ করেছ।'

থরথর করে কাঁপছে দুরানি। ভয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেছে। আবার লাঠির ঘা পড়ল তার গায়ে। কিন্তু কিছুতেই নিজের অপরাধ স্বীকার করল না দুরানি।

এক একটা কথা যেন মেপে মেপে বেরিয়ে আসছে নেতাজির মুখ থেকে। 'ক্যাপ্টেন মহম্মদ দুরানি, একজন ঘৃণ্য আন্তর্জাতিক গুপ্তচর হিসাবে তুমি নিজের মাতৃভূমির সঙ্গে আর আমাদের মিত্ররাষ্ট্র জাপানের সঙ্গে জঘন্য অপরাধ করেছ। নিজের মাতৃভূমির সর্বনাশ ডেকে এনেছ তুমি।'

নেতাজির সঙ্গে অন্যান্য সদস্যরাও বসেছেন কোর্ট মার্শালে। তাঁদের সবারই একই রায়। তাঁদের রায়গুলো হাতে নিয়ে দেখলেন নেতাজি। তারপর বললেন, 'ক্যাপ্টেন দুরানি, তোমার অপরাধ এত ভয়ানক যে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনও শাস্তি দেওয়া মানে ন্যায়বিচারের অপমান আর নিজেদের মাতৃভূমির অপূরণীয় ক্ষতি।'

মোমবাতির আলো যথেষ্ট নয় বলে গাড়ির হেডলাইটগুলো জ্বালিয়েই রাখা হয়েছে। রায় শুনে ভীত সন্ত্রস্ত দুরানি আঁকড়ে ধরল থামটাকে।

নেতাজি উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন। কোলের ওপর প্যাডটা রয়েছে লিখিত রায়টাতে ইতিমধ্যেই বাকি সদস্যরা সই করেছেন। নেতাজির সই করা হয়ে গেলেই গর্জে উঠবে ফায়ারিং স্কোয়াডের বন্দুকগুলো। কিন্তু কী একটা চিন্তা যেন নেতাজিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। চুপ করে বসে আছেন তিনি। কর্নেল আজিজ আহ্‌মেদ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'স্যার, সই?'

'অ্যাঁ— হ্যাঁ।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। এমন সময় নেতাজির ব্যক্তিগত সহকারী ভাস্করন দৌড়ে এলেন সেখানে।

'নেতাজি শিগগির রেস্ট হাউসে চলুন। সিঙ্গাপুর থেকে ফোন আসবে। জামান কিয়ানি আপনাকে জরুরি কিছু বলতে চান।'

প্যাডটা কর্নেল আজিজ আহ্‌মেদের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নেতাজি। দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললেন গাড়ির দিকে। আজিজ তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ে বললেন, 'স্যার— স্যার— সইটা?'

'হ্যাঁ তাই তো!' নেতাজি একটু দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'ওটা কাল করব।'

সেরেম্বনে আসার আগে সিঙ্গাপুরের দায়িত্ব জামান কিয়ানিকে দিয়ে এসেছেন নেতাজি। কুয়ালালামপুরের ভার ইনায়েত কিয়ানিকে দিয়েছেন আর ইপোতে আছেন জন থিবি। নির্দেশ আছে ভাল খারাপ যে-কোনও খবর অবিলম্বে ফোন করে জানানোর। তা ছাড়া তাঁর আদেশে অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যদের সিঙ্গাপুরে জড়ো করা হয়েছে।

এর আগের অনেকগুলো মাসের প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে। যুদ্ধের পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে বদলেছে। ভবিষ্যতে কী হবে ভবিষ্যৎই জানে।

আজ সকালে কর্নেল গিলানির ছোট্ট ছোট্ট ফুলের মতো দুটি মেয়ে ফুল দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে নেতাজিকে। নেতাজি তাদের সঙ্গে হইচই করে কাটিয়েছেন কিছুক্ষণ। ওদের দেখে

তাঁর মনে পড়েছিল অনিতার কথা। এখন তাকে কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে! প্রত্যেকটি ছোট্ট মেয়ের মুখে অনিতাকে খোঁজেন নেতাজি। ইদানীং ইউরোপ থেকে চিঠি আসার চোরাপথও বন্ধ হয়ে গেছে।

পরশু রাতে স্বপ্নে মা কালীকে দেখেছেন নেতাজি। মা কালীকে অত্যন্ত বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। চোখ দুটো জলে ভরা। ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন নেতাজি। মা চলে গেছেন মাত্র কিছুদিন আগে। কে জানে আদরের 'সুবি'র চিন্তায় হয়তো স্বর্গে গিয়েও শান্তি নেই তাঁর। ইদানীং সমস্ত প্রিয়জন আর গুরুজনদের কথা খুব বেশি করে মনে পড়ছে তাঁর। দেশবন্ধু, বিঠ্ঠলভাই, রবীন্দ্রনাথ— সবার কথা বারবার মনে পড়ছে। রাতের পর রাত স্বপ্নে দেখা দেন তাঁরা।

প্রীতম সিংকে বললেন নেতাজি, 'মা-বাবার চলে যাওয়ার সময় আমার ওপর দারুণ অবিচার করেছেন ঈশ্বর। বাবা যখন গেলেন তখন আমি নির্বাসনে। আর মা চলে গেলেন যুদ্ধের মধ্যে। তাঁদের শেষ দেখাটুকুও দেখতে পাইনি আমি।'

পরের দিন কর্নেল আজিজ আহ্‌মেদ নেতাজির সামনে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। কথার কোনও প্রয়োজন নেই। নেতাজি বুঝলেন কেন এসেছেন আজিজ। গভীর দুঃখের সঙ্গে নেতাজি বললেন, 'একজন ভারতীয়ের ফাঁসির হুকুম দিতে হাত সরছে না আমার।'

'স্যার এত বড় অপরাধ করার পরেও আপনি যদি চান— ছেড়ে দিন তাকে।' ক্ষুব্ধস্বরে বললেন আজিজ।

নেতাজি তার দিকে তাকালেন। চোখে জল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তাকে ক্ষমা করার কথা উঠছে না। দাও কাগজগুলো দাও।'

অন্তিম মন্তব্য লিখে তাড়াতাড়ি সই করলেন নেতাজি। বললেন, 'আজিজ। দুরানিকে ফাঁসির হুকুমই আমি দিলাম। সেটা কার্যকরী করার ভার তোমার ওপরে।' কিন্তু— একটু থেমে নেতাজি আবার বললেন, 'আমি সেরেম্বন থেকে চলে যাওয়ার পরেই এ আদেশ কার্যকর করো। আমারই দেশের একজনের মরণ আর্তনাদ আমার কানে সইবে না।' টপটপ করে এবার জল ঝরে পড়ল নেতাজির চোখ থেকে।

আজিজ আহ্‌মেদের ক্ষোভ উধাও। তিনি বুঝতেও পারলেন না কখন তাঁর নিজের চোখ দুটোও ভিজে উঠেছে। তিনি বললেন, 'নেতাজি আপনার বিরোধীরা পাগল, নির্বোধ। তারা আপনাকে ডিকটেটর বলে। নেতাজি, ইউ ক্যান নেভার বি এ ডিকটেটর। কোনওদিন আপনি ডিকটেটর হতে পারবেন না। কারণ ডিকটেটর হতে গেলে প্রধান যে গুণগুলো লাগে তার একটাও আপনার নেই।'

নেতাজি চুপ। তাঁর চাইতে বেশি করে এ সত্যটা আর কে জানে?

২

৬ আগস্ট রাত্রি বারোটা। নেতাজি টেবিলে বসে কাজ করেছেন। দ্রুতপায়ে ভাস্করন এসে ঘরের রেডিয়োটা চালিয়ে দিলেন। খবর শুনতে শুনতে নেতাজির মুখ দুঃখে কালো হয়ে গেল। আমেরিকা হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলেছে। এই অভাবনীয়, অকল্পনীয় বোমা প্রায় তেরো বর্গমাইল এলাকা সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দিয়েছে। সত্তর হাজার থেকে এক লাখ লোক মারা গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। একটা মাত্র বোমা! নিশ্চিহ্ন করে দিল একটা সম্পূর্ণ শহর। জাপানিদের স্পর্ধা ঘুচিয়ে দেবার জন্য আমেরিকার পাশবিক দাওয়াই।

চতুর্থ দিনে বোমা পড়ল জাপানের পশ্চিম প্রান্তের বন্দর নাগাসাকির ওপর। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সাড়ে চার বর্গমাইল এলাকা। প্রায় এক লাখ লোকের কোনও খবর নেই। তার মধ্যে অনেক ভারতীয়ও ছিল। শ্মশান হয়ে গেছে নাগাসাকি।

এর আগেও মিত্রশক্তি জাপানের বিভিন্ন জায়গায় কারপেট বম্বিং করেছে গত দু-তিন মাস ধরে। তার পরে এই দানবিক সংহারলীলা।

এই দৃষ্টান্তহীন পাশবিকতায় সারা পৃথিবীর মানুষ স্তম্ভিত। ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে কেউ জানে না। ১১ আগস্ট রাতে সিঙ্গাপুর থেকে মেজর জেনারেল কিয়ানির বার্তা এল, 'তাড়াতাড়ি রওনা হোন। তবে রাত্রে সফর করবেন না।'

আমূল বদলে গেল বিশ্বপরিস্থিতি। নতজানু হল জাপান। কাল পর্যন্ত বেড়ার ওপর বসে থাকা রাশিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল জাপানের ওপর। নিজেদের জাপান বিরোধিতার প্রমাণ দেবার জন্য মাঞ্চুরিয়া অভিযানে নেমে পড়ল রাশিয়া।

ভাস্করন বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছেন জেনারেল কিয়ানির বার্তার কথা। নেতাজি নির্বিকার। বললেন, 'রাশিয়া যুদ্ধে নেমে পড়েছে তো আমাদের কী? আমাদের কাজ আমরা করব।'

পরের দিন রাতেও প্রবল চাঞ্চল্য। কুয়ালালামপুর থেকে ইনায়েত এসে পৌঁছেছেন। রাত প্রায় দুটোর সময় সিঙ্গাপুর থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের দুজন কর্মকর্তা এসে পৌঁছলেন। আগাগোড়া ধুলোর আস্তরণ মাখা মোটরে। বিশদ খবরের জন্য আইয়ার সাহেব ইপোয় গিয়ে খবরের কাগজের গ্যালিপ্রুফ নিয়ে এলেন। খবরগুলোর বিশ্লেষণ শুরু হল।

সেরেম্বনে আর থাকার কোনও অর্থ নেই। নেতাজি পেনাং থেকে রাঘবন আর স্বামীকে ডেকে পাঠালেন। ইপো থেকে থিবিও এলেন।

সবাই মিলে সিঙ্গাপুরে জড়ো হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিঙ্গাপুর পৌঁছতে দু' দিন লাগল নেতাজির। মেয়র বাংলোর ছাদে বৈঠক বসল। মেজর জেনারেল কিয়ানি আর হবিবুর রহমান তো কবে থেকেই নেতাজির অপেক্ষায় রয়েছেন। আইয়ার আর রাওয়াত চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এসে বসলেন।

জাপানের রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে একটা আনুষ্ঠানিক বার্তা নিয়ে নেগোশি এসে পৌঁছলেন সেখানে। মুখ কালো হয়ে গেছে তাঁর। সব শেষ! খবর এনেছেন তিনি। থেমে থেমে, ঢোক গিলে গিলে, কান্নাভেজা গলায় নেগিশি বললেন, 'স্যার। জাপান আত্মসমর্পণ করেছে।'

পারমাণবিক বোমার চেয়েও এ খবর বেশি ধাক্কা দিল নেতাজিকে। আবার অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রত্যেক মুহূর্তে এই খবরটাই আশঙ্কা করছিলেন তিনি।

অঝোর ধারে কাঁদছেন নেগিশি। পট্‌সডাম চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান বিনাশর্তে জাপানের আত্মসমর্পণ দাবি করেছিলেন। কণ্ঠাগতপ্রাণ, নিরুপায় জাপানকে মেনে নিতে হয়েছে এ শর্ত। শোকাকুল নেগিশি বললেন, 'প্রতিটি জাপানি আজ হারাকিরি করে জীবন দিতে চায়। গত ছাব্বিশশো বছরের মধ্যে "পরাভব" কাকে বলে কখনও বোঝেনি জাপান। সূর্যদেবতার লৌকিক প্রতিমূর্তি জাপান সম্রাটের এই ঘোর অপমান সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল বলে মনে করছে তারা।'

'কিন্তু বাস্তবকে তো মানতেই হবে।' রাঘবন বললেন।

'না, জাপানের দক্ষিণপন্থীরা— যাতে রয়েছে অনেক তরুণ সামরিক অফিসার— সে কথা মানতে রাজি নয়। এই আত্মসমর্পণটা সহ্য করতে পারছে না তারা। সম্রাটের প্রাসাদের চারপাশে

জড়ো হয়ে তারা হাহাকার করছে। কেউ চুল ছিঁড়ছে, কেউ বুক চাপড়াচ্ছে। হিরোসিমা আর নাগাসাকির ঘটনার পরেও তারা নতিস্বীকার করতে রাজি নয়। গত দু'দিন ধরে সম্রাটের প্রাসাদের চারপাশে পড়ে রয়েছে তারা।' এবার হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন নেগিশি। 'জাপানি তরুণেরা এভাবে কখনও প্রতিবাদ করেনি। তরুণ বৈমানিকেরা আটশো বিমান নিয়ে সুইসাইড স্কোয়াড তৈরি করে ফরমোসার দিকে রওনা হয়েছে। সেখানে আত্মাহুতি দিতে চায় তারা। আত্মসমর্পণের কলঙ্কের চেয়ে আত্মাহুতি অনেক বেশি কাম্য তাদের কাছে।'

মন্ত্রিমণ্ডলীর সমস্ত সদস্য অপলকে তাকিয়ে আছেন নেতাজির দিকে। এই ভেঙে পড়া আকাশকে কী করে ঠেকা দেবেন নেতাজি? জাপানের এই আত্মসমর্পণের খবরে তিনি কি ভেঙে পড়বেন না নতুন করে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে উঠবেন?

কিছুক্ষণ একেবারে চুপচাপ বসে রইলেন নেতাজি তারপরে হঠাৎ একটা 'হুঁ' বেরিয়ে এল তাঁর মুখ দিয়ে। গলা সাফ করে নিয়ে একটু হেসে বললেন, 'জাপানের আত্মসমর্পণ মানে আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ নয়।'

নেতাজির মধ্যে আবার জেগে উঠেছে তাঁর চিরন্তন সংগ্রামী সত্তা। চোখে নতুন দীপ্তি, নতুন রণাঙ্গনের স্বপ্ন। দূর থেকে সাগরের কল্লোল শোনা যাচ্ছে। নেতাজির মুখে একটার পর একটা বিচিত্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠছে। মনে হচ্ছে উত্তাল সাগরের সঙ্গে এক দুঃসাহসী বেপরোয়া নাবিকের সংগ্রাম চলেছে তাঁর মনের মধ্যে। দেওয়ালে টাঙানো মানচিত্রের ওপর নজর পড়ল তাঁর। দৃষ্টি নিবদ্ধ হল দিল্লির ওপরে। উঠে এগিয়ে গিয়ে আঙুলটা রাখলেন তার ওপরে।

আবার বাস্তবে ফিরে এলেন নেতাজি। নেগিশিকে বললেন, 'এ পর্যন্ত আপনাদের সরকার আমাদের একশো মিলিয়ন ইয়েন ঋণ হিসাবে দিয়েছেন। তার মধ্যে দশ মিলিয়ন খরচ হয়েছে। বাকি টাকা রয়েছে সাউথ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে। আপনারা তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিন। আর আপনাদের সম্রাটকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাবেন।'

বৈঠক চলার সময়েই ডোমেই সংবাদ প্রতিষ্ঠান থেকে আত্মসমর্পণের খবর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারিত হল। জাপানের পতনের পর এবার কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে? আপাতত কী করা হবে?

অবশিষ্ট বাহিনীকে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মহিলা বাহিনীর যারা এখনও রয়েছে তাদের নিরাপদে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার জন্য সিঙ্গাপুরের ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল। বাকি সবাইয়ের মনে তখন শুধু একটাই চিন্তা— তাঁদের প্রিয় নেতার, নেতাজির কী ব্যবস্থা করা যায়।

এই সময় জেনারেল ইসোডার কাছ থেকে তৃতীয় তারবার্তা এসে পৌঁছল। 'অবিলম্বে সায়গনের দিকে রওনা হোন।'

কর্নেল প্রীতম সিং বললেন, 'ব্রিটিশের হাতে পড়বেন নেতাজি, সেটা সহ্য করতে পারব না আমরা। সে রকম সম্ভাবনা দেখা দিলে আমাদের তৃতীয় ডিভিশন মরণপণ করে লড়বার জন্য সবসময় প্রস্তুত।'

'আত্মসমর্পণ যখন হয়েই গেছে, জাপানে যাওয়ার আর কী সার্থকতা আছে। সেখানে ব্রিটিশ আর আমেরিকার ফৌজ কি তাঁকে ছেড়ে দেবে?' গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন দেবনাথ দাস।

'এটাও নয়, সেটাও নয়।' নেতাজি বললেন, 'এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের শেষ সংগ্রামের রাস্তা রাশিয়ার বরফের মধ্যে দিয়েই তৈরি হবে। হয় মাঞ্চুরিয়া নয় তো রাশিয়া থেকেই দিল্লির দিকে এগোতে হবে আমাদের।'

'নেতাজি যা করার তাড়াতাড়ি করুন। জাপানের আত্মসমর্পণের পরে আমাদের বিমান আর বেশিক্ষণ পাওয়া যাবে না। সব কিছুই চলে যাবে দুশমনদের হাতে। আমাদের এখানেই আটকে থাকতে হবে।'

সবাই একমত। আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলীর সবাই যদি কয়েদ হন তো পরোয়া নেই। কিন্তু স্বাধীনতার ধ্রুবতারা নেতাজিকে বাঁচাতেই হবে।

কী দারুণ সংকট, 'কী ভীষণ অনিশ্চয়তা! প্রতিমুহূর্তে মাথার ওপরে এগিয়ে আসছে মৃত্যুর করাল ছায়া। দুরন্ত বেগে পৃথিবীর পটপরিবর্তন ঘটছে। কোথায় যাওয়া যাবে? কোন দিকে?' ইসোডার তারবার্তা আর ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির কথাই গ্রহণযোগ্য মনে করলেন নেতাজি। কালকেই ব্যাংককে যাবার প্রথম সামরিক বিমানটা ধরতে হবে। আইয়ার প্রশ্ন করলেন, 'নেতাজি, তার পরে?'

'অ্যাডভেঞ্চার টু দ্য আননোন। অজানার সন্ধানে।'

৩

সফরের আয়োজন চলেছে। কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে ভেতরে এলেন নর সিং। জার্মানি থেকে বহু কষ্টে পূর্ব এশিয়ায় এসে পৌঁছেছেন তিনি। নাম্বিয়ারের কাছ থেকে আনা চিঠিটা নেতাজির হাতে তুলে দিলেন তিনি। জার্মানির পতনের পর ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার সম্পূর্ণ বন্ধ করে ফ্রান্সে চলে গেছেন নাম্বিয়ার।

নেতাজি জানতে চাইলেন, 'সেন্টার কবে থেকে বন্ধ করা হয়েছে?'

'এপ্রিলের গোড়ার দিকে। জার্মানি তখন পতনের মুখে। তারপর ৭ মে হিটলার আত্মহত্যা করলেন আর নাৎসি জার্মানির সম্পূর্ণ পতন ঘটল।'

'নর সিং, আমাদের অ্যাডাম ট্রটের কী হল কিছু জানো তুমি?' নেতাজি জানতে চাইলেন।

'গত বছর ২০ জুলাই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। হিটলার নিজে তাঁর ফাঁসির আদেশ দেন।'

খবরটা শুনে বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল নেতাজির মন। এই পরদেশি মানুষটি তাঁর মনে অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছিলেন। বার্লিনের সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। জার্মানির সেই প্রায় বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে পূর্ব এশিয়ায় তাঁকে পাঠানোর জন্য অ্যাডাম ট্রট কী ভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

২০ জুলাই, ১৯৪৪ কর্নেল স্টুফেনবার্গ আর লেফটেন্যান্ট বোর্নার রাস্টেনবার্গে হিটলারকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন। হিটলার যেখানে বসেছিলেন তার কিছুটা দূরেই বিস্ফোরণটা ঘটেছিল। হিটলার সামান্য আহত হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরাও ধরা পড়ে যান।

রাস্টেনবার্গের খবরের জন্য অ্যাডাম ট্রট সারাদিন উইলহেলমস্ট্রাসেতে বসেছিলেন। এই পরিকল্পনার রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং অ্যাডাম ট্রট। তা ছাড়াও বিভিন্ন দেশে হিটলার বিরোধীদের সঙ্গে তার যোগাযোগের ব্যাপারটাও ফাঁস হয়ে গিয়েছিল জার্মান গেস্টাপোদের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ২৫ জুলাই অ্যাডাম গ্রেফতার হলেন। স্বয়ং, হিমলার পর্যন্ত অ্যাডামের প্রাণ বাঁচানোর জন্য হিটলারের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু হিটলার টলেননি। উলটে এক ভয়ংকর আদেশ দিয়েছিলেন। সাধারণ ফাঁসিতে অ্যাডামকে না লটকে একটা বীভৎস মৃত্যুর ব্যবস্থা হয়েছিল অ্যাডামের জন্য। গলায় পিয়ানোর তার বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। একটু একটু করে

পিয়ানোর তার গলায় কেটে কেটে বসেছিল তাঁর। হিটলারের পৈশাচিকতার আর একটা নারকীয় দৃষ্টান্ত। তার চেয়েও পৈশাচিকতা এর পরে। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড মুভি ক্যামেরায় তোলা হয়েছিল। বার্লিনের লোকেরা বলে হিটলার নাকি এই ফিল্মটা দেখে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন।

সিঙ্গাপুরের সেই সন্ধ্যাটা বিষণ্ণতায় ভরা। শোনার পর থেকে ট্রটের কথাই বারবার মনটা রক্তাক্ত করে তুলছে। এমন সময় কর্নেল স্ট্রেসি এলেন।

'নেতাজি, শহিদ স্মারক দেখবেন চলুন।'

'স্মারক তৈরি শেষ?'

'হ্যাঁ। আপনিই তো বলেছিলেন তিন সপ্তাহের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।'

শহিদদের কথাই তো আজ সারাদিন ধরে ভাবছেন নেতাজি। ভবিষ্যতে আর কখনও সিঙ্গাপুরে আসতে পারবেন কি না কে জানে। তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের তীরের দিকে রওনা হলেন নেতাজি। সিঙ্গাপুরে কর্নেল স্ট্রেসি, কর্নেল রডরিগস প্রমুখ অনেক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অফিসার ছিলেন। সিঙ্গাপুরের শহিদ স্মারক দেখতে দেখতে নেতাজির মনে এক মিশ্র অনুভূতি। সময়মতো স্মারকের কাজ শেষ হওয়ায় তাঁর গর্ব হচ্ছে। স্ট্রেসির পিঠ চাপড়ে দিলেন তিনি। তারপর বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন এই স্মারকের দিকে। ওই স্মারকের মধ্যে দিয়ে তাঁর চোখের সামনে যেন অসংখ্য শহিদের এক মিছিল চলেছে। কত নাম না জানা ভারতীয় আর জাপানি সৈন্যদের শবদেহে ভরে গিয়েছিল চিন্দুইন, সালুইন আর ইরাবতী নদী। দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে, বোমার আঘাতে, যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছে হাজার হাজার বীর। সেইসব অবিস্মরণীয় মানুষেরা— তাঁর প্রিয় কুবের ইয়েলাপ্পা, মনসুখ, ড. আকবর আলি শাহ্, ইয়ানাগিডা— দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া সেই সব রক্তকমল— ভিড় করে আসছে তাঁর মনে। অনেক দিন পরে তাঁর নিজেরই লেখা লাইন আবার মনে পড়ল নেতাজির।

'এ জগতে সব কিছুর শেষ আছে, শেষ নেই শুধু স্বপ্নের, শেষ নেই সাধনার। সোনার পাখা মেলে সারা আকাশ ছেয়ে থাকে তারা।

'মানুষ মরে, কিন্তু তাঁর সাধনা অবিনশ্বর। কাল তাকে গ্রাস করতে পারে না। সেই সাধনা সঞ্চারিত হয় যুগ থেকে যুগে, এক আধার থেকে অন্য আধারে। বীজ থেকে প্রাণ পায় নতুন গাছ। রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে তার অনন্ত সঞ্চার।'

৪

ব্যাংকক বিমান বন্দর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বোমারু বিমান সেখানে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একসময়ে রানওয়েতে থেমে গেল বিমানটি। বোমারু বিমানে জানলা বেশি থাকে না। তাই ওপর থেকে বোঝা যায়নি তেমন। নীচে নেমে বোঝা গেল বিমানবন্দরে বেশ থমথমে ভাব। মিত্ররাষ্ট্রের আক্রমণের ভয়ে ব্যাংকক যেন বেশি ভীত। নেতাজির এই হঠাৎ আসার ব্যাপারটা কেউই জানেন না। তাই ছয়জন সহকর্মীদের সঙ্গে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল নেতাজিকে।

খবর পেয়ে জেনারেল ভোঁসলে তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছলেন সেখানে। নেতাজির আসার খবর হিকারি কিকনকেও দেওয়া হল।

রাতে নেতাজির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু হল।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের নেতারাও উপস্থিত রয়েছেন। হিকারি কিকনের জেনারেল

ইসোডা আর জাপানি রাষ্ট্রদূত হাচিয়াও এসেছেন। জাপানের এই অকল্পনীয় বিপর্যয়ে সমস্ত জাপানিরা যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। নেতাজি তাঁর কুশল জানতে চাইলে ইসোডা অবরুদ্ধ স্বরে বললেন, 'দুটো পারমাণবিক বোমা আমাদের শেষ করে দিল।'

'আপনাদের সম্রাটের আত্মসমর্পণের ভাষণ আমি শুনেছি'। নেতাজি বললেন।

হাচিয়া বললেন, 'এই ভাষণ প্রচার করা নিয়েও টোকিয়োতে তুলকালাম হয়ে গেছে। দক্ষিণপন্থীরা দাবি করেছিল যে শুধু হিরোসিমা-নাগাসাকি কেন, সমস্ত জাপানও যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবুও আত্মসমর্পণ করবেন না। এমনকী সম্রাটের ভাষণের টেপ পর্যন্ত আটকে ফেলেছিল তারা। কিন্তু প্রশাসন এ রকম সম্ভাবনার কথা আগেই চিন্তা করে টেপের কপি করে রেখেছিল। সেই টেপই অন্য বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।'

জাপানিদের বীরত্ব আর দেশপ্রেমে নেতাজি আগে থেকেই অভিভূত। যখন শুনলেন যে এখনও পাঁচশো বৈমানিক তাঁদের বিমান নিয়ে আত্মঘাতী অভিযানে শামিল হতে চায়, তাঁর শ্রদ্ধা আরও বাড়ল। পারমাণবিক বোমা পড়ার পরে তিন লাখ জাপানি সৈনিক বিভিন্ন রণাঙ্গনে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে কী করা যায় তাই নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দারুণ চিন্তায় পড়ে গেছেন।

কর্নেল ইসোডা জানতে চাইলেন, নেতাজি এখন কোথায় যাবেন? নেতাজি স্পষ্ট করে বলে দিলেন, মাঞ্চুরিয়ার পথে রাশিয়া যেতে চান তিনি।

'কিন্তু রাশিয়া এখন মিত্রশক্তির দলে। জাপানের শত্রু। শত্রুর কাছে কী আশা করেন আপনি?' ইসোডা প্রশ্ন করলেন।

'জাপানের দরজাও তো আমার কাছে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। রাশিয়া যদি যেতে না পারি তবে সাত সাগরের কোথাও কিংবা মহাকাশের কোনও কোণে ডেরা বাঁধব আমি। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমার আত্মা শান্তি পাবে না।'

'আপনার ইচ্ছের কাছে সব সময়েই মাথা নোয়াতে হয়েছে আমাদের। আমাদের সাধ্যমতো আপনাকে সাহায্য করব আমরা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের উপরওয়ালারা আপনার রাশিয়া যাবার প্রস্তাবে সম্মতি দেবেন বলে মনে হয় না।' হাচিয়া বললেন।

'তা হলে উপায়?'

ইসোডা আর হাচিয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর তাঁরা বললেন, 'এ ব্যাপারে একমাত্র ফিল্ড মার্শাল তেরাউচিই হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।'

হাচিয়া আর ইসোডা তেরাউচির কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এর জন্য তাঁরা সায়গনে যাবেন বলে জানালেন।

আবার শুরু হল চলা। গত তিনদিনের সফর যেন তিন শতাব্দীর মতো। সায়গনের বিমানবন্দরেও একই অবস্থা। তা ছাড়া শহরেও পুরোপুরি অরাজকতা। ওদিকে অনেক কর্মকর্তাই গোপনে মাউন্টব্যাটেনের সাদার্ন কম্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। বিমানবন্দরেই এসব খবর পেয়ে গেলেন নেতাজি।

সায়গনের কাছে দালাতেই ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সদর দপ্তর। তাঁর সঙ্গেই আগামী কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করার কথা স্থির হয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তেই ফরাসি ফৌজ শহরে পৌঁছতে পারে। রাস্তাগুলো শুনশান। কদাচিৎ এক আধটা গাড়ির দেখা পাওয়া যাচ্ছে। বাড়িগুলোর দরজা জানলা বন্ধ। গুজবের পর গুজব ছড়াচ্ছে। মিত্রশক্তি কীভাবে প্রতিশোধ নেবে সেই চিন্তায় সবাই ত্রস্ত।

একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক নারায়ণ দাসের বাড়ি উঠলেন নেতাজি। টেবিলে রাখা খাবারগুলোর দিকে কারও লক্ষ নেই।

'দালাতে এখনও প্রায় এক লাখ জাপানি সৈনিক রয়েছে। আত্মসমর্পণ করতে মোটেই রাজি নয় তারা। যে-কোনও মুহূর্তেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে পারে।' বললেন নারায়ণ দাস।

জাপানের সম্পূর্ণ বিমানবাহিনীর কর্তৃত্ব আমেরিকানরা নিয়ে নিয়েছে। সামরিক দপ্তরের সঙ্গেও টোকিয়োর যোগাযোগ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অবশ্য নেতাজির রাশিয়া যাবার প্রস্তাব আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে টোকিয়ো। তবে নেতাজিও সংকল্পে অনড়।

ইসোডা জানালেন যে এখান থেকে আধঘণ্টার মধ্যেই দালাত পৌঁছতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি। হাচিয়ার বিশ্বাস তেরাউচি নিশ্চয়ই কোনও রাস্তা বার করতে পারবেন।

ব্যক্তিগতভাবে তেরাউচি দারুণ শ্রদ্ধা করেন নেতাজিকে। সেধে আসা প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তেরাউচি। তা ছাড়া জাপসম্রাটের আত্মীয় তিনি। জাপানে তেরাউচির কথার মূল্য অপরিসীম। নেতাজি সম্মতি জানাতেই ইসোডা আর হাচিয়া দালাতের দিকে রওনা হলেন।

নেতাজি উঠে দাড়ি কামালেন। নারায়ণ দাসের স্ত্রী নিজের হাতে রান্না করেছেন। টেবিলে রাখা খাবারগুলো থেকে সুন্দর গন্ধ আসছে। কিন্তু খাবার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। শুধু আধকাপ দুধ খেলেন নেতাজি। তারপর একটা ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বাইরে মন্ত্রিমণ্ডলীর বাকি সদস্যরা ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছেন। রেডিয়োটা খালি দুঃসংবাদ শোনাচ্ছে।

দালাতের সামরিক দপ্তরে তখন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। ছাব্বিশশো বছরের ইতিহাসে জাপান কখনও পরাজয় বা আত্মসমর্পণের মুখোমুখি হয়নি। হিরোসিমা-নাগাসাকির ধ্বংসলীলা সমস্ত জাপানকে বজ্রাহত করে দিয়েছে। সমস্ত জাপান বিহ্বল।

ক্ষিপ্ত মার্শাল তেরাউচির বিছানার পাশে কয়েকজন সামরিক ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন। ১৫ আগস্ট আত্মসমর্পণের খবরটা পাওয়ার আঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন তেরাউচি।

একটার পর একটা খারাপ খবর আসছে দালাতের সদর দপ্তরে। অনেক অফিসার পাগল হয়ে গেছেন। অনেকে হারাকিরি করেছেন। বহু সৈন্য সুমিধা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন করেছে। বহু অফিসার পালিয়ে গেছেন।

সমস্ত জাপান টালমাটাল। হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে তখনও আগুন জ্বলছে। বাইরে থেকে কোনও সাহায্য পাঠানো যাচ্ছে না। লোহার পুলগুলো গলে গেছে। বাড়িগুলো চুরমার হয়ে গেছে। মানুষ তো দূরের কথা জন্তু-জানোয়ারও যাচ্ছে না সেখানে। পারমাণবিক বোমার ভয়ে সারা জাপান সন্ত্রস্ত।

জেনারেল ইসোডা আর রাষ্ট্রদূত হাচিয়ার গাড়িও শিবিররক্ষীরা আটকে দিল। একজন মেজর দৌড়ে এসে শুধু ওঁদের দুজনের ভেতরে যাবার অনুমতি পত্র রক্ষীদের দেখালেন। তেরাউচির অবস্থা দেখে দুজনেই স্তম্ভিত। সেই অবস্থাতেও তেরাউচি জানতে চাইলেন, 'চন্দ্রা বোসের কী হল?'

'চন্দ্রা বোস মাঞ্চুরিয়া যেতে চান।'

'তাঁর এই ইচ্ছের কথা তো আমি কবেই জানিয়েছি হেড কোয়ার্টারে। তার কী হল?'

সহকারীদের টোকিয়োতে ফোন করতে বললেন তেরাউচি। অপর প্রান্ত থেকে সুনির্দিষ্ট কোনও জবাব না পেয়ে, ডাক্তারদের নিষেধ উপেক্ষা করে নিজেই রিসিভার হাতে নিলেন তিনি। বললেন, 'আমি ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি বলছি। চন্দ্রা বোসের রাশিয়া যাবার অনুমতির কী হল?'

'জাপান তাকে এত সাহায্য করা সত্ত্বেও উনি শত্রুরাষ্ট্র রাশিয়ায় যেতে চান কেন? এটা কি উচিত হচ্ছে তাঁর?'

'দেখুন, আমরা তাঁকে যত সাহায্যই করে থাকি না কেন চন্দ্রা বোস কিন্তু জাপানের গোলাম নন। তাঁকে যদি অনুমতি না দেন তা হলে স্বয়ং সম্রাটের কাছে আপনার কথা জানাব আমি। আপনি ভাবেন কী নিজেকে? দেখুন, আপনি প্রধানমন্ত্রীকে বলে দিন যে আমি আমার নিজস্ব অধিকার বলে চন্দ্রা বোসকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছি। তাঁর যাবার ব্যবস্থাও আমি এখান থেকেই করছি।' তেরাউচি রিসিভার নামালেন।

কথার ধরন থেকে ইসোডা বুঝলেন যে তেরাউচি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতেই তেরাউচি বুঝলেন যে রাগের মাথায় একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন তিনি। আবার ফোনটা তুলে নিলেন তিনি। এবার শান্ত সংযতভাবে বললেন, 'আপনি বুঝে দেখুন। আমার এই সত্যিকারের বন্ধুটি, যিনি আমাদের দুর্দিনেও আমাদের পাশে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, নিজের দেশের জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকে আমাদের সমর্থন করা উচিত নয় কি? আমি মনে করি এই খোলা মনের মানুষটিকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।' ফোনটা এবার নামিয়ে রাখলেন তেরাউচি।

পাশে দাঁড়ানো অফিসারটিকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'মেজর চন্দ্রা বোসের জন্য কোন বিমানের ব্যবস্থা করেছেন আপনি?'

'স্যার। সায়গনে একটি বম্বারও নেই। সমস্ত বিমান ওপরওয়ালাদের হুকুমে টোকিয়ো চলে গেছে।'

'আমাদের বর্মা বাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিডেই মাঞ্চুরিয়া যাচ্ছিলেন না?'

'হ্যাঁ স্যার। তিনি তাঁর স্টাফেদের নিয়ে মাঞ্চুরিয়া রওনা হবেন আজ। সেখানে রাশিয়ান কম্যান্ডারের সামনে আত্মসমর্পণের কাগজপত্রে সই করতে হবে তাঁকে। মনে হয় তাঁর বিমান ইতিমধ্যে সায়গনের বিমানবন্দরে প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে আছে।'

এমন সময় দু-তিনজন সিনিয়র অফিসার প্রায় কাঁদতে কাঁদতে সেখানে এসে খবর দিলেন যে ফরমোসা বাহিনীর কম্যান্ডার রিকোজি অ্যাডো হারাকিরি করেছেন।

খবরটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল তেরাউচিকে। এমন দুর্দিন জাপানের জীবনে আর কখনও আসেনি। তিনি বুঝলেন একেবারেই সময় নেই আর। ভালমন্দ কিছু হয়ে যাওয়ার আগেই নেতাজিকে কোনও একটা নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিতেই হবে। সৌভাগ্য যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিডেই ইংরেজি আর ফরাসি জানেন। তাঁর সঙ্গেই নেতাজিকে মাঞ্চুরিয়া পাঠাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই সায়গনের বিমানবন্দরে নির্দেশ পাঠালেন তিনি।

৬

দালাত থেকে খবর আসতে দেরি হচ্ছে বলে নেতাজি ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠছেন। এমন সময় তেরাউচির কয়েকজন স্টাফ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে হাচিয়া আর ইসোডা এসে পৌঁছলেন। সবাই মিলে একটা বন্ধ ঘরে বৈঠকে বসলেন।

'তেরাউচি নির্দেশ দিয়েছেন যে আত্মসমর্পণের কাগজপত্রে সই করার সময় সিডেই আপনার সঙ্গে রাশিয়ান অফিসারদের পরিচয় করিয়ে দেবেন।' হাচিয়া জানালেন।

নেতাজি শুনে খানিকটা ভরসা পেলেন। তবে এ ভরসা বেশিক্ষণ টিকল না। বিমানবন্দর থেকে খবর এল যে বিমানে একটিমাত্র জায়গা আছে। শুনেই আইয়ার, হবিবুর রহমান, আবিদ হাসান, দাস, প্রীতম সিং সবাইকারই মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বহু কষ্টে জাপানের এই অবস্থাতেও তেরাউচি নেতাজির জন্য একটা রাস্তা খুঁজে বার করেছেন। কিন্তু নিজের প্রিয় সহকারীদের, যাঁরা সুখেদুঃখে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, তাঁদের ছেড়ে কোথায় যাবেন নেতাজি। সহকারীদের বিমর্ষ মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। নেতাজির পা উঠছে না যাবার জন্য।

'শিগগিরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে চন্দ্রা বোসজি। আমাদের সমস্ত বিমানবন্দরের কর্তৃত্ব এখন আমেরিকার হাতে। হয়তো সায়গন থেকে এটাই শেষ বিমান।' জেনারেল ইসোডা উদ্বিগ্নস্বরে বললেন।

জলে চোখ ভরে গেছে নেতাজির। একবার সমস্ত সহকারীদের মুখের দিকে তাকিয়ে ইসোডাকে তিনি বললেন, 'আমার এইসব জন্মজন্মান্তরের সাথিদের ফেলে কোথায় যাব আমি। আপনারা যে করেই হোক আর একটা বিমানের ব্যবস্থা করুন।'

'সেটা অসম্ভব। বহু চেষ্টায় পাওয়া এ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।' ইসোডা বলে উঠলেন।

সবাই অস্থির। আজাদ হিন্দের প্রাণপুরুষ নেতাজি চলে গেলে হালছাড়া এই নৌকো কোথায় যাবে? প্রাণই যদি চলে যায় তবে শরীরে কী হবে? এই সবের পেছনে জাপানের কোনও দুরভিসন্ধি নেই তো? হাচিয়া আর ইসোডাকেও সন্দেহের চোখে দেখছেন তাঁরা।

নেতাজি বললেন, 'সুখেদুঃখে আপনাদের সঙ্গে থাকার কথা দিয়েছি আমি। চলে যাক বিমান। আপনাদের ছেড়ে যাব না আমি।'

সবার মুখে খুশি ঝলক দিয়ে উঠল এ কথায়। এবার উত্তেজিত ইসোডা বললেন, 'আপনাদের মাথা ঠিক আছে তো? হিরোসিমা-নাগাসাকির পরেও জাপানের ওপর আরও পারমাণবিক বোমা যে-কোনও সময়ে পড়তে পারে।'

'আমরা আমাদের প্রাণ দিয়েও নেতাজিকে রক্ষা করব।' আবিদ হাসান জোর দিয়ে বললেন।

'নেতাজির প্রতি আপনাদের বিশ্বস্ততায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির কথা ভাবুন। আপনারা আপনাদের নেতাজিকে যেরকম ভালবাসেন, জাপানিরাও তেমনি তাদের দেশ আর তাদের সম্রাটকে ভালবাসে। পারমাণবিক বোমা ছাড়া জাপানকে কেউ নতিস্বীকার করাতে পারত না। হাজার বছর ধরে লড়াই চালাতাম আমরা। কিন্তু মূর্তিমান শয়তানের সৃষ্টি এই পারমাণবিক বোমা সব ওলটপালট করে দিয়েছে।' সবাইকে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি করিয়ে দিলেন ইসোডা। 'আর দিন চারেকের মধ্যেই শুধু আমাদের সৈন্য, প্রশাসনই নয় হয়তো আমাদের নিশ্বাস নেবার অধিকারটুকুও আমেরিকার হাতে চলে যাবে। তখন আমরা আপনাদের নেতাজির কোন কাজে লাগব?'

'আমেরিকান ফৌজ জাপানে নেমেই সর্বপ্রথম যুদ্ধাপরাধী হিসাবে নেতাজির হাতে হাতকড়া পরাবে।' হাচিয়া যোগ করলেন।

হাচিয়া আর ইসোডার কথায় সকলের সংবিৎ ফিরল। ইতিহাসের চাকা প্রবল বেগে ঘুরছে। সারা পৃথিবীতে ওলটপালট চলছে। থাইল্যান্ডের সৈন্যরাও আমেরিকা আর ব্রিটেনের আঁচলের তলায় যাবার জন্য তলায় তলায় তৈরি হচ্ছে। জাপানিদের খেদাবার জন্য ইতিমধ্যেই তারা অস্ত্রশস্ত্র জমা করছে বলেও খবর পাওয়া গেছে।

নেতাজি নিরুত্তর। এমন সময় প্রীতম সিং বলে উঠলেন, 'আইয়ার, পৃথিবী উলটে গেলেও নেতাজির হাতে হাতকড়া সইতে পারব না আমি।' সহকারীরাও এবার মত পালটালেন।

'নেতাজি, একটাও যদি জায়গা পাওয়া যায় তা হলে আর এখানে থাকবেন না আপনি। আপনি যদি নিরাপদে থাকেন তবে আবার সব হবে।' বলে উঠলেন সবাই।

'কিন্তু আমাদের অন্তত একজনকে নেতাজির সঙ্গে যেতে দিতে হবে।' এস. এ. আইয়ার বলে উঠলেন।

ইসোডা বললেন, 'চলুন বিমানবন্দরে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।'

সবাই বিমানবন্দরে পৌঁছলে দেখা গেল বিমানের ইঞ্জিন অনেকক্ষণ আগেই চালু করে রাখা হয়েছে। বাকি বারোজন যাত্রী ইতিমধ্যেই বিমানে উঠে গেছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিডেই অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছেন।

পাইলট নোনো গাকি আর সিডেই তাড়াতাড়ি বিমান থেকে নেমে নেতাজিকে জাপানি রীতিতে ঝুঁকে পড়ে আজোগি করলেন। নেতাজি সিডেইকে তাড়াতাড়ি বললেন, 'জেনারেল, আমার একজন অন্তত সহকারীর জায়গার ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে।'

সিডেই পাইলটের দিকে তাকালেন। নোনো গাকি বিমর্ষভাবে বললেন, 'অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব স্যার। এই বোমারু বিমানে মাত্র ন'জন যেতে পারে। সেখানে ইতিমধ্যেই বারোজন যাচ্ছে। একটন মালের জায়গায় দু'টন মাল তোলা হয়েছে। ভুলে যাবেন না এটা সবাইকার জীবনের প্রশ্ন।'

'যে করেই হোক আর একজনকে নিতেই হবে আপনাকে।' নেতাজি মিনতি করে বললেন।

'আপনি বুঝে দেখুন, অত ওজন নিয়ে বিমানের ওড়াই মুশকিল হবে।'

'এটা আমার অর্ডার মনে করুন।' এবার দৃঢ়স্বরে বললেন নেতাজি।

'স্যার, হুকুম মানতে আমরাও চাই। কিন্তু এতে বিপদ হতে পারে।'

অনেক তর্কবিতর্কের পর নেতাজির সঙ্গে আর একজন নেবার সিদ্ধান্ত হল। তখনও নেতাজির সহকারীদের একটা গাড়ি এসে পৌঁছয়নি। বিমানের ইঞ্জিন চালুই রয়েছে। পরের গাড়িটা এসে পৌঁছলে তার থেকে দুটি সিন্দুক নামানো হল। এবার বেঁকে বসলেন নোনো গাকি। মাল কমাতেই হবে। পাশের একটা ছোট্ট ঘেরা জায়গায় গিয়ে সিন্দুক খোলা হল। দুটো সিন্দুকেই রয়েছে পূর্ব এশিয়ার মা বোনদের দেওয়া অলংকারের রাশি। ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পাথেয়। অলংকারগুলো ছাড়া কাপড়চোপড় যা ছিল সব বার করে ফেলা হল। তারপর সিন্দুক দুটো তোলা হল বিমানে।

কর্নেল হবিবুর রহমান একলা চললেন নেতাজির সঙ্গে। হবিবুরের প্রতি হিংসে হচ্ছে বাকি সবার। বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ বাড়ল। কানে তালা লাগছে সবার। গরম হাওয়ার হলকা লাগছে সবার গায়ে। ইসোডা আর হাচিয়াকে আলিঙ্গন করে একের পর এক সহকারীকে

জড়িয়ে ধরলেন নেতাজি। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে তাঁর। চোখ দুটো মুছে ইসোডাকে আর একবার তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলেন নেতাজি। 'প্রতিশ্রুতির কথা ভুলবেন না। তাড়াতাড়ি বিমানের ব্যবস্থা করে আমার সহকারীদের মাঞ্চুরিয়ার ডেরেন-এ পাঠাতে ভুলবেন না।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিমানের দরজায় দাঁড়ালেন নেতাজি। দরজার ফ্রেমে তাঁর দীপ্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছেন সহকারীরা। আবেগভরা কণ্ঠে নেতাজি বললেন, 'মিলেঙ্গে, মেরে ভাই, জরুর মিলেঙ্গে। জয় হিন্দ।'

বিকেল সওয়া পাঁচটা বেজে গেছে। কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। জোরে জোরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বিমান চলতে শুরু করল। ক্রমশ গতি বাড়ছে বিমানের। বোমারু বিমানে জানলা থাকে না। তাই সহকারীদের আর দেখতে পাচ্ছেন না নেতাজি।

নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সহকারীদের এতক্ষণে মনে পড়ল, সকালে ব্যাংককে দু' চুমুক কফি ছাড়া সারা দিনে জলটুকুও খাননি নেতাজি।

দূরে পাড়ি দিচ্ছে বিমান। বিশাল আকাশে একটা ছোট্ট বিন্দুর মতো হতে হতে মিলিয়ে গেল একসময়।

৭

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নোনো গাকির মাথায় যেন পাহাড়ের বোঝা। নেতাজি বোস শুধু একজন রাষ্ট্রপ্রধান নন, এশিয়ার বহুমান্য নেতা। তাঁকে নিরাপদে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নোনো গাকি আর তাঁর সহকারীদের ওপর।

নোনো গাকিদের এই বিমানটি ৯৭-২ স্যালি বোমারু বিমান। হিরোসিমা-নাগাসাকির ঘা প্রত্যেক জাপানিদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। কিন্তু আপাতত সিডেই-এর মনে সব ছাপিয়ে শুধু একটা চিন্তা— নেতাজিকে নিরাপদে পৌঁছনো।

সায়গনের বিমানবন্দর থেকে ওড়বার সময়ই নোনো গাকির নজর সামনের ফ্লাইট ন্যাভিগেশন বোর্ডের দিকে যেতেই চমকে উঠলেন তিনি। এটা কী? 'তারো কোয়ানো, শিগগির সামনে দেখ।' তারো কোয়ানোর নজর পড়ল বোর্ডের ওপর। কী ব্যাপার? রেভোলিউশন কাউন্টার দেখাচ্ছে তেত্রিশশো আবর্তন। কপাল ঘেমে উঠল তারো কোয়ানোর।

'স্যার তেত্রিশশো— এত চাপ কোথা থেকে আসছে।'

'আমিও তো তাই ভাবছি। সাধারণত ষোলোশো-সতেরোশো থাকে। একেবারে দ্বিগুণ। তাও একেবারে শুরুতে।'

এখন বিমান চালাচ্ছেন মেজর আয়োগি। তাঁর মতো অভিজ্ঞ বৈমানিক আপাতত জাপানি বিমানবাহিনীতে আর দুটি নেই। তাঁকেও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। নোনো গাকি জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়োগি, কিছু গোলমাল মনে হচ্ছে?'

'অত্যন্ত বেশি ওজন হয়ে গেছে। যাত্রী আর মালপত্তর ছাড়াও কামানগুলোও তো রয়েছে। আয়োগি চোখ কোঁচকালেন।'

'যথেষ্ট পরিমাণ পেট্রল আছে তো?'

'হ্যাঁ। পেছনের ছাদে বড় বড় দু' ট্যাঙ্ক অতিরিক্ত পেট্রল নেওয়া হয়েছে। ওজন বাড়ার সেও একটা কারণ।'

'তা ছাড়া উপায়ও তো নেই। এত দূরের সফর। এই পরিমাণ পেট্রল তো দরকার হবেই। কিন্তু মাঝখানে কোনও গোলমাল হবে না তো?' নোনো গাকি জানতে চাইলেন।

'না, সেরকম কিছু তো মনে হচ্ছে না।' আয়োগি বললেন।

কো-পাইলট মেজর তাকিজাবাও আয়োগির কথার সমর্থন করলেন। দুজনের ওপরই নোনো গাকির ভরসা আছে। একটু নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। স্যালি বম্বার বেশ মজবুত ধরনের বিমান। বিখ্যাত মিৎসুবিশি কোম্পানির তৈরি দু'দুটো শক্তিশালী ইঞ্জিন রয়েছে এতে। লম্বায় প্রায় ১৬ মিটার। পাখার বিস্তৃতি সাড়ে বাইশ ফুট। যুদ্ধের সময় এই বিমান বহুবার ব্যবহার করেছে জাপানিরা। আজ পর্যন্ত কোথাও কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি এই বিমানে। তিন-চারদিন আগেই এই বিমান নিয়ে নোনো গাকি সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। একটা ডানা তখন সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বটে তবে সেটা বেশ ভাল করে সারিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন ডানা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। এ পর্যন্ত মোটামুটি নিশ্চিন্তই ছিলেন নোনো গাকি। কিন্তু ইঞ্জিনের এই দুরন্ত গতি ভাবনায় ফেলে দিয়েছে তাঁকে।

আকাশে ওড়ার পর অবশ্য সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে উঠল। তবু নোনো গাকি আর একবার এমারজেন্সির সময় ব্যবহার করার উপকরণগুলো ভাল করে দেখে নিলেন। এখন অনেকটা স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন বৈমানিকেরা।

বোমারু বিমানে বসার চেয়ার থাকে না। নেতাজিকে নিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিডেই মাঝখানে নীচে বসেছেন। এত বড় বড় মানুষরা এইভাবে কষ্ট করে যাচ্ছেন দেখে বৈমানিকেরা খুব লজ্জিত বোধ করছেন।

রওনা হতেই খুব দেরি হয়ে গেছে। অল্পক্ষণের মধ্যে অন্ধকার হয়ে এল। রাতে ওড়াটা বিপজ্জনক। তা ছাড়া শত্রু এলাকার ওপর দিয়েই বিমানের গতিপথ। সে জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক নোনো গাকির মনটা কু গাইছে। তেরাউচির আদেশ চন্দ্রা বোসকে মাঞ্চুরিয়ার ডেরেনে পৌঁছতে হবে। 'ভুলে যেয়ো না চন্দ্রা বোস একজন রাষ্ট্রপ্রধান।' সায়গনের উপরওয়ালারাও বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন নোনো গাকিকে। তাঁর সম্পর্কে যথোচিত সতর্কতা নেবার জন্য বার বার বলে দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

লম্বাচওড়া চেহারার লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিডেই এমনিতেই বেশ দিলখোলা লোক। অনেকগুলো ভাষার দখল তাঁর ব্যক্তিসত্তায় একটা বিশেষ মাত্রা এনে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নেতাজির সঙ্গে তাঁর বেশ ভাল জমে গেল। পরিষ্কার ইংরেজি বলেন সিডেই। নেতাজিকে তিনি বললেন, 'এই আত্মসমর্পণে জাপানের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। এ অবস্থায় আপনি না দমে নতুন করে উদ্যম নেবার জন্য রাস্তা খুঁজছেন তাতে খুব ভাল লাগছে আমার।'

নেতাজি হাসলেন। বললেন, 'যিশুখ্রিস্টের একটা অয়েল পেন্টিং দেখেছেন আপনি? বন্দি যিশু অপমানের কাঁটার মুকুট পরে, লাঞ্ছনার ক্রুশ বইতে বইতে পাহাড়ে চড়ছেন। তখনও মানবজাতির মুক্তির কথা ভাবছেন যিশু। ওই ছবিটা বার বার মনে পড়ে আমার।'

সিডেইয়ের মতো আগাপাস্তলা সামরিক ব্যক্তির পক্ষে নেতাজির কথার অন্তর্নিহিত অর্থটা বোঝা খুব সহজ নয়। তবে নেতাজি নিজেই বলতে লাগলেন, 'আমাকেও তাই করতে হবে।' নোনো গাকি যে মাঝে মাঝেই পেছনের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন সেটা নেতাজির নজর এড়ায়নি। হঠাৎ একসময় ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে পেছনে গেলেন নোনো গাকি। রবারের ট্যাঙ্কগুলো ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে কিনা ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপর আবার জায়গায় ফিরে এলেন।

অন্ধকারে এই পথে যাওয়ার অর্থ বিপদকে নেমন্তন্ন করে আনা। যে-কোনও মুহূর্তে শত্রুর একটা একটা বিমান বিধ্বংসী গোলা শেষ করে দিতে পারে তাদের। সিডেই আর নেতাজি স্থির করলেন রাতটা টুরেন নামে ছোট একটা শহরে কাটানোই ভাল।

টুরেনে জাপানি কোয়ার্টার মাস্টারের ফ্ল্যাটে নেতাজি আর সিডেই একটা কামরাতেই রইলেন। অনেকক্ষণ ধরে দুজনের আলোচনা চলল। রাশিয়ার একটা মানচিত্র মনোযোগের সঙ্গে দেখছিলেন নেতাজি। সিডেই তাঁকে অনেক তথ্য যোগাচ্ছিলেন। মাঝরাতের পর নেতাজি উঠলেন। পাশের কামরায় তিন পাইলট রয়েছেন। তাঁরা ঘুমিয়েছেন কি না দেখার জন্য নেতাজি তাঁদের কামরার সামনে এলেন। নিশ্চিন্তে নাক ডাকাচ্ছেন তিনজন। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন তাঁরা।

৮

মনে হল কে যেন গায়ের চাদরটা সরিয়ে নিল। নেতাজির ঘুমটা ভেঙে গেল। চারপাশে কেউ তো নেই! পাশের খাটে সিডেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘড়ির দিকে তাকালেন নেতাজি। পৌনে চারটে। অর্থাৎ ঘণ্টা দুইও ঘুম হয়নি।

উঠে পড়ে চান করে নিয়ে খালিগায়ে পুজোয় বসলেন তিনি। এই সময় সিডেইয়ের ঘুম ভাঙল। অবাক হয়ে নেতাজিকে দেখছেন সিডেই। সদ্যস্নাত চেহারায় তাঁকে যোগীর মতো দেখাচ্ছে। হাতে রুদ্রাক্ষের একটা মালা আর ছোট্ট একটা গীতা। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সিডেই। গীতাপাঠ শেষ করে চোখ খুললেন নেতাজি।

ছোট্ট গীতাটা একটা রেশমি রুমালে বাঁধবার সময় একটা ফটো নীচে পড়ে গেল। সেটা তুলে দিতে গিয়ে সিডেই অবাক। এক বিদেশি তরুণীর ছবি। অনর্থক অন্য কিছু যাতে তিনি না ভাবেন সে জন্য নেতাজি নিজেই বললেন, 'শি ইজ মাই ওয়াইফ।'

বেশি আলোচনার সময় নেই। কিন্তু আজ বার বার এমিলির কথা মনে হচ্ছে নেতাজির। এক মাতৃভূমি ছাড়া কোনও চিন্তাই নেতাজির মনে বেশিক্ষণ থাকে না। কিন্তু এমিলি! ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রেম দিয়ে নেতাজিকে জয় করেছিলেন তিনি। অনেকদিন পর তার কথা এত বেশি করে মনে আসছে নেতাজির। ইউরোপের পট পরিবর্তনের পর চোরাপথে চিঠি আসাও বন্ধ হয়ে গেছে। জার্মানি আর ইতালি দুটো দেশই এখন মিত্রশক্তির পদানত। এই তুলকালামের মধ্যে কোথায় আছে এমিলি?

'চন্দ্রা বোস। আমার দুটি ছেলে আছে। আপনার কোনও সন্তান আছে কি?' সিডেই বললেন।

'একটি ছোট্ট মেয়ে আছে। অনিতা নাম তার।' নেতাজি বললেন।

'তার কোনও ফটো নেই আপনার কাছে?'

'এ্যাঁ— না।' নেতাজিকে অপ্রস্তুত দেখাল। কীরকম অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন তিনি। সত্যি! একটা যদি ফটো থাকত। মনটা মুচড়ে ওঠে। হঠাৎ নেতাজি বলে উঠলেন, 'ছেলে যদি হত তা হলে হয়তো এত মন কেমন করত না।'

'কেন?'

'ছেলে মানে বাঁধনহারা ঝরনা। যে-কোনও সময়ে পাহাড় থেকে চঞ্চল পায়ে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু মেয়েরা পাথরের নীচে জলের মতো। অন্তত বাবার কাছে। মনের কোনায় শান্ত হয়ে বসে থাকা শান্তিবারি। ভেতরেই থেকে কেমন একটা ঝিম ধরিয়ে দেয় মনে।'

বাইরে হাঁকডাক শুরু হয়ে গেছে। ডেকে ডেকে তুলছে একে অপরকে। সিডেই বললেন, 'তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে। মাঞ্চুরিয়াতে সময়মতো পৌঁছতে না পারলে অনর্থ ঘটে যাবে। খামোখা জটিলতা বাড়বে।'

নেতাজি নিজের কিটব্যাগটা দেখলেন। আশ্চর্য! টুথব্রাশ, পেস্ট, দাড়ি কামাবার জিনিসপত্র, সাবান— এই ছোট্ট ব্যাগটা কে ভরল? এক এমিলিই এভাবে সাজিয়ে দিত। কিন্তু এমিলি কোথায়? আশ্চর্য! নিজেই এভাবে সাজিয়েছেন নেতাজি না কি কোনও অজানা শক্তি?

'চলুন, চন্দ্রা বোসজি।'

'চলুন।'

নেতাজি নিজের ব্যাগটা তুলে নিলেন। ঠিক তখনই হবিবুর রহমান দৌড়ে এসে তাঁর হাত থেকে ব্যাগটা নিলেন। জিনিসপত্র গুছিয়ে সবাই তাড়াতাড়ি টুরেনের বিমানবন্দরে চললেন। ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে পাঁচটা। ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫।

ভাবছেন নেতাজি। সবকিছুই কেমন রহস্যময় লাগছে তাঁর কাছে। সকালে কে তাঁকে উঠিয়ে দিল? কিটব্যাগটা কে ভরল? কীরকম যেন লাগছে।

মোটরে সবাই এসে বিমানবন্দরে পৌঁছলেন। হঠাৎ পেছন ফিরে তাকালেন নেতাজি। মনে হল কে যেন ঠিক পেছনে পেছনে আসছে। কেউ নেই। অনেকদিন ভাল ঘুম হয়নি। তাই বোধহয় এরকম হচ্ছে।

ক্রু-রা বিমান পরীক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে। কিন্তু বিমান পরীক্ষাও জরুরি। বিমানের প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। এমন সময় তারো কোয়ানো নোনো গাকিকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। বিমানের একটা চাকার দিকে দেখালেন তিনি। কাছে গিয়ে নোনো গাকি দেখলেন চাকাটা একটু বেঁকে রয়েছে।

স্যার, ওজন কিছু কমাতে হবে।' ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন আবি বললেন।

বম্বার থেকে বারোটা মেশিনগান, আর সেগুলোর গোলাগুলি নামিয়ে ফেলা হল। সব মিলিয়ে প্রায় দুশো কিলো ওজন কমল। সবকিছু ভালভাবে পরীক্ষা করে নিয়ে ভোরের মিঠে আবহাওয়ায় বিমান টুরেন থেকে রওনা হল। এরপর হায়তো আর তাইপে-তে থেমে ডেরেন যেতে হবে। স্যালি বম্বার চার হাজার মিটার উঁচু দিয়ে চলেছে। বিমানের মধ্যে তাই বেশ ঠান্ডা। যাত্রীরা সবাই ঠান্ডায় কুঁকড়ে যাচ্ছেন। সামরিক ব্যক্তিরা এতে অভ্যস্ত— তবে নেতাজির মতো সিভিলিয়ান বেশ ভালভাবেই টের পাচ্ছেন ঠান্ডা।

সিডেই আর নেতাজি মাঝে মাঝেই রেডিয়োর খবর শুনছেন। একটা খবর শুনে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সিডেই, 'চন্দ্রা বোস, রাশিয়ান ফৌজ ডেরেনের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। যে-কোনও মুহূর্তেই ডেরেনে পৌঁছবে তারা।'

বৈমানিকদের ওপর মানসিক চাপ বাড়ছে। তাইপে পৌঁছতেই অন্তত দু' ঘণ্টা লাগবে। মোট প্রায় এগারো ঘণ্টার রাস্তা এখনও বাকি। তার আগেই মিত্রশক্তির ফৌজ ডেরেন পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। সিডেইকে প্রচণ্ড চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। তার ওপরে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। বম্বারটা ডিপ্লোম্যাটিক কাজে যাচ্ছে না অন্য কোনও উদ্দেশ্যে যাচ্ছে শত্রুরা কি সেটা বুঝতে পারবে? একটা বিমান বিধ্বংসী গোলা যদি দেগে বসে তারা? সবাই ভাবনায় পড়লেন।

'একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডেরেনে পৌঁছতে হবে।' সিডেই বললেন।

মৃদু হেসে নেতাজি বললেন, 'আপনার চেয়ে আমার বেশি তাড়া!'

নোনো গাকিকে ডেকে সিডেই জানতে চাইলেন বিমানের যান্ত্রিক পরিস্থিতি কেমন?

'ভাল। মেশিনগানগুলো নামিয়ে নেওয়ার পরে বিমান অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। শুধু টেক অফের সময়ে একটু অসুবিধে থাকলেও ওড়বার সময়ে অসুবিধে নেই।' নোনো গাকি জানালেন।

'মাঝে হায়তোতে যদি আমরা না নামি?' সিডেইকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ। আবহাওয়াও পরিষ্কার। পেট্রলও যথেষ্ট আছে। মধ্যে না থেমে আমরা সোজা তাইপে পর্যন্ত পৌঁছতে পারব।'

কথাটা মনে ধরল সবার। নেতাজি সিডেইকে বললেন, 'রাশিয়াতেও বেশি দিন থাকব না আমি। হিমালয়ের দিকে এগিয়ে আমাকে আবার আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে হবে। স্বাধীনতার অপূর্ণ স্বপ্ন আমাকে সাকার করে তুলতেই হবে।'

'চন্দ্রা বোস, রাশিয়ান বাহিনীতে আমার বেশকিছু বন্ধু বেশ উঁচুপদে আছেন। স্পেশাল ট্রেনিং নেবার জন্য ইউরোপে থাকার সময় অনেকের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল।' সিডেই জানালেন।

'ওরা কি সাহায্য করবে?'

'কেন করবে না? আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করবে তারা।'

'রাশিয়ায় স্তালিনের একাধিপত্য। অসুবিধে হতে পারে।'

'আমার মনে হয় না।'

'আপনার মনে এত ভরসা কীসের?' নেতাজি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'পৃথিবীর কোনও স্বেচ্ছাচারী বাহিনীরই সমস্ত লোকের মন লোহা দিয়ে তৈরি নয়। প্রত্যেক সামরিক বাহিনীতেই আদর্শ, স্বাধীনতা, মনুষ্যত্বকে সম্মান করে এমন অনেক লোক থাকে। এইরকম কিছু লোকের সঙ্গে ডেরেনেই পরিচয় করিয়ে দেব আপনার। তা ছাড়া পৃথিবীর মধ্যে কঠোর প্রাণ বলে বিখ্যাত জাপানিদেরও আপনি মুগ্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই রাশিয়াতেও আপনি নিশ্চয় সফল হবেন।'

এবার হেসে উঠলেন নেতাজি। বললেন, 'আপনার কথায় আর একজনের কথা মনে পড়ে গেল আমার। লোহার হেলমেটের নীচে মোমের মতো নরম একজন লোক। আমার বন্ধু—নাৎসি জার্মানির অ্যাডাম ট্রট।'

প্রায় ছ' ঘণ্টা বিমান চলছে। দুপুর তখন সাড়ে বারোটা। ফরমোসা-র দ্বীপগুলো দেখা যাচ্ছে এবার। দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে তাইপের বিমানবন্দর। শহরের চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। মাঝখানে বাটির মতো শহরটা। সামনের উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে শহরটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ইটখোলার চিমনি দিয়ে বেরোনো ধোঁয়া। নেতাজির মনে পড়ছে অনেকবার এখানকার রেলওয়ে হোটেলে থেকে গেছেন তিনি।

বম্বারটা নীচে নামছে অল্প অল্প মেঘের মধ্য দিয়ে। তাইপের পর অনেকটা পথ সাগরের ওপর দিয়ে যেতে হবে। এখানে একবার থামাটা তাই খুব দরকার। ইঞ্জিনেরও একটু বিশ্রাম দরকার। এর পরে পাঁচ ঘণ্টা টানা উড়তে হবে। নামার কোনও উপায় নেই। রানওয়েতে বিমানের চাকার ঘর্ষণের আওয়াজ বাড়ছে। মেঘগর্জনের মতো শোনাচ্ছে সেটা।

তাইপের মুৎসুয়ামা বিমানবন্দর দুপুরের রোদে স্নান করছে। এর আগে অনেকগুলো বিমান আক্রমণ হয়ে গেছে সেখানে। তার সাক্ষ্য রয়েছে চারদিকে। একটা তাঁবুতে বসে রয়েছেন সিডেই আর নেতাজি। আরদালি এসে খাবার রেখে গেল। কিছুই খাওয়া হয়নি; তবু খিদে নেই। সিডেইয়ের পীড়াপীড়িতে দুটো কলা খেলেন নেতাজি।

ওদিকে উড়ানের আগে বিমান পরীক্ষা চলছে। কথা বলতে বলতে সিডেই বললেন, 'চন্দ্রা বোসজি, একটা কথা বলা হয়নি। রাত্রে সায়গনের সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে আমরা সায়গন থেকে রওনা হওয়ার কয়েক মিনিট পরেই আমেরিকান বিমান বোমা ফেলেছে সেখানে।'

নেতাজি শুনে হাসলেন। তাঁকে হাসতে দেখে সিডেই বিস্মিত। তাঁর বিস্ময় দেখে নেতাজি বললেন, 'আমাকে জীবিত বা মৃত যে কোনওভাবে হাতে পাওয়ার জন্য মাউন্টব্যাটেন আর চার্চিল অস্থির হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁদের সে বাসনা কোনওদিনই পূর্ণ হবে না। একদিন-না-একদিন ইংরেজদের ভারত ছাড়তেই হবে। ইন্ডিয়া উইল বি ফ্রি অ্যান্ড দ্যাট টু বিফোর লং।'

বুদ্ধের জন্মভূমি ভারত সম্বন্ধে আরও জানতে চান সিডেই। নেতাজি বললেন, 'পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক থাকে আমার দেশে। শুধু লোকবল নয়, প্রাকৃতিক সম্পদেও এক আমেরিকা ছাড়া আর কেউ আমাদের সমকক্ষ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। ভেদাভেদের দেওয়াল আমার দেশের একটা অভিশাপ। অন্ধ বিশ্বাস, জাতধর্মের বাছবিচার— এইসব থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। একবার যদি আমরা এইসব রোগ থেকে মুক্তি পাই তা হলে পৃথিবীর মধ্যে একটা সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসাবে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে সময় লাগবে না আমাদের। সেটাই আমার স্বপ্ন।'

'স্বাধীনতা পাওয়ার পরে কী করতে চান আপনি?'

'পাহাড়প্রমাণ সমস্যার সমাধান করতে হবে আমাদের। প্রথমেই একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দারিদ্র্য আর বেকারি দূর করতে হবে। জনসংখ্যার বল্‌গাহীন বৃদ্ধি রুখতে হবে। আমাদের বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের স্বার্থে গড়ে তুলেছে। এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জাতিধর্মের নামে যারা ডান্ডাবাজি করছে, তাদের শায়েস্তা করতে হবে। একদিকে কুটিরশিল্প অন্যদিকে প্রয়োজনমতো ভারী শিল্পের ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়াও কৃষি সংস্কার, নদী সংরক্ষণ, বাঁধ নির্মাণের কাজ হাতে নিতে হবে। দেশের প্রতিটি লোককে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। একটিমাত্র লিপির প্রচলন করতে হবে সারা দেশের ঐক্যের জন্য। উপযুক্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করে গড়ে তুলতে হবে শক্তিমান, ধর্মনিরপেক্ষ এক চৈতন্যময় রাষ্ট্র।'

ওদিকে স্যালি বম্বারের পরীক্ষা চলছে। নোনো গাকি তারো কোয়ানোকে একটা পাশে টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। চাপা স্বরে বললেন, 'লক্ষ করেছ যে ডান দিকের ইঞ্জিনটা একটু ঢিলে লাগছে।'

'নামার সময় আমি তো তেমন কিছু বুঝিনি।' মাঝখানেই বললেন আজোগি।

সে যাই হোক ভালভাবে ঠিকঠাক না করে ওড়া ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি ইঞ্জিনের ঢাকনা খোলা হল। তিনজনেই খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন সবকিছু। এদিকে ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সিডেই, নেতাজি আর হবিবুর রহমান বিমানের কাছে এসে আবার ফিরে গেলেন।

হঠাৎ রেডিয়োর খবর কানে এল। ফরমোসার জাপানি গভর্নর জেনারেল আত্মসমর্পণের কথা শুনে হারাকিরি করেছেন। রাশিয়ান ফৌজ আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডেরেন পৌঁছে যাবে বলেও বলা হল খবরে।

অস্থির হয়ে উঠেছেন সিডেই। সব পণ্ড হয়ে যাবে। বার বার তাড়া দিচ্ছেন বৈমানিকদের।

'স্যার এত চিন্তার কী আছে? আমাদের বম্বার তো শুধু আত্মসমর্পণের সইসাবুদ করার ব্যাপারেই সেখানে যাবে। এ কথা কি শত্রুপক্ষকে আগেই জানিয়ে দেননি আপনারা?'

'যুক্তির দিক দিয়ে তোমার কথা ঠিক। কিন্তু অন্ধকারে সাদা কালোর রং এক। তা ছাড়া বদলা নেবার জন্য পাগল হয়ে রয়েছে তারা। এর আগে রেডক্রশের বিমান বা হাসপাতালকেও ছেড়ে দেয়নি তারা।'

সিডেই যতই বলুন, বৈমানিকদের নিজেদের প্রাণও নির্ভর করছে বিমানের নিরাপত্তার ওপর। তাই একেবারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে গেলেন তাঁরা। তারপর হাত ধুলেন। সব ঠিকঠাক। ইঞ্জিন চালু করা হল। নেতাজিসহ চোদ্দোজন যাত্রী তাড়াতাড়ি করে বিমানে বসলেন।

নেতাজি বিমানে ঢুকেই নোনো গাকিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কর্নেল, বিমান কি সকালের মতোই উঁচু দিয়ে যাবে?'

'এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন স্যার?'

নেতাজি হেসে বললেন, 'কিছু না। ঠান্ডাটা একটু বেশি লাগছিল তো। আর একটু হলে জমে যেতাম।' হবিবুরকে স্পঞ্জের জ্যাকেটটা বার করতে বললেন নেতাজি। গাঢ় জাম রংয়ের গলাবন্ধ জ্যাকেটটা নেতাজির গায়ে এঁটে বসল। তার ওপরে বেল্টটা বেঁধে নিলেন নেতাজি। 'হবিবভাই, বড় টাইট হচ্ছে এটা।' একটু হেসে বললেন তিনি।

এদিকে দুটো বেজে গেছে। আয়োগি এর আগে ডেরেন যাননি। তাই তাড়াতাড়ি রওনা হতে চান তিনি।

একসময় রানওয়ে দিয়ে চলতে শুরু করল বিমানটি। তারো কোয়ানো আর নোনো গাকি অবাক হয়ে ইঞ্জিনের স্পিডের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রমশই ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এ কী? ইঞ্জিনের আবর্তন বেড়েই চলেছে— ২৫০০—৩০০০—৩৩০০। গলা শুকিয়ে আসছে বৈমানিকদের। একটাই ভরসা। সায়গন থেকে ওড়বার সময়েও এইরকমভাবেই ঘুরেছিল ইঞ্জিন। একসময় বিমান রানওয়ে ছেড়ে হাওয়ায় ভাসল। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল দুজনের।

বোধহয় বিশ কি পঁচিশ মিটার মতো তখন উঠেছে বিমানটা। এমন সময় মনে হল একটা প্রচণ্ড ঢেউ যেন আছড়ে পড়েছে বিমানের ওপর। সঙ্গে সঙ্গেই কানে এল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ। কী হয়েছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ভেতরের যাত্রীরা, থরথর করে কাঁপছেন।

বাইরের দিকে তাকিয়ে নোনো গাকির নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। বিমানের একদিকে পাখাটা ভেঙে নীচে পড়ে যাচ্ছে। তার পরেই পাঁচশো কিলো ওজনের ইঞ্জিনটা অনুসরণ করল পাখাটার। বাঁ দিকের ওজন হঠাৎ কমে যাওয়ায় বিমান ঝুঁকল ডান দিকে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে সবকিছু। হবিবুর অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখছেন। জাপানিরা প্রাণভয়ে আর্তনাদ করছে। নেতাজি তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে।

বম্বারটা নীচে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গেই যাতে আগুন না লাগে সে জন্য তাড়াতাড়ি ইঞ্জিনটা বন্ধ করা দরকার। নোনো গাকি চিৎকার করে উঠলেন, 'তাকিজাবা— তাকিজাবা— ইঞ্জিন বন্ধ কর

রে ইঞ্জিন—' নিজেই সামনের দিকে এগোতে চেষ্টা করছেন নোনো গাকি। কিন্তু বিমান এমনভাবে ঝুঁকেছে যে তাঁর চেষ্টা সফল হবার কোনও আশাই নেই। পরক্ষণেই ডানদিকে ঝুঁকে বিমানটা মাটি স্পর্শ করল। মড় মড় মড়াৎ—ডানদিকের পাখাটাতে বিমানের ভারটা পড়ল। পাখাটা ভাঙল বটে কিন্তু বিমানটা চুরমার হওয়া থেকে বেঁচে গেল।

নাক ভেঙে গেল বিমানটার। সমস্ত যাত্রী এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছেন। বিমানের মধ্যে অন্ধকার। হবিবুর আর নেতাজির গায়ের ওপর অনেকগুলো ব্যাগ আর অন্য মালের স্তূপ। সেই বোঝার নীচ থেকে বেরিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন দুজন। এদিকে বিমানের ভেতরে উত্তাপ ক্রমশ বেড়ে উঠছে প্রচণ্ডভাবে।

নোনো গাকি কোনওমতে উঠে দাঁড়িয়ে সিডেইকে দেখতে পেলেন। সিডেইকে পেছনে টানার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন মাথায় দারুণ চোট পেয়েছেন সিডেই। মনে হচ্ছে সিডেই আর নেই। ওদিকে আয়োগির আর্তনাদে তিনি বেঁচে আছেন বলেই মনে হচ্ছে। তবে তাঁর একটা পা একটা লোহার পট্টির মধ্যে আটকে গেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাঁকে বাইরে আনতে পারলেন না নোনা গাকি। ইঞ্জিনটা এখনও চলছে। ভেতরের উত্তাপ বেড়েই চলেছে। আর্তনাদ, চিৎকার—যে ভাবেই হোক বাইরে বেরোবার জন্য চেষ্টা করছে সবাই। প্রচণ্ড চেষ্টায় উইন্ডস্ক্রিনটা ভেঙে ফেলে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়লেন নোনো গাকি।

হবিবুর উঠে দাঁড়িয়ে দেখলেন নেতাজিও কোনওমতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সমস্ত মুখচোখ রক্ত ঢেকে গেছে। ঝরঝর করে কপাল থেকে রক্ত পড়ছে। এমন সময় পেছনের রবার ট্যাঙ্কটা ফেটে গলগল করে পেট্রলের স্রোত বেরিয়ে এল। পেট্রলে ভিজে গেছেন নেতাজিও। রক্ত আর পেট্রলে বীভৎস দেখাচ্ছে তাঁকে।

আর্তনাদ করুণ আর্তনাদ। একটা হ্যান্ডলের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কায় বৈমানিক তাকিজাবা শেষ হয়ে গেছেন। সিডেই আর তাঁর মৃতদেহ দুটো রক্তে ঢেকে গেছে। হঠাৎ বিমানের সামনের দিক থেকে চরর্— চরর্— শশশ্— আওয়াজ পেয়ে হবিবুর বুঝলেন আগুন ধরে গেছে বিমানে। আগুন ঘিরে ফেলছে বিমানটাকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাই হয়ে যাবে সবকিছু।

হবিবুর চিৎকার করে উঠলেন, 'নেতাজি, বাইরে বেরিয়ে পড়ুন—শিগগির বাইরে বেরিয়ে পড়ুন।' সেই অবস্থায়ও রক্তে ভেজা শরীরে পেছন দিকে চলে গেলেন নেতাজি। কিন্তু সেখানে মালপত্রের স্তূপে রাস্তা বন্ধ। খোলা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজার ওপর লাথি মারছেন নেতাজি। হবিবুর চিৎকার করে উঠলেন, 'নেতাজি, নেতাজি আগে সে নিকাল যাইয়ে।'

এবার সামনের দিকে দৌড়লেন নেতাজি ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করেছে সামনের দরজা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বিমানটা। পেছনের রাস্তা বন্ধ—সামনে আগুন। কিন্তু আগুনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে লাফ মারলেন নেতাজি। পেছনে হবিবুরও লাফ দিলেন। কিন্তু নীচে দাঁড়িয়েই দেখলেন আগুন ধরে গেছে নেতাজির শরীরে। পেট্রলভেজা নেতাজি জ্বলছেন জ্বলন্ত মশালের মতো। দাউ দাউ করে জ্বলছেন অগ্নিদেব। বালির ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছেন নেতাজি। মানুষ নয়—যেন একটা আগুনের গোলা গড়াগড়ি দিচ্ছে।

নিজের শরীরের জখম ভুলে হবিবুর নেতাজির শরীরের আগুন নেভাবার চেষ্টা করছেন। নেতাজির শরীরের স্পঞ্জের জ্যাকেটটা পেট্রলে ভিজে গেছে। আঁট হয়ে গায়ে সেঁটে বসা জামাটা খোলা যাচ্ছে না। বেল্টটারও হুক আটকে গেছে। সেটাও খোলা যাচ্ছে না। হবিবুরের

হাত পুড়ে গেছে। সে দিকে লক্ষই নেই হবিবুরের। এক সময়ে জ্বলন্ত জ্যাকেটটাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারলেন তিনি।

ইতিমধ্যে তাইপের রক্ষাবাহিনীর লোকেরা ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেল সেখানে। তারা হবিবুর আর নেতাজির শরীর বালি দিয়ে ঢেকে দিতে লাগল। ভিজে মোটা কাপড়ে জড়িয়ে ফেলল দুজনের শরীর। আগুন নিভল। খোলা জায়গাতেই অনেকক্ষণ পড়ে রইলেন নেতাজি।

নেতাজির দিকে তাকিয়ে এবার ব্যথায় টনটন করে উঠল হবিবুরের মন। কোথায় সেই দৃপ্ত চেহারা। সারা মুখ পুড়ে গেছে শুধু নয়—তাতে অসংখ্য ক্ষত। গায়ে পোড়া জায়গাগুলো দগদগ করছে। বুক আর পেটের অংশগুলো বিশ্রীভাবে পুড়ে গেছে। রক্ত জমে গেছে শরীরের বহু জায়গায়। বাকি জায়গায় বিশাল বিশাল ফোসকা। জখমের জায়গাগুলো থেকে এখনও রক্ত পড়ছে। প্রাণপণে চোখ খোলার চেষ্টা করছেন নেতাজি।

আগুনের সঙ্গে যুঝবার সময় অত কিছু মনে হয়নি হবিবুরের। কিন্তু নেতাজির এই বীভৎস চেহারা দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না হবিবুর। তাঁর নিজের শরীরেও অনেক ক্ষত—অনেক জায়গা পুড়ে গেছে। তার ওপর নেতাজির এই চেহারা! মাথাটা ঘুরে উঠল হবিবুরের। জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়লেন হবিবুর।

১০

তাইপে শহরের একটু বাইরের বিধ্বস্ত একটা এলাকায় ননমন-এর সামরিক হাসপাতালটা এখনও কোনওমতে টিকে আছে। একসময় চারটে ওয়ার্ডে ভাগ করা এই আশি বেডের হাসপাতালটাতে সব রকম সুযোগ সুবিধাই ছিল। কিন্তু বিমান আক্রমণের ভয়ে অনেক আধুনিক উপকরণ অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আগের গৌরব আর নেই তার।

১৮ আগস্ট দুপুরবেলা জাপানি ডাক্তার ইওশিমি বিষণ্ণ মনে আত্মসমর্পণের বিস্তারিত খবর শুনছেন আর ভাবছেন কবে এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে টোকিয়ো যেতে পারবেন। এমন সময় ঝনঝন করে ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই ওধার থেকে একটা চেরা চেরা গলার চিৎকার ভেসে এল, 'হ্যালো, ডক্টর। আমি এয়ারপোর্ট থেকে বলছি।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'এখানে একটা বম্বার ভেঙে পড়েছে। কয়েকজন খুব গুরুতর আহতকে নিয়ে আমরা এখুনি আসছি। দয়া করে তৈরি থাকুন।'

নার্স, স্ট্রেচার ইত্যাদি নিয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতালের গেটে গিয়ে হাজির হলেন ডাক্তার ইওশিমি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাইরেন বাজিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছুল সেখানে। পেছন পেছনে একটা সামরিক জিপ। স্ট্রেচারে তুলে রোগীদের ভেতরে নিয়ে গেলেন সবাই মিলে।

'ডক্টর, তাড়াতাড়ি করুন। এদের মধ্যে একজন কোনও যেমন তেমন অফিসার নন। হি ইজ চন্দ্রা বোস অফ ইন্ডিয়া।'

'ও মাই গড।' শিউরে উঠলেন ইওশিমি।

এর আগে নেতাজিকে কখনও চাক্ষুষ না দেখলেও খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তাঁর ছবি আর খবর বহুবার দেখেছেন তিনি। চন্দ্রা বোসের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি ভালমতোই ওয়াকিবহাল।

ডাক্তার ইওশিমি নেতাজিকে পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। তাঁকে সাহায্য করছেন ডাক্তার ইশি আর ডাক্তার সুরুতা। বুক, পিঠ, পেট, হাত, পা—শরীরের একটি জায়গাও নেই যা

জ্বলেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্ঞান আছে তাঁর। অসাধারণ ধৈর্যে যন্ত্রণা চেপে রেখেছেন। গায়ের উত্তাপ ৩৯ ডিগ্রি সে. অর্থাৎ ফারেনহাইট স্কেলে ১০২ ডিগ্রির মতো। নাড়ির গতি ১২০। তাঁর সারা শরীরে মলমের প্রলেপ দিয়ে ব্যান্ডেজ করা হল। চারটে ইঞ্জেকশন দেওয়া হল তাঁকে। হার্টের গতি খুবই ক্ষীণ। ইওশিমি তাঁকে দুটো ডিজিট্যালিসও দিলেন।

'আশ্চর্য!' প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললেন, ইওশিমি। 'এই প্রচণ্ড যন্ত্রণা মিস্টার বোস সহ্য করছেন কী করে?'

'ডাক্তার যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে তুলুন এঁকে।' সামরিক অফিসারটি বললেন।

'আমার তরফ থেকে প্রাণপণ করব আমি। চন্দ্রা বোসের কথা জানি আমি। ভারতের কাছে তিনি যে কী তাও জানি।' ইওশিমি বললেন।

বাকি সমস্ত আহতরা আর্তনাদ করছেন। সবচেয়ে বেশি জ্বলে গেছেন নেতাজি। তবু তিনি দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করছেন। হঠাৎ ডাক্তারের মনে হল কী যেন বলছেন তিনি। মুখের কাছে কান নিয়ে যেতে শুনতে পেলেন যে নেতাজি জিজ্ঞেস করছেন, 'জেনারেল সিডেই কেমন আছেন?'

জাপানি রোগীরা প্রচণ্ড আর্তনাদ করছেন। তাই তাদের পেছনের দিকে একটা বড় ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হল। নেতাজির কাছে একমাত্র অচৈতন্য হবিবুর রহমানকে রাখা হল।

তিনজন ডাক্তারকে সাহায্য করার জন্য অনেক নার্স আর অন্য কর্মীরা ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন। অ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে অন্য অনেকেও ছুটে এসেছেন সেখানে।

অবিলম্বে রক্ত দেওয়া প্রয়োজন নেতাজিকে। বিশ্রীভাবে পুড়ে যাওয়া হাতে শিরা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবু একসময় সুঁচটা ফোটানো গেল। কিন্তু ব্যাপারটা দেখে চমকে উঠলেন ইওশিমি আর ইশি। তাজা রক্ত ভেতরে যাওয়ার বদলে বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে বিবর্ণ কালচে রক্ত। ডাক্তারদের চিন্তা আরও বাড়ল।

'স্যার, কী করা যায়?' ইশি বললেন।

'শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব। তবে ফল কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। রক্তে অক্সিজেন অত্যন্ত কম। তাই এই কালচে রং। এটা অত্যন্ত খারাপ লক্ষণ।'

জাপানিতেই কথা বলছেন ডাক্তাররা। হঠাৎ কানে এল, 'মিজু, মিজু।' কথা দুটো কানে আসতেই ডাক্তাররা চমকে উঠলেন। তার মানে জাপানি বোঝেন চন্দ্রা বোস। তাঁদের আলোচনা তা হলে শুনেছেন তিনি? 'মিজু, মিজু'— 'জল, জল'—শুকিয়ে আসা গলা থেকে কোনওমতে বেরিয়ে আসছে আওয়াজ। একটু একটু করে জল দেওয়া হচ্ছে তাঁর মুখে। পেছনের ওয়ার্ডের আর্তনাদ এখানেও এসে পৌঁছেচ্ছে। কিন্তু শরীরের এই অবস্থায়ও কোনও আর্তনাদ নেই নেতাজির মুখে।

সামরিক অফিসাররা একজন দোভাষীকে নিয়ে এলেন। দোভাষীর সাহায্যে নেতাজিকে প্রশ্ন করলেন, 'কিছু বলবেন আপনি?'

'কী আর বলব? জাপান-সম্রাটকে আমার শুভেচ্ছা দেবেন। আমার প্রিয় বন্ধু তেরাউচিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন।'

নেতাজির চোখের পালক, ভ্রূ সব জ্বলে গেছে। চোখ খুলতে খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর। শরীরের উত্তাপ বেড়ে চলেছে। তার মধ্যেও ডাক্তার স্তরুতাকে কাছে ডেকে জানতে চাইলেন চিফ অফ স্টাফকে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে কিনা।

খোলা হাওয়ার দরকার নেতাজির। তাই তাঁর খাটটা নিয়ে এসে দরজার সামনে রাখা হল। নিজের এই অবস্থার মধ্যেও অন্যের খবরের জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন তিনি।

'জেনারেল সিডেই কেমন আছেন?'

'ভাল আছেন— ভাল আছেন,' থতমত খেয়ে বলেন অফিসারটি।

'কোথায় আছেন তিনি?'

'এই এখানেই আর একটা হাসপাতালে।'

'শিগগিরই আমার অন্য সঙ্গীরাও এখানে আসবেন। তাদের ব্যবস্থা করবেন।' বললেন নেতাজি।

অফিসারটি বাইরে এসে ডাক্তার ইওশিমিকে বললেন, 'কী বিরাট মনের মানুষ। মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও অন্যের জন্যেই চিন্তা তাঁর। ডাক্তার, ওঁকে আমি মিথ্যে বলেছি। জেনারেল সিডেই বিমানের মধ্যেই মারা গেছেন।'

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। নেতাজির অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। ডাক্তারকে ডেকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা চেপে তিনি বললেন, 'মনে হচ্ছে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি রাশিং। ডাক্তার, আমার ঘুম দরকার—গাঢ়, গভীর ঘুম।'

হবিবুর যেন কালঘুম থেকে উঠেছেন। পাশের দিকে তাকিয়ে ব্যান্ডেজে জড়ানো নেতাজিকে দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর পাশে ডাক্তার কর্মীদের ভিড়। নেতাজির মুখের দিকে নজর পড়তেই চোখ বুজে ফেললেন হবিবুর। এই তাঁদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস? যিনি হাসলে বা কথা বললে মনে হত কি সার্থক তাঁর নাম—সত্যিই 'সুভাষচন্দ্র'—তাঁর এ কী রূপ? রূপের এই বিদ্রুপে শিউরে ওঠেন হবিবুর।

রাত বাড়ছে। ডাক্তার স্তরুতা নেতাজিকে আরও দুটো ইঞ্জেকশন দিলেন। কিন্তু তাঁর অবস্থার অবনতি রোখা যাচ্ছে না। উৎকণ্ঠায় হবিবুরের হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। 'নেতাজিকে হারিয়ে আমি ভারতবর্ষে কোন মুখে যাব? আজাদ হিন্দের সাথিদের কী জবাব দেব আমি?'

হবিবুরের পুড়ে যাওয়া হাতে ব্যান্ডেজ। সেই অবস্থাতেই উঠে ঠান্ডা মেঝের ওপরই একমনে নামাজ পড়তে লাগলেন তিনি। 'আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতাজিকে রক্ষা করো তুমি।'

রাত যত বাড়ছে নেতাজির শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ ভয় বাড়িয়ে তুলছে। মাঝে বহুকষ্টে চোখ খুলে চারদিক তাকিয়ে দেখছেন তিনি। দুপুর থেকেই তাঁর মনে হচ্ছে এই ঘরটার কোণে কেউ একজন বসে রয়েছে। যতদূর সম্ভব বড় করে চোখ খুলতেই চাইলেন তিনি। মৃত্যুর উপস্থিতি অনুভব করছেন তিনি। একদিন তো মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হবেই সেটা জেনে আজ পর্যন্ত তার পরোয়া করেননি তিনি। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের মধ্যেও শান্ত থেকেছেন। আজও মৃত্যুর পরোয়া করেন না তিনি।

নেতাজির চোখের সামনে ভেসে উঠছে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের এক অপরূপ ছবি। বিগলিত করুণা গঙ্গার মধ্যে ফুটে ওঠে মায়ের ছবি। মনে হচ্ছে নিজের বুকের মধ্যে আদরের সুবিকে জড়িয়ে ধরার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন তিনি। নীল যমুনার পুণ্যস্রোতে মাতৃসমা বাসন্তী মা। হিমালয়ের উঁচু উঁচু শিখরগুলোর মধ্যে এ সব কাদের মুখ? ছোট ভাইকে প্রাণের চেয়েও ভালবেসে আপদে বিপদে সব সময় তাঁর পেছনে দাঁড়ানো মেজদা, দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, বিঠ্ঠলভাই, গাঁধীজি, জওহরলাল। আরবসাগর আর বঙ্গোপসাগরের বিশাল ঢেউগুলোও জেগে উঠছে। সেই সব ঢেউয়ে দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য মুখ। তাদের মধ্যে আছেন নরিম্যান, স্বামী সহজানন্দ, ক্ষিতীশ, দিলীপ রায়, শার্দূল সিং। আছেন আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সহযোগীরা—স্ট্রেসি, ইয়েলাপ্পা, রাসবিহারী, কিয়ানি, ধিল্লোঁ, সেহগল, শাহনওয়াজ আরও কত কত মুখ। আজাদির ডাকে সাড়া দিয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়া সেই সব বীরাঙ্গনারা—মানবতী,

লাবো, জানকী আর এ কালের ঝাঁসিওয়ালি লক্ষ্মী স্বামীনাথন। মনে হচ্ছে সমুদ্রের পরপারে অপেক্ষা করছেন অ্যাডাম ট্রট।

আর একটা মুখ বারবার ভাসছে তাঁর চোখের সামনে—এমিলি—তাঁর অভাগী শকুন্তলা। জলে ঝাপসা চোখের সামনে বড় স্পষ্ট সেই শকুন্তলা। বাঙালি ধরনে শাড়ি পরে, ফরসা কপালে সিঁদুরের টিপটা জ্বলজ্বল করছে।

'এমিলি, কোথায় চললে এই সাজে?'

'ভারতবর্ষে।'

'কেন?'

'বাঃ। মনে নেই? লালকেল্লায় পতাকা তোলার পর লাখো লোকের ভিড় থেকে আমাকে খুঁজে বার করবে বলেছিলে না তুমি?'

'লালকেল্লা, আমার স্বপ্নের লালকেল্লা। কত কাছে অথচ কত দূর।'

'এমন কেন বলছ? তুমিই তো শিখিয়েছ যে নিষ্ঠার সামনে, সাধনার সামনে পাহাড় মিলিয়ে যায়, সাগর পিছিয়ে যায়। নিষ্ঠা আর সাধনার ওপর ভর দিয়ে আকাশছোঁয়া উঁচুতে ওঠা যায়। তবে? এ নিরাশার সুর কেন তোমার গলায়?'

'কেন জানো? আমার মনে হয় মানুষের ক্ষমতার সামনে যাতে নুয়ে পড়তে না হয় তাই। বিধাতা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর অমোঘ নিয়তি তার কপালে লিখে দিয়েছেন। ওটাই তাঁর অন্তিম অস্ত্র। এই অন্তিম অস্ত্রটা বড় তাড়াতাড়ি আমার ওপর প্রয়োগ করলেন তিনি। আমি জানি হাজার হাজার দেশভক্তদের পুণ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্গ ভেঙে পড়বেই আর সেটা হবে খুব তাড়াতাড়ি। আমি তো সেদিন থাকব না। তুমি কিন্তু যেয়ো সেখানে।'

'এমন করে বোলো না। আমি একলা সেখানে যেতে পারব না।'

'কেন?'

'যে দিগন্তে আমার চন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের উদয় হবে না সেখানে কোনওদিন যাব না আমি।'

আরে একী? ছোট ছোট পায়ে দুড়দুড় করে কে ছুটে আসছে? ফুলের মতো ছোট্ট মেয়েটা কে? অনিতা—অনিতা। আরে সাবধানে মা—সাবধানে—পড়ে যাবি। ওমা হাতে ফুল? কার জন্য মা?

'কী বোকা তুমি। তোমার জন্য।'

'বড় দেরি হয়ে গেছে মা। আমাকে যে এখুনি রওনা হতে হবে।'

'কেন বাবা?'

'কী করে বোঝাব তোকে? আমাকে যে যেতেই হবে।'

'কোথায়?'

'ভগবানের কাছে।'

'না আমি যেতে দেব না তোমাকে। বা রে! একদিনও আমার সঙ্গে খেলনি, আমাকে নিয়ে বেড়াওনি। গল্প বলনি।'

'না রে মা। তোর জন্য কিছুই করিনি আমি। আর করাও হবে না। আয় তো মা—আমাকে একটা হামি দে। আঃ কি মিষ্টি! কি মিষ্টি! যাবার সময় এটাই থাকবে আমার সঙ্গে। এবার যেতে দে আমাকে।'

'কোথায়?'

'বললাম না ভগবানের কাছে?'

'ইস। ভগবানের কী দরকার তোমাকে? তোমাকে তো দরকার আমার।' ঠোঁট ফুলিয়ে অনিতা সরে গেল।

জ্ঞান ফিরে এল নেতাজির। হবিবুরকে কাছে ডাকলেন তিনি। পুড়ে যাওয়া ঠোঁট দিয়ে কথাগুলো বেরোতে চাইছে না। তবু অনেক কষ্টে একটা একটা করে কথা উচ্চারণ করলেন তিনি।

'হবিবুর, ভাই। আমার সময় হয়ে গেছে। যখন দেশে ফিরে যাবে তুমি তখন সবাইকে বোলো—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম থামায়নি সুভাষ। শক্তিমান, ধর্মনিরপেক্ষ, সমৃদ্ধ ভারতের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু কে জানে ভগবানের কী ইচ্ছে। মাঝপথেই আমাকে ডেকে নিচ্ছেন তিনি। তবু— যাক গে যেতে দাও।'

রাত এগারোটা। নেতাজির গলার আওয়াজ ক্রমশ ক্ষীণ, ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। মাথার মধ্যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা। তার মধ্যেও এক একটা কথা অনেক কষ্টে বলছেন তিনি।

'শুধু একটাই প্রার্থনা ভগবানের কাছে। ভারতের মাটিতেই যেন বারবার জন্মাই আমি। ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই লড়াই করে একদিন বিদ্যুতের মতো ঝলক তুলে মিলিয়ে যেতে পারি। জয় হিন্দ।'

ক্লান্ত ডাক্তার আর নার্সরা শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে দাঁড়িয়ে আছেন নেতাজিকে ঘিরে। তাদের এই ব্যূহের মধ্যে মৃত্যুও ঢুকতে ইতস্তত করছে। হঠাৎই যেন এক সুযোগে ঢুকে পড়ল সে। চুরি করে নিয়ে গেল সাতরাজার ধন এক মানিক—একটা প্রাণের মতো প্রাণ, বহু মানুষের প্রাণের চেয়েও দামি একটা প্রাণ।

ব্যান্ডেজ জড়ানো নেতাজির শরীরটা একবার থরথর করে কেঁপে উঠে শান্ত হয়ে গেল চিরদিনের মতো। চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন হবিবুর। নার্স, ওয়ার্ড বয়, অফিসাররা—সবাই ভিনদেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও চোখের জলে ভাসছে সবাই। তাইপের সামরিক হাসপাতালটাই যেন চোখের জলে ভাসছে।

১১

তাইপের সামরিক হাসপাতালের বাড়িটা বিবর্ণ, হতশ্রী। বোমার আঘাতে আশেপাশে ধ্বংসস্তূপ। ধূসর বাড়িটাকে বিহ্বল চোখে দেখছেন হবিবুর। ধাক্কাটা এখনও সামলাতে পারেননি তিনি। ডাক্তার তাঁকে বিছানা ছেড়ে উঠতে বারণ করেছেন। দরজায় চারজন সান্ত্রি দাঁড়িয়ে।

ডাক্তার ইওশিমি এলেন। নেতাজির মৃত্যুর কথা মনে হলেই সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে হবিবুরের। ডাক্তারের হাত দুটো ধরবার জন্য হাতটা এগিয়ে দিতেই মনে পড়ল হাতে ব্যান্ডেজ। নেতাজির শরীরটা হাসপাতালের মর্গে আছে। মনে পড়তেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি।

'কর্নেল, নিজেকে সামলান। আমি জানি এই দুর্ঘটনা আপনার দেশের ওপরে কী ভয়ানক দুর্দৈব। মোট চারজন মারা গেছেন এই দুর্ঘটনায়। জেনারেল সিডেই-এর মৃত্যুতে জাপানও শোকস্তব্ধ।'

'ডাক্তার, যে করেই হোক নেতাজির পুণ্যদেহটা নিয়ে টোকিয়ো যাবার ব্যবস্থা করে দিন। সেখানে অনেক ভারতীয় আছেন। তাঁরাই স্থির করবেন এর পর কী করা উচিত। এই নির্বান্ধব, অপরিচিত জায়গায় একলা কী করব আমি? কী উত্তর দেব আমার দেশবাসীকে? আপনি জানেন না ডাক্তার। "নেতাজি"—এই তিনটি অক্ষরের শব্দটা আমাদের রক্তমাংসের সঙ্গে

কীভাবে জড়িয়ে গেছে। মুসলমান অফিসাররা আল্লার কথা ভুলে তাঁর কথা ভাবতেন, তেমনি হিন্দুরা ঈশ্বরের জায়গায় নেতাজিকে বসাতেন। মালয়ালি, মাদ্রাজিরা নিজেদের সারা জীবনের সঞ্চয় পুষ্পাঞ্জলির মতো তাঁর পায়ে অর্পণ করেছেন। তাঁর ডাকে লক্ষপতি, কোটিপতিরা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরেছেন। খালি পেটে শত্রুর ট্যাঙ্কের মোকাবিলা করার হিম্মত নেতাজিই দিয়েছেন আমাদের।' আর বলতে পারলেন না হবিবুর। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে ওঠে তাঁর শরীরটা।

'কর্নেল হবিবুর। চিন্তা করবেন না। কালকেই নেতাজির মরদেহ নিয়ে টোকিয়ো যেতে পারবেন আপনি। আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে সেই মর্মেই নির্দেশ এসেছে। সেই অনুযায়ী মৃতদেহে ফর্মালিন ইঞ্জেকশন দিয়ে রেখেছি আমি। কফিনও তৈরি করে রাখা আছে।'

পরের দিন ২০ আগস্ট মৃতদেহবাহী কফিনের সঙ্গে তাইপে বিমানবন্দরে পৌঁছলেন হবিবুর। জাপানি অফিসাররাও শবদেহ বহনের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আজও পরিস্থিতি বড় থমথমে। যে-কোনও মুহূর্তে বিমানবাহিনীর কর্তৃত্ব চলে যাবে আমেরিকানদের হাতে। জাপানি অফিসারদের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

এমন সময় কয়েকজন জাপানি অফিসার এসে পৌঁছলেন সেখানে। বললেন, 'কখনও যা ভাবতে পারিনি তাই হয়েছে। কাল পর্যন্ত বিনা প্রতিবাদে যারা আমাদের শাসন মেনে চলত সেই তাইওয়ানি সৈন্যদল আজ আমাদের ছোবল দেওয়ার জন্য ফণা তুলেছে। আমেরিকানরা আমাদের জীবন মরণের সব দায়িত্ব তাইওয়ানি সৈন্যদের হাতে দিয়ে দিয়েছে।'

যে বিমানে হবিবুরের টোকিয়ো যাওয়ার কথা সেই বিমানটার উড়ান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। হতাশ হয়ে সেখানেই বসে পড়লেন হবিবুর। একটু পরে আবার মনের জোরে উঠে দাঁড়ালেন। অনেক চেষ্টায় তাইপের জাপানি অধিকর্তা জেনারেল অ্যান্ডির অফিসে পৌঁছলেন তিনি। সজল চোখে কাকুতি-মিনতি করে বললেন, 'জেনারেল, শেষবারের মতো শুধু একটা উপকার করুন। চন্দ্রা বোসের অন্তিম সংস্কার যাতে তাঁর দেশবাসীর সামনে হতে পারে তাঁর ব্যবস্থা করে দিন। যে করেই হোক আমাকে টোকিয়ো যেতে দিন। চন্দ্রা বোস—'

'ইয়েস, আই নো চন্দ্রা বোস।' হাত তুলে থামিয়ে দিলেন জেনারেল অ্যান্ডি। ইশারায় হবিবুরকে বসতে বললেন একটা চেয়ারে। বৃদ্ধ জেনারেলের হাতটা থরথর করে কাঁপছে।

জেনারেল অ্যান্ডি জাপানের ইম্পিরিয়ল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু বিফল হচ্ছে তাঁর চেষ্টা। প্রতিমুহূর্তে খারাপ, আরও খারাপ খবর আসছে। কোনও কোনও সেনাপতি হারাকিরি করেছেন, আমেরিকান বাহিনী কতটা কাছে এসে গেছে, টোকিয়ো থেকে কোনও কোনও মন্ত্রী সপরিবারে পালিয়েছেন—একটার পর একটা দুঃসংবাদ। এর মধ্যেই একজন ক্যাপ্টেন ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, 'স্যার, স্যার, ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি—'

'কী হয়েছে তেরাউচির? কী হয়েছে তাঁর?'

'অজ্ঞান হয়ে গেছেন তিনি। একেবারে শেষ অবস্থা।'

জেনারেল অ্যান্ডি প্রচণ্ড বিমর্ষ। তা সত্ত্বেও যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। অনেক চেষ্টার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রী শিগেমিৎসু ফোন ধরলেন। জেনারেল হবিবুরকেই রিসিভারটা দিয়ে দিলেন। হবিবুর কথা বলতে বলতেই ফোনটা কেটে গেল। হবিবুর উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'জেনারেল, এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না শুনেই শিগেমিৎসু ফোন কেন ছেড়ে দিলেন?'

'ছেড়ে দেননি হয়তো! সম্ভবত বেতার ব্যবস্থাই বিকল হয়ে গেল।'

'মিথ্যে কথা।'

'কি মিথ্যে? এতক্ষণে হয়তো আমেরিকান সেনাপতি ম্যাক আর্থার সদর্পে ঢুকছেন সদর দপ্তরে। সমস্ত জাপান শ্মশান হয়ে গেছে। কার জন্য কাঁদব? কত কাঁদব?'

হবিবুরের চোখের জল বাধা মানছে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শিশুর মতো কাঁদছেন তিনি। জেনারেল অ্যান্ডি এবার তাইওয়ান আর্মির হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এরপরে আর কোনও বিমান ওড়ার অনুমতি দিতে রাজি নন তাইওয়ানের কর্তারা। বিমান তো দূরের কথা, জাপানিদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যও এর পরে তাঁদের আমেরিকানদের জিজ্ঞেস করতে হবে। হতাশ জেনারেল অ্যান্ডি এবার উঠে দাঁড়ালেন। বিমর্ষ, বৃদ্ধ সেনাপতি হবিবুরের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'দেখো, এ অবস্থায়ও নির্লজ্জের মতো বেঁচে থাকতে হবে আমাকে। হারাকিরিও করা চলবে না। হারাকিরি করলে আমি তো ছাড়া পেয়ে যাব, কিন্তু আমাদের এই দপ্তর? তাইওয়ানে আমাদের হাজার হাজার সৈনিকরা? তাদের কী হবে? শুধু এইজন্যই হারাকিরি করতে পারছি না আমি। তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু আমি অসহায়, আমার হাত-পা বাঁধা।'

তাইপের শ্মশানভূমিতে ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। কয়েকজন জাপানি অফিসার জমা হয়েছেন সেখানে। জেনারেল অ্যান্ডিকে গ্রেফতার করার জন্য তাইওয়ান সৈন্যবাহিনী সদর দপ্তরে পৌঁছে গেছে অনেকক্ষণ হল। তাই শ্মশানে আসতে পারেননি তিনি। তবে জাপানি রীতি অনুযায়ী মৃত আত্মার সম্মানে ফলফুল আর কেক পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। নেতাজির প্রজ্বলন্ত চিতার সামনে একভাবে কেঁদে চলেছেন হবিবুর। আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর জীবন সার্থক হয়ে উঠুক এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজের জীবনে কোনও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবেননি তিনি। সমস্ত জীবনটাই সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। জননী আর জন্মভূমি এ জীবনে নিজের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাঁর। এদের কারও সঙ্গেই আর দেখা হল না। কোথায়, কোন মহাকাশে ছুটে চলেছে তাঁর অতৃপ্ত আত্মা কে জানে?

বিমানে নেতাজির রত্নভাণ্ডার পুড়ে যাওয়ার খবর হবিবুর জানিয়েছেন জাপানিদের। সৈন্যদের কড়া পাহারা রয়েছে সেখানে।

তিনদিন ধরে বহু চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নেভাতে পেরেছে দমকল বাহিনী। তাইপের স্কুলের ছাত্ররাও হাত মিলিয়েছিল তাদের সঙ্গে। শুরু হল ভস্মাবশেষের মধ্যে অনুসন্ধান। হবিবুরের চোখ এখনও ফোলা। সেই ফোলা ফোলা চোখ নিয়েই এক একটা করে আধপোড়া অলংকার পরীক্ষা করছেন তিনি। তাঁর চোখের সামনে সেই অলংকারগুলোর মধ্যে দিয়েই যেন ভিড় করে আসছেন পূর্ব-এশিয়ার অসংখ্য মা-বোনেরা। নিজেদের গা খালি করে গয়না দিয়ে ছিলেন তাঁরা। শুধু গয়না কেন? নেতাজির জন্য কি দেননি তাঁরা। গলার হারের সঙ্গে দিয়েছেন বুকের পাঁজর—নিজেদের ছেলেমেয়েদের স্বামীদের। দিল্লির পথ সুগম করার জন্য রিক্ত করেছেন নিজেদের ললাট। আজও যদি বিধাতা বলেন লক্ষলোকের বিনিময়ে নেতাজির জীবন তিনি ফিরিয়ে দেবেন তো হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে প্রাণ দেওয়ার জন্য। পুড়ে যাওয়া গয়নাগুলো সযত্নে একটা একটা করে জড়ো করছে ছেলেমেয়েরা। কিন্তু একটা সাধারণ জীবনকে যিনি পরশমণির ছোঁয়া দিয়ে সোনা করে তুলতে পারতেন, তিনি চলে গেছেন। আগুন সে পরশমণিকে গ্রাস করেছে।

সোনা পুড়ে গেছে। বেরিয়ে পড়েছে নিয়তির কলঙ্কিত পেতল।

উপসংহার

আগস্ট, ১৯৪৫-এর মাঝামাঝি রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভাইসরয় লন্ডনে যাচ্ছিলেন। তখন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর খবর তাঁর কাছে পৌঁছয়নি। তাই কোন দেশে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে, তাঁর মুক্তির জন্য সম্ভাব্য আন্দোলনই বা কী করে সামলানো হবে এই সব চিন্তায় ছিলেন তিনি। লন্ডন বিমানবন্দরে পৌঁছে নেতাজির আকস্মিক মৃত্যুর খবরটা পেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'যাক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এখন প্রায় নিঃশত্রুই বলা যায়।'

এই আকস্মিক আঘাতে সারা দেশে হাহাকার উঠল। গাঁধীজি তখন পুনার নিসর্গোপচার কেন্দ্রে। তাঁর প্রার্থনার সময় একটা ছোট্ট ত্রিবর্ণ পতাকা রোজ টাঙানো হত। সেদিন তাঁর নির্দেশে সে পতাকা গুটিয়ে রাখা হল। নেহরু খবরটা পেলেন অনোতাবাদে থাকার সময়। শোকাহত নেহরু বলে উঠলেন, 'সুভাষের উদ্দেশ্য বা মাতৃভূমির ওপর তার অসীম ভালবাসা সমস্ত আশঙ্কার ঊর্ধ্বে। পৃথিবীতে এই সব মহান মানুষরা উল্কার মতোই চলে যায়।'

শরৎবাবু ছিলেন দক্ষিণের কুনুর জেলে। বিমান দুর্ঘটনার আগে চারদিন রাতে সুভাষকে স্বপ্নে দেখেছেন তিনি। যেই জড়িয়ে ধরতে যেতেন মূর্তিটা যেন বিশাল হয়ে মিলিয়ে যেত।

নভেম্বর ১৯৪৫-এ লালকেল্লায় ধিল্লোঁ, সেহগল আর শাহনওয়াজের মামলা শুরু হল। কিন্তু তীব্র জন-আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সামরিক আদালতকে আত্মসমর্পণ করতে হল। শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলেন তাঁরা।

এর আগেও এ রকমই একটা বিমান দুর্ঘটনার খবর ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়ে ছিল। গাঁধীজি তখন জেলে। ব্রিটিশদের ধোঁকা দেবার জন্য এবারও হয়তো সুভাষ এই চাল চেলেছে এ সন্দেহও উঠেছিল তাঁর মনে। তাই অন্তত কিছুদিন পর্যন্ত গাঁধীজির মনে হত যে সুভাষ বেঁচেই আছে। কিন্তু হবিবুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর গাঁধীজিও এই মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন।

যুদ্ধ পরবর্তীকালে এমিলি আর অনিতাকে খুব কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছে। শরৎবাবু সপরিবারে ভিয়েনা গিয়ে এমিলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁদের ভারতে আনার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু শরৎবাবুর হঠাৎ মৃত্যু হল। স্বাধীনতার পর অনিতা বেশ কয়েকবার ভারতে এসেছেন। কিন্তু এমিলি কখনও আসেননি। 'যেখানে আমার চন্দ্র নেই' সেখানে যেতে চাননি তিনি। পঞ্চাশোর্ধ্ব অনিতা বর্তমানে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপিকা। থাকেন জার্মানির অ্যাঙ্গাসবার্গে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য-সেনানীরা অনেকেই ভারতবর্ষে ফিরে এসেছিলেন। সাধারণ সৈনিকদেরও ঢাকঢোল বাজিয়ে স্বাগত জানিয়েছিল গ্রামের লোক। নেতাজিই যেন ফিরে এসেছেন এমনভাবেই তাদের মাথায় তুলে নেচেছিল দেশের মানুষ। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীতে আর নেওয়া হয়নি তাদের। ইংল্যান্ড যাবার আগেই মাউন্টব্যাটেন এ ব্যাপারে নতুন শাসনকর্তাদের জপিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। তাই যেসব সৈন্য আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ না দিয়ে ব্রিটিশের প্রতি অটল আনুগত্যে জাপানের যুদ্ধবন্দি হিসাবে ছিলেন তাঁরা আবার ভারতীয়

ফৌজে সসম্মানে প্রবেশ করতে পারলেও স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করা নেতাজির সহযোগীদের স্থান হল না স্বাধীন ভারতের বাহিনীতে। একদিন যাঁরা গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগঠিত হতে পারলেন না তাঁরা। বেশির ভাগ লোকের কাছেই উদরপূরণের সমস্যাটাই বড় হয়ে দেখা দিল। নেতাজির অপূর্ব কীর্তির উপর ভিত্তি করে আবার উঠে দাঁড়ানোর সামর্থ্য কেউ দেখাতে পারলেন না। প্রেম সেহগল আর লক্ষ্মী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কানপুরে থিতু হলেন। চুরাশি বছর বয়েসেও ড. লক্ষ্মী নিজের প্র্যাকটিস সামলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলে সোৎসাহে কাজ করেন। প্রেম সেহগল কানপুরের একটা মিলের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। জানকী দাভার (থেবর) বর্তমানে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর শহরে থাকেন। সে দেশে তিনি যথেষ্ট সম্মানিতা। জগন্নাথরাও ভোঁসলে আর শাহনওয়াজ খান পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছিলেন। শাহনওয়াজ পরে ইন্দিরা গাঁধীর মন্ত্রীসভায়ও ছিলেন। মোহন সিং কৃষির ব্যাপারে পঞ্জাবে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। একসময় রাজ্যসভার সদস্যও হয়েছিলেন তিনি। কর্নেল ধিল্লোর ক্ষেতখামার মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী ন্যাশনাল পার্কের কাছে। অশীতিবর্ষীয় কর্নেল সাহেব শিবপুরীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে থাকেন। এ. সি. এন নাম্বিয়ার, ব্যারিস্টার রাঘবন আর আবিদ হাসান বিভিন্ন দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন।

অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন নিয়ে অনেক মুসলমান অফিসার নেতাজির পতাকার নীচে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু দেশভাগের দুর্দৈব তাঁদের দেখতে হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশই মূলত লাহোর এবং করাচির লোক। তাই জামান কিয়ানি, হবিবুর রহমানের মতো একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী অফিসারদেরও পাকিস্তানে চলে যেতে হল। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসাররা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে যথাসময়ে উচ্চপদে উঠে অবসর নিতে পেরেছিলেন। নেতাজির একটি অয়েল পেন্টিং তিরিশ বছর পর ভারতের রাজ্যসভায় লাগানো হল। লোকসভায় তাঁর ছবি টাঙাতে স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছর লেগে গেল। এ দেশের মার্কসবাদীদের বিশ্বাস ছিল রাশিয়ার ওপর। যে স্তালিন একদিন হিটলারের বন্ধু ছিলেন তিনি যখন মিত্রপক্ষে যোগ দিলেন তখন মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও 'জনযুদ্ধে' রূপান্তরিত হল। এই সব প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে নেতাজি অনেক বছর ধরেই ছিলেন একজন খলনায়ক। কিন্তু সম্প্রতি জ্যোতি বসুর মতো নেতারাও নেতাজি সম্পর্কে তাঁদের বিচারে যে ভুল ছিল সেটা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন।

নেতাজির মৃত্যু নিয়েও প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর তদন্ত করার জন্য ভারত সরকার শাহনওয়াজ খান কমিশন আর খোসলা কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন। দুটি কমিশনই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল বলেই মতপ্রকাশ করেছেন। জাপানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নেতাজির বেশির ভাগ সহকর্মীই এই মতই সমর্থন করেছেন। নেতাজি সত্যিই মারা গেছেন কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ লর্ড মাউন্টব্যাটেন আর জাপান দখলকারী আমেরিকান সেনানায়ক ম্যাক আর্থারেরও ছিল। এই দুজনও আলাদা আলাদা করে তদন্ত করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন। নেতাজিকে যিনি চিকিৎসা করেছিলেন সেই ডাক্তার ইওশিমি বন্দি হয়েছিলেন আমেরিকানদের হাতে। তাঁকেও ব্রিটিশ গুপ্তচরেরা অনেক জেরা করেছিল। কিন্তু দেশের মানুষের একটা বিরাট অংশ নেতাজির মৃত্যুকে মেনে নিতে চাইতেন না। এর পেছনে একটা বিরাট কারণ হল নেতাজির প্রতি তাঁদের অন্ধ শ্রদ্ধা। তা ছাড়া সত্যিই যদি তিনি জীবিত থাকেন তবে একদিন না একদিন আবির্ভূত হয়ে এ দেশে যে সব সংকট রয়েছে সেগুলোর

সমাধান করে দেবেন এমন বিশ্বাস কাজ করেছিল। অনেক সুদর্শন চেহারার সন্ন্যাসীকেও লোকে নেতাজি বলে ধরে নিয়েছিল। এইসব সন্ন্যাসীরাও তাদের এ ধারণা স্পষ্টভাবে অস্বীকার না করে লোকেদের সংশয়ে রেখে দিতেন। ক্রমে তাঁদের আশ্রমে ভিড় বাড়ত। বিনা খরচে খ্যাতি লাভ করার একটা দারুণ সুযোগ! এই সম্পর্কে আচার্য কৃপালনির একটি উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য। 'সংকটের গিরিগোবর্ধন তুলে ধরার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মতো সুভাষও একদিন আবির্ভূত হবেন এই বিশ্বাস নিয়েই তাঁর ভক্তদের থাকতে দেওয়া ভাল। নয়তো তারা হয়তো আবার জেগে উঠে সুভাষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সারাদেশে উগ্রবাদী সংগঠন গড়ে তুলবে।'

সিঙ্গাপুরের দখল নেওয়ার সময় দুরানির মতো মহাত্মাকে হাতে পান মাউন্টব্যাটেন। আন্তর্জাতিক আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে সিঙ্গাপুরের সাগরতীরে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মারক নিদর্শন মাউন্টব্যাটেন ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেন। শোনা যায় সে সময় সিঙ্গাপুরবাসীরা 'একদিন তুমিও এইভাবে উড়ে যাবে' বলে অভিশাপ দিয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলার সময় মোহন সিং, কর্নেল ভগৎ প্রমুখ সেনানীরা যাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেন তার জন্য দুরানির মতো লোকেরা প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আজাদি বীরেদের কাছে পাত্তা পায়নি তারা। দুরানির এই বীরত্বের জন্য ব্রিটিশরা তাকে 'জর্জ ক্রশ' দিয়ে সম্মানিত করেছিল। ক্যাসেলের মতো বিখ্যাত প্রকাশনী তার 'সিক্সথ কলাম' নামে মিথ্যায় ভরা আত্মচরিত প্রকাশ করেছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ সামরিক অধিকর্তাদের প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। তাই আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার কোনও সুযোগ ওয়াভেল আর মাউন্টব্যাটেন কখনও ছাড়েননি। সিঙ্গাপুরের যে স্মারক মাউন্টব্যাটেন ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সেই জায়গায় নতুন করে স্মারক নির্মাণ করার সংকল্প করেছিলেন সেখানকার নাগরিকেরা। সেই স্মারকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য পণ্ডিত নেহরু ১৬ মার্চ, ১৯৪৫ তারিখে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন অনেক করে তাঁকে বুঝিয়ে তাঁকে ওই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা থেকে বিরত করেন। প্রকৃতপক্ষে সেটাই ছিল মাউন্টব্যাটেন আর পণ্ডিত নেহরুর প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু রানি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকা লর্ড মাউন্টব্যাটেন একদিকে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবরক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিলেন অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের ওপরে ইম্ফলের যুদ্ধের সময় থেকে পুষে রাখা রাগও ভুলতে পারতেন না। তাই অনেক খেলাই খেলেছেন তিনি। পণ্ডিত নেহরু অবশ্য সেদিন স্মারকের জায়গাটিতে না গেলেও দু' দিন পর রাত্রিতে সেখানে গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে এসেছিলেন। সুভাষের স্মৃতিতে সজল হয়ে উঠেছিল তাঁর চোখ। স্মারকের কাছ থেকে 'সুভাষ' লেখা একটা শ্বেতপাথরের টুকরোও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। সেই টুকরোটা তিনি কর্নেল স্ট্রেসিকে উপহার দিয়েছিলেন।

সবচেয়ে বড় যুদ্ধাপরাধী হিসাবে জেনারেল তোজোকে টোকিয়োতে ফাঁসি দেয় আমেরিকানরা। আদেশ অমান্যের অভিযোগে জেনারেল সাতোর বিরুদ্ধে সামরিক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাড়া পেয়ে যান তিনি। ইম্ফল অভিযানের ব্যর্থতার সমস্ত দায় বর্তাল মুতাগুচির মাথায়। তবে তাঁর পূর্বকীর্তি স্মরণ করে তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কর্মজীবনের বাকিটুকু কেটেছিল সামরিক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে। ইম্ফলের স্মৃতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যন্ত্রণা দিয়েছে তাঁকে।

স্বাধীন ভারতে নেতাজির হাজার হাজার আজাদি সেনার ফৌজে বা অন্যত্র কোনও উল্লেখযোগ্য কাজই জোটেনি। তাঁদের বিরাট ত্যাগের বদলে তাঁরা কিছুই পাননি। আই এন

এ-তে যে সব অফিসাররা ছিলেন তাঁদের বয়োকনিষ্ঠদের কেউ কেউ ফিল্ড মার্শাল পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর অনেক বছর পর্যন্ত আজাদি সেনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে স্বীকৃতিটুকুও দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৫ আগস্ট, ১৯৭২—ইন্দিরা গাঁধীর সরকার তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

শহিদ স্মারক ধ্বংসকারী মাউন্টব্যাটেনের জাহাজ আইরিশ দেশপ্রেমিকরা ১৯৭৯ সালে বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়। তাতেই শেষ হয়ে যান তিনি। স্বাধীন ভারতে নেতাজি আর আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পর্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝির মেঘ জমেছে আবার কেটেও গেছে। কিন্তু জনমানসে নেতাজির ভাবমূর্তি এতটুকু ম্লান হয়নি তাতে। কালের কষ্টিপাথরে তা আজও অম্লান।

শাসনকর্তাদের দরবারে নেতাজি ও তাঁর আজাদি ফৌজের কীর্তিকে ধামাচাপা দেবার সবরকম চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু জনমানস তাঁকে কণ্ঠহার করেই রেখেছে। এখনও মায়েরা তাঁদের পুত্রদের নাম 'সুভাষ' রেখে গর্ব করেন। দেশের দূরতম প্রান্তেও শিবাজি, রানা প্রতাপের মতো নেতাজির ছবি সগর্বে টাঙানো হয় ঘরের দেওয়ালে। মাউন্টব্যাটেনের স্তুতি গেয়ে সরকারি স্কলারশিপ, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ অনেকেই পেয়েছেন। কিন্তু দেশের দুর্গম প্রান্তে সাধারণ শিক্ষক আর পল্লিকবিদের আজও প্রেরণা যোগান নেতাজি। সেই সব দূর প্রান্তে আজও শোনা যায় তাঁদের স্বরচিত গান। সেই সব গানের একটাই ধুয়ো, একটাই আকুতি।

আমাদের চন্দ্র যে আর ফিরে এল না।

লেখকের কথা

বছর তিরিশ বয়সের এক বাঙালি আই এ এস অফিসার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'যিনি শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, এমন একজন লোকের জীবনের ওপরে আপনি উপন্যাস লিখছেন কেন?'

'কার শত্রু?' আমি পালটা প্রশ্ন করেছিলাম। একটু থতমতভাবে নিরুত্তরই ছিলেন তিনি।

মোট মাত্র আটচল্লিশ বছরের কর্মজীবনে সুভাষচন্দ্র ইতিহাসের আকাশ দীপ্তছটায় উদ্ভাসিত করে গেছেন। মত-মতান্তর মেঘের মতো আসবে আবার চলেও যাবে। তারই মাঝে নেতাজি ধ্রুবতারার মতোই নিজের একটা জায়গা তৈরি করে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নেতাদের মধ্যে। কারও জীবনই তাঁর মতো বিচিত্র শৌর্যময় আর নাটকীয় নয়।

নভেম্বর, ১৯৪৫। লালকেল্লায় যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচার শুরু হল তখন নেতাজির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে; মন্দিরের ওপর স্বর্ণকলসের মতো স্বমহিমায় দীপ্ত। সারা দেশ তখন তোলপাড়। তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বের সম্পূর্ণ কাহিনি জনসাধারণের কাছে কিন্তু তখনও অজানা। হয়তো আজও সেই আকাশ ঝলসে দেওয়া বিদ্যুৎ ঝলক, সেই উল্কার অগ্নিময় উদ্ভাস, বীরত্বের সেই অসীম নিদর্শনের কাহিনি জনসাধারণের কাছে অনেকটাই অজানা। তবু অপূর্ব, অদ্ভুত একটা কিছু যে ঘটেছিল তার আভাস সবাই পেয়েছিল।

মহাত্মা গাঁধীর অহিংসনীতির জয়পতাকা তখন সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। সেই সময় সাম্রাজ্যবাদীদের তীব্র আঘাত করে, গোলামির জঞ্জাল পুড়িয়ে ছাই করে দেবার আহ্বানের সমর্থনে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের উদয়। ভারতের রাজনীতিতে গাঁধীজির একচ্ছত্র অধিনায়কত্বের সময় এ ধরনের ঘটনা ছিল অকল্পনীয়।

গাঁধীযুগেই সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি শুরু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার আর মুসোলিনির মতো স্বৈরতন্ত্রীদের সঙ্গে মৈত্রী করেছিলেন সুভাষ। তার মনে কি এই যে তিনি এই দেশেও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন? আজও অনেকের মনে এই ভীতি রয়েছে। এ ছাড়া স্বাধীন ভারতে মাউন্টব্যাটেনের প্রশাসনিক দক্ষতা বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে ইম্ফল আর কোহিমার রণাঙ্গনে জাপানি সেনারা আর আজাদ হিন্দ ফৌজ মাউন্টব্যাটেনকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। পৃথিবীর পট-পরিবর্তন হয়েছিল হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে। আমেরিকা, আত্মসমর্পণের পর জাপানকে অন্তত চার-পাঁচ বছর পায়ের নীচে দাবিয়ে রেখেছিল। নেতাজি আর আজাদ হিন্দ ফৌজের রোমাঞ্চকর ইতিহাস ধুলো চাপা পড়েছিল টোকিয়োর দস্তাবেজখানায়।

অপরিমিত সাহসে বুক বেঁধে দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি অর্ধেক পৃথিবীর সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন একক চেষ্টায়। কিন্তু তাঁর এই প্রয়াস কি বিবেকহীন হঠকারিতা? এ পথে কি দেশের স্বাধীনতা পাওয়ার আদৌ সম্ভাবনা ছিল? এ প্রশ্ন আজও ওঠে। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা, আই সি এস পরীক্ষায় তিনি চতুর্থস্থান অধিকার করেছিলেন। স্বয়ং

গাঁধীজির বিরোধিতা সত্ত্বেও এই দেশের সচেতন মানুষ তাঁকে কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত করেছিল অনেক ভোটের ব্যবধানে। রবীন্দ্রনাথ, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. বিশ্বেশ্বরায়ার মতো মনীষীরা তাঁকে প্রশস্তি করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে, উজ্জ্বল কৃতির এই পটভূমিকায় কেবল দুঃসাহসে ভর করে অন্ধের মতো অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে দেশত্যাগ করা কি সম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে? আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত হয়েছিল জার্মানি আর পূর্ব এশিয়ায়। তাই নেতাজির কীর্তিকাহিনির ইতিহাস আজও অনেকাংশেই আটকে রয়েছে জার্মান, জাপানি, বর্মি, ফরাসি ভাষায় লেখা নানান দলিল দস্তাবেজ। এই সব দস্তাবেজের বিশ্লেষণ করে, নেতাজির পদচিহ্ন যেখানে যেখানে পড়েছিল সেখানে সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান করে তাঁর ব্যক্তিসত্তা আর নেতৃত্বের একটা রূপরেখা তুলে ধরার জন্য একটা বিস্তীর্ণ পরিসরের প্রয়োজন ছিল। আমার প্রয়াস শুরু করার মুহূর্তটি থেকেই আমি জানতাম যে এটা একটা সীমাহীন, অন্তহীন বিষয়। সে জন্যই বাস্তবের পটভূমিকায় এই উপন্যাসটি লিখতে অনেকগুলো বছর লেগে গেছে আমার।

রিচার্ড অ্যাটেনবরোর মতো বহুমুখী প্রতিভাময় নির্দেশক গাঁধীজির জীবনের ওপর জগদ্বিখ্যাত 'গাঁধী' ছবি নির্মাণ করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে একটি ফ্রেমেও সুভাষচন্দ্রের দেখা মেলেনি। গাঁধী বা নেহরুর চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিকে অস্বীকার করে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

গাঁধী রচনাবলির অষ্ট-আশিটি খণ্ড আর নেহরু রচনাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় সিরিজ অনুপুঙ্খ অধ্যয়ন করলে এই তিনজনের পারস্পরিক সম্পর্কের বিচিত্র রংবাহার যে-কোনও পাঠকেরই চোখ ধাঁধিয়ে দেবে।

'আমাদের তিনজনের পারস্পরিক সম্পর্ক শেকসপিয়রের ট্র্যাজেডির মতো রূপ নিতে চলেছে।' এ উক্তি স্বয়ং নেহরুর। এই তিনজনের পারস্পরিক সম্বন্ধের ব্যাপারে খানিকটা আলোকপাত করেছেন নীরদ চৌধুরী আর মাইকেল ব্রিচার। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ব্রিচারের বইটা এ দেশে বেশ কয়েক বছর নিষিদ্ধ ছিল)। এঁদের তিনজনের মধ্যে যে সব পত্রবিনিময় হয়েছিল তা পড়ে আমার মনে হয়েছে এক বিশাল পর্বতমালার উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গরা যেন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে।

ল্যারি কলিনস আর ডোমিনিক ল্যাপিয়ের লিখেছেন তাঁদের রংদার বই 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট'। ভারতীয় নেতাদের অনেক মানসিক জটিলতা, বাদ-বিসংবাদ এমনকী তাঁদের প্রেম-প্রসঙ্গও রং জমাবার জন্যে রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন তাঁরা। কিন্তু এই দুইজনও নেতাজির নামোল্লেখ এড়িয়ে গেছেন। 'এ রিবেল' — এক বিদ্রোহী— এই একটি মাত্র শব্দে তাঁরা সুভাষচন্দ্রের উল্লেখ করেছেন। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় নেতাজি আর তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকাহিনি ধামাচাপা দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা সচেতনভাবেই চলছিল এ দেশে। কিন্তু সেই সময়েই লুই অ্যালেন, জয়েস লেব্রা, আর্থার সুইনসন, মিলান হর্নর, টি. এস. সারিন, পিটার ফে. গডউইন, নাগাসাকি নোবুকো প্রমুখ পৃথিবীখ্যাত বিদ্বান গবেষকরা আজাদ হিন্দ ফৌজ আর নেতাজির নেতৃত্বের কাহিনির ওপর আলোকপাত করে চলেছিলেন। তবে এঁদের কাজের সম্পর্কে ভারতীয়দের বিশেষ ধারণাই ছিল না।

এ সম্বন্ধে পড়াশুনো করার পরে আমার মনে হয়েছে স্বাধীনতার আগে বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর ভয় ছিল নেতাজির সামর্থ্যে আর স্বাধীনতার পরে স্বদেশিরা ভয় পেতেন নেতাজির ছায়াকে। আরেকদিকে অনুরক্ত ভক্তেরা তাঁকে বসাতে চাইছিলেন দেবতার আসনে।

নেতাজির 'চল দিল্লি' আহ্বান এঁরা কীর্তনের ভঙ্গিতে এমনভাবে বলেন যেন মনে হয় এক সকালে উঠে নেতাজি সিঙ্গাপুরে দরজির কাছে গিয়ে একটা উর্দি তৈরি করিয়ে নিয়ে দিল্লির পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা যেন এতই সহজ। বাস্তবে নেতাজির জীবন শুধু রোমাঞ্চ নয়, বেদনায় ভরা ছিল। দুঃসাহসে ভর করে জীবনের পিচ্ছিল পথে তাঁর যাত্রায় কখনও আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেননি তিনি। সারা জীবন তাঁকে ঘুরতে হয়েছে নির্ভীক অথচ সুপরিকল্পিত পদক্ষেপে। সাধুসন্তদের আশ্রমে তিনি বিনম্র শ্রদ্ধায় অবনত হতেন। তাই বলে তাঁর সেই বিনম্রতা কখনও চাটুবাদ হয়ে ওঠেনি। শয়তানের ডেরাতেও তিনি কখনও তাঁর আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেননি। সাভারকর স্বাধীনতার পরে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের একটা সম্মেলন ডেকেছিলেন। সেই সম্মেলনের সভাপতির আসনে তিনি রেখেছিলেন নেতাজির একটি অয়েল পেন্টিং। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে এক মহান বিপ্লবীর আর এক মহান বিপ্লবীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদনের অনবদ্য প্রতীক।

নেতাজির জীবন সংগ্রামে বারবার পট-পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন মোড়ে গাঁধী-নেহরুর সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি আর সংঘাত, মহাযুদ্ধের সময় জার্মানিতে বেদনাময় বাস্তব আর সব শেষে পূর্ব এশিয়ায় তাঁর দীপ্ত নেতৃত্ব। ১৯৪১-৪২ সালেই ইম্ফল অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিল জাপান। কিন্তু একমাত্র নেতাজির আগ্রহেই ১৯৪৪ সালে নতুন করে সেই অভিযান সংগঠিত করা হয়। যুদ্ধের সময় জাপান নেতাজিকে একজন ব্যক্তি হিসাবে না দেখে এক 'বন্ধুরাষ্ট্রে'র প্রধান হিসেবে মর্যাদা দিয়েছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার যুদ্ধবন্দি একত্র হয়ে নিজেদের দেশকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করার এমন দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবীতে একমাত্র আজাদ হিন্দ ফৌজই রেখে যেতে পেরেছে। তাঁর জীবনে একদিকে যেমন গাঁধী-নেহরু বা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়িয়েছেন তেমনি এসেছেন হিটলার-মুসোলিনি-তোজোর মতো একনায়করা। ছত্রপতি শিবাজির তানাজি বাজিপ্রভু, শেলার মামার মতো, নেতাজিও তাঁর পাশে পেয়েছিলেন সেহগল, ধিল্লোঁ, শাহনওয়াজ, লক্ষ্মী স্বামীনাথন আর ব্যারিস্টার ইয়েলাপ্পার মতো সংগ্রামী সাথিদের। পেয়েছিলেন জার্মান রেজিস্ট্যান্স গ্রুপের নেতা অ্যাডাম ট্রট, ব্রহ্মদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ড. বা ম-র মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের। এঁদের প্রত্যেকের জীবনীতেই 'দ্য স্টোরি অফ সুভাষ বোস' বা 'সুভাষ বোস' স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। এর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ভারতে কখনও আসেইনি। নিজের স্বল্পজীবনেও তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনে। আধুনিকীকরণের স্বপ্ন দেখার জন্য অনেক দাম দিতে হয়েছে তাঁকে। একটি দিনও কোনও সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ না করেও বর্মার রণাঙ্গনে মাউন্টব্যাটেন-স্টিলউইলের মতো অভিজ্ঞ সেনানীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে তাঁর জীবনের বিচিত্র কাহিনিতে স্থান করে নিয়েছে অস্ট্রিয়ার কন্যা এমিলির প্রণয়। সব মিলিয়ে বর্ণাঢ্য, বৈচিত্র্যময় এক জীবন।

পৃথিবীর সমস্ত মহান ব্যক্তিকেই নিয়তি যাচাই করেছে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। নেতাজির জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। পিচ্ছিল পথে চলার সময়ও কিন্তু ধৈর্য হারাননি তিনি। ধর্মনিরপেক্ষ, শক্তিশালী ভারত একদিন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে এই স্বপ্নকে রূপ দিতে সারা জীবন চেষ্টা করে গেছেন তিনি। তাই বহুবছর ধরেই তাঁর জীবনের ওপর ভিত্তি করে একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।

জীবনী-নির্ভর বা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার একটা রীতি আমাদের এই দেশে রেওয়াজ

আছে। 'নস্ট্যালজিয়া'— এই শব্দটির আড়াল থেকে তিরন্দাজি করেন তাঁরা। কিন্তু উপন্যাসকে অনেক পাশ্চাত্য সমালোচকই নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। নদীর প্রবাহ কি একরকম? কখনও নদী চলে মিসিসিপি বা ব্রহ্মপুত্রের মতো বিস্তৃত অঞ্চল দিয়ে— কত বৈচিত্র্যের সাক্ষী হয়ে; কখনও নর্মদা-তাপ্তির মতো উলটোপালটা মোড় নিয়ে; আবার কখনও কোঙ্কনের নদীগুলোর মতো পাহাড় থেকে নেমেই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মতো সাগরের বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। কিন্তু নদীর প্রবাহের গতিপথের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার বহমান জীবনরস। উপন্যাসও তেমনি। ঐতিহাসিক না গ্রামজীবনের ওপর, নাকি সামাজিক বিষয়াশ্রয়ী— তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা জীবনরসের আন্তর সত্তা।

'পাঙ্গিরা' আর 'ঝাড়াঝড়তি'র মতো সামাজিক বিষয়াশ্রয়ী উপন্যাস লেখার পরে জীবনী উপন্যাস লিখতে গিয়ে ব্যাপারটা যে কত কঠিন গোড়াতেই সেটা উপলব্ধি হয়েছিল আমার। সবার আগে লেখককে হয়ে উঠতে হয় নায়কের জীবনচরিতকার। তার জন্য প্রয়োজন হয় সেই নায়কের চরিত্রের, জীবনের যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচয়। অনেক অন্ধগুহায় ভূতের মতো ঘুরে বেড়াতে হয়। তার পরে সেই নায়কের সমকালীন বন্ধু আর বিরোধীদের চরিত্র অনুধাবন করতে হয়। পরিচিত হতে হয় তাঁর সময়ের সঙ্গে। তারপর দীর্ঘদিনের যাত্রাশেষে একসময় লেখার জমিটা নজরে আসে অতি ধীরে ধীরে। চোখে পড়ে সোনালি কিরণ। চেতনার স্রোতস্বিনীর কল্লোল কানে আসে। তারপর যাত্রা শুরু হয় সাহিত্যের শ্যামলিমায়। আমার মনে হয় সাহিত্যের কোনও পরিচিত রাস্তা নেই। জঙ্গলের রাস্তার মতোই আঁকাবাঁকা পথ তার।

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের পরিচয় নিতে গিয়ে গিয়ে সে সময়কার নেতাদের সুন্দ-উপসুন্দের মতো পারস্পরিক বিরোধের পরিচয় পাওয়া গেল গাঁধী-নেহরু-সুভাষের পারস্পরিক চিঠিপত্রের মধ্যে বাংলায় তাঁর কর্মকাণ্ডের বিবরণ রয়েছে তাঁর সংগ্রামী সাথিদের লেখায়। এই সব বিবরণের সবগুলিই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে। তার মধ্যে অনেক বই-ই আজ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারেও পাওয়া যায় না। সে সময়কার বই আর সাময়িকীর সন্ধান পেতে সাহিত্য অকাদেমির আঞ্চলিক সচিব নির্মলকান্তি ভট্টাচার্য আমাকে মূল্যবান সাহায্য করেছেন। নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্র ড. শিশিরকুমার বসু এবং তাঁর স্ত্রী সাংসদ কৃষ্ণা বসু তাঁদের জীবনব্যাপী প্রয়াসে গড়ে তুলেছেন 'নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো'। তাঁদের কাছ থেকেও মূল্যবান সহযোগিতা আমি পেয়েছি।

সেই উত্তাল সময়ে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে। তাঁদের সঙ্গ আমি পেয়েছি। লালকেল্লার মামলা খ্যাত ত্রয়ীর মধ্যে কর্নেল ধিল্লোঁ বর্তমানে থাকেন মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে, অভয়ারণ্যের পাশে। তাঁর ফার্ম হাউসে আট-দশদিন থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তা ছাড়া ধিল্লোঁসাহেব থানেতে আমার বাড়িতেও পদার্পণ করেছিলেন। কর্নেল লক্ষ্মী, ক্যাপ্টেন যাদব, ই. ভাস্করনের সঙ্গেও বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে আমার।

ভারতের মতো দূরদেশ থেকে আসা নিঃসম্বল নেতাজিকে জাপান এত সাহায্য কেন করেছিল? সেই আগুনঝরা যুদ্ধের ঘূর্ণির গতি-প্রকৃতিই বা কী ছিল? জাপানই বা সত্যি কী রকম? জাপানের মহাফেজখানা কী কাহিনি শোনাতে পারে? এই সব প্রশ্ন অনেক দিন ধরেই তাড়না করছিল আমাকে। তাই জাপানে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতাম আমি। জাপানের মতো ব্যয়বহুল দেশে যাওয়ার ব্যাপারে আর্থিক দিক থেকে সমস্যা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমার প্রিয় বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী জ্ঞানেশ্বর মূলে সেখানকার ভারতীয় দূতাবাসের কন্সুলার ছিলেন। তাঁর দাক্ষিণ্যে

সেখানে যথেষ্ট ঘোরার সুযোগ পেয়েছিলাম আর থাকার সমস্যাও হয়নি। সাধারণত জাপানিরা বেশ দীর্ঘজীবী হন। সে কারণেই কুনিঝুকা, কাকিৎসুবো আর নেগিশির মতো নেতাজির কাছের মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমার। এই সব জাপানিদের সঙ্গে অর্ধশতাব্দী আগে মাত্র কয়েক মাসের জন্য নেতাজির পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু সে দিনের সেই স্বল্পপরিচয়ের সময়টুকু আজও তাঁদের মনে সোনালি আলোয় ঝলমল করছে। জাপানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর নাতনি ইওয়ানামি আর চৌয়ামো মিৎসুরুর নাতি তানাকা (আজকের জাপানের অগ্রণী তরুণ ইতিহাসবেত্তা)—এঁরা দুজনে আমাকে সেখানকার মহাফেজখানা ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন নিজেদের বহুমূল্য সময় ব্যয় করে। তোজো, মুতাগুচির বাসস্থান দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে আমার।

নেতাজির ব্যক্তিত্ব অনুধাবন করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট প্রায় সবকটি দেশেই ঘুরেছি। কিন্তু ব্রহ্মদেশের বর্তমান তানাশাহী শাসনব্যবস্থায় সেখানে যাওয়ার আশা আমার পক্ষে দুরাশা ছিল। কিন্তু অভাবনীয়ভাবে সুযোগ এসে গেল। ১৯৯৭ সালে আমেরিকার ত্রিশজন বৃদ্ধ সামরিক অফিসার 'ওয়ার ভেটারেনস্' হিসেবে একান্ন বছর বাদে ব্রহ্মদেশের অভিমুখে রওনা হন। বর্মা রণাঙ্গনে এঁরা স্টিলওয়েলের নেতৃত্বে, মাউন্টব্যাটেনকে সহযোগিতার জন্য জাপানি, আর আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। বহুকষ্টে আমি এঁদের দলে স্থান করে নিতে পেরেছিলাম। সেই সূত্রেই সেই যুদ্ধের সময়কার অসম আর ব্রহ্মদেশের অনেক সামরিক বিমানঘাঁটি (যার অনেকগুলোই আজও পর্যটকদের জন্য নিষিদ্ধ) দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেনের চোখের চিকিৎসায় শুশ্রূষাকারিণী আমেরিকান নার্সটিও এই যাত্রায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ব্রহ্মদেশ আর থাইল্যান্ডের নিবিড় গিরিকন্দরের পথে আঠেরোশো মাইল পথ মোটরগাড়ি করে যাওয়াও হয়েছিল। আজাদি সেনাদের রক্তস্নাত মাউন্ট পোপা দেখার সৌভাগ্য হল। খরস্রোতা ইরাবতী নদীর তীরে প্রাতঃভ্রমণ করার সুযোগ এল। আমেরিকান আর ব্রিটিশদের বিমানবাহিনীর প্রচণ্ড দাপটে যে অরণ্যে ইঁদুরও বেরোতে ভয় পেত সেই অঞ্চলেও যেতে পেরেছিলাম আমি। বার্লিন, রোম, লন্ডন, মস্কো, রেঙ্গুন আর টোকিয়োর মহাফেজখানায় নেতাজির অপূর্ব জীবনকাহিনির অনেক অজানা অধ্যায় জানতে পারলাম আমি। এক অতুলনীয় নেতৃত্বের অনুপম প্রতীক নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বিচিত্র জীবন সম্পর্কে অধ্যয়ন একটা অনবদ্য শান্তি এনে দিল আমার প্রাণে।

ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের সময় আমার বন্ধু ভেঙ্কটেশ কুলকার্নি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। আলোচ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট ইতিহাস অনুসন্ধানের বিভিন্ন পর্যায়ে ড. সারিন, ড. এস. আর. বক্সি, (অল ইন্ডিয়া হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ কমিটি, নয়া দিল্লি), ড. ওয়াই দি. ফড়কে, আর ড. রোহিণী গাওয়ানকরের সঙ্গে আলোচনা নানানভাবে আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. ত্র্যম্বক কৃষ্ণরাও টোপেও আমাকে বহুমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক অরবিন্দ টিকেকর সারা দেশের অনেক গ্রন্থাগার থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আনিয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। ভাষার প্রতিবন্ধকতায় অনেক বই-ই আমার কাছে 'কাছে থেকেও দূরে' দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমার 'পানিপথ' আর 'ঝাড়াঝড়তি' বইগুলোর দৌলতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র, যারা আমাকে চিনত, তারা সে সব বইগুলোর ভাষান্তর করে দিয়ে আমার বোধগম্য করে দিয়েছেন। মোট তেইশটি বাংলা বইয়ের মধ্যে চোদ্দোটিই একা কুমারী মেধা তাসকর অনুবাদ করে আমাকে দারুণ সাহায্য করেছেন। বিভিন্ন ভাষার বইগুলো অনুবাদ করে দিয়ে

যে সব বন্ধু আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের নামোল্লেখ আমি আমার কর্তব্য বলেই মনে করি।

১। জাপানি— জ্ঞানেশ্বর মূলে, কুমারী ইয়ামায়ুচি (টোকিয়ো), কুমারী সুগিয়ামা (ইয়োকোহামা), উমেশ পাওয়ানকর (সোফিয়া বিদ্যাপীঠ, টোকিও), অনিল কুলকার্নি (থানে)।

২। বাংলা— কুমারী মেধা তাসকর (থানে), দীপেন চক্রবর্তী, সরযূ বোস, নন্দিনী আত্মসিদ্ধ (মুম্বাই)।

৩। বর্মি— ফ্র্যাঙ্কি চোয় (রেঙ্গুন)।

৪। ফরাসি— সান্তা সিং (দিল্লি)।

পাণ্ডুলিপিগুলোর ওপর দিলীপ মাজগাঁওকর, ড. সদানন্দ বোরসে, সম্ভাজি জাধব, বামন বেন্দ্রে, সঞ্জয় পাটিল, ড. চন্দ্রকান্ত বান্দিওয়াডেকার আর শঙ্কর সারডার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা প্রচুর সাহায্য করেছে। প্রেস কপি তৈরি করার দুরূহ কাজ করে দিয়েছেন আমার অর্ধাঙ্গিনী চন্দ্রসেনা।

দিল্লির কর্নেল এস. এস. সিং আর অল ইন্ডিয়া আই এন এ কমিটির কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন এস. এস. যাদব আমার পেছনে যে ভাবে দাঁড়িয়েছেন তার জন্য কোনও ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়।

আমার সিনিয়র আই এ এস অফিসাররা, অরবিন্দ রেড্ডি, উজ্জ্বল উকে, সচিব গোবিন্দ স্বরূপ এবং মুখ্যমন্ত্রী মনোহর যোশি বিভিন্ন সময়ে আমার ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন বলেই আমি এই বিপুল কাজটি শেষ করতে পেরেছি।

কোলাপুরে আমার সহপাঠী, প্রাক্তন বিধায়ক এবং আমার আত্মীয় ত্র্যম্বক সীতারাম কারখানিস আর প্রাক্তন উপাচার্য ত্র্যম্বক কৃষ্ণরাও টোপে আজ আর আর আমাদের মধ্যে নেই। এই দুই ত্র্যম্বক যদি আজ থাকতেন, আর তাঁদের বাহবা যদি পেতাম তবে নিজেকে কৃতার্থ মনে হত। এই উপন্যাস পড়ার আন্তরিক ইচ্ছে এই দুজনেরই ছিল।

গত আট বছর ধরে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো, দিনের পর দিন চিন্তাভাবনা আর নেতাজি আর তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের অপূর্ব কীর্তির সঙ্গে পরিচয় এক অসামান্য মানসিক তৃপ্তি এনে দিয়েছে আমাকে। সেই সঙ্গে আজ খানিকটা ফাঁকা-ফাঁকাও লাগছে চারপাশে। রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসা সাঁজোয়া গাড়ির মতো মনে হচ্ছে নিজেকে। উপন্যাসে বর্ণিত বিভিন্ন পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে যেন মিলেমিশে গিয়েছিলাম আমি। এ বিরহে আনন্দ আর বেদনা হাত ধরাধরি করে রয়েছে।

১ অক্টোবর, ১৯৯৮
থানে

বিশ্বাস পাটিল

তথ্যসূত্র

সাক্ষাৎকার

১। বিনায়ক সুপনেকর—পুনা, জুন ১৯৯০
২। বাবাসাহেব ভোঁসলে (INA, জার্মানি)—কওঠেমহাঙ্কাল, সেপ্টেম্বর ১৯৯১
৩। কর্নেল প্রেম সেহগল—দিল্লি, ২০ অক্টোবর ১৯৯১
৪। কর্নেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন—মুম্বাই, ৭ আগস্ট ১৯৯২
কলকাতা—২২ জানুয়ারি ১৯৯৫। মুম্বাই—এপ্রিল—১৯৯৭
৫। সতবন সিং ওয়ালিয়া—মুম্বাই, আগস্ট ১৯৯১
৬। রামসিং রাওয়াল—দিল্লি, মার্চ ১৯৯২
৭। শিশিরকুমার বসু—কলকাতা, ২৯ মার্চ ১৯৯২
৮। কৃষ্ণা বসু—কলকাতা, ২৯ মার্চ ১৯৯২
৯। কোরিয়ন সিং (আজাদ হিন্দ দল, পরে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী)—ইম্ফল, ১ এপ্রিল ১৯৯২
১০। এম. মুনীন্দ্র সিং—মোইরাং, ২ এপ্রিল ১৯৯২
১১। কর্নেল জি. এস. ধিল্লোঁ—শিবপুরী, ১৭ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
দিল্লি—২৪ জানুয়ারি ১৯৯৭, মুম্বাই—১০ আগস্ট ১৯৯৭
১২। মণিভাই দোশি—মুম্বাই, মার্চ ১৯৯৪
১৩। মেজর ই. ভাস্করন—আডিয়ার, মাদ্রাজ ২৮ মার্চ ১৯৯৫, ৬ এপ্রিল ১৯৯৫
১৪। অনিতা বোস—কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ১৯৯৫
১৫। নারায়ণ সান্যাল—কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৫
১৬। কর্নেল এন. এস. ভগৎ—দিল্লি, ১৩ মার্চ ১৯৯৪
১৭। পি. এন. ওক—পুনা, এপ্রিল ১৯৯৪
১৮। কর্নেল রণ সিং—দিল্লি, ১৪ মার্চ ১৯৯৪
১৯। হরবন সিং—দিল্লি, ১৪ মার্চ ১৯৯৪
২০। ক্যাপ্টেন কে. ভি. চন্দ্রন—মাদ্রাজ, ৬ মার্চ ১৯৯৫
২১। শীলভদ্র যাজি—দিল্লি, ১২ মার্চ ১৯৯৪
২২। অধ্যাপক রঙ্গা—দিল্লি, ১৩ মার্চ ১৯৯৪
২৩। রমা খান্ডেলওয়াল (ঝাঁসি রানি বাহিনী)—মুম্বাই, মার্চ ১৯৯৭
২৪। মানবতী আর্য—দিল্লি, ১৯৯৪
২৫। জানকী দাভার—দিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৭
২৬। কর্নেল এস. এস. সিং—দিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৭

২৭। প্রতাপ ভগৎরাম তলোয়ার—থানে, ১ মে ১৯৯৮
২৮। নেগিশি (নেতাজির দোভাষী)—টোকিয়ো, ৭ জুলাই ১৯৯৬
২৯। অধ্যাপক মুরাই—সোফিয়া বিদ্যাপীঠ, টোকিয়ো, ৮ জুলাই ১৯৯৬
৩০। কাকিৎসুবো (নেতাজির দোভাষী, পরে পাকিস্তানে জাপানের রাষ্ট্রদূত)—১০ জুলাই ১৯৯৬
৩১। ইওয়ানামি (প্রধানমন্ত্রী তোজোর নাতনি এবং জীবনী লেখিকা)—টোকিয়ো, ১ জুলাই ১৯৯৬
৩২। তোমোজি মুতো—টোকিয়ো, ১২ জুলাই ১৯৯৬
৩৩। নাগানুমা—টোকিয়ো, ১২ জুলাই ১৯৯৬
৩৪। মোরিতো—টোকিয়ো, ১২ জুলাই ১৯৯৬
৩৫। অধ্যাপক ইয়াশিমা ওকেশি (প্রাক্তন সামরিক অফিসার)—টোকিয়ো, ১৩ জুলাই ১৯৯৬
৩৬। নাকাকুওয়া—টোকিয়ো, ১৪ জুলাই ১৯৯৬
৩৭। কে. ভি. নারায়ণ (স্বাতন্ত্র্য সৈনিক এবং পূর্ব এশিয়ায় অর্ধশতাব্দী ধরে 'হিন্দু' পত্রিকার প্রতিনিধি)—টোকিয়ো, ১৫ মার্চ ১৯৯৬
৩৮। তানাকা (টোয়ামোর নাতি এবং আধুনিক জাপানের ইতিহাসকার)—টোকিয়ো, ১৭ জুলাই ১৯৯৬
৩৯। তেৎসুয়ো হিগিচি (রাসবিহারীর কন্যা)—টোকিয়ো, ১৮ জুলাই ১৯৯৬
৪০। ওকুদা (হিকারি কিকন)—টোকিয়ো, ১৮ জুলাই ১৯৯৬
৪১। কুনিঝুকা (নেতাজির যুদ্ধকালীন দোভাষী, সচিব এবং ইতিহাসকার)—ফুকিওকা, ২১ জুলাই ১৯৯৬
৪২। ফিজি (ফুজিয়ারা কিকন)—টোকিয়ো, ২১ জুলাই ১৯৯৬
৪৩। অজয় খত্রা—ব্যাংকক, ২২ জুলাই ১৯৯৬
৪৪। এস. এস. গিলানি—ব্যাংকক, ২৩ জুলাই ১৯৯৬
৪৫। মারউইন বোয়েঙ্গা*
৪৬। জন থপান*
৪৭। রিচার্ড এফ. কের*
৪৮। হ্যারল্ড টিব্‌স*
৪৯। জর্জ ক্রো*
৫০। ডেরিও আন্তোনিকি
৫১। জেলিয়াস উইলসন (জুনিয়র)*
৫২। কর্নেল রাইডার*
৫৩। জজ ন্যাথাম*
৫৪। হোমেন সি. কুপার*
৫৫। তাকে ওঁকে—মেমিয়ো (ব্রহ্মদেশ), ২৭ মার্চ ১৯৯৭
৫৬। এস. পি. খত্রা—রেঙ্গুন, ২২ মার্চ ১৯৯৭
৫৭। শ্রীমতী ভরদ্বাজ—রেঙ্গুন, ২৩ মার্চ ১৯৯৭
৫৮। রামবলি সিং—তাম্মাই, রেঙ্গুন, ২০ মার্চ ১৯৯৭

৫৯। শ্রীরাম বর্মা—জিয়াওয়াডি, ২০ মার্চ ১৯৯৭
৬০। চন্দুলালজি ঠক্কর—রেঙ্গুন, ২১ মার্চ ১৯৯৭
৬১। রাম দয়াল—মিচিনা, ২৪ মার্চ ১৯৯৭
৬২। তসিন নান—মিচিনা, ২৪ মার্চ ১৯৯৭
৬৩। এমিলি শেঙ্কেল (বোস)
৬৪। আলেকজান্ডার রিথ
৬৫। হরিভাউ উপাধ্যায়
৬৬। শাহনওয়াজ খান
৬৭। পি. বি. সরমা
৬৮। ড. লক্ষ্মী সেহগল
৬৯। কর্নেল পি. কে. সেহগল
৭০। এ. সি. এন. নাম্বিয়ার
৭১। লর্ড মাউন্টব্যাটেন
৭২। কে. পি. কেশব মেনন
৭৩। উত্তমচাঁদ মালহোত্রা
৭৪। ড. এন. বি. খারে
৭৫। এইচ. ভি. কামাথ
৭৬। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
৭৭। অরবিন্দ বোস
৭৮। মমতা মেহ্‌তা (ঝাঁসি রানি রেজিমেন্ট)

* স্টিলউইল ও মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে জাপান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করা এইসব অফিসারদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল মার্চ ১৯৯৭-এ অসম—ব্রহ্মদেশ সফরের সময়।

* ৬২ থেকে ৬৭ ক্রমাঙ্কে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের সাক্ষাৎকার নেহরু মেমোরিয়াল গ্রন্থাগারের জন্য ইতিহাস গবেষকরা বিভিন্ন সময়ে নিয়েছিলেন।

এক-একজনের সঙ্গে ৭-৮ বার বসে দীর্ঘ কথাবার্তার পরে এইসব সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করা হয়।

এইসব সাক্ষাৎকার টাইপ করার পরে প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা হয়ে দাঁড়ায়। এই কাজ অত্যন্ত মূল্যবান মৌলিক তথ্যের আকর।

গ্রন্থপঞ্জি

(হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি, জাপানি, জার্মান, ইংরেজি, বাংলা, মরাঠী, হিন্দি)

হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি

1. Diary of Capt. Mehboob Ahmad.
2. Memories of Col. G. S. Dhillon.
3. Correspondence of Bhagat Ram Talwar.
4. Account of Gulam Ahmad Quereshi.
5. Imparu Sakusen Kaisoroku (Memories of the Imphal operation)-Mutaguehi Renya.

জাপানি

1. Nihon no guntai (The Japanese Military) Koji Iizuka.
2. Heitai Gashu (Drawings of the Soldier's Life)—Akihiro Tomita.
3. Indoyo ni kakaru kiji (A Rainbow across the Indian Ocean)-Kazunori Kunizuka.
4. Higeki no eiyu Chandora Bosu no shogai (Tragic Hero—The Life of S. C. Bose—Tatsuo Hayashida.
5. Showa no boryaku, Hara shobo, 1967 (Japanese Subversion in China and South-East Asia)-Takeo Imai.
6. Imparu (Imphal)—Tastsuo Hayashida
7. Biruma kosaku to boryaku shoko (A Japanese agent and Saboteur in Burma)—Masayoshi Yamamoto.
8. Imparu-Aru jugum-i no shuki (Imphal—An M. O.'s Notebook)-Karube Shigenori.
9. Ma no sittan kawa (Sittang: The Devil's River)-Kameo Susumu.
10. Biruma senki (The war in Burma)-Ushira Masaru.
11. Tenshin (Retreat)-Tsutsumi Shinzo.
12. Imparu Sakusen. Rettsu heidan kohima no shito (The Imphal operation. 31 Division at Kohima)-Murata Heiji.
13. Biruma senjo nikki (Burma: a battlefield Diary)—Kobyashi Ikusaburo.
14. Sakimori no shi : Imparu hen (Poems of the Guards: Imphal)—Kuzuma Yasuji.

15. Imparu saizensen (Front-line at Imphal)—Toshio Hamachi.
16. Biruma haisen koki. Ippeishi no kaiso (Wondering After Defeat in Burma. A Soldier's Reminiscences)—Araki Susumu.
17. Kyofu Imparu Saizensen (The Hurricane of Battle: Imphal)-Kikuchi Hitoshi.
18. Senso to ningen no kiroku. Biruma-Sen zenpan. (War and Man. The War in Burma. Vol. I)-Komiya Tokuji.
19. Imparu (Imphal), Bungel Shunju-Takagi Toshiro.
20. Imparu Sakusen Hishi (Secret History of the Imphal Operation)—Katakura Tadashi.
21. Komel (Insubordination)-Takagi Toshiro.
22. Funshi (Death in Anger)-Takagi Toshiro.
23. Tojo-Iwanami.
24. Shiki Kan (Commanders), Bunshun Bunko, 2 Vols.-Kajima Noboru.
25. Senshi (Death in Battle)-Takagi Toshiro.
26. Nihoan to S. C. Bose Gainusho's Publication.
27. Yomiuri Shinbun's three volumes.

জার্মান

1. Der Tiger Indiens S. C. Bose—A. Werth.
2. Manner, die icn sah und kannte-F. J. Furtwangler.
3. Tiger und Schakal-R. Schnable.

বাংলা

১। ইতিহাসের সন্ধানে—কৃষ্ণা বসু
২। সুভাষ স্মৃতি—সম্পাদক, বিশ্বনাথ দে
৩। সুভাষচন্দ্র ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
৪। নেতাজি রহস্য সন্ধানে—নারায়ণ সান্যাল
৫। আমার বন্ধু সুভাষ—দিলীপকুমার রায়
৬। সুভাষচন্দ্র ও নাৎসি সরকার—নন্দ মুখোপাধ্যায়
৭। বসু বাড়ি—শিশিরকুমার বসু
৮। সুভাষচন্দ্র ও ব্রিটিশরাজ—নন্দ মুখোপাধ্যায়
৯। আমি নেতাজিকে দেখেছি—নারায়ণ সান্যাল
১০। প্রসঙ্গ সুভাষচন্দ্র—কৃষ্ণা বসু
১১। তাইহোকু থেকে ভারত—নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য—শ্রী অভিজিৎ
১২। সমকালীন ভারতবর্ষ ও সুভাষচন্দ্র—বেদুইন

১৩। চরণরেখা তব—কৃষ্ণা বসু
১৪। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র—নেপাল মজুমদার
১৫। সুভাষের সঙ্গে বারো বছর—হেমন্তকুমার সরকার
১৬। আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে—ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসু
১৭। নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—(খণ্ড ১ থেকে ৩)—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী
১৮। সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং—শঙ্করীপ্রসাদ বসু
১৯। 'মানুষ' চিত্তরঞ্জন—অপর্ণা দেবী
২০। দেশ—সুভাষচন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা
২১। পরিচয়—শতবর্ষী সুভাষচন্দ্র, ১৯৯৬
২২। নারীজগৎ—ঝাঁসি রানি বাহিনীর ওপর বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৬
২৩। উত্তরা—নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন; লখনউ, দ্বিতীয় সংখ্যা (সুভাষ বিশেষ সংখ্যা)

মরাঠি

১। সুভাষবাদ—গ. ত্র্য. মাডখোলকর
২। নেতাজীঞ্চা সহবাসাত—পু. না. ওক
৩। দুসরা স্বাতন্ত্র্যসংগ্রাম—পু. না. ওক
৪। নওরোজী তে নেহ্রু—গোবিন্দ তড়ওয়ালকর
৫। নেতাজি—বি. স. ওয়াড়িম্বে
৬। শৃঙ্খলা খড়াখড়া তুটল্যা—বি. শ্রী. জোশী
৭। আজাদ হিন্দ—ডি. ডি. কাড়ে
৮। সত্তান্তর—গোবিন্দ তড়ওয়ালকর
৯। কহানী সুভাষচন্দ্রাচী—ড. য়া. দি. ফড়কে
১০। কহানী নেতাজিঞ্চী—ড. য়া. দি. ফড়কে
১১। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী আনি ঝাঁসি রানি ফৌজ—ড. রোহিণী গাওয়ানকর
১২। সুভাষকথা—আচার্য আত্রে
১৩। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে—আচার্য আত্রে
১৪। ডা. না. ভা. খরে য়াঞ্চা চরিত্র—জগন্নাথ জোশী
১৫। দুসরে স্বাতন্ত্র্যযুদ্ধ—শা. তু. ভালেকর

হিন্দি

১। ৫১ই হিন্দি রাষ্ট্রীয় মহাসভা কা অহওয়াল—হরিপুরা, ১৯৩৮
২। কংগ্রেস কা ৬০ বর্ষ—ড. পট্টভি সীতারামাইয়া
৩। জীভ দিখানা—গুন্টার গ্রাস (অনু: বিষ্ণু খারে)

৪। জয় হিন্দ—শ্রীকৃষ্ণ সরল
৫। কালজয়ী সুভাষ—শ্রীকৃষ্ণ সরল
৬। আজাদ হিন্দ ফৌজ মে গাড়োয়ালী সৈনিকোঁ কা যোগদান—ডা. সুরেশ চন্দোল
৭। স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম সে সমাজবাদ কে সংঘর্ষ তক—ড. লক্ষ্মী সেহগল
৮। অমর সংকল্প—কর্নেল এ. বি. সিংহ, আজাদ হিন্দ সংঘ, বরেলি

ইংরেজি

1. The Retreat from Burma—Lt. Col. Tony Mains
2. Behind the Burma Road—W. R. Rees and Dean Berlis
3. Memoirs of the Four Foot Colonel—General Smith Dun
4. The March Out—James Shaw
5. Last and First in Burma—Maurice Colis
6. Burma under the Japanese—Thakin Nu
7. The Sixth Column—Mahmood Khan Durrani
8. The War of the Springing Tigers—Gerald H. Corr
9. Vivekananda's Influence on Subhash—Nanda Mookerjee
10. The Calcutta Municipal Gazette, S. C. Bose Centenary Number 1997
11. Mahatma Gandhi 100 years—S. Radhakrishnan
12. Gandhi: A Study—Hiren Mukerjee
13. Gandhi and his Apostles—Ved Mehta
14. Gandhi: His Critics—B. K. Nanda
15. Deshapriya J. N. Sengupta—Padmini Sengupta
16. S. C. Bose—Dr. Girija Mookerjee
17. A Forgotten Army—INA Committee Publication
18. J. M. Sengupta—Sachin Dutt
19. Subhash Chandra Bose and Nazi Germany—T. S. Sareen
20. My Days with Gandhi—Nirmal Bose
21. My Uncle Netaji—Ashok Nath Bose
22. I Warned My Countrymen—Sarat Chandra Bose
23. The Great Escape—Sisir Bose
24. Remembering My Father—Sisir K. Bose
25. The Voice of Sarat Chandra Bose—Sisir K. Bose
26. An Indian Pilgrim—Subhash Chandra Bose
27. Crossroads—Subhash Chandra Bose
28. Correspondence 1924-1932—Subhash Chandra Bose
29. Boycott of British Goods—Subhash Chandra Bose

30. Letters to Emili Schenkl 1934-1942—S. C. Bose
31. Impressions in Life—Subhash Chandra Bose
32. Selected Speeches of Subhash Chandra Bose
33. The Indian Struggle 1920-1942—Subhash Chandra Bose
34. The Mission of Life—Subhash Chandra Bose
35. Through Congress Eyes—Subhash Chandra Bose
36. Mission with Mountbatten—Alan Campbell—Jonson
37. When Bose was Ziauddin—Uttam Chand
38. In Search of Freedom—Jogesh Chandra Chatterji
39. India's Struggle for Freedom—A. C. Chatterji
40. Thy Hand, Great Anarch—Nirad C. Chaudhuri
41. India for Indians—Chittaranjan Das
42. India from Curzon to Nehru and After—Durga Das
43. Sarder Patel's Correspondence 1945-50—Durga Das
44. Netaji—Krishna Bose
45. Mein Kampf—Adolph Hitler
46. Secret Conversations—Adolph Hitler
47. The Rebel and Other Poems—Kazi Nazrul Islam
48. My Memories of I.N.A. and its Netaji—Shah Nawaz Khan
49. The Story of My Life—M. R. Jaykar
50. Quid-e-Azam Jinnah as I Knew Him—M.A.H. Ishphani
51. My Political Memories—N. B. Khare
52. Subhash Chandra Bose As I Knew Him—Kitty Kurti
53. Japan's Greater East Asia Co. —Prosperity Sphere in World War II—Joyce Lebra
54. The Goebbels Diaries—Louis Lochner
55. An Indian Freedom Fighter in Japan—A. M. Nair
56. Ciano's Diary 1939-1943—Malcolm Muggeridge
57. Europe at War (1938-1946) —Girija K. Mookerjee
58. The Road Past Mandalay—John Masters
59. The Statesmen—Niranjan Majumdar
60. Guilty Men of India's Partition—Ram Manohar Lohia
61. F. Kikan—Iwaichi Fujiwara
62. An Autobiography: My Experiments with Truth—Mohandas K.Gandhi
63. The Collected Works of Mahatma Gandhi. 88 vols.
64. India Today—Rajani Palme Dutt
65. Early Life of Netaji—Subodh Chandra Ganguli

66. Netaji in Germany—N. G. Ganpuley
67. Our Struggle—Moni Ghosh
68. Netaji in Germany—Watter Harbich and Alexander Werth
69. Sarat Chandra Bose Commemoration Volume, Calcutta
70. Netaji: The Man, Reminiscences—Dilip Kumar Roy
71. The Subhash I Knew—Dilip Kumar Roy
72. Fight For Freedom—N. G. Ranga
73. Autobiography—Rajendra Prasad
74. A Bunch of Old Letters—Jawaharlal Nehru
75. Towards Freedom—Jawaharlal Nehru
76. Selected Works, Second series—Jawaharlal Nehru
77. Selected Works, 15 Vols. —Jawaharlal Nehru
78. The Indian Nationalist Movement—B. N. Pandey
79. Sheel Bhadra Yajee—V. L. Sundar Rao
80. Report of the 52nd Indian National Congress Tripuri (Dt. Jubbulpore)
81. The Tiger Strikes—Mangat Gurubachan Singh
82. Soldiers' Contribution to Indian Independence—Mohan Singh
83. Leaves From My Diary—Mohan Singh
84. The Road to Delhi—M. Sivaram
85. Defeat into Victory—Viscount Slim
86. Netaji Subhash Chandra Bose—Sopan
87. The Talwars of Pathan Land and Subhash Chandra's
Great Escape—Bhagat Ram Talwar
88. While Memory Serves—Sir Francis Taker
89. Passage through a Turbulent Era—M. R. Vyas
90. The Viceroy's Journal—Lord Wavell
91. Encyclopaedia of the Indian National Congress—Zaidi and Zaidi
92. Freedom at Midnight—Larry Collins and Dominique Lapierre
93. Deshbandhu Chittaranjan Das—Hemendranath Das Gupta
94. Subhash Chandra—Hemendranath Das Gupta
95. Peasant Struggles in India—A. R. Desai
96. Quit India Movement: British Secret Report—P. N. Chopra
97. Hitler—Joachim C. Feast
98. Bengal: The Nationalist Movement 1876-1940—L. A. Gordon
99. History of the Second World War—B. H. Liddell Hart
100. India in Axis Strategy: Germany, Japan and Indian Nationalists
in the Second World War—Milan Hauner
101. Netaji Subhash Chandra Bose—Tatsua Hayashida

102. The Great Divide: Britain, India, Pakistan—H. V. Hudson
103. The Pacific War—Suburo Ienaga
104. In Freedom's Quest—N. G. Jog
105. The History of the German Resistance 1933-45—Peter Hoffman
106. The War against Japan—S. Woodburn Kirby
107. Japanese—Trained Armies in South-East Asia—Joyce Lebra
108. Jungle Alliance: Japan and Indian National Army—Joyce Lebra
109. Country Must Know What Happened to Netaji—Samar Guha
110. A Matter of Honour—Philip Mason
111. The Nehrus: Motilal and Jawaharlal—B. R. Nanda
112. Mahatma Gandhi—B. R. Nanda
113. Two Great Indian Revolutionaries—Uma Mukherjee
114. Churchill, Cripps and India 1939-1945—R. J. Moore
115. Hitler and Japan: Hollow Alliance—Johanna Menzed Meskill
116. The Transfer of Power in India—V. P. Menon
117. Socialism in India—B. R. Nanda
118. Nehru—B. N. Pandey
119. Mahatma Gandhi—The Last Phase 2 Vols. —Pyarelal
120. Two Historic Trials in Red Fort—Moti Ram
121. Ras Bihari Basu: His Struggle for India's Independence—Radhanath Rath
122. The Life and Times of C. R. Das—Prithwis Chandra Ray
123. Oaten Incident 1916—Bhola Nath Roy
124. Japan and the Indian National Army—T. R. Sareen
125. Life and Work of Netaji Subhash Chandra Bose—P. D. Saggi
126. Netaji, His Life and Work—Shri Ram Sharma
127. The Left Wing in India—L. P. Sinha
128. End of the War in Asia—Louis Allan
129. Subhash Chandra Bose—Hugh Toye
130. Mahatma 8 Vols. —D. G. Tendulkar
131. Netaji Bose, The Last Phase—Madan Gopal
132. Troubled Loyalty: A Biography of A. V. Trott—Christopher Sykes
133. Mussolini, A Biography—Denis M Smith
134. History of the Indian National Congress—Pattabhi Sitaramayya
135. Mountbatten—Philip Ziegler
136. Dictionary of National Biography 5 Vols. —S. P. Sen
137. The Indian Annual Register: 1925-47—Nripendra Nath Mitra
138. The Footprints on the Road to Indian Independence—Kali Charan Ghose
139. C. R. Das and Indian National Movement—Dilip Kumar Chatterji

140. The Rise and Growth of Economic Nationalism in India—Bipan Chandra
141. Nationalism and Colonialism in Modern India—Bipan Chandra
142. A History of Modern Burma—John F. Cady
143. Japan's Decision to Surrender—Robert J. C. Butow
144. A Will for Freedom—Romen Bose
145. Eminent Indians—Ermine Brown
146. Nehru, A Political Biography—Michael Brecher
147. Dissentient Report—Suresh Chandra Bose
148. Netaji and India's Freedom—Sisir K. Bose
149. A Beacon Across Asia—Sisir K. Bose and Alexander Werth
150. The Lost Hero—Mihir Bose
151. Studies in Gandhism—Nirmal Kumar Bose
152. Freedom Struggle and Anushilan Samiti—Buddhadeva Bhattacharya
153. The Quit India Movement—Arun Bhuyan
154. India Wins Freedom—Maulana Abul Kalam Azad
155. Unto Him a Witness—S. A. Ayer
156. Breakthrough in Burma—Ba Maw
157. At the Crossroads (1885-1946) —Nripendra Chandra Banerji
158. Indian National Army—Secret Service—Motilal Bhargava and Americk Singh Gill
159. In the Shadow of the Mahatma—G. D. Birla
160. The Rise and Growth of Congress in India (1832-1920)
161. Story of the I.N.A. —S.A. Ayer
162. The Making of Modern Ireland 1903-23—J. C. Beckett
163. Studies in Gandhism—N. K. Bose
164. Gandhi's Rise to Power: Indian Politics (1915-23)—Judith M. Brown
165. Subhash Chandra Bose and Indian Communist Movement—Gautam Chattopadhyay
166. Social Background of Indian Nationalism—A. R. Desai
167. The Role of the Gadar Party in the National Movement—G. S. Deol
168. Swami Vivekananda—Bhupendranath Dutta
169. Socialism and Communism in India—Sankar Ghosh
170. Bengal: The Nationalist Movement 1876-1940—Leonard Gordon
171. Netaji and the C.P.I., Society for Defence of Freedom in Asia—Sitaram Goel
172. Ireland Her own—T. A. Jackson
173. Brothers Against Raj—Godwin
174. Evolution of Netaji: The Warrior Prophet of India—S. K. Majumdar
175. The Communal Triangle in India—Ashok Mehta and Achyut Patwardhan

176. Jawaharlal Nehru—Frank Moraes
177. Bow of Burning Gold—Hiren Mukerjee
178. I.N.A. Soldiers Diary—M. G. Mulkar
179. Gandhi and Nehru—M. Chalapathi Rao
180. Golden Jubilee Celebrations Netaji Number, Jalandhar 1994
181. What Netaji Stands For—Anil Roy
182. The Road to Delhi—M. Sivaram
183. Burma: The Longest War—Louis Allen
184. The Indian National Congress and the Raj, 1929-1942—B. R. Tomlinson
185. Jai Hind—The Diary of a Rebel Daughter of India with the Rani of Jhansi Regiment
186. A Detail on the Burma Front—Winnifred Beaumont
187. A Chindi Story—James Baggaley
188. Naga Path—Ursula Graham Bower
189. Prisoner Beyond the Chindwin—Hillda R. Crope
190. Jungle Diary—Duncan Guthrie
191. Monsoon Victory—General Hanley
192. With Wingate in Burma—David Halley
193. Burmese Outpost—Anthony Irwin
194. A Revolutionary Life—Lakshmi Sahgal
195. The Forgotten Army—Peter Fay
196. Netaji Where Are Thou—Trikannad Sunder Rao
197. Four Samurai—Arthur Swinson
198. The March to Delhi—A. J. Barkar
199. Struggle in Burma Jungle—Yoshiro Akinaga
200. Reminiscences—Douglas MacArthur
201. Kohima—Arthur Swinson
202. The Last Days of Netaji—H. N. Pandit
203. The Great INA—Col. M. Z. Kiani
204. Sittang: The Last Battle—Louis Allen
205. A Good German: Adam Trott—Giles MacDonogh
206. West Bengal—Netaji Birth Centenary Volume 1997
207. Netaji S. C. Bose: From Kabul to Battle of Imphal—H. N. Pandit
208. Netaji Number: Ajanta, New Delhi 1997
209. Two Years with Netaji—Narayan Menon
210. The Last Days of Netaji—K. C. Yadava & Akiko Seki
211. Japan and it's Destiny—Shigemitsue

সর্ব অর্থেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
ইতিহাসপুরুষ। 'মহানায়ক' উপন্যাস
সেই মহাজীবনের কাহিনি। মূল
মরাঠি ভাষায় লেখা এই
জীবনোপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছেন
মহানায়ক নেতাজি।

9 788177 566512